অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

চতুর্থ খণ্ড

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা ৭৩

Achintyakumar Rachanavali (Vol. IV.)
(Collected Writings of Achintyakumar
Sengupta).

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬১

উপদেষ্টা মণ্ডলী :
শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ডঃ সরোজমোহন মিত্র,
নিরঞ্জন চক্রবর্তী

প্রকাশক :
আনন্দরূপ চক্রবর্তী
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড,
১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

মুদ্রক :
শুকদেব চন্দ্র চন্দ
বিবেকানন্দ প্রেস,
১/১ই, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
রূপায়ণ, কলকাতা ৬

সূচীপত্র

উপন্যাস:

জননী জন্মভূমিশ্চ ৩

ইন্দ্রানী ৭৯

তৃতীয় নয়ন ১৯৫

ছিনিমিনি ২৭৭

তুমি আর আমি ৪৩৯

উপন্যাসিকা:

ডাউন দিল্লি এক্সপ্রেস ৪০৫

সংকলন:

বাঁকা-লেখা (উপন্যাস) ৫১৫

পত্রগুচ্ছ:

বুদ্ধদেব বসুর চিঠি : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে ৬২১

উপন্যাস

জননী জন্মভূমিশ্চ

এক

রাজলক্ষ্মী দ্বিতীয় পক্ষে পড়িয়াছিল, কিন্তু বিবাহের বছর বারো পরেই স্বামী যখন হঠাৎ সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিবার উপক্রম করিলেন, লোকলজ্জার মাথা খাইয়া সে সরাসরি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল: নাবালক ছেলেদুটোর কী ব্যবস্থা করে গেলে? রাজলক্ষ্মীর সপত্নী-পুত্র কালিকিঙ্কর তাহার সমবয়সী, বাপের মৃত্যুর পর সংসারে তাহারই বিস্তৃত একাধিপত্য চলিবে—অগত্যা তাহারই প্রতি আঙুল তুলিয়া ইশারা করিয়া রাজলক্ষ্মীর স্বামী ক্ষান্ত হইলেন। কিন্তু ইহাতে রাজলক্ষ্মীর মন উঠিল না। স্বামীকে লইয়া ডাক্তার-কবিরাজ আত্মীয়-পরিজন যখন অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, আস্তে-আস্তে পাশের ঘরে গিয়া সে মোটা চাবি ঘুরাইয়া লোহার সিন্দুকটা খুলিয়া ফেলিল। চাবিটা এখনো পর্যন্ত কর্তার জিম্মায় ক্যাশবাক্সের মধ্যে বন্ধ হইয়া আছে, কিন্তু তাঁহার এই রাত্রি পোহাইতে-না পোহাইতে সেটা কালিকিঙ্করের হস্তগত হইবে। রাশীভূত আঁচলে কড়াটা দুই হাতে সবলে চাপিয়া ধরিয়া শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া রাজলক্ষ্মী ডালাটা টানিয়া তুলিল। ওদিকে পাশের ঘরে বহুকণ্ঠে নানারূপ অসংলগ্ন কোলাহল হইতেছে—তাহাতে কান দিবার এখন সময় নাই। দুই ক্ষিপ্র, ত্রস্ত, অসহিষ্ণু হাতে রাজলক্ষ্মী সিন্দুকটা ঘাঁটিতে বসিল, কতগুলি কাগজ-পত্রের বাণ্ডিল ছাড়া কিছুই তাহার হাতে ঠেকিল না। তাহার গহনার ঝাঁপিটা এক কোণে পড়িয়া আছে বটে, কিন্তু বৃহৎকায় থলেগুলির স্ফীতি অনুভব করিতে গিয়া সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। সবগুলি শূন্য, অন্তঃসারহীন। ওদিকে রাশি-রাশি অসংলগ্ন কোলাহল সমবেত আর্তনাদে পরিণত হইয়াছে। তাহাতে রাজলক্ষ্মী বিশেষ বিচলিত হইতেছে না; তাহা তো সে জানেই—যেদিন তাহাকে তাহার বয়সের তুলনায় এই বৃদ্ধের হাতে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেইদিন হইতেই তো সে ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে—কিন্তু সর্বনাশ যে শেষকালে এমন মূর্তিতে দেখা দিবে তাহা সে কোনো দিন ভাবিয়া দেখে নাই।

স্বামীর মৃত্যুর পর সপত্নী-পুত্রের সংসারে রাজলক্ষ্মী বেশিদিন টিকিতে পারিল না। স্বভাবতই সে রুক্ষস্বভাব, কলহপ্রিয় ও কটুভাষী—তাহার পর স্বামীর সংসারে তাহার সিংহাসন তো চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছেই, উপরন্তু সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নাবালক দুইটি ছেলে লইয়া কালিকিঙ্করের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। স্বামী যদি হঠাৎ এমনি সন্ন্যাসরোগে মারা না যাইতেন

রাজলক্ষ্মীকে তাহা হইলে এমন শূন্য হাতে কপাল কুটিতে হইত না। কিছু সে অনায়াসে গুছাইয়া নিতে পারিত।

এই সুযোগে কালিকিঙ্করের স্ত্রী ষোড়শী সংসারের সমস্ত ব্যাপারে নিজের কর্তৃত্ব জাহির করিবার জন্য কোমরে কাপড় বাঁধিয়া উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। সেই নম্রচক্ষু, মৌনমুখী মেয়েটিকে এখন আর চিনিবার যো নাই। তাহার গলা এখন সবার উপরে; তাহার দৃপ্ত, দ্রুত পদশব্দে সমস্ত সংসার টলমল করিয়া উঠিল। ভাঁড়ার হইতে রান্নাঘর, গোয়ালঘর হইতে মুদির দোকান—সমস্ত এখন তাহারই এলাকায়। কোন্ বেলা কী রান্না হইবে, কোন মাছখানা কাহার পাতে পড়িবে, বছরে কাহার কয়খানা কাপড় লাগিবে, তাহার ব্রত-সমাপ্তির দিন পাড়ার কাহাকে-কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে ইত্যাদি তুচ্ছ ও বৃহৎ যাবতীয় ব্যাপারে ষোড়শীরই এখন অপ্রতিহত প্রভাব। কালিকিঙ্করের সমস্ত পরামর্শ তাহার সঙ্গে: ক্যাশ-বাক্সের চাবির গোছা এখন তাহার আঁচলেই উঠিয়াছে। সমস্ত ব্যাপারটা চক্ষু মেলিয়া রাজলক্ষ্মী সহ্য করিতে পারিল না। একজনের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে তাহার এই জীবন্ত সহমরণের জ্বালা তাহার কাছে ক্রমশ দুর্বহ হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু নির্বিবাদে সহ্য করিবার মেয়ে সে নয়।

উঠিতে-বসিতে ষোড়শীর সঙ্গে ঝগড়া তাহার লাগিয়াই আছে। এবং যত নগণ্য কারণেই হোক না কেন, সে-সব ঝগড়ায় সমারোহের এতটুকু ত্রুটি ঘটে না। ধোপাবাড়িতে কাপড় দিবার সময় ষোড়শী সমস্ত কাপড়-জামার পরিচ্ছন্নতা-অপরিচ্ছন্নতার তারতম্য বিচার করিতে বসে; তেমনি একদিন রঙ্গলালের একটা শার্ট তুলিয়া লইয়া সে কহিল: এটা তো দিব্যি ফরশা আছে, আরো একছুট গায়ে দেয়া চলে! এইটুকু ছেলে—তারই যাচ্ছে কিনা সাতখানা!

রাজলক্ষ্মী তাড়িয়া আসে: কেন যাবে না শুনি? তোমার নতুন ভাইটিকে যে এনে বসিয়েছ তার গেছে ক'খানা?

ষোড়শী মুখ ঘুরাইয়া বলে: আহা, কার সঙ্গে কার তুলনা! আমার ভাই থার্ড ক্লাশে পড়ে, দস্তুরমতো তার গোঁফের রেখা দিয়েছে—তার কাছে কিনা ও! এইটুকু বাচ্চা ছেলে—এত বাবুগিরি কিসের? ফরশা জামা-কাপড় ছেলের গায়ে না উঠলে যদি জাত যায়, তবে নিজ হাতে কেচে নিলেই তো পারেন।

রাজলক্ষ্মী মারমুখো হইয়া উঠে: কেন কাচতে যাব? তোমার বাপের পয়সায় ধোপাবাড়িতে কাপড় যাচ্ছে?

ষোড়শী রঙ্গলালের শার্টটা বারান্দায় ছুঁড়িয়া দিয়া বলে: কার পয়সায় যাচ্ছে তা আর ঠাট করে বলতে হবে না। যাই হোক, আমি যখন বলছি, ও-জামা

যেতে পারবে না। দাদার ঘাড়ে চেপে ঐটুকু ছেলের এমন বেজাতীয় বাবুগিরি চলবে না এখানে।

—দাদার ঘাড়ে! রাজলক্ষ্মী চোয়াল বাঁকাইয়া রুখিয়া উঠে : কালিকিঙ্করের ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে এমন কথা বলতে পারে শুনি? দাদার পয়সা? বিষয়-আশয়ে ওদের সমান-সমান ভাগ নেই ভেবেছ? ওরা অমনি ভেসে এসেছে? মোক্তারি করে তোমার সোয়ামি ক'পয়সা ঘরে এনেছে জিগগেস করি? দাদার পয়সা! বলতে জিভটা খসে পড়ল না?

ষোড়শী গম্ভীর হইয়া বলে : অত শাসাচ্ছেন কী! ভাগ আছে তো আদালতে গিয়ে মামলা করুন না। এখানে তবে পড়ে আছেন কী করতে?

—এ কী তোমার বাপের জায়গায় পড়ে আছি? এ আমার সোয়ামির ভিটে, এখানে আমার ষোলোআনা কায়েমি স্বত্ব, এতটুকু অপমান সইব না, বড়-বৌ। শিগগির ঐ শার্ট তুমি কুড়িয়ে এনে বোঁচকার সঙ্গে বেঁধে রাখ, নইলে ভালো হবে না বলছি।

—কী অত চোখ করছেন? রাখব না তো কী করতে পারেন করুন না। ষোড়শীও তাড়াতাড়ি আঁচলটা কোমরে জড়াইয়া নেয়। সেই মুহূর্তে কী যে ঠিক করা যায় রাজলক্ষ্মী এক নিমেষে ভাবিয়া পায় না। অগত্যা মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া মৃত স্বামীর উদ্দেশে প্রবলকণ্ঠে ডাক পাড়িতে থাকে।

রঙ্গলাল এই বছর ফিফ্থ্ ক্লাশে প্রমোশন পাইয়াছে, পান্নালাল সবে ইস্কুলে ঢুকিবার উদ্যোগ করিতেছিল। পরদিন রঙ্গলাল আসিয়া মাকে বলিল : আজ আমাদের মাইনে দিতে হবে।

রাজলক্ষ্মী বলিল : দাদার ঠেঁয়ে চেয়ে নে গে, যা।

কথাটা সে পাড়িতেই কালিকিঙ্কর সরাসরি বলিয়া বসিল : টাকা-পয়সা সব আকাশ ফুঁড়ে আসে, না? যা, আজ হবে না। নিতান্ত ভীত হইয়া রঙ্গলাল বলিল : আজ না দিলে কাল থেকে একআনা করে জরিমানা লাগবে।

—জরিমানা লাগবে! ষোড়শী ভেঙচাইয়া উঠিল : অমন ইস্কুলে তবে ঠাট করে পড়া কেন? ইস্কুল থেকে ছোঁড়ার নাম কাটিয়ে দাও।

দুঃখে, অভিমানে রঙ্গলালের চোখে জল আসিয়া পড়িল; কহিল : মোটে আড়াইটে তো টাকা!

তাহার গালে ঠাস করিয়া এক চড় মারিয়া ষোড়শী কহিল : যত বড়ো মুখ নয়

তত বড়ো কথা! আড়াই টাকার হিসেব নিতে এসেছেন! যা না তোর মা'র কাছে, সে দিতে পারে না? সিন্দুকের সব মোহরগুলোই তো আলগোছে সরিয়ে ফেলেছে—নগদ টাকা কিছুই তো আর পাওয়া গেল না। বসে-বসে তো খালি গিলবে, দিতে পারে না আড়াই টাকা?

রাজলক্ষ্মী পাশের ঘরে কান পাতিয়া ছিল, একেবারে থাক-যাক অবস্থায় ছুটিয়া আসিল। তীব্রকণ্ঠে কহিল, কেন, কেন তুমি আমার ছেলের গায়ে হাত তুলবে?

ষোড়শী কহিল: একশোবার তুলব, বেয়াদপি করলে শাসন করব না?

—কী বেয়াদপিটা করেছে শুনি? ইস্কুলের মাইনে চাইতে এসেছে মাত্র। তা তুমি তাকে শাসন করবার কে?

—আহা, খালি তাঁদের পেট পুরে দুধ-ভাত খাওয়াও, বেয়াদপি করলেও কাঁধে করে নাচ! মামাবাড়ির আবদারের আর জায়গা পায়নি! ষোড়শী গলা ফুলাইয়া স্বরটাকে একেবারে গদ্গদ করিয়া তুলিল।

রাজলক্ষ্মী দুই পা আগাইয়া আসিয়া কহিল: তোমার চুপ করে থাকলে চলবে না কালিকিঙ্কর। রঙ্গলাল কী-এমন অন্যায়টা করেছে যে ওকে চড় মারবে!

কালিকিঙ্করের মুখের কথা কাড়িয়া নিয়া ষোড়শীই কহিল: ছেলের দোষ তো আপনি দেখতেই পান না! এইটুকু ছেলে—এক চড়ে অন্নপ্রাশনের ভাত বেরিয়ে আসে—কী তার টাস-টাস কথা! তলে-তলে মায়ের ইশারা না থাকলে এইটুকু ছেলের এতখানি সাহস হয়?

মাঝে পড়িয়া কালিকিঙ্কর কহিল: হাতে আজ টাকা নেই, একদিন সবুর করলে ইস্কুল তো আর উঠে যাচ্ছে না!

—তা যাচ্ছে না, কিন্তু সামান্য আড়াইটে টাকা তোমার হাতে নেই এ-কথাই বা বিশ্বাস করি কী করে? কর্তার আমলে সামান্য দু'চার টাকার জন্যে এমন গোলমাল তো কই হতে দেখিনি।

ষোড়শী আবার ফোঁস করিয়া উঠিল: কত খরচ তাও তো কই দেখতে পান না? বিশ্বাস না হয় নিজের গাঁট থেকে বের করে দিলেই তো চুকে যায়।

রাজলক্ষ্মী কহিল: সোয়ামির সামনে দাঁড়িয়ে শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করতে তোমার লজ্জা হয় না, বড়-বৌ? আর, কালিকিঙ্কর, এ-ও আমায় দাঁড়িয়ে দেখতে হবে?

কালিকিঙ্কর স্ত্রীকে ধমক দিয়া উঠিল: তুমি যাও না তোমার কাজে।

—আহা, কী আমার শাশুড়ি রে! বলিয়া ষোড়শী শরীরে একটা মোচড় দিয়া রান্নাঘরের দিকে প্রস্থান করিল।

কালিকিঙ্কর বলিল : একদিন সবুর করা যাবে না এ-ই বা তোমাদের কেমন-ধারা জেদ।

কোনো জিনিসের প্রার্থী হইয়া পরে প্রত্যাখ্যাত হইবার মধ্যে প্রভুত্বহানির যে দুঃসহ লজ্জা ও গ্লানি তাহা রাজলক্ষ্মী তাহার এই বারো বৎসরের বিবাহিত জীবনে কোনোদিন প্রত্যক্ষ করে নাই। কিন্তু আজ তাহাকে এই অবনতি স্বীকার করিতে হইবে। রাজলক্ষ্মী শান্ত স্বরে কহিল : কিন্তু আজ ইস্কুলের সব ছেলেই মাইনে দেবে, তার মধ্যে ও না দিলে ওর একটু লজ্জা হওয়াই তো স্বাভাবিক। মাস্টার কিছু যদি জিগগেস করে, কী বলবে তবে?—বলবে মাইনে আনতে আজ মনে ছিল না।

রাজলক্ষ্মী চক্ষু পাকাইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল : তুমি ওকে মিথ্যে কথা বলতে বলছ?

হঠাৎ কুণ্ঠিত হইয়া কালিকিঙ্কর কহিল : তবে বেশ, সত্যি কথাই বলতে শিখিয়ে দাও। যেন স্পষ্ট বলে, ঘরে আজ টাকা নেই।

—ও-ও তো মিথ্যে কথা। তা ছাড়া এতে কর্তার মিছিমিছি অসম্মান হয়। বছরে প্রায় দশ হাজার টাকা আয়ের বিষয়-সম্পত্তি যে রেখে গেছে তার ছেলে ঠিক-দিনে টাকার অভাবে ইস্কুলের মাইনে দিতে পাচ্ছে না, এতে লোকে যে টিটকিরি দেবে। সামান্য আড়াই টাকার জন্য তোমার সঙ্গে এমন গলাবাজি করতে হবে এও কিনা আমার কপালে ছিল?

কালিকিঙ্কর কটুকণ্ঠে কহিল : গলাবাজি করতে তোমায় কে বলছে? সামান্যই যখন টাকা, তখন নিজের থেকে চালিয়ে নিতে পারো না?

রাজলক্ষ্মী কহিল : আমি চালিয়ে নেব কোত্থেকে? বলতে তোমার একটুও বাধল না? কর্তা কি আমার নামে জমিদারি লিখে দিয়ে গেছেন?

—কী দিয়ে গেছেন না গেছেন তা তুমিই ভালো বলতে পারবে। তা নিয়ে আমি তর্ক করতে চাই না। মোদ্দা কথা হচ্ছে এই, মাইনে আজ আমি দিতে পারব না।

রাজলক্ষ্মী ফাটিয়া পড়িল : কিন্তু শম্ভুর মাইনে তো দিব্যি দিয়ে দিলে। তার বেলায় তো কই টাকার টান পড়ল না।

কালিকিঙ্করের কিছু বলিবার আগেই ষোড়শী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল : কথায়-কথায় আমার ভাইয়ের সঙ্গে এমনি তুলনা দিতে পারবেন না বলে রাখছি।

—তোমার ভাইয়ের সঙ্গে এমনি তুলনা দিতে সত্যিই আমার মাথা কাটা

যাচ্ছে, বড়-বৌ। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, কালিকিঙ্কর, এ-সংসারে দাবি কার আগে? শম্ভুর, না রঙ্গলালের? হাত-মুখ ঘুরাইয়া ষোড়শী বলিল: যান না, সেটা আদালতে গিয়ে সাব্যস্ত করে আসুন না।

কালিকিঙ্কর ফের ধমক দিয়া উঠিল: তুমি কেন এর মধ্যে কথা বলতে আস?

—না, আসবে না! যেমন কুকুর তেমনি মুগুর হওয়া চাই। পুতু-পুতু করে অনেক সওয়া গেছে, কিন্তু উঠতে-বসতে শুধু-শুধু আমার শম্ভুর সঙ্গে তুলনা দেবে—এ তুমি বারণ করে দাও বলছি। বলিয়া আবার সে অদৃশ্য হইল।

রাজলক্ষ্মী কহিল: এখনো একটা পেটে ধরোনি বড়-বৌ, তাই সোহাগে একেবারে উপছে পড়ছ! ভগবান করুন, একদিন যেন বোঝ সন্তানের অপমান মা'র বুকে কতোখানি লাগে। পরে কালিকিঙ্করকে সম্বোধন করিয়া কহিল: বেশ, কার দাবি আগে সেই সাব্যস্তই আমি করব। যেই জন্মের জোরে তোমার এতখানি তেজ তা তোমার একচেটে নয়, দয়া করে এটা মনে রেখ।

কালিকিঙ্কর কহিল: কী তুমি করবে?

—সে-পরামর্শ অন্তত তোমার সঙ্গে করব না। কালকের সকালের ট্রেনে আমাদের এখান থেকে চলে যাবার ব্যবস্থা করে দিয়ো।

কালিকিঙ্কর নির্লিপ্তের মতো কহিল: স্বচ্ছন্দে।

রাজলক্ষ্মীর দুই বিশুষ্ক, পাণ্ডুর ওষ্ঠাধরে একটি নিষ্ঠুর, শানিত হাসি ভাসিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। সে কহিল: সে-বেলা তোমার টাকার অকুলান হবে না তো? ইশারাটা অনেক আগে থেকেই বুঝতে পেরেছি, কিন্তু, নাবালক, অনাথ দুটি ভাইকে ঠকিয়ে বেশিদিন এই রাজত্ব করা চলবে না, কালিকিঙ্কর। তোমাকে যে নিজের পেটে ধরিনি, আজকের দিনে এই আমার সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা। বলিয়া কুটিল ও হিংস্র শত্রুতার একটা প্রচ্ছন্ন আভাস দিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

কঠোর দারিদ্র্য বা হীনতার লাঞ্ছনায় রাজলক্ষ্মী হয়তো পীড়িত বোধ করিত না, কিন্তু এই বৃহৎ সংসারে নিজের অস্তিত্বকে প্রতি মুহূর্তে এমনি কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত করিয়া রাখিবে ইহা তাহার নিজের কাছেই ক্ষমার অযোগ্য মনে হইতে লাগিল। দ্বিতীয় পক্ষে পড়িয়া সৎছেলেকে সে সামান্য একটু মন যোগাইয়া চলিত বটে, কিন্তু কখনো তাহার দুই দৃঢ়করধৃত বল্গা এক নিমেষের জন্যও শিথিল করিয়া আনে নাই। তাহার স্থান যেমন সপরিসর ছিল, তেমনি শাসন ছিল অপ্রতিহত। সেই স্থানচ্যুতির লজ্জা সে আর বহন করিতে পারিবে না।

কিন্তু কোথায়ই বা সে এখন যায়। সমস্ত ভবিষ্যৎ তাহার ললাটের মতোই শূন্য হইয়া গিয়াছে। তবু সে সহজে পরাজয় স্বীকার করিবে না, কালিকিঙ্করকে দেখিয়া লইবে। কী যে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিবে তাহা আদ্যোপ্রান্ত সে অনুধাবন করিতে পারিতেছে না, পৃথিবীতে জনবল বা ধনবল বলিতে যাহা কিছু, সমস্তই তাহার একজনের সঙ্গে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—তবু সারা রাত্রি ভরিয়া কালিকিঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া সে যে অভিশাপ-বিষ উদ্গীরণ করিতে লাগিল তাহাতেই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে বলিয়া সে নিশ্চিন্ত রহিল।

কিন্তু সেই দিন মধ্যরাত্রিতেই যে বাড়িতে চোর পড়িবে এমন কথা রাজলক্ষ্মী ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারে নাই। সকালে যথারীতি ঘুম হইতে উঠিয়া গোবর-ছড়া দিতে উঠানে নামিয়াছে, শুনিতে পাইল কাল রাত্রে লোহার সিন্দুকটা উজাড় হইয়া গেছে—ভিতরে ছিটে-ফোঁটা কোথাও কিছু পড়িয়া নাই। রাজলক্ষ্মী মুহ্যমান অবস্থায় চিৎকার করিয়া উঠিল: আমার গয়নার বাক্স? কালিকিঙ্কর কহিল: তাও গেছে।

ষোড়শী ফোড়ন দিয়া কহিল: মোটে তো ক'খানা পাতলা-পাতলা গয়না, তার জন্যে হাত-পা ছুঁড়ে কেমন শোক করছে দেখ না। এদিকে যে সব দলিল-দস্তাবেজ, পাট্টা-তমসুকের কাগজপত্র, হাতচিঠে খতিয়ান লোপাট হয়ে গেল সেই কথা ভেবে দেখছে না। বিষয়-আশয় সব তছনছ হয়ে যাচ্ছে সেইদিকে খেয়াল নেই, দু'খানা গয়নার জন্যে সারা বাড়ি কেমন মাথায় করছে দেখ।

লোক-লস্কর পুলিশ-দারোগা—কোনো দিক হইতেই কোনো কিছুর ত্রুটি ঘটিল না। মহাসমারোহে চাকর-বাকর ঠ্যাঙানো হইল, মাঠ-খেত আনাচ-কানাচ তন্ন-তন্ন করিয়া খোঁজা হইল, কিন্তু না মিলিল এক ফালি কাগজ, না বা গহনার বাক্সর এতটুকু ভগ্নাবশেষ।

রাজলক্ষ্মী জোর গলায় কহিল: সবই যখন গেল, তখন আর এক মুহূর্তও আমি এখানে টিকতে পারব না। আমি দিদির কাছে যাব, অন্তত রাহাখরচটা আমাকে দিয়ে দাও।

রাজলক্ষ্মী যেমন শোরগোল শুরু করিয়াছিল, সে যে আজকের ট্রেনেই বিদায় হইবে এমন কথা কালিকিঙ্কর ভাবিতে পারে নাই। তাই অপরিমাণ উৎসাহের সঙ্গে কহিল: নিশ্চয়। কত তোমার লাগবে?

—সে তুমিই ভালো বলতে পারবে। তবে যাই কেন না দাও, আমার

রঙ্গলাল যদি মানুষ হয় তবে তোমাকে একদিন এই ঋণ কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করে দেবে, দেখ।

কালিকিঙ্কর জিভ কাটিয়া কহিল: সে কী কথা? বাবার সম্পত্তি তো খালি আমারই একার অংশ নয়—

—আমিও সেই কথাই বলছিলাম। রঙ্গলাল যদি মানুষ হয়, যদি সে তার মায়ের দুঃখ বোঝে, তবে তোমার এই অপমান কড়ায়-গণ্ডায় সে একদিন শোধ করে দেবে। দাও, বেশি দেরি কর না, ঘণ্টা দুয়েক বাদেই তো ট্রেন।

উত্তরে কালিকিঙ্কর একটু হাসিল; কহিল: কিন্তু কিছুই তো তোমার গোছগাছ হয়নি।

রাজলক্ষ্মী কহিল: গোছগাছ করবার আর কী-ই বা আছে? দয়া করে কিছু টাকা যদি দাও, তাহলেই হয়।

—বেশ তো, একশোটা টাকাই তোমাকে দিচ্ছি। কিন্তু সঙ্গে একজন লোক দিতে হয় তো? সরকার মশায়ই সঙ্গে যান না। তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসবেন।

রাজলক্ষ্মীর মুখে সেই কুটিল, বিবর্ণ হাসি ফুটিয়া উঠিল; কহিল: দরকার নেই, সেও তো তোমারই লোক—হয়তো কোন সুযোগে সেই টাকাটাই কখন চুরি করে নেবে। বুদ্ধিমতী বলে নিজের মনে-মনে খুব একদিন আমার গর্ব ছিল, কিন্তু—রাজলক্ষ্মী ঢোঁক গিলিয়া কহিল: গয়না গেছে যাক, তাই বলে এখেনে থেকে আমার সন্তানদের জীবন বিপন্ন করতে পারব না। আমি যে তোমার সত্যিকারের মা নই, সেই কথা ভেবেই আজ আমি ভীষণ আরাম বোধ করছি।

কোথা হইতে ষোড়শী খেঁকাইয়া উঠিল: হাঁ করে শুনছ কি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে? টাকা ক'টা ফেলে দাও না, পাপ বিদেয় হয়ে যাক।

রাজলক্ষ্মী ছেলে দুইটিকে লইয়া বিদায় হইয়া গেল।

দুই

বিক্রমপুরের অখ্যাত একটি গ্রামে রাজলক্ষ্মী তাহার দিদির আশ্রয়ে আসিয়া উঠিয়াছে। বাপের বাড়ির দিকে এই দিদি ছাড়া তাহার আর কেহ বান্ধব নাই, কিন্তু দারিদ্র্যে যাহাকে সে এতদিন সাহায্য করিয়া আসিয়াছে, আজ কিনা তাহারই কাছে উপযাচিকা হইয়া তাহাকে দাঁড়াইতে হইল। দিদি তাহাকে

দুই হাতে তুলিয়া লইলেন ও তাহার সর্বনাশী প্রতিহিংসা স্পৃহার আগুনে দিনে-দিনে অনুকূল বায়ুসঞ্চার করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বুদ্ধি করিয়া কালিকিঙ্কর মাসে-মাসে নিয়মিত কিছু টাকা পাঠাইয়া সেই আগুন ক্রমশ নিস্তেজ করিয়া আনিল! নিদারুণ দারিদ্র্যে রাজলক্ষ্মীর সেই উগ্র তেজ স্তিমিত হইয়া আসিল। মনি-অর্ডারে দস্তখত করিয়া সে-টাকা তো সে গ্রহণ করিতই, এমন কি বলিয়া বেড়াইত: আমি তো কোনো কালে টাকা-পয়সার কাঙাল ছিলাম না, দিদি, সংসারে সেই যে আমার প্রতিষ্ঠা নষ্ট হয়ে গেল তাই আমার সইল না। নইলে আমার আর এখন দুঃখ কী বল? আমার রঙ্গলাল-পান্নালাল মানুষ হয়ে উঠছে, আমার সেই গৌরব তো আমি আবার ফিরে পেলুম বলে।

দিদি নতমুখে বলিয়া উঠিতেন: কিন্তু ন্যায়ত যারা এত টাকার মালিক, তাদের এই হাড়ির হাল তুই মা হয়ে সইছিস কী করে? রাজলক্ষ্মী মালা ফিরাইতে-ফিরাইতে কহিত: না সয়ে কী করি বল? তবু ওদের পড়ার খরচটা যে চলে যাচ্ছে সেই ঢের। কালিকিঙ্কর যে একদম হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি সেই আমার ভাগ্যি! কি করে যে ওর সেই সুমতি হল তাই কেবল ভাবছি।

—সুমতি না ছাই! এটা যে ওর কী ভীষণ চালাকি তা তুই বুঝতে পাচ্ছিস না? ঐ সামান্য ক'টা টাকার ঘুষ দিয়ে তোকে ও মামলা করার থেকে নিরস্ত করে রাখছে।

রাজলক্ষ্মী উদাসীনের মতো কহিত: আর আমি কোত্থেকে মামলাই বা করতে পারতাম বল। ভাগ বাঁটরা করে আলাদা হয়ে এলেই বা কি সুরাহা হত? মেয়েমানুষ—মন স্থির করে পুজোর দুটো মন্তরই পড়তে পারি না—তায় অত বড় সম্পত্তি সামলানো! ছেলেরা যখন সাবালক, লায়েক হয়ে উঠবে, তখন তারাই তাদের ভাগ-বণ্টন বুঝবে—মামলা-মোকদ্দমা করতে হয় তারা করবে—আমি তার মধ্যে মাথা গলাতে যাই কেন?

দিদি রুষ্ট হইয়া বলিতেন: গোড়ায় তো খুব তড়পেছিলি।

রাজলক্ষ্মী ম্লান হইয়া বলিত: তখন দিদি, স্ত্রীলোকের কোথায় যে সব চেয়ে ঐশ্বর্য, সেইটেই মনের মধ্যে ঝাপসা হয়ে ছিল। স্বামীকেই যখন হারালাম, তখন তাঁর সম্পত্তিটার ওপর নিজের জন্যে লোভ না করাই আমার উচিত ছিল। আমার মূল্য—আমি মা, আমার সত্যিকারের প্রতিষ্ঠা আমার সন্তানের শ্রদ্ধায়। ওরা মানুষ হয়ে উঠলেই আমি আর কিছু চাই না।

—কিন্তু এই মানুষ হয়ে উঠতেই তো বিস্তর টাকার দরকার। নিজের সম্পত্তি থাকতে কেউ কখনো এমনি ভিখিরি সেজে বসে থাকে নাকি ?

—সেই কথাই তো বললাম দিদি—ওদের জিনিস, পারে ওরা কেড়ে-ছিঁড়ে নেবে—সত্যি কথা বলতে, আমার তো কোনো দাবি-দাওয়া নেই। আইনের চোখে ওদের সাবালক হতে দাও, ওরা এই বঞ্চনা কক্‌খনো সইবে না। কিন্তু আমি এর ভেতর থাকতে চাই না, আমি আমার এই পট আর পুতুল নিয়ে দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারব।

দিদি অস্থির হইয়া বলিতেন : কিন্তু মিছিমিছি সবুর করতে যাবি কোন দুঃখে ? এখুনিই তো নাবালকের পক্ষে মামলা রুজু করে দেয়া যায়। টাকা-কড়ি নেই, কিন্তু সেই যে কি 'পাঁপর' হয়ে মামলা করা যায়, আরজির কোর্ট-ফি লাগে না—তাই করতে তো কোনো বাধা ছিল না। হাকিমের খাসকামরায় গিয়ে দরখাস্ত-দাখিল করে দিয়ে এলেই হল। আমাদের শ্যামাচরণ উকিল তো তাই বলছে—মাত্র আটআনা নাকি খরচ!

রাজলক্ষ্মী মলিন হাসিয়া বলিত : সেইটে খুব সম্মানের হত না, দিদি। তা ছাড়া—

দিদি মুখ ঝামটাইয়া উঠিতেন : আর এই যে সোয়ামির ভিটে থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দিলে—সেইটেই খুব সম্মানের হয়েছে ? দিন-কে-দিন তোর সম্মানের জ্ঞান যে খাসা টনটনে হয়ে উঠছে, রাজী।

রাজলক্ষ্মীর দুই চক্ষু মুহূর্তের জন্য জ্বলিয়া উঠিত ; বলিত : বললাম না দিদি, সেই অপমানের শোধ নিতে হয়, আমার রঙ্গলাল আছে—তার জন্যে তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? এখুনিই আমি মামলা করতে পারতাম বটে, কিন্তু চারদিকে যে বিচ্ছিরি আবহাওয়া তৈরি হয়ে উঠত তাতে আমার ছেলে-দুটির মানুষ হবার পক্ষে বাধা হত, দিদি। নিতান্ত ওদের পড়াশুনো যখন চলছেই, তখন আর বিশেষ মারামারি করে লাভ নেই। সম্পত্তি আমার হাতে থাকলেও ওদের এই দারিদ্র্যের কঠোর তপস্যার মধ্য দিয়েই এগোতে হত। তুমি ভাবছ তাহলে আমি ওদের ইস্কুলে যাবার জন্যে গাড়ি আর বাড়িতে পড়া বলে দেবার জন্যে চার-পাঁচটা মাস্টার রেখে দিতাম ? কক্‌খনো না। পৃথিবীতে কী বড় বল—সম্পত্তি, না, চরিত্র ?

তর্কে পরাস্ত হইয়া দিদি উঠিয়া পড়িতেন ; বলিতেন : বাজে কথায় তোর সঙ্গে কে পারবে বাপু। কিন্তু শখ করে এত টাকার সম্পত্তি কেউ ছেড়ে দেয়, এমন কথা বাপের জন্মে কেউ কখনো শোনেনি।

—কে ছাড়তে যাচ্ছে বল ? ছেলেদের সম্পত্তি, বড় হয়ে তারা তার দায়

সামলাবে। যা তাদের ন্যায্য প্রাপ্য, যাতে তাদের জন্মগত অধিকার, তা যদি তারা বর্জন করে তাহলে তো তাদের আমি কাপুরুষ বলব। কিন্তু আমি এর মধ্যে থাকতে চাই না—আমার ওতে কী দরকার! বলিয়া রাজলক্ষ্মী তাহার পূজার সাজ-সরঞ্জাম লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিত।

দিদি বলিতেন: কিন্তু এইটুকুন বয়সে তোর পুজো-আচ্চা নিয়ে এই মাতামাতি আমি আর দেখতে পারি না, রাজী। তুই শেষকালে সন্নেসি সাজবি নাকি?

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিত: ঐ সাজতেই পারব, দিদি, কোনো কালে আর হতে পারব না। আমি যে কী ভীষণ লোভী, কী নিদারুণ তামসিক, তা ভেবে নিজেই আমি শিউরে উঠি। তুমি জানো না দিদি, মূর্তিটা অবিশ্যি মহাদেবের, কিন্তু পুজো করি আমি আমার রঙ্গলালকেই। ধর্ম বল, অর্থ বল, আমার জীবনে ঐ একমাত্র রঙ্গলাল।

দিদি মুখ ভার করিয়া বলিতেন: কিন্তু বেশিদিন আলগা দিলেই টের পাবি ওদিকে একেবারে ফাঁক হয়ে গেছে। শেষকালে একটা ফুটো পয়সাও দেখিস জুটবে না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রাজলক্ষ্মী বলিত: সেই জন্যেই তো মাঝে-মাঝে ওদের বলি, সময় থাকতে একটা হিল্লে করিস, পরে নইলে পস্তাতে হবে। কিন্তু রঙ্গলাল কিছুতেই কান দেবে না। আমারও তাই একেক সময় মনে হয়, দিদি, ও যাবারই যদি হয়, যাক, আমার তো রঙ্গ-পান্নাই আছে।

রাজলক্ষ্মী সেই কল্পনায়ই রাত্রিদিন বিভোর হইয়া থাকিত। ঘূর্ণ্যমতী পৃথিবীর দুই মেরুপ্রান্তের মতো তাহার জীবনে এই দুটি সন্তান, যাযাবর প্রাণের দুইটি স্থির, অপরিবর্তনীয় আশ্রয়স্থল—জীবন ও মৃত্যু, স্বর্গ ও পৃথিবী। তাহার দক্ষিণ ও বাম হস্ত, তাহার দুই দৃষ্টিময় বিশাল চক্ষু, তাহার চঞ্চল দুই পদ, তাহার হৃদয় ও মস্তিষ্ক। কত দুঃখে সে তাহাদের মানুষ করিতেছে। তাহার প্রশান্ত হাসিতে রূঢ় দারিদ্র্য স্নেহসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে—কোথাও তাহার এতটুকু নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশের ছিদ্র রাখে নাই। রোগে অজস্র সেবা, অপরাধে অকৃপণ দাক্ষিণ্য, নির্জীবতায় সবল অনুপ্রাণনা—দুইটি সন্তানকে কোথা হইতে সে কোথায় লইয়া আসিল! সমস্ত প্রতিকূল পৃথিবীকে সে তাহাদের মাতৃজঠরের মতোই নিরাপদ, নির্জন রাখিয়াছে। তাহারা তাহার আপন দেহের রক্ত, আপন যৌবনের নিভৃত-লালিত স্বপ্ন, আপন সৃষ্টির গৌরবময় অধিকার।

সে সন্তাই এইবার রাজলক্ষ্মী। সংসারে এই [illegible] প্রতিষ্ঠাই তাহার

চিরজীবনের ধ্যানের বস্তু ছিল, সহজ অধিকারের গর্বে তাহাই সে এতদিনে পাইতে বসিয়াছে। গত বছর লাঙ্গলবন্দের স্নানে যাইবার জন্য গ্রাম সুদ্ধ মেয়ের দল তাহাকে অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াছিল, কিন্তু রাজলক্ষ্মী কিছুতেই রাজী হয় নাই। বলিয়াছিল : আমার রঙ্গলাল ছাড়া আমি আর কোনো তীর্থ জানি না, রাঙামাসি। রঙ্গলাল ক'দিনের ছুটিতে আমার কাছে একটু এসেছে, আমি ওকে ফেলে যেতে পারব না কোথাও।

রাঙামাসি ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল : অত বড় ধাড়ি ছেলেকে এখনো তুই আঁচলের তলায় লুকিয়ে রাখবি নাকি? ছেলেকেও বাবা বলিহারি, কই নিজে থেকে মাকে তীর্থে পাঠাবে, তা না, কেবল চব্বিশ ঘণ্টা মা'র পিছে-পিছে। তোর এই সাত দিনের ছুটিতে কলেজের পড়া ছেড়ে এখানে ছুটে না এলে চলত না রে, রঙ্গলাল?

রঙ্গলাল দুই হাতে শিশুর মতো মা'র গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল : মাকে ছেড়ে দুদণ্ড থাকতে পারি না, রাঙাদিদিমা। আমি চাকরি করে যখন বাসা নেব, তখন সেই হবে মা'র অনন্ত তীর্থ।

তিন

আরো কয়েকটা বৎসরের পর রাজলক্ষ্মীকে আমরা যেখানে দেখিতে পাইলাম, তাহা সর্বগ্রাসিনী পদ্মার পারে অখ্যাত সেই গ্রামে নয়, বন্ধুর তীর্থপথে নয়—একেবারে জনযানমুখর লৌহলোষ্ট্রকণ্টকিত কলিকাতা রাজধানীতে—ব্যস্ত ও উজ্জ্বল সংসার-সন্নিবেশের মধ্যে। রাজলক্ষ্মীকে এখন দেখে কে! রাহুস্পর্শক্লিষ্ট চন্দ্রের মতো সে এত কাল কুণ্ঠিত ছিল, আজ সংসার-আকাশে তাহার সমুচ্ছ্বসিত মুক্তি!

ভবানীপুরের দিকে রঙ্গলাল সুন্দর দেখিয়া দোতলা একখানা বাড়ি নিয়াছে। মাসে বিয়াল্লিশ টাকা ভাড়া। দক্ষিণ মুখো বাড়ি, দোতলায় একজনের গা ছড়াইবার মতো চওড়া বারান্দা, উপরে নিচে নিয়া মোট ছয়খানা ঘর। কল, বাথরুম, পায়খানা—সব দুইটা করিয়া—ফুল-গাছ বা দুয়েকটা শাক সবজি করিবার জন্য সামান্যটাক মাটিও এককোণে পড়িয়া আছে—নীচে কলতলার কাছে একটি বাঁধানো তুলসী-মঞ্চ। বাড়ি দেখিয়া রাজলক্ষ্মীর খুশি আর ধরে না। কোন্ ঘরটা ভাঁড়ার, কোন্টা নিরামিষ্যি, কোন্টাতে রঙ্গলাল শুইবে, কোনটাতে পান্নালালের পড়ায় মন লাগিবে, এই সম্বন্ধে তাহার আদেশের উপর কোনো

আপিস চলিবে না। তাহার সেই অপ্রতিহত কর্তৃত্বের যুগ আবার ফিরিয়া আসিল।

রঙ্গলাল এম-এ পাশ করিয়াই কোন এক উচ্চপদস্থ ইংরেজের সুনজরে পড়িয়া গিয়াছিল। তাহারই সুপারিশে সে এক সওদাগরের আপিসে সহকারী কর্মচারীর পদ পাইয়া গেল—গোড়াতেই তাহার আড়াইশো টাকা মাহিনা হইয়াছে। চাকরিটায় কায়েমী হইবার আভাস পাইতেই রঙ্গলাল হাত-পা ছড়াইবার জন্য একখানা বাড়ি ভাড়া করিল, মেস হইতে পান্নালাল তাহার বই-খাতা নিয়া উঠিয়া আসিল, বিক্রমপুরের সেই অখ্যাত গ্রাম হইতে মা আসিল, মাসিমা আসিলেন, তাঁহার নাতনি মাতৃ-পিতৃহীনা তেরো-চোদ্দ বছরের নলিনীই বা আর কোথায় যাইবে!

রঙ্গলাল কহিল: ওপরের এই বড় ঘরখানাই আমাকে ছেড়ে দিচ্ছ কী, মা? এটা তোমরা নাও, তিনজনে থাকবে—অনেকখানি জায়গার দরকার। আমার তো এখন আর পড়াশোনার হাঙ্গামা নেই—আসবাবের মধ্যে একখানা তক্তা-পোশ। আর কাজের মধ্যে আপিস থেকে এসে তোমার সঙ্গে গল্প করা—ঐ কোণের ঘরটাতেই আমি বেশ থাকব।

রাজলক্ষ্মী বালতির জলে ন্যাকড়া ডুবাইয়া ঘরের মেঝেটায় ঘষিতে-ঘষিতে কহিল: তোর পরামর্শ আমি নিতে বসিনি, খোকা। তুই খালি সায় দিয়ে চলবি, বুঝলি? আমার কথার ওপর কথা বলতে আসবি না। ঘরে একখানা খালি তক্তাপোশ পাতলে চলবে না, দস্তুরমতো টেবিল চেয়ার আলনা-আলমারি পাততে হবে, আজও তুই এমনি হতচ্ছাড়া হয়ে থাকবি নাকি?

রঙ্গলাল হাসিয়া কহিল: আস্তে মা, আস্তে। দরকার যত কমানো যায়, ততই তো সুখ।

—তোর তত্ত্বকথা রেখে দে এখন। আজ আমি আর কোনো কথা শুনব না, রঙ্গ। স্বর্গ থেকে কর্তা এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন। জাঁক করতে নেই জানি কিন্তু তোকে আর আমি এমনি কাঠখোট্টা অসভ্যের মতো থাকতে দেব না কক্ষনো। কী কেবল ছেঁড়া জামা গায়ে দিস, চটের মতো কাপড় কিনিস, জুতোর একটা পাটিতেই প্রায় ছাপ্পান্নটা তালি পড়েছে—কেন, কেন তোর এই দুর্দশা? তোর অভাব কিসের?

—কী যে তুমি বল, মা? এই তো সেদিন মোটে চাকরি পেলাম।

রাজলক্ষ্মী তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে চাহিয়া কহিল: কিন্তু এই মাইনেই তো তোর একমাত্র আয় ছিল না—

ইঙ্গিতটা রঙ্গলাল স্পষ্ট আয়ত্ত করিল। হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কথাটাকে সে ঐখানেই চাপা দিয়া রাখিল।

রান্নাঘরে খাইতে বসিয়া রঙ্গলাল বলিল : একটা ঠাকুর রাখি, মা। কী তুমি দু'বেলা রাঁধবে?

—আহা, কী যে বলিস? আমাকে চুপচাপ বসিয়ে রাখলেই বুঝি মায়ের ওপর খুব মায়া দেখানো হল! এই যে দুবেলা নিজের ইচ্ছেমতো রেঁধে-বেড়ে তোদের সামনে থালা ধরছি এ যে আমার কতখানি সুখ, তা তোরা কী বুঝবি বল? কতদিন তোদের পেট ভরে খাওয়া আমি দেখতে পাইনি।

পান্নালাল কহিল : ঠাকুর রাখলে আমার পক্ষে ঠিক লাভ না হলেও এমন মারাত্মক ক্ষতি হত না।

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল : কেন, তোর আবার কী হল?

—ঠাকুর রাখলে হয়তো দিনের পর দিন এই অন্যায় পক্ষপাতিত্ব চলত না, তার ভুল করার অন্তত একটা স্বাধীনতা থাকত। তুমি যে দু'বেলা বেছে-বেছে বড় মাছখানাই মেজদার পাতে দেবে এ আর আমি সইতে পারি না। তোমার কি একদিনও ভুল হতে নেই, মা?

রাজলক্ষ্মী ও রঙ্গলাল একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। রাজলক্ষ্মী কহিল : ঠাকুর রাখলেও সে সব সময়েই মনে রাখত কার কাছ থেকে মাস মাস সে মাইনে পাচ্ছে। ভুল তারও হত না।

—অন্তত তাকে গোপনে ডেকে ধমকে দিতে পারতাম। দু'চার পয়সা এ-দিক ও-দিক ঘুষ দিলেই সে ঠাণ্ডা হয়ে যেত। কিন্তু তুমি সমস্ত শাসনের বাইরে চলে যাচ্ছ। নাঃ, আমাকেও একটা চাকরি নিতে হল দেখছি। কী কুক্ষণেই যে ক'টা বছর পরে এসে জন্মালাম—বিধাতা এ-ভুল আর কোনোদিন সংশোধন করলেন না। কলেজ হইতে টাইমে-বেটাইমে ছুটি পাইয়া পান্নালাল যখন-তখন তাহার খেলা-ধুলা আড্ডা-আখড়ার সন্ধানে বাহির হইয়া যায়, রঙ্গলাল আপিস হইতে ফিরিয়া সাহেবি পোশাক ছাড়িয়া জল-খাবারের থালা লইয়া চুপিচুপি মা'র কোল ঘেঁষিয়া বসে, এটা-ওটা লইয়া কত বাজে ও কাজের কথা হয়। অদূরে মাসিমা বসেন, সারাদিনের শ্রান্তির পর ম্লান প্রদোষচ্ছায়াটি কেমন স্নিগ্ধ, অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে।

রাজলক্ষ্মী বলে : বিকেলে একদিন বায়োস্কোপে গেলেও তো পারিস। কেমন যেন তুই একটু বুড়োটে হয়ে পড়ছিস, খোকা।

রঙ্গলাল তাহার কামানো গোঁফের জায়গায় আঙুল বুলাইতে বুলাইতে কহিল :

টাকা রোজগার করতে আরম্ভ করলেই তখন তাকে ব্যয় করা নিয়ে ভাবনা ঢোকে —একটু বুড়া না হয়ে উপায় থাকে না। বায়োস্কোপ দেখব কী, মা! ঐ মিছি-মিছি কতগুলি পয়সা বেরিয়ে যাবে—মনটা যেন কেমন সায় দেয় না।

রাজলক্ষ্মী কহিল : না, তুই যা, আমি তোকে টাকা দিচ্ছি। নিজের জন্যে কিছুই তুই খরচ করবি না, এ আমি দেখতে পারি না।

—নিজের জন্যে খরচ করছি না মানে? তোমরাই কি আমি নিজে নয়? তুমিই বল দেখি মাসিমা, এই কি আমার টাকা উড়োবার সময়? আমার এখন টাকার কত দরকার। পান্নাকে যে আমার বিলেত পাঠাতে হবে তার খবর রাখ?

—হবে, হবে, সে জন্যে তোর ভাবতে হবে না। সে-টাকার ব্যবস্থা আছে। পান্না তার এখানকার পড়া সাঙ্গ করুক, তার বিলেত যাওয়া আর বসে থাকবে না। বলিয়া রাজলক্ষ্মী তাহার বাক্স হইতে তিনটি টাকা বাহির করিয়া আনিয়া রঙ্গলালের হাতে গুঁজিয়া দিল।

রঙ্গলাল চমকাইয়া উঠিল : এ কী, মা? এত টাকায় কী হবে? রাজলক্ষ্মী তাহার গায়ে হাত বুলাইতে-বুলাইতে কহিল : খুব ভালো দামী সিটে বসে বায়োস্কোপ দেখবি। আমার মাথা খাস! আপত্তি করতে পারবিনে।

বলিয়া অনেক করিয়া ঠেলিয়া-ঠুলিয়া রঙ্গলালকে সে রওনা করাইয়া দিল।

দুই চক্ষু দিয়া বহুদূর পর্যন্ত তাহাকে অনুসরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী দিদির কাছে আসিয়া বসিল। শোকাচ্ছন্ন কণ্ঠে কহিল : সেদিনের কথা কিছুতেই আমি ভুলতে পারব না, দিদি। পাবনায় সেবার নতুন বায়োস্কোপ এসেছে। ছেলেদের মহলে তখন বেজায় স্ফূর্তি। কালিকিঙ্করের শালা শম্ভু নতুন জামা-জুতো পরে ফিটবাবু সেজে চাকরের সঙ্গে বায়োস্কোপ গেল; খোকা আমাকে এসে বললে—'আমিও যাব, মা!' আমি বললাম—'তোর বড়দার কাছে বল গে যা।' খোকা ফিরে এসে কাঁদ-কাঁদ মুখে বললে—'বড়দাকে বললাম, মা, কিন্তু তিনি আমাকে পয়সা দিলেন না। শম্ভুদা একা-একা চলে গেল।' মোটে চারআনা পয়সাও আমার হাতে ছিল না। অগত্যা কি করি, ছেলেটাকে ঠেসে ধমকে দিলাম। ও শুধু মলিন ছলছল দুটি চোখ মেলে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। সেই ওর সেদিনকার ব্যথাভরা, অসহায় চাউনি আমার বুকের মধ্যে এখনো জেগে আছে। দিদি, আমার সেই খোকা।

সেই খোকা আজ তাহার কত বড় হইয়া উঠিয়াছে। এক কথায় তাহাকে বুঝিয়া ফেলে কাহার সাধ্য। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মারামারিতে প্রত্যেকবার সে হারিয়া যাইত, জখম হইয়া ফিরিয়া আসিলে তাহারই হাতে আবার তাহাকে

একচোট নাকাল হইতে হইত—তাহার সেই দুর্বল, স্বল্পভাষী, কৌশলবুদ্ধিহীন, নিরীহ খোকা—আজ কেমন দীর্ঘায়ত, সুন্দর, বলশালী হইয়া উঠিয়াছে। আজ আর তাহার সঙ্গে কেহ পারিবে না। সেই খোকা একদিন যে গোলাপছড়ি খাইতে সামান্য একটি পয়সার জন্য তাহার কাছে কাঁদিয়া পড়িয়াছিল, আর রাজলক্ষ্মী নিজের অভাব লুকাইতে গিয়া তাহাকে ধমকাইয়া বিদায় দিলে পর সারা দুপুরবেলা বাড়ির আনাচে-কানাচে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছিল কোথাও একটি পয়সা পাওয়া যায় কিনা—সেই খোকা আজকাল মাস ফুরাইলেই, অবলীলাক্রমে, আড়াইশোটা টাকা তাহার হাতে গুঁজিয়া দেয়—অথচ তাহা হইতে নিজের অবান্তর খরচের জন্য একটি পয়সাও তুলিয়া নিতে তাহার হাত উঠে না! পান্নালালকে ডাক্তারি পড়াইতে জার্মানিতে না কোথায় পাঠাইবে বলিয়া সে এখন হইতেই টাকা জমাইতেছে। কিন্তু এই কারণে টাকা-জমানোটা রাজলক্ষ্মী তত পছন্দ করে না—পান্নালালের ভার সে একাই বা বহিতে যাইবে কেন। রাজলক্ষ্মীর ইচ্ছা, দুইটি ভাই তাহাদের জীবনধারণের তথ্যটা প্রখর সমারোহে চতুর্দিকে বিজ্ঞাপিত করিয়া দেয়, তাহাদের দেখিয়া ষোড়শীর চক্ষু দুইটা তীব্র যন্ত্রণায় জ্বলিতে থাকুক। তাই রঙ্গলালের এই বীতস্পৃহ, ভোগনির্লিপ্ত, উদাসীন ভাব-ভঙ্গি সে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারে না—তাহার এই আয়াসকৃত দীনতার মাঝে আজও যেন সেই পরাজয়ের কালিমা লাগিয়া আছে।

তবু এই সংসারে তাহার বিস্তীর্ণ একাধিপত্য, সেই নির্বিশেষে নির্বারিত স্বাধীনতায়ই রাজলক্ষ্মী মত্ত হইয়া আছে। সামান্য তরকারি কোটা হইতে শুরু করিয়া বড়-বড় খরচে পর্যন্ত তাহারই অবারিত হাত। তাহারই হাঁক-ডাকে সবাই উঠে-বসে; মা বলিতে ছেলেরা মুহ্যমান হইয়া পড়ে। রঙ্গলাল বলে: তাই বলে তুমি রোদ্দুরে বসে গুল দিতে যাবে কেন, মা?

রাজলক্ষ্মী বলে: তোর টাকা বাঁচাচ্ছি।

—বা, ওতে আর ক'পয়সা বাঁচবে? দুবেলা উনুনের আঁচে থেকে আবার যদি তোমাকে রোদ্দুরে গুল দিতে বসতে হয়, তবে যে মা, তোমার শরীর থাকবে না।

—কিন্তু এত খাটা-খাটনির পরে তুই যে টাকা খরচ হবে বলে ভালো-ভালো খাবার খাবি না, তাতেই বুঝি তোর শরীর থাকবে? চেহারাখানা কী হচ্ছে দিন-দিন, খেয়াল আছে?

রঙ্গলাল হাসিয়া বলে: হপ্তায় ওজন নিচ্ছি, মনের সুখে বেড়েই চলেছে মা। মাদের এমনি চোখ সন্তানকে তারা কোনোদিন সুস্থ দেখতে পারে না, কেবলই

অভাবগ্রস্ত মনে করে। তুমি যখন আমার আছ, তখন আমার আর কী চাই? বলিয়া রঙ্গলাল মাকে ধরিবার জন্য আগাইয়া আসে।

রাজলক্ষ্মী পিছনে দুই পা হটিয়া যায়: ঐ ময়লা কাপড়ে আর ছেঁড়া জামায় তুই আমাকে ছুঁতে পারবি না, খোকা। এ-ছুটে ধোপাবাড়িতে চারখানার বেশি কাপড় পাঠালে তোর জাত যেত? তুই নিজে রোজগার করছিস না? কেন তুই নিজ হাতে তোর গেঞ্জি, বালিশের অড়, বিছানার চাদর কাচবি শুনি?

—অনেক দিনের অভ্যেস, মা। ওতে আমার কিচ্ছু অসুবিধে হয় না। মুখ-ধোয়ার মতো ওগুলোকে আমি নিত্য কর্ম বলে ধরে নিয়েছি। কত পাপীকেই মা কোল দেন, এ তো তাঁর এক ময়লা ছেলে। বলিয়া রঙ্গলাল মা'র গা ঘেঁষিয়া নিজ হাতে গুল পাকাইতে বসে: তোমাকে মিছিমিছি এমনি খাটিয়ে মারছি। এবার একটা ঠাকুর রাখব।

রাজলক্ষ্মী ধমক দিয়ে উঠে: খবরদার, খোকা। মাসে-মাসে দশটা টাকা তোর বেরিয়ে যাবে।

—তুমি কি আমার টাকা বাঁচাবার জন্যেই এমনি দেহপাত করছ নাকি?

—এখন তো কেবল তাই মনে হচ্ছে। রাজলক্ষ্মী বলে: টাকার জন্যে তুই তোর নিজের শরীর ক্ষয় করতে পারিস, তার থেকে আমার দেহটার দাম বেশি নাকি? হাঁ, ভালো কথা, ঠাকুর রাখবি বৈকি, আর আমি ভাবছি এবার একটি ঝিও রাখতে হবে।

রঙ্গলাল বলে: আবার ঝি কেন? চাকরই তো আছে।

মাসিমা হাসিয়া বলেন: সে ঝি নয় রে মূর্খ—

অর্থটা বুঝিয়া রঙ্গলাল লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠে; বলে: ও-সব বাবুগিরিতে আমার রুচি নেই। গান্নাকে আগে বিলেত পাঠাই।

রূঢ় শাসনের সুরে রাজলক্ষ্মী কিছু একটা বলিবার আগেই রঙ্গলাল দ্রুত পায়ে কাটিয়া পড়ে।

সেইদিন রাত্রে রাজলক্ষ্মী তাহার দিদিকে সারথি করিয়া রঙ্গলালকে সম্মুখ যুদ্ধে আক্রমণ করিল। পাত্রী স্থির হইয়া আছে—সিভিল-সার্জন মহেন্দ্র ঘোষের মেয়ে, দেখিতে—বর্ণনায় মাসিমা কালিদাসকেও প্রায় পরাস্ত করিলেন। নগদ পাঁচটি হাজার টাকা তো দিবেই, তাহার উপর মোটর ও দানসামগ্রী—যা রঙ্গলাল চায়।

কথা শুনিয়া রঙ্গলালের ঠোঁটের কাছে তীক্ষ্ণ একটি হাসি বিদ্ধ হইয়া রহিল;

কহিল : একেবারে সব ঠিকঠাক ? আমাকে একবার জিগগেস করবারও দরকার মনে করনি ?

রাজলক্ষ্মী কহিল : আমি কি তোর জন্যে যা-তা একটা মেয়ে ধরে নিয়ে আসব নাকি ? আমার মতো শুভাকাঙ্ক্ষী তোর কেউ আছে নাকি পৃথিবীতে ?

তাহা নিশ্চয় নাই, কিন্তু একমাত্র আকাঙ্ক্ষাতেই জীবনের কতখানি শুভ হইতে পারে তাহা সেই মুহূর্তে রঙ্গলাল কিছু ভাবিয়া পাইল না।

মাসিমা বললেন : তোর মত না পেলে তো আর পাকা কথা দেয়া যেতে পারে না। এই সামনের রাস্তায়ই তারা আছে, একদিন মেয়েটিকে দেখে আসবি চল।

রঙ্গলাল আশ্বস্ত হইল। গম্ভীর গলায় কহিল : বাঁচালে যা-হোক। তবে আগে-ভাগেই আমার পাকা কথাটা দিয়ে রাখি, মা।

রাজলক্ষ্মী ও দিদি কথাটা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।

রঙ্গলাল কহিল : মিছিমিছি বাইরের এই আপদ জোটাবার এখন আমার একেবারেই সময় নেই, মা। আমার কত কাজ। কত বড় দায়িত্ব আমাকে নিতে হয়েছে। আমি না-হয় চাকরিতে ঢুকে নিজেকে দিনে-দিনে ছোট করে ফেলব, চারদিকে সংস্কার আর আচারের বেড়া তুলে নিশ্চিন্ত জীবনে প্রত্যহ আরাম খুঁজে বেড়াব, জীবনে কোনো নতুন পরীক্ষায় হাত দিতে পারব না, কিন্তু তাই বলে পান্নাকে আমি কখনো এমনি গতানুগতিক হতে দেব না। সে হবে মৌলিক, স্বাধীন, অসাধারণ। তাকে এই বিরাট পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে পথ আমাকে তৈরি করে দিতে হবে, মা। তা ছাড়া জীবনে এখন আমার আর কোনো সাধনা নেই। বাঙলাদেশের পাত্রীরাও সব সঙ্গে-সঙ্গে বিলেত চলে যাচ্ছে না, মা, দুটি দিন আরো সবুর করো।

রাজলক্ষ্মী মেঝের উপর গ্যাঁট হইয়া বসিল। কহিল : পান্নাকে বিলেত পাঠাবি, সে তো ভালো কথা। বুক ফুলিয়ে দশজনের কাছে সে-কথা আমি বলে বেড়াতে পারব। কিন্তু তার জন্যে তুই শুকিয়ে মরবি কেন ? তার নিজের টাকা আছে না ?

—তার নিজের টাকা ! পান্না আবার টাকা পেল কোত্থেকে ?

—কেন, কর্তা কি তোদের একেবারে কিছুই দিয়ে যাননি নাকি ?

এক ছেলেই সমস্ত বিষয়-আশয় লুট করে চেটে-পুটে খেয়ে সাবাড় করে ফেলবে, আর তোরা দুভাই হাঁ করে বসে থাকবি ? নিজের থাকতে কেন তোদের এই অনর্থক কষ্ট করতে হবে ? অনেক হয়েছে, অনেক সয়েছি—যখনই বলতে

গেছি, তুই দুই হাতে আমার মুখ চেপে ধরেছিস, কিন্তু আর আমি চুপ করে থাকতে পারব না। পান্নার বিলেত যাবার সঙ্গতি থাকতেও, তোকে শেষকালে তার জন্যে বিয়ে পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে হবে, এ আমাকে তুই সহ্য করতে বলছিস ?

মাসিমা কহিলেন : আর যা-সব শুনছি, কালিকিঙ্কর এতদিনে প্রায় সব শেষ করে এনেছে। এখনো সময় আছে, আরো কিছুদিন সবুর করতে গেলেই সব একদম সাফ হয়ে যাবে !

রাজলক্ষ্মী নির্মম কণ্ঠে বলিল : আমি বলিনি ? কত আগে থেকেই তো বলছি, কিন্তু পড়াশুনোর ব্যাঘাত হবে বলে গা করেনি, কেবল বলেছে—'জীবনে দুঃখের খানিকটা অভিজ্ঞতা থাকা ভালো, মা।' কিন্তু এখন তোর দুঃখটা কিসের শুনি ? যা হক্ টাকা, তা কেন তুই এখন দাবি করবি না ? এত যার অভাব এত যার দায়িত্ব, টাকা থাকতে কেন সে তা হাত বাড়িয়ে তুলে নেবে না শুনি ?

রঙ্গলাল কহিল : পান্নার বিলেত যাওয়ার খরচের টাকা এখন যদি আমাকে বড়দার সঙ্গে মামলা করে নিতে হয় মা, তাহলে বুক ফুলিয়ে পাঁচজনের কাছে কোন মুখে কী বলে বেড়াবে ?

—নিশ্চয় বলে বেড়াব। রাজলক্ষ্মী মেরুদণ্ড টান করিয়া বসিল : বলে বেড়াব যে, আমার রঙ্গলাল অন্যায়কে কোনোদিন ক্ষমা করতে শেখেনি, যা তার নিজের অধিকারের জিনিস, তা সে জোর করে কেড়ে নিতে জানে।

রঙ্গলাল বাহিরে একটুও বিচলিত হইল না। তেমনি শান্ত, উদাসীন কণ্ঠে কহিল : তা নিয়ে হঠাৎ আজকে এতদিন বাদে ব্যস্ত হয়ে লাভ কী, মা ? বরং আজকেই তো তার প্রয়োজন কমে এসেছে—আশা করি সম্পত্তির আয়ের সঙ্গে-সঙ্গে দিনে-দিনে তা আরো কমবে।

মাসিমা কহিলেন : কিন্তু তাই বলে তোদের পাওনা অংশ ছেড়ে দিবি নাকি ?

—সে-অংশে বিশেষ আর কিছু নেই, মাসিমা। খবর যা শুনেছ তা একেবারে মিথ্যে নয়—অনেক সম্পত্তিই বড়দার নিজের ধার শোধ করতে উড়ে গেছে। এখন কী আর পাওয়া যাবে বল ? আর তুচ্ছ দু-চার হাজার টাকার জন্যে শুম্ভ-নিশুম্ভর লড়াই বাধালেই বা আমাদের কী এমন সম্মান বাড়বে !

রাজলক্ষ্মী অস্থির হইয়া উঠিলেন : তবে দেখলি তো, নিজে কেমন সব একা শুষে নিলে। তোরা উপযুক্ত হয়ে উঠেও যদি এর প্রতিবিধান না করিস তো চলবে কেন ?

রঙ্গলাল আর্দ্রকণ্ঠে কহিল : চলে তো মা যাচ্ছেই, বরং বড়দারই ভালো চলছিল না। ঐ সম্পত্তিটা ছিল বলেই তিনি কোনো রকমে ছেলেপুলে নিয়ে

এখনো দাঁড়াবার জায়গা পাচ্ছেন, নইলে যে কোথায় ভেসে যেতেন তার ঠিক নেই। মোক্তারি করে একটা পয়সাও রোজকার করতে পারেননি, তার ওপর বাবার আমলের সেই সাবেকি চাল সম্পূর্ণ বজায় রেখেছেন। সম্পত্তিটা হাতে না থাকলে কোত্থেকে তিনি এ-সব সামলাতেন বল।

—সামলে-সামলে সব তো শেষ করে আনল। শেষে তো তোদেরই একদিন গলগ্রহ হবে।

রঙ্গলাল কহিল: আমরা দুভাই যদি সত্যি মানুষ হতে পারি, মা, তবে বড়দাকে আমরা ফেলে দেব নাকি?

রাজলক্ষ্মীর মুখ-চোখ অসহ্য অপমানে জ্বালা করিয়া উঠিল। কহিল: শুনলে কথা, দিদি? এই করেই ওরা মায়ের সম্মান রাখবে?

রঙ্গলাল মা'র কাছে নামিয়া আসিল; কহিল: বাইরে তুমি যতই কেন মা নিষ্ঠুর হও, তুমি যখন আমাদের মা, তখন এটুকু মহত্ত্ব বা মমতা—এ আমরা তোমারই কাছ থেকে পেয়েছি। বড়দা যদি একদিন মা বলে ডেকে তোমার সামনে দাঁড়ান, তুমি তাঁকে এক নিমেষেই ক্ষমা করতে পারবে। আমাদের উনি কী বঞ্চিত করেছেন জানি না, আমাদের মা আছে - ওঁকেই আমরা বরং মায়ের থেকে এতদিন বঞ্চিত করে রেখেছি। তোমার এই কোলের কাছে কী ঐ সম্পত্তি!

মাসিমা ধারাল বিদ্রূপ হানিলেন: ছেলেকে কী চমৎকার মানুষই করেছিস, রাজী!

রঙ্গলাল মা'র কোলে মাথা রাখিয়া মেঝের উপর শুইয়া পড়িল। কহিল: তুমি যখন আছ, মা, তখন আমাদের মতো বড়লোক আর কে আছে? কোথাও তো কিছুর অভাব দেখছি না। কোনোখানেই তো ঠেকতে হচ্ছে না—

রাজলক্ষ্মী তাহার কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল: কিন্তু এই তো ঠেকতে হল। পান্নাকে বিলেত পাঠাতে হবে বলে বিয়ে করতে চাচ্ছিস না।

রঙ্গলাল বলিল: তবে তুমি কি ভাবছ বড়দার থেকে টাকা বাগিয়ে এনে পান্নাকে বিলেত পাঠাবার সব বন্দোবস্ত করতে পারলেই কালকে আমি বিয়ে করব? তা নয়, মা। বিয়ের এখনো দেরি আছে।

—কক্‌খনো না। দেরি আমি আর সইব না, খোকা। পান্না বিলেত যাক বা না যাক, ব্যাঙ্কে তোর টাকা জমুক বা না জমুক, বিয়ে তোকে এই অঘ্রানেই করতে হবে। কেবল খরচের ভয়! তোর বউ ক'হাঁড়ি ভাত খাবে শুনি? ঘাড়ে তো আর চোদ্দটা মাথা নিয়ে আসবে না যে চোদ্দ হাঁ করে ভাত গিলবে!

রাজলক্ষ্মী রঙ্গলালের মাথাটা নামাইয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল: আমার কথা তোকে শুনতেই হবে।

—তা শুনব। তবে আরো দুটো বছর দেরী করলে ক্ষতি কী?

—দু'বছর! মাসিমা অবাক হইয়া কহিলেন: দুদিন নয়, দুমাস নয়—দুবছর!

—দুবছরে আমার মাইনে আরো বাড়বে, মাসিমা।

—আবার তোর সেই খরচের ভাবনা! রাজলক্ষ্মী ধমক দিয়া উঠিল: কী এমন তোর সৃষ্টিছাড়া বৌ আসবে যে তাকে নিয়ে টাকা-পয়সার হরির লুট দিতে হবে? মেয়ে আমি ঠিক করছি কিন্তু।

রঙ্গলাল কহিল: সেই মেয়েই যে আমার পক্ষে ঠিক হবে তা তুমি কী করে জানলে?

কথা শুনিয়া রাজলক্ষ্মী স্তব্ধ হইয়া গেল। কহিল: কী বললি? আমার পছন্দে তোর মন উঠবে না?

রঙ্গলাল লজ্জিত হইয়া কহিল: কিন্তু মা, বিয়ে তো আমাকেই করতে হবে। সারা জীবন যাকে নিয়ে থাকব তার নির্বাচনের দায়িত্ব কি আমার ওপরে থাকাই সঙ্গত হবে না?

মাসিমা কহিলেন: তা, মেয়ে তোকে দেখানো হবে না নাকি?

—শুধু দেখাতেই কী হবে।

—তবে আবার কী!

রঙ্গলাল হাসিয়া কহিল: তাকে আমার খুঁজে বার করতে হবে, মাসিমা! তার জন্যে আরো অনেক প্রতীক্ষা, অনেক তপস্যা দরকার।

রাজলক্ষ্মী কহিল: কেন, আমাদের পছন্দে তোর মন উঠবে না কেন? তুই এমন কি ডানা-কাটা পরী চাস? এখুনি তুই আমাদের অবিশ্বাস করতে শুরু করলি নাকি?

রঙ্গলাল অসহিষ্ণু হইয়া কহিল: যাও, তোমাদের সঙ্গে আমি আর বাজে বকতে চাই না। আমাকে এখন ঘুমুতে দাও দিকি। যত খুশি মেয়ে পছন্দ কর গে, বিয়ে আমি করছি না। বলিয়া সে তক্তাপোশে উঠিয়া শুইয়া পড়িল।

রাজলক্ষ্মী কহিল: তা করবি কেন? মাকে কেবল খাটিয়ে মারবি। কই এখন হাত-পা ছড়িয়ে বসে সেবা পাব, তা না, চরকির মতো কেবল আমাকে ঘুরে মরতে হচ্ছে!

মাসিমা বিছানার কাছে আগাইয়া আসিয়া কহিলেন: কেন, কিসের জন্যে

তোকে দেরি করতে হবে? লেখা-পড়া শেষ হল, দিব্যি চাকরি পেলি, বাসা করলি, দেরিটা কিসের শুনি? বয়েসের একটা ছিরি আছে তো?

রাজলক্ষ্মী দুই হাতে হতাশাসূচক এক ভঙ্গি করিয়া কহিল: ঐ এক ওজর, পান্নাকে বিলেত পাঠাতে হবে। তা, বিয়ে করলে পান্নার বিলেত-যাওয়াটা কোনখানে বন্ধ হচ্ছে শুনি? যে-লোক বিষয়-আশয় ঠকিয়ে দিব্যি আত্মসাৎ করলে, তোরা যদি এমনিই ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হয়ে থাকিস, নাই বা তার সঙ্গে মামলা-ফয়সালা করলি। পান্নার জন্যে ব্যাঙ্কে টাকা তো জমাচ্ছিসই, আর বিলেত সে কাল রাত পোহালেই যাচ্ছে না। এর মধ্যে ঘরে বউ আনতে কোন জায়গায় বাধছে শুনি? বউ এলে কিনা খরচ বেড়ে যাবে! আমি কি তেমন উড়নচণ্ডি বাবু-বৌ আনব নাকি ভেবেছিস? আর যাকে আমি আনব তার সঙ্গে গুনে কম সে-কম নগদ পাঁচটি হাজার টাকা। তাকে খাওয়াবার জন্যে দশটি বচ্ছর তোকে ভাবতে হবে না। বিয়ে করবে না! বিয়ে না করলেই হল কিনা!

দুই বোনে মিলিয়া আরো অনেকক্ষণ ধরিয়া গজগজ করিতে লাগিল; রঙ্গলাল আর একটি কথাও উচ্চারণ করিল না।

চার

রঙ্গলাল যে এমন দৃঢ় অবিনয়ের সঙ্গে মায়ের আদেশ অমান্য করিবে ইহা রাজলক্ষ্মী কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিত না। কিন্তু কী যে ধনুকভাঙা পণ করিয়া বসিয়াছে, কিছুতেই তাহাকে নোয়ানো গেল না। হইলই বা না ছেলে, কিন্তু অম্লানমুখে পরাজয় স্বীকার করিবার ধাতই রাজলক্ষ্মীর নয়। সে রঙ্গলালের থেকে দূরে সরিতে আরম্ভ করিল।

রান্না আজকাল আর রাজলক্ষ্মী তদারক করে না, ঠাকুরের হাতে সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া সে এখন আবার তাহার হরিনামের ঝুলি লইয়া বসিয়াছে। রান্না সম্বন্ধে রঙ্গলাল যদি কখনো নালিশ করিতে আসে, রাজলক্ষ্মী গম্ভীর হইয়া বলে: আমি তার কী জানি? বিয়ে করতে পারিস না—বউ এসেই তো সব দেয়া-থোয়া দেখা-শুনো করতে পারে। আমি বিধবা মানুষ, আঁশের আঁকশালে গিয়ে রাতের বেলায়ও স্নান করি, না? মায়ের দুঃখ কি তোরা চোখ মেলে দেখতে পাস কোনোদিন?

উঠিতে বসিতে রাজলক্ষ্মী অহর্নিশ এই জাতীয় খোঁটা দিয়া চলিয়াছে। তাহাতে ধার দিয়া দিতেছেন মাসিমা। রাজলক্ষ্মী আজকাল নিজ হাতে তাহার

বিছানাটা পর্যন্ত পাতিয়া রাখে না, চাকরের উপর ছাড়িয়া দিয়াছে। সেই দিন খোট্টাটা তো তাহার টেবিল ঝাড়িতে গিয়া তাহার টাইম-পিস ঘড়িটাই ভাঙিয়া টুকরা-টুকরা করিয়া ফেলিল। তাই নিয়া রঙ্গলাল একটা হৈ-চৈ বাধাইতে যাইতেই রাজলক্ষ্মী বারান্দা হইতে বলিয়া উঠিল : ও তার কী জানে? কোন জিনিস কোথায় গুছিয়ে রাখতে হবে—ও কি ঐ ছাতুখোরের কাজ? ভাঙবেই তো—চাকর-বাকরের হাতে সংসার ছেড়ে দিলে যাবেই তো সব ছত্রখান হয়ে।

মা তাহার উপর সেই হইতে নিদারুণ অভিমান করিয়া আছে। হাত বাড়াইয়া ঘন করিয়া আর তাহার নাগাল পাওয়া যাইতেছে না। আপিস হইতে যখন সে ফেরে, মা'র সমস্ত অবকাশ তখন এক নিমেষেই যেন নিঃশেষ হইয়া যায়, খাবারের থালাটা চাকরের হাত দিয়া পাঠাইয়া মাসিমা ও নলিনীর সঙ্গে ছাতে গিয়া প্রতিবেশিনীদের তুচ্ছ দৈনন্দিন কাহিনী শুনিতে ব্যস্ত হইয়া উঠে। রাত করিয়া তাহার মশারি তুলিয়া তাহার ঘুমের গভীরতা নির্ণয় করিবার জন্য একবারও তাহার ঘরে আসে না। অন্তরঙ্গ হইবার সুযোগ সন্ধান করিবার আগেই ছল করিয়া কোনো কাজে হঠাৎ সরিয়া পড়ে। অসুখের ভান করিলে নির্লিপ্তের মতো কেবল বলে : তাহলে আজকে আর চান করিসনে, ঠাকুরকে না হয় আটার রুটি করতে বল, ভালো বুঝলে পান্নাকে একবার ডাক্তারের কাছে পাঠাতে পারিস। মাত্র এইটুকু। সেই উদ্বেগ-উদ্বেল স্নেহ-প্রাচুর্যে যেন হঠাৎ ভাটা পড়িয়া গেছে। সমস্ত ব্যাপারটায় রঙ্গলাল একটা মজা অনুভব করে। মা'র অভিমান-ম্লান বিষাদ-গম্ভীর মুখখানির দিকে চাহিয়া সে মনে-মনে অস্থির হইয়া উঠে।

রঙ্গলাল ডাকে : মা! ওমা! শুনছ?

রাজলক্ষ্মী বিরক্ত হইয়া বলে : কী, কেন ডাকছিস? দেখছিস না আমি এখন মালা ফেরাচ্ছি।

মা'র এই কৃত্রিম ঈশ্বরারাধনার ছলা-কলা দেখিলেই রঙ্গলাল বুঝিতে পারে মা তাহার নিকট হইতে কত দূরে সরিয়া যাইতেছে। তাহার রঙ্গলালের অস্তিত্ব হইতে কিনা ঐ কতোগুলি অর্থহীন নামের মোহ তাহার কাছে প্রবলতর হইয়া উঠিল!

তাহা ছাড়া আজকাল রাজলক্ষ্মী সময়ে-অসময়ে পান্নালালের ঘরে গিয়া তাহারই সঙ্গে অবসরযাপন করিতে শুরু করিয়াছে। তাহার পড়া নষ্ট হইবে বলিয়া সামান্যতম চিত্তবিক্ষেপের সুযোগ যে ঘটিতে দিত না, সেই কিনা এখন উপযাচিকা হইয়া সেই ধ্যানে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতেছে।

রাজলক্ষ্মী বলে: ও না-হয় সন্নেসি হবে, কিন্তু তাই বলে তুই তোর ভাগ ছাড়বি কেন?

পান্নালাল ছুরি দিয়া পেন্সিল কাটিতে-কাটিতে বলে: কিসের ঘোড়ার ডিমের ভাগ! ডিনামিক্স্ নিয়ে যা হাঙ্গামায় পড়েছি তার ওপরে আবার এই সিন্ধুবাদকে ঘাড়ে চাপাই আর কি!

—কিন্তু তুই বিলেত যাবি, তোর তো টাকার দরকার।

পেন্সিলের শিস্‌টা চোখা করিতে-করিতে পান্নালাল বলে: মেজদার যা কাণ্ড ওতে তুমি ঘাবড়িয়ো না, মা। কে যাচ্ছে? যারা ইউরোপ গেছে মা, তাদের মধ্যে কত লোক যে একেকটি আস্ত গাধা হয়ে ফিরেছে তার ইয়ত্তা নেই। ইউরোপ হচ্ছে ভারতবর্ষের কামাখ্যা—গেলেই সেখানে গাধা হয়ে যেতে হয়, অর্থাৎ ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে একেবারে অমানুষ হয়ে যায়। মেজদাকে যেমন সুখে থাকতে ভূতে কিলোচ্ছে—

—ও তো তোকে পাঠাবার জন্যে কোমর বেঁধেছে।

পান্নালাল মিনতি করিয়া বলে: তুমিই সে-যাত্রায় আমাকে বাঁচাতে পার, মা। ঐ ম্লেচ্ছ দেশটার গুণপনা সম্বন্ধে সবিস্তার বিজ্ঞাপন দিয়ে যদি একটিবার গলা ফাটিয়ে কাঁদতে পার, মা, তবে মেজদা গলে জল মেরে যাবে। মিছিমিছি আমাকে তাহলে আর ঐ অমানুষিক পরিশ্রমটা করতে হয় না।

রাজলক্ষ্মী মুখ ভার করিয়া বলে: ওর কথায় আমি থাকতে যাব কেন? ওর যা ইচ্ছে তাই করবে—আমার কী!

—তবে নিতান্তই আমাকে মহাদেশটা বেড়িয়ে আসতে হল দেখছি। এমনিও অমানুষ, অমনিও অমানুষ। তার চেয়ে এই দিব্যি ছিলাম—খাও-দাও, টো-টো করে নির্ভাবনায় আড্ডা দাও, দেশের একটা স্থায়ী উপকার হচ্ছিল। অলস না থাকতে-পারাটা যে কত বড়ো ব্যাধি এ কোনো মহারথীরই মাথায় আসে না।

চারিদিকের সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া রঙ্গলাল মনে-মনে অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া উঠিল। মা'র এই বিচ্ছেদ তাহাকে প্রতি মুহূর্তে গভীরতর ক্লান্তির মধ্যে লইয়া আসিতেছে। সামান্য তো একটা বিবাহ—দুইটি দিন-রাত্রির অবসানের পর পৃথিবীর যে-ঘটনাগুলির আর কোনো পারম্পরিক তারতম্য নাই—মা'র সন্তোষের জন্য তাহার প্রতিজ্ঞাকে সে এইটুকু শিথিল করিতে পারিবে না? জীবনে সে এতদিন ধরিয়া কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে? কবে সে আসিবে—তাহার এই হৃদয়ের গহন-দুর্গম পথ সে চিনিবেই বা কী করিয়া? অনির্বাণ আলো না-হয় সে

জ্বালাইয়া রাখিয়াছে, কিন্তু সেই আলোতে পথ চিনিয়া সে-ই যে ঠিক আসিবে তাহার প্রমাণ কী? বিবাহ তো সে করিতই, তবে—হ্যাঁ, যাক, আর কথা নয়, বিবাহ যখন সে করিতই, তখন মাকে খুশি করিতে আগামী বৈশাখেই সে করিয়া ফেলুক না! অনেকে—অনেকেই তাহার মতো দীর্ঘ দিন-রাত্রি প্রতীক্ষা করিয়াছে —বৃথা; সে আসে নাই, সে কখনো, কাহারও জীবনে আসে না; আর যদি সে আসেও, দুইদিন পরেই মনে হইয়াছে, এ সে নয়। অসীম সময়-সমুদ্র মন্থন করিয়াও তাহাকে উদ্ধার করা যাইবে না। তবে মাকে বেশিদিন অতৃপ্ত ও অসুখী রাখিয়া লাভ কী!

অতএব রঙ্গলালকেও তাহার প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলিকে হ্রস্ব ও সংক্ষিপ্ত করিয়া আনিতে হইল। রঙ্গলাল কহিল: বেশ, পুরুত ঠাকুরকে ডাকিয়ে বৈশাখে দিন ঠিক করে ফেল মা। আর আমি আপত্তি করব না।

রাজলক্ষ্মী আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। রঙ্গলালকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল: এতদিন রোজ সহস্রবার করে নাম জপ করবার ফল তাহলে পেলাম দিদি।

আনন্দে মাসিমা তো উলুই দিয়া ফেলিলেন।

নলিনী দাঁত দিয়া আঁচলের খুঁট চিবাইতে-চিবাইতে কহিল: মেজমামার সেই বিয়ে করার ষোলোআনাই শখ ছিল, দিদিমা, মাঝে থেকে একটুখানি ন্যাকামো করে নিলে।

রাজলক্ষ্মী উদ্ব্যস্ত হইয়া কহিল: মেয়ে তো আমার পছন্দই আছে, একবার পুরুতঠাকুরকে ডাকা। না, মহেন্দ্রবাবুদের সঙ্গে আগে পাকাপাকি একটা 'পান-পত্র' করে নিতে হবে? কী করতে হবে এখন, শিগগির বল না, দিদি। পরামর্শ দাও।

রঙ্গলাল কহিল: তবে এক কথা, মা। ঐ মহেন্দ্রবাবুর মেয়েকে নয়।

—কেন? ঐ মেয়েকে তুই দেখেছিস?

নলিনী মুখ ঘুরাইয়া কাহল: একেবারে জলজ্যান্ত অপ্সরা, মামা।

রঙ্গলাল গম্ভীর হইয়া কহিল: তা হোক। কিন্তু বিয়েতে আাম টাকা নিতে পারব না।

রাজলক্ষ্মী অসহিষ্ণু হইয়া বলিল: চাইলেই যখন পাওয়া যায়, তখন নেব না কেন? তারা খুশি মনেই তো দেবে—জুলুম তো কেউ করতে যাচ্ছে না।

—দিলেও বা। ও আমি পারব না ছুঁতে।

মাসিমা কহিলেন: তোর ব্যবসা-বুদ্ধি চিরকাল কাঁচাই থেকে গেল—লেখা-

পড়া শিখে মানুষ তো না একটা পাঁঠা হয়েছিস। এত বড়লোক শ্বশুর হবে—সুন্দরী বউ—

রাজলক্ষ্মী কঠিন গলায় কহিল: কিন্তু বরপণ বলে যদি নগদ কিছু ধরে না দেয়, তাহলে তো আর আপত্তি নেই?

—তাহলেও আপত্তি আছে। রঙ্গলাল স্পষ্ট, সতেজ ভঙ্গিতে বলিল: বড়লোকের ধার দিয়েই আমি যাব না। বিয়ে যখন একটা করতেই হবে—আর, সব বিয়েই যখন সর্বসাকুল্যে এক—আমি কোনো এক দুঃস্থ, গরিব গৃহস্থেরই উপকার করব। শরীরের সংজ্ঞায় যে রূপসী নয়, ধর যার অর্থের অভাবে ভালো পাত্র মিলছে না—কিম্বা ধর, যে অল্প বয়সে বিধবা হয়ে সমাজের বুকে পাথর হয়ে বসে আছে।

চক্ষু কপালে তুলিয়া মাসিমা বলিলেন: তুই পাগলা হলি নাকি, খোকা?

রাজলক্ষ্মী স্তম্ভিত হইয়া বলিল: এমনি করে তুই আমাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাস নাকি? থাক তোর বিয়ে, কার এমন মাথা-ব্যথা পড়েছে?

রঙ্গলাল আর্দ্র হইয়া কহিল: তোমার ওপর কিসের প্রতিশোধ নিতে যাব, মা? এ তো একটা এক মুহূর্তের কাণ্ড নয় যে একটা ছেলেখেলা করে তোমার সঙ্গে একটু ঝগড়া করে নিলাম। দায়িত্ব তো সম্পূর্ণ আমার, সারা জীবন এর ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে আমাকেই। তোমরা কোথায়? তোমরা তো আমার আগেই সরে পড়বে বোধহয়। না মা, এ-ক্ষেত্রে মাথা-ব্যথা কেবল আমারই। বিয়ে যখন করবই, তখন তাতে যদি কারো কোনো সামাজিক বা অর্থনৈতিক উপকার হয়, তো মন্দ কী! আরো তো অনেক সম্বন্ধ উপস্থিত আছে—ভেবে-চিন্তে একটা ঠিক করলেই চলবে। বলিয়া সে নিচে চলিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী কহিল: এমন সর্বনেশে বিদ্‌ঘুটে কথা কেউ কখনো শুনেছে? রূপে-গুণে আমার এমন রাজপুত্তুরের মতো ছেলে— সে কিনা বিয়ে করবে একটা পেঁচি-খেঁদিকে?

দিদি বলিলেন: ওর ও-সব রঙ্গে তুই কান দিসনে, রাজী। গোটা কতক পছন্দসই মেয়ে দেখা না, কাকে বিয়ে করতে হবে ঠিক ওর চোখ খুলে যাবে দেখিস। এখন আর তা নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করিসনে, কোনো রকমে একবার যখন বিয়ে করতে রাজী হয়েছে, তখন কোথাও আর বাধবে না।

পাঁচ

রঙ্গলাল মায়ের নির্দেশ মতো পাত্রী দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে অতিমাত্রায় অপরিচ্ছন্ন, ক্লান্তিকর বোধ হইতেছে। এমনি শরীরময় নৈকট্যের মাঝে সে তাহার প্রিয়তমার আবির্ভাব কল্পনা করিতে পারিত না—তাহাকে পাইবার ইহাই প্রশস্ত, অবারিত, সহজ রাজপথ ছিল না। তাহাকে সে পাইবে ভাবিয়াছিল গভীর বিরহের মধ্যে, প্রশান্ত প্রগাঢ় প্রতীক্ষায়—অনেক দূর-দুর্গম বাধা-বন্ধুর কণ্টকাস্তীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া। সে যে যৌবনে কত দৃপ্ত, কত অমিতপরাক্রমময় তাহাই সে নিজের কাছে উদ্ঘাটিত করিতে চাহিয়াছিল। প্রিয়তমাকে সে পাইত কিনা জানে না, কিন্তু পৃথিবীতে তাহার প্রেমকে হয়তো অবিনশ্বর করিয়া রাখিত।

রঙ্গলালের জীবনেও সেই সুযোগ আর আসিল না। প্রতীক্ষার যবনিকা বিদীর্ণ করিয়া উন্মুক্ত রঙ্গমঞ্চের কোলাহল শুরু হইয়াছে। মহত্তর স্বার্থপরতার চেয়ে পারিবারিক বা গোষ্ঠীগত শান্তি অনেক কাম্য। জীবনের সেই দুর্দম আরণ্য উন্মাদনার পরিবর্তে সে চায় এখন সামাজিক সামঞ্জস্য, শারীরিক সঙ্কীর্ণতা - তাহা অনেক সহজ, অনেক স্বাস্থ্যকর। একটি মুহূর্তের কোটিতম ভগ্নাংশের জন্যও সে সজীব মৃত্যুর শিহরণ না-ই বা অনুভব করিল, দেহের আধারে কোনো রকমে স্বল্পসুখী প্রাণ বহন করিতে পারিলেই সে বাঁচিয়া যাইবে। পরীক্ষার রোমাঞ্চ ছাড়িয়া স্থির সিদ্ধান্তেই সে এক ধাপে উত্তীর্ণ হইল। আর, আগাগোড়া যখন প্রয়োজনের কথাই উঠিতেছে, তখন সে বরং দুর্গতত্রাণ করুক—নিজের সেই অসীম-দুঃখময় বিপুল আনন্দের দিকেই যখন সে চাহিল না, যখন নিতান্ত একটা সামাজিক অনুষ্ঠানই সে পালন করিতেছে, তখন তাহাতে কোথাও না কোথাও এই সমাজের উপকার হোক।

অবশেষে যে-মেয়েটিকে সে পছন্দ করিল তাহাকে দেখিয়া রাজলক্ষ্মী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। দেখিতে কালো তো সে বটেই, বাপের অবস্থাও তেমনি কদর্য। বাপ রাজেন্দ্র ঘোষ কোন সওদাগরি আপিসে সামান্য মাহিয়ানায় কাজ করেন, কালো মেয়ের শীঘ্র বিবাহ হইবার সম্ভাবনা বিশেষ নাই বলিয়াই মেয়েকে বেশি বয়সে ইস্কুলে দিয়াছিলেন। কৃত্রিম বিদ্যা ও তাহার আনুষঙ্গিক অঙ্গসজ্জায় মেয়ের স্বাভাবিক বর্ণহীনতার কিছু ক্ষতিপূরণ হইতে পারে বা। আভা এই বৎসর ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করিয়াছে ও মেয়েদের মধ্যে যা-হোক একটা বৃত্তি পাওয়ার দরুনও তাহার কলেজে-পড়াটা খানিক সম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। এই

ভাবে খরচের দায় হইতে রাজেন্দ্রবাবু অতি-সহসা মুক্ত হইতে পারিবেন তাহা তাঁহার স্বপ্নের অতীত ছিল। একটি পয়সা তো ব্যয় করিতে হইবেই না, বরং এমন উপযুক্ত, উপার্জনক্ষম জামাই হইলে কখনো-সখনো তাঁহারও ব্যক্তিগত অভাবের তালিকাটা সংক্ষিপ্ত হইতে পারিবে।

ঐ কালো, ঢ্যাঙা, কৈশোরোত্তীর্ণা মেয়ের মধ্যে রঙ্গলাল যে কী দেখিয়া মুগ্ধ হইল রাজলক্ষ্মী কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না। রঙ্গলাল তো আগাগোড়াই তাহার অবাধ্যতা করিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার বিদ্রোহ এমন নির্মম হইয়া উঠিবে তাহা কে জানিত! বরপণ নিবে না, না নিক, কিন্তু গরিবের ঘরে ইহার চেয়ে সুন্দরী মেয়ে কি কোনো কালে জন্মগ্রহণ করে নাই? লেখাপড়া করিতে গিয়া মুখশ্রী তো নিতান্ত রুক্ষ, বিরস হইয়া উঠিয়াছে—আর বাকি জীবনটা কোলে বই লইয়া বসিয়া কাটাইয়া দিবে বলিয়াই কি তাহার বিবাহ হইতেছে নাকি? ঐ মেয়ের কল্যাণে তাহার ভাবী পৌত্রী-পৌত্রাদির চেহারার কথা কল্পনা করিয়া রাজলক্ষ্মী শিহরিয়া উঠিল—তাহারা 'জলচল' কিনা চেহারা দেখিয়া হয়তো সে নিজেই একদিন সন্দেহ করিয়া বসিবে। তাহার এত সাধের, এত সাধনার রঙ্গলাল—যাহাকে সে পৃথিবীর অগ্রগামীদের সমকক্ষ করিয়া তুলিয়াছিল—তাহার কি না এই দুর্গতি! কোথায় সে পুত্রবধুকে নিয়া সমস্ত দেশময় গর্ব করিয়া বেড়াইবে, তাহার আগমনে নূতন ঐশ্বর্যের পত্তন করিবে—তাহা না হইয়া এখন হইতে কিনা তাহাকেই মুখ লুকাইয়া থাকিতে হইল! রাজলক্ষ্মীর মনে হাসি-কান্না মিলাইয়া কত সব স্বপ্নের রামধনু জাগিত, আজ রূঢ় জাগ্রত রৌদ্রে তাহারা একে-একে সব নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। ছয়ছোট্ট কিশোরী একটি বৌ আসিবে—কোরকের মতো অস্ফুট ও অনাঘ্রাত—এবং দিনের পর দিন রাজলক্ষ্মীরই স্নেহে ও শাসনে, বৃষ্টিতে ও উত্তাপে সে বিকশিত হইতে থাকিবে। তাহাকে আর পুত্রবধূর উপর কর্তৃত্বময় প্রাধান্য বিস্তার করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে না। সে একেবারে স্বয়ং-প্রধান, আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াই আবির্ভূত হইল। ছি, ছি, রাজলক্ষ্মী কী করিয়া তাহার এই প্রাধান্য-হীনতার দুঃখ সহিবে?

কিন্তু রঙ্গলাল কিছুতেই নরম হইল না—স্তুতি মিনতি সব ব্যর্থ হইল। হোক সে কুরূপা, সাধারণ নিয়মে সে কুরূপা বলিয়াই তো তাহাকে সে জীবনে এই সগৌরব প্রতিষ্ঠা দিবে! মা'র কিছু ভয় বা চিন্তা করিবার নাই—এই মেয়েটিকেই তাহার ভালো লাগিয়াছে—তাহার রুচি যদি অধঃপতিত হয়, তবে তাহার জন্য নিজেকেই সে একা দায়ী করিতে পারিবে। আর রঙ্গলাল যদি মা'র ছেলে হয়, তবে তাহার স্ত্রীও যে নিশ্চিত তাহার অনুবর্তী হইবে—রঙ্গলাল রাজলক্ষ্মীকে এই

ভরসা দিল। বলিল : একেই যখন আমার মনে ধরল, মা, তখন একেই তোমাকে সানন্দে আশীর্বাদ করতে হবে। আমি যদি একে নিয়েই সুখী হব মনে করে থাকি, তবে সেই ভুল ভাঙবার স্বাধীনতাও আমাকে দাও। রাজলক্ষ্মী প্রায় চিৎকার করিয়া উঠিল : কিন্তু রাজ্যে আর মেয়ে ছিল না? তাই বলে এই কেলে পেত্নিকে তোর বিয়ে করতে হবে? এত সব মেয়ে দেখালাম, তাদের একটাকেও তোর মনে ধরল না? বাপ তো সাক্ষাৎ একটা চামার—যেমন হাল তেমনি হায়া! আর মেয়েরই বা কী ছুরৎ—কুঁজো, রোগা, ঝাঁটার কাঠির মতো চেহারা—

রঙ্গলাল হাসিয়া বলিল : তাকে ঘরে আনবার আগে যা-খুশি বলে নাও, কিন্তু এসে পড়লে তার মুখের ওপর তো এই মোলায়েম কথাগুলো বলতে পারবে না।

—কেন পারব না? তোর বউ বলে ছেড়ে কথা কইব নাকি?

—নেহাত আমারই তো বউ, মা। তোমার রঙ্গলালের।

মাসিমা টিপ্পনী কাটিতে ছাড়িলেন না : বিয়ে না করতেই যে এত মায়া! দেখিস। কী জাদুই যে তোকে করেছে—

রাজলক্ষ্মী মুখ ভার করিয়া বলিয়া উঠিল : আমার কপাল দিদি, কপাল! কী যে একখানা পছন্দ!

আভার রঙ ময়লা বটে, কিন্তু মা'র ঐ গ্রাম্য বিশেষণগুলিই রঙ্গলাল আপন কল্পনায় পরিচ্ছন্ন করিয়া লইল। কৃশ, দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি—মুখখানি লাবণ্যে উদ্ভাসিত! কালো মেয়ের যে এত রূপ থাকিতে পারে তাহা দেখিবার চক্ষু সংসারে খুব অল্প লোকেরই আছে ভাবিয়া রঙ্গলাল আশ্বস্ত হইল। একমাত্র বর্ণই যদি রূপনির্ণেতা হইত, তাহা হইলে পশ্চিমের তুষারগাত্রীরা এমন কুৎসিত মুখ করিয়া থাকিত না। রঙ্গলালের মনে হয়, সর্বসমেত রূপ হইতেছে আবির্ভাবে, তাহার প্রথম আত্মোদ্ঘাটনে। সেই দিক দিয়া আভার তুলনা নাই। দুই বিশাল চক্ষুর গভীর দীপ্তিতে তাহার সমস্ত অস্তিত্ব-চেতনা জ্যোতিষ্মান হইয়া আছে। কাহারও মাত্র দৈহিক উপস্থিতিতেই এমন প্রবল উজ্জ্বলতা থাকিতে পারে রঙ্গলাল অন্যান্য পাত্রী দেখিয়া তাহা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। সমস্ত দেহ যেন সবল প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত হইয়া আছে, ভঙ্গিতে একটি অনায়াস ও অচপল দৃঢ়তা। সে যে গরীব তাহাতে তাহার এতটুকু দুঃখ নাই—তাহার রঙ যে কালো তাহা তাহার জীবনের পক্ষে অনপনেয় লজ্জা নয়, তাহাকে যে সম্প্রতি নিতান্তই সমাজের প্রথা পালন করিয়া বুভুক্ষুদৃষ্টি পুরুষের সামনে উপস্থিত হইতে হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে তাহার হঠকারী, অশোভন বিদ্রোহ নাই—এমন দৃপ্ত, অকুণ্ঠিত, তেজোময় আত্মপ্রকাশের

সৌন্দর্যে রঙ্গলাল মুগ্ধ হইয়া গেল। ভঙ্গি জড়িমাশূন্য, উচ্চারণগুলি স্পষ্ট, নিরহঙ্কার দৃষ্টিতে প্রতিভার দীপ্তি পড়িয়াছে। বিধাতা তাহাকে যে কৃত্রিম, বাহ্যিক, চর্মসর্বস্ব সৌন্দর্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন তাহার ক্ষতি সে আপন অস্তিত্ববোধের তেজে পূর্ণ করিয়া নিয়াছে। সেই সৌন্দর্য তাহার অবয়বের সীমায় আবদ্ধ হয় নাই, সেই সৌন্দর্য তাহার ভঙ্গিতে, তাহার চেতনায়, তাহার জাগ্রত, বুদ্ধি-উদ্দীপ্ত প্রতিজ্ঞায়! রঙ্গলালের মতোই সে দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর আদর্শের সন্ধানে যাত্রা করিয়াছে--সেই বহুদূরসন্ধিৎসু প্রতিভার আলো আভারও চোখে জ্বলিতে দেখিয়া তাহার মনে সহসা ডাক দিয়া উঠিল। সে এমনই একটি মেয়েকে খুঁজিতেছিল, আপন অন্তরের সম্পদে যে জীবনের পূর্ণতা খোঁজে, জীবনের পূর্ণতা সম্বন্ধে যাহার ঔদার্যময়, বলিষ্ঠ একটা অভিমত আছে। হয়তো এই সেই মেয়ে।

রাজলক্ষ্মীর স্বপ্নের সঙ্গে রঙ্গলালের আদর্শের সংঘর্ষ বাধিল, কিন্তু কিছুতেই রঙ্গলাল হার মানিল না। আভার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়া গেল। তাহাকে রাজলক্ষ্মী বিবাহই বা বলে কী করিয়া? কোথায় সেই আত্মীয়-সমাগম, সেই উৎসব-সভা, বরপক্ষীয়দের সেই সাহঙ্কার আস্ফালন! কী নিয়া রাজলক্ষ্মী উৎসব করিবে, তাহার এই নিদারুণ স্বপ্নভঙ্গের শূন্যতার মাঝে কাহাকে সে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবে? মাত্র পান্নালাল ও জনকয়েক বন্ধু-বরযাত্রী লইয়া রঙ্গলাল বিবাহ করিতে গেল; তাহাকে প্রণাম করিবার সময় মাথায় ধান-দূর্বা দিয়া আশীর্বাদ সে একটা করিল বটে, কিন্তু চোখের জলও চাপিয়া রাখিতে পারিল না। ছেলে হইয়া রঙ্গলাল তাহাকে যে গভীর বঞ্চনা করিল তাহা সে কী করিয়া সহ্য করিবে? এই অবহেলা, এই আঘাত পাইবার জন্যই সে তাহাকে এত দুঃখে লালন করিয়া এত বড় করিয়াছে। আঁচলের আড়ালে যে মৃদু দীপশিখাটিকে সে এত বিনিদ্র রাত্রি জাগিয়া রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, সে আজ কিনা আপন ঔজ্জ্বল্যে তাহাকেই দগ্ধ করিয়া দিল।

তাহার পরে বউ লইয়া রঙ্গলাল যখন নিঃশব্দে বাড়ি ফিরিল—তাহার সামান্য বেড়াইয়া সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরিবার সময়ও ইহার চেয়ে বেশি সোরগোল হয়—তখন রাজলক্ষ্মী দস্তুরমতো শোকশয্যা নিয়াছে। খবরটা সে পান্নালালের কাছ হইতে আগেই পাইয়াছিল, দানসামগ্রী বলিতে কয়েকটা ঠনঠনে বাসন, আর মেঝেতে শুইবার জন্য পাটির উপর একটা খেলো বিছানা। বরযাত্রীদের ভালো করিয়া খাওয়ায় নাই পর্যন্ত। এই ভাবে তাহার রঙ্গলালের বিবাহ হইয়া গেল।

নিচে সহসা কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া গাঁটছড়া খুলিয়া আভাকে লইয়া রঙ্গলাল উপরে উঠিয়া আসিল। প্রথমে দেখা হইল নলিনীর সঙ্গে। নলিনী উল্লাসে উলু দিয়া উঠিল। মাসিমা বাহির হইয়া আসিলেন। কিন্তু মা কোথায়?

আভাকে লইয়া রঙ্গলাল মা'র ঘরে ঢুকিল—ঘরটা অন্ধকার, এক কোণে মেঝের উপর রাজলক্ষ্মী নিঃশব্দে পড়িয়া আছে। স্বুইচ টানিয়া রঙ্গলাল আলো জ্বালাইল; ম্লানকণ্ঠে কহিল: আমরা এলাম, মা, আর তুমি কিনা চুপ করে অন্ধকারে পড়ে আছ? এ কী, তোমার অসুখ করেছে নাকি?

রাজলক্ষ্মী শূন্যচক্ষে ছেলের দিকে একবার তাকাইল, একটিও কথা কহিল না।

রঙ্গলাল বলিল: ওঠো, তোমাকে প্রণাম করি, আমাদের আশীর্বাদ করবে না? বলিয়া সে আভাকে সংকেত করিল: এই আমাদের মা।

মাসিমা বলিলেন: আর মুখ ভার করে থেকে কী করবি? ছেলে যখন কাণ্ড একটা করেই বসেছে, তুই তো তাই বলে ওদের ফেলতে পারবি না।

রাজলক্ষ্মী উঠিয়া বসিল। রঙ্গলাল প্রণাম করিল। আভাও দেখাদেখি শাশুড়িকে প্রণাম করিতে নত হইল, রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি তাহার হাতটা ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িয়া কহিল: থাক, থাক, বিদ্যের জাহাজ তোমরা—মুখখু-সুখখুর কাছে মাথা নোয়াবে কী? আভা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রঙ্গলাল কহিল: আর ইনিই আমার মাসিমা।

আভা অতি ভয়ে-ভয়ে মাসিমার পায়ের কাছে বসিল। প্রণাম সাঙ্গ হইলে মাসিমা কহিলেন: দানসামগ্রী, টাকাকড়ি না-হয় কিছু না দিল, তাই বলে মেয়েকে দু-চারখানা ভালো গয়না দিতে কী হয়েছিল? সরু দুগাছ চুড়ি, আর এক সুতো হার। বেয়াইর চোখে কি চামড়া নেই?

রাজলক্ষ্মী তীব্রস্বরে কহিল: চামার! চামার!

সহসা রঙ্গলালের চোখ-কান জ্বালা করিয়া উঠিল, তবু গলার ঝাঁজ দমন করিয়া সে কহিল: ছি, মা, ও নতুন এই বাড়িতে এসে সবে পা দিল, ওকে লক্ষ্য করে ওর বাবাকে গাল দেওয়াটা কি ভালো দেখায়?

রাজলক্ষ্মী কুটিল মুখভঙ্গি করিয়া কহিল: দেখলে, দেখলে দিদি, ও এরি মধ্যে বউর হয়ে আমার সঙ্গে লাগতে এসেছে!

রঙ্গলাল কহিল: না, আমাদের হয়েই বলতে চাচ্ছি। আমাদের তবে ও কী ভাববে?

মাসিমা কহিলেন: কী আবার ভাববে! এমন জামাই পেল—ওদের চোদ্দগুষ্টির

ভাগ্যি। তাই বলে মেয়েকে এক সেট ভালো গয়না দিতে পারত না? কী ভালো দেখায় না-দেখায় গুরুজনদের তোর তা শেখাতে হবে না।

রঙ্গলাল কহিল: কোত্থেকে দেবে বল? অবস্থা তো ওদের জানো। এই নলিনী ওখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? তোর মামিমাকে নিয়ে যা, ভাব কর তার সঙ্গে।

নলিনী আসিয়া আভার হাত ধরিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেলে রঙ্গলাল ঢোঁক গিলিয়া কহিল: দুখানা গয়নায় কী আর আমাদের সম্পদ বাড়ত, মা? তুমিই তো বলতে, মেয়েমানুষের ঐশ্বর্য তাদের বাইরের আভরণে নয়, তাদের অন্তরের দীপ্তিতে। সে-কথা তুমি এর বেলায়ই বা খাটাতে চাইবে না কেন?

রাজলক্ষ্মী ঠোঁট উলটাইয়া কহিল: আহা, কী এঁর দীপ্তি!

রঙ্গলাল বলিল: বেশ তো, যদি বল, আমিই গয়না গড়িয়ে দিতে পারব, তাতে কী?

—তা দিবি না? কত দিবি। আমার বলতে হবে কেন? আমি তোর কে?

মাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া রঙ্গলাল কহিল: তুমি আমার কে, এ-কথা এতদিন পরে আমার নতুন করে জানাতে হবে নাকি, মা? তুমি আমার সব কিছুর চেয়ে বড়, সকল স্থানের উর্ধ্বে তোমার স্থান। কিন্তু মা, আমার সুখের চাইতে তুচ্ছ ক'টা জিনিসের দাম তোমার কাছে বেশি হল? আমি যদি সত্যিই সুখী হই, তবে ওর রঙ কালো বা ওর বাবার অবস্থা খারাপ, তাতে কী বল এসে যায়? সংসারে আমি সুখী হলেই কি তুমি সুখী হও না?

কিন্তু তাই বলে তুই এই প্যাঁচামুখীকে পছন্দ করলি কী বলে?

রঙ্গলাল হাসিয়া কহিল: অন্য মায়েরা যে তোমার ছেলেকে ভাল্লুক-মুখো বলে! মুখে হলে কী হয়, স্বভাবে না হলেই হল। কী বল মাসিমা! নতুন ও এল, তোমরা সব ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে নাও। আমার বন্ধুরা আজ এখানে খাবে—কিছুই যোগাড় দেখছি না যে। পান্না গেল কোথায়?

ছয়

দেখিতে-দেখিতে সব ভোল ফিরিতে শুরু করিল।

রঙ্গলালের সেই সব ময়লা জামা-কাপড় কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে, ঘরে-দুয়ারে কোথাও আর এতটুকু অযত্নসমৃদ্ধ অপরিচ্ছন্নতা নাই—আভার স্পর্শে রঙ্গলালের পোশাকে ও গৃহে ভোগবিরতির সেই রুক্ষতা হঠাৎ অপসৃত হইয়া গেল। চতুর্দিকে শ্রীর বন্যা নামিয়াছে। রঙ্গলাল চুল চকচকে করিয়া সিঁথি কাটে, মাটিতে দিশি

ধুতির কোঁচা লুটাইয়া চলে, সিল্ক ছাড়া জামা পরে না। ঘরেও আজকাল একে-একে দামী-দামী আসবাব আসিতেছে—একটা ড্রেসিং টেবিল, বেতের ইজি-চেয়ার, বই রাখিবার শেলফ্। এখন তাহার আরো একটা ঘর দরকার—নিচের সেই পরিত্যক্ত ঘরটায় সে আজকাল বসে, পড়াশুনা করে, বন্ধুরা আসিয়া জুটিলে আড্ডা দেয়। রাজলক্ষ্মী মুখ বাঁকাইয়া বলে : ছেলের আমার মূর্তিখানা দেখ, দিদি। তখন কত পই-পই করে বলতাম, ভালো দুখানা কাপড় পরবারও কোনোদিন চাড় হয়নি। আর এখন বউ এসেছে, সাজগোজের একবার ঘটা দেখ।

দিদি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলেন : আজকাল হাওয়াই ঐ। বউ পেয়েই ছেলে-গুলো যেন কী হতে থাকে! মা-মাসির দিকে ফিরে চাইবারও আর নাম নাই।

নলিনী চোখ বড় করিয়া নাকের বাঁশি ফুলাইয়া জোরে নিশ্বাস নিতে-নিতে বলে : মেজমামির চুল বাঁধবার জন্যে সেই আয়নাওলা টেবিল কিনে দিয়েছে, দেখেছ ছোড়দিদিমা? কত রকম সব স্নো, পাউডার, মুখে লাগাবার জন্যে লোম-ওলা ফুল—মেজমামি তো দিনের মধ্যে দশবার গালে মুখে পাউডার ঘষে—কিন্তু রঙ তো দেখি বদলায় না। আর আমি যদি একটু আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তো কী কটমট করে যে তাকায়, আমি যেন ওর আয়না চিবিয়ে খেয়ে ফেলব। আর স্নোর শিশিতে যদি হাত দিই কোনোদিন, তবে তো মামা আমাকে মেরেই ফেলবে।

রাজলক্ষ্মী বলে : য্যাদ্দুর?

নলিনী বলিতে থাকে : তারপর শোনো, সেই দুটো লম্বা হয়ে শোবার চেয়ার কিনেছে না, চাকরকে দিয়ে সেই দুটো চেয়ার ছাতে নিয়ে গেছে। তোমরা তো তখন ঘুমিয়ে, রাত করে দুজনে ছাতে উঠে গেল। লুকিয়ে-লুকিয়ে আমিও গেলাম, দেখি দুজনে চেয়ারে শুয়ে হাওয়া খাচ্ছেন। তারপর মামিমার জন্যে কত বই কিনেছে দেখনি বুঝি? তাই রোজ রাত জেগে-জেগে পড়ানো হয়।

শাশুড়িকে তাহাদের শোয়ার ঘরের দিকে আসিতে দেখিয়া আভা সন্ত্রস্ত হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আবার না-জানি সে নতুন করিয়া কী অপরাধ করিয়াছে! স্বামীর সঙ্গে প্রথম ঘনিষ্ঠতার দিনে রঙ্গলাল আভাকে বলিয়া দিয়াছিল : মা'র কোনো কথায়ই তুমি কিছু মনে করতে পারবে না কিন্তু, নির্বিচারে তাঁর সমস্ত আদেশ, সমস্ত শাসনই মাথা পেতে নেবে। পারবে না? আমিই তো তোমার আছি, আর আমি যখন তোমার পক্ষে, তখন কোনো দুঃখ কোনো অপমানই তোমাকে স্পর্শ করা উচিত নয়। মা'র প্রতি তোমার এই অকাতর বশ্যতা থেকেই আমি প্রমাণ পাব আভা, সত্যি তুমি আমাকে কতখানি ভালোবাস।

সেই হইতেই আভা শাশুড়িকে পদবীর অতিরিক্ত সম্মান দেখায়, কিসে তাহার মন পাওয়া যাইবে অহনিশ তাহারই কেবল পথ খোঁজে, শত লাঞ্ছনা ও বাক্য-যন্ত্রণায়ও সে মুখ তোলে না। একেক সময় এই শানিত, উলঙ্গ অন্যায় ও রূঢ়তার বিরুদ্ধে সে ফণা তুলিতে চায়—আত্মদমন করা অসহ্য হইয়া উঠে, কিন্তু স্বামীর কথা মনে করিয়া অসংযমী জিহ্বাকে নিরস্ত করে। তাহার স্বামীই তো আছে, স্নেহসিক্ত একটি স্পর্শে ও কথায়, তাহার বিশ্বব্যাপী, বলিষ্ঠ বন্ধুতায় সমস্ত জ্বালা তাহার জুড়াইয়া যায়। স্বামীকে যে সে কত ভালোবাসে, নীরবে সমস্ত উপদ্রব ও অপমান সহ্য করিয়া তাহা সপ্রমাণ করার জন্য আভা ব্যস্ত হইয়া উঠে।

রাজলক্ষ্মী ঘরে ঢুকিয়াই একেবারে ফাটিয়া পড়িল : দিনের মধ্যে তো পঁচিশবার হাতে-মুখে সোনো' ঘষছ, যেই কেলে সেই কেলেই তো থেকে গেলে—তবু লজ্জা বলে তো কোনো বালাই দেখছি না। আর এদিকে নলিনী ওতে একটু হাত দিতে এলে অমন তেড়ে আস কেন? বউরা বাপের বাড়ি থেকে কত সব সাবান-তেল, কাঁটা-ফিতে নিয়ে আসে, ননদ-ভাগ্নিদের বিলিয়ে দেয়—তার তো নাম নেইই, সোয়ামি যা শখ করে কিনে দিয়েছে তা থেকে ওকে একটু দিলে তোমার কী এমন একেবারে সর্বনাশ হয়ে যায় শুনি? লেখাপড়া শিখেছ বলে ছেলে তো আমার খুব বড়াই করে—কিন্তু এমন ছোট নজর কেন? হবে না—যেমন ঝাড়, তেমনি তো ফল গজাবে!

কথা শুনিয়া আভার সমস্ত গা-হাত-পা ঝাঁজিয়া উঠিল; তবু কণ্ঠস্বর সংযত, শান্ত রাখিয়াই কহিল : নলিনী আপনাকে তাই বলেছে?

—না, ও বলবে কেন, আমি গায়ে পড়ে মিথ্যে কথা বলতে এসেছি? তোমার যে বড় তেজ হয়েছে, ভেড়ার মতো সোয়ামি পেয়ে বড্ড বেড়ে গেছ দেখছি—আমাকে তুমি মিথ্যুক বল?

দুঃখে বিমর্ষ হইয়া আভা কহিল : ছি, অমন কথা আমি মনেও স্থান দিইনি, মা। আমি বলছিলাম, নলিনী ও-কথা আপনাকে বলল কী করে?

রাজলক্ষ্মী মুখ বাঁকাইয়া বলিল : এখনো আমাকে তোমার বিশ্বাস হয় না? এত হেনস্ত'। তবে নলিনীকে ডেকে তোমার সামনে মোকাবিলা করে দিতে হবে?

তেমনি শান্তস্বরে নতদৃষ্টিতেই আভা কহিল : সে যখন একবার ও-কথা বলেছে, তখন ডেকে আনলেও তাই বলবে। কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, সত্যি কথা ও মোটেই বলেনি। যখনই ওর চুল বেঁধে দিই, মুখ পরিষ্কার করে স্নো ঘষে পাউডার মেখে দি; তা ছাড়া আমার জিনিসের যখন যা ওর দরকার হয়েছে, কোনো দিন 'না' বলিনি।

রাজলক্ষ্মী কহিল : তুমি যেমন দৃষ্টিকৃপণের মেয়ে, হয়তো আঙুলের ডগায় করে দু'এক ফোঁটা লাগিয়ে দাও মাত্র।

আভা সামান্য তপ্ত হইয়া বলিল : তবে স্নো কতগুলি করে মাখতে হয় ?

রাজলক্ষ্মী আবার চিৎকার করিয়া উঠিল : মুখে-মুখে ঐ সকল তর্কই করতে জানো, আর সংসারের মধ্যে চিনেছ কেবল এক সোয়ামিকে। ভারি মেম-সাহেব হয়েছ, না ? তবু এত-এত করে স্নো মেখেও তো ছুরৎ ফেরে না দেখি।

সন্ধ্যায় বেড়াইয়া ফিরিয়াই রঙ্গলাল তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া নেয়। আভা আসার পর হইতে রাজলক্ষ্মী রান্নার তদারক করিতে আর নিচে নামে না, তাই আভাও কোনো-কোনো দিন সুযোগ-সুবিধা বুঝিয়া স্বামীরই সঙ্গে পাশাপাশি বসিয়া পড়ে। পান্নালাল সম্প্রতি সাহিত্যিক মহলে আড্ডা দিতেছে বলিয়া ফিরিতে তাহার একটু রাত হইয়া যায়। ঠাকুর তাহার ভাত ঢাকিয়া রাখে।

খাওয়া-দাওয়ার শেষে দরজা ভেজাইয়া আভা বিছানায় তাহার বই-খাতা ছড়াইয়া রঙ্গলালের পাশে শুইয়া পড়ে, বুকের তলায় বালিশ রাখিয়া পড়িবার ভঙ্গিটাকে সে সহজ ও সহিষ্ণু করিয়া নেয়। রঙ্গলাল তাহার সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকসংক্রান্ত অনেক আলাপ-আলোচনা করে ও যতক্ষণ পড়া বলিয়া দেয়, ততক্ষণ অন্তত সে শিক্ষকের একটা দূরত্ব রাখে ; তারপর নির্জীব বই-খাতাগুলি যখন একে-একে বিছানা হইতে তিরোধান করিয়া ব্যবধানকে সংকীর্ণতর করিয়া আনে, তখন, প্রাণবাহী দুই শরীরে অন্তরঙ্গতার আর অন্ত থাকে না। যেমন বলিষ্ঠ উদারতা, তেমনি নিবিড় সহানুভূতি—এমন স্বামীর জন্য কবে, কোন জন্মে আভা তপস্যা করিয়াছিল ? তাহার জন্যে কী সে মূল্য দিতে পারে ?

কিন্তু সেই দিন বই-খাতা ছড়াইয়া বসিবার আগে নলিনীর সেই মিথ্যা অভিযোগটাই সে রঙ্গলালের কাছে উত্থাপন করিতে গেল। রঙ্গলাল হঠাৎ তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া হাত দিয়া মুখ চাপিয়া ধরিল। কহিল : তোমাকে বলছি না আভা, এই সব তুচ্ছ ছোট কথা আমাকে কোনো দিন বলতে পাবে না। ছোট কথা তুমিই বা কেন বেশিক্ষণ মনে রাখতে যাবে ?

রঙ্গলালের আঙুলের ফাঁক দিয়া আভা বোবা গলায় বলিল : কিন্তু তুমি ছাড়া কাকে আর বলব ?

—আমি আমার আপিসের সব তুচ্ছ কথা তোমাকে বলতে আসি ? আমাদের কি ও সব ছাড়া আর কথা নেই ? এই সব মন-ছোট-করে দেয়া খুঁটিনাটি কথা নিয়ে মাথা ঘামাতেই আমরা এসেছি নাকি ? নিয়ে এস তোমার সাইলাস মার্নার। দুপুরে পড়তে পেরেছ দু'এক পৃষ্ঠা ? ঘুমোওনি তো ?

বই মেলিয়া স্বামীর পাশে ক্ষণিক ব্যবধান রচনা করিয়া আভা সমস্ত বিষম্মৃতি স্তিমিত, স্নিগ্ধ করিয়া আনে। দিনের সংসারে তাহার যেখানে যেটুকু ক্ষতচিহ্ন পড়ে, রাত্রির এই স্বামিসান্নিধ্যে অবগাহন করিয়া তাহার সেই জ্বালা সহজেই জুড়াইয়া যায়।

রঙ্গলাল বলিল : তোমাকে কলেজে ভর্তি করে দিলে মন্দ হত না। উৎসাহে আভা একেবারে উপচিয়া পড়িল : তাই দাও না। সকালবেলায়ই তো অনেক কলেজে মেয়েদের ক্লাশ খুলেছে— আমার স্কলারশিপ এর টাকাটা আর এমনি মাঠে মারা যায় না তাহলে।

—কিন্তু তাতে সংসারের সঙ্গে বিরোধ আরো বাড়তে থাকবে।

আভা বলিল : সংসার বলতে তো মা। তা, কেন তিনি আপত্তি করবেন? সকালবেলা একরকম তো আমি বসেই থাকি, আমাকে তো তাঁর ঘরে এখনো এক বছর রাঁধতে দেবেন না— পরেও দেন কিনা ঠিক নেই। ঠাকুর-চাকরই তো আছে —আর দুটি মাত্র তো লোক—তুমি জোর করলেই হয়ে যায়।

—না, যাতে মা'র আপত্তি আছে সে-কথায় জোর দিতে পারব না।

আভা বলিল : সে-আপত্তি যদি অন্যায় হয়, তাহলেও?

—এ ক্ষেত্রে মা'র আপত্তিটা মোটেই অন্যায় হবে না। তা ছাড়া—দুই হাতে আভার মুখখানি মুখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া রঙ্গলাল কহিল : তোমার কলেজে পড়ার কিছু দরকার হবে না, আর পাশ না করলেই বা তোমার কী। আমিই তো তোমার আছি।

এমন সময় নিচে নামিবার সিঁড়ির কাছে রাজলক্ষ্মীর গলা শোনা গেলো : খুব দিগগজ হয়েছ, এখন পায়ের ভারে বাড়িতে ভূমিকম্প না হলে বাঁচি। এদিকে পান্না এসে যে খেতে নেমে গেল তার সামনে গিয়ে একটু বসতে হয় তো?

শাশুড়ির গলা পাইয়া বই-খাতা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া আভা দরজা খুলিয়া বাহিরে চলিয়া আসিল।

—এত যে ডাকছি, কানে যায় না বুঝি? সারাদিন যে কেবল বইর ওপর মুখ গুঁজে বসে থাক, তাতে তোমার কোন পুরুষ উদ্ধার হবে শুনি? এদিকে পান্নাকে কে দেয়-থোয় দেখে-শোনে তার ঠিক নেই।

আভা না বলিয়া পারিল না : ঠাকুরপোই তো তাঁর ভাত চাপা দিয়ে রাখতে বলে যান। আমি আর গিয়ে কী করব?

রাজলক্ষ্মী ঘরের ভিতরে রঙ্গলালকে শুনাইয়া-শুনাইয়া বলিল : তা যাবে কেন —আপন-পর যে এখুনি বাছতে শিখেছ! বসে-বসে ফ্যাশান করে কেবল বই

পড়বে! তা, এত বুড় বয়স পর্যন্ত পড়তে তোমার লজ্জা করে না? এদিকে নলিনীর যে কিছুই পড়া-শোনা হচ্ছে না তা একবার চোখে পড়ে? ওর কি ব্যবস্থা হবে সে-কথা একবার তোমরা ভাব?

নিচে নামিবার জন্য ধীরে-ধীরে দুই পা আগাইয়া আসিয়া আভা কহিল: সে-ব্যবস্থা আপনারা করবেন, আমি তার কী জানি?

রাজলক্ষ্মী কহিল: মুখে-মুখে খালি তর্ক করতেই জানো, কিন্তু রঙ্গলাল এই যে এখন দিনে রাতে তোমাকে পড়াচ্ছে, কই, একদিনও তো নলিনীকে নিয়ে বসতে দেখি না। তারও যে একটা গতি করতে হবে সেটা একবার মনে করে ও?

আভা তবু কথা কহিবে: ওকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিলেই তো হয়—

—আর তোমার মতো অমন শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে কোলকুঁজো হয়ে বসে থাক! ইস্কুলে একবার ঢুকলেই হল, ঢেপসি না হয়ে আর কেউ বিয়ে করতে চায় না—সবাই ভাবে কি জানি একটা দিগ্বিজয় করতে বেরিয়েছি!

আঁচাইয়া তোয়ালেতে মুখ মুছিতে-মুছিতে পান্নালাল উঠিয়া আসিল। রাজলক্ষ্মী কহিল: হয়ে গেল এরি মধ্যে? সব ছিল তো? মাছ দুখানা রাখেনি?

পান্নালাল কহিল: কে অত হিসেব রাখে? পেলাম আর গিললাম। ভীষণ ঘুম পেয়েছে। কী বৌদি, তুমি এখনো শুতে যাওনি?

রাজলক্ষ্মী কহিল: এখুনি কী? কত বই এখনো পড়তে হবে। রোজ বারোটা-একটা। এখন আর এতে ইলেক্‌ট্রিক বিলের খরচ বাড়ে না। কী, পান্নার বিছানা করে মশারি টাঙিয়ে দিয়েছ তো?

পান্নালাল নিজের ঘরের দিকে যাইতে-যাইতে হাসিয়া বলিল: আমার আবার বিছানা!

আভা কহিল: কোন দিন তোমার বিছানা না করি?

পান্নালাল স্মিতমুখে কহিল: তা কে অস্বীকার করছে? কথাটার একটা গভীর অর্থও থাকতে পারে—সেদিকে কি তোমাদের হুঁস আছে?

রাজলক্ষ্মী কথাটাকে অতি সহজেই বুঝিয়া লইল: হ্যাঁ, ওর আবার হুঁশ থাকবে? নিজেরটা নিয়েই চব্বিশ ঘণ্টা, বাড়ির আর কারো সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে মাথা ঘামাবার বা কী দরকার! বলিয়া সে সোজা পান্নালালের ঘরে গেল।

পান্নালাল বিছানায় লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, ঘরের মধ্যে সহসা অজস্র আলো দেখিয়া সে বিরক্ত হইয়া কহিল: ওখানে কী করছ, মা?

রাজলক্ষ্মী তাহার পড়ার টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে ; কহিল : দাঁড়া, তোর টেবিলটা গুছিয়ে দি। কী রকম নোংরা হয়ে আছে! বইয়ে-খাতায় একটা পাহাড়!

পান্নালাল চেঁচাইয়া উঠিল : খবরদার মা, ওতে তুমি হাত দিতে যেও না। সব গোলমাল করে ফেলবে। কোথায় কি রাখবে তার ঠিক নেই।

রাজলক্ষ্মী বলিল : তা বলে জিনিসপত্র এমনি ছড়িয়ে থাকবে নাকি? আর কারো তো চোখ পড়ে না!

—থাক, হ্যাঁ, তাই থাক। বৌদিকে পর্যন্ত আমার টেবিলে হাত দিতে দিই না। তুমি এবার যাও। খাতাপত্র অমন পাশাপাশি ভিড় করে না থাকলে পড়ায় আমার মন বসে না।

টেবিলের কাছ হইতে সরিয়া আসিয়া রাজলক্ষ্মী পান্নালালের ব্র্যাকেট ঘাঁটিতে লাগিল : এ কী, তোর দুটো জামাই দেখছি ছিঁড়ে উঠেছে, তোর মেজদাকে বলতে পারিস না? এদিকে হপ্তায়-হপ্তায় বৌয়ের জন্যে রঙ-বেরঙের ব্লাউজ আসছে—কত রকম শাড়ি, কত ঢঙের জুতো। না চাইবি তো, ওর পাল্লায় পড়ে তুইও তোর সম্পত্তির অংশ ছেড়ে দিবি কেন? ওর না-হয় চাকরি আছে, তোর আছে কী? তুই কেন তোর ন্যায্য অংশ কেড়ে নিবি না? নিবি না তো, এমনি হা-পিত্যেশ করে বেড়াবি নাকি?

পান্নালাল পাশ ফিরিয়া আলো আড়াল করিয়া কহিল : এ মহা মুশকিলে পড়লাম দেখছি। ঘুমুবার সময় কেন বকবক করতে এসেছ? ব্র্যাকেটের জামা দুটো ছিঁড়ে থাকে, নিয়ে যাও—তা দিয়ে বাসন রেখ। ট্রাঙ্কে হয়তো গোটা পাঁচ-ছয়, ডাইংক্লিনিংএ তিনটে। চাকরি নেই তো, কী হয়েছে? এই দুটো হাত আছে না? তুমি এবার যাও বলছি, শিগগির আলো নেবাও।

সিঁড়ির ধার হইতে রাজলক্ষ্মী চলিয়া গেলে আভা খানিকক্ষণ অন্ধকারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরে হঠাৎ দরজা ঠেলিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া বলা-কহা-নাই বিশৃঙ্খল বইগুলি দুই ক্ষিপ্র হাতে গুছাইয়া লইতে লাগিল।

রঙ্গলাল কহিল : কী হল? আর পড়বে না?

বইগুলি টেবিলের উপর সশব্দে নামাইয়া রাখিয়া আভা চাপা গলায় কহিল : না, আর কোনো দিন না। আর কক্‌খনো তুমি আমাকে পড়াতে পারবে না বলে রাখছি।

রঙ্গলাল বলিল : কেন কী হল?

—আমাকে পড়াতে তোমার লজ্জা করে না? বাড়িতে যার বিয়ের উপযুক্ত

ভাগ্নি আছে, লেখা-পড়া শিখিয়ে তার একটা গতি করতে পার না? আমাকে দিগ্‌গজ করবার কী হয়েছে?

রঙ্গলাল প্রবলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। বাহিরের কথা কিছু-কিছু তাহার কানে আসিয়াছিল, তাই মজা পাইয়া কহিল: নলিনীকে তুমিই তো পড়াতে পার। সে-বাবদ টিউশানির মাইনেও না-হয় তোমাকে দেয়া যাবে। আমি তোমাকে পড়িয়ে একেবারে ঠকে যাচ্ছি—কিছুই রোজগার নেই।

কিন্তু টেবিলের উপর মাথা গুঁজিয়া আভা কাঁদিতে বসিয়াছে।

রঙ্গলাল বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল। গম্ভীর হইয়া কহিল—ছি আভা এ কী কাণ্ড! তুমিও এমনি ছোট হবে নাকি?

আভা মুখ তুলিল না; ফোঁপাইয়া উঠিয়া কহিল: না, সব সময়ে এই সব ছোট কথা শুনে মানুষ ছোট না হয়ে পারে?

রঙ্গলাল তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া দিল। বলিল: তুমি যে দেখছি এখনো নিতান্ত কাঁচা, একেবারে পিছিয়ে আছ! তোমার লেখা-পড়া শেখার ভীষণ দরকার, লেখা-পড়ায় আরো উন্নত না হতে পারলে এ সব ক্ষুদ্রতা তুমি ডিঙিয়ে যাবে কী করে? এস, এস, আরো বেশি করে পড়া-শুনা করে তোমায় এগিয়ে যেতে হবে। বলিয়া এক হাতে রাশীকৃত বই ও অন্য হাতে আভাকে সে রাশীকৃত করিয়া বিছানার উপর লইয়া আসিল।

কিন্তু বিছানার উপর লইয়া আসিয়া রঙ্গলালের আর মাস্টারি করিতে ইচ্ছা হইল না। হঠাৎ হাত তুলিয়া দেয়ালের উপর সুইচটা অফ করিয়া দিল। জানলার আড়ালে কোথায় এক ফালি জ্যোৎস্না মুখ লুকাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, অন্ধকার হইতেই বিছানার এক প্রান্তে আসিয়া এলাইয়া পড়িয়াছে।

জ্যোৎস্নার সেই শুভ্র ও সুকোমল রেখার চেয়ে আভার শরীরভঙ্গিটি অনেক বেশি সুন্দর, অনেক বেশি অপার্থিব মনে হইল। বালিশে গাল রাখিয়া আভা ঐ পাশে মুখ ফিরাইয়া আছে। ছোট কপাল, চিবুকটি তীক্ষ্ণ, প্রোফাইল বা অর্ধাস্যরেখা একেবারে ছুরির ফলার মতো প্রখর। রঙ্গলাল ধীরে-ধীরে আভার মুখখানি জ্যোৎস্নায় লইয়া আসিল। হাসিয়া বলিল: এখনো কাঁদছ নাকি?

আভা দুই চক্ষু দৃষ্টিতে বিস্ফারিত করিয়া রঙ্গলালের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। জ্যোৎস্না তাহার কাছে লাগে না। সৌন্দর্য-বিচারের মানদণ্ডটা সংসারে কী স্থূল! একমাত্র চর্মচক্ষুর মন্তব্যই সেখানে প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয়। অথচ রঙ্গলালের দুই চক্ষে তাহার আত্মা গোপনে গভীরতর দৃষ্টি ফেলিতেছে—সেই দেখাতে আভার লাবণ্যের সে কূল পাইতেছে না। এই রূপ বিধাতা সৃষ্টি করে নাই,

এই রূপ রঙ্গলাল নিজে সৃষ্টি করিয়াছে। যাহার জন্য, সে আলোকসামান্যার জন্য সে এত কাল নিভৃতে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল, সে এমন করিয়া এই সন্নিহিত স্নেহের মাঝে কোনো দিন ধরা দিত কিনা তাহা কে বলিতে পারে?

সাত

আভাকে লইয়া রঙ্গলাল সন্ধ্যার দিকে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল।

দিদি ও রাজলক্ষ্মী বারান্দায় বসিয়া ছিলেন। নলিনী গিয়াছে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গুটি খেলিতে।

রেলিঙের ফাঁক দিয়া তেরছা করিয়া চাহিয়া দিদি বলিলেন: ঐ শাড়িখানা আবার কিনল কোন দিন?

রাজলক্ষ্মী মুখ ঘুরাইয়া বলিল: কে জানে? হামেশাই তো কিনছে—আমাকে একবার দেখায় নাকি? বৌ-মানুষ নতুন শাড়ি পরলে শাশুড়িদের প্রণাম করে যায় —তা, ও-শিক্ষা কি ওর গুষ্টির কারো আছে? পাছে কিছু বলি সেই ভয়ে কেমন পালিয়ে গেল দেখলে?

দিদি দুই চোখে টান দিয়া কহিলেন: আর পছন্দকেই বাপু বলিহারি। সেজেছেন—একেবারে জ্যান্ত একটি ছুছুন্দরি! কেষ্টঠাকুরুণ যাচ্ছেন কোথায়?

—কে জানে কোথায়! বিকেলে হাওয়া না খেলে সুন্দরীর খিদে পায় না। আর এই ফাঁকে বুঝলে, দিদি, বাপের বাড়িটা ঘুরে আসে। সামনে বাপের বাড়ি হয়ে ও ডানা গজিয়েছে দেখ না। কই, বাপ তো একবার এসে নেমন্তন্ন করে যায় না—সেধে-সেধে জামাইকে এমন হ্যাঙলাপনা করতে কোনো দিন দেখিনি, দিদি। যেমন রঙ্গটা হয়েছে আস্ত গণ্ডমূর্খ, বৌর কথায় বাঁদর-নাচ করছে। আমার যেমন কপাল!

দিদি বলিলেন: কানে ওটা আধহাত কী ঝুলছে দেখলাম।

ব্যথিত স্বরে রাজলক্ষ্মী বলিল: ঝাড়-লণ্ঠন। ঢঙিরা ওকে বলে ঝুম্‌কো। বুঝলে দিদি, রঙ্গর এখন অনেক পয়সা। জামা কাপড়ে বৌর বাক্স-প্যাঁটরা বোঝাই হয়ে গেল—এদিকে পান্নার একটা আস্ত জামা নেই, আমাকে সেই যে পুজোয় একজোড়া থান দিয়েছিল—তুমি দেখনি তার জমি, একেবারে জ্যালজেলে, দুটি মাস সমানে পরতে পারলাম না—তারপর একবার ভুলেও জিগগেস করলে না: 'মা, তোমাকে এক জোড়া কাপড় এনে দেব?' ছি আমি চাইতে যাব কোন লজ্জায়?

দিদি আঙুল নাড়িয়া-নাড়িয়া বলিলেন: বুঝলি না, সব নষ্টের গোড়া হচ্ছে ঐ

কালীমূর্তি! যেমন বংশ, তেমনি চেহারা, তেমনি স্বভাব। কই তুই এখন শাশুড়ির সেবায় প্রাণপাত করবি, না, সোয়ামির বগল ধরে যাচ্ছেন উনি হাওয়া খেতে! ঘোমটার বালাই তো নেইই—তারপর ঢলানির হাসির কী বাহার! রাজ্যের লোকের মধ্যে গিয়ে এমনি বেহায়াপনা করতে মাগীর একটু লজ্জা হয় না—মাগো! ওর যাওয়া তুই বন্ধ করে দিতে পারিস না? রাজলক্ষ্মী কপালে চোখ তুলিয়া কহিল: সর্বনাশ। তাহলে রঙ্গরই যে বুক ফেটে যাবে। বুঝলে, দিদি, ওকে কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছে হয় না। বৌরই তো সব বোঝা উচিত—ওরই তো উচিত সোয়ামিকে এ-ক্ষেত্রে নিরস্ত করা। ও যাবে না বললেই তো হয়। বলতে পারে না—ঘরের কাজ-কর্ম ফেলে আমি যাই কী করে? এই ধর না সেদিন—ওরা দুজনে আদ্ধেক রাত পর্যন্ত কী থিয়েটার দেখে এল। ও বলতে পারত না—মা আর মাসিমাকেও নিয়ে চল? পারত না বলতে? বাপের জন্মে কলকাতার থিয়েটার কী কোনোদিন জানলাম না।

গলা ফুলাইয়া দিদি বলিলেন: শাসন কর রাজী, শাসন কর। হাতের লাগাম আলগা দিলেই সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

—শাসন করব কী, দিদি? রঙ্গ কি আমাকে তেমন বৌ এনে দিয়েছে? একেবারে একটা কাঠ-সেপাই। কিছু বলতে গেলে একেবারে ঘাড় বেঁকিয়ে তেড়ে আসে। কী টাস-টাস কথা, কী অন্তর-পুড়ুনি চিমটি! আর বৌকে শাসন করতে গেলেই তো রঙ্গর মুখখানা এতখানি! ওর লাগে বলেই তো বৌকে কিছু বলতে পারি না। নইলে একেবারে তুলো ধুনে দিতাম না?

দিদি বলিলেন: এই কেলেকুষ্টি বৌ পেয়ে ছেলেটার কি মতিভ্রম হল নাকি?

—তা ছাড়া বাপের বাড়িটাও হয়েছে কাছে। ধুরন্ধরিরা সব আজকাল মেমসায়েব হয়েছে কিনা—বাস্‌এ চড়ে পুরুষের ভিড়ে বসে চার আনায় যাওয়া-আসা করছে। নইলে বাপের বাড়ি ওর মফস্বলে হত—অমন উড়াল দিয়ে যাওয়া ওর দেখে নিতাম। তারপর শোনো সেদিনের কাণ্ড—

রাজলক্ষ্মী দিদির কাছে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিল: কী-একটু সেদিন সর্দি না কী হয়েছে—ঘরে উঁকি মেরে দেখি কোট-প্যাণ্টালুন পরা এক ডাক্তার এসেছে। একবার কীর্তিখানা দেখো—রঙ্গর পয়সার ওপর বৌর কী অগাধ মায়া; পয়সা তো নয় খোলামকুচি।

—আর রঙ্গর মায়াকেও বলিহারি। অমন বৌর জন্যে আবার ডাক্তার! পুরুষ-মানুষের আবার স্ত্রী-ভাবনা।

—অথচ এই দাঁতের ব্যথায় কতোদিন কষ্ট পাচ্ছি, ডাক্তার দূরের কথা, এক

ফোঁটা ওষুধ পেলাম না। সবই আমার অদেষ্ট, দিদি, নইলে আমার এত কষ্টের রঙ্গ কেন এমনি পর হয়ে যাবে বল ?

আস্তে-আস্তে চারিদিক হইতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। এমন সময় আপিস হইতে ফিরিয়া খাবারের থালা সমুখে নিয়া রঙ্গলাল তাহার পাশে বসিত—বিলীয়মান আলোর বিষণ্ণ আবহাওয়ায় বসিয়া তাহারা দুইজনে সুখ-দুঃখের কত গল্প করিয়াছে। আজকাল রঙ্গলাল মা'র ধার দিয়াও আসে না—সেই জায়গাটা আজ শূন্য, সমস্ত সন্ধ্যা আজ বিচ্ছেদবেদনায় মন্থর, ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। বেড়াইতে না গেলেও রঙ্গলাল ছাতে চেয়ার টানিয়া বসিয়া বৌর সঙ্গেই এই সময়টা ব্যয় করিতে ভালোবাসে—তাহার সুখ-দুঃখ, তাহার স্বপ্ন-সমস্যার মাঝে মা'র জন্য সে আর এতটুকুও স্থান রাখে নাই। সামান্য একটু শরীর খারাপ হইলে বৌকেই সে আগে খবর দেয়—এবং তাহারই রঙ্গলালের জ্বরতপ্ত কপালে আর কাহার অধিকারগর্বিত আঙুল সঞ্চরণ করিয়া বেড়ায়। তাহাকে জামায় সামান্য একটা বোতাম পর্যন্ত আর লাগাইতে হয় না। কী সে খায়, কতখানি তাহার ক্ষুধা থাকে—কোনো খবরই তাহার জানা নাই ; সময়ে-অসময়ে ক্ষুধা পাইলে মা'র কাছে আর সে কখনো হাত পাতে না, বৌকেই বলে, বৌ-ই ব্যবস্থা করিয়া দেয়। বৌ নাকি ঠাকুরকে দিয়া রোজ রোজ কত সব রাঁধায়—নলিনীর মুখে সব তাহার কানে আসে বটে—তাহা নাকি ঝালে-পেঁয়াজে ঘিয়ে-মশলায় ভীষণ উপাদেয় ; রঙ্গলাল তাহা শতমুখে তারিফ করে, কিন্তু এত উগ্র অখাদ্য যে রঙ্গলালের পেটে সহিবে না তাহা পর্যন্ত বলিবার মুখ তাহার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কোথা হইতে অনাত্মীয় একটা মেয়ে আসিয়া এক কথায় তাহার রঙ্গলালের সমস্ত ধাত জানিয়া বসিল। মা'র থেকে সেই এখন তাহার বেশি আপনার। সমস্ত ঘর-দোর সেই তদারক করে, আলস্য করিয়া একদিন অপরিষ্কার করিয়া রাখিলে কোনো কথাই তাহাকে আর শুনিতে হয় না। বৌ মশারি টাঙানো পছন্দ করে না দেখিয়া রঙ্গলাল কোথা হইতে কতগুলি কী ধোঁয়ার কুণ্ডলী কিনিয়া আনিয়াছে—তাহার এখন অনেক পয়সা। সমস্ত সংসারে রাজলক্ষ্মীর স্থান আবার কেমন সংকীর্ণ হইয়া আসিল। রঙ্গলালের ঘরে তাহার প্রবেশ আজ অনধিকারপ্রবেশ। বৌকে একটু শাসন করিতে গেলে রঙ্গলাল মনে মনে আপত্তি করে, কেননা মা'র শাসনের পরেও সে তাহার সান্নিধ্যকে স্বীকার করে, সান্ত্বনা দেয়, তাহার শাসনের সমস্ত সুফল-সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করিয়া তোলে। এক কথায় তাহার বিচারকে সে সবলে উপেক্ষা করে, নহিলে বৌ কোন সাহসে, কিসের জোরে এমন ঝিলিক দিয়া বেড়ায় ? ভাবিতে-ভাবিতে রাজলক্ষ্মীর দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। আপন ছেলের হাতে তাহার অধিকারের গর্ব এমন করিয়া ক্ষুন্ন

হইবে তাহা সে অসহতম দুর্দিনেও কল্পনা করিতে পারিত না। আশ্চর্য, এই সব ছাড়িয়া-ছুড়িয়া সে যে এখন আগের মতোই পূজা-অর্চনায় মন দিবে তাহারও উপায় নাই। রঙ্গলালের সঙ্গে সঙ্গে দেবতাও তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন।

তাহার একদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়িল। কালিকিঙ্করের বিরুদ্ধে মামলা করিবার জন্য সে যখন একদিন রঙ্গলালকে উত্তেজিত করিতেছিল, তখন রঙ্গলাল দুই হাতে তাহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল : 'পৃথিবীতে সমস্ত পাওনাই কি ঠিক-ঠিক তাদের মালিকের হাতে এসে পৌঁছোয়, মা? ও কথা চিরজীবনের জন্যে আমাকে ভুলতে দাও। আমরা দুই ভাই ঐ ক'টা তুচ্ছ টাকার বিনিময়ে যে সম্পত্তি পেয়েছি, তা স্বর্গের চেয়েও বড়। এই আমাদের সব চেয়ে বড় ভাগ। এ আমরা অর্জন করেছি, মা, ভিক্ষে করে এ আমাদের পেতে হয়নি!'

মিথ্যা কথা—জন্মভূমির সঙ্গে-সঙ্গে মাকেও সে ভুলিয়া গিয়াছে।

আঁচলে চোখের জল মুছিয়া রাজলক্ষ্মী আবার কহিল : তার এখন অনেক পয়সা। তার মাইনে-টাইনে য়্যাদ্দিনে বাড়ল কিনা তা-ও জানিনে। আর সে-খবর আমাকে বলবে কেন? য়্যাদ্দিন মাইনে পেয়ে আমার হাতেই তো তুলে দিত—এবার দেখি তিরিশ টাকা কম! জিগগেস করাতে বললে : 'নিজের কয়েকটা খরচের জন্যে ও-টাকাটা রেখে দিলাম।' নিজের খরচ মানে বৌর বাবুগিরির খরচা। নোটগুলি ঠেলে দিয়ে বললাম : 'আমার কাছে আর কেন? বৌই তো দিব্যি খরচ করতে শিখেছে —সেই এবার থেকে রাখুক। তোদের কখন কী দরকার হবে আমি তার কী জানি?'

দিদি উৎসাহিত হইয়া কহিলেন : নিসনি তো বেশ করেছিস। বাছাধন এবার টের পাবে।

—না নিয়ে পারলাম না, দিদি। রঙ্গলাল প্রায় কান্নাকাটি করবার যোগাড়। আমি ছাড়া নাকি তার কেউ নেই। কিন্তু ওদিকে হাত-খরচেই তার আজকাল তিনগুণ বেরিয়ে যায়, ব্যাঙ্কে কিছু আর উঠতে পায় না। বৌ-ই সব গ্রাস করেছে।

দিদি কিছুটা সামলাইলেন যা-হোক : তা ছাড়া মাইনেও নিশ্চয় কিছু বেড়েছে, সেটা আর তোকে জানায়নি, বাড়তি টাকাটা বৌরই বাক্সবন্দী থাকে। নইলে যে দমকে খরচ করছে—

রাজলক্ষ্মী বলিল : তাই হবে। তা ছাড়া বৌর কল্যাণে আরো এক খরচ বেড়েছে, দিদি। লাইফ-ইনসিয়োর করেছে—মাসে-মাসে তার টাকা গোণে—হঠাৎ যদি একটা কিছু তার ভালো-মন্দ হয়, তবে বৌর কী দুর্দশা হবে সেই ভাবনা তাকে এখন থেকেই পেয়ে বসেছে। শত্রুরও সেই দুর্দশার কথা মনে আনতে পারি না দিদি, কিন্তু মা'র জন্যে কোনোদিন তাকে কিছু ভাবনা করতে দেখলাম না।

আভা কুণ্ঠিত পায়ে আস্তে-আস্তে উপরে উঠিয়া আসিল। বাড়ির মুখে হঠাৎ এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হইয়া যাইতেই রঙ্গলাল রোয়াকে দাঁড়াইয়া তাঁহার সঙ্গে গল্প করিতেছে। বাহিরের জনতার মাঝে সে যে অবাধ মুক্তির স্বাদ পাইয়াছিল ঘরে আসিয়া পা দিতেই তাহা এক নিমেষে বিষময় হইয়া উঠিল।

রাজলক্ষ্মী তাহাকে দেখিয়া ডাক দিল: পেথম মেলে কোত্থেকে এলে?

আভা স্তব্ধ হইয়া গেল। এতক্ষণ এই অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া হইতে সে কত দূরের বিস্তৃতির মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিল—এই সব শ্বাসরোধী সংকীর্ণতার কথা তাহার মনেই ছিল না।

রাজলক্ষ্মী আবার হাঁক দিল: ডাক দিলে যে শুনতে পাও না? এস এদিকে।

—যাই। আভা শাড়িটা বদলাইবার পর্যন্ত সময় পাইল না, ব্রোচটা খুলিয়া আঁচল-স্থাপনের আধুনিকতাটা মার্জিত করিয়া সে অগ্রসর হইল।

মাসিমা বলিলেন: কানের মাথা খেয়েছ নাকি? বলি, যুগলমূর্তি হয়ে গেছলে কোথায়?

আভা দৃঢ়কণ্ঠে স্পষ্ট করিয়া কহিল: বায়োস্কোপে।

—বায়োস্কোপে! রাজলক্ষ্মী বিস্ময়ে ও ক্ষোভে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে বলিল: ক'টাকা খসল?

আভা কহিল: তা আমি কী জানি?

—না, তা কি আর জানো? ভাজা মাছ তুমি উলটে খেতে জানো না। এত বিত্তের জাহাজ, আর এইটুকু না জানলে তোমার চলবে কেন? বলি, ক'টাকার সিটে বসেছিলে?

আভা দ্বিধা করিল না, বলিল: দু'টাকা চারআনা করে।

রাজলক্ষ্মী দাঁত খিঁচাইয়া কহিল: তবে তখন জানো না বলছিলে যে? এই যে এতগুলি টাকা তুমি বার করে দিলে, সে-টাকা দিয়ে কত কিছু হতে পারত তা খেয়াল আছে?

আভা তেমনি স্পষ্ট কণ্ঠে কহিল: এ-কথা আমাকে বলে লাভ কী? যার টাকা তাকে বললেই তো পারেন।

—শুনলে, বৌর একবার কথা শুনলে, দিদি। রঙ্গর টাকা তো এখন তোমার জন্মই উড়ছে—রঙ্গ যদি মানুষ হত, তো তোমার এই বেয়াদবিকে প্রশ্রয় দিত না! তা, সব টাকাই কি একলা উদরস্থ করতে হয়? নলিনী—আমাদের নলিনী কী দোষ করল? ওকে নিয়ে যেতে পারতে না?

আভা কুণ্ঠিত হইয়া বলিল: আমি তো নিয়ে যাবার কর্তা নই।

মাসিমা বলিলেন : তুমি কর্তার বাবা। তুমি ইচ্ছে করলে কী না করতে পার ? রঞ্জর না-হয় খেয়াল নেই, কিন্তু তোমার এতদিকে এমন কড়া নজর, আর এইটুকু তোমার চোখে পড়ল না ? এ-সংসারে আছে বলে নলিনীর কি কোনোই সাধ-আহ্লাদ করতে নেই ?

আভা অতিশয় ভয়ে-ভয়ে কহিল : নলিনী এ ছবির কিছু বুঝত না।

মাসিমা গর্জন করিয়া উঠিলেন : না, কেবল একলা তুমিই বুঝেছ ! খবরদার, আমার নলিনীকে তুমি এমনি হেনস্তা করতে পারবে না।

আভা মনে-মনে ক্লান্ত, বিমর্ষ হইয়া উঠিল, তবু বিনীত অথচ স্পষ্ট ভাষায় সে কহিল : ওতে সব ইংরেজিতে কথাবার্তা, ও কিছুই বুঝতে পারত না। ওকে হেনস্তা করতে যাব কেন ?

তাহার এই স্পষ্টতাই রাজলক্ষ্মীর অসহ্য লাগে। সে বলিল : না বুঝলেই নিয়ে যেতে পার না এমন কি কথা আছে শুনি ? হেনস্তা করই না এ-কথা মানি কী বলে ? ওর সঙ্গে তুমি মেশো, দুটো কথা কও ?

মাসিমা ফোড়ন দিলেন : নলিনী যে ইংরেজি জানে না। তোর বৌ যে ইংরিজি ছাড়া কথা কয় না।

আভা ভিতরে-ভিতরে জ্বলিতেছিল, তবু শান্ত হইয়াই কহিল : ওর সঙ্গে মেশবার আমি অযোগ্য, মা। ও এই বয়সে যা-সব কথা বলতে শিখেছে তা এত বড় হয়েও আপনারা ধারণা করতে পারবেন না।

দুই বোন হাঁ-হাঁ করিয়া আসিল : কী, কী শিখেছে ও—যার সঙ্গে তুমি এঁটে ওঠো না ?

—সে-সব অত্যন্ত নোংরা বাজে কথা, তা আমি বলতে পারব না। মাসিমা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন : ডাক, ডাক নলিনীকে। কী এমন ও কথা বলে যা বলতে তোমার কালো মুখ বেগনি হয়ে যাচ্ছে।

আভা বলিল : ওকে ডেকে লাভ নেই, ডাকলেও আমি ওর সঙ্গে তা নিয়ে তর্ক করতে পারব না। ওর সঙ্গে এই জন্যেই আমি মিশতে পারি না যে বিবাহিত জীবন সম্বন্ধে অসঙ্গত কৌতূহল ছাড়া আর ওর কোনো কথা নেই। মাপ করবেন, এ-সব বলবার আমার ইচ্ছা ছিল না। ওকে ইস্কুলে পড়তে না দিয়ে খুব ভুল হয়েছে।

দুই হাত নাড়িয়া মাসিমা কহিলেন : ইস্কুলে পড়েই তো তোমার এই হায়া হয়েছে ! শাশুড়িদের মুখে লাথি মেরে সোয়ামিকে নিয়ে ধেই-ধেই করে খালি নাচতে শিখেছ। আমার নলিনীর সঙ্গে তোমার পোড়ারমুখের আর তুলনা দিতে এস না। বায়োস্কোপের ইংরিজি বুঝতে পেরেছ বলেই ভেব না তুমি নলিনীর চেয়ে খুব উঁচুয়

চলে গেছ। তার এমন প্যাঁচার মতো মুখ নয়, গায়ে সে আলকাতরা মেখে জন্মায়নি —বুঝলে? অমন ঢের বায়োস্কোপ সে দেখবে।

আভা তবুও কথা কহিবে: বায়োস্কোপের ইংরিজি আমিও সব বুঝিনি, মা, তবু নলিনী যে আমার অনেক ওপরে এ কথা আমি অস্বীকার করি না। বলিয়া সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

—দেখলে, দেখলে—দিদি ঘরের দিকে ইশারা করিয়া কহিলেন: ঐ যে রঙ্গ ঘরে এসেছে টের পেল, অমনি আলগোছে সরে পড়ল। ঘুঘু মেয়ে আবার নলিনীকে বলতে এসেছে পাকা। রঙ্গলালের উপস্থিতি অনুভব করিয়া রাজলক্ষ্মীর মন আবার আর্দ্র, আকুল হইয়া উঠিল। কহিল: আগে তাকে ঠেলে পাঠাতে পারতাম না, এখন তাকে ঘরে রাখাই দায় হয়েছে।

দিদি ঝাঁজালো গলায় কহিলেন: তার একখানা কী বাহনই যোগাড় করে দিয়েছিস।

সহসা সমস্ত সংসার রাজলক্ষ্মীর কাছে শূন্য, অবাস্তব মনে হইতে লাগিল। এই মুহূর্তে তাহার কোথাও কিছু আশ্রয় আছে বলিয়া বিশ্বাস হইল না। স্খলিত পায়ে রাজলক্ষ্মী উঠিয়া পড়িল। রঙ্গলালের ঘরের দিকে একটা বিষাক্ত, কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে আস্তে-আস্তে পান্নালালের ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

পান্নালাল কঠিন মনোযোগসহকারে খাতায় একটা আঁক কষিতেছিল। রাজলক্ষ্মী আসিয়া তক্তাপোশে বসিতে পান্নালাল মুখ না ফিরাইয়াই কহিল: দুঘণ্টা বাদে মা। এখন এই আঁকটা নিয়ে আমি ভারি ব্যস্ত আছি। দুঘণ্টার আগে তোমার সংসারের দরকারি সব নালিশ-পত্র আমার আদালতে পেশ হচ্ছে না, মা। তূষ্ণীং তিষ্ঠ। পান্নালালের কথায় কান না দিয়া রাজলক্ষ্মী আপন মনে গজগজ করিতে লাগিল: কেবল খরচ আর খরচ। তখন খুব গায়ে লাগত, এখন বৌ কিনা, তাই। এদিকে মা-ভাই যে শুকিয়ে মরছে তার খেয়াল নেই।

এমন সব কর্ণরোচক কথায় কেহ বেশিক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। পান্নালাল তাড়াতাড়ি বইখাতা সরাইয়া রাখিয়া মা'র দিকে চেয়ারটা ঘুরাইয়া লইল, চোখে তাহার দুষ্ট কৌতূহল। বলিল: বলো, বৌদির জন্যে কী আবার নতুন খরচ হল। শুনে রাখি। কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে না রাখলে পরে বিপদ আছে। বল।

রাজলক্ষ্মী কাছে সরিয়া আসিয়া নিম্নকণ্ঠে কহিল: এই ত্যাখ না বৌ নিয়ে বায়োস্কোপে গিয়ে এক মুঠো টাকা উড়িয়ে দিয়ে এল। অথচ নলিনীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে কী হয়েছিল? বৌ তো আর কচি খুকিটি নয়, নিজে মনে করেই তো ওকে নিয়ে যেতে পারত। দিদির কি রকম আজ লেগেছে বল দিকি। মা-মরা মেয়ে—

পান্নালাল বিস্মিত হইয়া কহিল : নলিনীকে নিয়ে যাবে কী ? সস্ত্রীক বায়োস্কোপ দেখার তাহলে মানে কোথায় ? বৌদি আর কচি খুকিটি নয় বলেই তো না নিয়ে গিয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে।

—কী যে বলিস ! এত টাকাই যখন যেতে পারল—

—তখন আর যেতে পারে না। তারপর ?

রাজলক্ষ্মী বলিল : তাই বলে খালি-খালি বৌকে নিয়ে এমনি বাবুগিরি করে টাকা উড়োবে নাকি ? আর পাঁচজনের দিকে চাইতে হয় না ?

পান্নালাল বলিল : মেজদা তো তবু পদে আছে, মা, আমার তো ওঁর প্রতি ভীষণ সহানুভূতি হয়। বিয়ে করে বড় জোর বাস-এ চেপে সিনেমায় যান। আমি তো বিয়ে করে বৌ নিয়ে এরোপ্লেনে হানিমুন্ করতে বেরুব।

রাজলক্ষ্মী স্তম্ভিত হইয়া কহিল : সে আবার কী ?

—সে একটা বিভীষিকা। শূন্যযান। মেজদার সামনে তো তবু পাঁচজন বলে কেউ আছে, আমার কাছে পৃথিবী বলেও কিছু থাকবে না। খালি আকাশ। বলিয়া পান্নালাল উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

মুখে-চোখে নৈরাশ্যের একটা ভঙ্গি করিয়া রাজলক্ষ্মী কহিল : এদিকে সর্বনাশটা যে তোরই হবে তার খেয়াল আছে ? ব্যাঙ্কে আর টাকা যাচ্ছে না—তোর বিলেত যাওয়াই বন্ধ হয়ে যাবে।

চেয়ারে গ্যাঁট হইয়া বসিয়া পান্নালাল বলিল : বাঁচা যাবে তাহলে। মেজদার এই একগুঁয়ে অভিভাবকত্ব থেকে কী করে ছাড়া পাব, মনে-মনে তারই ফাঁক খুঁজছিলাম, বিলেতের ভয়ে আমাকে হয়তো শেষে একদিন অন্য কোনো দেশে গিয়ে পালাতে হত—সমস্যাটা যদি এ-ভাবে এত সহজে সমাধান হয়ে যায়, তবে আমার ভাগ্য ভালো বলতে হবে।

রাজলক্ষ্মী বলিল : তাহলে বিলেত তুই যাবি না নাকি ?

—রক্ষে কর। গলায় একটা ফাঁস বেঁধে তুটো পাশ-বালিশের খোলে পা ঢুকিয়ে আমি ভূত সাজতে চাই না। আমার এই লম্বা কোঁচা ঢের ভালো, ইচ্ছে হল পা দিয়ে মাড়িয়ে-মাড়িয়ে ফুল-বাবুটির মতো গজেন্দ্র গমনে চল, ইচ্ছে হল মালকোঁচা মেরে চোঁচা ছুটে পালাও। খুঁটটি মেলে গায়ে জড়াও, রাস্তায় জল হলে দিব্যি হাঁটুর ওপর প্রমোশন দাও। একসঙ্গে এত সংক্ষেপ ও এত বিস্তারিত পোশাক সারা পৃথিবীতে কিছু আছে নাকি ? এই দেশ ছেড়ে আমি কোথায় যাব ?

—তোরও শেষকালে এই অধোগতি হবে ?

পান্নালাল হাসিয়া বলিল : শেষকালে নয় মা, আদিকালের। আর বিলেত

গেলেই বা কী উর্ধ্বগতি হতাম ? আমাদের দেশে কী নেই ? বড় হওয়ার দৃষ্টান্ত বল, পত্নিপ্রেম বল, গল্পের প্লট বল—কী তুমি এখানে না পাবে শুনি ? এই দিব্যি আছি, চিরকাল সহজ হয়েই থাকব। পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া হালকা হইবার ভান করিয়া সে কহিল : তুমি আমাকে বাঁচালে, মা। তোমাকে কী দিয়ে আমি খুশি করতে পারি ? বৌ এনে নয়, তোমার ভয় নেই।

আমার মনের মতো একটি এনে দিলে মন্দ কী ! রাজলক্ষ্মী হাসিল।

—তোমার আকাঙ্ক্ষা যে মিটছে না।

—তোর দিকেই তো আমি এখন চেয়ে আছি।

পান্নালাল হাসিয়া বলিল : তারপর কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ? তখন আমিও যে মহাব্যস্ত। দাঁড়াও, তার চেয়েও ভালো উপায় আছে। পরীক্ষায় আমি খুব ভালো রেজাল্ট করব মা।

—দিনে-রাত্রে তো কেবল আড্ডা দিয়ে বেড়াস। বৌ এলে বরং ঘরে মন বসবে।

—কিন্তু সে-ঘরে তোমার মন বসলে হয়। তারপর আমার বৌ। ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

তার মুখ-চোখের ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া রাজলক্ষ্মী হাসিয়া উঠিল।

পান্নালাল বলিল : আড্ডা দিয়ে বেড়ানোই হচ্ছে সাফল্যের প্রথম সোপান। আড্ডা দিয়ে-দিয়ে ভালো ছাত্রদের পড়া নষ্ট করে দিতে হয়। আঃ, বিলেত যেতে হবে না—ফোড়ায় ফোমেণ্ট করার মতো আরাম পাচ্ছি, মা। বাঁধা রাস্তায় বড় হতে হবে না—সে একটা মস্ত কথা। মৌলিক কিছু করব। যাক, অঙ্কটা এবার মেলাতে পারব মনে হচ্ছে। বলিয়া টেবিলের কাছে চেয়ার টানিয়া লইয়া পান্না খাতা-পেনসিল লইয়া মস্ত হইয়া উঠিল।

রাজলক্ষ্মী আরো খানিকক্ষণ নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল। অনেক কথাই তাহার মনের মধ্যে হাঁসফাঁস করিতেছে, তাহা সবিস্তারে বহুবিশেষণ-সংযোগে প্রকাশ করা গেল না বলিয়া তাহার অস্বস্তির অবধি রহিল না। পান্নালালের কাছেও তাহার ঠাঁই নাই—পান্নালালও তাহাকে বুঝিবে না।

আট

সকালবেলা চা খাইবার সঙ্গে-সঙ্গে রঙ্গলাল খবরের কাগজ পড়িতেছিল—এমন সময় মা'র তীব্র কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে ভাঙা প্যারাগ্রাফের মধ্যেই থামিয়া গেল।

কোথায় কোন অদৃশ্য প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষেই বোধ করি স্বরের উচ্চতা ক্রমশ বাড়িয়া যাইতেছে। ইহাকে ঠিক মা'র অন্যান্য শোকাবহ স্বগতোক্তির পর্যায়ে ফেলা সম্ভব মনে হইল না। রঙ্গলাল কান খাড়া করিয়া রাখিল। প্রতিপক্ষটি যে কে, সে এইবার স্পষ্ট বুঝিয়াছে। কেননা মা'র ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু স্বরের তীক্ষ্ণতার সঙ্গে-সঙ্গে আভার কথাও বেশ স্পষ্ট, উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে। অবশ্য কথাগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, মা'র সঙ্গে সমতা রাখিবার স্পর্ধাও তাহারা করিতে পারে না, কিন্তু এই সংক্ষিপ্ততাই কথাগুলিকে বেশি অর্থবান করিয়া তুলিতেছে। রঙ্গলাল স্পষ্ট শুনিতে পাইল কাটা-কাটা কথাগুলিতে ছুরির ফলার তীক্ষ্ণতা, বিদ্যুৎ স্ফুরণের দুঃসহ ঔজ্জ্বল্য, তাহাতে ভাবাকুলতার এতটুকু বাষ্প নাই। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া মাঝে-মাঝে যে দু-একটা কথা বলিতেছে তাহাদের ক্ষণস্থায়িত্ব মা'র একটানা, দীর্ঘছন্দী বিলাপের চেয়ে ঢের বেশি প্রখর, ঢের বেশি উলঙ্গ। স্বরগ্রামের উচ্ছৃঙ্খল উচ্চতায় সে না পারিলেও যুক্তিতে ও সত্যবাদিতায় সেই জয়লাভ করিবে এমনি আভার একটা উদ্ধত ভঙ্গি।

সমস্ত ব্যাপারটা আনুপূর্বিক অনুধাবন করিতে না পারিলেও যেটুকু তাহার কানে আসিল তাহাতে তাহার মন অত্যন্ত ক্লান্ত, বিরক্ত হইয়া উঠিল। তাহার পর মা এখন যাহা আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে এই ঔদাস্য অবলম্বন করাই প্রাণান্তকর পরিশ্রম মনে হইতেছে। তবু রঙ্গলাল খবরের কাগজের পৃষ্ঠার উপর দুই চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া ভারতবর্ষের অর্থ-সমস্যার জটিলতা পরিমাপ করিতে চেষ্টা করিল। কোলাহলের মুখে মৌনতা যে কত মুখর, কত কার্যকরী তাহা সে জানে।

কিন্তু আভা যে একেবারে চুপ করিতেছে না কেন?

আভাকে সে কতদিন বলিয়াছে মা'র কথার কখনো কোনো মুহূর্তে প্রতিবাদ করিতে পারিবে না। তাহা যতই রূঢ় হোক, অযৌক্তিক হোক, তবু তোমাকে তাহার কাছে—আমারই জন্য, একমাত্র আমারই জন্য—নির্বিবাদে বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। বড় আদর্শের জন্য এত মানুষ সহ্য করে, আর সে তাহার এই স্বামিপ্রেমের জন্য এই মিথ্যা সম্মানবোধের লাঞ্ছনা সহ্য করিতে পারিবে না? প্রতিবারই আভা স্বচ্ছন্দচিত্তে তাহার কাছে সেই কথা স্বীকার করিয়া যায়, কিন্তু ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া কোনোবারই সে নিঃশব্দ, নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না। কেন সে এমন অসহিষ্ণু?

রঙ্গলাল আভার এই অতিভাষণের নির্লজ্জতায় মনে-মনে আগুন হইয়া উঠিল। তাহার মা পুরাতন সংস্কার ও প্রথার প্রতিনিধি—তাহা সে জানে; তাঁহার কাছে যুক্তির চেয়ে ভাবের মাহাত্ম্য বেশি, স্বাতন্ত্র্যের চেয়ে গতানুগতিক তার মোহ

প্রবলতর—তাই বলিয়া আধুনিকতার অদম্য প্রাণস্রোতে সেই ভিত্তি এমন করিয়া টলাইয়া দিতে হইবে নাকি? তবু তিনি তাহাদের মা, সহানুভূতির দাবি না করিলেও তিনি সম্মানের অধিকারী। আভা কোন অধিকারের অহঙ্কারে তাঁহাকে অপমান করিবে, আঘাত দিবে? এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন, রূঢ়ভাষী, ব্যক্তিত্বলোভী মা'র অন্তরতম মহিমার কতটুকু ইতিহাস সে জানে? সংসারে উদার পটভূমি রচনা করিয়া মা'র বিস্তৃত বিরাজমানতার কী অপূর্ব সার্থকতা আছে তাহা সংকীর্ণ-কল্পনা-ক্লিষ্ট আভা কী বুঝিবে? সেই মা হোক নির্মম, হোক কটুকণ্ঠ, হোক ক্ষুদ্রবুদ্ধি—তবু তাহার শারীরিক অস্তিত্বটাই যে সংসার-যাপনের পক্ষে কী স্নিগ্ধতাময়, মিলনের উগ্রতার মাঝে কী সুন্দর অন্তরাল, তাহা আভা বোঝে না, তাই সে তাঁহাকে অপমান করিতে সাহস পায়। রঙ্গলালের ইচ্ছা হইল ঐ ঘরে ছুটিয়া গিয়া কোনো কথা জানিতে না চাহিয়া প্রবলকণ্ঠে আভাকে শাসন করে, তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া আসে—কিন্তু ঐ ঘরে এখন হাজির হইলেই কোলাহলের উপর দ্রুত যবনিকাপাত হইবে না। তাহা ছাড়া ঝগড়া থামাইবার চেষ্টা করিতে গেলে ঠিক যে কাহার পক্ষ নেওয়া হইবে সেটা নিজেই সে বুঝিতে পারিল না। আভাই তো তা বুঝিতে পারে। কথা একটাও না কহিলে কী এমন তাহার রাজ্যপতন হয়!

আভাকে সে কতদিন বলিয়াছে: এই বা কেমন কথা, তুমি মা'র মন পাবে না? তিনি অবুঝ হলেনই বা, মানুষ বনের পশু বশ করতে পারে, আর তুমি আমার মাকে বশ করতে পার না?

আভা বলিয়াছে: আমার সাধ্য মতো কোনো ত্রুটিই আমি করি না, কিন্তু আমি আমার গায়ের রঙ কী করে বদলাব বল?

—এ আমি বিশ্বাসই করতে পারব না, আভা। সেটা গোড়ায় থাকতে পারে, কিন্তু চোখে এখন তা সয়ে যাবার কথা—তুমি তোমার অপরাধের জন্য কারণ খোঁজ—ঠিক পেয়ে যাবে দেখ। তোমার এই কালো রঙের লাবণ্যে আমার মতো নিঃস্পৃহ সন্ন্যেসিকে পর্যন্ত ঘায়েল করলে—ও-কথা তোমার আমি মানব না, আভা।

আভা হাসিয়া বলিয়াছে: ওটাই তো আমার মস্ত অপরাধ. নিজে ইচ্ছে করে কালো মেয়ে বিয়ে করলে, তাতেও তুমি ক্ষান্ত হলে না, তাকে কি না ভালোবাসলে—কোথাও এতটুকু কৃপণতা করলে না। তারপর—

—বল।

—তারপর—আজও আমার মা হবার কোনোই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

রঙ্গলাল তাহার মুখে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিয়াছে: এ সব তো তাঁর দিক থেকে কথা হল, কিন্তু শত ঘৃণা-নিন্দা সত্ত্বেও তোমার কতখানি দায়িত্ব আছে তা

একবার ভেবে দেখেছ? তুমি নিজে থেকে তাঁকে আক্রমণ কর সেবায়, আরাধনায়, বাধ্যতায়, বিনয়ে। তাঁকে বন্দী করে রাখ তোমার অসহায় দুর্বল নির্ভরশীলতায়। পারবে না? ভাঙন-নদী পর্যন্ত শান্ত, স্তব্ধ হয়ে আসে, তাঁর নিষ্ঠুর শূন্যতার ওপরে তুমি চর হয়ে জেগে উঠে তাঁকে ভরাট করে দাও। এই সংসারে তাঁকে তুমি নতুন স্থান, নতুন রূপ দেবার সুযোগ তৈরি কর। তোমার এখন কত কাজ, কী অসীম কর্তৃত্ব। আর্টিস্টের মতো এ-সংসার তুমি সৃষ্টি করবে বলেই তো তোমাকে নিয়ে এসেছি। মা হচ্ছেন এই সংসারের পৃষ্ঠপট। আভা তাহার বুকে মুখ গুঁজিয়া অস্পষ্ট অসহায় স্বরে বলিয়াছে: আমার আর কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে।

কথা শুনিয়া রঙ্গলালের বুকটা ধক করিয়া উঠিয়াছিল। এই কথার আড়ালে কী ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে তাহা বুঝিতে আর বাকি ছিল না। অর্থাৎ আভা এমন জায়গায় যাইতে চায় যেখানে রঙ্গলাল ছাড়া তাহার আর কেহ নাই; সংসার যদি তাহাকে সৃষ্টিই করিতে হয় তবে সে আপন সংসার সৃষ্টি করিবে—আর্টিস্ট মাত্রেই সজ্ঞান, আত্মসুখপরায়ণ, স্বার্থসৌন্দর্যলিপ্সু। পরের রুচি সে প্রত্যাহার করে, পরের সমালোচনায় সে নির্বিকার। আভাও তাই পৃথিবীতে এমন একটি স্থান কামনা করে যেখানে কবির কবিতার মতো তাহারই একমাত্র রসগ্রহের আদিম ও অনন্যসাধারণ অধিকার থাকিবে। পরের কদর্থে কিছু আসিয়া যাইবে না।

রঙ্গলাল বলিয়াছে: যেখানে যাবে মাকে ফেলে যেতে চাও তো? আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে আশা করি, কিন্তু আমি মাকে ছেড়ে কোথায় কার কাছে গিয়ে থাকব?

আভা স্বামীর শিথিল আলিঙ্গন হইতে খসিয়া বালিশের উপর এলাইয়া পড়িয়াছে। কোনো কথা বলে নাই।

রঙ্গলাল আবার বলিয়াছে: আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ, আভা। তাকাও বলছি। মাকে তুমি ফিরিয়ে আনো। রঙের গৌরব নেই, কিন্তু অন্তরে তোমার কী ঐশ্বর্য আছে তা তো জানি। বল, পারবে?

স্বামীর মুখের দিকে ভীরু দুইটি চোখ তুলিয়া আভা বলিয়াছে—চেষ্টা করে দেখব।

কিন্তু এই তার চেষ্টা? কথার পিঠে কথা, হঠাৎ মাঝখানে সমাপ্তির রেখা টানিয়া তাহাকে অনর্থক তীক্ষ্ণ করিয়া তোলা। এবং সেই কথাগুলির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া আছে কত না জানি শানিত ভ্রূ-ভঙ্গি ও রূঢ় দৃষ্টি? কত না-জানি অহঙ্কার! রঙ্গলাল চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। কিন্তু খাড়া হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই সমস্ত ব্যাপারটার অপার তুচ্ছতা তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল।

সে ইহার মধ্যে গিয়া কী করিবে? কিন্তু ঐ, আভা আবার কী কহিতেছে। অসম্ভব! মাকে সে এই ভাবে অপমানিত হইতে দিবে নাকি?

কিন্তু পিছন ফিরিবার আগেই দ্রুত পায়ে আভা ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল। তাহার মুখ গম্ভীর, মেঘলা দিনের মতো থমথম করিতেছে. কপালের রগ দুইটা ফুলিয়া উঠিয়াছে—চোখে এতটুকু স্নিগ্ধতা নাই। রঙ্গলালের মুখে খানিকক্ষণ কোনো কথা আসিল না। আভা আশ্চর্য নির্লিপ্ততার সঙ্গে তাহার টেবিল গুছাইতে হাত দিল; যেন কোথাও কিছু অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটে নাই, আর ঘটিয়া থাকিলেও তাহাতে তাহারই জয় হইয়াছে। যদি সে এখন খাটের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কান্নায় ভাঙিয়া পড়িত— তাহা হইলেও তাহার ব্যবহারে খানিকটা লাবণ্য থাকিত —এই অপমানের জ্বালা মাকে এমন করিয়া নিঃশেষে পুড়াইয়া মারিত না। তাহার মায়ের এই পরাভবের বিজ্ঞাপনটা রঙ্গলালের কাছে অসহ্য লাগিল। কিন্তু কথা পাড়িতে গেলেই হয়তো আবার আগুন জ্বলিয়া উঠিবে।

রাজলক্ষ্মীর কথাটা তখনো শেষ হয় নাই, তাই এই দিকেই বোধকরি সে আসিতেছে। তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া সেই নির্লিপ্ত স্বরে আভা কহিল: তোমার সেই বইটা খুঁজে পেয়েছি, নিচের ঘরে ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটের মধ্যে পড়েছিল—

যেন রাজলক্ষ্মীকে শুনাইয়া বলা: আমার কিছুই হয় নাই—দিব্যি আমি আমার স্বামীর স্নেহাচ্ছাদনের মধ্যে চলিয়া আসিয়াছি। তাহার এই পরম নিশ্চিন্ত ভঙ্গিটা রঙ্গলালকেও অসহ্য পীড়া দিতে লাগিল। কর্কশ হইয়া কহিল: কেন তুমি সব সময় মা'র মুখের ওপর কথা কইবে? তোমাকে বলেছি না, চুপ করে থাকবে, প্রতিবাদ করতে পাবে না?

রাজলক্ষ্মী দুই পা আগাইয়া থামিয়া পড়িল। ছেলের শাসনটা তাহার মনঃপূত হইবে না জানে, তবু দেখা যাক; তাহার কথা এখনো শেষ হয় নাই। আভা চোখ তুলিয়া কহিল: সব সময়ে নয়। মুখ বুজে থাকবারও একটা সীমা আছে। এক-এক সময় পারি না, পারা যায় না, তুমিও পারতে না।

রঙ্গলাল ধমক দিয়া উঠিল: না, তোমাকে পারতে হবে।

—এ তোমার অন্যায় কথা। মানুষের শরীরকে অতিক্রম করা মানুষের সম্ভব নয়।

—কিন্তু মা তোমার গুরুজন নন? তাঁকে তুমি আঘাত দিতে যাও কোন লজ্জায়?

আভা বলিল: গুরুজন বলে মানি, মানতে আমার বাধা নেই, কিন্তু আমিও যে

স্নেহভাজন সেটা তিনি রাত্রি-দিন ভুলে থাকলে চলে কী করে? ক্ষমা করবার মহত্ত্ব তাঁরই বা কেন থাকবে না?

রঙ্গলাল শাসনের সুরে কহিল: চুপ কর। বাজে কথা বলতে হবে না!

—বেশ কাজের কথাই তবে শোনো। এই শাড়িটা পরনে দেখছ, সকালে উঠে স্নান করে পরে মা'র পূজার ঘরে গেছি টাটে ফুল সাজাতে। মা এসে তোমার নাম করে জিগগেস করলেন: 'এই শাড়ি আবার তোমাকে কবে কিনে দিল?' সঙ্গে অবিশ্যি আরো অনেক কথা। আমি বলবার মধ্যে শুধু বললাম: 'উনি কিনে দেননি বাবা দিয়েছেন।' সেই কথা তো মা বিশ্বাস করলেনই না, উল্‌টে বাবাকে যা-তা গালাগালি দিতে লাগলেন। আমি সব সহ্য করতে পারি, কিন্তু গরিব বলে বাবাকে এই—

কথা শেষ না হইতে রাজলক্ষ্মী ঘরের মধ্যে ছুটিয়া আসিল: তোমার বাবাকে কী খারাপ কথাটা বলেছি শুনি?

আভা তবু কথা কহিবে: সে-সব কথা মেয়ে হয়ে আমি মুখে আনতে পারব না।

রঙ্গলাল তাহার মুখের উপর গর্জন করিয়া উঠিল: চুপ কর বলছি।

রাজলক্ষ্মী বলিতে লাগিল: কেন বলব না শুনি? একশোবার চামার বলব। বলতে হয় বলে বলব। গায়ে যে একখানা গয়না ঠেকাল না, পুজোর-পাব্বনে যে একটা তত্ত্ব করে না, সে দেবে অমন শাড়ি কিনে? বিশ্বাস করলেই হল? আমি জানি না তোমার কীর্তি! সোয়ামিকে দিয়ে হপ্তায়-হপ্তায় নতুন-নতুন শাড়ি কেনাও আর চালিয়ে দাও—তোমার সই দিয়েছে। কি আমার সই রে!

আভা চুপ করিয়াই রহিল। কিন্তু কথা বলিল রঙ্গলাল: কেন মা, আর কথা বাড়াও? মেয়ের কাছে বাপের নিন্দে করাটা কি ঠিক?

—তুই তো তা বলবিই। তুই কি আর তোর বৌর দোষ দেখতে পাস? ও যে আমায় এত গাল-মন্দ করল সেইটে তুই দেখবি না? তুই আমার তেমন ছেলে হলে ওকে এক্ষুনি ঘাড় ধরে বাড়ির বার করে দিতিস। কী না বলেছে ও, পায়ের তলায় ফেলে থেঁতলে দিতে খালি বাকি রেখেছে। রাজলক্ষ্মী কণ্ঠ বিদীর্ণ করিতে লাগিল: বৌর দোষ দেখবি কেন? তাকে কিছু না বলে আমাকে তুই শাসাতে এসেছিস?

রঙ্গলাল নিরুপায় হইয়া কহিল: বেশ তো, তুমি শাসন করলেই তো পার।

রাজলক্ষ্মী গর্বিত ভঙ্গিতে কহিল: সেই অধিকার যদি আমার থাকত তো ঐ

হতচ্ছাড়িকে আমি এক্ষুনি বার করে দিতাম। আমি তো তোর মা নই, আমি তো তোকে পেটে ধরিনি, তাই আজ ও আমাকে যা-তা বলে পার পেয়ে যাচ্ছে—

আভার পক্ষে চুপ করিয়া থাকা আবার অসম্ভব হইল। দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—বেশ, আমাকে বাবার কাছে রেখে আসবে চল।

—বলতে লজ্জা করে না? রাজলক্ষ্মী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল: কী আমার বাপের বাড়ি রে! বাপ একবার আসে না তো দেখি জিগগ্যেস করতে। দুজনেই তো খালি ল্যা-ল্যা করতে-করতে যাস, আবার বলিস কিনা শাসন করতে? শাসন করবার পথ কিছু রেখেছিস নাকি? ইচ্ছে মতো শাড়ি ঘুরিয়ে বাপের বাড়ি যাচ্ছে, দু'বেলা এত খেয়েও আবার হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়াচ্ছিস, বায়োস্কোপ-থিয়েটার —কোনটা ওর বাদ পড়েছে শুনি! এর পর আবার শাসন চলে নাকি? কিছু বলতে গেলেই কেবল ফোঁস করে উঠে ছোবল মারে—আর মারবেই বা না কেন? তুই একেবারে ওকে মাথায় করে রেখেছিস—নইলে আজ যা আমার ও অপমান করেছে তা নিতান্ত তোর মা বলে আমাকে হজম করতে হল।

রঙ্গলাল বিরক্ত হইয়া কহিল: থামো মা, থামো। আর ভালো লাগে না।

—আমাকেই তো থামতে বলবি। আর আমাকে যে ও এত কথা শুনিয়ে দিলে তার কোনো প্রতিবিধান হবে না? আমার ওপর চোখ রাঙিয়ে ওকে কিনা তুই হোটেলে নিয়ে গিয়ে গেলাবি, পায়ের তলায় দোকান উজাড় করে দিবি? আর আমরা উপোস করে মরব?

আভা সেইখানে টিকিতে পারিল না। কথা না বলিতে পারাটা যে কী নিদারুণ শাস্তি তাহা মর্মে-মর্মে অনুভব করিয়া সে পলাইয়া গেল।

রঙ্গলালও ঈষৎ তপ্ত হইয়া উঠিল; কহিল: কী কতগুলি বাজে কথা বলছ, মা। তোমাকে যদি ও অন্যায় কথা বলে থাকে, তার নিশ্চয়ই তবে শাসন আছে, কিন্তু উঠতে-বসতে তুমিই বা ওর বাপ তুলবে কেন? কখনো তো একটু স্নেহ করতে দেখিনি।

মাসিমা এতোক্ষণে আড়ালে ছিলেন, এইবার সামনে আসিয়া কহিলেন: কথার ছিরি দেখ না একবার। বৌর বেলায় 'যদি অন্যায় বলে থাকে'—আর মা'র বেলায় একেবারে সরাসরি বিচার! কালে-কালে কতই আরো দেখতে পাব।

এই কথাটা ভীষণ কাজ করিয়া বসিল। দিদির এই অনাহূত সান্ত্বনায় রাজলক্ষ্মী একেবারে ভাঙিয়া পড়িল, কান্নায় গলিয়া গিয়া কহিল: ওকেই আমি দশ মাস দশ দিন পেটে ধরেছিলাম দিদি, ওকে আমি কত কষ্টে পড়ে মানুষ করেছি; আজ কিনা

বৌর হয়ে ও আমাকে এমনি অপমান করছে ? আমার চেয়ে বৌ-ই এখন ওর বড়, এই সংসারে আমার একটা ঝি-চাকরেরও সম্মান নেই।

রঙ্গলাল বলিল : কিছুই তোমাকে অসম্মান করা হয়নি, মা। রাত-দিন ধরে এই নোংরা কথা-কাটাকাটি আমার সহ্য হয় না। বলিয়া সে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

উপরে দুই বোনে মিলিয়া অনেক বিলাপ শুরু হইয়াছে, নিচের ঘরে আসিয়া পৌঁছিতেই তাহা স্পষ্ট হইয়া আসিল। রঙ্গলালের মন চতুর্দিকের এই জটিল আবেষ্টনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। পরিপার্শ্বের এই বিস্তীর্ণ অবরোধ হইতে মুক্তি পাইলে সে বাঁচিয়া যাইত বোধকরি। কিন্তু তাহার জন্য, তাহার চারিদিকে এই অবরোধ রচনা করিবার জন্য, মা'র প্রতি তাহার অশোভন কোনো অভিযোগ নাই, কেননা আভাই এই অবরোধকে মুক্তির চেয়েও সুস্বাদুতর করিয়া তুলিতেছিল এবং এই মা'র জন্যই আভাকে সে পাইয়াছে। কিন্তু প্রচ্ছন্ন কর্তৃত্বলাভের সংঘর্ষে সংসারে যে প্রতিদিন অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হইতেছে, সেই ছন্দোহীনতাই রঙ্গলালকে বিমর্ষ, ক্লান্ত, নিরাশ্রয় করিয়া তুলিল। কোথাও সে চলিয়া যাইতে পারিলে বাঁচে—যেখানে মা নাই, আভা নাই, জীবনের যেখানে কোনো মহৎ আকাঙ্ক্ষার কণামাত্র আলো পড়ে না।

মা'র প্রতি তাহার সমান শ্রদ্ধা, আভার প্রতি নূতন, পরিপূর্ণ, প্রচুর ভালোবাসা। দুইজনের কাছেই সে সমান কৃতজ্ঞ, সমান প্রার্থী। কিন্তু সংসারের পক্ষে যেইখানে তাহার কর্মাবসানের পর বিস্তীর্ণ শান্তির প্রয়োজন, সেইখানেই দুইজন বিরোধের বাক্যজালে সমস্ত আবহাওয়া কুণ্ঠিত, কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে এবং রঙ্গলাল দুইজনের কাজেই ভীষণ অসহায়। আভার প্রতি তাহার এতদিনকার প্রতীক্ষাতীক্ষ্ণ, স্বপ্নরঞ্জিত প্রেম অজস্র হইয়া উঠিতে পারে না ; মায়ের প্রতি তাহার শ্রদ্ধায় কোথায় যেন কৃত্রিমতা ধরা পড়ে। দুইয়ের মাঝে পড়িয়া সে যেন আর রঙ্গলাল নাই। অত্যন্ত চতুর, কৌশলী, কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। সুবিধাবাদী, দ্বিধাগ্রস্ত, অত্যন্ত ব্যবহারিক জীবন। কেবল অন্তঃসারহীন মৌখিকতা, কেবল জোর করিয়া ভদ্রতা বাঁচাইয়া চলা। দিনে-দিনে এ সে কী হইয়া পড়িতেছে ? মাত্র সাংসারিক সামঞ্জস্যে সুখ কোথায় ?

তবু সমস্ত রাগ তাহার আভার উপরে গিয়াই পড়িল। মানুষ হইয়া কেহই সমস্ত স্নায়ুদৌর্বল্য এড়াইয়া যাইতে পারে না, কিন্তু তাই বলিয়া সে তাহার প্রেমে কেন সেই অনৌদার্যকে ক্ষমা করিতে পারিবে না ? প্রেম যদি তাহার চরিত্রে দৃঢ়তা আনিয়া থাকে তো দাক্ষিণ্যের অভাব হইবে কেন ? এই যে সে মায়ের উপর রাগ

করিয়া নিচে চলিয়া আসিল, মা যে তাহার এই মিথ্যা পক্ষপাতিত্ব নিয়া অযথা শোক করিতেছেন, ইহাতে নিশ্চয়ই সে মনে-মনে খুশি হইতেছে। মা'র কাছ হইতে ছিনাইয়া আনিয়া রঙ্গলালের উপর এই আধিপত্যে সে খুব গর্বিত ; কোথাও তাহার এতটুকু দৈন্য নাই, ক্ষতি নাই—এমনি একটা কঠিন, নির্লিপ্ত ব্যবহার। তাহার মনোভাব সে বেশ বুঝিতে পারিতেছে। নারীমাত্রই ক্ষুদ্রস্বার্থলিপ্স, এবং সেই ক্ষুদ্র স্বার্থের অধিকারে অপরিমাণ স্ফীত হওয়াই তাহার স্বভাব। যাহা সে সহজে পায়, তাহার উপরেই তাহার জন্মগত দাবির একটা অতিকায় অহঙ্কার হয়, তাহা ছাড়া কিছু সে অর্জন করিবার জন্য সাধনা করে না। নহিলে মা'র নিকট হইতে তাহাকে এই প্রতিপদে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিয়া আসিতে তাহার এই সুগোপন চেষ্টা কেন ? এবং সেই চেষ্টায়, ঘটনাচক্রে, রঙ্গলালের প্রাণপণে অনিচ্ছায়ও যখন সে সামান্য সফল হয়, তখন সে মনে-মনে তৃপ্তিই অনুভব করে হয়তো। রঙ্গলাল কী করিতে পারে ? আভাকে ন্যায়াতিরিক্ত শাসন করিতে সে নিজেরই কাছে সায় পায় না, মাকে কিছু বুঝাইয়া বলিতে গেলে তো এই কাণ্ড। আভার নিজেরই তো সমস্ত দিক সহজ করিয়া গুছাইয়া নেওয়া উচিত—তাহার এই সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির অহঙ্কার রঙ্গলাল কিছুতেই সহ্য করিবে না। কিন্তু কী তাহার করিবার আছে ? দুজনকেই যে সে ভালোবাসে।

নয়

দিন এই ভাবে চলিতে পারে না। সামঞ্জস্যেরও একটা নিয়ম আছে, পরিমাণ আছে।

আজ ছুটির দিন পান্নালালের হঠাৎ চিংড়ি মাছের কাটলেট খাইবার শখ হইয়াছে। কথাটা সে বৌদির কাছেই পাড়িয়াছিল, কিন্তু গা পাতিয়া উত্তর দিতে গেল রাজলক্ষ্মী : ওরা কি আর তোর পছন্দমতো রান্না করবে নাকি ? ইচ্ছে হয়ে থাকে, পয়সা নিয়ে দোকান থেকে খেয়ে আয় গে।

পান্নালাল হাসিয়া বলিল : সেও তো দাদার ওরফে বৌদিরই পয়সা। বিশেষ আর কী লাভ হবে ?

—তবে কষ্ট করে রাঁধবে নাকি ভেবেছিস ?

—রাঁধলে তো বৌদিরও লাভ। পরে খেতে তো পারবেই, আগেও দুয়েকটা চেখে দেখবার সুবিধে হবে।

—ঐ চাখতেই জানে। রোজ-রোজ রঙ্গ ঠোঙায় করে বৌর জন্যে কত কি সব

খাবার নিয়ে আসে, তোকে দেয় দু'একখানা? নলিনীকে তবু যা দু'এক টুকরো দেয় বলে কথাটা কানে আসে। পান্নালাল কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলিল: ছি, ছি, বৌদি আমাকে বড্ড ঠকাচ্ছে তো? কিন্তু আমিও বৌদিকে কম ঠকাই না, মা। চীনে-সাহেবি হোটেলে গিয়ে আমি যে সব খাদ্য খাই, বৌদি তার নামও শোনেনি। শুনলে তুমি খুশি হবে কিনা জানি না কিন্তু পেটের মধ্যে তারা একদিন আশ্রয় পেয়েছিল জানলে হয়তো তুমিও আমাকে ছোঁবে না।

রাজলক্ষ্মী আভাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল: কী গো, বলি, মাছ আনতে দেবে নাকি?

আভা বলিল: এ আবার কী বেশি কথা!

—বেশি কথা তো নয়, কিন্তু ওকে তো একটিবারও তোমাকে জিগগেস করতে দেখি না: ঠাকুরপো, তুমি আজ কী খাবে? কী খেতে তুমি ভালোবাস? সোয়ামি-স্ত্রীতেই তো খালি পরামর্শ কর! সেই যে সেদিন রাত্তির বেলা কঁ্যাকড়া রান্না করলে, কই, পান্নাকে একবার বলেছিলে সে-কথা? ও কোথা থেকে কী-সব খেয়ে এসে সারা রাত উপোসই করে রইল।

আভা না বলিয়া পারিল না: খেয়েএলে আবার উপোস করে থাকে কী করে?

—তা তো পারে না জানি, কিন্তু তুমি বলেছিলে একবার? কঁ্যাকড়া খেতে ও কত ভালোবাসে।

পান্নালাল বলিল: কী যে বলো, মা। কত সব বৃহৎ-বৃহৎ প্রাণী ভক্ষণ করে এলাম, তার কাছে কীটাণুকীট এই কঁ্যাকড়া! আমার পছন্দ যে এতটা নেমে যায়নি সেটা বৌদি জানতে পেরেছে বলে তার পছন্দকেই তারিফ করছি। আর আমি মা, সর্বভুক। যাই বৌদি রাঁধতে দেয় তাইতেই যে কি করে আমার ভীষণ পছন্দ হয়ে যায়, সেইটেই অবাক করে।

রাজলক্ষ্মী নিচে সেই রান্না তদারক করিতে আসিল। পান্নালাল নিজে হইতে খাইতে চাহিয়াছে বলিয়াই সে সহসা উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে এবং মাছের ঘরের সমস্ত সংস্পর্শ হইতে সরিয়া আসিলেও আভার এই ব্যাপারে আজ কতখানি অবহেলা বা শৈথিল্য হইতেছে তাহাও তাহার খুঁটিয়া-খুঁটিয়া দেখা দরকার। কেননা পান্নালালের ফরমায়েসে কি তাহার তত গা হইবে? চাকর বাজার আনিয়াছে, সিঁড়ির একটা ধাপে বসিয়া রাজলক্ষ্মী তাহাই দেখিতে লাগিল। মাছগুলি মোটেই আশানুরূপ বড় হয় নাই—রঙ্গলালের নিজে বাজারে

যাইতে কী হইয়াছিল! না, বাজারে কী সে যায়, বৌ একবার বলিলে সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিত নাকি? তা, বৌ বলিবে কেন?

চাকর বলিতেছে, ইহার চেয়ে বড় মাছ বাজারে আজ উঠেই নাই—আনিবে কোথা হইতে? ইহারাই বা আকারে কম কিসে, চার-চারটিতে একেক সের করিয়া ওজন। চোদ্দ আনা করিয়া সের।

—তুই তো তা বলবিই। রাজলক্ষ্মী চাকরকে ধমকাইয়া উঠিল: তোকে যা শিখিয়ে দেবে তাই তো বলবি। ব্যাটা আবার পয়সার হিসেব দিতে এসেছে? সেদিন বৌর জন্মদিনে রঙ্গ যে চিংড়ি মাছ আনল, তার সের পাঁচ-সিকে করে ছিল না? ছোট দেখে আনতে বলে দিলে তুই কী করবি? তোর কী দোষ? নে, কুটে ফেল চট করে। ও ঠাকুর, একটু ভালো করে রেঁধো যেন—কারু কথায় পড়ে যা-তা গুচ্ছের ঝাল দিয়ে বস না।

আঁচলের খুঁটে বাজারের ফিরতি পয়সা বাঁধিয়া আভা উপরে উঠিতে যাইতেছিল. ইচ্ছা ছিল পান্নালালকে একবার নিচে পাঠাইয়া দেয়, মাছগুলির কাটলেট হইবার যোগ্যতা আছে কিনা সে নিজে আসিয়া দেখিয়া যাক্। কিন্তু ঠাকুরপোর কাছে কথাটা কী করিয়া পাড়িবে ভাবিতেই তাহার ভারি হাসি পাইল। তবু, উপরে উঠা দরকার, পয়সাগুলি বাক্সে রাখিয়া আসিবে—ভারি আঁচলে কাজ করিতে সুবিধা হইবে না।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখিয়াছে, মাসিমা টিপ্পনি কাটিলেন: ঐ চলল রঙ্গর কাছে নালিশ করতে।

রাজলক্ষ্মী বলিল: ঐ তো জানে। সাত-জন্মে এমন লাগানে মেয়ে দেখিনি কখনো।

আভার ইচ্ছা হইল বলে. উনি নিচের ঘরে বসিয়া আপিসের কি কাগজ-পত্র ঘাঁটিতেছেন, কিন্তু রান্নাবান্নার মধ্যে ব্যস্ত থাকিয়াও তাহার এই খবর রাখাটা শাশুড়িদের চোখে শোভন ঠেকিবে না। তাই সে কোনো দিকে না চাহিয়া নিঃশব্দে উপরে উঠিতে লাগিল! রাজলক্ষ্মীর বসিবার ধাপের কাছে আসিয়া সে থামিয়া পড়িল। তাহার পার হইবার এখনো যথেষ্ট জায়গা আছে বটে, তবু রাজলক্ষ্মী কিছুতেই সংকুচিত হইল না বলিয়া সে বলিল: একটু সরুন, আমি যাব।

রাজলক্ষ্মী কহিল: যাও না, তোমাকে কে ধরে রাখছে?

অত্যন্ত কুন্ঠিত হইয়া, শরীরের চার পাশে শাড়িটা সংযত করিয়া, অতি সন্তর্পণে, চোরের চেয়েও ভয়ে-ভয়ে আভা অতি কষ্টে সে ধাপটা পার হইল।

পরের ধাপে উঠিয়া সে শাড়িটাকে ছাড়িয়া দিয়া শরীরটাকে সবে একটুখানি বিস্তৃত করিয়াছে, অমনি রাজলক্ষ্মী চীৎকার করিয়া উঠিল: দেখলে, দেখলে দিদি, বৌ কেমন একটা আমাকে লাথি মেরে গেল?

আভার পা দুইটা পাথর হইয়া গেল, শরীরে কোথাও একটুও বশ রহিল না। তবু সে প্রাণপণ শক্তিতে রুখিয়া দাঁড়াইয়া কহিল: ও-মা কই আমার পা ঠেকল? আঁচলটা গুটিয়ে ধার দিয়ে কোনো রকমে উঠে গেলাম, বলে কিনা—

রাজলক্ষ্মী আর কোনো কথা না বলিয়া আঁচলের তলায় মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া উঠিল। মাসিমা চেঁচাইয়া কহিলেন: একবার দেখে যা রঙ্গলাল, তোর বৌর কীর্তিখানা একবার দেখে যা।

রঙ্গলাল তাহার বৈঠকখানা হইতে ছুটিয়া আসিল। ব্যাপারটার কিছুই সে বুঝিতে পারিল না। দেখিল আঁচলে মুখ চাপিয়া মা বসিয়া আছে, আর দুই ধাপ উপরে আভা নামিবে, না, উঠিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছে না। রঙ্গলাল বিরক্ত, চাপা গলার জিজ্ঞাসা করিল: কী, কী হল আবার?

মাসিমা কহিলেন: এই ভাখ না তোর বৌর কাণ্ড। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় পা দিয়ে তোর মাকে এক ঠোক্কর মেরে গেল।

—মিথ্যে কথা। আভাও সঙ্গে-সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছে: কক্খনো গায়ে তাঁর আমার পা লাগেনি। আমার আঁচল পর্যন্ত লাগেনি।

রাজলক্ষ্মী মুখ হইতে আঁচল সরাইয়া কহিল: মুখ খসে পড়বে। সেই পাম্না দুখানা কাটলেট খেতে চেয়েছে, তাতেই ওর চোখ-মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। কী দুমদাম করে চলা, কী গজগজানি! আমি এইখেনে বসে আছি, আমার মাথা ডিঙিয়ে যাবার ওর কি হয়েছিল! তারপর দিদিকে কিনা মিথ্যুক বলা!

মাসিমা ফোড়ন দিলেন: কত কী বলে—মুখে ওর কিছু বাধে নাকি? হাঁ করে ওখানে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী, রঙ্গ? আজ শাশুড়িকে লাথি মারল, কাল তোকে মারবে।

রঙ্গলাল কী করিবে, একেবারে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আভা বলিল: আপনিই তো আমাকে এখান দিয়ে তখন যেতে বললেন, আপনাকে বলেই তো পাশ কাটিয়ে গেলাম—

রাজলক্ষ্মী গর্জন করিয়া উঠিল: তাই যাবার সময় একটু চন্নামৃত দিয়ে গেলে—

উত্তরে আভা আবার কী বলিতে যাইতেছিল, রঙ্গলাল তাহার মুখের উপর

ছুঁড়িয়া মারিল : শিগগির নেমে এস বলছি। এক্ষুনি এসে মাকে প্রণাম করে তাঁর ক্ষমা চাও।

সেই প্রবল কণ্ঠের কাছে সবাই এক মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গেল।

আভা রেলিঙ ধরিয়া এই নিদারুণ শব্দের আঘাতটা সামলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু রঙ্গলাল আবার গর্জন করিল : নেমে এলে ? এস। মা'র পা ধরে ক্ষমা চাও এক্ষুনি। চাও। নইলে ভালো হবে না বলছি।

আভার চোখ-মুখ তাতিয়া উঠিয়াছে, তাড়াতাড়ি সে রাজলক্ষ্মীর পাশ কাটাইয়া তাহার সামনে, পরের ধাপটায় নামিয়া আসিল। শাশুড়ির সামনে নত হইয়া সে কহিল : গুরুজনকে প্রণাম করতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু যে-দোষ আমি করিনি, তার জন্যে আমি কক্‌খনো ক্ষমা চাইতে পারব না, এবং বলার সঙ্গে-সঙ্গেই সে রাজলক্ষ্মীর পা স্পর্শ করিয়া আবার উঠিয়া গেল।

রঙ্গলাল বলিল : দাঁড়াও।

আভা থামিয়া পড়িল।

—তোমার ক্ষমা চাইতে হবে।

আভা বলিল : কেন ? ওঁর গায়ে যখন আমার পা লাগেনি, তখন কেন আমি ক্ষমা চাইতে যাব ? এই তো উঠে এলাম, পা লাগতে পারে কখনো ?

রাগে রঙ্গলালের সমস্ত হাত-পা কঠিন হইয়া আসিল। আভার এই দুর্বিনীত, নির্লজ্জ ব্যবহার সে কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিবে না। ক্ষমা চাহিলে তাহার কী ক্ষতি হয়। কিন্তু কিছু বলিবার আগে রাজলক্ষ্মী তাহার জায়গা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রুক্ষ কণ্ঠে কহিল : তুমি লাগাওনি পা ইচ্ছে করে। আমি মিথ্যে কথা বলছি ? দিদি দেখেনি ওখান থেকে ?

দিদি পাশের ঘরের দরজার সামনে বসিয়া তরকারী কুটিতেছিলেন, বঁটি ফেলিয়া তিনিও উঠিয়া আসিলেন। বলিলেন : দেখলাম বৈকি।

আভা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল : আপনি ওখান থেকে দেখতেই পারেন না। আর আমিও কখনো মিথ্যে বলিনি। গলা বড় করে বললেই তা সত্যি হবে না।

রাজলক্ষ্মী রঙ্গলালের দিকে চাহিয়া বলিল : আমি মিথ্যেবাদী। আর তুই তোর বৌকেই বিশ্বাস করছিস।

—কক্‌খনো না। ও-ই মিথ্যে বলছে। আমি জানি ওকে। বলিয়া রঙ্গলাল সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিল। কহিল : শিগগির ভালো করে মা'র পায়ে পড়ে ক্ষমা চাও এক্ষুনি।

—আমি মিথ্যে বলছি ? আভা দুই চক্ষু তীক্ষ্ণ করিয়া স্বামীর দিকে তাকাইল।

—নিশ্চয়। তোমার মতো ছোট, নীচ, নির্লজ্জ কেউ আছে নাকি। শিগগির যাও, এক্ষুনি আমার কথা শোনো। মা কক্‌খনো মিথ্যে বলতে পারেন না। তোমাকে আমি জানি না? যাও!

আভা তবু চিত্রার্পিতের মতো স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যথিত কণ্ঠে কহিল: প্রণাম তো একবার করলাম—আবার কী! আমি যখন মিথ্যে বলিনি, তখন তার জন্যে আমি ক্ষমা চাইতে পারব না। বলিয়া সে চোখ নামাইয়া আঙুল খুঁটিতে লাগিল।

রঙ্গলালের সমস্ত প্রভুত্ব গর্ব হঠাৎ এক নিমেষে ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। নির্মম, পরুষকণ্ঠে কহিল: তবে তুমি আমার সামনে থেকে বেরোও। তোমার মুখ দর্শন করতে চাই না বুঝলে? যে আমার মাকে এমন অসম্মান করতে সাহস পায়, তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এখনো সময় আছে, এখনো তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও।

—কক্‌খনো না। বলিয়া আভা আঁচল ও ঘোমটা না সামলাইয়াই দোতলায় উঠিয়া গেল।

আর রঙ্গলাল কিনা ইহার পর কিছুই না করিয়া গম্ভীর মুখে আবার তেমনি নামিয়া আসিয়াছে! মা ও মাসিমার কাহারও মুখের দিকে সে তাকাইল না, একটিও কথা না বলিয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

রঙ্গলাল বুদ্ধিমানের মতো আভার পক্ষে ব্যাপারটা খুবই সহজ করিয়া তুলিয়াছিল। মাত্র একটা ক্ষমা চাওয়া। তাহা হইলেই রাজলক্ষ্মীর জ্বালাটা কিঞ্চিৎ মিটিত বটে। কিন্তু স্বামীকেও যখন এইরূপ অমান্য করিতে পারিল, তখন রঙ্গলালের উচিত ছিল তাহার পিঠে দুই ঘা বসাইয়া দেওয়া। লাথি দেওয়া হইয়াছিল কিনা তাহার সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দেওয়া। তাহা না করিয়া সে কিনা তাহার সমস্ত অধিকারে জলাঞ্জলি দিয়া মুখ ম্লান করিয়া নামিয়া আসিল। অন্য ছেলে হইলে কি এই অমানুষিক অপমান সহ্য করিত নাকি?

ঘণ্টা দুই পরে রঙ্গলাল যখন বাড়ি ফিরিল, দেখিল সমস্ত উপর-নিচ কেমন যেন থমথম করিতেছে। নিচে রান্না-বান্না সব ছিটানো, কাহারও খাওয়া হয় নাই, এখানে-সেখানে কোটা তরকারি পড়িয়া আছে। কিছু একটা বিভীষিকার সন্দেহ করিয়া রঙ্গলালের বুক কাঁপিয়া উঠিল। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার পর্যন্ত সামর্থ্য রহিল না। রাজলক্ষ্মী রঙ্গলালকে রাস্তা দিয়া আসিতে দেখিয়াছে। তাড়াতাড়ি সে নামিয়া আসিল, রঙ্গলাল তাহার দিকে ভীত, কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাইতেই

সে কহিল : এদিকে সর্বনাশ হয়ে গেছে, রঙ্গ। রঙ্গলালের ভিতর [illegible]— ঘুরিয়া উঠিল : কী?

—আর কী? যা তোর বউ, জাঁহাবাজ, বোম্বেটে মেয়ে। [illegible] আর শেষ আছে? কোনো শাসনে কখনো মানে? শাশুড়ি [illegible]

রঙ্গলাল উদ্‌ভ্রান্তের মতো কহিল : কী, কী করেছে সে?

—কী আবার করবে? কাউকে না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে।

—বেরিয়ে গেছে? রঙ্গলাল কতকটা যেন তবু আশ্বস্ত হইল।

রাজলক্ষ্মী কহিল : সারা বাড়ি তন্ন-তন্ন করে খুঁজলাম, কোথাও নেই। [illegible] সেই ফুল তোলা নাগরা-জোড়া নেই, আলনার ওপর সেই মাদ্রাজি চাদরটা খুঁজে পাচ্ছি না। নলিনী ওকে খানিক আগে ছাদে দেখেছে। [illegible] জিগগেস করবার সাধ্যি আছে নাকি?

রঙ্গলাল জিজ্ঞাসা করিল : একা-একা বেরিয়ে গেল?

রাজলক্ষ্মী মুখ বাঁকাইয়া কহিল : কে জানে? আর কারো সঙ্গে [illegible]— বেরিয়ে গেল কিনা তারই বা ঠিক কী? এ যে তোর লেখাপড়া জানা বৌ। [illegible] ছোঁয়ার যো নেই। তা, হতচ্ছাড়ি যেমন একবার এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, আর এ-বাড়িতে ঢুকতে পাবে না। কী সাহস! কী তেজ! সটান বাড়ি ছেড়ে চলে গেল!

রঙ্গলাল মনে-মনে সমস্ত জনারণ্য খুঁজিয়া আসিয়া কহিল : কিন্তু কোথায় যাবে?

—তা নিয়ে কে মাথা ঘামাতে বসেছে? পান্নাটা যেমন উজবুক, খবর পেয়ে তক্ষুনি খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু কোথায় ওকে পাবে শুনি? তলে-তলে ওর বদমাইসি [illegible] ওর মতলব। রাস্তা-ঘাট সব যে ওকে তুই চিনিয়ে দিয়েছিস [illegible] কখন কী বন্দোবস্ত করে রেখেছে—

রঙ্গলাল [illegible] দিয়া উঠিল : বাজে কথা কেন বলছ? কিন্তু বাড়ি-ঘর ভালো করে খুঁজে দেখেছ তো? কোথাও বিষ-টিষ খেয়ে পড়ে নেই তো?

রাজলক্ষ্মী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল : সেদিকে মেয়ে ভারি সেয়ানা। সোজা পথ সে মাড়াবে না। লেখা-পড়া শিখেছে যে। পেটে-পেটে যে অনেক বুদ্ধি।

রঙ্গলাল উপরে তাহার শোবার-ঘরে উঠিয়া আসিল। ঘরের চেহারা দেখিয়াই কেমন তাহার মনে হইল [illegible] গিয়াছে। আলনাটার একটা জায়গায় ফাঁক, জুতা এক-জোড়া কম, যাইবার আগে চুলটা যে একটু আঁচড়াইয়াছে চিরুনিতে তাহার চিহ্ন, চিরুনির মুখে সদ্য সিঁদুর লাগাইবার স্পষ্ট আভাস। ড্রেসিং-টেবিলের আয়নাটা একটু বাঁকানো, যাইবার আগে সামান্য একটু প্রসাধন করিয়া নিতে সে

ভোলে নাই। পথের লোকের অহেতুক সন্দেহ এড়াইবার জন্য তাহার রুক্ষতাকে মার্জিত করিয়া নিয়াছে। ড্রয়ারটা ধরিয়া রঙ্গলাল টান দিল। তাহার বাক্স্কিনের সেই মনিব্যাগটা এখানে ছিল—সেটাও সে নিয়া গিয়াছে, এবং তাহার উদর পূরণ করিয়া নিতেও সে কৃপণতা করে নাই। এমন দুঃখের মুহূর্তেও সে এত প্র্যাকটিক্যাল। কিছু টাকা না নিলে তাহার চলিবে কী করিয়া?

নিচে পান্নালালের গলার আওয়াজ পাইয়া রঙ্গলাল তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল: কী, কিছু খোঁজ পেলি?

রুমালে কপালের ও বুকের ঘাম মুছিতে-মুছিতে পান্নালাল কহিল: নিশ্চয় পেলাম। যা ভেবেছিলাম, তাই; বাপের বাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছে। গিয়ে দেখি, বৌদি রান্নাঘরে তার ভাই-বোনদের সঙ্গে দিব্যি ভাত খেতে বসেছে। আমাকে দেখে কী হাসি!

রঙ্গলাল বলিল: তুই কী বললি?

—কত সাধ্যসাধনা করতে লাগলাম, কিছুতেই এল না।

রাজলক্ষ্মী দাঁত খিচাইয়া উঠিল: তোকে সাধ্যসাধনা করতে কে বলেছিল? যে একা-একা স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যায়, তাকে আবার সোহাগ দেখানো! এল না! আসতে ওকে কে দিচ্ছে? মাসিমা টিপ্পনি কাটিলেন: সব তাতেই ওর বাড়াবাড়ি। একেবারে খোঁজ না নিয়ে এলে ওর চলত না!

রঙ্গলাল জিজ্ঞাসা করিল: তারপর?

পান্নালাল হাসিয়া বলিল: তারপর আর কী! আমাকে বৌদি খেয়ে যেতে বললে। দিব্যি মোচার চপ বেঁধেছে দেখলাম। না খেয়ে আর করি কী বল?

রাজলক্ষ্মী চীৎকার করিয়া উঠিল: ঐ বাড়িতে তুই ভাত খেয়ে এলি? নেমন্তন্ন করল না, কিছু না, খেতে তোর লজ্জা করল না?

—হ্যাঁ, লজ্জা করতে গেলেই হয়েছিল। এদিকে বাড়িতে কখন কী রান্না হয় কিছু ঠিক নেই। এক চিংড়ির কাটলেট খেতে চেয়েছিলাম বলে তো এই কাণ্ড! এগারোটা বাজে। ওদিকে টাটকা ভাজা মোচার চপগুলিও ছেড়ে দিয়ে আসি আর কি! খিদে আগে, না, নেমন্তন্ন আগে? বলিয়া পান্নালাল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দশ

রঙ্গলাল ভাবিয়াছিল আভা বেশিদিন এই স্বেচ্ছা-আরোপিত বিচ্ছেদের নির্বাসন সহ্য করিতে পারিবে না, সজল চক্ষে ক্ষমাপ্রার্থিনীর বিনীত ভঙ্গিতে আসিয়া এক

দিন উপস্থিত হইবে। কিন্তু তিনমাস কাটিয়া গেল, তবু তাহার ঔদ্ধত্যের এতটুকু নড়চড় হইল না।

সেই নাটকীয় ঘটনার পর দিনই অবশ্য তাহার বাবা রাজেন্দ্রবাবু আসিয়াছিলেন। তিনি মেয়ের হইয়া বেয়ান-ঠাকরুনের কাছে অনেক ক্ষমা চাহিলেন, কিন্তু সেই ক্ষমা চাওয়াইবার জন্য মেয়েকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতে পারিলেন না। রঙ্গলাল স্পষ্ট বুঝিল আভা তাহার দৃপ্ত ভঙ্গিটা কিছুতেই এতটুকু অবনত করিবে না। মনে-মনে সে নিদারুণ চটিয়া রহিল।

রাজেন্দ্রবাবু বলিলেন : অল্প বয়সেই ওর মা মারা যাওয়াতে সেদিক দিয়ে শিক্ষা ওর সম্পূর্ণ হয়নি। আপনিই ওর মাতৃস্থানীয়া—ওর দোষ-অপরাধ ক্ষমা করে না নিলে—

রাজলক্ষ্মী কর্কশ স্বরে কহিল : শিক্ষা হয়নি কী? উঠতে-বসতে ছোবল মারে, চিমটি মেরে কথা কয়—যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

—কিন্তু আপনারই তো পুত্রবধূ।

—রাখুন সে কথা। পুত্রবধূ বলেই তো বলছি। বেশি কথা বাড়িয়ে কিছু লাভ নেই, বেয়াইমশাই। আমার বৌ যখন একবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে, তখন এ-বাড়ির দরজাও তার মুখের ওপর বন্ধ হয়ে গেছে জানবেন। আমার ঐ এক কথা।

রাজেন্দ্রবাবু রঙ্গলালের দিকে চাহিয়া মিনতির সুরে বলিলেন :

তুমি বাবা কী বল?

রঙ্গলাল রূঢ়স্বরে বলিল : আমি আবার কী বলব? মা'র ওপর আমার আবার কোনো কথা আছে নাকি?

রাজলক্ষ্মী গর্বের হাসি হাসিয়া তাহার নির্লজ্জ তীক্ষ্ণতায় রাজেন্দ্রবাবুকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিল। রঙ্গলালের দিকে এমন ভাবে তাকাইল যে বেয়াইমশাই তাহার ছেলেকে একটা যা-তা যেন না ঠাওরান। সে মায়ের বুকের দুধ খাইয়া মানুষ হইয়াছে।

রাজেন্দ্রবাবু আবার কাকুতি করিয়া কহিলেন : কিন্তু তুমি নিষ্ঠুর হলে সে কোথায় যাবে, বাবা?

কথাটার উত্তর শুনিবার জন্য রাজলক্ষ্মী তীক্ষ্ণ চোখে রঙ্গলালের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। সেই দৃষ্টির প্ররোচনায় উদ্দীপ্ত হইয়া রঙ্গলাল বলিল : তাকে যেতেই বা কে বলেছিল? আর যখন সে একবার সবাইর মুখের ওপর দিয়ে এমন করে চলে যেতে পারল, তখন তার সঙ্গে আর কিসের সম্পর্ক?

রাজেন্দ্রবাবু আবার মুখ কাঁচুমাচু করিয়া হাত কচলাইতে লাগিলেন : তাকে,

বাবা, কিছুতেই আমি এখানে টেনে আনতে পারছি না। তুমি যদি একবারটি আমাদের ওখানে যাও, তবে অনায়াসেই ওকে ঠাণ্ডা করতে পার। তোমাদের জিনিস, অধিকারও তোমাদের।

রঙ্গলাল এইবার ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল : অধিকার যে আমাদের তা আমরা জানি এবং সে-অধিকার কী করে খাটাতে হয় তা কারো কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবে না।

রাজলক্ষ্মী বেয়াইমশাইর দিকে কুটিল ভ্রূভঙ্গি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ইহার পর আরো তিন-চারবার রাজেন্দ্রবাবু মিনতি করিতে আসিয়াছেন, কিন্তু আভার আসিবার কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই; মা-ও বারে-বারে তাহার সেই এক কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে। মা ও আভা কেহই একচুল বিচ্যুত হইতেছে না। মাঝখানে পড়িয়া রঙ্গলালই হাঁপাইয়া উঠিল।

গোড়ায়-গোড়ায় সে দুর্নিবার রোষে তাহার সমস্ত শরীর-মন কঠিন করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তাহার সমস্ত কর্ম ও অবকাশ উদাসীন শূন্যতায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু স্নেহে যদি সে অকৃপণ, নিষ্ঠুরতায়ও সে বলিষ্ঠ। আভার কিসের এই অহঙ্কার। কিসের মূল্যে সে এই বিরহের বিলাস সম্ভোগ করিতেছে? উচ্ছৃঙ্খল হঠকারিতায় এখনো সে তাহার মর্যাদা বুঝিল না, সামান্য একটা ক্ষমা চাহিলেই তাহার জীবনের সমস্ত সত্য যেন নিষ্প্রভ হইয়া যাইত।

আভার এই অশোভন বিদ্রোহ রঙ্গলালের মনে দিনে-রাত্রে তীব্র চাবুক মারিতে লাগিল। এমন করিয়াই তাহাকে সে অস্বীকার করিবে? অথচ তাহার আসিবার পথ সে কত প্রশস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। মৌখিক একটা ক্ষমা চাহিবার পরিবর্তে এই দূরে সরিয়া দাঁড়ানোই তাহার কাছে সহজ হইয়া উঠিয়াছে। জীবনে তাহার জন্য তাহাকে যেন কোনো দিন অনুতাপ করিতে হইবে না! আভা যে শেষ পর্যন্ত এত বোকাই রহিয়া যাইবে তাহা রঙ্গলাল বিশ্বাস করিতে পারিত না। সে ভাবিয়াছে কী? যেন রঙ্গলালের কিছুই করিবার নাই—মুখ বুজিয়া তাহাকে সকল অসৌজন্য সহ্য করিতে হইবে।

প্রতিশোধ নিতে রঙ্গলাল কী করিতে পারে, ভাবিতে গিয়া সে অস্থির হইয়া উঠিল।

কিন্তু—ইহাও ভাবিতে-ভাবিতে রঙ্গলাল অস্থির হইয়া উঠে—সেই-বা কিসের জন্য ব্যবধান রচনা করিয়া নিজেকে এমন অপূর্ণ, হতশ্রী করিয়া রাখিতেছে? জীবনে কোথায় তবে তাহার মূল্য রহিল? যে-প্রেমের জন্য এতদিন ধরিয়া প্রতীক্ষা

করিয়াছিল, তাহার এই মূর্ত আবির্ভাবকে সে কেন বরণ করিয়া নিবে না? জীবনে কোন মহত্তর স্বার্থের লোভে তাহার এই প্রায়োপবেশন! এ তপস্যা নয়, এ মাত্র একটা ঘটনা। সামান্য একটা ঘটনায় সেই বা কেন জীবনকে এমন কৃত্রিম, এমন অসত্য, এমন ভিন্নগামী করিয়া তুলিবে? প্রেমের কাছে কিসের তাহার সংসার, কিসের সামঞ্জস্য, কিসের লোকলজ্জা! সেই বা কেন আভাকে নিয়া আসিতেছে না?

কিন্তু, না, মূর্খ মেয়েটার জন্য মায়া করিয়া লাভ নাই।

বাপ তাহাকে লইয়া আসিবার জন্য কত সাধ্য-সাধনা করিতেছেন, তবু তাহার এতটুকু গোঁ কমিল না। কী অবাধ্য, কী দুর্বিনীত! রঙ্গলালই যেন গিয়া তাহাকে পায়ে ধরিয়া গাড়ি করিয়া বাড়ি লইয়া আসিবে! যত দায় যেন তাহারই একলার পড়িয়াছে। এই কথা যখন আবার মনে হয়, রঙ্গলালের সমস্ত শরীর ক্ষোভে ও অভিমানে কঠিন হইয়া উঠে। একটা দুর্দান্ত কিছু ঘটনা ঘটাইয়া আভার এই ঔদ্ধত্যকে ভাঙিয়া গুঁড়া করিয়া দিতে ইচ্ছা করে।

রাজলক্ষ্মী আবার তাহার হারানো জায়গা ফিরিয়া পাইয়াছে—অর্থাৎ রঙ্গলালের অর্থের আর এতটুকু অপব্যয় হইতেছে না। খাদ্যদ্রব্যের মশলা ও ঝালের পরিমাণ কমিতেছে, তাহার প্রার্থী আত্মীয়-স্বজনের ভাণ্ডারে গিয়া কিছু অর্থ জমা হইতেছে, তাহার হাত হইতে একটা-একটা করিয়া আভার চায়ের বাসন-কোসন-গুলি মেঝের উপর খসিয়া-খসিয়া পড়িতেছে। মাসিমা ও তাহাতে মিলিয়া এখানে-সেখানে পাত্রী দেখিয়া বেড়াইতেছেন, আর নলিনী এই সুযোগে দুই হাতে খাবলা মারিয়া-মারিয়া আভার স্নোর বাটিগুলি শেষ করিয়া ফেলিতেছে। পায়ে জুতা সামান্য বড় হইলেও তাহার কিছু আসে যায় না, এবং একদিন আভার সেই কেশোরাম-মিলের রঙিন শাড়িখানি পরিয়া সে তো রঙ্গলালকে দস্তুরমতো চমকাইয়াই দিয়াছিল।

একদিন অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পান্নালালকে সে জিজ্ঞাসা করিল: তোর না সেদিন গড়পারের দিকে কোথায় দরকার পড়েছিল—গিয়েছিলি নাকি?

লজ্জিত হইয়া পান্নালাল কহিল: না, যেতে পারিনি। যাব একদিন?

—কোথায়? না, না, কী দরকার? তুইও যেমন।

কিন্তু দরকার যে কত, তাহা পান্নালাল সহজেই বুঝিয়াছে। তাই সে একদিন গড়পারের দিকটা ঘুরিয়া আসিয়া রঙ্গলালকে নিভৃতে পাইয়া কহিল: বৌদিদিদের ওখানে গিয়েছিলাম, দাদা। বৌদিদি ভালোই আছেন।

রঙ্গলাল সমস্ত শরীর শ্রুতিমান করিয়া রাখিলেও ভঙ্গিটা এমন নিষ্ঠুর, নির্লিপ্ত করিয়া রাখিল, যেন এই সব খবরে তাহার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নাই।

আজ এইটুকু কথা। এইটুকু কথা বলিয়াই পান্নালাল অদৃশ্য হইয়া গেছে। বিস্তর—আরো অনেক কথা হইয়াছিল। সেই সব আভার ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক —সেই সব গর্বসূচক, অবমাননাকর কথা পান্নালাল দাদাকে বলিতে পারে না। পান্নালাল নিশ্চয়ই তাহাকে বাড়ি ফিরিয়া যাইবার জন্য বারে-বারে অনুরোধ করিয়াছে, কিন্তু তাহাতে কান দিতে গেলে যেন তাহার সতীত্বহানির কলঙ্ক লাগিত। এইটুকুর বেশি বলিয়া দিবার তাহার কথা নাই। এত অহঙ্কার তাহার কেন? যাহার রূপ নাই, যৌবন নাই, বিদ্যাবুদ্ধির ইহাই যাহার নমুনা, স্বামীকে যে বিমুখ করিয়া আসিল—কিসের জোরে সে এত অহঙ্কার করিতেছে! ছি, ছি, সে কিনা আবার তাহার খোঁজ নিতে পান্নাকে পাঠাইয়াছিল! কই, সে তো এক দিন সামান্য একখানা পোস্টকার্ডও লিখিল না।

লিখিবেই-বা কেন? রঙ্গলালের জন্য তাহার এতটুকু মায়া আছে নাকি? অসুখে পড়িয়া আছে শুনিলেও হয়তো একটিবার দেখিতে আসিবে না। তাহার জন্য অসুখ হইবার কথা মনে হইলেও রঙ্গলালের ভীষণ লজ্জা করে। আভা হয়তো ভাবিবে রঙ্গলাল অসহায় অবস্থায় পড়িয়া এখন তাহাকে ভিক্ষা করিতেছে। ভিক্ষা নয়, অধিকার। ইহা বোধ হয় আভার মনে নাই। এই অধিকারের প্রমত্ত অহঙ্কারে সে তাহার কী সর্বনাশ করিতে পারে, আভা নিতান্ত অন্ধ, তাই তাহা সে দেখিতে পাইতেছে না।

কিন্তু লজ্জার সেইখানেই শেষ ছিল না। রঙ্গলালও কিনা নিজে একদিন গড়পারের দিকে বাহির হইয়া পড়িল। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বাড়ির সদর দেওয়া, উনুনে সবে আগুন দেওয়া হইয়াছে বলিয়া প্রচুর ধোঁয়ায় গলিটা আচ্ছন্ন,—ভিতরে কতক-গুলি শিশুর সানন্দ কলকণ্ঠ শোনা গেল। রঙ্গলাল ইতি-উতি চাহিয়াও কাহারও এতোটুকু আভাস পাইল না। বা, এইদিকে বেড়াইতে-বেড়াইতে আসিয়া পড়িয়াছে মাত্র। এই গলিটা পার হইলেই সে বড় রাস্তায় পড়িবে। তাহার বন্ধু হরিহরের বাসাও তো এই পাড়ায়। তাহার সঙ্গে দেখা করিতেই সে আসিয়াছিল।

সে স্বামী, সে তাহার প্রভুত্ববোধকে কিছুতেই ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। রাত্রের খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বিছানায় শুইয়া-শুইয়া সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে অত্যন্ত গর্হিত, অত্যন্ত লজ্জাকর মনে [illegible] গিয়াছিল, কোনো ঘুলঘুলির ফাঁকে আভা তাহাকে লুকাইয়া দেখিয়া থাকিলে সে নিজেই তো তাহার এই দুর্বলতাকে মনে-মনে বিদ্রূপ করিবে। সে নিজে এতটুকু টলিল না, আর রঙ্গলাল কিনা উলটা হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সাধিয়া ক্ষমা চাহিতে [illegible] গেলেই বা কী ক্ষতি হইত? আর, যখন একবার মনের টানে সেখানে সে গিয়াছিলই, আরো দুর্বল হইয়া ভিতরে

ঢুকিয়া পড়িল না কেন? কিসের জন্য তাহাকে সে দূরে থাকিতে দিতেছে? কেন সে তাহাকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া আসিল না? কেন সে তাহাকে লইয়া এই সংকীর্ণ সংসারের প্রান্ত হইতে চুপি-চুপি পলাইয়া গেল না? আভার চেয়ে কাহাকে সে বেশি মূল্য দিতেছে—এবং সেই মূল্যে সংসারে সে কী লাভ করিল।

রঙ্গলাল মনে-মনে হাসিল, সে কিনা এত সহজেই বশ্যতা স্বীকার করিতে যাইতেছিল? ভাগ্যিস সে দরজা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে নাই। সে স্বামী, সে প্রভু, তাহার দীনতা সমাজ বা সংসার কেহই সমর্থন করিবে না।

বারান্দায় বসিয়া রাজলক্ষ্মী আর দিদি কথা কহিতেছিলেন। তাহারই কয়েকটা টুকরা রঙ্গলালের কানে আসিতেছে; রাজলক্ষ্মী বলিল: যাই বল দিদি, রঙ্গ কি আমার তেমন ছেলে? এতদিন ওর খপ্পরে ছিল বলে যা একটু বিগড়েছিল, নইলে ও আমার সেই রঙ্গই আছে, দিদি। মাকে অশ্রদ্ধা করতে জানে না।

দিদি সায় দিলেন: সোনার টুকরো ছেলে। কিন্তু বৌটার যাবার পর থেকেই মন কেমন উড়ু-উড়ু। তেমন সকাল-সকাল আর বাড়ি ফেরে না, মুখে আর টুঁ শব্দটি নেই।

—বা, আমার সঙ্গে তো সারাক্ষণই কথা বলে। তা, এমন দাগা দিয়ে বেরিয়ে গেলে মনে একটু না লেগে পারে? তা, দেখলে তো কেমন ছেলে, কর্তব্য থেকে একচুল নড়ল না। অন্য সব তোমার আজকালকার বৌ-ঘেঁষা ছেলে হলে তখুনি আঁচল ধরতে ছুটত। গর্ব করিনে দিদি, কিন্তু ছেলেদের আমি মানুষ করেছিলাম।

ইহাতেও দিদির সায় আছে: তা যা বলেছিস। মা'র সম্মানের জন্য ছেলের এই ধর্মজ্ঞান কই আজকাল আর দেখা যায়!

রাজলক্ষ্মী বলিল: ছেলের মন উড়ু-উড়ু কেনই বা হবে না বল?

বয়েসটাই বা ওর কত? আমি শিগগিরই তার ব্যবস্থা করছি, দিদি। ও-ভূত যে কাঁধ থেকে নেমেছে তাই ভগবানের আশীর্বাদ। দিদি ঘাড় নাড়িলেন: হ্যাঁ, পুরুষমানুষের আবার ভাবনা!

এগারো

তারপর একদিন রাজলক্ষ্মী ফাঁক-ফিকির সন্ধান করিয়া কথাটা রঙ্গলালের কাছে পাড়িয়া বসিল।

বলিল: তোর এই শুকনো মুখ আমি আর দেখতে পারি না, রঙ্গ। আমি এবার তোকে একটি ঘর-আলো-করা মেয়ে এনে দিচ্ছি। নিজে বাছতে গিয়ে কী

কেলেঙ্কারিটাই হল। এবার আমার ওপর ছেড়ে দে, আমার মতো শুভাকাঙ্ক্ষী তোর কে আছে?

রঙ্গলাল মা'র মুখের দিকে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

রাজলক্ষ্মী কহিল: এবার আর তোর লেখা-পড়া-জানা বিবি বৌ নয়, দিব্যি ছয়ছোট্ট গাঁয়ের মেয়ে—লক্ষ্মীশ্রী। দিব্যি মনের মতো করে গড়ে নিতে পারব।

মাসিমা ফোড়ন দিলেন: পাত্রীও প্রায় ঠিক আছে। আমাদের তেওটিয়া গ্রামেরই হরিনাথ মিত্তিরের মেয়ে। আমাদের দেখা এখন নিশ্চয় আরো সুন্দর হয়েছে।

রাজলক্ষ্মী কহিল: কি, মত আছে তো তোর?

এক কথায় রঙ্গলাল সম্মতি দিয়া বসিল: নিশ্চয়। তোমার মুখের ওপর আমি আর কখনো কথা বলবো নাকি? যা তুমি ভালো বোঝ, তাই করবে।

রাজলক্ষ্মী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। দিদির দিকে সগর্বে চাহিয়া কহিল: রঙ্গর মতো ক'টা ছেলে পৃথিবীতে তুমি দেখেছ, দিদি?

রঙ্গলাল বলিল: কিন্তু সতীনের ঘরে দিতে ওদের আপত্তি হবে না তো?

—কিসের সতীন? সে তো আর ঘর করতে আসছে না। যে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায়, সেই ভ্রষ্টাকে কে স্থান দিচ্ছে? আমি ভাবছি কী জানিস, রঙ্গ?

—কী?

—দিদিকে নিয়ে আমি একবার গাঁয়ে যাই। হরিনাথের মেয়ে হয়, ভালো, নইলে আরো দুটো-চারটে দেখে-শুনে আসি।

রঙ্গলাল বলিল: মন্দ কী!

মাসিমা কথাটা বিশদ করিলেন: কলকাতায় যা দু'একজন দিশি লোক জানি, তারা এই ব্যাপারের পর সহজে কেউ মেয়ে দিতে রাজী হবে না। জানাজানি হতে তো কিছু বাকি নেই! গাঁয়ে সেটা এখনো ছড়ায়নি।

—কিন্তু জানতে তো একদিন পারবে।

—তাতে বয়ে গেল।

রাজলক্ষ্মী কহিল: মেয়ের তো তাতে কিছু ক্ষতি হচ্ছে না। অনেকে জেনেও সেধে দিতে চাইবে। এমন ছেলে পাবে ক'টা শুনি? বিয়ে করে লোকের একদিন উপকার করবি বলছিলি না? এবারই সত্যি উপকার হবে।

রঙ্গলাল হাসিয়া বলিল: কিন্তু ভেবে দেখছি উপকার হবে সব চেয়ে বেশি আমার।

—হ্যাঁ, মা হয়ে আমি আর তোর এই কালো মুখ দেখতে পারছি না।

যাক গে, তেওটিয়া গিয়ে দিদির সঙ্গে শিগগিরই আমি একটা বন্দোবস্ত করে ফেলছি। তুইই নিয়ে চল না আমাদের—একেবারে তুইও দেখে-শুনে পছন্দ করে আসবি।

রঙ্গলাল গম্ভীর হইয়া কহিল: আমার এখন ছুটি কোথায়? আর, আমার পছন্দ!

রাজলক্ষ্মী বলিল: তবে অন্য কোনো একটা চলনদার দেখতে হবে। লোকজন, কি বড় জোর গোয়ালন্দের স্টীমারে চাপিয়ে দিলেই চলবে, বাকি রাস্তাটা আমরা ঠিক চলে যেতে পারব। কী বল, দিদি?

মাসিমা সায় দিলেন: অনায়াসে। লোকই বা লাগবে কী করতে? আমাদের কাউকে কিছু বলে দিতে হবে না।

রঙ্গলাল বলিল: না, সঙ্গে একজন লোক নিতে হয় বৈকি। সে আমি ঠিক খুঁজে বার করতে পারব। সঙ্গে মাল-পত্র থাকবে, টাকা-কড়ি থাকবে—

—নিশ্চয়, লোক একটা দরকার হবে বৈকি। আমরা তো আর হাল-ফ্যাশানের মেয়ে নই।

মাসিমা ঘাড় নাড়িলেন: তা বলেছিস ঠিক। তা ছাড়া রঙ্গলালের মা আর মাসি। তাদের ঐশ্বর্য কম কিসে?

রঙ্গলাল জিজ্ঞাসা করিল: নলিনীকেও তো সঙ্গে নেবে?

—হ্যাঁ, ওকে কোথায় রেখে যাব?

রাজলক্ষ্মী কহিল: তবে আমার চিঠি পেয়েই ছুটির জন্যে একটা দরখাস্ত করে দিবি। যত বেশি পাস।

রঙ্গলাল বলিল: তা, আমার মন্দ পাওনা হয়নি।

—হ্যাঁ, যেমন লিখব সেই বুঝে ছুটি নিবি। আমি অবিশ্যি কলকাতায়ই বিয়ে দেবার চেষ্টা করব। কিন্তু বলা তো যায় না। হয়তো দেখব অবস্থা ভালো নয়, কলকাতায় আসার খরচ কুলিয়ে উঠতে পারবে না। সেই ক্ষেত্রে গাঁয়েই বিয়ে দিতে হবে। এবার আমি জাঁকিয়ে উৎসব করব, রঙ্গ। ষোড়শীকে এবার ফেলতে পারব না। এবার তো আর শাঁকচুন্নি ঘরে আনছি না। আর আমার লজ্জা কিসের?

—তা, যা তুমি ভালো বোঝ, তাই করবে। গাঁয়ে হলেও আমার আপত্তি নেই। তা, কবে তোমরা যেতে চাও?

রাজলক্ষ্মী কহিল: যত শিগগির হয়। একজন চলনদার যোগাড় করে দে। পান্নাটাও এ-সময় বাড়ি নেই—গেছেন তাঁদের কলেজের হয়ে দিল্লিতে ক্রিকেট খেলতে।

মাসিমা বলিলেন : ও থাকলে আমাদের নিয়ে যেত নাকি ভেবেছ ?

—না নিয়ে গেলেও রঙ্গকে সাহায্য করতে পারত ! ধর, তেওটিয়াই যদি বিয়ে হয়, তবে রঙ্গকেই একলা সব অধিবাসের জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যেতে হবে তো ? দুভাই ভাগাভাগি করে কেনাকাটা করে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়তে পারত। না, যত শিগগির হয়, রঙ্গ। তোর দুঃখ আমি আর দেখতে পারি না।

মাসিমা ঘাড় হেলাইয়া বলিলেন : পুরুষমানুষের আবার দুঃখ ! স্বর্গ-মর্ত মন্থন করিয়া রঙ্গলাল চন্দনদার যোগাড় করিয়া আনিল : আমাদের সেই বৈদ্যনাথ, মা— একসঙ্গে ইস্কুলে পড়তাম, যামিনী দত্তর ছেলে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কই সে ?

—সেই তোমাদের নিয়ে যেতে রাজী হয়েছে।

রাজলক্ষ্মী ভাঁড়ার-ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল : বেশ কথা, ও এখানে চাকরি খুঁজতে এসেছিল শুনেছিলাম ! নিয়ে এলি না কেন ?

—আসবে'খন বিকেলে। চাকরি এখনো একটা পায়নি। আমিও চেষ্টা করছি। তোমাদের পৌঁছে দিয়ে ও চলে আসবে। তারপর আমিই তো যাচ্ছি।

মাসিমা বলিলেন : হ্যাঁ, পরের উপকার একটু-আধটু করতে হয় বৈকি। কী কষ্টে লেখা-পড়া শিখেছে।

রাজলক্ষ্মী বলিল : তবে পাঁজি দেখে দিন একটা ঠিক কর কাছাকাছি।

রঙ্গলাল ব্যস্ত হইয়া বলিল : এর আবার দিন দেখবে কী ? আজকেই বেরিয়ে পড় না। হাঙ্গামাটা কোথায় ?

মাসিমা হাসিয়া বলিলেন : ছেলের এখন যে আর তর সইছে না। দেব, দেব, রাঙা টুকটুকে বৌ এনে দেব এবার।

রাজলক্ষ্মী বলিল : তা কী করে হয় ? যাচ্ছি একটা শুভকর্মে, ভালো দিন বেছে রওনা হতে হবে বৈকি।

রঙ্গলাল তক্ষুনি পাঁজি দেখিতে উঠিয়া গেল।

দিদি বলিলেন : বাছার বুকটা একেবারে থাক করে দিয়ে গেছে।

আরেকটা আশ্রয় না পাওয়া পর্যন্ত ও টিকতে পারছে না।

দাঁতে-দাঁতে ঘষিয়া রাজলক্ষ্মী কহিল : থাক এবার আমি করাচ্ছি। দেমাকি এবার বুঝবেন।

আজ ভালো দিন—সন্ধ্যা হইতেই অমৃতযোগ। রাজলক্ষ্মী আর মাসিমা বাঁধা-ছাঁদা নিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আভার চুলের কাঁটাটি হইতে শূন্য কৌটা, সাবানের

বাক্স, যাহা যেখানে পাইল নলিনী কোঁচড় ভরিয়া তুলিয়া লইল। পায়ে বড় হইলেও জুতা-জোড়ার মায়াও সে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিল না।

পান্নালালের ঘরটা তালাবন্ধ—চিঠি দিয়াছে শীঘ্রই সে আসিতেছে। রাজলক্ষ্মীদের ঘরেও তালা পড়িল। খালি রঙ্গলালের ঘরটা খোলা। নিচে নিরিমিস্যি ঘরেও শিকল আঁটা হইয়াছে। অতিরিক্ত বাসন-পত্র, বাক্স-ট্রাঙ্ক রাজলক্ষ্মীদের ঘরেই সম্প্রতি মজুত রহিল। পরে আবার সব তাহাদের জায়গা করিয়া দিতে হইবে।

সন্ধ্যায় রঙ্গলাল বাহির হইয়া যাইবার পরই বৈদ্যনাথ আসিয়া হাজির। খাওয়া-দাওয়া সে এখানেই সারিয়া নিল। কিন্তু রঙ্গলাল এখনো ফিরিতেছে না। ফিরতি-মুখে তাহার ন'টার আগে একেবারে গাড়ি নিয়া আসার কথা। এখন ন'টা তো প্রায় বাজে। জিনিসপত্রগুলি বৈঠকখানা ঘরে চাকর নামাইয়া আনিয়াছে, জলযোগ সারিয়া রাজলক্ষ্মীরা কখন হইতে প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছে। কিন্তু এখনো তাহার ফিরিবার নাম নাই। রাজলক্ষ্মী অস্থির হইয়া বারে-বারে ঘর বাহির করিতে লাগিল। টাকা-পয়সা অবশ্য রঙ্গলাল তাহাকে আগেই সব বুঝাইয়া দিয়াছে, টিকিটের টাকাটা আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া সেমিজের তলায় সে চালাইয়া দিয়াছে—বাকিটা তাহার পেট-কাপড়ে বাঁধা। চলিয়া যাইবার তাহার কোনো বাধা নাই, কিন্তু যাহার জন্য যাওয়া তাহার সঙ্গে দেখা না হইলে চলে কি করিয়া? তাহার উপর সে গাড়ি লইয়া ন'টার আগে আসিবে বলিয়া গিয়াছে।

খানিক পরেই সদর দরজার কাছে রাস্তায় মোটরের হর্ন বাজিয়া উঠিল। রঙ্গলালই আসিয়াছে—হ্যাঁ, স্পষ্ট রঙ্গলালের কথা শোনা গেল: হ্যাঁ, শেয়ালদায় যেতে হবে। ঢাকা মেইল। ঘুমা লাও। নলিনী আহ্লাদে ডগমগ হইয়া কহিল: নতুন বৌ আসবে শুনে মামা ফুর্তি করে একেবারে মোটর নিয়ে এসেছে। ঠেসে হাওয়া খাওয়া যাবে, দিদিমা!

দিদিমা শাসনের সুরে কহিলেন: আলোয়ানটা মাথার ওপর দিয়ে ভালো করে জড়িয়ে নে। যা শীত পড়েছে ক'দিন থেকে।

মোটা লুইটা গায়ের উপর ভালো করিয়া চাপাইতে-চাপাইতে রাজলক্ষ্মী গদগদ হইয়া কহিল: আমার রঙ্গর কর্তব্যবুদ্ধি একবার দেখ, দিদি। দেরি হচ্ছিল বলে কত কি ভাবছিলাম, কিন্তু একেবারে ট্যাক্সি নিয়ে এসেছে। হু-হু করে পৌঁছে যাব। বদ্যিনাথ কোথায়?

রঙ্গলাল বৈঠকখানায় আসিয়া হাঁক পাড়িল: কই রে, রামা কই রে? মালগুলো তুলে দে চট করে ট্রাঙ্কটা আগে মাথায় চাপিয়ে দে—বড় বিছানাটা ড্রাইভারের পাশে, ছোট ট্রাঙ্কটা ওপরেই ধরবে—আরেকটু বাঁয়ে করে নে, এই,

কই, তোমরা এস। তা, বেশ সময় আছে বভিনাথ, কী বল? বেশ হুঁসিয়ার হয়ে যেয়ো।

রাজলক্ষ্মী বলিতে-বলিতে আসিল : খাবারের ঝুড়িটা যেন রামা না ছোঁয়। যা নলিনী, ওটা তুই পাশে নিয়ে বস গে।

কিন্তু ঘরের মধ্যে পা দিয়াই সে হতবাক, স্তব্ধ হইয়া গেল। পায়ের নীচে সিমেণ্ট-করা মেঝেটা যেন কাদার মতো ডুবিয়া যাইতেছে। দরজার পাশে কুণ্ঠিতকায়, আপাদমস্তক র‍্যাপার মণ্ডিত, নিস্পন্দ মূর্তিটার দিকে ইঙ্গিত করিয়া নিষ্প্রাণ, শুষ্ক কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল : ও কে?

রঙ্গলাল ব্যস্ত অথচ স্বচ্ছন্দ গলায় কহিল : ও আভা। বৌকে নিয়ে এলাম, মা। তোমরা চলে গেলে একা-একা কী করে এ বাড়িতে থাকব? হ্যাঁ, উঠেছে তো সব? বভিনাথকে টিকিটের টাকা বুঝিয়ে দিয়েছ তো? ও কি আভা, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? মাসিমার সঙ্গে মা তেওটিয়া বেড়াতে যাচ্ছেন। প্রণাম কর। নলিনী তো আগেভাগেই গাড়িতে উঠে বসেছে।

গাড়ির মধ্য হইতে নলিনী বলিল : এটা যে দিদিমা, বন্ধ মোটর। তোমরা উঠে এস শিগগির। বা, বা, ভেতরে যে আবার আলো জ্বলে, দিদিমা!

আভা নিঃশব্দে নতজানু হইয়া প্রাণপূর্ণ ভক্তিতে রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম করিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল। মাসিমাকেও।

রঙ্গলাল কোনো দিকে না চাহিয়া অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিল : স ন'টা হল প্রায়। আর দেরি কোরো না, বভিনাথ। তোমাকে আরো কুড়িটে টাকা আমি একস্ট্রা দিচ্ছি। বেশ সাবধানে ওঠা-নামা করাবে, কুলির পেছনে ধাওয়া না করে এদের সঙ্গে-সঙ্গে থাকবে। দেখ মা'র যেন কোনো অসুবিধে না হয়! ছুটি পেলে আমরাই একবার বেড়িয়ে আসব তেওটিয়া। কী রে নলিনী, খাবারের ঝুড়ি আঁকড়ে বসে আছিস? তোর কিন্তু একজনের কোলে বসতে হবে, নইলে জায়গা হবে না। কী রে, তোর মামিমা এসেছে, দেখলি না?

তাহার মামিমা ফিরিয়া আসিয়াছে সেটা তাহার কাছে বিশেষ নির্ভাবনার কথা নয়, কেননা সে তাহার বাক্স-দেরাজ সমস্ত ফাঁক করিয়া আসিয়াছে। তাই সে বিশেষ উতলা হইয়া কহিল : কিন্তু তোমার তা হলে আর বিয়ে হল না, মেজমামা?

রঙ্গলাল হাসিয়া বলিল : বিয়ে না হলে তোর মামিমাকে পেলাম কোথায়? তোর স্বামীকে তুই ক'টা বিয়ে দেওয়াবি?

এতক্ষণে রাজলক্ষ্মী গলায় কথা পাইল। কঠিন অথচ করুণ কণ্ঠে সে কহিল : বৌকে এনে আমাকে তুই এমনি করে আজ তাড়িয়ে দিলি, রঙ্গ?

রঙ্গলাল বিবর্ণ, বিমর্ষ হইয়া কহিল : ও-কথা মনেও এনো না, মা। তোমাকে তাড়াব কী ? যখন খুশি তুমি আসবে, তোমার স্থান, তোমার রঙ্গলাল-পান্নালাল, তোমার আভা—তার থেকে কে তোমাকে বিচ্যুত করে ? ওঠ মাসিমা, আর সময় নেই। দাঁড়াও প্রণাম করে নিই।

মাসিমা রোয়াকে নামিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে রাজলক্ষ্মীও আসিল। তাহার পায়ের তলায় মাথা নোয়াইয়া রঙ্গলাল ডাকিল : মা।

রাজলক্ষ্মী বলিল : আমি তোর কে ? আমি তোর কেউ নই। বলিতে-বলিতে তাহার দুই চোখ ছাপাইয়া অজস্র অশ্রু নামিয়া আসিল : বৌই তোর সব। তোর মা'র চেয়েও বড়।

রঙ্গলাল ফের ব্যস্ত হইয়া উঠিল : তোমাকে একটু কষ্ট করেই বসতে হবে, বদ্যিনাথ। শীতকালে ঘেঁষাঘেঁষিতে বিশেষ কষ্ট হবে না। এ তোমার কী ফ্যাশান, কোটের নিচে অর্ডিনারি একটা শার্ট। কী বেজায় শীত, খেয়াল আছে ? নাও, আমার এই র‍্যাপারটা নাও। নইলে মারা যাবে যে। লোজঙে যদি পার, নেমে একটা টেলিগ্রাম করে দিয়ো। ভারি ব্যস্ত হয়ে থাকব। তোমার সেই ওষুধটা নিয়েছ তো মা ? টাকার দরকার হলেই লিখবে। ছুটি পেলেই আমি আভাকে নিয়ে একবার তোমাদের ওখানে যাব, মাসিমা। আভা এখনো পদ্মা দেখেনি। বাঙালী মেয়ে কখনো পদ্মা দেখেনি ভাবতে পার ? পান্নাকেও নিয়ে যাব, মা। দিল্লিতে খেলায় ও নাকি দুটো সেনচুরি করেছে। বিলেত যাওয়া ওর সার্টেন।

রঙ্গলালের সঙ্গে-সঙ্গে আভাও নিচে নামিয়া মোটর ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই চক্ষু সজল, মুখখানি বিষাদে অতি স্নিগ্ধ ও করুণ।

মাসিমা পাশে বসিয়াছিলেন। হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া হঠাৎ আভার মাথার উপরে রাখিলেন। স্নেহবিগলিত কণ্ঠে কহিলেন : যাবার আগে তোমাকে কী আর বলে যাব, মা ? জন্ম-জন্ম স্বামী-সোহাগিনী হও।

ইন্দ্রাণী

॥ ১ ॥

পাড়ার কোন একটি চেনা মেয়ে ঘোড়ার গাড়ির জানলার পাখি তুলে জলজ্যান্ত দিনের আলোয় শহরের রাস্তা দিয়ে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলো বলে রাজীবলোচন তার নামে কি কীর্তিটাই সেদিন রঠিয়েছিলো ; ঘোমটার তলা থেকেও মেয়েরা যদি চোখ চাইতে থাকে, তবে দেশের আর উচ্ছন্ন যেতে বাকি কি ! তারপর তার ছোটো বোন দশ বছরের ভুনি যেদিন পাশের অমৃতদের বাড়ি গিয়ে তার নতুন কেনা সিঙ্গল-রিড হার্মোনিয়ামের একটা চাবি টিপে হঠাৎ মনের আনন্দে বলা-কওয়া-নেই মুখব্যাদান করলে, রাজীব সেদিন নিতান্ত মেয়ে বলেই তার মাথাটা গুঁড়ো করে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেয়নি। তার একগোছ চুল উঠে এসেছিলো হাতের মুঠোয়, ডান কানের মাকড়িটা কোথায় যে ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছিলো তার আর কোনো সন্ধানই মিললো না। মা ছুটে রাজীবকে বাধা দিতে এলে রাজীব ভুনির পিঠে পর্বত-প্রমাণ একটা কিল বসিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বলেছিলো : যা, বাইজি হগে যা, ধিঙ্গি হয়ে এখানে আছিস কেন আর মরতে ? গলা ছেড়ে উনি আবার গান ধরেছেন, গা না আরো খানকতক। বলে আবার আরেকটা কিল।

এই ছিলো রাজীব, কৈশোরে। যৌবনে কলকাতায় কলেজে পড়তে এসেও, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তার মতগুলি সে নরম করতে পারলো না। তবে, হাতের শক্তিটা আর হাতে না থেকে এসেছে এখন কলমের মুখে। দৈনিকে সাপ্তাহিকে শ্রীনিধিরাজ সামন্তের ছদ্মনামে সে লিখতে লাগলো সব ভীষণ-ভীষণ সারগর্ভ প্রবন্ধ, সমাসবদ্ধ বাক্যের বিদ্যুতে বেচারা বাংলা সাহিত্যকে সে ধাঁধা লাগিয়ে দিলে। স্ত্রীশিক্ষা বলতে বিলিতি কেতায় হ্যাণ্ড-সেক্ করা বা স্বামীর কনুই ধরে গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়া নয়, সত্যিকারের স্ত্রীশিক্ষা বলতে বাঙালী মেয়েদের রান্নাঘর ও ঠাকুরঘর, গুরুজনের সেবা, আর বাধ্যতা। নিজেদের রামায়ণ মহাভারত না পড়ে পড়তে গেছে তারা শেক্স্পিয়র আর শেলি : সীতা সাবিত্রীর আর্য আদর্শ ছেড়ে অনুসরণ করছে হায়, বিলিতি পেটিকোট। সত্যবানের মৃতদেহে নতুন জীবন সঞ্চার করবার সাধনার বদলে স্বামীর তিরোধানের পর অন্যের ঘরণী হবার লালসা। নেই সেই নিষ্ঠা, নেই সেই নির্মলতা। শিখেছে কেবল শাড়ি ফুলিয়ে শরীরের উপর ঢেউ তুলতে, দিতে যতো সাজসজ্জার চেকনাই, দেখাতে যতো খোঁপার হাত-প্যাঁচ। এদিকে ঘাটে নেমে কলসী করে জল তুলতে গেলে হাঁপায়,

উনুন ফুঁয়াতে গেলে চোখে দেখে সর্ষে-ফুল। না পারে কুলোয় করে চাল ঝাড়তে, মাটির পিঁড়ে লেপতে, ন্যাকড়ার ফালি ছিঁড়ে সলতে পাকাতে। হায়, হায়, সেই সুখের দিন কবে অস্ত গেছে, মেয়েরা আজকাল ঢেঁকিতে দেয় না পাড়, কাটে না আর নারকোলের সরু চিঁড়ে, পাথরের থালা ভরে আম গুলে দেয় না আর আমসত্ব। সেই দিন কি আর ফিরে আসবে না—মাছের আলু আর তরকারির আলু আলাদা করে মেয়েরা আবার কুটতে শিখবে, মাটির সাজ তৈরী করে ভাজবে আবার আসকে পিঠে, পিটুলি করে দেবে আবার লক্ষ্মীর আলপনা। সেই রামও নেই, আযোধ্যাও নেই। ফ্যাশানের বন্যায় মেয়েরা আজকাল এককেকটা ফাঁপানো ফেনা। কোথায় বা সেই পিঁড়ি-চিত্র, কোথায় বা সেই কাঁথার উপর বন্ধা কাটা। শিখেছে কেবল দু' চারটে বিলিতি বুকনি, কোলকুঁজো হয়ে বই নিয়ে বসে ঝিমুতে। দেশের দুর্গতি এসেছে ঘোরালো হয়ে। একে বাঁচাতে হলে চাই ফের সনাতন যুগে ফিরে যাওয়া, তার সমাজের আদর্শকে ফের প্রতিষ্ঠা করা। গরম দেশে বিলিতি মদ পরিপাক করা যাবে না, তাতে শক্তি না এসে আসবে মত্ততা: এ দেশে চাই কালো পাথরের গ্লাশে ঠাণ্ডা মিছরি-পানা, শুকতো আর মাছের ঝোল। বিলিতি সাফ্রেজিস্ট্-এর বদলে ব্রীড়াবনত-মুখ গৃহলক্ষ্মী।

তারপর রাজীবলোচন বিয়ে করলো। যুগের উপযোগী ঠিক সময়েই বলতে হবে, অর্থাৎ তার বয়েস যখন উনিশ। বিয়ে হলো ত্রিদিব গাঙ্গুলীর মেয়ের সঙ্গে—বয়েসে সেও যুগের আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। যমপুকুরের ব্রত শেষ করে সবে আবির দিয়ে মেঘমণ্ডলের সে আঁক টানছে। নাম ছিলো তার কামিনী, রাজীবলোচনের সে নাম পছন্দ হলো না: ও নামটা নেহাত একাল-ঘেঁষা, তার আবহাওয়ায় রয়েছে আদিরসের ঝাঁজ, অতএব সে নাম সে বদলে নিলো কাত্যায়নী-তে। গড়ে-পিটে তাকে সে লেগে গেলো মানুষ করতে। চিঠিতে পাঠ দিতে শেখালো 'পরমপূজনীয়েষু', বইয়ের মধ্যে রাখলো শুধু 'সীতার বনবাস'। ঠেললো তাকে হেঁসেলে, হাঁড়িকুঁড়ির আস্তাকুঁড়ে; সেখান থেকে প্রমোশন দিলে আঁতুড়ঘরে; কাঁথা পেনির আবর্জনায়। অথচ স্বামীর সামনে দিনের বেলায়, সূর্যের আলোয় তার দেখা দেওয়া বারণ: তার ইঞ্চি-মাপা ঘোমটা। দুপুরবেলা, রাজীবলোচন কলেজে গেলে, বসে-বসে সুপুরি কাটো, তেঁতুল ছাড়াও, জাঁতা ঘুরিয়ে ডাল ভাঙো। আর বিলাসিতা এক আধটু যদি করতে চাও তো পাড়ার মেয়েদের নিয়ে গোলামচোর খেল বা ঘুমে খানিক গড়াগড়ি দাও। ব্যস, এই পর্যন্ত। বিকেল হতে না হতেই অলক্ষ্যে আবার স্বামী সেবার তোড়জোড় শুরু

করো ; তুমি লক্ষীভূত হবে, অন্ধকারে রাত যখন আসবে ঘনিয়ে। তোমার অস্তিত্ব শুধু অন্ধকারেই।

॥ ২ ॥

সনাতন কাল স্থির হয়ে বসে রইলো, কিন্তু সময় চললো এগিয়ে। শতলক্ষ রাজীবলোচনও তাকে—তার দুর্বার, উদ্ধত স্রোতকে ঠেকাতে পারলো না। আর এমনি তার ধার যে বড়ো-বড়ো পাহাড়-পর্যন্ত ক্ষয় পেয়ে-পেয়ে তার স্রোতকে অনুকূল পথ করে দিলে।

হওয়া এসেছে জোর। নদীতে জোয়ার। রাজীবলোচনকেও একটু একটু করে পাল তুলে দিতে হলো। আস্তে-আস্তে কি করে যে অনায়াসে সে এই সময়ের স্রোতে গা ভাসাচ্ছে, ঠিক কিছু সে খেয়াল করতে পারছে না। চারদিকে তাকিয়ে কোথাও সে আর খুঁজে পায় না অসঙ্গতি, এতোটুকু কোথাও প্রতিবাদ। সময় এমন দুর্ধর্ষ যে তার সঙ্গে সম্মিলিত কণ্ঠে সবাই সায় দিয়ে উঠেছে। সে এমন কি ধুরন্ধর এসেছে, তার বিরুদ্ধে একা যাবে যুঝতে? যখন যা সময়, তখন তাই সমাজ। সময় এমন দুর্ধর্ষ যে তাকে পর্যন্ত ভুলিয়ে দিয়েছে তার আগেকার সময়ের কথা। তার সঙ্গে পেরে উঠবে এমন সাধ্য কার?

হ্যাঁ, রাজীবলোচনের মেয়ে ইন্দ্রাণীর কথাই বলছি।

রাজীবলোচনের মতামত থেকেই স্পষ্ট টের পাওয়া যায় তার আর্থিক অবস্থা বিশেষ সচ্ছল নয়, কেননা অর্থের অপব্যবহার করবার পথ করতে গিয়ে নিশ্চয়ই তাকে প্রাচীন অন্ধকূপ থেকে মাঝে মাঝে খোলা রাস্তায় বেরিয়ে আসতে হতো। অর্থের নির্গমের জন্যে তার সংস্কারের দুর্গে ফোটাতে হতো দু-চারটে ফোকর, এবং সেই ছিদ্র দিয়ে হয়তো বা আসতো আকাশের দু-এক টুকরো নীলিমা। অবস্থা তার ভালো নয় বলেই শাস্ত্রানুমোদিত বয়সে বিনাপণে ইন্দ্রাণীর সে বিয়ে দিতে পারলো না।

তার অগণন সন্তানমণ্ডলীর মধ্যে বড়ো মেয়ে এই ইন্দ্রাণী। গায়ের রঙটি মিঠে শ্যামবর্ণ, অপরাজিতার লতার মতো লাবণ্যের একটি মসৃণ ধারা দেহের বেড়া বেয়ে লতিয়ে উঠেছে, মুখের কমনীয়তা উঠেছে বুদ্ধিতে ঝলসে, চোখে ঠিকরে পড়ছে প্রতিভার আলো। তবু সে যখন তেরোয় পা দিলো, রাজীবলোচন তার জন্যে লাগলো পাত্র খুঁজতে, কিন্তু আশ্চর্য, অতো ছোটো মেয়ে কেউ বিয়ে করতে রাজী হয় না। মেয়েরা না এগোক, ছেলেরা গেছে এগিয়ে : তারা বিয়েটাকে ব্যবসার

চোখে দেখতে শিখেছে। আশ্চর্য, ঊর্ধ্বতন সপ্তপুরুষ নরকস্থ হবার যোগাড়, তবু মেয়ের বয়েস দিনে-দিনে বেড়ে যাচ্ছে দেখেও পাড়াপড়শীরা নিদ্রা-নির্জীব। হাওয়া এসেছে নতুন : সবার ঘরের দরজাই সমান এলো। গণ্যমান্যরা বলছেন : অতো ভাবনা কিসের, রাজু। মেয়ে ইস্কুলে পড়ছে, পড়ুক না।

—আজকালকার ছোঁড়ারা ঐ তো এখন চায়। কি করবে বলো, সেই সব ধর্মভাব কি আর আছে ?

ইন্দ্রাণীর এই থার্ডক্লাস। পিঠের উপর সাপের মতো আঁকাবাঁকা বেণী নাচিয়ে সে ইস্কুলে যায়, তার বইয়ের পৃষ্ঠা ও ইস্কুলের দেওয়ালের বাইরে যে আর কোনো একটা পৃথিবী থাকতে পারে এ তার তখন ধারণায়ই আসতো না ; মাঝে-মাঝে সেজেগুজে বাড়ির আত্মীয়দের গয়না গায়ে চাপিয়ে তাকে যখন পাত্রের অভিভাবকের সামনে এসে দাঁড়াতে হতো, তখন তার গাল দুটো লজ্জায় হতো একটু লালচে, গায়ে লাগতো যৌবনের হাওয়া। তাছাড়া, আর-আর সময় তার একটা রণরঙ্গিণী সাজ : দৌড়ঝাঁপ, খেলাধুলো, বই-খাতা, ছুঁচ-সেলাই—এই নিয়েই সে মেতে আছে। তাকে বহন করতে হয় যে একটা নমনীয় শরীর, এবং সেই শরীর সজ্ঞানে বহন করতে যে কি দুঃসহ লজ্জা—এই কথা ইন্দ্রাণীকে কে অতো মনে করিয়ে দেবে ? শুধু মনে পড়ে, যখন অমন ঘটা করে পাত্রের অভিভাবকের সামনে তার শরীরটাকে দিতে হয় বিজ্ঞাপন। নইলে সে খায় দায়, পড়াশুনা করে, ঘুড়ি কাটা পড়লে সুতো ধরতে ছোটে, জামরুল পাড়তে গাছে উঠতে পর্যন্ত কসুর করে না। ইস্কুলের সমবয়সীদের সঙ্গে কাটে সাঁতার, খেলে হাডু-ডু, গার্ল-গাইডের দল পাকায়। এই বয়সেই তার মা তাকে কোলে পায় এই কথা ইন্দ্রাণীকে দেখে আজ কে বিশ্বাস করবে ? ইন্দ্রাণীর সম্বন্ধে এই কথা ভাবতে গেলেও আজকাল কতো অন্যায়, কতো অশ্লীল মনে হয়। সময়ই ধরেছে এখন অন্য সুর।

বয়েস যদি বা ইন্দ্রাণীর বাড়লো, তার রঙের পর্দা চড়লো না। তাছাড়া যতোই সে এক ক্লাস করে ডিঙিয়ে যাচ্ছে, রাজীবলোচনের মতে, তার পাত্রেরও নিশ্চয়ই সমানুপাতে মাইনের সংখ্যার পিছনে একটা করে শূন্য বাড়ছে। থার্ড ক্লাসে যদি বা একজন কেরাণী, সেকেণ্ড ক্লাসে নিশ্চয়ই উকিল। আর যখন এ বছর সে প্রথম হয়ে ফার্স্ট ক্লাসে উঠলো তখন একজন ডিপ্‌টি না হলে ইন্দ্রাণীকে মানাবে কেন ? একথা রাজীবলোচন কেন, তার আপিসের সামান্য একটা চাপরাশি পর্যন্ত বলে দিতে পারে। কিন্তু সংসারে নারীর প্রেম যেখানে পণ্যের সামগ্রী, সেখানে মনের আর কোন সুষমা বা লাবণ্যের চাইতে শরীরের চামড়াটাই আগে পড়ে চোখে। তাই

বর্ণমালিন্যের ক্ষতিপূরণ বাবদ গলা ছেড়ে তার লম্বা দাম হাঁকে। হাতে পয়সা নেই বলেই তো পয়সা খরচ করে রাজীবলোচন মেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে নিখরচায় তাকে পাত্রস্থ করবে বলে, কিন্তু চারদিক সে চেয়ে দেখলো মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোটা নতুন একটা ফ্যাশান হিসেবেই যা বাঙালী-জীবনে আচম্‌কা এসে গেছে, তা দিয়ে বিয়ের বিশেষ কিছুই সুরাহা হচ্ছে না। বিয়ে ব্যাপারটা আগে যেমনি, তেমনি রয়েছে গতানুগতিক। আজো সেই মেয়ের গায়ের রূপ, বাপের ব্যাঙ্ক-এ্যাকাউন্ট। রাজীবলোচন বেঁকে দাঁড়ালো, এতোদিন জলের মতো পয়সা ঢেলেও আবার যদি বিয়ের সময় পণ দিতে হয়, তবে এক মেয়ে পার করতেই সে প্রায় পরপারে এসে ঠেকবে। ছেলে হলে বরং কিছু ফিরে পাবার প্রত্যাশা থাকে, তার পিছনে খরচ করাটা তবু যা হোক একটা ইনভেস্টমেন্ট, কিন্তু মেয়ে হচ্ছে যেন শাঁখের করাত, আসতেও কাটবে, যেতেও কাটবে।

অতএব পুরোদমে ইন্দ্রাণীর পড়া চললো। এবং বাংলা দেশের মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়ে সে সমারোহে ম্যাট্রিক পাস করলে: বৃত্তি পেয়ে গেলো মাসিক কুড়ি টাকা করে। বালির বাঁধ দিয়ে কে রোধে তখন আর সমুদ্রের উত্তাল ঊর্মিলতা? এর উপর আর দশ টাকা পাঠালেই ইন্দ্রাণীর কলেজে পড়া হয়, বোর্ডিংএ থেকে, কলকাতায়। একটা পাঁড়াগেয়ে শহরে থেকেই যখন সে অতো ভালো করতে পেরেছে, তখন বিরাট রাজধানীর সমৃদ্ধবাভ আবহাওয়ায় পড়ে নিশ্চয়ই সে দেবে আরো চমক, আরো চাকচিক্য। তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র শুধু এখন আর মেয়েদের ঘিরে সঙ্কীর্ণ হয়ে থাকবে না। পাবে সে কল্পনার বিশাল একটা আকাশ—এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত অবাধে সে পাখা মেলে দেবে, গতির দ্যুতিতে প্রখর পাখা।

মেয়ের যে-মুখে প্রতিভার প্রভা এসে পড়েছে, আত্মবোধের দৃঢ়তা যেখানে রেখায়-রেখায় পরিস্ফুট, সেই মুখ রাজীবলোচনের কাছে স্বপ্নের চেয়েও একটা বড়ো বিস্ময় বলে মনে হলো। অনায়াসে, বলা যেতে পারে খুশী হয়েই, সে মত দিলো: ইন্দ্রাণী চলে এলো কলকাতায়, বেথুনে, হেদোর কাছাকাছি মেয়েদের একটা মেস্ এ নিলো বাসা। বেণী তখন তার খোঁপায় স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে, দেহের লাবণ্য-তরলিমা তখন ফেনিল তরঙ্গিমায় নিয়েছে রূপান্তর। লালিত্যের বদলে এসেছে লীলা, চাঞ্চল্যের বদলে স্পর্ধিত গাম্ভীর্য। শরীরের চেয়ে বড়ো একটা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সে আবিষ্কার করে বসলো: সে তার মন, উদার অন্ধকার আকাশে গণনাতীত বিন্দু-বিন্দু জ্যোতিরুদয়ের মতো তার আশা আর আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন আর বাসনা—তার দীপ্তি আর দাহ!

এই মেয়ের মা যে কামাখ্যা, বেচারীর তা বিশ্বাস করতে আশ্চর্য। লাগে

ইন্দ্রাণী যখন এই বয়সেও ছোটো খুকির মতো মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে শব্দরে ন্যাকা গলায় খুঁটিনাটি আবদার করে, তাকে সম্পূর্ণ নিজের অপত্য বলে আয়ত্ত করতে কেমন তার একটু বাধো-বাধো ঠেকে। কিন্তু বাইরে আত্মীয়-অনাত্মীয়ের কাছে চোখের সে এমন একটা তেরছা ভঙ্গি করে, কথায় দেয় এমন সব ঠোকর, যাতে হিংসের জ্বালায় সবাই ওঠে চিড়বিড় করে। রাজীবলোচনের তো ভীষণ গদগদ ভাব। নিজেকে দিয়ে বেশি পড়াশুনা করানো যায়নি, তাই মেয়ের মাঝেই পাচ্ছে সে পরোক্ষ চরিতার্থতা। কামাখ্যার মতো মুখে সে কিছু দেমাক করে বেড়ায় না, কিন্তু মনের ভিতর রচনা করে চলে স্বপ্নের উর্ণা। এবার ইন্দ্রাণীর জন্যে নিশ্চয়ই আই-সি-এস্।

কিন্তু বিয়ের কথা ইন্দ্রাণীর কাছে সবিস্তারে পাড়ে এমন সাধ্য কার! এবারে সে মেয়েদের মধ্যে সেকেণ্ড হয়ে আই-এ পাস করেছে। এখন সে আর ক্রেতার হাতে বিপণির পণ্য নয়, নিজে সে এখন নিজের মালিক, তার জীবনটা কারুর বন্ধকি কারবার নয়, নিজের মূলধন। এখন শরীরের অন্তরালে পেয়েছে সে মনের সন্ধান, নিজের মাঝে ব্যক্তি। এখন তার অনেক পথ, অনেক প্রসার। বিয়ে ইন্দ্রাণী এখন করছে না—আপাতত তার চেয়ে সম্পাদ্য অনেক বড়ো কাজ তার হাতে আছে। বিয়ে তো সামান্য একটা খুকিও করতে পারে। আগে অন্তত বি-এ টা সে পাস করুক।

তার এই দৃঢ় দুর্নমনীয়তাকে যদি কেউ ক্ষয় করতে পারে, তবে-ও সেই সময়। মাসিক দশটাকাও আর রাজীবলোচনকে দিতে হয় না, হস্টেলের কাছাকাছি ইন্দ্রাণী একটা টিউশনি যোগাড় করে নিয়েছে, ত্রিশ টাকা মাইনে। উল্টে বাবাকেই সে টাকা পনেরো সাহায্য করতে পারে। সংসারস্ফীতির সঙ্গে-সঙ্গে দিন-দিন অবস্থা তাঁর যা শোচনীয় হচ্ছে তাতে ইন্দ্রাণীর এ দান, বাপের সত্যরক্ষা করতে ইফিজিনিয়া-র আত্মোৎসর্গের মতোই সমান গৌরবের। সেকালের গার্গী-মৈত্রেয়ীও বিদ্যার বিনিময়ে এতোখানি মূল্য পায়নি। অন্তত বাড়ি ভাড়াটা তো চলে, এবং যে টাকাটা ইন্দ্রাণীকে মাস-মাস আর দিতে হয় না তা দিয়ে বাজার খরচের ফর্দটা তো একটু আয়তনে বিস্তৃত হয়। বলতে গেলে, রাজীবলোচনের নাসাগ্র এখন তীক্ষ্ণ, কপাল উদ্ধত ও চোয়ালের হাড় দুটো স্পর্ধায় দৃঢ়তর হয়ে উঠেছে, চোখ ও ঠোঁটের কোণে সমগ্র অকিঞ্চিতকর পৃথিবীর উপর একটা কঠিন অবজ্ঞা; অর্থাৎ তার মতো মাইনের কেরাণির মধ্যে কার ঘরে এমন দিগ্বিজয়িনী! খরচের কোঠা থেকে ইন্দ্রাণী একেবারে জমার ঘরে চলে এসেছে: ক্রুসেড থেকে ফিরে আসা জয়ী নাইট-এর চেয়েও মহত্তর তার আবির্ভাব। কন্যা যে তার শরীরের কোনো অতিরিক্ত অর্থে রত্ন

হতে পারে রাজীবলোচনের তা জানতে বাকি ছিলো। প্রথম সন্তান ছেলে হলে সেও এমনি পিছে দাঁড়াতো; এবং বলতে কি, কখনো ইন্দ্রাণীর মতো এতো তাড়াতাড়ি নয়। মিছিমিছি বিয়ের কথা পেড়ে মেয়েকে এখন বিব্রত করে লাভ নেই: লাভ, রাজীবলোচনের সংসারে লাভ, যদ্দিন বিয়ে তার নেহাত না হচ্ছে।

তাছাড়া ঐ কথা ইন্দ্রাণীর সামনে এখন পাড়বে কে? ময়ূরের মতো পেখম মেলে সে আর দাঁড়াবে নাকি ভেবেছ রূপের পরীক্ষা দিতে? খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখাতে তার চুলে ঘনতা ও দৈর্ঘ্য, চামড়ার উষ্ণতা ও ঔজ্জ্বল্য। দেবতা প্রজাপতি নয়, দেবতা মীনকেতু। ইন্দ্রাণীর তাতে, মানে এ বিয়ের ব্যাপারে নেই এতটুকু কুৎসিত কৌতূহল, নিজের চারদিকে নেই এক ফোঁটা নিঃসঙ্গতা। তাকে দেখলে মনে হয় না বিয়ে না করলেই মেয়ে অভিচারিণী হয়, শুভদৃষ্টি করবার জন্যেই তারা অহোরাত্র শিবনেত্র হয়ে আছে। বরং তাকে দেখলে মনে হয়, বিয়েটাকে সে শরীরের একটা রঙ্গিল অঙ্গরাগ বলে মানতে চায় না: সে তার শরীরের অন্তরালে, আগেই বলেছি উদ্ভাবন করেছে তার আত্মা। সে এখন এমন একজন সম্পূর্ণ ব্যক্তি যে বিয়ের পাত্র ও পানপত্র নিয়েও তারই সঙ্গে পরামর্শ করতে হয়। রাজীবলোচনের হাতে কিছু টাকা জমলে তা জমিতে লাগাবে, না হ্যাণ্ডনোটে ধার দেবে, সে বিষয়েও বুদ্ধি দেয় এই ইন্দ্রাণীই। ইন্দ্রাণীর সঙ্কেত ছাড়া রাজীবলোচন আজকাল আর এক পা-ও চলতে চায় না।

যদি সে কখনো মেয়ের পিঠে মৃদু-মৃদু হাত বুলোতে-বুলোতে জিগ্‌গেস করে: আর কতো পড়বি মা? এবার জাঁকজমক করে তোর বিয়ের একটা যোগাড় করি।

ইন্দ্রাণী তখন ঠোঁটের উপর পাতলা একটি হাসির পাপড়ি মেলে বলে: যোগাড় করে ও জিনিস মেলে না, বাবা। বলেই শরীরের রেখাগুলি চঞ্চলতায় উচ্চকিত করে সেখান থেকে চলে যায়।

তার ঐ ত্বরান্বিত অন্তর্ধানের অর্থ উনবিংশ শতাব্দীর ভঙ্গুর কৌমারব্রীড়া নয়; অর্থ, হাতে তার এখন অনেক জরুরি কাজ, বিয়ের যোগাড় যদি করতেই হয় কখনো, সে একাই যথেষ্ট।

অনুরোধ করলে তো এই, জোর করা তো ভয়াবহ দুঃস্বপ্নেরও অতীত। জোর করবে রাজীবলোচন আর কাকে? ইন্দ্রাণী পেয়ে গেছে তার মেরুদণ্ড, সকল জোরের বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড প্রতিষেধক। ঐ অস্ত্রের সঙ্গে যুঝবে এমন সাধ্য কার? ইন্দ্রাণী পেয়ে গেছে তার পায়ের নিচে মাটির কঠিন আশ্রয়, কে আর নিয়ে আসবে তাকে মোহের মরুভূমিতে? সময় যদি তার এখনো না হয়ে থাকে, রাজীবলোচন এই সময়ের হাতেই সুতো ছেড়ে দেবে।

॥ ৩ ॥

ইংরিজিতে ফার্স্টক্লাস অনার্স নিয়ে ইন্দ্রাণী বি-এ পাস করলো।

একপাত ঝকঝকে ইস্পাতের মতো উজ্জ্বল ও ধারালো ইন্দ্রাণীর দেহ যেন চঞ্চলতার লতা। তার চলায়-বলায় হাসিতে-গাম্ভীর্যে বিচ্ছুরিত হচ্ছে বুদ্ধি, তেজোময় ব্যক্তিত্ব। নাকের উপর সোনার হালকা চশমাটি চোখে এনেছে দৃষ্টির শাণিত সূক্ষ্মতা। তার ক্রমক্ষীণায়মান আঙুলের অগ্রভাগে শাণিত ব্যগ্রতা : তার নিটোল চিবুকে গভীর উপলব্ধি। গায়ে তার মুক্তির ঢেউ, দুই পায়ে অবারিত পথলিপ্সা। অথচ এ শোভা তার প্রসাধনে সমৃদ্ধ নয়, পরিপুষ্ট নয় বাহ্যিক কৃত্রিম কোনো সৌন্দর্যের অনুশীলনে : এ শোভা তার ব্যক্তিত্বের বিকিরণ, তার অস্তিত্বের বর্ণচ্ছটা। কস্‌মেটিক্‌স্‌ নয়, এস্‌থেটিক্‌সই হচ্ছে ইন্দ্রাণীর বিষয়। বেশবাস যা বা কিছু সে করে, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশবাস—তা তার আত্মার আনন্দকে প্রতিমূর্ত করতে, দৃষ্টিবিহারী পুরুষকে মুগ্ধ করতে নয়। নয় সে রঙচঙে-পাখা-মেলা ফুরফুরে প্রজাপতি, পাখায় নেই তার ফুলের সোনালি রেণু মাখা : দস্তুরমতো সে সবলবর্ধনা, দুই বাহুতে তার পেশল বলিষ্ঠতা। প্রজাপতি ছেড়ে বন্য একটা চিতাবাঘের সঙ্গে তার তুলনা করা যায়। শরীরে তার সেই পিচ্ছিল ক্ষিপ্রতা, সেই শক্তির বিদ্যুদ্দীপ্তি। স্বাস্থ্য অর্থ দেহের মেদবিস্তার নয়, নয় কতোগুলি রাশীভূত মাংস : ইন্দ্রাণীর হচ্ছে দৃঢ়তার লাবণ্য, শক্তির অমিতোচ্ছ্বাস। কৈশোরকাল থেকে সে রূপচর্চা না করে করেছে বলানুশীলন, চামড়ার জৌলুস না বাড়িয়ে রক্তের গাঢ়তা। ব্যায়াম তার শরীরে এনেছে প্রকৃত অনুপাত, অবয়বের সংস্থানে এনেছে পরিচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য। স্বয়ম্ভূতা সমুদ্রোত্থিতা আফ্রোদিতে-র চেয়ে মৃগয়া-বিহারিণী আর্টেমিস্‌ তার বড়ো দেবী। তার কাছে শরীর বিলাস নয়,— বিস্ময়— একটা মাত্র জটিল ধারাবাহিক যন্ত্র নয়, কেননা যন্ত্রে জন্ম পায় না শেক্‌স্‌পিয়ারের কবিতা, দা-ভিঞ্চির ছবি। দেহ তার কাছে একটা মদির অনুপ্রাণনা— এবং দেহময় এই উজ্জ্বল উৎসাহই তার আসল সৌন্দর্য। দেহের এই দৃঢ়তা তার মনেও হয়েছে সংক্রামিত, এবং মানুষের মন অরণ্যের চেয়েও গহন, আকাশের চেয়েও গভীর।

এবার বি-এ পাস করে, ইন্দ্রাণী নতুন কি অসাধ্যসাধন করে বসে, সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলো। হয়তো পড়তে চাইবে এম-এ, কিংবা নিতে ছুটবে কোনো মাস্টারি।

ইন্দ্রাণী নিভৃতে রাজীবলোচনের কাছে গিয়ে সরাসরি বলে বসলো : বাবা, এবার আমি বিয়ে করবো।

স্পষ্ট, একটু বা রূঢ় শোনালো, কিন্তু ইন্দ্রাণীর বলার ভঙ্গির মধ্যে এতোটুকু নির্লজ্জতা নেই। মেয়ে নিজে থেকে সরাসরি বিয়ের কথা পাড়ছে ব্যাপারটায় সামাজিক অসৌজন্য একটু ছিলো হয়তো, কিন্তু সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভয়ে ভেঙে পড়বার মেয়ে ইন্দ্রাণী নয়। বিয়ে যখন করবেই মনে করেছে, তখন মুখের উপর মনের কথা বলে ফেলাই সভ্যতা। সীতাকে বনবাসে পাঠাতে হবে, অথচ তা লক্ষ্মণের জবানিতে, সেই সেকেলে ভদ্র দৌর্বল্যের সে পক্ষপাতী নয়।

রাজীবলোচন এখুনিই তার প্রত্যাশা করছিলো না, কিন্তু খুশী হয়ে উঠলো অপরিমিত। বললে—তোমার এতদিনে বিয়ের যে মত হলো সেটা ভগবানের আশীর্বাদ বলতে হবে। হাতে এখনো আমার দু'চারটে ভালো পাত্র আছে, (তার কথা উঠতে লাগলো রসালো হয়ে), তুমি একটি বার মত দিলেই হয়। করুণাবাবু তো তাঁর ছেলের জন্যে সেই কবে থেকে এখানে ঝোলাঝুলি করছেন, রেঙ্গুনে ফরেস্ট-ডিপার্টমেণ্টে তিনশো টাকা মাইনের চাকরি করছে। অতো দূরে তোমাকে যেতে দিতে মন সরবে না, তা, হাতের কাছে আছে শম্ভুবাবুর ভাইপো। জার্মানি থেকে এসে কলকাতায় ছাপা-খানার কলকব্জার কি ফ্যালাও কারবার দিয়েছে—শম্ভুবাবুরা লাখী লোক। কাকে তোমার পছন্দ হয় এদের মধ্যে? পাটনায় উমাচরণ বাবুর ছেলে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন, সাসারামে হীরালাল বাবুর নাতি ইন্‌কাম-ট্যাক্স-অফিসার। আজ বলো, আজই তাঁদের চিঠি লিখে দি, সব যুগ্যি ছেলে এঁরা।

ঠোঁট কাঁপিয়ে অল্প একটু হেসে ইন্দ্রাণী বললে—তোমার ব্যস্ত হতে হবে না, বাবা, পাত্র আমি ঠিক করেছি।

রাজীবলোচন এতোটাও কখনো আশা করেনি। চেখের তারা দুটো স্থির, সে নির্বোধের মতো প্রশ্ন করলে : পাত্র ঠিক করেছ মানে?

—মানে, ভাগ্য ঠিক করে দিয়েছে, ইন্দ্রাণী সসঙ্কোচে বললে—শীগ্‌গীরই আমরা বিয়ে করতে চাই, তোমার মত নিতে এসেছি।

খাটের বাজুটা ধরে ফেলে রাজীবলোচন নিজেকে সামলালো : পাত্রটি কে? কি করে?

—বিশেষ কিছুই করেন না, ইন্দ্রাণী বাপের মুখের দিকে চেয়ে একটু পীড়িত কণ্ঠেই বললে—এম-এ পাস করে সম্প্রতি চুপচাপ বসে আছেন, পরে কিছু একটা করবেন নিশ্চয়ই।

রাজীবলোচন রাগে মুখ বেঁকিয়ে উঠলো : অসম্ভব। শেষ কালে এমন পাত্র তোমার মনে ধরলো?

ইন্দ্রাণীর কণ্ঠস্বর নির্মম, নির্ভয় : কি করবো, বাবা, উপায় নেই।

—উপায় নেই মানে? তুমি কি স্ট্যাম্পের ওপর নাম দস্তখত করে দিয়েছ নাকি?

বাপের অদ্ভুত উপমা শুনে ইন্দ্রাণীর ঠোঁটে হাসি ফুটলো: তার চেয়েও বেশি।

রাগে রাজীবলোচন একটু-একটু তোতলাতে শুরু করেছে: শেষকালে তুমি এমন একটা বেকার, অপদার্থ লোক বাছলে? এক পয়সা কামাবার মুরোদ নেই, সে তোমার মতো মেয়েকে বিয়ে করবে?

ইন্দ্রাণী তার শাড়ির পাড়টা সূক্ষ্ম চোখে পর্যবেক্ষণ করতে-করতে বললে—কি পরিমাণ সে টাকা রোজগার করে সেই দিকে দৃষ্টি রেখে তাকে বরণ করিনি। আর্থিক প্রয়োজনের দিক থেকেই সব জিনিসের সৌন্দর্য আমরা বিচার করি না, বাবা।

রাজীবলোচন স্তম্ভিত হয়ে গেলো। গলা চিরে তার শব্দ বেরুলো: এরি জন্যে তোমাকে আমি এতোদিন লেখাপড়া শিখিয়েছি?

কানায় কানায় মিনতিভরা পরিপূর্ণ দু'টি চোখ তুলে ইন্দ্রাণী বললে—এ প্রশ্ন আমিও তোমাকে করতে পারতাম, বাবা। আমাকে এতোদিন তুমি লেখাপড়া শেখালে, এতো দিলে স্বাধীনতা, আর আমি তার ব্যবহার করতে পিছিয়ে থাকবো? হোক ভুল, তবু স্বাধীনতাটা তো আমার।

—কিন্তু, এম-এ পাস করা একটা আস্ত গণ্ডমূর্খ, সে তোমাকে খাওয়াবে কি?

—সে খাওয়াতে না পারুক, আমি পারবো। আমি কি এমনি অকর্মণ্য?

রাজীবলোচন প্রশ্ন করলো: লোকটার নাম?

আলগোছে চোখের পাতা দু'টি নামিয়ে ইন্দ্রাণী বললে—সুদর্শন সেন।

—সেন? রাজীবলোচন প্রায় চীৎকার করে উঠলো: আর তুমি?

—ব্রাহ্মণ, চাটুজ্জে।

—তুমি—তুমি ওকে বিয়ে করবে?

—হ্যাঁ, তাই তো ঠিক করেছি। মাত্র একটা জাতের বাধা আমাদের আলাদা করে দেবে এতটা ভাবপ্রবণতা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি না। ইন্দ্রাণী কঠোর একটা ভঙ্গি করলে।

রাজীবলোচন একেবারে ম্লান হয়ে গেলো। শুকনো গলায় বললে—তাহলে তুমি আর হিন্দু থাকছো না?

—একশো বার থাকছি। মাত্র একটা প্রথার উপর হিন্দুত্ব দাঁড়িয়ে আছে নাকি? ইন্দ্রাণী দীপ্তকণ্ঠে বললে—হিন্দুধর্মের মতো এত উদাসীন, এত উদার ধর্ম

আর কোথায় আছে। স্বয়ংবৃতা হবার চমৎকার অনুষ্ঠান এই হিন্দুত্বেরই সাবেক আমদানি, বাবা। আমিও সেই হিন্দুর মেয়ে।

—যাক, তোমার মুখে আর পুরাণের আলোচনা শুনতে চাই না।

—দরকার হলে আমাকে তোমরা ঝুড়ি-ঝুড়ি শোনাতে পারো।

ইন্দ্রাণী তরলকণ্ঠে বলতে লাগলো: দিকে-দিকে সীতা-সাবিত্রীর এতো সব পুণ্যকথা শুনতে পাই, অথচ প্রাতঃস্মরণীয়াদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে গেলেই পৃথিবী গেলো রসাতলে। আমি যদি সাবিত্রীর মতো বর মনোনয়ন করি, তবে আমাকে কেউ ক্ষমা করবে না: যদি সীতার মতো রুগ্ন শ্বশুর-শাশুড়ী ফেলে স্বামীর সঙ্গে দেশভ্রমণে যাই, তবে তো আর কথাই নেই—দেশের হিন্দু দৈনিক কাগজগুলো আমার আত্মশ্রাদ্ধ করবে। বলে, কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে ইন্দ্রাণী শব্দ করে হেসে উঠলো।

—সে যুগের সাফাই গাইতে এসো না। রাজীবলোচন শ্রান্ত, বিরক্ত মুখে বললে—সাবিত্রীর কীর্তিটা একবার মনে করে দেখো।

—দেখেছি। কিন্তু তেমন মহীয়সী এ যুগেও অচল নয়, বাবা। ইন্দ্রাণী হেসে ফেললো: যমরাজ সশরীরে আর দেখা দেন না, নইলে পলিমিক্স্-এ কারসাজি দেখিয়ে অনেকেই মরা স্বামী জীইয়ে তুলতে পারতো। তাছাড়া কি পরিমাণ সেবা-শুশ্রূষা করে বাংলার গৃহ-লক্ষ্মীরা তাঁদের মুমূর্ষু স্বামীকে বাঁচান তার ঠিকমতো পাব্লিসিটি দিতে পারলে তাঁরা সাবিত্রীর চেয়ে কম যেতেন না কখনো।

—কিন্তু, রাজীবলোচন অস্থির হয়ে উঠলো: কিন্তু স্বজাতে হিন্দুমতে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি কি?

আমার কিছুই আপত্তি ছিলো না, বাবা, কিন্তু ঈশ্বর এ ক্ষেত্রে বিমুখ; ইন্দ্রাণী সামান্য গম্ভীর হলো: মতের মধ্যে কি আছে, কতোগুলি কথার খোলসের মধ্যে? আমাদের মনের দিক থেকে তা একেবারে মিথ্যে, এতো মিথ্যে যে সমস্ত শরীরে নিদারুণ ঘৃণা ধরে যায়। এই বেশ, বিয়ের নামে একটা অতিকায় অপব্যয় নয়, কতোগুলি অর্থহীন বাগাড়ম্বর নয়, দুজন সাক্ষী নিয়ে রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে ফি জমা দিয়ে সম্বন্ধটা পাকা করে আসা।

পিছন থেকে পিঠের উপর আমূল একটা ছুরি বসিয়ে দিলেও রাজীব-লোচনের মুখ এতো বিকৃত হতো না: রেজেস্টারি করে? শেষে তুমি রেজেস্টারি করে বিয়ে করবে?

—আইনের গোলমাল না থাকলে তারও দরকার ছিলো না। ইন্দ্রাণীর কপালে নীল দুটো শির ফুলে উঠলো: হিন্দু বিয়ের চেয়ে তা অনেক সস্তা, অনেক

যুক্তিসঙ্গত। স্যাক্রামেণ্টের ফাঁস জড়িয়ে যাবজ্জীবন নির্বাসন নয়, এখানে আগে-পিছে দু'দিক থেকেই দরজা খোলা আছে। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে দাসত্বের জাঁতাকলে তিলে-তিলে চিরকাল নিজেকে ক্ষয় করা নয়, চারদিকে রয়েছে মুক্তির আবহাওয়া।

—তুমি এই বিয়ে করে আবার এ বন্ধন ছিন্ন করবে নাকি?

—দরকার হলে করবার আমার স্বাধীনতা থাকবে। কিন্তু সে তো অনেক, অনেক দূরের কথা, ইন্দ্রাণী একটু এগিয়ে এলো: আমি যদি এ বিয়েতে সুখী হবো মনে করি, তবে তোমার আর কিসের আপত্তি বলো? রাজীবলোচন মেয়ের ছোঁয়া বাঁচিয়ে লাফিয়ে উঠলো: তুমি এই বিয়েতে সুখী হবে মনে করো?

হাতের দুর্বল একটা ভঙ্গি করে ইন্দ্রাণী বললে—তুমি আশীর্বাদ করলে নিশ্চয়ই হবো, বাবা।

—ঐ গর্দভ এম-এ পাস করা নিষ্কর্মা ছেলেটাকে বিয়ে করে?

—কে জানে! ইন্দ্রাণী নিজের ঠোঁট উলটালো: তোমার ঐ সব মার্কা মারা ধুরন্ধর পাত্রদের কারু সঙ্গে বিয়ে হলেই সার্থক হতাম তারও বা ঠিক কি। সবই চান্স্—বিয়েটা আগাগোড়াই একটা লটারি। আর আমার তো মনে হয় বাবা, সংসারে এই চান্স্ই একমাত্র অভ্রান্ত। কোনো আকস্মিক ঘটনায় যা হাতের কাছে আসে, ধরে বেঁধে ছক কেটে কোনো জিনিসের পাওয়ার চেয়ে তা অনেক সত্য। গ্রীকরা তো শুনেছি 'টস্' করে তাদের রাজকর্মচারী নির্বাচন করতো, তাই বলে তাদের কম সুশাসন ছিলো না।

রাজীবলোচন বললে—ছেলের আর কে আছে?

—মা আর দুই দাদা আছেন শুনেছি, দুজনেই রোজগার করেন। তবে তাঁদের আয়-ব্যয়ের ঠিক হিসেব জানি না। ইন্দ্রাণী আবার এক পা এগিয়ে এলো: যা হবার তা হবে, জীবন নিয়ে একটু এ্যাডভেঞ্চারই যদি না করলাম তো তার আর স্বাদ কি বলো। সুখী হওয়া বাবা, আমার নিজের হাতে, আমার হাতের বাইরে নয়। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো—

—আশীর্বাদ! রাজীবলোচন পিছিয়ে গেলো: তোমার কাছে আমাদের আশীর্বাদেরই যদি দাম থাকতো, তবে এমন একটা কুৎসিত কাণ্ড করে বসতে না। বিয়ে তোমাদের কবে হচ্ছে?

—যে কোনোদিন হতে পারে, সব দিনই আমার কাছে সমান শুভ। ব্যথায় উজ্জ্বল দুই চোখ তুলে ইন্দ্রাণী বললে—কিন্তু সামান্য একটা মত, তুচ্ছ

একটা প্রথার জন্যে আমার এতো বড়ো একটা উপলব্ধিকে তুমি কুৎসিত বলবে?

—তার চেয়ে আরো কটু কথা বলা উচিত ছিলো। সগর্জনে রাজীবলোচন বললে: এখন তুমি আমার কাছ থেকে চলে যেতে পারো—যেখানে তোমার খুশি, যেখানে তোমার সেই রেজেস্ট্রী অফিস। লেখাপড়া—শিখে তুমি যে এমন একটি আস্ত মেমসাহেব হয়েছ তা আমার জানা ছিলো না। তখন হাত-পা বেঁধে কেন যে তোমাকে জলে ফেলে দিইনি তারি জন্যে আমার এখন শোক করতে ইচ্ছে হচ্ছে। যাও! রাজীবলোচন দরজার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো।

হিন্দু মেয়ের মতো বাপের আর আশীর্বাদ কুড়োতে হবে না, রেজিস্ট্রার-সাহেব তোমাকে আশীর্বাদ করবার জন্য হাত তুলে বসে আছে।

প্রায় কাঁদ কাঁদ গলায় ইন্দ্রাণী বললে—তার দরকার ছিলো না বা। তোমার আশীর্বাদ পেলেও আমাকে যেতে হতো।

—তাই যাও, বব্ করে, গাউন পরে, গালে ঠোটে চুনকালি মেখে বিলিতি বাঁদর সাজো গে, যাও। আমাদের মুখোজ্জ্বল করতে দয়া করে তোমার ও মুখ আর আমাদের সামনে বার করো না। রাজীবলোচন অন্তঃপুরের দিকে পা বাড়ালো, চীৎকার করে উঠলো: মেয়েদের আজই—আজই ইস্কুল থেকে নাম কাটিয়ে আনো, আমার ঢের শিক্ষা হয়েছে, সোনার পাথরের বাটিতে ঢের রাজভোগ খেয়েছি—

বাপের সঙ্গে তবু যা হোক একটা বিস্তৃত আলোচনা করা গিয়েছিলো, কিন্তু কামাখ্যা দেবীর কান্না ছাড়া আর কোনো কথা নেই।

—কেন, কেন তুই এই বিয়ে পছন্দ করতে গেলি?

—তাতে হয়েছে কি, মা? আমি তোমাদের সেই মেয়ে, চিরকাল সেই ইন্দ্রাণীই থাকবো। ইন্দ্রাণী মা'র শোকাকুল মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বললে—তোমাদের সুখী করা আমার কর্তব্য, আর আমাকে সুখী দেখা তোমাদের কর্তব্য নয়?

—এরি জন্যে তোকে আমরা লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম?

—ঠিক এরি জন্যে, মা। স্বাতন্ত্র্য শিখতে, নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে।

—কিন্তু এখনো সময় আছে, এ বিয়ে তুই ভেঙে দে।

—এখন কেন, সে স্বাধীনতা আমার চিরকাল থাকবে, মা। মিছিমিছি কেন তুমি চোখের জল ফেলবে? ইন্দ্রাণী বললে—আমি যখন মা হবো, তখন আমার মেয়েকে—আমার মেয়ে যদি এমন গৌরবের অধিকারিণী হয়—আমার মেয়েকে নিজহাতে ইন্দ্রাণীর মতো সাজিয়ে দেবো, দেখো। তুমি ওঠো। তোমার মেয়ের

বিয়ে, আর তুমি উলু দিচ্ছ না? এ তুমি কেমন ধারা মা? ইন্দ্রাণী দুই হাতে মা'র গলা জড়িয়ে ধরলো: এই দেখ আমি, তোমার ইন্দ্রাণী, তোমার স্বর্গের ইন্দ্রাণীর চাইতে আমার আজ বেশি ঐশ্বর্য।

॥ ৪ ॥

সুদর্শনের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর প্রথম আলাপ তাদের এই হস্টেলেই, আই-এ দেবার যখন তার মোটে মাসখানেক বাকি। সুদর্শন তখন ফিফথ ইয়ারে, হিস্ট্রিতে। জয়ন্তী—সম্পর্কের লতাপাতায় কি-রকম তার বোন হয়—পড়ে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে, থাকেও এক হস্টেলে—সুদর্শন তার সঙ্গে কালে-ভদ্রে দেখা করতে আসতো। ভিজিটার্স-রুমটা আয়তনে ছোটো ও বসবার চেয়ারের সংখ্যা নিতান্ত পরিমিত বলে হস্টেলের সমস্ত মেয়ের জন্যে সপ্তাহে কোনো একটা বাঁধাধরা ভিজিটার্স-ডে নির্দেশ করে রাখা সম্ভব ছিলো না। মেয়েরা তাই ছোটো-ছোটো দল পাকিয়ে নিজেদের জন্যে আলাদা-আলাদা দিন ঠিক করে রাখতো—সপ্তাহে দু'দিন করে। একেক দলে চার পাঁচ জনের বেশি নয় অবিশ্যি। জয়ন্তীদের গ্রুপটার যদি হয় মঙ্গলবার আর শুক্রবার, চামেলিদের সোমবার আর বেস্পতিবার—ঐ দু'দিন ছাড়া দু'দলের ভিজিটার্সদের আসতে বারণ। অন্যান্য দিন বাইরে বেড়াতে যাবার অবিশ্যি বাধা ছিল না, তারপর শনিবার বিকেলে যার-যার আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাবারও একটা ফ্যাশান ছিলো চলতি। ফিরতে অবিশ্যি সেই সোমবার সকাল। হস্টেলে একজন মেট্রন বা মাসিমা আছেন বটে নামমাত্র, কিন্তু সমস্ত দেখাশোনা ও খবরদারি করার ভার মেয়েদের মধ্যেই ভাগ করে দেয়া: খানাপিনা যেমন সস্তা, কড়াক্কড়িও তেমনি নেই বললেই চলে। মেয়েরা যে-যার মালিক, যে-যার নমুনা। ব্যবসায় যেমন সাধুতা করতে হয় সিদ্ধিলাভের সহজ উপায় ভেবে, তেমনি জীবনেও একটা নিয়ম রাখতে হয় জীবনকে ভোগ করবার বেশি সুবিধে হয় বলে। নিয়মটা এদের কাছে নিগড় হয়ে ওঠেনি, নির্মোকের মতো চলে তার ক্রমান্বিত পরিবর্তন। তাই এদের চেহারায় যেমন ছিল খুশির টাটকা একটা জৌলুস, ব্যবহারেও ছিলো একটা সতেজ সরলতা। যেমন দাপটে তারা কথা কয় ও হাসে, চেঁচামেচি ও ছুটোছুটি করে, রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে কারুর মনে হয় না যে এটা ছাত্রীদের একটা হস্টেল, মনে হয় বিরাট একটা একান্নবর্তী পরিবারের এতোগুলি কুমারী অন্তঃপুরিকা। উপরে-নিচে, সিঁড়িতে-বারান্দায়, রান্নাঘরে-বাথরুমে লেগেই আছে তাদের সোরগোল আর হুটোপুটি: এ ওর রুটি চুরি করে খায়, ও এর শাড়ি আর গয়না পরে কলেজ করে। একজনের

খামের চিঠি পঁচিশজনের চোখের কাছে আব্রু হারায়। হস্টেলে বসেছে যেন এক ছোটোখাটো কমিউনিজম্‌, এমন কিছু সুখ কেউ ভোগ করতে পারবে না যা থাকবে কারুর একলার এলাকায়. সকলকে ভাগ দেয়া না সম্ভব হোক অন্তত ঘ্রাণে অর্ধ-ভোজনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তাই এদের মাঝে নেই কিছু স্তব্ধ ও সুপ্ত, নেই কিছু গূঢ় ও গোপন। কার বাড়িতে ক'টা জলে উনুন, দু' বেলা ক'খানা পড়ে পাত—সমস্ত হাঁড়ির খবর তাদের মুখস্ত, এমনকি কোনো ভিজিটার যখন সদর দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দেয় : দারোয়ান, তখন, মাত্র গলার আওয়াজ পেয়ে, তারা বলে দিতে পারে কার কাছে কোন দাদা বা মামা বা জামাইবাবু এসেছেন। সবাই মিলে পেতেছে একটা কৌমার-'কলোনি' : এক তোড়ায় গুচ্ছীকৃত কতোগুলি বিচিত্রিত ফুল, পাপড়ির বিকাশোন্মুখতায়, রঙে-রেখায় যা এদের একটু তারতম্য—কেউ বা গাঢ়, কেউ বা পাতলা ; কেউ বা মদির, কেউ বা মিঠে—তফাতটা বিশেষ কিছু চোখে পড়ে না।

ইন্দ্রাণী ছিলো জয়ন্তীর গ্রুপে—যদিও কলকাতায় তার কেউ আত্মীয় নেই। ভিজিটার্স লিস্টটা তার শূন্য, কোনো নাম দেয়া হয়নি। বরাদ্দ দিনে সে-ই বেরোয় শহর ঘুরতে, বাজার করতে, পাড়া-বেপাড়া বেড়িয়ে আসতে : কেউ যদি বা তার সঙ্গে দেখা করতে আসে, নেহাত সে কলেজের কোনো ছোকরা মাষ্টার (নোটের খাতা দিতে অগ্রিম), বা দৈনিক ইংরিজি কাগজের কোনো সাব-এডিটার (তাদের যুগনারী সমিতির রিপোর্ট নিতে)। এমন কেউ আসে না যার সঙ্গে, দুই চেয়ারের মাঝে টেবিলের সামান্য একটা কাষ্ঠ ব্যবধান রেখে, বসে-বসে গলা ছেড়ে গল্প করা যায়। এমন কেউ নেই যার জন্যে সপ্তাহে অন্তত একটা দিনও প্রতীক্ষায় সে থেকে থেকে উচ্চকিত হতে পারে।

সুদর্শনের কথা জয়ন্তীর মুখে সে এতো শুনেছে যে তার মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয়েছে জয়ন্তী তাকে দস্তুরমতো ভালোবাসে কি না। তা হয়তো বা একটু বাসে, তেমন গভীর কিছু হলে বলতে সে বাধ্য থাকতো নিশ্চয়, কিন্তু সুদর্শনকে সচক্ষে সেদিন দেখে তার এই ভেবেই আশ্বস্তি হলো যে হিন্দুমতে বিয়েটা তাদের অচল। আর যে-ভালোবাসা বিয়েতে সম্পূর্ণতা পায় না তাতে ইন্দ্রাণীর সায় নেই : এ যেন কলের জলে গঙ্গাস্নান করা, টাইম-টেবল পড়ে বিদেশে বেড়ানো। দেহ আর মনে এমন নিকট সম্বন্ধ, যেমন পেয়ালা ও তার হাতলের—হাতল বাদ দিয়ে গরম পেয়ালায় কে চুমুক দিতে যাবে ?

ব্যাপারটা ঘটেছিলো এমনি :

ইণ্টারমিডিয়েট্‌ পরীক্ষা তখন আসন্ন, বিকেলের দিকে পঠনক্লান্ত জীর্ণ

শরীরটাকে একটু হাওয়া খাইয়ে আনা দরকার। অথচ মন এখন উৎকণ্ঠায় এতো অবসন্ন যে নিজে থেকে মৌলিক কোনো গবেষণা করে যেখানে-খুশি বেরুনো চলে না, শুধু কারুর সস্নেহ কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করে একটু ফাঁকায় এসে বিশ্রাম করতে ইচ্ছা করে। তেমনি এক সন্ধ্যায় জয়ন্তী তার গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো: চোখের আর মাথা খাস্‌নি, ইন্দ্‌রি, ওঠ, বেড়াতে চল।

ইন্দ্রাণী শুকনো, শ্রান্ত চোখ তুলে বলল—কোথায়? আমার কিন্তু ভাই আজ বিকেলেই 'হাইপথেসিস্'টা মুখস্ত করে ফেলবার কথা।

—থাক, মুখস্ত না করলেও তুই ফার্স্ট হবি। জয়ন্তী গলা নামিয়ে বললে —সুদর্শনদা আমাকে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইছেন। তুইও চল, বাড়িটা একবার বোঁ করে ঘুরে আসি। একটু ঘুরে এলে আবার খানিকটা পড়বার ইম্‌পেটাস্ পাবি' খন।

ইন্দ্রাণী আবিষ্ট চোখে বললে—বা, তোদের সঙ্গে আমি কেন যাব?

—এই ত্যাখ্‌, দর্শনদার মা, আমার পিসিমা, চিঠিতে তোকে যেতে লিখে দিয়েছেন। বিকেলে ঢু'ঘণ্টা ঘুরে এলে তোর লজিকের বদহজম হবে না। নে, ওঠ, সবার সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে যাবে। জয়ন্তী হাসলে: বলে-বলে তোকে এতো ফুলিয়েছি যে সবাইকে না দেখাতে পারলে আমার আর মুখ থাকে না। চোখে মুখে জল দিয়ে নে, দর্শনদাকে বলে দিলাম তুই যাবি। তুই যাবি শুনে দর্শনদা স্ট্রেইট একটা ট্যাক্সি আনতে গেছে।

পরিচয়ের সেই প্রথম সন্ধ্যাটা ইন্দ্রাণীর কি চমৎকার কেটেছিলো! মাঝারি মধ্যবিত্ত একটি পরিবার, অনেকগুলি শিশুর বসেছে মেলা, ঘরে দুয়ারে লোক-জনের আচারে চেহারায় বিশিষ্ট একটি সম্ভ্রান্ততার ছাপ। তাকে দেখে সুদর্শনের মা সৌদামিনী গদগদ, বৌদিদিরা নীরদা আর নিভা একেবারে বিহ্বল। তুষার চুড়া থেকে যেন পার্বতী নেমে এসেছে; উপন্যাসের পৃষ্ঠা থেকে নতুন নায়িকা। সাদাসিধে পোশাকে ও সহজ কথাবার্তায় সে একেবারে ঘরের মেয়ে। স্তুতিতে দিঙ্মণ্ডল মুখর হয়ে উঠলো। থালা ভরে খেতে দিলো, ইন্দ্রাণী যদি কিছু না মনে করে—সৌদামিনী তাকে একখানা নতুন শাড়ি দিয়ে প্রণামের বিনিময়ে আশীর্বাদ করলেন। বিনিময়ে ইন্দ্রাণী গোটা কয়েক গান শোনালো, প্রচুর খেলো আর উচ্চগ্রামে খিল-খিল করে হাসলো। সবার সঙ্গে মিশে গেলো সমতল জায়গায় জলের মতো তরল হয়ে। এমন মেয়ে আর হতে নেই।

এ-ঘর ও-ঘর করতে করতে জয়ন্তীর সঙ্গে তার দর্শনদার পড়ার ঘরেও সে ঢুকেছিলো বৈকি। বইয়ের পাহাড়ে দেয়াল পড়েছে ঢাকা, মেঝের উপর চেয়ার-

টেবিল এতো গাদি করা যে মেপে-মেপে পা ফেলতে হয়। কাগজের সোঁদা গন্ধে ঘরের বাতাস স্যাঁতস্যাঁত করছে, ক্ষণকালের জন্যে জীবন যেন দুর্বহ হয়ে ওঠে। তবু, ইন্দ্রাণীর কাছে, সেই ছিলো সুদর্শনের বিস্ময়, ছাত্র হিসেবে তার উত্তুঙ্গ কৃতিত্ব। সুদর্শনের দুই চক্ষু যেন অতলসঞ্চারী অক্ষর-সমুদ্রের উড়ন্ত দুই পাখি। তার স্বাস্থ্যস্ফূর্ত সমস্ত শরীরে যেন একটা বিশালতার আভাস। তাকে এই অনুপাতে দেখে ইন্দ্রাণীর দস্তুরমতো ভয় করতে লাগলো—ভক্তিমূলক ভয়। কিন্তু সহজ হওয়ার মতো সুখ নেই, তাই সে আলাপ শুরু করলে—এবারে কলকাতার হকি লিগ্‌ নিয়ে, স্টেনোগ্রাফি শিখলে বাঙালী মেয়েরা গভর্নমেণ্টের আপিসে চাকরি পেতে পারে কি না, ক্রস্‌-সুদ্ধু সেণ্ট পলস ক্যাথিড্রালটা ক'শো ফিট্‌ উঁচু। কিন্তু বিদ্যায় অতো অভ্রভেদী হয়েও সুদর্শন তার গলায় পেলো না সহজ স্বর, ব্যবহারে পেলো না সহজ পরিমিতি। রয়ে সয়ে সব কথারই সে উত্তর দিলে, অথচ পরীক্ষার খাতায় যেমন সে দীপ্তি দিতে পারতো, কথায় আনতে পারলে না তার এতটুকু ছটা। নিতান্ত ভালোমানুষের মতো অনবরত সে থেমে উঠতে লাগলো। সঙ্গে জয়ন্তী ছিলো বলেই যা রক্ষে।

আলাপের সেই ক্ষীণ সূত্রপাত থেকে দিনে-দিনে তাদের মধ্যে রচিত হয়ে উঠলো স্বপ্নের কুজ্ঝটিকা, কল্পনার যতো সব সূক্ষ্ম কারুকাজ। কাউকে কারুর কিছু বলে দিতে হলো না, দুজনের মাঝেকার অপরিচয়ের ব্যবধানটা দেবতাদেরও অজানতে হয়ে এলো ঘনতরো। ইন্দ্রাণীর বি-এর দুই বৎসর, পুরো। ভিজিটার্স-লিস্টে নাম ঠিক খাতায়-কলমে না উঠলেও ইন্দ্রাণীর জীবনে সুদর্শনই হচ্ছে প্রথম ও পরম অতিথি। দেখতে-দেখতে দু'য়ের মাঝেকার টেবিলটাও উঠে গেল ও তারা লোহার চেয়ার দুটো এতো ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে লাগলো যে সামনের পর্দাটা আর পুরোপুরি টেনে না দিলে চলে না।

কিন্তু, দুজনে হাওয়াই কেবল খাচ্ছে, স্বাস্থ্যবৃদ্ধির কিছু সূচনা দেখা যাচ্ছে না। ভয়েল্‌ বা দিশি পপ্‌লিন কেনা বলো, চশমার নাকী বদ্‌লানো বলো, এখানে ওখানে নিয়ে যাওয়া বলো—দর্শনই ইন্দ্রাণীর বাহন। ও সব তুচ্ছ মেয়ে-হস্টেলিপনা ছেড়ে দিই, দর্শন তাকে হোয়াইটওয়েতে নিয়ে গিয়ে চা খাইয়ে আনে, লেস্‌লির থেকে মোটর ভাড়া করে ডায়মণ্ড হারবার ঘুরে আসে, ইটুলির পাঁচমাইল পুবে তপ্‌সিয়ার বিলে গিয়ে টিল্‌ আর স্নাইপ্‌ শিকার করে। কখনো-কখনো ছুটি বুঝে, চালাকি করে জয়ন্তী-সুদ্ধু তাকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে আনে, জয়ন্তীকে রান্নার তত্ত্বাবধানে পাঠিয়ে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চালায় সে এ্যাকাডেমিকেল তর্ক। তবু এতো করেও মুখ দিয়ে তার আসল কথা বেরোয় না। শরীর যখনই

উচ্চারিত হতে চায়, তার উপর তক্ষুনি আনে সে মনের শাসন। স্পর্শের উত্তরে মাত্র একটি নিরুত্তাপ সহানুভূতি, সান্নিধ্যের উত্তরে একটি নিঃশব্দ নিষ্ক্রিয়তা। এই বেশ, এই অপরূপ।

দর্শনের কাছে ইন্দ্রাণী ছিলো কাব্যের নায়িকা, শেলির অশরীরী কল্পনা। সেও যে একটা বাস্তবতার রূঢ় দাবি করতে পারে তার কোথাও যেন সেই সঙ্কেত উহ্য নেই। তাকে তার ভালো লাগে বটে, তার ক্ষিপ্র আঙুলের অগ্রভাগ থেকে বিনম্র চক্ষুর দীঘল পালকগুলি পর্যন্ত—কিন্তু সেই ভালোলাগাকে ভোগে আবিল করতে তার ভীষণ মায়া করে, বাধে যেন তার কাব্যের সৌন্দর্যবোধে। তাই প্রচ্ছন্ন ও প্রগাঢ় হাওয়া ছাড়া হতে পারে না সে প্রচুর, হতে পারে না সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

দেহের বাতায়নে বসে ইন্দ্রাণী তার অনেক—অনেক প্রতীক্ষা করেছে। তার ভালো-লাগাকে সে উপন্যাসের বর্ণচ্ছটাময় বর্ণনার মাঝে পর্যবসিত করেনি, সেই অবস্থা অতিক্রম করে সে চলে এসেছে এখন ভালোবাসার জীবনে, জীবনের ভালোবাসায়। মহম্মদ যদি পর্বতের কাছে না আসেন, পর্বতকেই পথ করে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। এমন একটা বিশাল অনুভূতি নিষ্প্রাণ কাব্যের জন্যে নয়, জীবনের মুহূর্ত-প্রবাহের মাঝে তাকে সঞ্চারিত করে দিতে হবে। এতে নেই আর কোনো কুণ্ঠা। একেবারে উলঙ্গ, খরতরো মুক্তি। জীবন দিয়ে যা অনুভব করলাম, জীবন দিয়েই তা ভোগ করতে হবে।

দর্শন যে তাকে ভালোবাসে তাতে তার নিজের সন্দেহ থাকলেও ইন্দ্রাণীর নেই। তার মুখের গাঢ়তায়, চোখের নির্নিমেষ স্নেহে স্খলিত স্পর্শের উত্তাপে পেয়েছে সে তার অগাধ পরিচয়। তার মনের দর্পণে পড়েছে তার মনের প্রতিবিম্ব। অনেক সে পড়েছে বলে কেমন যেন সে দ্বিধাগ্রস্ত, নির্জীব হয়ে পড়েছে। কেমন যেন সে হ্যামলেটিশ। চেহারায় এত বড়ো একটা জোয়ান হয়েও মনে-মনে যে এতো ছোটো, কাপুরুষ হতে পারে তার উপর সত্যিই ইন্দ্রাণীর করুণা হয়। নাগালের মাঝে যে জল, তার জন্যে ট্যান্ট্যালাস্‌এর মতো পিপাসার্ত হয়ে শুকিয়ে মরতে দেখাও দুর্বিষহ। একটুমাত্র অধ্যবসায়, আর এক ধাপ মাত্র বাকি। মাত্র মুখের একটা ডাক। পড়ে-পড়ে স্নায়ুমণ্ডলী তার শিথিল, দৃষ্টি অপরিচ্ছন্ন, বুদ্ধি একটু ভোঁতা হয়ে গেছে বোধ হয়। নিজে থেকে কিছু করবার যেন তার প্রেরণা নেই, সময়ের হাতে নিজেকে সে আলগোছে যেন তুলে দিয়েছে। ছি, ছি, মাত্র আলস্য করে যা সে হারাবে, সমস্ত স্বর্গ-মর্ত মন্থন করেও তার সে পুনরাবিষ্কার করতে পারবে না। সে কি পাগল না আর কিছু!

ইন্দ্রাণী যখন কায়মনোবাক্যে তার ভালো চায়, তবে কখ্‌খনো তাকে সে এই

ভুল করতে দেবে না। ইন্দ্রাণী ছাড়া সমস্ত সংসারের সসম্মানে আর কার সে মুখাপেক্ষী হতে পারবে? থাক, আর দূর আকাশের তারার আলো হয়ে দরকার নেই, ইন্দ্রাণী হবে তার শিয়রের কাছে স্নিগ্ধ মোমের আলো। কবির কল্পনার জন্যে ভাড়া না খাটিয়ে নিয়ে আসুক তাকে সে তার ভাঁড়ার ঘরে, লাইব্রেরীতে। পেটে খিদে, মুখে লাজ—এমন দুর্বল গোবেচারা পুরুষের জন্যেই কিনা তার স্নেহের আর অন্ত নেই! ইন্দ্রাণীর ভারি হাসি পেলো, কিন্তু ব্যাপারটা হাসির মতো অতো হালকা নয়।

॥ ৫ ॥

পাস্-ফিলজফির শেষ পেপারটা সাব্‌মিট করে ইন্দ্রাণী কম্পাউণ্ড পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। গেটের বাইরে দর্শন দাঁড়িয়ে আছে। পরীক্ষার এ ক'দিন সেই ইন্দ্রাণীর খবরদারি করছিলো।

ইন্দ্রাণীর বাঁ হাতের মুঠো থেকে নীল্‌চে কোশ্চেন-পেপারটা টেনে নিয়ে দর্শন কৌতূহলী হয়ে জিগ্‌গেস করলে: কেমন হলো?

—ও আবার হবে কি? তেত্রিশ তো নম্বর! ইন্দ্রাণী দর্শনের হাতে একটা ঠেলা দিলো: তুমি মেটাফিজিক্সের বোঝ কি ছাই! চলো, আমার ভারি খিদে পেয়েছে।

কোশ্চেন-পেপারটা চার ভাঁজ করে মুড়তে মুড়তে দর্শন বললে—কোথায় এখন যাবে? হস্টেলে?

—হস্টেলে না জাহান্নমে। আমার আজ এক্‌জামিন শেষ হলো, আর এখুনি কিনা আমি ফের খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢুকি। বুদ্ধিকে তোমার বলিহারি। ইন্দ্রাণী ফুটপাতের উপর ডান পায়ে ছোট-ছোট দুটো লাথি মারলে: যা করবার হয় করো, আমার খিদে পেয়েছে নিদারুণ।

দর্শন বললে—কি খাবে? কোথায়?

—বা, আমি কি জানি, তুমি আছ কি করতে?

—চলো বিডন স্ট্রীটের দিকে এগোই, ট্যাক্সি একটা পেয়ে যাবো আশা করি।

—লেট আস হোপ, নইলে সটান বাস্‌এ। এখনও চীপ্ মিড ডে আছে। ইন্দ্রাণী হেসে ফেললো: পয়সা পকেটে যা আছে, বাঁচাও—আমার আজ একেবারে ভীমের মতো খিদে পেয়েছে। কোথায় নিয়ে যাবে বলো তো? বলতে-বলতে বাঁ হাত তুলে এস্‌প্লানেড-গামী দোতলা একটা বাস্‌কে সে দাঁড় করালো।

—না, না, বাস্‌এ কেন?

রাস্তাটা পেরোতে-পেরোতে ইন্দ্রাণী বললে—চলে এসো, ট্যাক্সির জন্যে অতোক্ষণ ওয়েট্ করার আমার সময় নেই।

এসপ্লানেডে নেমে দুজনে উঠলো এসে চাঙউয়া রেস্টোরাণ্টে, ওটুকু রাস্তা পায়ে হেঁটেই। রোদকে সামান্য আড়াল করবার জন্যে ইন্দ্রাণী আঁচলের প্রান্তটা মাথায় তুলে দিয়েছে ঘোমটার মতো করে; কপালে, নাকের ডগায়, ঠোঁটের উপরে, বুকের উপর ব্লাউজের ধার ঘেঁষে চিক্‌চিক্ করছে রুপালি ঘাম। রোদে শুকনো মুখখানিতে একটি কমনীয় ক্লান্তি, পরীক্ষা দেয়ার শ্রান্তিতে সমস্ত শাড়িতে-শরীরে মধুর একটি অগোছালো ভাব।

দুজনে একটা ক্যাবিন নিয়ে বসলো। বয় দর্শনের চোখের সামনে মেনু-কার্ডটা ধরলো মেলে, সেটা তার হাত থেকে ইন্দ্রাণী প্রায় কেড়ে নিলো। যতো জাঁকালো নাম, তার উপরেই তার ততো ঝোঁক। অর্ডার দিয়ে বেশিক্ষণ বসে থাকতেও সে রাজী নয়। প্রতীক্ষার বোঝা আর সে টানতে পারবে না। তার শরীরের সমস্ত রেখায় উছলে পড়ছে প্রখর অসহিষ্ণুতা: চাঞ্চল্যে সে থেকে-থেকে ঝিলিক দিয়ে উঠছে।

প্রথম কোর্স এসে গেলো—ড্রাই। কাঁটা-চামচ সরিয়ে রেখে লতানো আঙুল দিয়ে ধরে-ধরে সে প্রন্-কাট্‌লেটগুলোতে রাই মেখে-মেখে সাবাড় করতে লাগলো। লোভীর মতো ইন্দ্রাণীর এই রসালো খাওয়া দর্শনের কাছে বিহ্বল একটা ভাবাবেশের মতো চমৎকার লাগছে: কেমন ফুলে ফুলে উঠেছে তার গাল, জিভে দাঁতে লেগে কেমন পিছলে পড়ছে শব্দ। তারপর থেকে-থেকে চল্‌কে পড়ছে হাসি। তার এই খাওয়ার মধ্যে এমন একটি আদিম, বর্বর নির্লজ্জতা আছে যে চোখ দিয়ে তারই স্বাদ নিতে-নিতে দর্শনের আসল খাওয়ার কথা আর ততো মনেই রইলো না।

চলেছে তো, ইন্দ্রাণী একমনে খেয়েই চলেছে। অথচ আসল যে কথা, তাই এখনো সে উচ্চারণ করতে পারছে না। আবহাওয়া তৈরি হবার জন্যে আর সময় দেয়া চলে না, বুলেটের মতো কথাটা এবার সে দর্শনের মুখের উপর ছুঁড়ে মারবে, দেবে তাকে চমকে ছত্রখান করে। হ্যাঁ, যার জন্যে হঠাৎ তার নিদারুণ খিদে পেয়ে গেলো: না, দেরি করা চলে না আর, এই কামড়টা চিবিয়ে গলা দিয়ে গলিয়ে ফেলেই—যা থাকে কপালে আর যা করেন কালী।

দর্শনই হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলো: বি-এ পাস করে এবার কি করবে?

তাড়াতাড়ি ঢোঁকটা গিলে ফেলে কৌতুকোজ্জ্বল চক্ষু তুলে ইন্দ্রাণী বললে—বলো তো কি করবো?

—এম-এ পড়বে আশা করি।

মাথা ঝাঁকিয়ে ইন্দ্রাণী বললে—কখ্খনো না।

—তবে ?

অনেকক্ষণ দর্শনের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ইন্দ্রাণী বললে—বিয়ে করবো।

ইন্দ্রাণীর সেই প্রশান্ত, পরিব্যাপ্ত দৃষ্টির সামনেই দর্শনের মুখ ধীরে-ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে এলো। ধরা গলায় বললে—কাকে ?

তেমনি শাণিত ভ্রূভঙ্গি করে, কোলের থেকে ন্যাপকিন তুলে নাকের তলা থেকে মুখের আধখানা ঢেকে ইন্দ্রাণী বললে—বলো তো কাকে ?

যেন কবরের তলা থেকে দর্শনের গলা এলো : কি জানি !

—বিশ্বের এতো বড়ো একটা মনোয়ারি জাহাজ হয়েও বুদ্ধিতে তুমি যে দেখছি আস্ত একটি গাধাবোট। ইন্দ্রাণী খিল-খিল করে হেসে উঠলো—আমি না বলে দিলে কি করে তুমি বুঝবে বলো ? তবু কিনা জাঁক করে তোমরা বলো বুদ্ধিতে মেয়েরা তোমাদের ইন্‌ফিরিয়ার্।

দর্শন তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো।

—হাঁদার মতো অমন হাঁ করে চেয়ে আছো কি ! ইন্দ্রাণী ডান হাতে ছুরিটা তুলে দর্শনের প্লেটে টুং-টুং শব্দ করতে লাগলো, তার সঙ্গে তাল রেখে-রেখে বললে—তোমাকে তোমাকে, তোমাকে।

চেয়ারসুদ্ধ দর্শন তখুনি লাফিয়ে উঠতো হয়তো, কিন্তু বয় এসে ঢুকলো নিঃশেষিত প্লেটগুলি তুলে নিয়ে যেতে।

সে চলে গেলে দর্শন মুখখানি তৃপ্তিতে নিটোল করে বললে—আমাকে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ইস্ক্রুপ মেরে মাথার মধ্যে ছেঁদা না করে দিলে তো মশায়ের মাথায় বুদ্ধি ঢোকে না। ইন্দ্রাণী নয়নহরণ হাসি হাসলো।

দর্শন বললে—আমাকে বিয়ে করবে কি ? তুমি পাগল হলে নাকি, ইন্দ্রাণী ?

—না, বিয়ে করবে না ! কষ্ট করে তোমার সঙ্গে এই রোদ্দুরে কতোগুলি অখাদ্য খেতে বাস্‌এ চড়ে এইখেনে ছুটে আসবে ! মাগার বাড়ির কি আবদার !

বয় নতুন করে আরেক ঝাঁক ছুরি-কাঁটা রেখে গেলো।

দর্শন ছুরি দিয়ে টেবিল ঠুকতে-ঠুকতে বললে—আমার মাঝে তুমি কি এমন দেখলে, ইন্দ্রা—

মুচকে হেসে ইন্দ্রাণী বললে—দেখলাম তোমার এই পর্বত-প্রমাণ বুদ্ধি।

—তুমি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছ, ইন্দ্রাণী।

মুখের তরলিমা একমুহূর্তে সরে গিয়ে ফুটে উঠলো গভীর গাম্ভীর্য। ইন্দ্রাণী

বললে—এমন একটা ব্যাপার নিয়ে তোমরা ঠাট্টা করতে পারো, আমরা পারি না। এ জিনিসটার গুরুত্ব আমরা যতোটা বুঝি তোমরা তার একবিন্দুও বোঝ না বলে এমন একটা টাট্টার কথা বলতে পারলে।

—ব্যাপারটার গুরুত্বই যদি বুঝে থাকো, দর্শন বললে—তবে আমাকে তোমার নির্বাচন করার কি হলো? আমি একটা কী!

—উঃ, একেই বলে ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স্। ইন্দ্রাণী হেসে বললে—তুমি আবার কী, তুমি একটি গণ্ডার।

বয় পরের কোর্সটা নিয়ে এলো—এবার গ্রেভি।

এতো বড়ো একটা গাল খেয়েও দর্শন ঘাবড়ালো না একটুও। বললে—খাও।

ইন্দ্রাণী বললে—বিশেষ খিদে নেই।

—বা, এই যে তখন বলেছিলে নিদারুণ খিদে পেয়েছে তোমার।

—সে মোটেই ঔদরিক খিদে নয়, স্পিরিচুয়্যাল খিদে। আঙুল দিয়ে মাংস ছিঁড়তে ছিঁড়তে ইন্দ্রাণী বললে—কিন্তু কথাটা অমন চাপা দিলে কেন?

দর্শন মুগ্ধ হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে-চেয়ে বললে—আবার কি করে তুমি সেই কথায় ফিরে আস তারই আশায় বসে ছিলাম।

—তুমি তো চিরকাল বসেই রইলে। ইন্দ্রাণী গলায় একটু ঝাঁজ এনে বললে—আর সমস্ত—এমনকি নিজের বিয়ের বন্দোবস্তটাও কিনা আমাকে একা করতে হলো।

দর্শন বললে—শেষ পর্যন্ত আমাকেই তুমি ঠিক করলে কেন? বারে বারে এই কথাই শুধু আমার জিগ্‌গেস করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

—শেষ পর্যন্ত নয়, গোড়া, থেকেই ঠিক করে আছি।

—আমি তো তার কিছুই জানি না, সত্যি নাকি?

—বইয়ে না যতোক্ষণ লেখা থাকে ততক্ষণ তো তুমি কিছুই জানো না। হাসিতে ইন্দ্রাণী ঝল্‌মল্‌ করে উঠলো: তুমিই যে আমাকে ভালোবাসো, সে কথা তুমি জানতে?

—আমার চেয়ে তুমিই তা বেশি জানো দেখছি। কিন্তু, দর্শন আস্ত একটা আলু মুখে পুরে দিয়ে প্রায় গদগদ হয়ে বললে—তবু, আমাকে তুমি এখনো ভালো করে জানো না, ইন্দ্রা। আমার অক্ষমতা যে কতো—

—অক্ষমতা মানে? শিরদাঁড়া খাড়া করে ইন্দ্রাণী টান হয়ে বসলো।

—না, না, ভয় নেই, হাতের ছুরিটা অমনি উঁচিয়ে ধোরো না। একমুখ

খাবার নিয়ে দর্শন উঠলো হেসে : ভাবার একটা অলঙ্কার করছিলাম মাত্র। অর্থাৎ সামান্য একটা এম-এ পাস করে দু'টি বছর আজ সমানে আমি ভেরেণ্ডা ভাজছি। আমার মাঝে বিয়ে করার তুমি কি পেলে ? তার চেয়ে—

—তার চেয়ে টাকার আণ্ডিল একটা মাড়োয়ারিকে বিয়ে করা আমার উচিত ছিলো।

—না ইন্দ্রাণী, লাইট্‌ হয়ো না। মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য এনে দর্শন বললে—বিয়েটা তোমাদের কাছে তো ভীষণ গুরুতর ব্যাপার। ডোণ্ট বি চীপ, ভেবে দেখ, পাত্র হিসেবে আমি একটা কী !

—পাত্র হিসেবে তুমি একটা পুরুষ। ইন্দ্রাণী চোখ পাকিয়ে বললে—দেখ, আমি ছোটো একরত্তি খুকি নই যে মুখে-মুখে এমন পরীক্ষা নেবে।

—বা, আমার কনে দেখাটা তো সেরে নিতে হবে। দর্শন হেসে উঠলো : অমন ঢের পরীক্ষা তো তুমি দিয়েছ। পরে আঙুল দিয়ে খাবারগুলো আস্তে-আস্তে নাড়াচাড়া করতে-করতে বললে—ডোণ্ট বি র‍্যাশ, ইন্দ্রাণী, তোমাকে আমি খাওয়াবো কি ! একটা চাকুরি-বাকুরি কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।

ইন্দ্রাণী হেসে বললে—তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি না পারো, আমি তোমাকে খাওয়াবো। চাকরি চাও, আমার আণ্ডারে কোনো একটা ইস্কুল-টিস্কুলে একটা দপ্তরি বা দারোয়ানির কাজে ঢুকিয়ে দিতে পারবো অনায়াসে।

—আঃ। চেয়ারে পিঠ ছেড়ে দিয়ে দর্শন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে : তাহলে আর ভাবনা নেই। বিয়ে তবে আমরা কবে করছি ?

এবার দর্শন এগিয়েছে দেখে ইন্দ্রাণী মিইয়ে গেলো। বললে—না, তুমি আগাগোড়া সব ভেবে দেখ, আমি বললাম বলেই তো আর তুমি বিয়ে করতে পারো না।

—বা, তুমি এই মাত্র বললে যে বিয়ে করলে আমাকে চাকরি যোগাড় করে দেবে। এখন কথা ফিরিয়ে নিলে চলবে কেন ? এমন পাত্রী আমি বাঙলা দেশে কোথায় পাবো বলো ?

মুখ গম্ভীর করে ইন্দ্রাণী বললে—না, আমার মুখের কথায় কি এসে যায় ? তুমি যা করবে, নিজে ভেবে দেখ।

হাতের ছুরি ফেলে দিয়ে ইন্দ্রাণীর একখানি হাত মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে দর্শন বললে—ভাববার সময় অনেক পাবো পরে, কিন্তু এমন মুখের কথা সমস্ত পৃথিবী ঘুরলেও আমি শুনতে পাবো না। মুখের এমন কথা ক'জন বলতে পারে ?

হাতখানা সরিয়ে আনতে-আনতে ইন্দ্রাণী বললে—ডোণ্ট বি লাইট ; আমাকে বিয়ে করলে তোমাদের বাড়িতে নিশ্চয়ই একটা গোলমাল উঠবে।

—বা, দর্শন বিস্মিত হয়ে বললে—সে কথা তো আমিই তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম।

—আমার জন্যে ভেবো না, সে বাড়ি আমি ছেড়ে আসছি।

—তবে আমার জন্যে ভাববো ? তুমি আমাকে কি ভাবো বল দেখি ? এই না খানিক আগে বলছিলে আমি একজন পুরুষ ?

—তা তো বলছিলাম, ইন্দ্রাণী ন্যাপকিনে হাত মুছতে-মুছতে বললে—কিন্তু থাক, আমিই সব ম্যানেজ করতে পারবো। আমি তোমার মা'র এমন কিছু অযোগ্য পুত্রবধূ হবো না।

দর্শন চোখ বড়ো করে বললে—কথাটা তুমি অযোগ্য পুত্রবধূ বললে, না, অযোগ্যপুত্র বধূ বললে ?

—যখন হবো না, যাই বলি না কেন, কিছুই এসে যায় না। এবার চলো।

—বা, হয়ে গেলো ? আর কিছু খাবে না ?

—আচ্ছা, নাও দু'টো আইসক্রিম।

—বয় !

নীলচে বাটিতে দুই তাল আইসক্রিম এসে হাজির।

চামচেয় করে ছোটো-ছোটো চুমুক নিতে-নিতে ইন্দ্রাণী বললে—বিয়েটা কোথায় হবে ?

—তাই ভাবছি।

—এ্যাট্ অল্ হবে তো ?

—লর্ড ! দর্শন চেয়ারের পিঠে ঢলে পড়লো : যদি বলো তো, কালকেই।

—কোথায় ?

তার দিকে চেয়ে মুচকে-মুচকে হেসে দর্শন বললে—তাই ভাবছি।

ইন্দ্রাণী ঝরঝর করে হেসে ফেললে।

হাত তুলে দর্শন বললে—আমার মাথায় একটা ব্রিলিয়্যাণ্ট আইডিয়া এসেছে। জয়ন্তীদের ওখানে চলো। ওর স্বামী আমাদের সাহায্য করতে পারবে।

—সে তো রাঁচি।

—মন্দ কি ! বিয়ে আর হনিমুন একজাগাতেই সেরে নেওয়া যাবে। শরৎকে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। কালকেই তবে হয় না অবিশ্যি।

—না হোক। বয়কে বিল আনতে বলো। ইন্দ্রাণী ব্লাউজের ভিতর থেকে

তার ছোট্ট মনি-ব্যাগটি বার করলে : এদিকে আমার পরীক্ষার রেজাল্টটা বেরোক। তুমি ততদিন তোমার মা-দাদাদের মত পেতে চেষ্টা করো।

—সে হচ্ছে, কিন্তু বিলটা তুমিই দেবে নাকি ভেবেছ ?

—রীতিমতো। তুমি আমাকে কষ্ট করে বিয়ে করে খাওয়াবে বলেই তো তোমাকে একটু খাওয়ালাম।

—বা, তখন যে বললে আমাকে পয়সা বাঁচাতে ; আমাকে ট্যাক্সি নিতে দিলে না।

—নিশ্চয়, পরে তোমার পয়সার কতো দরকার হবে খেয়াল আছে ? এখন থেকে জমাতে না শিখলে চলবে কেন ? ইন্দ্রাণী দশ টাকার একটা নোট বার করলো : আমারই বরং পরে আর চাকরি থাকবে না, হাতে যা দু'চার পয়সা আছে তোমার সঙ্গে উড়িয়ে দিয়ে যাই। ডাকো না তোমার বয়কে।

দর্শন বললে—চাকরি থাকবে না বলছ ? বা, এই যে বললে বিয়ে করে আমাকে খাওয়াবে !

—আহ্লাদ ! ইন্দ্রাণী হেসে বললে—চাকরি করবার জন্যে ওঁকে বিয়ে করতে যাবে। তুমি আছো কি করতে ? আমি ও সব জানি না, আমার তখন অনেক কাজ। ডাকো।

বিল চুকিয়ে, খুশিতে ঝলমল করতে-করতে দুজনে বেরিয়ে এলো। দরজার সামনেই ট্যাক্সি, হেঁটে বাস্ ধরবার কোনো মানে হয় না এখন। এখন নির্ব্যবধান নিবিড়তা, এখন উদ্দাম উন্মুক্ত গতি।

দর্শন বললে—তুমি বিয়ে করছ শুনে হস্টেলের তোমার যুগনারীর মেয়েরা তোমাকে ফাঁসি দেবে। বিয়ে করাটা তো তাদের মতে একটা লজ্জার ব্যাপার।

—কোনো সুস্থ মেয়ের মতেই নয়। বিয়ে না-হওয়াটাকেই যারা বিয়ে না-করা মনে করে আমি তাদের দলে নই। আমি জীবনকে ভীষণ ভালোবাসি, কথাটা চীপ্ ক্ল্যাপ্ ট্র্যাপ্-এর মতো শোনাচ্ছে নাকি ? কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ইন্দ্রাণীর মাথাটা দর্শনের কাঁধের উপর প্রায় নেমে এলো : দেয়ার কুড্ বি নাথিং হায়ার দ্যান্ দি পারপাস্ অফ হিউম্যান লাইফ্।

তার কপালের কাছেকার চুলগুলিতে হাত বুলোতে-বুলোতে দর্শন বললে—গাড়িটাকে কোথায় যেতে বলবো ?

—আইনের টেক্‌নিক্যালিটি না থাকলে এখুনিই আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যেতে বলতাম ! তার যখন দেরি আছে এখনো, আপাতত হস্টেলেই ফিরে যাই।

॥ ৬ ॥

মাঝের মাস তিনেক, মানে, ইন্দ্রাণীর রেজাল্ট না বেরুনো পর্যন্ত, কোনো রকমে তারা সাঁতরে পার হলো। পার হলো বটে, কিন্তু দর্শন তার এরকম বিয়েতে কিছুতেই বাড়ির মত করাতে পারলো না।

মত করাবার খানিকটা দরকার ছিলো বৈকি। ভালোবাসার অভিনয়টা গুরুস্থানীয়দের চোখের আড়ালে ঘটতে পারে, কিন্তু বিয়ে নামক বিজাতীয় ব্যাপারটার উদ্দেশ্যই হচ্ছে সেটাকে প্রকাণ্ড একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া। আগুন চেপে রাখা যায়, কিন্তু বিয়ে কখনো গোপন করা যায় না। এ হেন একটা রাজকীয় ব্যাপারে তাঁদের নিশ্চয়ই একটা সম্মতি চাই যাঁরা প্রতি মাসে তাকে হাতখরচের টাকা দিয়ে যাচ্ছেন। আর সে টাকার সংখ্যাটা তার পক্ষে নিতান্ত সূক্ষ্মদেহী নয়! সিজ্‌ন্ চলে গিয়েছে বলে টিউশনির বাজার এখন মন্দা—জুলাই পর্যন্ত চলবে এ ডিপ্রেশান্। ততোদিন ফুটবল চলবে পুরোদমে, রোদে তেতে বৃষ্টিতে ভিজে.. তারপর আছে চায়ের দোকান। বাস্ দু'মিনিট দেরি হয়ে গেলেই ট্যাক্সি। ততোদিন বায়স্কোপগুলোও বন্ধ থাকবে না। খাই না-খাই—খরচের তো আভিজাত্য আছে। চারটে মাস তো সমানে—বড়দা না হলে মেজদা, মেজদা না হলে মা, এমনি দোরে-দোরে ফিরতে হবে! তারপর দাদার মেস্‌এ আছে—খাওয়ার খরচ, সিটরেণ্ট লাগে না, দিব্যি আরামে আছে গা ঢেলে। অন্তত মুখের একটা মত চাই বইকি। সব চেয়ে বড়ো বিপদ হচ্ছে এই যে কয়েকমাস আগে থেকেই 'বিয়ে করবো না' 'বিয়ে করবো না' বলে একটা সে হাইদরি হাঁক তুলেছিলো, অন্তত নিজের গোড়ালিতে ভর দিয়ে দাঁড়াবার আগে পর্যন্ত মাড়াবেন না সেই হাটের রাস্তা। এতো ডঙ্কা বাজিয়ে এখন সানাই ধরতে তার লজ্জা হচ্ছে। এতো ঝলসে এখন একেবারে চুপসে যেতে নিজের কাছেই কেমন বিশ্রী লাগছিলো।

তবু কথাটা পাড়তেই হয় কোনোরকমে। ক'দিন থেকে সে একটা ধুয়ো ধরলো: কাজকর্ম হচ্ছে না, চুপচাপ বসে আছি হাত পা ছাড়িয়ে বিয়ে এখন একটা করে ফেললেই তো পারি।

মেজ বৌদি টিপ্পনি কাটলেন: ভাটার নৌকো আবার উজান যেতে চায় কোন হিসেবে? এই না খুব হুঙ্কার দিচ্ছিলে যে লাইফে কোনোদিন বিয়ে করবে না।

দর্শন বললে—বা, তেমন মেয়ে হলে কখখনো বিয়ে করবো না বলেছি? নেভার।

—আর তেমন মেয়ে নয়, ঠাকুরপো, এখন যেমন তেমন একটা হলেই হয়।

সঙ্গে-সঙ্গে হাসলেও কথাটা উঠতে বসতে বাড়িময় এমন রাষ্ট্র হয়ে গেলো যে সৌদামিনী আর আড়ালে থাকতে পারলেন না। দর্শনকে নিভৃতে পেয়ে বললেন: কি, এখন মত বদলেছে নাকি? ছাখ, হাতে এখনো এক গাদা সম্বন্ধ আছে. বলিস তো নাড়াচাড়া করে দেখি, সুরেনকে বলি।

দর্শন, যা তার স্বভাব, কথাটার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারলো না সাহস করে। অস্পষ্ট, প্রায় অতীন্দ্রিয় একটা ইঙ্গিত করে সে বললে—তুমি পাগল হয়েছ মা, ওসব বাজে, রট্‌ন্ মেয়ে আমি বিয়ে করবো নাকি?

মা আধো-খুশী আধো-শঙ্কিত হয়ে বললেন—না দেখেই মত দিয়ে ফেলিস না—

—না মা, দেখেই বলছি। কথাটাকে আর টানবার সাহস না পেয়ে দর্শন গেলো বাহাদুরি দেখাতে: বিয়ে যদি করবো তো একটা সমাজসংস্কারের দৃষ্টান্ত দেখাবো। নইলে কি ছাই বিয়ে করছি।

ছেলের অন্যান্য প্রলাপ ঘোষণারই একটা মনে করে সৌদামিনী সকৌতুকে জিগ্যেস করলেন: সেটা কি?

—একটা আন্তর্জাতিক-বিবাহ।

—সেটা আবার কি উৎপাত!

—অথবা বলতে পারো প্রতিলোম বিবাহ। কায়স্থের ছেলে হয়ে একটি ব্রাহ্মণ-কন্যার পাণিগ্রহণ করবো। জল বা জীবন দুই অর্থেই।

সৌদামিনী মুখ গম্ভীর করে বললেন—ফাজ্‌লামো করিস নে! এবার আর গড়িমসি নয়, বিয়ে দিয়ে দি। ঘরে লক্ষ্মী এলে যদি কিছু ছিরি ছাঁদ ফেরে। সেই এম-এ পাস করার পরই যদি বিয়েটা করতিস, পাওয়া-থোওয়া নিয়ে ভাবনা থাকতো না। এখন যতোই দিন যাচ্ছে গুণমণির ততোই শশিকলা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তখন ছিলি সোনার মেডেল পাওয়া ছেলে, এখন একজন ভাড়াটে বাড়ির মাস্টার। এ অবস্থায় কে তোকে কি দেবে ভেবেছিস? এতো সাধের তুই, তোকে দিয়ে আর কি পাওয়া যাবে?

—সর্বনাশ! তারপর আবার দেনাপাওনার কথা আছে যে। দর্শন চোঁচা পালিয়ে গেলো।

ইন্দ্রাণীকে গিয়ে বললে—বাড়ির মত করাতে পারবো বলে মনে হয় না। তা,

ঐ রিস্‌ক আমি নেবো, হাজার বার নেবো! রোজগার করতে পারলেই জানো ইন্দ্রাণী, সমাজ পর্যন্ত পায়ের কাছে কুকুর হয়ে থাকে। যতো অত্যাচার তাদেরই উপর, যারা গরীব, যারা দুর্বল, তুমি কিছু ভেবো না, ও ঠিক হয়ে যাবে। কোথাও ফেলতে পারবে আমাকে? দর্শন হো-হো করে শিশুর মতো হেসে উঠলো: মা'র কোলের ছেলে, দাদাদের ফুল ব্রাদার।

ইন্দ্রাণী সামান্য গম্ভীর হয়ে বললে—না, আমি কিছু ভাবছি না। তবু, বিয়ে করে আমরা কিন্তু তোমাদের বাড়িতে গিয়েই উঠবো। তুমি টাকা রোজগারের কথা ভাবছ, আমি ভাবছি, আমি এতোদিন কি লেখাপড়ার চর্চা করলাম—বাড়িসুদ্ধু সবাইকে যদি না বশ্ করতে পারি তবে এতোদিন কি সাইকোলজি পড়লাম ছাই। মা-ই বা আমাকে কেমন করে ফেলেন আমি দেখবো। ইন্দ্রাণী হাসলো: তাঁর অকর্মা খোঁড়া ছেলেটিকে সেবা করতে দেখে তিনি নিশ্চয় স্বস্তিই পাবেন, কি বলো?

দর্শন বললে—এই খোঁড়ারাই আসল যুদ্ধ করে, ইন্দ্রাণী, কেন না পালানো তাদের পক্ষে অসম্ভব! ভয় হয় তোমার মতো এই সব পলায়নক্ষম সুস্থ ব্যক্তিদের দেখে।

ইন্দ্রাণী তার হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—কিছু তোমার ভয় নেই। সে আমি—আমি—আমি।

সাহস পেয়ে দর্শন মাঝের ক'টা দিন একেবারে চুপ করে গেলো। রাঁচি যাবার দিন সকালবেলা মাকে বললে, এক বিয়েতে যাচ্ছি: বিকেলে বৌদিদিদের বললে, যাচ্ছি বিয়ে করতে।

পাগলে কি-না বলে!

সত্যি-সত্যি! রাঁচি থেকে দর্শনের প্রকাণ্ড দুই চিঠি এসে হাজির—

একখানা শ্রীযুক্তা মাতৃদেবীর কাছে, অন্যখানা বড়দার। প্রথমটা বাংলায়, দ্বিতীয়টা ইংরিজিতে। চিঠি পড়ে বাড়িসুদ্ধু সবাই একদিন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। বৌদিরা পর্যন্ত নেপথ্যে একটা ঠাট্টা করতে পারলো না। নাম নেই, ধাম নেই, রাঁচির কোন এক ক্রিশ্চানিকেই বিয়ে করে বসেছে হয়তো। আবার লিখেছে: বৌ নিয়ে বাড়ি ফিরছি শীগ্‌গীর। কুলোয় করে তাদের বরণ করবে, না, কুলোর হাওয়ায় তাদের বিদায় করবে—সৌদামিনী হাপুস চোখে কাঁদতে বসলেন।

বড়দা বললেন—কি কাঁদতে লেগেছে মা, ও হচ্ছে ওর একটা রসিকতা। ভাবলে একটা ভজ্ দিয়ে খানিকটা সবাইর হুঁশ করা যাক। পাজিটা একবার আসুক। ঘাড় ধরে এবার যদি না ওর বিয়ে দিয়েছি তো কি!

সেটাকে বড়ো বেশি কেউ রসিকতা বলে ধরে নিতে পারলো না, যখন দেখা গেলো, একদিন সকালবেলা সঙ্গে একটি মেয়ে নিয়ে দর্শন বাড়ি ঢুকছে। গাঁটছড়া অবিশ্যি বাঁধা নেই, কিন্তু সদ্য সিন্দুর মাখানো সিঁথিটা একেবারে তক্‌তক্ করছে নতুন। ঐ চিঠির পর, এ মেয়ে আর দর্শনের বৌ না হয়ে যায় না।

সকালবেলা—বাড়িসুদ্ধ্ লোক উপস্থিত। দর্শন ও তার সঙ্গের মেয়েটি বলা কওয়া নেই একে-একে সবাইকে প্রণাম করতে লাগলো। আগে দাদাদের, বৌদিদি দুজনকে, সবশেষে দূরে-দাঁড়ানো মাকে। শুধ্ মা'র কাছে এসে দর্শন অস্ফুটস্বরে বললে—আমার বৌ, মা।

নিচটা তখন এতো স্তব্ধ যে সবাইর কানেই কথাটা প্রবেশ করলো। সবাইর সম্মিলিত দৃষ্টি একটি তীক্ষ্ণ সরল রেখায় ইন্দ্রাণীর মুখে এসে বিদ্ধ হলো। সৌদামিনী প্রায় একটা আর্তনাদ করে উঠলেন : এ কি ইন্দ্রাণী না?

নীরদা বলে উঠলো : আরে, সেই ইন্দ্রাণীই তো। এ কি কাণ্ড!

নিভা চোখ কপালে তুলে বললে—হ্যাঁ, সেই দিনই তো আমার সঙ্গে বসে এক থালা লুচি খেয়ে গেলো। এ কি সর্বনেশে কথা। পেটে-পেটে এতো বুদ্ধি!

নিতান্তই যখন ভাদ্রবধূ—তখন ভাসুররা আর সেখানে কি করে দাঁড়িয়ে থাকেন। শুধ্ বড়দা গম্ভীর গলায় বলে গেলেন : বিয়েই যখন করে এসেছে, একবার এক ঝাঁক উলু দাও।

সৌদামিনী ইন্দ্রাণীর মুখের সামনে এসে ফোঁস করে উঠলেন : কেমন ভালো মানুষের মেয়ে তুমি শুনি? শেষকালে আমার ছেলের মাথাটা তুমি চিবিয়ে খেলে?

ইন্দ্রাণী কোনো কথা বললো না, শান্ত মুখে দাঁড়িয়ে রইলো। সে-এমনি তরো একটা অভিবাদনের জন্যেই প্রস্তুত হয়ে ছিলো, কিন্তু একেবারে এতোটা হয়তো আশা করেনি। এর আগে যতোবার সে এ বাড়ি এসেছে, পেয়েছে অবারিত অভ্যর্থনা, প্রায় একটা অভ্রভেদী সম্মান—দু'টি দিনেই সে সুর যাবে বদলে, সম্পর্ক যাবে উল্‌টে, এতোটা সে সময়ের এই চির পরিবর্তনশীলতার মধ্যেও কল্পনা করতে পারতো না, যতোবার এসেছে, সবার সঙ্গে মিশেছে সে মন খুলে, কতো গান, তুলেছে কতো হাসির তরঙ্গ। এ বাড়িতে এসে বরং দর্শনের সঙ্গেই তার দেখাশোনা হতো না : এদের সবার কাণ্ড-কারখানা দেখলে মনে হতো ইন্দ্রাণী যেন এদেরই কাছে বেড়াতে এসেছে, তাদের সে কতো চেনা কতো আপনার। এতোদিনের এতো পরিচয় আজ তার সত্যিকারের পরিচয় দিতে গিয়েই ভিস্তে গেলো, এতো হাসি-হুল্লোড়, এতো গান-বাজনা, কিছুতেই কিছু সুরাহা হলো না। আজ যেন এরা চিনতেই পারছে না ইন্দ্রাণীকে : আজ সে যেন তাদের কতো পর হয়ে এসেছে।

ছেলের বন্ধু হয়ে আসতে কোনো বাধা নেই, যতো অপরাধ ছেলের বধূ হয়ে আসতে। অথচ ইন্দ্রাণী এমন একটা সমাজান্তর্ভুক্ত কাজ করলে, বিবাহের চেয়ে বড়ো কিছুতে জোর দিলো না! কিসে মানুষের মনের আবহাওয়া বদলে যায় বোঝা মুশকিল। অথচ ইন্দ্রাণী সেই ইন্দ্রাণী: মেয়ে-পুরুষের গুণানুসারিক তারতম্য বিচারের তর্কে দর্শনের বিরুদ্ধে বৌদিদিদের হাতে সেছিলো একটা প্রকাণ্ড দৃষ্টান্ত, আজ বিদ্যার্জনের কৃতিত্বটা পর্যন্ত তার পক্ষে একটা অনপনেয় কলঙ্ক, চরিত্র শৈথিল্যেরই ও-পিঠ, যে গুণ আগে তার রূপবর্ধন ছিলো, এখন তাই হয়েছে, একটা শারীরিক কদর্যতা। পড়ে-পড়ে তার চোখ খারাপ হয়েছে, এটা আগে ছিলো একটা সকৌতুক কৌতুহলের বিষয়, এখন তা একটা জাজ্বল্যমান নির্লজ্জতার। আগে তাকে যে-ই দেখেছে সেই একবাক্যে বলেছে সুন্দর। তার রূপবিচারে মাত্র তখন দেহটাকেই মানদণ্ড বলে ধরা হতো না, তার মাঝে ছিলো তার খ্যাতির দীপ্তি, গানের লাবণ্য, প্রতিভার আলো, আজ সে সব প্রসাধনের অস্তিত্ব নেই: আজ নাকটা তার কতোখানি বেঁটে, মুখের হাঁ-টা কতো বড়ো, চোয়ালটা কতো চওড়া। মাথার চুল পাতলা। যাকে বলে খড়ম-পা। তখন খোঁপা ফুলিয়ে জুতো পরে আসতো যেতো—কে অতো তা লক্ষ্য করেছে? অথচ, আগে একদিন সৌদামিনীই চিবুক ধরে সোহাগ করে বলেছিলেন: এমন একটি লক্ষ্মীমন্ত বৌ এলে ঘর-দোর আমার ঝলমল করে ওঠে। যতোদিন পর্যন্ত বৌ হয়ে সে আসেনি ততোদিনই তার প্রতিষ্ঠা ছিলো, এখন স্ত্রীত্বই যেন তার পক্ষে একটা ব্যভিচার। যতোক্ষণ পর্যন্ত দু'য়ের মাঝে প্রেম, ততোক্ষণ পর্যন্ত পুরুষ অপরাধী, আর বিয়ে হয়ে গেলেই যত দোষ মেয়ের।

সৌদামিনী তিরস্কারের ভঙ্গিতে বললেন—তুমি বামুনের মেয়ে হয়ে এমন কেলেঙ্কারিটা কি বলে করলে বলো দিকি? তোমার মা-বাবাই বা কি করে মত দিতে গেলেন?

ইন্দ্রাণী হেসে বললে—সব মা-বাবাই সমান, মা। মত দিতে যেমন তাঁরা কুণ্ঠিত আবার তেমন তাঁরা উদার।

তবু সৌদামিনীর মনস্তাপটা সে খানিক বোঝে: ছেলে ক্ষমতা প্রয়োগে তাঁকে অতিক্রম করে গেলো এটা তাঁকে স্বভাবতোই পীড়া দেবার কথা। ছেলের বিয়েতে তাঁর সাধ-আহ্লাদের কিছুই পূর্ণ হলো না, এটা তাঁর মাতৃত্বগর্বকে ক্ষুণ্ণ করছিলো, কিন্তু সেই নীরদা আর নিভা যে আজ কি বলে মুখ বাঁকায় ও নাক কুঁচকোয়, সেইটেতেই ইন্দ্রাণী অবাক হচ্ছে। এতোদিন ইন্দ্রাণী কৌমার্য ও কৃতিত্বের উত্তুঙ্গ চূড়ায় অধিষ্ঠান করছিলো, এখন নেমে এসেছে তাদের সঙ্গে সমান সমতল জায়গায়,

সংসারের আবর্জনায়, একেবারে উনুনের পাশটিতে। এখন আর তবে তার কিসের সম্ভ্রম, কিসের বিশিষ্টতা। সেই তো বাপু পুরুষের কাঁধে এসেই ভর করতে হচ্ছে, ঠেলতে হচ্ছে হাঁড়ি, সাজতে হচ্ছে পান, দিতে হচ্ছে লক্ষীর-সাজ। এই যখন গতি, তখন এতো পেখম মেলবার কি হয়েছিলো! তাদেরই দলে এসে যখন নাম লেখাতে হলো তখন ওসব পাখা-ফড়ফড়ানির আর কি দাম? তাদের দলে মেয়ে-মানুষদের আর কোনো আলাদা দাম নেই, স্বামীর রোজগারের অঙ্ক অনুসারে তাদের মর্যাদার ক্রমান্বয়। বিবাহিতা মেয়েদেব সেই হচ্ছে আসল কৌলীন্য নির্ণেতা—তাদের স্বামীর মনিব্যাগ।

সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে ইন্দ্রাণী বনবাসিনী সীতার চেয়েও অকিঞ্চিৎকর—ঠাকুরপো বহু চেষ্টা-চরিত্র করে মাত্র একটা চল্লিশ টাকার টিউশনি যোগাড় করতে পেরেছে।

এতোকাল, মানে বিয়ে হওয়ার আগে পর্যন্ত, ইন্দ্রাণীকে তারা সমীহ করতো: কি-কি তার কীর্তি তার বিশাল সমুদ্রে তারা থৈ পেতো না। এখন, যখন সে তাদের ভিড়ে এসে জুড়ে বসলো, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে হিসেব করে তারা তার অকীর্তি বার করতে লাগলো—অগণন যতো ত্রুটি। সামান্য উনুন ধরাতে জানে না, জানে না আঁচল সামলে পরিবেশন করতে। রান্না করতে গেলেই চশমা ওঠে চোখের জলে ঝাপসা হয়ে, তরকারি কুটছে না আঙুল কুটছে বোঝা দায়। সেই মল-ই যখন খসালি, মিছিমিছি তখন লোক হাসাতে গেলি কেন? বিদ্যের এতো বহর দেখিয়েও তো কোনো কাজ হলো না—সেই তো এক গোয়ালের গরু। যখন ধানই ভানতে হবে তখন একটু ভালো করে ঢেঁকি হলেই হতো। নীরদা আর নিভাকে তুমি এদিক থেকে টেক্কা দিতে পারবে না। তাদের ভাবখানা এই যে, তারাই পেয়েছে আসল শিক্ষা, ইন্দ্রাণীর মতো তারা দু'পৃষ্ঠা খবরের কাগজ পড়ে দেশোদ্ধার করতে নামেনি।

ধীরে-ধীরে তাদেরও মনোভাবোর সে একটা হদিস পেলো। সম্পর্কে ছোট, সংসার-চালনার বুদ্ধিতে অনভিজ্ঞ, তারপর ঠাকুরপোর যখন টাকার জোর নেই, তখন সব বিষয়েই ইন্দ্রাণী তাদের মুখাপেক্ষী। যতোই লেখাপড়া শেখো না কেন, মেয়েমানুষের এই গিন্নিপনাই হচ্ছে আসল অহঙ্কারের জিনিস। এদিক থেকে ইন্দ্রাণী একেবারে নাবালিকা, তার কোনোই মূলধন নেই। সবাই শুরু করল তার দুর্বলতার উপর অনবরত ঠোকর মারতে: ক্ষুদে পিপড়ের কামড়ের মতো কথার চিমটি কাটতে তারা ওস্তাদ।

আত্মসম্মানের জ্ঞান তার তীব্রতর হলেও ইন্দ্রাণী চুপ করেই আছে—

আশ্চর্য রকম চুপ করে আছে, নিজেকে এমন নিস্তেজ, নিষ্প্রভ করে এনেছে যে দেখলে আর মনেই হয় না তার জীবনে আছে কোনো কামনার দাহ, কোনো প্রতিভার দৈবী প্রেরণা। নিতান্তই লাজুক যেন একটি গ্রাম্য বধূ, সবার চেয়ে আজ সে নিঃশব্দ, সবার পিছনে থেকে পায়ের চিহ্ন ধরে সে অনুগামী। আজ আর তার কোনো ব্যস্ততা নেই: প্রেম যখন সে পেয়ে গেছে, তখন জীবন নিয়ে প্রতীক্ষা করবার তার এখন অনেক সময়। আর আসলে সে একজন প্রকাণ্ড অপটিমিস্ট্। সবাইকে সে যে তার ব্যবহারে বশ করতে পারবে, তার সৌরভে সম্মোহিত—এতে তার ছিলো পরিপূর্ণ আত্মপ্রত্যয়। মনন শক্তিতে তার ছিলো এমন প্রবল মৌলিকতা যে সমস্ত ব্যাপারটা অনুধাবন করে বলতে গেলে, মজাই পাচ্ছিলো সে বেশি, জীবনে নতুন একটা অভিনয় করতে তার তো বেশ ভালোই লাগছে।

॥ ৭ ॥

বিয়ে করার পর থেকে ইন্দ্রাণীর কাছে দর্শন কেমন লজ্জিত, কেমন অপরাধী। এ তাকে সে কোথায় নিয়ে এলো? দু' মাসেই তার চেহারা এসেছে চুপসে, সেই উৎসাহ উদ্ভাসিত শরীরে এসেছে অবসাদ। তার তপ্ত, নিবিড়াভ, গভীর ভালোবাসা ছাড়া কিছুই দর্শনের বিত্ত-বেসাতি নেই, কিন্তু ইন্দ্রাণী ঘরের কোণে বসে স্বামীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করে জীবন অতিবাহিত করবার মেয়ে নয়। এ তাকে সে কোথায় নিয়ে এলো, কোথাকার চারাগাছ উপরে এনে পুঁতলে সে এ কোন গেরু-মাটিতে? কোথায় পাবে এ রস, কোথায় মেলবে এ শেকড়, কোথায় তুলবে এ মাথা। ইন্দ্রাণীর মুখের দিকে চাইতে পর্যন্ত তার লজ্জা করে।

ইদানীং পড়েছে ইন্দ্রাণীর নিদারুণ খাটুনি; মনে করতে হবে, তার পক্ষে নিদারুণ। বেড়াবার ছড়ি দিয়ে গল্ফ খেলা যায় না। নিতান্তই যখন সে বাড়ির বৌ হয়ে এলো, তখন কিছু ভার তার নিতে হবে বৈকি। ঝিটাকে রাখার আর দরকার নেই, একটা চাকরই যথেষ্ট। চাকর যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, তিন জায়ে ভাগাভাগি করে বাসন-কোসনগুলি মেজে ফেলতে হবে। ধরা যাক, বিনি-মাইনের একটা বাসনিই না হয় রাখা গেছে—ঘুরে-ফিরে একবেলা ইন্দ্রাণীকে রাঁধতেই হয়। বিকেলবেলা বেরুবার সে ফাঁকই খুঁজে পায় না, আর পেলেই বা কি। দু'জা বাড়িতে বসে খেটে মরবে, আর সে যাবে সোয়ামির সঙ্গে হাওয়া খেতে—এমন ঢঙের কথা মুখ ফুটে সে বলুক না একবার। বৌ নিয়ে হাওয়া খেয়ে বেড়ানোর টাকাটা না

উড়িয়ে সংসারে দিলে বরং কাজ হয়। একটা গান পর্যন্ত সে আর এখন গায় না, সংসারের কাছে তার এই নীরবতাই এখন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত।

ইলেকট্রিক-বিলটা এ-মাসে একটু ভারি হয়েছে। বড়দা মুখ হাঁড়ি করে গজরাতে শুরু করেছেন : দিন-দিন খরচ কেবল বেড়েই চলেছে। কোথাও থেকে এক পয়সা আয়ের সংস্থান নেই, কেবল খরচ আর খরচ।

নীরদার গা-টা চড় চড় করে উঠলো; কথায় ঠেস দিয়ে বললে—রাত দুটো-আড়াইটে অবধি আলো জ্বালিয়ে বসে প্রেমালাপ করলে মিটারটা শুনবে কেন?

প্রেমালাপ করতে, অন্তত স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে যে আলোর দরকার হয় না,—এটা বড়োবৌদির জানা উচিত ছিলো। প্রাইভেট এম-এ দেবার জন্যে ইন্দ্রাণী এখন থেকেই অল্প বিস্তর তৈরি হচ্ছে বলে এগারোটা বাজতে না বাজতেই সে ঘুমুতে যেতে পারে না : সমস্ত দিনের গ্লানির পর এই বইগুলিতেই যা একটু সে পরিচ্ছন্ন অবকাশ পায়, কিন্তু সে কথা শোনে কে?

অতএব মাসান্তে দর্শনকে ইলেকট্রিকের বিলটা মিটিয়ে দিতে হচ্ছে। এমনি আরো তার নিতে হয়েছে ছোটোখাটো খরচের ভার। যা কিছুর সঙ্গে ইন্দ্রাণীর কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে, তাতেই তার খাজনা লাগছে। যেমন ধরো চা, যেমন ধরো ধোপা। এক বেলায় কুলোয় না, অনেক ঘোরাঘুরি করে বিকেলেও সে আরেকটা টিউশনি নিলে। সব মিলে টাকা ষাটেকে এসেছে। তেমন টাকা আগে তার কতোদিকে যে মশা-মাছির মতো উড়ে গেছে আদাড়ে-বাদাড়ে, তা সে এখন ভাবতে পারছে না : এখন প্রতিটি পয়সার উপর তার অবিচল মায়া। আগে আগে নিজের যা কিছু রোজগারি পয়সা দুই হাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েও মোটা মোটা দরকারি জিনিসের জন্যে দাদাদের কাছে সে হাত পাততো : যেমন কাপড় বা জুতো, কোথাও যেতে হলে যেমন রাহা-খরচ। আজ সে দাবি মুখ ফুটে উচ্চারণ করাও তার মহাপাপ—সে বিয়ে করেছে। রোজগার করুক বা না করুক, সে বিয়ে করেছে। বিয়ে তার কেউ দিয়ে দেয়নি, মনে থাকে যেন, বিয়ে সে করেছে। তার দায়িত্ব আর কেউ নিতে আসছে না। এখন হতে সে একা।

হঠাৎ সমস্ত সংসার থেকে সে কি করে যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো, জীবনের এই বিস্ময়কর পরিবর্তনটাই দর্শনকে অভিভূত করছে। আগে সে দাদাদের উপর খানিকটা নির্ভর করে ছিলো, এখন তাঁরা রশিটা তাকে অনেক দূর ছেড়ে দিয়েছেন। তাকে নিয়ে আর যেন তাঁদের দুশ্চিন্তা নেই, নেমে গেছে তাঁদের

সকল দায়িত্বের বোঝা। তার যে ভালো দেখে একটা চাকরি পাওয়া দরকার সে বিষয়েও এখন থেকে তাঁরা শৈথিল্য দেখাতে শুরু করেছেন : যা পারো, নিজে যোগাড় করো গে যাও। অথচ বিয়ের আগে পর্যন্ত তাঁরা তার একটা চাকরির জন্যে কি অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন! তার একটা অর্থকরী ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত যেন তাঁদের পেটের ভাত হজম হচ্ছিলো না। এখন, এই বিয়ে করার পর থেকেই, তাঁরা চুপ। যা পারো, নিজে যোগাড় করো গে যাও। বিয়ে করেই সে যেন একটা জমিদারি পেয়ে গেছে। আগে এ বাড়িতে তার বিস্তৃত জায়গা ছিলো, ছিলো যা খুশি করবার একটা স্বাধীনতা : এখন আরেকজনকে জায়গা করে দিতেই তার স্থান হয়ে এসেছে সঙ্কীর্ণ, অধিকার সঙ্কুচিত। অথচ সেদিনকার সেই দর্শনের সঙ্গে আজকের এই দর্শনের কোনো তফাত নেই : আজও সেই মা'র ছেলে, দাদাদের সহোদর ভাই। মাঝখান থেকে আরেকজনের আবির্ভাবে দাড়িপাল্লা গেছে উল্‌টে, তার দিকটা হয়ে পড়েছে ভারি। অথচ, সেই আরেকজনের খাওয়া-পরার একটা দাম দিলেই চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে যোগাতে হবে তার নিজেরও মাশুল। আগে তাকে সাহায্য করা হয়েছে, এখন করতে হবে তাকে সাহায্য। চাকরি পাক বা না পাক, মনে থাকে যেন, বিয়ে করেছে সে।

অথচ এই কতোগুলি টাকা সে কি করে উপার্জন করছে, কতো টাকাই বা সে পায়—এ সব জানতে কারুর মাথাব্যথা নেই। আরো বেশি সে সংসারে দিতে পারে না কেন—সকলের হালচালে বরং সেই প্রচ্ছন্ন অভিযোগ। ইন্দ্রাণীর হাত লেগে সেজোবৌদির সেই দামি ফুলদানিটা টেবিল থেকে পড়ে সেদিন ভেঙে গেলো—আরেকটা তেমনি সেখানে কিনে এনে বসালে ভালো হতো : কিন্তু দর্শনের ফুলদানি কেনবার পয়সা নেই, ইন্দ্রাণীর জমানো যা কিছু পুঁজি এতোদিনে নিঃশেষ হয়েছে। পয়সা যখন নেই, তখন, কাজে-কাজেই দিতে হবে শ্রম, সইতে হবেই একটু অবজ্ঞা! সেই সব ব্যঙ্গোক্তিতে যদি দর্শনের আত্মদর্শন ঘটে, যদি বাড়ে তার একটু দায়িত্বজ্ঞানের তীব্রতা।

কিন্তু জ্ঞানের তীব্রতা বাড়লে কি হবে, এদিকে চাকরির সম্ভাবনাটা বিন্দুতম একটা তারার চাইতেও দূরে। বলতে কি, বিয়ে করার আগেই যেন দর্শন ভালো ছিলো : তেমনি অনেক জায়গা জুড়ে গা ঢেলে বিশ্রাম, তেমনি চায়ের কাপে মৃদু-মৃদু চুমুক দেবার মতো মিঠে-মিঠে প্রেম। অলস অবসরে বেশ একটি কোমল কবিতা। এতো তীব্রতায় যেন সুখ নেই : দর্শনের সেই ধাতই নয়। নিজের উপর অবিশ্বাসী থেকে সময়ের স্রোতে গা ছেড়ে দিয়ে

ঢেউ গুনতেই সে ভালোবাসতো ! তাকে ইন্দ্রাণী কিনা ডাক দিয়ে নি
এলো চেতনার এই উত্তাল মহাসমুদ্রে । তাকে সে দেবে না আর ঢে
গুনতে । আরাম করে-করে তার শরীরে মনে যে একটি অভিজাত নির্জীব
এসেছিলো তা দেবেই সে খণ্ড বিখণ্ড করে । ইন্দ্রাণীর কাছে তার বে
সার্টিফিকেট—সে পুরুষ । কিন্তু আজকাল পুরুষদেরই যে চাকরি যোগাড় ক
একটা প্রকাণ্ড সমস্যা, সে কথা ইন্দ্রাণী বুঝেও বুঝবে না কিছুতেই । তা
চেয়ে, চেষ্টা করলে, আরেকটা বিয়ে করা সহজ ।

তবু, যা হোক, সকালে বিকেলে দু'টো টিউশনি করে খানিক সে বে
গেছে । তার হয়ে ইন্দ্রাণীই বিজ্ঞাপন দেখে-দেখে জায়গায়-বেজায়গায় দরখা
পাঠায় : ইন্দ্রাণীকে দিয়েই পাঠায়, কেন না তাহলে সে বুঝতে পার
চাকরির বাজারটা প্রেমের বাজারের মতো অতো সস্তা নয় । সে নিশে
হয়ে আছে এমন কথা ইন্দ্রাণী তাকে বলতে পারবে না । তাকে আর
গদাইলস্করি চালে চলতে দিলো কই ? গাফিলি করে সময় কাটাবার আমিরি ক
আর তার পোষালো না, কিন্তু মাগ্‌গি-গণ্ডার দিনে জুৎসই চাকরিই বা কই একা
মিলছে ।

মেঝের উপর বিছানাটা পাততে পাততে হঠাৎ ইন্দ্রাণী ছুঁচ-সুতো নি
চাদরটা সেলাই করতে বসলো । টিউশনি সেরে দর্শন ঘরে ফিরেছে ঃ চোখে
দুর্বল দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে ইন্দ্রাণীকে ছুঁচে সুতো পরাতে দেখে সে আধে
ঠাট্টায়, আধো-ভালোবাসায় বলে উঠলো : কেমন, আমাকে আরো বি
করো !

ইন্দ্রাণী খুশিতে ঝলসে উঠলো ঃ কেন, কি এমন অপরাধ করে ফেলেছি !

বিকেলের ছাত্রকে সে আজ কোনোরকমেই সায়েস্তা করতে পারেনি, বে
বকে সে হয়রান । নিতান্তই মাসান্তে একটা টাকা পাওয়া যায় বলে সোজা
তার মুখের উপর একটা চড় বসায়নি যা হোক : এমন দর্শন যে দর্শন, তা
পর্যন্ত ধৈর্যচ্যুতি হবার যোগাড়, পিছনে ইন্দ্রাণীর প্রয়োজনের তাগি
না থাকলে আজই সে মাস্টারিতে সটান ইস্তফা দিয়ে আসতো । কিন্তু প্রে
যাকে করতে হয়, তার অসহিষ্ণু হলে চলে কি করে ?

গায়ের জামাটা খুলে ফেলে দর্শন একটা চেয়ারে এসে বসলে
বললে—একশোবার অপরাধ করেছ । আমাকে বিয়ে করা তোমার উ
হয়নি ।

ইন্দ্রাণী ঠাট্টা করে বললে—বা, তুমি তো ভা—রি ! এ কথা কেবল আমা

দোষ, না? তোমার বুঝি আগাগোড়া 'ধরো-লক্ষ্মণ' ভাব। বাজনার বেলায় বেচারি ছড়টারই দোষ, বেহালার কোনো সায় নেই। বা, আছ বেশ।

—না, আমি তোমার কোনো অংশেই যোগ্য ছিলাম না। আমাকে না বিয়ে করে তোমার অন্য জায়গায় যাওয়া উচিত ছিলো—এ আমি তোমাকে কি বিশ্রী আবহাওয়ার মাঝে নিয়ে এলাম।

—উঃ, তুমি কি ভীষণ সেন্টিমেন্টাল। তোমাকে নিয়ে আমার কি উপায় হবে?

—না ইন্দ্রাণী, সত্যি কথাই বলছি। এ সব কুৎসিত দুঃখ তোমাকে মানায় না, এ সবের জোয়াল টানতে তুমি জন্মাওনি।

ইন্দ্রাণী খিলখিল করে হেসে উঠলো। বললে—তুমি আমাদের সুখের কি বুঝবে? তুমি গরিব তো আমার তাতে বয়ে গেছে। তুমি মাত্র গরিব বলে তো নিজেকে এই সার্থকতা থেকে বঞ্চিত করতে পারি না।

—সার্থকতা না হাতি! দর্শন অস্থির হয়ে উঠলো: আমার এ গরিবানায় কোনো মাহাত্ম্য নেই।

—তোমার এ চাঞ্চল্য দেখে আমার কিন্তু একটু আশা হচ্ছে। চোখ তুলে ইন্দ্রাণী বললে—কিন্তু কি তুমি করতে পারো? আমাকে ভালোবাসা ছাড়া আর তোমার কি করবার আছে?

শরীরে একটা দৃঢ় ভঙ্গি এনে দর্শন বললে—না, মার্চেন্ট অফিসের সেই চাকরিটা আমাকে নিতেই হচ্ছে। পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনে, তারপর টিউশনি দু'টো যোগ দিলে একরকম মন্দ হবে না।

তার ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে ইন্দ্রাণী বললে—তাতে কি হবে?

ইন্দ্রাণী সারা দিনের পরিশ্রমের পর এখন শয্যাসংস্কারে মনোনিবেশ করেছে; এখনো তার বিকেলের গা ধোয়া হয়নি, গায়ে আঠার মতো লেগে আছে ক্লান্তির কালিমা। শরীরের নরম রেখাগুলি অবসাদে শিথিল, অপরিচ্ছন্ন শাড়িটি গায়ে ফেলেছে বিষাদের ছায়া। ম্লান, স্নিগ্ধ চোখে তাকে লেহন করে দর্শন বললে—দারিদ্র্যটা তাহলে আরো একটু ভদ্রতরো হতো। তোমার চেহারার এ বৈধব্য দেখলে আমার গা জ্বালা করে। গায়ে একটা ভালো তোমার গয়না নেই, কি কতোগুলি কস্তাপাড় শাড়ি ছাড়া তোমার শাড়ি নেই।

—রামচন্দ্র! ইন্দ্রাণী বিছানা শেষ করে উঠে দাঁড়ালো: পরের কাছে নিজের জিনিসটির একটা জাঁকালো বিজ্ঞাপন দিতে না পারলে বুঝি মশায়ের মন ওঠে না। নাঃ, তুমি দেখছি একেবারে পিউরিট্যান, যাকে বলে হস্টাইল টু লাইফ, যাকে বলা

স্বায় ইম্‌মর‍্যাল। আমার ক' গাছ চুড়ি আর ক' প্রস্ত শাড়ির জন্যে তোমার একটা জঘন্য কেরানিগিরি নিতে হবে। মাগো, শেষ কালে একটা কেরানির বৌ বলে পৃথিবীতে চলে যাবো। দরকার নেই আমার গয়নাগাটিতে—এই আমি খাসা আছি।

—খাসা আছ—একটা প্রাইভেট-টিউটারের স্ত্রী হয়ে!

—মোটেই নয়, হিসট্রিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট সুদর্শন সেনের জীবনসঙ্গিনী হয়ে। এখনো তুমি তাই আছ, ইন্দ্রাণী হেসে উঠলো: খবরদার, যা-তা চাকরি নিয়ে বসো না।

—কিন্তু, মুখ গম্ভীর করে দর্শন বললে—এমনি করে ক'দিন থাকা যায়?

—কি এমন তুমি কাঁটার উপর বসে আছ শুনি? ওয়েট এ্যাণ্ড ট্রাই। কোনো কলেজে একটা ভেকেন্সি হয়ে গেলেই পেয়ে যাবে এবার।

—আর জন্মে। ততোদিন এখানে, এ বাড়িতে থাকি কি করে? ছেলে-পড়ানোর চাইতেও ডিপ্রেসিং এ্যাট্‌মস্‌ফিয়ার। দর্শন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো: তুমিই বা এখানে কি করে টিকে আছো? দিনের পর দিন এ তোমার ভালো লাগে?

—কি?

—এই উনুন ধরানো, ঘর ঝাঁট দেয়া, কাঁথা-কাপড় কাচা, এই একঘেয়েমি?

—বা, উনুন না ধরালে খাবে কি, ঘর ঝাঁট না দিলে শোবে কোথায়, রোজ ফতুয়াটা অন্তত না কেচে দিলে নিজেরই তো ঘিনঘিন করবে। একঘেয়েমি? ইন্দ্রাণী ঘাড় হেলিয়ে গালের আধখানায় হাসির একটি হালকা ঢেউ তুললে: দিনের এক-ঘেয়েমির শেষে, তারপর আমার তুমি আছ না?

—না ইন্দ্রাণী, তুমি কি এই সব তুচ্ছতার জন্যে জন্মগ্রহণ করেছিলে নাকি?

—বা রে, তবে আবার কিসের জন্যে? ইংরিজি ক'পাতা পড়তে পারি বলে আমার কি এমন ল্যাজ গজিয়েছে! পাস কয়েকটা করেছি বলে তো আমি আর আকাশে উড়তে শিখিনি।

—না, এরকম করে তুমি নিজেকে চোখ ঠেরো না। তোমাতে আর মেজ বৌদিতে কোনো তফাত নেই যদি তুমি বুঝতে শেখ ইন্দ্রাণী, তাহলে বুঝতে হবে বিয়ের পর তুমি তোমাকে হত্যা করেছ।

—সর্বনাশ! ইন্দ্রাণী জোরে হেসে উঠলো: একেবারে হত্যা!

গলা নামিয়ে দর্শন বললে—আস্তে। তুমি যে উচ্চকণ্ঠে হাসবে, এ বাড়িতে তাও একটা প্রকাণ্ড অপরাধ। হত্যা হয়তো তুমি তোমাকে করোনি, করেছি আমি। আমিই তোমাকে—

—প্লীজ, দয়া করে ঐ হত্যা কথাটা ব্যবহার করো না। ভীষণ হ্যারোয়িং।

—না, দর্শন পাইচারি করতে-করতে বললে—চলো, এ বাড়ি ছেড়ে আমরা পালাই।

—কোথায়?

—পৃথিবীতে জায়গা একটা পাওয়া যাবেই।

—সেখানে গিয়ে আমাদের কি করতে হবে? ইন্দ্রাণীর ঠোঁট ঠাট্টায় ঈষৎ বাঁকানো।

দর্শন হঠাৎ তার একখানা হাত চেপে ধরলো: না, তুমি চলো।

স্বামীর স্পর্শের আশ্রয়ে সরে এসে বললে—আমার এই স্বামীটিকে আরামের এই আশ্রয় ছেড়ে কোথায় নিয়ে যাবো? এখানে তবু তোমার মা আছেন, ফুল্ ব্রাদাররা আছেন, ঘরের উপর তবু একটা চাল আছে, রান্নাঘরে চুলো আছে—সেখানে যে একেবারে খোলা, ঝোড়ো আকাশ। স্বামীকে গায়ের উপর গাঢ় করে টেনে এনে ইন্দ্রাণী তার কপালে হাত বুলোতে-বুলোতে বললে—পৃথিবীতে জায়গা সত্যিই বেশি নেই!

—কিন্তু তোমার এই দুর্দশা আমি আর দেখতে পারি না, তুমি যেন কি হয়ে গেছ। রান্নাবান্না ছাড়া আর কোন বড়ো কাজ যদি তোমার দ্বারা সম্ভব না হয়—

মুখের কথা মুখ দিয়ে কেড়ে নিয়ে ইন্দ্রাণী বললে—স্বামী ও গুরুজনদের সামনে ভাত বেড়ে থালা ধরবার চেয়ে মেয়েদের আর কোনো বড়ো কাজ আছে নাকি? ইন্দ্রাণী ঝরঝর করে হেসে ফেললো: বলো, 'তোমাকে আমি হত্যা করেছি।' হত্যা করতেই তো তুমি আছো। পরে দর্শনের চুলের মধ্যে আঙুল বুলোতে বুলোতে সে আর্দ্র কণ্ঠে বললে—এতো অস্থির হয়ে কি করবে? ওয়েট এ্যাণ্ড হোপ, দু'দিনে সব ঠিক হয়ে যাবে। পুরুষ মানুষ, একটা তুমি চাকরি পাবে না ভেবেছ? আমার জন্যে কিছু ভেবো না। আই এ্যাম গেম্।

॥ ৮ ॥

দর্শন সৌদামিনীর কাছে গিয়ে বললে—ইন্দ্রাণীর চোখটা বিশেষ ভালো নয়, ক'দিন থেকে ভীষণ জ্বালা করছে। সমানে মাথা ধরে আছে বলছে।

সৌদামিনী তরকারি কুটছিলেন; নির্লিপ্তের মতো বললেন—তা আমি কি করবো? ডাক্তার দেখালেই হয়।

—ডাক্তার দেখিয়েছি, মা।

—তা আর দেখাবে না। বাবু বৌ ঘরে এনেছ, কথায়-কথায় ডাক্তার না দেখালে চলবে কেন?

—চোখটা ওর অনেক কাল থেকেই খারাপ, দর্শন বললে—পরীক্ষা করে দেখা গেলো চশমার পাওয়ার ওর আরো অনেক বেড়ে গেছে।

—চোখ খারাপ, তবু চোখের মাথা খেয়ে তো গিয়েছিলে ওকেই পছন্দ করতে। হাতের কুমড়োটায় ফালা দেবার সঙ্গে-সঙ্গে সৌদামিনী জোর দিয়ে বলে উঠলেন: পাওয়ার বেড়ে গেছে, আবার সোনা দিয়ে চশমা গড়িয়ে দাও।

—চশমা বদলে আনা হয়েছে, কিন্তু দর্শন ঢোঁক গিলে বললে—ডাক্তার বলে দিলে যে উনুনের সামনে ঐ চোখে রান্না করা ঠিক হবে না।

সৌদামিনী গম্ভীর মুখে বললেন—ঠিক হবে না তো বৌ-র বদলে একটা ঠাকুর রেখে দিলেই পারো।

দর্শন বললে—তাই রাখবো ভাবছি।

—কিন্তু আমার পাকে কে রাঁধবে?

—বৌদিদিদের কাউকে রাঁধতে হবে আর কি। ইন্দ্রাণীর এ বাড়িতে আসবার আগে ওঁরাই তো ঘুরে-ঘুরে রান্না করতেন। উপায় কি তাছাড়া।

—না, উপায় কি! সৌদামিনী পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে বললেন—তুমি তোমার সোহাগিনী বৌকে আড়াল করে থাকবে, আর উনুনের মুখে ঠেলে পাঠাবে ঐ পোয়াতি বৌদের। দেখাদেখি তারা আবার মুখ বেঁকালে শেষকালে বুড়ো বয়সে আমাকেই গিয়ে হাঁড়ি ঠেলতে হবে আর কি। সেই যে কি বলে না, মায়ের গলায় দিয়ে দড়ি, বৌকে পরায় ঢাকাই শাড়ি—এখন হয়েছে সেই দশা।

—বা, অসুখ করলে কি করা যাবে, মা? দর্শন রুক্ষ কণ্ঠে বললে—উনুনের আঁচে চোখ যদি ওর নষ্ট হয়, তবে তাই কি হতে দিতে চাও নাকি তোমরা?

—না, না, আঁচ লাগবে কি! সৌদামিনী মুখ বেঁকিয়ে উঠলেন: তুলোর বাক্সে করে প্যাটরার মধ্যে বৌকে ঢাকা দিয়ে রাখো গে যাও।

—বা, মাইনে করা ঠাকুর রেখে দিয়েও রেহাই পাব না, মা? দর্শন রীতিমতো রাগ করে উঠলো: নিচের রান্নাঘরে ঠাকুর এসে গেলেই তো বৌদিদিদেরও ছুটি মিলে গেলো। তাঁরা একদিন করে মাত্র একজনের জন্যে উপরে তোমাকে রান্না করে দিতে পারবেন না? ওর যখন অসুখ—আর সকল কিছুর চাইতে মানুষের চোখই হচ্ছে মূল্যবান। ও যখন ছিলো না মা, তখন এক বৌদি নিচে, এক বৌদি উপরে, এমনি অদলবদল ক'রে দু'বেলা রান্না করেননি? এখন কি উপরে তোমার জন্যেও আমাকে একটা বামুনি রেখে দিতে হবে নাকি?

সৌদামিনী নিশ্বাস ফেলে বললেন--আমার জন্যে! আমার জন্যে আবার বামুনি। বলে, তপ্ত ভাতে নুন জোটে না, পান্তা ভাতে ঘি। থাক মা'র কাজ ঢের করেছ, এখন নিজের কাজ গুছোও গে যাও।

বিকেল বেলা বাড়িতে এক ঠাকুর এসে হাজির দেখে আনাচ কানাচ থেকে নানান রকম কোলাহল শুরু হলো। নীরদা ইন্দ্রাণীকে ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে—এ আবার তোমার কোন্ ফ্যাশান?

ইন্দ্রাণী বললে—কোন্‌টা।

এই যে ঠাকুরপোকে দিয়ে একটা ঠাকুর ধরে আনলে?

—আমি আনতে পাঠাবো কেন? ইন্দ্রাণী কথায় ঝাঁজ দিয়ে বললে—তাঁর নিজের একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই?

জুতোয় যেমন সুখতলা—তেমনি নীরদার পাশটিতে আছে নিভা। আগে অবিশ্যি, মানে ইন্দ্রাণীর আসবার আগে, দুজনে ছিলো সাপে-বেঁজিতে। তাদের যতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলো নিজের-নিজের ছেলে-পিলেদের লুকিয়ে বেশি খাওয়াবার ঘটায়; একই দিনে কলকাতায় তাদের যার-যার বাপের বাড়ি বেড়িয়ে আসবার অদম্য উদ্যমে; তাদের নতুন ধাঁচের ছিট ও নতুন পাড়ের শাড়ি কেনবার উৎসাহে। নীরদার ঘরে যদি একটা ড্রেসিংটেবিল এলো, নিভার অমনি চাই একটা কাঁচের দরজাওয়ালা আলমারি। নিভার যদি হলো একজোড়া দুল, নীরদা বয়সে একটু বুড়োটে হলে কি হবে, তারো চাই ঘোমটা আটকাবার অন্তত দুটো সেফটিপিন্। এমনি বংশানুক্রমে। কিন্তু ইন্দ্রাণী আসবার সঙ্গে-সঙ্গেই তারা একদলে। বোতলের যেমন ছিপি, দরজার যেমন ছিটকিনি— তেমনি নীরদার নীভা, একটা নির্ভর।

দিদির গা ঘেঁষে নিভাও একটু হেলান দিলো: রান্না করলে কি তোমার জাত যেতো?

ইন্দ্রাণী হেসে বললে—জাত তো কবেই গেছে। তার চেয়েও দামি জিনিস যেতো, আমার চোখ।

—উঃ, কতো ফুটুনি। নীরদা তার বাম অর্ধাঙ্গে একটা মোচড় দিয়ে বললে—কেউ আর কোনোকালে পড়াশুনো করে না! না হয় পাসই করিনি ফ্যাশান করে, কিন্তু তোমার চেয়ে বই কিছু কম পড়িনি আমরা। কই চারচোখও হইনি, উনুনের আঁচে চোখের ড্যালা দুটোও গলে যায়নি। বিদ্যের অতো দেমাক কোরো না আমাদের কাছে।

ইন্দ্রাণী বললে—পড়াশুনো একদম না করেও অনেকের চোখ খারাপ হয়। অসুখ করলে সাবধান হওয়াটাও কি একটা ফ্যাশান?

দিদির দেখাদেখি নিভাও একটা মোচড় দিলো: ঢঙ। আমরা অসুখ নিয়ে কতো কি কাজকম্ম করে যাচ্ছি, কই ,কেউ তো আমাদের হয়ে দরদ দেখাতে আসে না। চোখের চশমার জন্যে আবার ডাক্তার! আমাদের মাথা ভেঙে গেলেও তো একটা হাতুড়ে আসে না দেখি? বলে, ঘণ্টা বাজিয়ে দুর্গোৎসব, ইতু পূজোয় ঢাক।

ইন্দ্রাণী ঈষৎ তপ্ত হয়ে বললে—কিন্তু দরদ তো একা আমারই উপর দেখানো হচ্ছে না, রান্না থেকে আপনারাও তো সঙ্গে সঙ্গে রেহাই পাবেন।

—মা'র রান্না?

—তা আমার হয়ে রাঁধলেনই বা। আপনাদেরই কারুর অসুখ করলে ছেলেপিলেদের আমার দেখাশোনা করতে হবে না? ইন্দ্রাণী বিরক্ত, ক্লান্ত গলায় বললে—বাড়িতে সামান্য একটা ঠাকুর রাখা নিয়ে এতো যে হট্টগোল হতে পারে, তা কে জানতো? অথচ এর জন্যে সংসারে বিশেষ কিছু অসুবিধে হচ্ছে না। তার মাইনেটা তো উনিই দেবেন বলেছেন।

—কি আমার মাইনে-দেনেওয়ালা উনি রে? নীরদা একটা বেড়ালের মতো ফোঁস করে উঠলো: বিদ্যের তো একটি চুড়ো, পেটের মধ্যে অনেক বই খাতা তো শুনি গজ্‌গজ্‌ করছে, টাকার খোঁটা দিতে তোমার লজ্জা করলো না? সামান্য একটা ঠাকুরের মাইনে দেবে—তাও কতোদিন দিতে পারে দেখ—তায় আবার লম্বা চওড়া কথা! দাদারা এতোটুকু থেকে মানুষ করলো, টাকা-পয়সার শ্রাদ্ধ— তাই উপযুক্ত হয়ে সামান্য একটা ঠাকুরের মাইনে দিতে যাচ্ছেন, তাতে কথা শোনানো! কে তোমার ঠাকুর চায়! রেঁধো না তুমি, তুমি না রাঁধলে এ সংসার আর উপোস করে শুকিয়ে মরবে না।

ইন্দ্রাণী নিঃসঙ্কোচে বললে—টাকার আমি কোনো খোঁটা দিতে চাইনি, দিদি। বলছিলাম, এতে মিছিমিছি কোনো খরচ বাড়ছে না। তিনি পরে চাকরি করতে পেলে দাদাদের আরো সাহায্য করবেন নিশ্চয়—এখন যদ্দুর সাধ্যি—

—আর পেরেছে! নিভা ঠোঁট উলটালো।

নীরদা হাত নেড়ে বললে—আর এতো তুমি কি বিদ্যান হয়েছ যে রাঁধতে গেলে তোমার মান যায়? বিদ্যে বুঝি হয় ইস্কুলে-কলেজে গিয়ে ডিগবাজি খেলে, আত্মীয় স্বজনদের জন্যে দু'টো ফুটিয়ে দিতে গেলেই বুঝি বিদ্যে যায় রসাতলে? ছাই, ছাই লেখাপড়া শিখেছ, তা নিয়ে অতো দাঁত বার করো না। কি বল, নিভা? নীরদা নিভার কনুইয়ে একটা ঠেলা মারলো: আমরা অমন লোক-

দেখানো পাস ফেল করিনি, কিন্তু বলতে গেলে ছোট বৌর চাইতে আমরা বেশি শিক্ষিত।

—তা কে অস্বীকার করছে? ইন্দ্রাণী বললে নিশ্চয়, আপনারা রাঁধতে পারেন, রান্নায় আপনারা দ্রৌপদী—

এবার নিভা মুখনেড়ে বললে—একশো বার। মেয়েদের শেখবার আসল বিষয়ই হচ্ছে এই রান্না, সেবা, শিশুপালন। রান্না একটা শিল্পবিদ্যা।

—আপনারা সেই বিদ্যা নিয়ে থাকুন, দেশের মুখোজ্জ্বল হোক। ইন্দ্রাণী দীপ্ত কণ্ঠে বললে—রান্না ছাড়াও যে মেয়েদের আর কোনো বড়ো কাজ থাকতে পারে, আপাতত তা আপনাদের অজানাই থাকুক। কোনো কোনো সভ্য দেশে যে রান্নার কাজটা মিউনিসিপ্যালিটিই করে দেয় তা জেনেও আপনাদের বিশেষ লাভ নেই।

ইন্দ্রাণী চলে যাচ্ছিলো, নীরদা পিছন থেকে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো : কি আমার বড়ো কাজ করনে-ওয়ালি এসেছেন! কাজের মধ্যে তো দেখি কেবল সোয়ামির বগল ধরে হাওয়া খেতে যাওয়া।

এমনি ছোটোখাটো ঝড়-ঝাপটা থেকে-থেকে বয়েই চলেছে।

আরেক দিন।

সেদিন হঠাৎ দুপুরের খাওয়ায় কয়েকজন লোক বেড়ে গিয়েছিলো বলে থালায় টান পড়েছিলো; বাসনের পাঁজায় চাকর এখনো হাত দেয়নি। সৌদামিনী বললেন —তোমরা তিন জায়ে এক থালায় বসে খাও না।

ইন্দ্রাণী গম্ভীর হয়ে বললে—কারু সঙ্গে এক পাতে বসে আমি ভাত খাই না।

—কেন, কি দোষ?

—খাই না, ও আমার অভ্যেস নেই।

—অভ্যেস নেই মানে? সৌদামিনী জোর দিয়ে বললেন—অভ্যেস তোমায় করতে হবে।

—না, কথায় জোর দিতে ইন্দ্রাণীও জানে : যা স্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে, তেমন কাজ আমি সজ্ঞানে করতে পারবো না।

নিভা তো অবাক : ভাত খাওয়া স্বাস্থ্যের বিরুদ্ধ? এ যে দিদি, নতুন কথা শুনছি।

ভাত খাওয়া নয়, ইন্দ্রাণী বললে—কারুর সঙ্গে এক থালায় বসে ভাত খাওয়া। কার কি রোগ আছে কে জানে?

এক মুহূর্তে সবাই স্তব্ধ হয়ে গেলো। সৌদামিনী বললেন—কার আবার কি রোগ থাকবে? আমরা তো ছেলেবেলা থেকেই সবার সঙ্গে এক সঙ্গে বসে খেয়ে

আসছি—কোনোদিন তো রোগ হতে দেখলাম না। আমরা তোমার মতো এমন নিজের সুখ বুঝতে শিখিনি, পাঁচজনের সঙ্গে মিলে মিশেই আমরা ঘর করে এসেছি। কি আমার রূপের ডালি, তায় আবার রোগ—রোগের চিন্তা!

ইন্দ্রাণী শান্ত গলায় বললে—কেবল নিজের সুখের জন্যেই বলছি না মা, সকলের ভালোর জন্যেই বলছি। বড়দির দাঁত যে খারাপ সে তো সবাই জানে, আর মেজদির আছে হিস্‌টিরিয়া—

—হিস্‌টিরিয়া? তাকে তুমি হিস্‌টিরিয়া বলো? নিভা গর্জে উঠলো: আর তোমার যে চোখ নেই, তুমি যে কানা—

—সেই জন্যেই তো বলছি আমার সঙ্গে আপনাদের কারুর খাওয়া ঠিক হবে না।

নীরদা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলো: হেনস্তা, হেনস্তা—এ কেবল আমাদের হেনস্তা করা। উনি কি ছাই ক'টা পাস করেছেন বলে একেবারে রানী ভিক্টোরিয়া হয়েছেন! হবে না, খেতে হবে না আমাদের সঙ্গে—তবু যদি বুঝতাম নিজেদের খাওয়াটা যোগাড় করবার কোনো মুরোদ আছে।

ইন্দ্রাণী রাগ করে উপরে চলে গেলো—ননদরা এলো সাধাসাধি করতে। ইন্দ্রাণী বললে—আমার ভাত ঢেকে রাখতে বলো গে, নিচেটা একটু নিরিবিলি হলে এক সময় গিয়ে খেয়ে আসবো'খন।

ঘোলাটে আবহাওয়ায় পড়ে ইন্দ্রাণীরও মনের রঙ মেটে হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। যে আকাশ এরা সঙ্কীর্ণ করে রেখেছে, তারও জীবনের যেন ততোটুকু পরিধি। সে এদেরই মতো রান্না করে, ঘর নিকোয়, পরিপাটি করে বিছানা পাতে। এদেরই মতো সাজসজ্জা, নিজের স্বামী। বোঝে শুধু পয়সা নিয়ে কদর্য কার্পণ্য: মিতব্যয়িতার নামে চিত্তের দরিদ্রতা। শিখে উঠেছে সে খুঁটিনাটি ঝগড়া করতে, ঠোকর দিয়ে কথা কইতে, অভিমানে মুখ ফুলোতে। খাঁচার মধ্যে ঢুকে পড়ে সেও স্তব্ধ করে আনলো তার পাখা, ছোটো করে আনলো তার বাতায়ন। তার মনে ধরেছে মরচে, সেই তার তলোয়ারের ফলার মতো ঝক ঝকে মন: তার শরীরে ধরেছে ঘুণ, সেই তার মননশক্তিতে উজ্জ্বল, উদ্ধত শরীর। নিজের জন্যে নিজেরই তার ভারি মায়া করতে লাগলো: এ সে কি হতে বসেছে?

কিন্তু চেয়ে আছে সে দর্শনের দিকে যাকে নিয়ে তার জীবনের স্বপ্ন ও জীবনের সার্থকতা। যে তাকে নিয়ে যাবে সংসারের ঊর্ধ্বে আকাশের পরিব্যাপ্তিতে, বিপুলতর ভবিষ্যতের অতলতায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত, এতো ঘোরাঘুরি করেও দর্শন একটা চলনসই চাকরি যোগাড় করতে পারলো না। ইন্দ্রাণীর বুঝতে আর বাকি

নেই, সংসারে কিছুরই কোনো দাম নেই—প্রতিভা বলো, প্রেম বলো সবার মূলে চাই টাকা; যার রসগ্রহণে সবাই সমান পারঙ্গম। টাকার জোরে নয়কে হয় করে দেখা যায়, বিসদৃশকে করে তোলা যায় সুসমঞ্জস। দর্শনের যদি টাকা থাকতো, তবে তার এই প্রেম হতো একটা কীর্তি : ইন্দ্রাণীর যদি থাকতো টাকা, তবে তার প্রতিভা হতো একটা সৌন্দর্য। টাকার অতিরিক্ত আর যেন কিছু বিত্ত নেই, অন্তত যেখানে তুমি পাঁচজনের সঙ্গে সমাজ গঠন করে আছ—টাকাই সেখানে একমাত্র অস্ত্র। টাকাই সেখানে তোমার একমাত্র সংজ্ঞা। যেন তার প্রেমের প্রবলতা নিরূপিত হবে দর্শনের অর্থোপার্জনের ক্ষমতা দিয়ে, যেন সে তার আত্মবিকাশের প্রেরণা লাভ করবে এই অর্থোপার্জনের অসুস্থ উন্মত্ততা থেকে। যেন এই তার অতিকায় অহঙ্কার। ইন্দ্রাণী মমতায় স্নিগ্ধ চক্ষু তুলে দর্শনের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। দর্শন প্রয়োজনানুরূপ টাকা রোজগার করতে পারে না—সে যেন ইন্দ্রাণীর কাছে কি ভীষণ অপরাধ করে আছে। তার ব্যবহারে সেই গ্লানি, সেই তেজোহীনতা। রাত্রে ইন্দ্রাণীর প্রত্যাশার উত্তাপে বিশ্রাম নিতে এসে সে বিষণ্ণ, দুর্বল : টাকা যখন রোজগার করতে পারছে না, তখন স্নেহেও তার অধিকার নেই। সমস্তক্ষণ দর্শন যেন লজ্জায় লাঞ্ছিত হচ্ছে। ইন্দ্রাণী তাকে স্পর্শে, হাসিতে, শব্দে, সৌরভে—উচ্চকিত, উন্মুখর করে তুলতে চায়, কিন্তু ইন্দ্রাণীর চেয়েও বড়ো তার টাকা : টাকা না পেলে সে যেন একদিন ইন্দ্রাণীরও আর দাম দিতে পারবে না। ইন্দ্রাণীকে যদি সে হত্যা করে থাকে, তবে তার জীবনে ইন্দ্রাণী এনেছে এই হননের বিভীষিকা।

কিন্তু তাই বলে কি তাদের মুক্তি নেই? ইন্দ্রাণীর একেক সময়ে ইচ্ছা হয় দর্শনকে নিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে পড়ে— বৃহৎ একটা বিস্তারের মধ্যে। কিন্তু ভয় হয় —ভয় হয় স্বামীর এই অতিকোমল নির্ভরশীলতাকে, ভয় হয় তাদের ঘিরে সম্পূর্ণ, পরিব্যাপ্ত নিঃশব্দতার ভাবকে। দর্শন এখানে এই পরিবারের এতো গভীরে তার শিকড় প্রসারিত করে দিয়েছে যে তাকে সমূলে উপড়ে নেওয়া প্রায় অসম্ভব ; তবে দারিদ্র্যের কুঠারের ঘায়ে-ঘায়ে সে শিকড়গুলি হয়তো এতোদিনে প্রায় আলগা হয়ে এসেছে। আসবার তো কথা, কিন্তু দর্শনকে তবু তার ভয় করে—ভয় করে তার ভাবপ্রবণ অলস নিশ্চেষ্টতাকে : তার চরিত্রে রয়েছে দুর্বল আত্ম-অবিশ্বাসের নেশা! তার দ্বারা কিছু হবে না, এই একটা অসুস্থ চিত্তবিক্ষেপ। এই অকর্মণ্যতাই তার বিলাস, তার কৃতিত্বের পরিচয়। দারিদ্র্যকে সে পাপ বলে ধরে না, দেয় তাকে একটা ব্যর্থতার সৌরভ, কবিতার আবহাওয়া। তবু ইন্দ্রাণী তাকে একদণ্ড ভোগ করতে দেবে না এই মদির তন্দ্রালস্য! তাকে চেতনার ঢেউ থেকে ফেনিলতর ঢেউয়ের উপর নিয়ে আসে। বলে : ওটা না হয়েছে, তুমি সেই ইন্সিয়োর

কোম্পানির চাকরিটার জন্যে চেষ্টা করো। মিস্টার রায় আমাকে খুব স্নেহ করতেন, তাঁর মেয়ে প্রতিমার সঙ্গে কতোদিন ওঁর বাড়ি গিয়ে গান গেয়ে এসেছি। আমি ওঁকে একটা চিঠি লিখে দেবো। তুমি কিছু ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

॥ ৯ ॥

ঠিক কিছুই হলো না, মাঝের থেকে দর্শনের বিকেলের টিউশনিটা হাতছাড়া হয়ে গেলো। পকেটে টান পড়লো বটে, কিন্তু যে দায়িত্ব দর্শন একবার হাতে নিয়েছে তা সে কিছুতেই ছাড়তে পারবে না—অসম্ভব সে পরাজয় বহন করা। তাকে দিতেই হবে ইলেট্রিকের বিল, ঠাকুরের মাইনে, চায়ের খরচ, কয়লার দাম—যা পড়েছে তার ভাগে। কিন্তু মনের সদিচ্ছায় কি কাজ হবে বলো?

এবার ইন্দ্রাণী এলো এগিয়ে। বললে—তোমায় ব্যস্ত হতে হবে না। আমি চাকরি করবো।

তুমি?

—হ্যাঁ, তুমি শুধু খেটে দেহ পাত করবে, আর আমি গা ছড়িয়ে শুয়ে আরাম করবো, এমন কোনো বাঁধাধরা কথা নেই। ইন্দ্রাণী দৃঢ় গলায় বললে— বরং তোমার সঙ্গে চুক্তি ছিলো আমার উল্টো। মনে পড়ে না সেই চাণ্ডউয়ার কথা?

ম্লান চোখে দর্শন বললে—তুমি চাকরি করবে কি ইন্দ্রাণী?

—বসে-বসে অভাবের দংশন সহ্য করবো, অথচ ক্ষমতা থাকতে তা ব্যবহার করবো না—তুমি কি আমার এই অপমরণ দেখতে চাও নাকি? ইন্দ্রাণী তার দুই গাঢ় নির্নিমেষ চোখ দর্শনের মুখের উপর তুলে ধরলো: আমাদের এই মিলনের দায়িত্ব কি একলা তোমার? আমার যেটুকু শক্তি আছে তা দিয়ে যদি তোমার ক্ষতিপূরণ না করতে পারি তো আমি, আমি তোমাকে কেন ভালোবাসলাম? আমি তোমার পাশে দাঁড়াতে চাই, তোমার কাঁধে ভূত হয়ে চেপে বসে থাকতে চাই না।

যেন ভয়ে ভয়ে দর্শন জিগ্‌গেস করলে: কি চাকরি তুমি করবে?

ইন্দ্রাণী বললে—তার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না। গেলো-সপ্তাহে স্টেট্‌স্‌ম্যানে এক বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম—দুটি বাঙালি মেয়ের জন্যে গানের এক মাষ্টারনী চায়। সপ্তাহে তিন দিন—রবিবার বাদ—বিকেলে দু' ঘণ্টা মিনিমাম্ মাইনে কত চাই জানিয়ে এ্যাপ্লাই করতে হবে। আমি কম করে পঞ্চাশ টাকা বলে দরখাস্ত করে দিয়েছিলাম। কাল তার জবাব এসেছে, দেখবে? ইন্দ্রাণী দেরাজটা টানতে-টানতে

বললে—হয়ে গেছে আমার সেই চাকরি। বেশি দূরে নয় তাদের বাড়ি—এই গড়পার। আমার নাম শুনেই নাকি মেয়ে দুটি আমাকে রাখবার জন্যে পাগল। তুমি জানো তো এককালে সংস্ট্রেস্ হিসেবে আমি কি 'রেজ্' ছিলাম। তুমি তো নিরালায় বসে একদিন আমার গান শুনলেও না, এই ছাখ চিঠি। কি? পঞ্চাশ টাকা! এমন কিছু খারাপ বলে মনে হচ্ছে?"

পঞ্চাশ টাকা! তাও সপ্তাহে মাত্র তিন দিন, দুঘণ্টা করে। আবহাওয়াটা কেমন হালকা, মুহূর্তগুলি কেমন মিঠে। দুঘণ্টা দেখতে-দেখতে যাবে কেটে। দর্শন বিকেলে যে টিউশনিটা করতো—তা সপ্তাহে প্রত্যহ, রবিবারে আসতে পারলেও ভালো হতো, ঘড়ি ধরে দুঘণ্টা না কেটে গেলে তাকে উঠতে দেওয়া হতো না, পাশের ঘরেই পাহারা দিচ্ছেন ছাত্রের অভিভাবক: উঃ, সে কি হৃদয়বিদারক শ্বাসকষ্ট, প্রতিমুহূর্তে সে কি পঙ্কিল নরকযন্ত্রণা! তবু, এতো করে, মিলতো কিনা কুড়িটি করে টাকা। তাও কিনা হায়, রইলো না।

চিঠিটা পড়া শেষ করেও দর্শনের মুখে যেন আনন্দের আভা এলো না; নিষ্প্রভ গলায় বললে—কিন্তু বাড়ি থেকে মত দিলে হয়।

—মত দেবে না কি? দর্শনের হাত থেকে চিঠিটা কেড়ে নিয়ে ইন্দ্রাণী চোখে মুখে, শরীরের প্রতিটি রেখায় ঝিলিক দিয়ে উঠলো: মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উদরান্ন সংস্থান করবো, এর চেয়ে মহত্তর কাজ মানুষের আর কি থাকতে পারে? মত দেবে না, এদিকে আমাদের ট্যাক্‌সো দিতে হবে না মাস-মাস?

দর্শন উত্তরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের রাস্তার দিকে চেয়ে বললে—কিন্তু দায়িত্ব তো আমার, ইন্দ্রা।

—কখ্‌খনো না, দুজনের। ইন্দ্রাণী দীপ্ত কণ্ঠে বললে—বিশ্লেষণ করে দেখতে গেলে—একলা আমার। তুমি যতোদিন বিয়ে করোনি, একেবারে হালকা, স্বাধীন ছিলে, সংসার তোমাকে ধরতে ছুঁতে পেতো না। আমাকে বিয়ে করেই তোমার পাখা গিয়েছে কাটা, তোমার পায়ে পড়েছে বেড়ি। বিয়ে করার সঙ্গে-সঙ্গেই তুমি সংসারের কয়েদে হয়েছো বন্দী, বলতে গেলে, আমিই তোমাকে এই বন্ধনের মধ্যে নিয়ে এসেছি—তোমার সর্বক্ষণ এই সংসারের কাছে অপরাধবোধের আমিই তো একমাত্র কারণ। তোমার সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে। ইন্দ্রাণী দর্শনের কাছ ঘেঁষে এলো: কেন, বাড়িতে অমত করবে কেন?

দর্শন ধরা গলায় বললে—বাড়ির বৌ হয়ে শেষকালে চাকরি করবে, এটা কেউ পছন্দ করবে না।

—শেষকালে মানে, আগে আমি করিনি? কথার বিদ্যুচ্ছটায় ইন্দ্রাণীর সুপ্ত

ব্যক্তিত্ব উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো : বৌ হয়েছি বলে আমাকে একটা কাঁচের ঘেরা-টোপের মাঝে লণ্ঠনের মতো মিটমিট করে জ্বলতে হবে? তেল আসবে ফুরিয়ে, আর আস্তে-আস্তে আমি ক্ষয় হয়ে যাবো? দর্শনের হাতের উপর ইন্দ্রাণী তার উৎসাহ-উষ্ণ ডান হাতখানি রাখলো : তুমিই বলো, আমি কি এরই জন্য জন্মগ্রহণ করেছি? এমনি পড়ে-পড়ে ঘুমোনো, আর বসে-বসে হাই তোলা? আমি কি আমাকে খাটাবো না, ব্যবহার করবো না? কার কি মতের জন্যে আমাদের মাথা ব্যথা পড়েছে, আমরা যখন ভালোবাসলাম, বিয়ে করলাম, তখন কার মতের অপেক্ষা করেছিলাম শুনি?

—কিন্তু, হাতের মুঠোর মধ্যে ইন্দ্রাণীর হাতখানা নাড়াচাড়া করতে করতে দর্শন বললে—কিন্তু আমারই তোমাকে খাওয়াবার কথা।

—কখ্খনো না। ইন্দ্রাণী হঠাৎ লঘুকণ্ঠে হাসির কলরোল তুললে : আমি বরং তোমাকে খাওয়াবো, এই আমাদের হোলি কনট্রাক্ট ছিলো। তুমি যখন পারছ না, তখন আমাকেও হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে? দুজন দুজনকে অধোগতির দিকে টেনে নিয়ে যাবো? আমরা পরস্পরের সাপ্লিমেণ্ট হবো, এরই জন্যে তো আমি আর তুমি।

'তুমি যখন পারছো না.' কথাটা দর্শনের মর্মাস্তমূল পর্যন্ত বিদ্ধ করলো।

দর্শন বললে—আমার জন্যে তোমাকে এই কষ্ট, এই লাঞ্ছনা সইতে হবে।

—বলিহারি তোমার ভাষাজ্ঞান! ইন্দ্রাণী দুই বিসর্পিত বাহু দিয়ে দর্শনের গলা জড়িয়ে ধরলো : কানের কাছে মুখ এনে চুমু খাবার মতো করে বললে—সত্যি, সত্যি তুমি আমার অযোগ্য—তুমি আমাকে আর তোমাকে আলাদা করে দেখছ, তোমাকে যে আমি ভালবাসি তার একটা বাহ্যিক প্রমাণ পর্যন্ত তুমি চাও না।

—কিন্তু আরো ক'টা দিন অপেক্ষা করলে পারো, সেই ইন্‌সিয়োর কোম্পানির থেকে ফাইনাল কথা এখনো পাইনি। তোমার সুপারিশে হয়েও যেতে পারে মনে হচ্ছে।

—ভালোই তো। ইন্দ্রাণী সরে এসে বললে—দুজনে মিলে আয়ের সংখ্যাটাকে একটা ভদ্র চেহারা দেওয়া যাবে। কিন্তু সে যখন হবার তখন হবে—মাসে পঞ্চাশ টাকা তাই বলে আমি থামকা হাতছাড়া করতে পারবো না। তুমি আমাকে আজই নিয়ে চলো গড়পার। দেখলে তো চিঠি. যতো শীগ্‌গীর সম্ভব, আমাকে জয়েন করতে বলেছেন। আর দেরি নয়—আজই। আর, তেরো দিনের মধ্যে ইলেকট্রিক-বিল দিতে না পারলে রিবেট পাওয়া যাবে না, খেয়াল আছে তোমার? টাকা কই?

বেড়াবার নাম করে দর্শনের সঙ্গে ইন্দ্রাণী বেরিয়ে গেলো চাকরি করতে।

হেঁটেই—দূরের রাস্তা নয়। বুক ভরে বাতাসের নিশ্বাস নিয়ে ইন্দ্রাণী বললে—আর সবটাই টাকার কোশ্চেন নয়, যদিও আপাতত মাত্র জীবন ধারণের জন্যেই ওটার এতো দরকার। তোমার অবস্থা যদি কোনোদিন সচ্ছল হয় আমি তখনো কেবল নির্ভাবনায় আরাম করবো নাকি ভেবেছো? করবার কি আর আমার কোনো কাজ থাকবে না?

দর্শন বললে—কিন্তু আমার কাছে তো তুমি আরামই চাও ইন্দ্রা, সব স্ত্রীই চায়।

ইন্দ্রাণী খিল-খিল করে হেসে উঠলো; বললে—কত স্ত্রী তুমি দেখেছ! নিজের কাছে যাদের কিছু চাইবার নেই, তারাই চায় পরের কাছে আরাম, কিন্তু আমি? ইন্দ্রাণী হঠাৎ সুর করে আওড়াতে লাগলো: 'তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা, এবার সকল অঙ্গ ঘিরে পরাও রণসজ্জা।' দর্শনের একটা হাত মুঠোয় চেপে ধরে সে ফের বললে—আমিও তোমার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে চাই, আমিও তোমার সহধর্মিণী না?

দেখতে দেখতে ইন্দ্রাণীর সমস্ত চেহারা যেন বদলে গেলো, আলোর চেতনায় রাত্রির নিঃসাড় আকাশ যেমন বদলায়। চেতনার ছটায় তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন ঝলসে উঠেছে। চোখে তেজ, ঠোঁটে সাহস, চিবুকে সঙ্কল্প—ইন্দ্রাণী এখন অনির্বচনীয় সুন্দর। দুই পায়ে ক্ষিপ্রতার উল্লাস, পদপাতের তালেতালে শরীর থেকে উছলে পড়ছে তার চিত্তের পরিপূর্ণতা। সেই একটা বন্য ব্যাঘ্রীর বিলাসবিক্রম: তার দেহ যেন নতুন ঝকঝকে একটা অটোমোবিল। সমুদ্রের বাতাস পেয়ে সে যেন তুলে দিয়েছে তার জাহাজের পাল, তার যাত্রা যেন পলায়মান দিগন্তের সন্ধানে। এই ইন্দ্রাণীই রচনা করবে তার জন্যে শয্যা, শিয়রে জ্বালবে প্রদীপ, জীবনকে করে তুলবে অখণ্ড একটি স্বর্গের অবসর, সেই স্বপ্নের মাধুরী যেন কোথায় এক নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে গেলো। তবু তার এই দীপ্তি, এই মত্ততা, এই বলসাধনা—এতেও ইন্দ্রাণীকে কতো অতুলনীয় সুন্দর লাগছে।

বাড়ি পেয়ে ইন্দ্রাণী বললে—আমি এখানে নির্বিঘ্নে থাকবো, ঘণ্টা দুই পরে তুমি আমাকে নিতে এসো, কেমন? একা-একা বাড়ি ফিরবো না, বুঝলে?

তাকে সেখানে চাকরিতে বসিয়ে দর্শন টহল দিতে লম্বা রাস্তা নিলে। একবার ভাবলে রায় এর সঙ্গে দেখা করে আসে, আজকালের মধ্যেই তাকে তিনি যেতে বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু কি হবে সেখানে গিয়ে? ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তার মেয়েদের বন্ধুত্ব আছে বলে যদি তিনি দয়া করে তাকে চাকরিটা দেন হাতে ধরে—কেননা সে ইন্দ্রাণীর স্বামী, সেই ইন্দ্রাণীর, পরীক্ষায় যে বরাবর ফার্স্ট হয়ে এসেছে, যার

কণ্ঠে খেলতো গানের বিদ্যুৎ, শরীরে ছন্দের তরঙ্গিমা—সেই ইন্দ্রাণী আজ একটা অপদার্থের হাতে পড়ে দুঃস্থ, বিপন্ন, তাকে অর্থাৎ তার স্বামীকে যদি তিনি কিছু সাহায্য করেন। এক নিশ্বাসে দর্শনের সমস্ত উৎসাহ নিভে গেলো। ইন্দ্রাণীর স্বাধীন স্বামী-মনোনয়নের গর্বকে লাঞ্ছিত করতে তার ইচ্ছা হলো না, প্রতিপন্ন করতে তার নিজের লজ্জাকর অপৌরুষকে। অন্যমনস্কের মতো সে এখানে-সেখানে হাঁটতে লাগল। পুরুষ হয়ে সে তার প্রেমাস্পদকে আয়ত্ত করতে পারলো, কিন্তু সেই প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে পাচ্ছে না সে একটি সহজ সমতল, সুসমঞ্জস জীবন, পাচ্ছে না সে একটা হেয় মূর্খ, অকিঞ্চিৎকর চাকরি।

॥ ১০ ॥

কথাটা চাপা রইলো না. কর্ণপরম্পরায় বড়দা শুনতে পেলেন। ইন্দ্রাণী রয়েছে বারান্দায়, মা আছেন ঘরে, এমনি একটা দৃশ্যসংস্থান বেছে নিয়ে, দুজনকে শুনিয়েই তিনি বলে উঠলেন : এ কি শুনতে পাই, মা?

ঘরের ভিতরে থেকে উদ্বিগ্নকণ্ঠে সৌদামিনী বললেন—কি?

—এই যে শুনছি ছোটো বৌ নাকি মাস্টারি করতে যায়? এ কি অনাসৃষ্টি কাণ্ড।

—অনাসৃষ্টি কোন্‌টা নয়? নাড়া পেয়ে ছাইচাপা আগুন যেন শিখা বিস্তার করলো : বিয়েটাই তো একটা কেলেঙ্কারি, নিতান্ত কলকাতা শহর বলে টিকে আছি। দেশে-গাঁয়ে হলে আর রক্ষে থাকতো না।

—কিন্তু কি ভীষণ কথা! বৌ যাবে চাকরি করতে! তুমি বারণ করতে পারো না?

—বাবা, আমি যাবো বারণ করতে? বৌ তো নয়, আস্ত একগাছা বাঁশ, কে তাকে মচকাতে যাবে শুনি? ধনুকের মতো বেঁকেই আছে সব সময়, সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই চোখা-চোখা বাণ ছুঁড়তে শুরু করবে। কে এগোয় তার কাছে?

—তাই বলে মান সম্মান খুইয়ে যা-খুশি সে করবে নাকি? বাড়ির বৌ না সে? এ কি অন্যায় কথা!

সৌদামিনী ঠোঁট মুচড়ে বললেন—আরো কতো কি কাণ্ড করে ছাখ্।

—না, এখানে এ সব চলবে না বলে দিচ্ছি। বড়দা বারান্দাকে সম্বোধন করলেন : এটা ভদ্রলোকের বাড়ি, বৌ হয়ে চাকরি-ফাকরি করার এখানে রেওয়াজ নেই।

সৌদামিনী মুখটা রেখায় কুঞ্চিত করে বললেন হ্যাঁ, তোর কথা সে শুনতে গেছে।

শুনবে না কি? আমার এ বাড়ি আমি এ পছন্দ করি না। বড়দা গর্জন করে উঠলেন: এ সব বেয়াদবি করতে হয়, আমার বাড়ির বাইরে গিয়ে। বাড়িতে বসে এই অনাচার আমি কখ্খনো সইবো না। দর্শন—দর্শন গেলো কোথায়? তাকে তুমি বলে দিয়ো মা, বৌকে খাটিয়ে টাকা-রোজগারের বাড়ি এটা নয়। ছি, ছি, মানুষে বলে কি! পাড়ায় মুখ দেখানো আমার ভার হয়ে উঠলো যে! তুমি বলে দিয়ো দর্শনকে।

—কেন, তুই বলতে পারিস না?

—না, না, তুমি বলে দিয়ো ওকে স্পষ্ট করে, বৌ নিয়ে নির্লজ্জ মাতামাতি করতে হয়, এ বাড়ির বাইরে তার অনেক জায়গা আছে। বলে তিনি বারান্দায় ইন্দ্রাণীর দিকে একটা সূচ্যগ্রতীক্ষ্ণ বিষাক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সিঁড়ি দিয়ে গজগজ করতে-করতে নেমে গেলেন।

দর্শনকে কিছুই বলতে হলো না অবিশ্যি। যাকে বলবার, তাকে তিনিই যথেষ্ট বলে গেছেন। নিজেকে ইন্দ্রাণীর ভারি অসহায় ও অবসন্ন লাগতে লাগলো: না পারলো এই কটূক্তির সে প্রতিবাদ করতে, না পারলো নিজের আচরণে প্রকাশ করতে তার সত্যোপলব্ধির দৃঢ়তা। এই পরিবারের পরিধির মধ্যে আনতে হলো আবার তার ব্যক্তিত্ববোধকে বিশীর্ণ,সঙ্কুচিত করে। ছেড়ে দিতে হলো তার চাকরি ফুরিয়ে গেলো তার গান।

মেজদা ব্যাপারটাকে অন্য আলোয় দেখলেন। দর্শনকে বললেন—তোর লজ্জা করে না দর্শন, শেষকালে তোর বৌর রোজগারের পয়সা খেতে হচ্ছে?

দর্শন পীড়িত মুখে বললে—কি করা যাবে বলো, তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও যখন একটা জুৎসই চাকরি পাচ্ছি না—

—তাই বলে বৌকে দিয়ে চাকরি করাতে হবে? তুই একটা পুরুষ না?

বেদনার্ত হাসিতে দর্শনের মুখাভাস ভারি করুণ দেখালো: আজকালকার চাকরির বাজারে সেই তো আমাদের প্রকাণ্ড ডিসকোয়ালিফিকেশন। মেয়েরা বরং একটু লেখাপড়া শিখলে কতো সহজে চাকরি পাচ্ছে।

—তাই বৌকে চাকরি করতে পাঠিয়ে নিজে বসেছিস চুল বাঁধতে। বাহাদুর বটে! একেই বলে পুরুষসিংহ। বিরক্তিতে মেজদার মুখ কুটিল হয়ে উঠলো: কেন, রাস্তায় একটা মুটেগিরি, স্টেশনে একটা কুলিগিরি তোর মেলে না? এই জোয়ান শরীর, পারিস না রিক্সা টানতে?

দর্শন হেসে বললে—এ সবও মেজদা, লক্ষপতি হবার মতোই দুর্লভ স্বপ্ন। যা অসম্ভব, তাকে নিয়ে কবিত্ব করে লাভ কি?

—আর সম্ভবের মধ্যে তুই দেখছিস কেবল এই বৌয়ের আঁচল হাটকানো, কি সে ক্ষুদকুঁড়ো যোগাড় করে আনলো! রাস্তায় যে ঝাড়ু দেয়, যে ময়লাগাড়ি হাঁকায়, তার পর্যন্ত তোর চেয়ে বেশি সম্মান, বেশি প্রতিষ্ঠা। ছি, ছি, তার চেয়ে বৌয়ের আঁচলের ফাঁসটা গলায় জড়িয়ে ঝুলে পড়লেই হয়।

অতএব, ইন্দ্রাণীকে, আগেই বলেছি, চাকরিতে ইস্তফা দিতে হলো, তার স্বামীর এই কৃত্রিম মর্যাদা রক্ষার জন্যে। এই বাধার সঙ্গে সমানুপাতে দর্শন তার ব্যক্তিত্বকে বিস্ফারিত করতে পারলো না, পরিবারের কাছে সে পরাজয় স্বীকার করলে। যে টাকার জোরে সে করতে পারতো বিদ্রোহ, সে টাকার জন্যে তার যেন পিপাসা গেছে ফুরিয়ে। আজ চারদিকে কেবল অভাবের তাণ্ডব, দারিদ্র্যের নিপীড়ন। ইন্দ্রাণীকে সঙ্গে করে ধীরে-ধীরে ক্ষয় হয়ে যাওয়ার মধ্যেই যেন তার স্বামীত্বের সার্থকতা।

প্রথম প্রেমের উত্তাপে ইন্দ্রাণীকে সে এখান থেকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো—পরিবারের এই বিমর্ষ আবহাওয়া থেকে: সে শুধু তার গৃহিণী নয়, পথের সহচরী। কিন্তু এখন নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের মোহে তার সমস্ত বহিরাকাঙ্ক্ষা স্তিমিত হয়ে এসেছে। দারিদ্র্যের তাড়না ততো দুর্বিষহ নয়, যতো তার সঙ্গে দর্শনের এই নির্লজ্জ সামঞ্জস্য রাখবার চেষ্টা। কষ্ট সহ্য করবার মহিমারও একটা সীমা আছে: সে রেখা উত্তীর্ণ হয়ে যেতেই সে ক্লেশ তখন ইন্দ্রাণীর কাছে শারীরিক অসতীত্বের মতোই গ্লানিকর মনে হচ্ছিলো। মাত্র দেহটাকে অবশিষ্ট রেখে প্রেম যেন নিবতে বসেছে, আত্মা করেছে আত্মহত্যা। এই আত্মহত্যার অমর্যাদা থেকে স্বামীকে যদি সে না বাঁচাতে পারে, তবে জীবনে তার অহঙ্কার করবার আর থাকবে কি?

তাদের দুয়ের মাঝে নেমেছে যেন অপরিচয়ের যবনিকা: পরস্পরকে দুজন ক্ষণে ক্ষণে চলছে এড়িয়ে। বিস্তৃত হয়ে উঠছে ব্যবধান, এদিকে ফেনিয়ে উঠছে সংসারের হলাহল। দর্শন বোঝে ইন্দ্রাণীর অসীম বৈফল্য, ইন্দ্রাণী বোঝে দর্শনের এ নিষ্ক্রিয় বিমুখতা। দর্শন বোঝে ইন্দ্রাণীর এই ঘরের মধ্যে নির্বাসনের অনভ্যাস, ইন্দ্রাণী বোঝে দর্শনের এই বাইরের প্রতি সাতঙ্ক সঙ্কোচ। এই ক্লেশকর জীবন যাপনের সঙ্গে ইন্দ্রাণী যে মোটেই পরিচিত হতে আসেনি, সে যে রাখতে পারছে না দর্শনের এই সীমাবদ্ধতার সঙ্গে সহজ সঙ্গতি, তার বেদনা দর্শনের চোখে মুখে কাজে কথায়: আর দর্শন যে পরাঙ্মুখ ইন্দ্রাণীর প্রেমের বলিষ্ঠ সাহচর্য নিতে, জীবনের নূতন অর্ঘ্য-

বিস্কারের সন্ধানে বেরিয়ে আসতে বাইরের বিস্তীর্ণ আকাশের নিচে, ইন্দ্রাণীর নিস্তব্ধ মন্থরতায় পুঞ্জিত হয়ে উঠেছে সেই অভিমান।

এইভাবে বেশি দিন গেলো না। একদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর দর্শন ঘুমোবার চেষ্টা করছে, ইন্দ্রাণী কোথা থেকে তার বুকের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো, আনন্দে বিহ্বল গলায় সে বললে— তোমার জন্যে ভারি একটা শুভ সংবাদ আছে, আমাকে কি খাওয়াবে বলো।

এ কদিনের মলিন ম্রিয়মাণতার পর ইন্দ্রাণীর শরীরে এই খুশির ছলছলানি দেখে দর্শন অবাক হয়ে গেলো। এ কদিন সে তার কাছে ধরা দেয়নি, দুপুরে যখন সে ঘুমোয়, তাকে দেখতে নাকি এতো কুৎসিত হয় যে তাকে ছুঁতেও তার ঘেন্না করে। হঠাৎ এই বিচ্ছেদের সমুদ্র পেরিয়ে ইন্দ্রাণী স্পর্শে ফেনিল হয়ে তার শরীরের তটে এসে আঘাত করলে, এটাই যেন তার কাছে যথেষ্ট শুভ সংবাদ।

দর্শন শোয়া ছেড়ে উঠবার চেষ্টা করতে-করতে বললে – কি ? আমার একটা চাকরির দরখাস্তের জবাব এলো বুঝি ? দেখি, দেখি,— কোনটা ? লাহোরের সেটা হলে কিন্তু গ্রেট—বাংলা দেশ থেকে একবার বেরোতে পারলেই বাঁচি বাবা। দাও।

খবরটা ভাঙতে যেন ইন্দ্রাণী আর গলায় জোর পাচ্ছে না। তার এখনকার মুখের চেহারা দেখলে মনে হয়, না জানি কতো বড়ো একটা দুঃসংবাদ সে নিয়ে এসেছে। বাহুর বেষ্টনী শিথিল করে ম্লান গলায় সে বললে—তোমার নয়, এসেছে আমার চাকরির খবর।

—তোমার ?

—আর এইখেনে নয়, তোমার ভাবতে হবে না। ইন্দ্রাণী তক্তপোশের এক-ধারে সরে বসলো ; বুকের সেমিজের তলা থেকে চওড়া একটা খাম বার করে দর্শনের হাতে সেটা পৌঁছে দিতে দিতে বললে—দিনাজপুরে। য়্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেস। একশো টাকা মাইনে। আর এই আসছে মাস থেকেই। দেয়ালের ক্যালেণ্ডারের দিকে ইন্দ্রাণী ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো : মাসের আজ কতই ? একত্রিশ দিনে মাস—আর পুরো এক সপ্তাহও নেই।

বালিশে ফের হেলান দিয়ে পা দুটোকে টান করতে-করতে দর্শন বললে— তুমি নেবে নাকি ?

—বা, নেবো না ? তুমি এ কি ইডিয়টিক প্রশ্ন করলে একটা ? চাকরি নেবো না মানে ? ইন্দ্রাণী উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো : একশোবার নেবো, এখুনি নেবো। নইলে এখানে বসে পচে মরবো নাকি ? পরের প্রত্যাশী হয়ে কাঙালপনা করবো নাকি চিরকাল ?

দর্শন নিস্পৃহ, নিরাসক্তের মতো বললে—কবে যাবে?

খুশির ছটায় তারকান্বিত রাত্রির মতো ইন্দ্রাণীর দেহ থরথর করে কেঁপে উঠলো : যদি বলো তো, আজই, আজকের নর্থ-বেঙ্গলে। এখান থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্যে খাঁচার দেয়ালে সেই কবে থেকে পাখা ঝাপটাচ্ছি, আজ দরজা পেয়েছি খোলা। চলো, আজই বেরিয়ে পড়ি। টাকা? চলো, বিকেলে একটু চেষ্টা করলেই শ'খানেক টাকা রেইজ করতে পারবো।

দর্শনের এতোটুকুও উৎসাহ দেখা গেলো না। বললে—সেখানে কোথায় থাকবে?

—বা, আমি ফ্রি কোয়ার্টার পাবো না? আমি যে যুগল, হেডমিস্ট্রেস তা জানেন। সেল্ফ-কনটেইণ্ড আলাদা বাড়ি আমার জন্যে তৈরি, মালতীদিও 'সপতিক' সেখানে থেকে গেছেন। থাকা খাওয়ার দিক থেকে নাকি একবারে পারফেক্ট।

দর্শন বললে—তাহলে তো ভালোই।

ইন্দ্রাণী বালিশের উপর তার মাথাটা নেড়ে দিয়ে বললে—তুমি এতো কোল্ড কেন বলো তো? তোমার কি হলো?

মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে দর্শন বললে—না, কি হবে?

—তবে এমন একটা সুখবর পেয়ে তুমি একটুও সাড়া দিচ্ছ না যে?

—তোমার চাকরি পাওয়াটা আমার পক্ষে সত্যিই সুখবর কিনা তাই ভাবছিলাম। দর্শন হাত বাড়িয়ে ইন্দ্রাণীকে ফের কাছে টেনে আনলো, চশমার রিম্ ঘেঁষে তার ডান ভুরুর উপর ধীরে-ধীরে আঙুল বুলোতে বুলোতে ভারি গলায় বললে—তুমি কত সহজে একেকটা কাজ পেয়ে যাও ইন্দ্রাণী, আর আমি সমানে দু'বচ্ছর যা-তা একটা চাকরির জন্যে ফ্যা-ফ্যা করছি। তোমার উপর আমার ঈর্ষা হচ্ছে।

ঈর্ষা হচ্ছে, আমি কি তোমার পর? ইন্দ্রাণী দর্শনের পাশে ঘন হয়ে বসলো : আমার উপর তোমার আগাগোড়া লোভ হওয়া উচিত। আমি তো তুমিই। আমার দেহ, মন, প্রাণ—সব যদি তোমার হতে পারলো, সামান্য ক'টা টাকা তোমার হতে পারবে না?

তার ঘন, এলোমেলো চুলের উপর সস্নেহে হাত বুলোতে-বুলোতে দর্শন বললে—তোমার একটা চাকরি না নিলে কিছুতেই আর চলে না, না ইন্দ্রাণী?

—বলো, আর কি অলটারনেটীভ আছে? কি আমি করতে পারি এ ছাড়া?

দর্শন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললে—না, কিছুই তো আর নেই।

—আমি তো আর শখ করে চাকরি করতে যাচ্ছি না, ইন্দ্রাণী বললে: নিতান্ত পেটের দায়ে। যদি বলতে দাও, বলি, কেবল তোমার জন্যে। তোমার এতে কিছুই অসম্মান নেই, বরং আমি যে তোমার সত্যিকারের স্ত্রী, সেইটেই আমার পক্ষে সাংঘাতিক গৌরব। ডান হাত যদি অক্ষম হয় আর সেই সঙ্গে বাঁ হাতও যদি দেখাদেখি ধর্মঘট করে বসে তবে শরীর টেঁকে কি করে? নিজেকে বাঁচাবার মতো মহৎ কাজ মানুষের আর কি থাকতে পারে বলো?

—কিন্তু আমি কতো ছোটো ইন্দ্রাণী।

ইন্দ্রাণী এক ঝটকায় উঠে পড়লো। বললে—তাই বলে বুঝি আমাকেও ছোটো করে রাখতে চাও—আর তাতেই বুঝি তোমার মর্যাদা বেড়ে যাবে? ওঠো, তোমার সঙ্গে বাজে বকতে পারি না আর, যাবার ব্যবস্থা সব এখন থেকেই করে ফেলতে হয়। নিজেই তো বাপু তখন বলতে, এই সাংসারিক তুচ্ছতার জন্যে আমি জন্মগ্রহণ করিনি, আমার উদ্দেশ্য আরও মহত্তর—এখন নিজেই মিইয়ে গেলে চলবে কেন? ইন্দ্রাণী এটা ওটা টুকিটাকি কাজ সারতে লাগলো: দেখ দেখি, নিজের চেহারাখানা কি করেছ! দারিদ্র্য যতো বাড়ছে, ততো যেন বাড়ছে তোমার তৃপ্তি। বাবাঃ, দুধের দাম দিতে পারি না বলে বাড়িতে চা খেতে পাবো না, এমন অত্যাচারের কথা কে কবে শুনেছে? তুমি মুখের কথায়ই যতো কামান দাগো; আর সত্যি যখন তোমার কথা শুনে কাজ করতে যাই, তখনই তোমার উৎসাহের বারুদ যায় ফুরিয়ে। চাকরি করবে না, পরের ঘুঁটে কুড়োবে? তুমি যখন পারছ না, আমাকেও তখন পারতে হবে না—কি চমৎকার বুদ্ধি তোমার! তবে আমি—আমি কেন? তবে এতো মেয়ে থাকতে তুমি ইন্দ্রাণীকে ভালোবেসেছিলে কি দেখে? তুমি যখন পারবে না, তখন আমাকেই হাজার বার চাকরি করতে হবে। ইন্দ্রাণী আবার দর্শনের কাছে ফিরে এলো নাও, ওঠো, আজই যাবো। কি তোমার নেবার, গোছগাছ করে নাও। আমি মাস্টারি করতে গিয়ে কি পরে যে বেরুবো মেয়েদের কাছে—সে যাক গে। চলো, কিছু আপাতত ধার যোগাড় করি গে।

দর্শন বললে—আমি কোথায় যাবো?

—বা, তুমি আমার সঙ্গে যাবে না দিনাজপুর?

—তুমি চাকরি করতে যাবে, আমি সেখানে গিয়ে করবো কি?

নিমেষে ইন্দ্রাণীর মুখ কঠিন, গম্ভীর হয়ে উঠলো। বললে—আর, তুমি একটা

চাকরি পেয়ে গেলে আমাকেই বা এখানে তবে থাকতে হবে কেন? আমারই বা তখন কি কাজ! আমার এই প্রয়োজনসাধনের মহান প্রচেষ্টাকে তুমিও কিনা অগৌরবের জিনিস বলে ভাবতে শিখেছ, আর এই যে প্রত্যহ আমাকে অশুচি দারিদ্র্যের মধ্যে টেনে নিয়ে আসছ, এতেই তোমার সম্মান বাড়ছে? তোমার সম্মান বাড়ছে উঠতে বসতে রোজ এই সংসারের নিন্দা বিদ্রূপের খোঁচা খেয়ে? নানাদিকে তোমার অর্থ ব্যয় করতে আমার সম্মান যায় না, সম্মান যায় তোমার জন্যে অর্থ উপার্জন করলে? তোমাকে বিপন্ন করলে আমার সম্মান কমে না, কমে, তোমাকে বিপদের দিনে সাহায্য করতে গেলে? রান্না করতে পারবো, ঘর ঝাঁট দিতে পারবো, নর্দমা পরিষ্কার করতে পারবো, একটা য়্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেসের চাকরি করতে পারবো না?

কথায় উজ্জ্বল, গতিশীল, ইন্দ্রাণীর আরক্ত মুখের দিকে চেয়ে দর্শন বললে—আমি তা বলছিলাম না। চাকরি না করে তোমার উপায় কি?

—নেইই তো উপায়। প্রসন্ন ব্যঙ্গের স্বরে ইন্দ্রাণী ঝাঁঝিয়ে উঠলো: তবে তোমার এখানে উপোস করে শুকিয়ে মরবো নাকি ভেবেছ? না, সেইটেই আমার খুব একটা সম্মানের কাজ হবে?

—তাও নয়, দর্শন শোয়া ছেড়ে উঠে বসলো: কিন্তু আমার সেখানে কি কাজ আছে বলো? আমি করবো কি?

ইন্দ্রাণীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো: এখানে যা করতে, তাই। তোমার কি, খাবে-দাবে, ঘুমুবে আর দিস্তে-দিস্তে দস্তখত পাঠাবে। আবার কি কাজ!

কথা কয়টা বিষাক্ত সাপের ছোবলের মতো দর্শনের মুখের রক্ত শুষে নিলো। অবশ, নিষ্প্রাণ, গলায় সে বললে—তার চেয়ে আমার মরে যাওয়াই বড়ো কাজ, ইন্দ্রাণী। তখন তুমি একেবারে মুক্ত, একেবারে একলার।

কথাটা বলে ফেলেই ইন্দ্রাণী ভয় পেয়েছিলো, হঠাৎ দর্শনের কথা শুনে সে সেই ভয়ের মেঘের উপর ছড়িয়ে দিলো হাসির বিদ্যুদ্বন্যা। ইন্দ্রাণী জোরে, গলা ছেড়ে, ঘরের সমস্ত শূন্য কাঁপিয়ে খিল-খিল করে হেসে উঠলো। দুই সুপুষ্ট, সবল হাতে দর্শনের গলা জড়িয়ে ধরে হাসতে হাসতে বললে—উঃ, তুমি কি মরবিড! এতো বড়ো সুখের সময় কিনা মরণের কথা মুখে আনো। নিজের দুই প্রসন্ন, আয়ত চোখের উপর স্বামীর নিরাভ, বিষন্ন মুখ স্পষ্ট করে তুলে ধরে সে বললে—বটে! আমি আমার একলার জন্যেই তো এই কষ্ট করছি, তুমি আমার কেউ নও, আমার মাথার সিঁদুরের কোনো মানে নেই? আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে চাই না, আর তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চাও? পুরুষের এ ভালোবাসার আবার

বড়াই করো তোমরা? পরে তার দুর্বল নির্বোধ, অসহায় মুখ ইন্দ্রাণী তার বুকের উপর চেপে ধরলো: তোমাকে ছাড়া আমি থাকবো কি করে? নতুন জায়গা, নতুন চাকরি, সেখানে তুমি আমার নতুন। দুজনে এক-একা কেমন আরামে থাকবো বলো দেখি? আলিঙ্গন হঠাৎ শিথিল করে অভিমানে সজল দুই চক্ষু তুলে ইন্দ্রাণী ফের বললে—আমাকে ছেড়ে তুমি একলা থাকতে চাও?

অসহায় শিশুর মতো ইন্দ্রাণীর উত্তপ্ত আঁচলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে দর্শন বললে—পাগল!

॥ ১১ ॥

যেতে-যেতে আরো দুদিন দেরি হয়ে গেলো।

রাত্রে ট্রেন, দর্শন একটা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে এসেছে. মালপত্রের মধ্যে দুজনের দুটো ট্রাঙ্ক আর সুটকেস, আর দুজনের একত্রিত একটা বিছানা। খবরটা এ দুদিন দর্শন চাপা দিয়ে ছিলো, কিন্তু চাকরের হাত দিয়ে মালগুলি নিচে পাঠাতেই সৌদামিনী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন: একি, তুই চললি কোথায় রাত করে?

সৌদামিনীর বিস্ময় আরো বেড়ে গেলো যখন দেখলেন দর্শনের পিছনে সসজ্জা ইন্দ্রাণী গায়ে একটা পাতলা চাদর জড়িয়ে ছোটো একটা য়্যাটেসি-কেস নিয়ে এগিয়ে আসছে।

—একি, তুমিও চললে কোথায়?

ইন্দ্রাণীকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে দর্শন বললে—দুজনে ক'টা দিন একটু ঘুরে আসতে যাচ্ছি, মা।

—ঘুরে আসতে যাচ্ছ মানে?

নীরদা কাছেই কোথায় ছিলো, কলকলিয়ে বলে উঠলো: তোমার বৌ যাচ্ছে চাকরি করতে, আর তুমি যাচ্ছ আঁচল ধরতে—সত্যি কথাটা সোজাসুজি বলতে এতো লজ্জা কিসের? সংসারে চিনেছো তো কেবল ঐ পদপল্লব—বলো না, যাচ্ছ তার পাদোদক খেতে?

দর্শন ইন্দ্রাণীকে লক্ষ্য করে জোর গলায় বললে— দাঁড়িয়ে আছ কি ওখানে? চলে এসো।

ইন্দ্রাণী সৌদামিনীর পায়ের কাছে উপুড় হয়ে প্রণাম করলো, একটিও কথা বললো না।

সৌদামিনী তার মুখের উপর রুখে এলেন: কলির বৌ ঘরভাঙানি হয় শুনেছি, কিন্তু তোমার মতো এমন বেআক্কেল মেয়ে তো কই দেখিনি বাপু? সংসারে

টাকাই যদি রোজগার করতে চাও, করো গে, যেদিকে খুশি বেরিয়ে যাও না তুমি —কে তোমার পথ আটকাবে, কিন্তু দর্শনকে তুমি কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

অন্ধকার সিঁড়ির উপর দর্শনের দিকে চেয়ে নীরবে ইন্দ্রাণী একটু হাসলো। ধাপ চিনে-চিনে নেমে আসতে-আসতে সে একটি নিশ্বাসের পর্যন্ত শব্দ করলো না।

—ও যাবে কেন নিয়ে, আপনার দর্শনই যাচ্ছেন ল্যা-ল্যা করতে-করতে। নীরদার জিভ লক্‌লক্ করে উঠলো: বৌ না হলে ওঁকে খাওয়াবে কে? এখন যে বৌই ওঁর মাথার মণি, অঞ্চলের সোনা। আর ওঁর কেউ নেই—দাদারা খেটে-খেটে হাড়-মাস ভাজা-ভাজা হচ্ছেন, আর উনি যাচ্ছেন কোল-সোহাগীকে নিয়ে হাওয়া খেতে। চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়ায়, রামা চড়ে ঘোড়া। পোড়ার দশা আর কি।

দর্শন নিচে থেকে অবতীর্যমান ইন্দ্রাণীকে উদ্দেশ করে ফের বলে উঠলো: শীগ্‌গীর চলে এসো।

সৌদামিনী কেঁদে কেটে প্রায় একটা হাট বসাবার যোগাড়। নিভা ঢলো-ঢলো হয়ে বললে—এমন বৌ-ন্যাওটা পুরুষমানুষ আর কোনোকালে দেখিনি, দিদি। হাঁচলে জীবো বলে, হাই তুললে তুড়ি দেয়। কামাখ্যার মেয়ে বাবা—হাড়েতে ভেল্কি হয়। নইলে ভাবো দিকি একবার, কোনো ঘরের বৌ টাকা রোজগার করতে রাস্তায় বেরিয়েছে— মাগো, তার জন্যে আবার এতো আদেখ্‌লেপনা। অন্য কেউ হলে তেমন নটকীর থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিতো না?

নীরদা সায় দিলো: দাব্ নেই—দাব্ না থাকলে স্ত্রী বশ মানবে কেন? হবেই তো সে গস্তানি, যাবেই তো সে উড়িয়ে-পুড়িয়ে, কুলে ছাই দিয়ে।

নিচে সদর দরজার কাছে, দাদারা আবার পাকড়াও করলেন।

—এ কি, কোথায় চললি তোরা?

রোয়াকের উপর চলে এসে পিছন দিকে না তাকিয়ে দর্শন গম্ভীর গলায় বললে —দিনাজপুর।

—সেখানে কি?

—সেখানকার স্কুলে ইন্দ্রাণীর একটা কাজ হয়েছে।

মেজদা চিপ্‌টেন কাটলেন: আর তাতে তোর কি কাজ হলো শুনতে পাই?

গাড়ির দরজাটা একহাতে খুলে দর্শন ব্যস্ততার ভান দেখিয়ে অনুসারিকা ইন্দ্রাণীকে বললে—উঠে পড়ো।

বড়দার গলা থেকে খাদগম্ভীরে আওয়াজ বেরুলো···শেষকালে বৌ নিয়ে আলাদা হয়ে যাচ্ছিস, দর্শন?

পা-দানিতে পা রেখে গাড়িতে উঠতে-উঠতে দর্শন বললে···ভিড়ের মধ্যে

একসঙ্গে থেকে বাঁচতে পারলাম কই। তারপর ইন্দ্রাণীর পাশে বসে গাড়োয়ানকে হুকুম করলে : চলো।

গাড়ির চাকার ঘর্ঘরের সঙ্গে-সঙ্গে মেজদার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো : বাঁচবার কি একখানা চমৎকার নমুনা!

খানিকক্ষণ কাটলো চুপচাপ। গাড়িটা মোড় ঘুরলো।

গায়ের থেকে চাদরটা ফেলে দিয়ে দুই হাতে দর্শনের দুই হাত তার কোলের উপর চেপে ধরে ইন্দ্রাণী গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে বললে…বাঁচলাম। তুমি যে আমাকে শেষকালে বাইরে নিয়ে আসতে পারলে, উঃ, দুই হাতের মধ্যে ইন্দ্রাণীর হৃদয় থরথর করে কাঁপতে লাগলো : একেই বলে অসহ্য সুখ।

তার সবল, উত্তপ্ত মুষ্টির সুদৃঢ় আশ্রয়ের মাঝে নিজের দুই হাত ছেড়ে দিয়ে দর্শন বিষণ্ণ গলায় বললে…তুমিই তো আমাকে নিয়ে এলে, ইন্দ্রাণী, আমি কোথায়!

…তোমার মনে হচ্ছে না, সত্যি করে বলো তো…ইন্দ্রাণী সমস্ত দেহ মনে যাত্রার এই অভিনব আনন্দ অনুভব করতে-করতে বললে…আমরা খুব একটা বড়ো আদর্শের জন্যে বেরিয়ে এলাম? সে আমাদের বাঁচবার অধিকার, আমাদের স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ হবার মহান স্বার্থপরতা! আমার কি যে ভালো লাগছে তোমায় কি বলবো? সত্যি কথা স্বীকার করতে আমাদের লজ্জা কি, জীবনে স্বার্থপর হবার মতো বড়ো আদর্শ কিছুই আর নেই পৃথিবীতে। কি বলো।

গ্যাসের আলোয় পাণ্ডুর, ধূসর রাস্তার দিকে চেয়ে দর্শন চুপ করে বসে আছে।

ইন্দ্রাণী খানিকটা অন্যমনস্কের মতো বললে—আর সবার সঙ্গে তোমার টাকার সম্পর্ক, টাকার পরিচয়। এমন যে গদগদ মাতৃস্নেহ, তারো গভীরতার মূলে রয়েছে টাকার অনুপাত। কেবল আমিই—হ্যাঁ, জোর করেই বলবো, ইন্দ্রাণী তার স্পর্শে আরো উত্তাপ, আরো আন্তরিকতা সঞ্চারিত করে দিলো : কেবল আমিই টাকার দিকে চেয়ে তোমার কথা ভাবিনি, বরং তোমার দিকে চেয়ে টাকার কথা ভাবলাম। কেননা আজকের দিনে সকলের চেয়ে আমিই তোমার বড়ো সত্য।

উত্তরে দর্শনের দিক থেকে একটা প্রগাঢ় সম্মতির জন্যে খানিকক্ষণ প্রতীক্ষা করে ইন্দ্রাণী ফের আগের কথায় ফিরে গেলো : টাকার সম্পর্ক, কিছু কিছু টাকা পাঠিয়ে তাঁদের সঙ্গে সেই সম্পর্ক বহাল রাখলেই হবে।

ইন্দ্রাণীর মুঠি থেকে আঙুলগুলি আলগোছে শিথিল করে আনতে-আনতে দর্শন বললে—তোমার টাকা তাঁরা নিতে যাবেন কেন? আমি পাঠালে হয়তো নিতেন, কিন্তু তুমি কে? আমি নিতে পারি বলে সবাই তো আর

আত্মধিক্কার দিতেও দর্শনের বিরক্তি এসে গেছে।

—না নিলে তো বয়ে গেলো। অপম্রিয়মান আঙুলগুলো মুঠির মধ্যে আবার চেপে ধরে ইন্দ্রাণী বললে—তুমি নিলে—আমাকে তুমি সম্পূর্ণ করে নিলেই আমি সার্থক। আমি আর কিছু চাই না।

তারপর, ট্রেন ছুটেছে উদ্দাম, রাত হয়ে এসেছে বিরহের মতো অবিচ্ছিন্ন। আকাশে ময়লা একটু জ্যোৎস্না উঠেছে। গাড়িতে যাত্রীরা সব স্তব্ধ, দর্শনও বালিশে মাথা এলিয়ে ঘুমে নিঝুম। ঘুমচ্ছে বলে তার মাথার সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে ইন্দ্রাণীও বেঞ্চির আধখানা জুড়ে শুয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু তার ঘুম আসছে না। আরো কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থেকে ইন্দ্রাণী উঠে বসলো। অবসন্ন জ্যোৎস্নায় ধূ-ধূ করছে মাঠ…রাত্রিময় কি নিরন্ধ্র প্রশান্তি! যেন তার প্রেমের গভীরতার মতো অপরিমেয় সেই স্তব্ধতা। ইন্দ্রাণী দর্শনের মাথার নিচে একখানি হাত রেখে বালিশে তাকে আরো ভালো করে শুইয়ে দিলে। গলার বোতামটা ছিলো খোলা, তা দিলো পরিয়ে। কতো যে তার ভালো লাগছে এই রাত জাগতে, তার চোখের সামনে দিয়ে তা ভোর করে দিতে। জীবনে সে যেন আজ খুঁজে পেয়েছে তার প্রেমের সার্থকতা - তার নারীত্বের অহঙ্কার। তার প্রেমেরই জন্যে নারীত্ব নারীত্বের জন্যে প্রেম নয়। এই প্রেম, ইন্দ্রাণী দর্শনের ঘুমন্ত চোখের উপর থেকে হাওয়ায় ওড়া দীর্ঘ চুলগুলি কপালের দুই পাশে সরিয়ে দিতে লাগলো, তার স্বামী, তার দর্শনের চাইতেও অনেক বেশি।

॥ ১২ ॥

পরিচ্ছন্ন ছোটো একখানি বাড়ি, একতলা, পাশাপাশি সমান মাপের তিনখানি কোঠা—সামনে দিয়ে, কোঠাগুলি ছুঁয়ে চলে গেছে এক বারান্দা, তারপর খানিকটা দেয়াল-ঘেরা জমি পেরিয়েই রাস্তা। সেই জমির উপর টিনের একখানি ছোটো রান্নাঘর, একপাশে কতোগুলি কলাগাছের ঝোপের মধ্যে কাঁচা একটি পাতকুয়ো। লতায়-পাতায় জমিটুকুর উপর স্নিগ্ধ ছায়া করা।

দুজনের জন্যে জায়গা সেখানে অনেকখানি।

তক্তপোশ, টেবিল, চেয়ার—আস্তে-আস্তে দু-একটা করে আসবাব আসতে লেগেছে ; রান্নাঘরে ডেকচি, কড়া, খুন্তি-হাতা, ভাঁড়ারে হাঁড়ি-কুঁড়ি, শিশি-বোতল দা-কুরুনি। বারান্দায় মোটা ক্যান্‌ভাসের দুটো ইজিচেয়ার। একপাশের একটা ঘরকে করা হয়েছে বসবার, টেবিলের উপর কতোগুলি বই, ইস্কুল থেকে পাওয়া

গেছে দুটি চেয়ার বেতের ও কাঠের, লণ্ঠন আর রিঙ্-ঝুলানো পরদা। তারপর পাশাপাশি দুটো ঘর শোবার—একটা ইন্দ্রাণীর, একটা দর্শনের। একত্রিত বিছানাটাকে দ্বিখণ্ড করতে হয়েছে। দরকার হয়েছে তাই দুপ্রস্ত শয্যা এবং তার অনুষঙ্গ। ইন্দ্রাণীর ঘরের দেয়ালে বড়ো একটা আয়না, তার পাশে কুলুঙ্গিতে দাঁতন থেকে শুরু করে তার চুলের ফিতে-কাঁটা, দেয়ালের কোণ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একটা আলনা, শাড়িতে-সেমিজে বোঝাই, আলনার পা-দানিতে জুতো। ঘরদোর তার হাসিতে উদ্ভাসিত দাঁতের মতো ঝকঝক করছে। দর্শনের ঘরের দেয়ালগুলি একেবারে শাদা, তার বিরহের মতোই শুভ্র-শূন্য। কোথায় বা তার জামা-জুতো, কোথায় বা তার দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম। কে বা এখন দেখেশোনে, কে বা রাখে গুছিয়ে! ইন্দ্রাণীর এখন কতো কাজ। দিনের বেলায় সে ইস্কুলে, রাত্রে সে দর্শনের পাশের ঘরে। নিরালা জায়গা, একটু ভয় করে বলে দু-ঘরের যাওয়া-আসার দরজাটায় সে খিল চাপায় না, কিন্তু মনে হয়, ভয় তার বেশি যেন এখন তার স্বামীকেই। সে আর এখন স্ত্রী নয়, শিক্ষয়িত্রী। স্বামীর চেয়ে এখন সে নিজেকে বেশি যত্ন করে, সাবধানে রাখে। এখন এই তার স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ হবার মহান স্বার্থপরতা।

তবু কলকাতায় তার নিষ্কর্মণ্যতার মাঝে দর্শন খানিক পূর্ণতা পাচ্ছিলো, কিন্তু এখানে এই বিশ্রামটা যেন একটা বোঝা, রাত্রিতে একটা দুঃস্বপ্নের চাপ: যাকে বলে, তাকে বোবায় ধরেছে। কলকাতায় তবু শরীরে মনে সে একটা সক্রিয় উদ্বেগ অনুভব করতো, এখানে আগাগোড়া একটা ঠাণ্ডা, নিশ্চুপ নিশ্চিন্ততা। সেখানে শত অভাব অশান্তির মাঝে ইন্দ্রাণী ছিলো কাছে, বাহুবিলগ্ন, তার দেহ ছিলো সান্ত্বনার একটি শীতল প্রবাহিনী, সে ছিলো তার অন্তরের অঙ্গ: এখানে যেমন বলতে গেলে, ততো অভাব নেই, তেমন ইন্দ্রাণীও নেই; এখানকার আবহাওয়া যেমন ঠাণ্ডা তেমনি সমানুপাতে ইন্দ্রাণীও এসেছে জুড়িয়ে; ইন্দ্রাণী এখানে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, স্বয়ংপ্রধান, তার পরিচয় সে নিজে, তার অস্তিত্বের প্রমাণ তার এখন নিজের কর্মোদ্‌যাপনে, এখন কারুর প্রতি তার সহানুভূতি দেখানো অর্থ করুণা দেখানো। সান্ত্বনায় যদি সে এখন নুয়েও আসে কোনোদিন, তবে সেটাকেও দেখাবে তার অহঙ্কারে একটা উদ্ধত ভঙ্গির মতো। ইন্দ্রাণীকে দেখবার দৃষ্টিকোণ এখন বদলে নিতে হচ্ছে।

কলকাতায় থাকতে দর্শন কতো ভোরে উঠতো—টিউশনি থাক বা না থাক। তার আলস্যভোগটা পরিবারের কাছে অশ্লীল একটা অপরাধ, তাই সব সময়েই ছিল তার একটা ব্যস্ততার ভাব—তাতে ফল কিছু হলো বা নাই হলো। কিন্তু এখানে

কিছুই আর তাড়া নেই, যতোক্ষণ খুশি না ঘুমিয়ে শুয়ে থাকা যায়। ভোররাত্রের ঘুম কেউ তার গা ধরে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যায় না। আগে-আগে, কলকাতায়, ইন্দ্রাণী যখন বিছানার পাশ থেকে উঠে পড়তো, তখন কেউ কিছু তাকে না বলে দিলেও সেই শূন্য শয্যা তাকে বলে দিতো আর শুয়ে থাকার কোনো মানে নেই, এবার ওঠো। এখন জাগা না-জাগা তার সমান। শোয়া-ওঠাতে সমান পরিশ্রম। শুধু রোদ ওঠবার সঙ্গে-সঙ্গে ইন্দ্রাণী চায়ের বাটি হাতে ঘরে ঢোকে, টিপয়ের উপর সেটা নামিয়ে রাখতে রাখতে তাকে একবার ডাকে, ছল করে ঘুমিয়ে থাকলে বা গায়ে একটু ঠেলা দেয়,···শুধু সেইটুকুর জন্যে প্রতীক্ষা করতে দর্শন আরো খানিকক্ষণ চুপ করে পড়ে থাকে। সেই সময় ইন্দ্রাণী নিজেরও অলক্ষ্যে দর্শনের একটু সন্নিহিত হয়ে আসে। যতোটুকু সে না নিজে থেকে দেবে, তার অতিরিক্ত কিছু দাবি করবার যেন দর্শনের অধিকার নেই। মাঝে-মাঝে কোনো-কোনো অসতর্ক মুহূর্তে সে আবিল, প্রগল্‌ভ হয়ে উঠতে চায়, কিন্তু নিজেরই কাছে তার করে ভীষণ লজ্জা, প্রেমকে দেখায় যেন একটা নির্লজ্জ, নির্জলা কামনার মতো। ইন্দ্রাণীকে কাছে ডেকে আনার অর্থই হচ্ছে তাকে তার মহিমার চূড়া থেকে নামিয়ে নিয়ে আসা, নিয়ে আসা দর্শনের এই পরাজয়ের গ্লানির মধ্যে ; অর্থাৎ তার কাছে সে যেন তার অক্ষমতার ক্ষমা চায়, তার দৌবল্যের চায় সমর্থন ! তাকে কাছে ডেকে আনায় যেন এখন কেবল কাতর ভিক্ষা, অশোভন লোলুপতা। ইন্দ্রাণীকে তাই ছুঁতেও তার এখন ভয় করে, পাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে তাতে তার প্রেমের দারিদ্র্য, শরীরের কাকুতি। পাছে তার আত্মদৌর্বল্য আরো গভীর হয়ে ওঠে, তাই যতোদূর সম্ভব, নিজেকে নিশ্চিহ্ন ও নিরুচ্চার করে রাখাই দর্শনের কাজ। ইন্দ্রাণী যদি কোনোদিন মমতার ভারে বর্ষার মেঘের মতো আসে নুয়ে, যদি তার প্রবহমানতার আনন্দে দর্শনের তটদেশে দিয়ে যায় দুটো ঢেউ। এখনো তার সেই প্রতীক্ষা, দেহের বাতায়নে মনের চোখ রেখে বসে থাকা। তা, ইন্দ্রাণীর এখন মাত্র প্রেম করা ছাড়া আরো অনেক কাজ, অনেক বিস্তৃতি।

রোদ উঠে গেছে, দর্শন বিছানায় শুয়ে চোখ বুজে ইন্দ্রাণীর সমস্ত দিনের মধ্যে প্রথম ও স্বতঃপ্রণোদিত স্পর্শটির জন্যে প্রতীক্ষা করছিলো।

আজকের ইন্দ্রাণীর পায়ের শব্দ অত্যন্ত দ্রুত, তার স্পর্শে আজ সেই অনুরাগের বিহ্বল মন্থরতা নেই। দর্শনের মাথাটা দুই হাতে ঝেঁকে দিয়ে সে বললে—ওঠো, ওঠো শীগ্‌গীর, বেলা কতো হলো খেয়াল আছে ?

স্পর্শটা এমন নয় যে দর্শন ধীরে-ধীরে চোখ মেলবে। উঠলো সে ধড়মড় করে।

ইন্দ্রাণীর চেহারা দেখে সে অবাক।

—এ কি সক্কালবেলাই এতো সাজগোজ ?

ইন্দ্রাণীর শরীর খুশিতে উছলে উঠলো : হ্যাঁ, একবার স্কুলের সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমাকে আর হেডমিস্ট্রেস্‌কে ডেকে পাঠিয়েছেন। গাড়ি নিয়ে হেডমিস্ট্রেস্ হাজির। আর তুমি এখনো ওঠোনি।

দর্শন চোখ কচলে নিয়ে ইন্দ্রাণীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো।

—আটটায় টাইম দিয়েছেন, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসবো বুঝলে ? দর্শন বললে—আমার চা ?

—নিজেই তৈরি করে নিয়ো, কেমন ? ঝিকে বলে গেলাম জল গরম করে দেবে। বুঝলে ?

ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

এক পেয়ালা চা তৈরি করে খাওয়া এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। কিন্তু এক বেলা চা না খেলেই বা কি ! ইন্দ্রাণী সেই যদি তার ঘুম ভাঙাতেই এলো তো হাতে করে এক পেয়ালা চা নিয়ে এলো না কেন ?

অন্যায়, এই অভিমান দর্শনকে সাজে না। এতো সকালে ইন্দ্রাণীকে যদি স্কুলের জরুরী কাজে বেরুতে হয়, তবে আরেক পাট চা করবার তার সময় কোথায় ? নিজের সাজসজ্জার আয়োজনের চাইতে তার জন্যে তুচ্ছ এক পেয়ালা চা করে দেওয়া তো বেশি দরকারী নয়।

দর্শন তা বুঝুক। সে কেবল ইন্দ্রাণীর উপর ভর করেই থাকবে, তাকে করবে না সাহায্য, দেবে না সহযোগিতা—দর্শনের কাছে তা সে প্রত্যাশা করে না। মাত্র তো নিজের জন্যে এক পেয়ালা চা করে নেওয়া—তাতে কতোটা সময় বাঁচে।

সেদিন দর্শন হঠাৎ ভুল করে চেঁচিয়ে উঠলো, আমার গেঞ্জি—গেঞ্জিটা গেলো কোথায় ?

দর্শন একটু বাইরে বেরুবার উদ্যোগ করছিলো—ইন্দ্রাণী সবে স্কুল থেকে ফিরে জামা-কাপড় ছেড়ে বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে।

দর্শনের গোলমালে সে কোনো গা করলে না।

—কোনো জিনিস যদি হাতের কাছে আজকাল খুঁজে পাই। জামার বোতাম সব ছেঁড়া, জুতোয় আজ তিনমাস ধরে কালি পড়েনি। দর্শন বারান্দায় চলে এলো, মুখিয়ে উঠলো ইন্দ্রাণীর উপর : আমার গেঞ্জিটা খুঁজে দিয়ে দাও দেখি।

ক্লান্তিতে তেমনি গা এলিয়ে রেখেই ইন্দ্রাণী বললে—তুমিই তো আজ সেটা সাবান দিয়ে কাচলে দেখলাম।

—তবে কে আর কেচে দেবে আমার হয়ে? দর্শন অভিমানে মুখ ভার করে বললে—রোদ্দুরে শুকোতেও দিয়েছিলাম—এখন আর খুঁজে পাচ্ছি না।

ইন্দ্রাণী বললে—নিজের সামান্য জিনিস নিজে গুছিয়ে রাখতে পারো না? এও আমাকে করে দিতে হবে? এখন এই টয়োর্ড অবস্থায় আবার সব জিনিসপত্র ওলোট-পালোট করতে বসি! তবে তুমি আছ কি করতে, সমস্ত দিন কি করো? আমার জন্যে তোমার একটু মায়া করে না?

মায়ার কথা নয়, দর্শনের মনে হলো, এই সব তুচ্ছ কাজ আর মানায় না ইন্দ্রাণীকে। সত্যিই তো, তারি তো বরং উচিত এখন ইন্দ্রাণীর শাড়ি-সেমিজ তদারক করা, কাতের কাছে জুতোটা-ছাতাটা এগিয়ে দেয়া, তার যাতে এতটুকু ঠেকতে না হয়, সমস্ত ফিটফাট, গোছগাছ করে রাখা। সমস্ত দিন সে করে কি! এখানে সে তবে কি করতে এসেছে?

দর্শন আর কোনো কথা বললো না। সে তার গেঞ্জি খুঁজে পেলো। 'এও তাকে করে দিতে হবে নাকি?' সে কি এই সব টুকিটাকি তুচ্ছতার জন্যে এইখানে মাস্টারি করতে এসেছে? তার এতো সব বৃহৎ অনুষ্ঠানের মাঝে আবার একটা ছেঁড়া গেঞ্জি খুঁজে দেয়া! কখ্‌খনো না, দর্শন তা অনায়াসে বোঝে। জামার বোতাম সে নিজেই লাগায়, রুমালগুলি সে-ই কেচে রোদ্দুরে শুকোতে দেয়। কলকাতায় থাকতে ইন্দ্রাণী তার নরম, এলানো আঙুলগুলো দিয়ে কি করে যে তার জুতোয় কালি লাগিয়ে দিতো তা সে ভাবতেই পারে না। এখন মুখ ফুটে সে কথা উচ্চারণ করাও একটা বিভীষিকা, তার আত্মমর্যাদার উপর নিষ্ঠুর একটা বলাৎকার। জুতোয় এখানে কালি না লাগালেই বা কি! যে জায়গা, এখানে কোনো রকমে এক জোড়া জুতো যোগাড় করতে পারলেই যথেষ্ট। কে অতো দেখতে আসছে

কে অতো দেখতে আসছে তার বিছানার চাদরটা কেমন নোংরা, ঘরে কেমন ধুলো? কেমন কতোগুলি কাজ তার নিজের জন্যে স্পষ্ট, নির্দিষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রয়োজনের রেখা টেনে-টেনে কেমন সে ইন্দ্রাণীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসছে দিন-দিন। বালিশের খোল ছিঁড়ে তুলে বেরিয়ে এসে দর্শনকেই নিতে হয় ছুঁচ-সুতো—কেননা সেটা তার বালিশ। কর্ত্রীর হুকুমে ঝি ঘর ঝাঁট দিতে না এলে দর্শনেরই উচিত ঝাঁটা হাতে করা—কেননা সেটা তার ঘর। নিজের বিছানাটাও যদি সে নিজ হাতে পেতে রাখতে না পারে তো সমস্ত দিন সে করে কি!

তেমনি, সকালবেলা দর্শনকে জাগাতে এসে ইন্দ্রাণী একদিন দেখলে তক্তপোশের

মতো তক্তপোশ আছে পড়ে, দর্শন মেঝের উপর একটা মাদুর পেতে ঘুমিয়ে আছে।

ইন্দ্রাণী হাঁটু মুড়ে তার শিয়রে বসে পড়লো। রুক্ষ চুল ভরা মাথাটা তার কোলের উপর টেনে আনতেই দর্শন চোখ মেললো। ঘুমের সঙ্গে তাতে অভিমানের ম্লানিমা।

ইন্দ্রাণী নুয়ে পড়ে বলল—এ কি, এখানে শুয়ে আছ কেন?

মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে নিয়ে দর্শন বললে—তবে কোথায় শোবো?

—কেন, বিছানা কি দোষ করলো?

—শুকনো তক্তপোশের চাইতে মেঝেটা মন্দ কি! দর্শন উঠে বসলো: কে আবার ওসব বিছানা-ফিছানা পাতে বলো, মশারি-ফসারি টাঙানোর কে অতো হাঙ্গামা করে? তার চেয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়া অনেক সোজা।

ইন্দ্রাণী ব্যস্ত হয়ে বললে—কেন, ঝি কাল বিছানা পেতে রাখেনি বুঝি? ওটাকে দিয়ে কিছু কাজ হচ্ছে না, ওকে তুমি তুলে দাও।

দর্শন ঝাপসা গলায় বললে—তোমার অসুবিধে হচ্ছে দেখলে একশোবার তুলে দেবে বৈকি। আমি তার কি বলবো?

প্রচ্ছন্ন খোঁচা খেয়ে ইন্দ্রাণী ছটফট করে উঠলো: তুমিই বা কেমন ধারা শুনি, ভুলে একদিন বিছানাটা পাতা হয়নি বলে একেবারে মেঝের উপর গড়াগড়ি দিতে হবে? নিজের বিছানাটা নিজে পাততে পারো না, কি এমন একটা হাঙ্গামা শুনি? তোমাকে তো কেউ আর কুড়ুল দিয়ে গাছ ফাড়তে বলছে না? বিছানাটা শুধু টান করে শুয়ে পড়া।

বলে ইন্দ্রাণী নিজেই বিছানাটা এক হাতে মেলে ফেললে। বললে: সেই আমাকেই রোদ্দুরে দিতে হবে, আমাকেই বাছতে হবে ছারপোকা। আমার দিকে তুমি তাকিয়ে একবার দেখতে পাও না—আমার সময় কোথায়?

বিছানাটা সম্পূর্ণ প্রসারিত করতেই তার দারিদ্র্য যেন অট্টহাস্য করে উঠলো। তোশকের মধ্য থেকে তুলোর চাপগুলি এখানে ওখানে ঠেলে উঠেছে, চাদরটা চিট্-ময়লা, বালিশের সেলাই খসে গিয়ে তুলো পড়েছে বেরিয়ে।

—না, বিছানার এমন চেহারা, আমাকে পারোনি একবার বলতে। নতুন দুটো বালিশ করে নিলেই হয়। ইন্দ্রাণী ঝাঁজিয়ে উঠলো: না, কে তুলো ধোনে, কোথায় খেরো পাওয়া যায় এই সব আমাকেই খুঁজে বেড়াতে হবে নাকি? বিছানা ছিঁড়ে গেছে, আমাকে বলতে তোমার কি হয়েছিলো জিগ্গেস করি?

আগে-আগে, কলকাতায় থাকতে, যেমন কাপড় বা জামা ছিঁড়ে গেলে দাদাকে

গিয়ে সে বলতো। সব সময়েই ভয় থাকতো যদি তিনি বলতেন : না, এখন হবে না। তেমনি ভয়ে-ভয়ে, অপরাধীর মতো কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে তাকে ভিক্ষা চাইতে হবে। ইন্দ্রাণী হয়তো মুখের উপর না বলতো না, কিন্তু অনায়াসে বলতে পারতো : দাঁড়াও, সবুর করো আর দুটো দিন, মাসের শেষ, হাতে এখন টাকা কই ?

বিছানাটা বারান্দার রৌদ্রে টেনে নিয়ে যেতে-যেতে ইন্দ্রাণী বললে—সব কাজ যদি আমার উপর ছেড়ে দাও, আমি একা এতো দিক সামলাই কি করে ? হাত-পা গুটিয়ে যদি কেবল বসেই থাকবে, তবে তোমার জন্যে আলাদা একটা চাকর রাখো। ইন্দ্রাণী তার কাছে এসে দাঁড়ালো : কি বলো ? রাখবে একটা চাকর ?

দর্শন দাঁতে ব্রাশ্ ঢুকিয়ে ফেনা করতে-করতে বললে—তার আমি কি জানি। তোমার টাকা, তুমি কি ভাবে খরচ করবে তাতে আমার কি বলবার আছে ?

॥ ১৩ ॥

তবু যা হোক এতোদিন ইন্দ্রাণী দুবেলা রাঁধতো, প্রথমটায় এ ছাড়া উপায় ছিলো না। বলতো : দু'টি লোকের তো মোটে রান্না, কতোক্ষণ আর সময় লাগবে। তোমাদের কলকাতার বাড়িতে নিত্যি চলছে রাজসূয় যজ্ঞ, সকাল বেলা হেঁসেলে ঢুকলে বেরিয়ে আসতে সূর্যাস্ত—হাড়ে ঘুণ ধরে যায়। এখানে আমার রান্না প্রায় একটা কবিতা লেখার মতো মধুর।

তবু যা হোক এইখানে ছিলো ইন্দ্রাণীর সেবিকা, কল্যাণী মূর্তি, তার দুই হাতে সেবার সুষমা। কিন্তু সেই দিন সন্ধ্যা করে স্কুল থেকে ফিরে এসে ইন্দ্রাণী হঠাৎ অন্ধকারে হাত ছুঁড়তে লাগলো : মাগো এখন আবার উনুনের পাশে গিয়ে বসতে হবে ভাবলে গা জলে যায়।

কথাটা সত্যি, কিছুই এতে অভিমান করবার নেই। সারা দিন মেয়ে চরিয়ে এসে এখন যদি ফের তাকে হাঁড়ি ঠেলতে হয়, তা হলেই একেবারে সোনায় সোহাগা। বাড়ি ফিরে সে-ই তো এখন প্রত্যাশা করে কেউ তার জন্যে নরম করে বিছানা পেতে রেখেছে, তার ক্ষুধার্ত মুখের কাছে এনে ধরছে যা হোক কিছু জলখাবার। এক এক সময় ক্লান্তিতে এতো সে ভেঙে পড়ে যে আলনা থেকে আটপৌরে শাড়িটা পর্যন্ত হাত বাড়িয়ে টেনে নিতে ইচ্ছা করে না, কেউ বেশ আগে থেকেই চেয়ারের হাতলের উপর ভাঁজ করে গুছিয়ে রেখে দেয় তো কাপড় ছাড়তে তার একটুও আলস্য হয় না। তা না, গাড়িও চালাতে হবে তাকে, মোটও তাকেই বইতে হবে। কুলি আর মেকানিক, একাধারে তারই দুই মূর্তি। মাত্র খাদ্য

যুগিয়ে তার নিস্তার নেই, আবার তা নিজ হাতে করতে হবে পরিবেশন। স্কুলে সারাদিনের এই খাটা-খাটনির পর এখন আবার ঘর-দোর সাফ করো, সন্ধ্যা দাও, হাঁড়িতে জল চাপাও। সব তার একহাতে একলা করতে হবে, কারু কাছে কিছু প্রত্যাশা করা যাবে না। এক একদিন কোনো স্কুল-সংক্রান্ত কাজের ফিকিরে পড়ে ফিরতে তার হয়তো দেরি হয়ে যায়, যখন প্রায় সন্ধ্যার অন্ধকার এসেছে ঘনিয়ে। এসে দেখে এক ফোঁটা আলো নেই, অথচ বারান্দায় চেয়ার টেনে দর্শন দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে আকাশে তারার উদয় দেখছে। ইন্দ্রাণী না এলে নিজে যেন সে আর লণ্ঠনগুলি জ্বালিয়ে নিতে পারে না। ইন্দ্রাণীর উপর তার এক রতি মায়া নেই; থাকলে এর পরও নিজেকে আর সে অমনি অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন, নিরুচ্চারিত রাখতে পারতো না। ঝি একটা আছে বটে, কিন্তু বিকেলের কাজকর্ম সেরে সে সেই তার ঘরে চলে যায়, আসে ফের পর দিন ভোর বেলা। বিকেলের পর থেকে অনেক রকম ছোটোখাটো কাজ এখানে ওখানে উঁকি মারতে থাকে; দর্শন তা দেখে না, হাত গুটিয়ে বসে আছে তো বসেই আছে। কখন স্কুল থেকে ইন্দ্রাণী ফিরবে, কখন সে আবার বসবে তার সংসার নিয়ে। যেন তারই কেবল একলার সংসার, যতো দায়-দাবি যেন তারই। কেন বাপু, দর্শন তো ঠায় বেকার বসে আছে, এ-দিক ও-দিক দু একখানা কাজ সেরে রাখলে ক্ষতি কি! পুরুষ হয়ে সামান্য কতোগুলি কয়লা সে ভেঙে রাখতে পারে না, না, ঘর-দোর একটু সাফ করে রাখলেই তার জাত যায়? স্টোভটা ধরিয়ে বিকেলের চা-টাও তো অনায়াসে করে ফেলতে পারে —বাড়িতে পা দিয়েই যদি ইন্দ্রাণী এক পেয়ালা চা পায়, উঃ ভাবতেও কি রোমাঞ্চ হচ্ছে! তা না, সব এসে ইন্দ্রাণীকেই করতে হবে: উনুন ধরানো, বিকেলের জল-খাবার তৈরী করা, আরো কত কি টুকিটাকি, তার লেখাজোখা নেই। দর্শন কুটোটি কেটে দু'খান করবে না; কাজের ভাগ নেবে না, করবে কেবল আরামে কায়েমি ভোগ—এই বুঝি সহযোগিতা, তার ভালবাসা! গাড়ি টেনে এসে আবার এখন তাকে নাকে দড়ি নিয়ে সংসারের ঘানি ঘোরাতে হবে। কেন, কিসের জন্যে? নিজের বিছানাটাও পেতে রাখতে যার সম্মানে বাধে, কোথায় তার গেঞ্জি রুমাল যাকে প্রতি পদে খুঁজে দিতে হয়, তার নিষ্কর্মণ্যতার উপর ইন্দ্রাণীর আর শ্রদ্ধা নেই। দিবারাত্র পায়ের উপর পা তুলে বসে কেবল হাই তুলবে আর তুড়ি দেবে, আর নিজে সে অনবরত চরকির মতো ঘুরে মরবে কাজের আবর্তে—এ অসম্ভব। নিজে সে রোজগার করবে এতো পরিশ্রম করে, আবার তাকেই থাকতে হবে বঞ্চিত, এর মাঝে শ্রমের খুব বেশি মহত্ত্ব নেই। নিজে যখন সে রোজগার করছে, তখন অনর্থক আর সে কষ্ট স্বীকার করতে পারবে না।

শাড়ি-সেমিজ বদলে ইন্দ্রাণী দর্শনের কাছে এসে বসলো আরেকখানা চেয়ার টেনে। খোলা চুলের মধ্যে হালকা করে চিরুনি চালাতে-চালাতে বললে—এখন আবার গিয়ে উনুনের পাশে বসতে হবে ভাবলে গায়ে জ্বর আসে। বড়ো জোর, টেনে বুনে চা-দু-কাপ করা যায়, কিন্তু রান্না? আমার শরীরে আর দিচ্ছে না। একটা ঠাকুর রাখবো ভাবছি, কি বলো? দর্শন উদাসের মতো বললে—তোমার সুবিধে হলে রাখবে বৈকি, আমাকে জিগ্‌গেস করা বৃথা।

— ঠাকুর রাখাটা তুমি দরকারী মনে করো না?

—আমার মনে করায় না-করায় কি এসে যায়? তুমি দরকার বুঝলে রাখবে, তাতে কারুর তো কিছু বলবার থাকতে পারে না।

ইন্দ্রাণী গম্ভীর মুখ করে বললে—হ্যাঁ, ইস্কুলের খাটনির পর রান্না আর আমার পোষাবে না। অন্ন প্রস্তুত করার চাইতে আমার এখন অন্ন সংস্থান করার কাজ! আর শোনো, ঐ বিলাসিনী ঝিকে দিয়ে চলবে না, একটা হোল্‌-টাইম চাকর রাখবো ভাবছি। যতো লাগবে লাগুক, প্রতিমুহূর্তে জিনিসপত্রের পিছু আর আমি ধাওয়া করতে পারি না। দর্শনের মুখের উপর এক ঝলক তরল দৃষ্টি ফেলে ইন্দ্রাণী খুশির সুরে জিগ্‌গেস করলে : কি বলো, তাই ভালো হবে না?

চাপা ঠোঁটের কোণ দুটো বিদ্রূপে ঈষৎ তীক্ষ্ণ করে দর্শন বললে—ভালো-মন্দের আমি কি বুঝি? তোমার টাকা, যেমন ভাবে খুশি তুমি খরচ করবে, তাতে আমার কি বলবার আছে?

কথাটার ঝাঁজ ইন্দ্রাণীর রক্তে যেন আগুন ধরিয়ে দিলো! ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে ধারালো গলায় সে বললে—এর মাঝে তুমি কেবল খরচ দেখছ, প্রয়োজন দেখছ না? খেটে-খেটে আমি এমনি মরে যাই এই বুঝি তুমি চাও? কলকাতায় থাকতে মহাত্মার কতো মায়া উথলে উঠতো দেখতাম।

ঠোঁটের উপর নিরানন্দময় একটি হাসির রেখা টেনে দর্শন বললে—পাগল! তুমি মরে গেলে আমার চলবে কেন? আমি এমন কি একেবারে মন্দ কথা বললাম! তোমার সুবিধে বুঝলে যতোটা না কেন পাইক-পেয়াদা রাখো, আমি বলবার কে?

ইন্দ্রাণী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো : নিশ্চয়ই, রাখবোই তো। কিন্তু চাকর ঠাকুর তুমি খুঁজে আনতে পারবে?

ঠোঁট উল্‌টে দর্শন বললে—চেষ্টা করে দেখবো'খন।

—থাক, তোমাকে আর কষ্ট করে চেষ্টা করতে হবে না! দাঁতে ফিতে চেপে ধরে ইন্দ্রাণী বললে—আমিই পারবো, আমাদের ইস্কুলের বেয়ারাটাই যোগাড় করে দিতে পারবে।

—জানি। দর্শন ম্লান, পীড়িত মুখে বললে—আমি তোমাদের ইস্কুলের বেয়ারাটার চেয়েও অপদার্থ, একথা এতো স্পষ্ট করে ইঙ্গিত না করলেও পারতে। আমি জানি, আমি তা জানি ইন্দ্রাণী।

সেখান থেকে পিছলে ইন্দ্রাণী ঘরের মধ্যে চলে গেলো। কথাটার সে একটা প্রতিবাদ করে গেলো না, বরং যাবার সময় পিচ্ছল, ছিপছিপে শরীরে যে রেখা ফুটে উঠলো তাতে উচ্চারিত হলো যেন তার সম্মতির সঙ্কেত।

ইন্দ্রাণী ধীরে-ধীরে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এলো। তার এখন আলাদা রূপ, আরেক রকম চেহারা। শুধু ব্যবহারে নয়, চেহারায় পর্যন্ত এসেছে তার নতুন পরিবর্তন, এমনকি প্রসাধনের পারিপাট্যে। আগের মতো ঘোমটা ও আঁচল এলো রেখে সে শাড়ি পরে না, এখন চুলে-কাঁধে আনাচে-কানাচে বিদ্ধ হচ্ছে সব সেফ্‌টিপিনের ডাঁট। শরীরের সঙ্গে লেপ্‌টে শাড়িটা আজকাল কেমন সে যেন আঁট করে পরে, ঝুলটা অনেক উঁচুতে আসে উঠে, বালির উপর নদীর ছোটো-ছোটো ঢেউয়ের মতো শাড়ির পাড়টা পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে-জড়িয়ে আর খেলা করে না। পিঠের উপর খেলা করে না তার বেণী, এখন তা স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে খোঁপায় : লীলা রূপান্তরিত হয়েছে মন্থরতায়। পায়ে আর সেই হালকা লপেটা নেই, এখন খুর-তোলা ভারি জুতো। শাড়ির আঁচলে আর সেই আলস্য নেই, পায়ে নেই আর সেই গতির স্ফূর্তি। সোনার হালকা চশমাটিতে তার মুখখানিকে আগে কেমন টুকটুকে দেখাতো, সোনালি মেঘে মাখা সন্ধ্যার এক টুকরো আকাশ : এখন তার বদলে পরেছে সে গগল্‌স্‌, কালো মেঘে থমথম করছে যেন ঝড়। আর কমনীয়তা নয়, এখন গাম্ভীর্য, নির্লিপ্ত নিরবকাশ গাম্ভীর্য। সেই লঘু অনায়াস, সব সময়ে সেই আকস্মিক ক্ষিপ্রতার বদলে এখন প্রতি পদে তার হিসেব, প্রতি পদে তার আত্ম-কর্তৃত্বের গরিমা। তার শরীরে লাবণ্যস্রোতের ধার যেন ধীরে-ধীরে ক্ষয়ে যাচ্ছে, তার আভিজাত্য বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ধীরে-ধীরে রাশীভূত হয়ে উঠছে মাংসলতা। মরচে পড়ে-পড়ে তলোয়ার ভোঁতা হয়ে-হয়ে যেন একটা দা হয়ে উঠছে। গালের উপর পেশী উঠছে ফুলে, চিবুকে পড়ছে ভাঁজ, সেই বেদিবিলগ্নমধ্যা, কৃশ-কটি ইন্দ্রাণীর সেমিজে-পেটিকোটে আজকাল আধ গজ করে বেশি কাপড় লাগছে। তার মুখের সেই স্বতঃস্বচ্ছ, নির্মল, প্রসন্ন আভাটি কবে অস্ত গেছে, তার বদলে সেখানে এখন মাংসময় স্তব্ধতা। তার চোখের চঞ্চল কৌতূহল গেছে নিভে, এখন দৃষ্টিতে তার আত্মসচেতনতার কঠিন ঔজ্জ্বল্য। মুঠিভরা আর আলিঙ্গনের শিথিলতা নয়, আলিঙ্গনকে প্রত্যাহার করবার কঠোরতা। ইন্দ্রাণীর এখন আলাদা রূপ, আর এক রকম চেহারা। প্রতি নিশ্বাসে সে আত্ম-উদ্বুদ্ধ, প্রতি পা ফেলায় সে আত্মপ্রতিষ্ঠিত।

সে এখন বুঝেছে তার নিজের মূল্য, জেনেছে তার অপার প্রয়োজনীয়তা—তার গরিমার তাই শেষ নেই। জীবন নিয়ে তুচ্ছ রঙিন বিলাসিতায় মত্ত হবার তার সময় কোথায়, তাকে অর্জন করতে হচ্ছে স্থূল, দিনানুদৈনিক জীবিকা—সে নিরুপায়, বিলাসের চেয়ে কর্তব্য তার এখন বড়ো লক্ষ্য : ইন্দ্রাণীর মুখে চোখে, কথায় স্তব্ধতায় কেবল এই তেজস্বী অহঙ্কার। কে জানে এই তার একটা ব্যসন কিনা—এই তার আত্মমূল্যবোধ! সে আর ইন্দ্রাণী নয়, সে একটা মাস্টারনী।

দর্শন যেন তাকে আর ঠিক চেনে না, ইন্দ্রাণীর দিকে চোখ ভরে তাকাতে তার ভয় করে। তুমি আশা করতে পারো না এই মেয়ে তোমার জন্যে থালা ভরে ভাত বাড়বে, ফুল-তোলা বালিশের ওয়াড়ে মেখে রাখবে ঘুমের কোমলতা, যতোক্ষণ তুমি না খাচ্ছ ততোক্ষণ মুখে এক ফোঁটা জল তুলবে না। কি করে বা তা তুমি প্রত্যাশা করতে পারো, স্বার্থপর, নিষ্কর্মা, মূর্খ কোথাকার? বাড়িতে উনুনের আঁচে ইন্দ্রাণীর চোখ খারাপ হচ্ছিলো, এখন কিনা নিজ হাতে তাকে ঠেলে আনতে চাও সেই কয়লার ধোঁয়ায়। তার সাড়ে-দশটায় যখন স্কুল করতে হয়, তখন কি করে তুমি আবদার করতে পারো যে তোমার জন্যে ভাতের থালা নিয়ে সে বসে থাকবে! তারপর কিনা ঘুমের কোমলতা! সামান্য উদরের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে যার উপর নির্ভর করতে হচ্ছে, তার দেহের দুয়ারে গিয়ে আবার হাত পাততে লজ্জা করা উচিত। ইন্দ্রাণীকে সাহায্য করা দূরে থাক, সে শুধু বিস্তার করতে চায় তার বাধা, সঙ্কীর্ণ করে আনতে চায় তার পরিধি। ছি-ছি, তার চেয়ে সে আত্মহত্যা করে না কেন?

ইন্দ্রাণী এখন নাকে-মুখে পথ পাচ্ছে না, সে এখন বসবে কিনা দর্শনের সেবাদাসীত্ব করতে! ঢের ভালোবাসা হয়েছে, এখন দেওয়া যাক তার একটা জাজ্বল্যমান প্রমাণ—দর্শনের জন্যে এই তার জীবিকা-সংগ্রহের সংগ্রাম, এই তার চাকরি। কিন্তু দর্শনের মনে হয়, ইন্দ্রাণী কেবল নিজেকেই ভালোবাসে, ভালোবাসে নিজের বলশালী ব্যক্তিত্বকে, ভালোবাসে নিজের স্বাধীন স্বাতন্ত্র্য। এরই জন্যে নিজের বিস্তৃততর প্রসার ও উজ্জ্বলতর প্রকাশ পাবার জন্যেই সে বাধার পর বাধা এসেছে পেরিয়ে, এক তরঙ্গ-চূড়া থেকে বিস্ফারিত হয়ে পড়েছে চেতনার আর এক উর্মি-উচ্ছ্বাসে। সে যেন পৃথিবীতে এতোদিনে পেয়েছে তার অপরিমিত স্থান, তার গভীরতর পরিচয়। গিরিগুহার প্রচ্ছন্ন অন্ধকার থেকে তার এই বেগোচ্ছল নির্বাধ নির্ঝর-যাত্রা। কে এখন গৃহকোণে উনুনের পাশে বেড়ালের মতো জবুথবু হয়ে ঘুমিয়ে থাকবে? শুধু টিচারি নয়, ইন্দ্রাণী এখানে মেয়েদের মধ্যে স্থাপন করেছে তাদের কলকাতার 'যুগনারী সমিতি'র

একটা শাখা : বাড়ি বাড়ি গিয়ে করছে তার সভ্য, কুড়োচ্ছে তার চাঁদা, গলা ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে চোখা-চোখা লম্বা বক্তৃতা। কাজ দিয়ে মুহূর্তগুলি তার ঠাসা, সপ্তাহে একটা করে রবিবার, সেদিন সে সারাদিন ঘুরে-ঘুরে গানের টিউশনি করে। আড়মোড়া ভেঙে তার একটা হাই তোলবারও সময় নেই। সারা দিন-রাত্রে তার আশে-পাশে কোথাও নেই দর্শনের এক ইঞ্চি জায়গা। দিনে যদি বা তার কাজ, রাত্রে তার ক্লান্তি : দিনে যদি বা তার কাজের আনন্দ, রাত্রে তার এই ক্লান্তির আরাম।

আগে-আগে এখানে এসেও, ইন্দ্রাণী যা করতো দর্শনের মত নিয়ে করতো। যেখানে যেতো, থাকতো সেখানে অন্তত দর্শনের একটা মৌখিক অনুমতি। বাধা দিলে অবিশ্যি কোনো ফল হতো না, তেমনি বাধা দেবার দরকারও থাকতো না কোনো। 'অমুক জায়গায় যাচ্ছি'—ব্যস, মুখে এইটুকু বলে গেলেই যথেষ্ট। এখন যেন সেইটুকু সৌজন্যও আর সমীচীন নয়। যখন খুশি, যেখানে খুশি, ইন্দ্রাণী বেরিয়ে যায় ; ফিরে এসে ইচ্ছে হলে বলে, ইচ্ছে হলে বা বলে না সে কোথায় গেছলো। দর্শনেরও আর তা শোনবার কৌতুহল নেই। ইন্দ্রাণীকে ফিরে আসতে দেখে নিজেই সে এখন ঘরে উঠে যায়। ইন্দ্রাণীর এখন অনেক কাজ, অবাধ স্বাধীনতা। নিজের প্রকাশের প্রাচুর্যে সে দর্শনকে পর্যন্ত অতিক্রম করে গেছে। হাত বাড়িয়ে আর তার নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। দর্শনের মাঝে, মাঝে সন্দেহ হয়, একেই কি সে একদিন এতো ভালোবেসেছিলো এই একেই ? হয়তো বা ইন্দ্রাণীর মনেও এই সন্দেহ আসছে, এই দর্শনকেই কি সে দিতে চেয়েছিলো তার প্রেম, তার দেহের নৈবেদ্য—এই পরাঙ্মুখ, নিরুত্তাপ, নিলজ্জ দর্শনকে ? কিন্তু, চোখ খুলে দেখতে গেলে, ইন্দ্রাণীর বিরুদ্ধে কিছুই অভিযোগ তার করবার নেই, না, যা সে করছে, শুধু দর্শনের জন্যে, শুধু দর্শনের অক্ষমতার ক্ষতিপূরণ করতে। ভাগ্যিস যে ইন্দ্রাণীকে বিয়ে করেছিলো।

কো-অপারেটিভ সোসাইটি থেকে কারা এসেছে মেয়েদের মধ্যে ম্যাজিক লণ্ঠনে বক্তৃতা দিতে—ইন্দ্রাণী যখন রাত করে ফিরে এলো, দর্শন তখন খেতে বসেছে। ইন্দ্রাণীকে দেখেই মুখের গ্রাসটা থালার একপাশে থুতিয়ে ফেলতে ফেলতে দর্শন বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলো : ছোঃ ! এ কখনো মানুষে খেতে পারে ? ছাইপাঁশ এ কি রেঁধেছ, ঠাকুর ?

কোনোদিন কিছু হয় না, আজ হঠাৎ কি গোলমাল হলো—ঠাকুর মুখখানি বেচারা করে বললে—কি হলো, বাবু ? তরকারিতে বেশি নুন পড়ে গেছে ?

—তরকারিতে? কোনটা তুমি রাঁধতে পারো শুনি? এসব খোট্টাই উজবুকের হাতে ভদ্রলোক খেতে পারে? তরকারির বাটিটা সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে দর্শন মুখ খিঁচিয়ে উঠলো: এ কি তরকারি কোটা হয়েছে, না, গরুর জাব্‌না? যেমন জুটেছেন হনুমান, তেমনি আবার তাঁর জাম্বুবান।

ইন্দ্রাণী রান্নাঘরের বারান্দায় উঠে এলো। ভারিক্কি চালে বললে—এতো চেঁচামেচি শুরু করলে কেন?

—যাও, যাও, তুমি রান্নাঘরে আসছ কি, তোমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে যে! দর্শন এক পশলা বিদ্রূপ বৃষ্টি করে উঠে পড়লো: এসব নিয়ে তোমার মাথা ঘামানো সাজে? তুমি গিয়ে বিশ্রাম নাও, এসব রান্নাবান্না তুমি দেখবে কি? দর্শন ঠাট্টায় হঠাৎ জিভ কাটলো: ছি!

ইন্দ্রাণী দর্শনের দিকে এক মুহূর্ত স্থির, কঠোর চোখে চেয়ে রইলো; গম্ভীর গলায় বললে—নিশ্চয়, রান্নাবান্না আর আমাকে সাজে না বলেই তো মাইনে দিয়ে ঠাকুর রেখে দিয়েছি। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে সে একটা দৃপ্ত ভঙ্গি আনলো। ঠাকুরের কাছে এক পা এগিয়ে এসে জিগ্‌গেস করলে: কি হয়েছে, ঠাকুর?

অভিযোগটা ইন্দ্রাণী ঠাকুরের মুখের থেকেই শুনবে, কেননা সে তার মাইনে-করা চাকর—ইন্দ্রাণীর প্রশ্নের ভঙ্গিমায় যেন সেই স্পর্ধা।

ঠাকুর চোখ নামিয়ে বললে—আমার রান্না বাবুর পছন্দ হয় না।

—পছন্দ হয় না, ইন্দ্রাণী আপন মনে গজগজ করতে-করতে ফিরে গেলো: নিজে রান্না করলেই হয় তবে। মেয়েদের থেকে বাবুর্চিরা তো ভালোই রাঁধে, কতোই তো বড়ফট্টাই শুনতাম আগে, নিজে রান্না করে একবার দেখালেই হয়। কিছু কাজকর্ম তো আর করতে দেখি না, ফাইন আর্ট হিসেবে রান্নাটা অন্তত শিখলে মাস-মাস এতোগুলি অপব্যয় হয় না।

দর্শনের যে একদম খাওয়া হলো না, তাতে ইন্দ্রাণীর এক ফোঁটা অনুশোচনা নেই। নিজের ঘরে চলে এসে কাপড়-ছাড়তেও ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সে এই কথারই পুনরাবৃত্তি করে চলেছে: মন্দ কি, এই ভাবে আমাকে সাহায্য করতে পারলে বুঝতাম একটা যা হোক কাজের মতো কাজ করলো। উনি চাকরি করলে আমি বসতাম না হাঁড়ি-কুঁড়ি নিয়ে? উল্টো বিধানটাই বা চলবে না কেন? গলদঘর্ম হয়ে এতো খেটে এসে আবার আমি হেঁসেল করতে যাই, আর উনি নবাবপুত্তুরের মতো গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ান।

পাশের ঘরে দর্শনের উপস্থিতিকে ইন্দ্রাণী খুব অল্পই গ্রাহ্য করছে: এদিকে কর্মের গোঁসাই, তার আবার পছন্দের বহর দেখ না। তবু যদি বুঝতাম—

কথাটা শেষ না করেই সে রান্নাঘরের বারান্দা থেকে হাঁক দিলো : ঠাকুর ভাত দাও শীগ্‌গীর, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।

আসনের উপর সে আঁট হয়ে বসলো, চাকর দিয়ে গেলো গ্লাশে করে জল ভরে। তারই পাশে যে একথালা অভুক্ত ভাত পড়ে আছে, একখানা শূন্য পরিত্যক্ত আসন, তাতে তার দৃক্‌পাত নেই। আর কেউ উপবাস করে আছে বলে সে নিজের ক্ষুধা মেটাবে না—এই দুর্বল অস্বাস্থ্য ইন্দ্রাণীর নয়।

॥ ১৪ ॥

গানের টিউশনিগুলিতে যোগ দিয়ে ইন্দ্রাণীর এখন, তাদের দুজনের দিক থেকে বলতে গেলে, অনেক পয়সা। হিসেবের ফর্দটা সে নিজ হাতেই ছকে দেয়, ক্যাশ-বাক্সের চাবিটাও রাখে সে নিজের হেফাজতে। নিজের নামে হাজার দুয়েক টাকার সে একটা লাইফ-ইন্‌সিয়োর পর্যন্ত করেছে। নিজের নামে—আর কারু চেয়ে তার জীবনের দাম কিছু কম নয়।

যে ব্যায়াম করবে তার যেমন চাই পরিপুষ্টিকর খাদ্য, তেমনি যে অর্থোপার্জন করবে তার চাই অর্থব্যয়ের সুবিস্তীর্ণ সুবিধে। সেদিক থেকে ইন্দ্রাণী প্রায় উচ্ছৃঙ্খল। এতোটুকু শারীরিক অপরিচ্ছন্নতা বা সাংসারিক অসামঞ্জস্য সে সহ্য করতে পারে না—এখন, অর্থাৎ যখন সে নিতান্ত টাকা রোজগার করতে পারছে। এখনো যদি তাকে কষ্ট করতে হয়, তবে কষ্ট করে সে আর চাকরি না করলেই তো পারে। এই তো তার সময়, সূর্য থাকতে-থাকতে ধান কাটবার দিন। না, এই সূর্যকে ইন্দ্রাণী অস্ত যেতে দেবে না।

ইন্দ্রাণীর এখন দুসেট্ ধোপা—কে একজন কখন দেরি করে বসে তার ঠিক কি! সব সময়েই বাইরের জন্যে যাকে ফিট্‌ফাট থাকতে হয়, তার চাই বস্তায়-বস্তায় শাড়ি-ব্লাউজ, একদিনের সাজ ফের পরের দিনে টেনে আনা, ঠিক একই বাক্যে একই শব্দ পর-পর ব্যবহার করার মতো লজ্জাকর। দিনান্তর তার শাড়ির রঙ ও ব্লাউজের কাট্ বদলাতে হয়। নিচের ক্লাসে গগল্‌স্, উপরের ক্লাসে প্যাঁস্‌নে : তার জুতোরও চাই অনেকগুলি প্যাটার্ন। এক একদিন এক একরকমের ভ্যানিটি ব্যাগ। শুধু বাইরের জন্যেই নয়, ঘরেও তার উপকরণের পাহাড় জমে উঠেছে। লণ্ঠনের বদলে পেট্রোম্যাক্স, তক্তপোশের বদলে পালঙ্ক, চার পায়ার উপর দাঁড়-করানো কেরোসিনের তক্তার বদলে সবুজ বনাতে মোড়া সেক্রেটারিয়েট টেবিল। এটা-ওটা প্রসাধনের সরঞ্জামে প্রায় একটা হাট বসানো হয়েছে। সামান্য পাপোশ থেকে শুরু

করে নেটের মশারি পর্যন্ত সব তার নতুন, কাঁচের আলমারিতে ঝক্‌ঝক্ করছে চীনে মাটির বাসন, শ্বেতপাথরের হিজিবিজি। সেল্‌ফ-এ ভরা ঝকঝকে বই – ব্লু-রিবন-বুক্‌সের লম্বা ডলার-সিরিজ্‌টা, খ্যাত-অখ্যাত যা যখন তার মনে ধরে। রাখতে হয় তাকে মোটা দেখে গোটা দুই বাংলা মাসিক পত্রিকা : তার বাড়িতে অমুক কাগজ আসে, পাড়া-পড়শীদের কাছে তাতে বেড়ে যায় বিদ্যার ততো না হোক, অর্থের মর্যাদা। পত্রিকা শুধু রাখলেই চলবে না ; ছ'মাস পুরলেই আবার তা বাঁধিয়ে রাখতে হবে সোনার জলে তার নাম খোদাই করে। এমনি তাদের উপর তার যত্ন। আগে-আগে খরচের তালিকাটা ইন্দ্রাণী দর্শনকে দিয়ে চেক্ করিয়ে নিতো, কিন্তু তাতে ব্যয়-নির্বাহপর্বটা সুসম্পন্ন হতো না, তালিকাটা সঙ্কীর্ণ করবার জন্যে দর্শন তাতে নিক্ষেপ করে বসতো ইন্দ্রাণীর কাছে যা মনে হতো, তার বর্বর কৃপণতা। অর্জনে যে উদার নয়, ব্যয়ে সে বদান্য হবে কি করে ? তাই দর্শনকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার তার প্রয়োজন নেই। তার নিজের কিছু অসুবিধে হচ্ছে এ কথা সে মুখ ফুটে বলুক দেখি না একবার। তা যখন হচ্ছে না, তখন আগে সে মাথা না ঘামালেও কিছু ক্ষতি হবে না। কতো রোজগেরে স্বামী কতো দিকে যে টাকা উড়োয় তাতে পতিপ্রাণারা কি বলতে আসে ! ইন্দ্রাণীর বেলায় দর্শনের এ-প্রভুত্ব না খাটালেও চলবে—সংসার চলবে স্বচ্ছন্দেই। টাকার উপর মায়া দেখানোরও একটা সীমা আছে—তা যখন আবার নিজের টাকা নয়। না, দর্শন কিছু বিশেষ আর বলতে আসে না, সে নিজের আলস্য নিয়েই মশ্‌গুল। শুধু ইন্দ্রাণী যে নাম শুনেই যা-তা গুচ্ছের কতোগুলি বই আনায় কলকাতার দোকান থেকে, তার জন্যেই তার দুঃখ হয়, আলস্যবিনোদনের জন্যে এক পৃষ্ঠাও সেগুলোর উল্‌টোনো যায় না বলে গা জ্বালা করে।

মাসের মাইনে পেতেই ইন্দ্রাণী দর্শনের কাছে গিয়ে হাসিমুখে জিগ্‌গেস করলে : এ মাসে তোমার কি লাগবে বলো ?

দর্শন কোলের বইয়ের উপর চোখ নামিয়ে বললে—কিছু না।

—কিছু না ? সে কি কথা ? দর্শনের প্রসাধনের ছোটো টিপয়টা ঘাঁটতে ঘাঁটতে ইন্দ্রাণী বললে—অন্তত এক প্যাকেট ব্লেড্, কেক-দুই সাবান ?

বইয়ের অক্ষরে চোখ ডুবিয়ে রেখে দর্শন বললে—দরকার নেই। দাড়ি রাখি কি কামাই কিছুই এখানে যায় আসে না।

—খুব যায় আসে। ইন্দ্রাণী অনেকদিন পর খিল-খিল করে হেসে উঠলো—এক সঙ্গে তার হাতের উপর ঝুপ করে অনেকগুলি যখন টাকা পড়ে তখন তার মেজাজে থাকে এমনি স্বচ্ছন্দ লঘুতা : ডারউইনের থিওরির কনট্র্যারিটা তাই

বলে তুমি সপ্রমাণ করো না। যা লাগলে না-লাগবে কিনে-কেটে আনো গে—দশ টাকার বেশি এ মাসে হাত খরচ পাবে না। নানান দিকে এবার আমার অনেক খরচ।

নোটটা টেবিলের উপর চাপা দিয়ে রেখে ইন্দ্রাণী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। প্রথমটা দর্শন তার চোখের সামনে দেয়ালটা যেন কেমন ঝাঁপসা দেখতে লাগলো, কিন্তু খরচ করুক বা না করুক, নোটটা সে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে পারলো না। এখন না হয় একটু, হ্যাঁ, একটু অপমান লাগছে, কিন্তু তার চেয়েও তীব্রতর হবে অভাবের তাড়না, যখন হাতে থাকবে না সিগারেট কিনবার পয়সা। দশ-দশটা টাকা, অভিমান করে বাইরে অমন ফেলে রাখাটা নিরাপদ নয়। আসছে মাসের পয়লা তারিখের আগে ইন্দ্রাণী যখন আর এ ঘরমুখো হচ্ছে না, তখন নোটটা টেবিলের উপর পড়ে রইলো, না, দর্শনের মনিব্যাগের মধ্যে—তাতে তো তার সমান দুশ্চিন্তা!

ইন্দ্রাণীর এ মাসে যে কি অনেকটা খরচ তা পরদিনই বোঝা গেলো।

স্কুল থেকে ফিরে এসে দর্শনকে সে জিগ্‌গেস করলে: কাল তুমি একটিবার স্টেশনে যেতে পারবে?

—কেন?

—গুড্‌সএ একটা মাল এসেছে—সেটা ছাড়িয়ে নিয়ে আসবে।

—কি মাল? দর্শন সামান্য কৌতূহল প্রকাশ করলো।

—একটা ড্রেসিং-টেবিল।

—ড্রেসিং-টেবিল? দর্শন তো অবাক।

—হ্যাঁ, ড্রেসিং-টেবিল।

—ড্রেসিং-টেবিল দিয়ে কি হবে?

—ড্রেসিং-টেবিল দিয়ে যা হয়। ইন্দ্রাণী বিরক্ত মুখে বললে—অতো কথা বলবার তোমার কি দরকার, দয়া করে মালটা ছাড়িয়ে আনতে পারবে কি না তাই বলো।

ঢোক গিলে দর্শন জিগ্‌গেস করলে: কিন্তু, এইখানে এই ড্রেসিং-টেবিলের মর্যাদা তোমার কে বুঝবে?

—পরকে দেখাবার জন্যেই মানুষ জিনিস কেনে নাকি? ইন্দ্রাণী ঠোঁট বাঁকালো।

—তা ছাড়া আবার কি! কথাটাকে দর্শন অবিশেষ, ব্যক্তিবিরহিত করে তুললো: মানুষের টাকা যতোক্ষণ ব্যাঙ্কে, ততোক্ষণ তা সে গোপন করে রাখতে

চায়, সেটা তার সযত্নসমৃদ্ধ আত্মম্ভরিতা : আর যখনই সেই টাকার মূল্যে কিছু সে কিনতে ও অধিকার করতে চায়, তখন তার মাঝে যা সে ঘোষণা করে তা তার নিজের নির্লজ্জ দম্ভ ছাড়া আর কিছু নয়। অন্যের চোখ যাতে না টাটালো তেমন জিনিসের প্রতি মানুষের লোভ নেই। পরকে যদি না সামান্য ঈর্ষান্বিত করে তুলতে পারি, তবে বিলাসিতা করে সুখ কি!

—থাক, তোমার এই ছেঁদো বক্তৃতা আমি শুনতে চাই্না। ইন্দ্রাণী চোখ বড়ো করে বললে—আর কারুর জন্যে আমার মাথাব্যথা নেই, আমার অহঙ্কার তৃপ্ত হলেই আমি খুশি। যা পরের কাছে মাত্র বিলাসিতা, তা-ই হয়তো আমার কাছে পরম প্রয়োজন।

দর্শন গেলো মিইয়ে, মুখের স্নায়ুগুলি নিস্তেজ হয়ে এলো। দুর্বল গলায় বললে—কিন্তু কতো পড়লো ওটা তোমায় আনতে শুনতে পাই?

—বেশি নয়। সবসুদ্ধ্ টাকা ষাটেক।

—ষাট টাকা! দর্শন না বলে পারলো না: এই দুর্দিনে তুমি এতোগুলি টাকা খরচ করে ফেললে?

ইন্দ্রাণী জলের মতো তরল গলায় বললে—অনায়াসে। একজনের সুদিন না হলে আর একজনের দুর্দিন হয় কি করে? ও কথাটারও একটা মাত্র আপেক্ষিক অর্থ, ওতে কোনো সত্য নেই।

—কিন্তু এতো জিনিসের পাহাড় তুমি রাখবে কোথায়?

—কেন, এই বাড়িতেই। চাকরিতে যখন কনফার্মড্ হলাম, তখন এখানেই তো শেকড় মেলে মৌরসি করে বসতে হবে।

—হুঁ! দর্শন তার বাঁ হাতের নখগুলি তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বললে—কিন্তু ঐ টাকায় কি আরো কোনো সদ্ব্যয় হতো না?

ইন্দ্রাণী শরীরে একটা অবিচল দৃঢ়তার ভঙ্গি এনে বললে—প্রত্যেক টাকাতেই অপেক্ষাকৃত সদ্ব্যয় হবার সম্ভাবনা আছে। যে টাকা দিয়ে তুমি একখানা কবিতার বই কিনলে, সেই টাকায় হয়তো কোনো পরিবারের এক সপ্তাহের বাজার খরচ হয়। তাজমহল তৈরি করতে যে টাকাটা অপব্যয় করা হলো তা দিয়ে তখনকার ভারতবর্ষের নাকি অনেক দুর্গতিমোচন হতে পারতো এমন অভিযোগও কেউ-কেউ করে শুনি। ইন্দ্রাণী হাসলো: সাজাহানের কাছে যা তাজমহল, আমার কাছে হয়তো তাই একটা সামান্য ড্রেসিংটেবিল।

দর্শন রুক্ষকণ্ঠে বললে—কিন্তু তাজমহলের দিনে ভারতবর্ষের যদি ইতিহাস পড়ো, দেখতে পাবে সাজাহানের প্রজাদের মধ্যে এই রাক্ষসী দরিদ্রতা ছিলো না।

তুমি তো অনায়াসে ষাটটা টাকা উড়িয়ে দিলে কিন্তু কলকাতায় মেজদার ছেলে টুটির আজ সতেরো দিন ধরে টাইফয়েড্—মেজবৌদি কেঁদে-ককিয়ে তোমাকে একটা চিঠি লিখলো পর্যন্ত—আর তুমি—

ইন্দ্রাণীর কথা তার মুখের উপর যেন ছিট্‌কে পড়লো : চুপ করো। আমিও মহারাণীর মতো প্রজাপালন করছি। প্রজার দুঃখ দূর না করে নিজের সমৃদ্ধি একা ভোগ করছি না।

দর্শন তার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো : কি, কি করেছ তুমি?

—বিশেষ কিছু অনিষ্ট করিনি। তোমার মেজবৌদির নামে পঁচিশটা টাকা মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দিয়েছি মাত্র, ছেলে টুটিকে যেন ফল কিনে দেন, এটা-ওটা খরচের যাতে তাঁর একটু-আধটু সুবিধে হয়।

—কেন, কেন তুমি তাঁদের টাকা পাঠাতে গেলে? দর্শন চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো।

দর্শনের এই অস্বাভাবিক উত্তেজনায় ইন্দ্রাণী হঠাৎ ভেব্‌ড়ে গেল। পাংশু মুখে, ম্লান গলায় সে জিগ্‌গেস করলে : কেন, কি অপরাধ হয়েছে?

—অপরাধ, একশো বার অপরাধ হয়েছে। দর্শন বিষে একেবারে ঝাঁজিয়ে উঠলো : তাঁদের এই অপমান করবার তোমার কি অধিকার ছিলো। তুমি তাঁদের কে যে দেমাক করে তাঁদের টাকা পাঠাতে চাও?

ইন্দ্রাণী মুখ গম্ভীর করে বললে—কাউকে অপমান করতে কোনো অধিকারের কথা ওঠে না। আমার ইচ্ছা হয়েছে তাঁদের টাকা পাঠিয়েছি, আমার ইচ্ছা হয়েছে আমি ড্রেসিং-টেবিল কিনবো।

—তোমার ইচ্ছা নিয়ে তুমি থাকো, কিন্তু একজনকে বিপন্ন, অসহায় দেখে তার দুর্বলতার সুযোগ পেয়ে তুমি তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করবে, এ কিছুতেই হতে পারে না। তুমি তাদের কে, তোমার টাকা তারা কেন নিতে আসবে?

ইন্দ্রাণী বললে—কেন, আমার টাকা কি তোমার টাকা নয়? তোমার থেকে নিতে পারলে, আমার থেকেই বা কেন নিতে পারবে না?

—কথ্‌খনো নয়। তুমি আমাকে অপমান করতে হয় করো, কিন্তু, দর্শনের গলা প্রায় ধরে এলে : আমাকে ঘিরে আমার সমস্ত পরিবারকে তুমি এইভাবে অপমান করতে পারবে না। তুমি তাদের কেউ নও।

ইন্দ্রাণী ঝর্‌ঝর্ করে হেসে ফেললো। বললে—মেজদির ছেলে টুটির হয়ে আমার বলতে ইচ্ছে করছে : 'হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে।' তোমার আমি কেউ না হতে পারি, কিন্তু আমি তাদের কাকিমা, সম্পর্কে মেজদির ছোট বোন।

তোমার মতো তাদের সম্মানজ্ঞান অতো টন্‌টনে নয়। বলে শরীরে একটা গতির ঝাপটা তুলে ইন্দ্রাণী চলে গেলো।

পরমুহূর্তেই আবার সে এলো ভিতরে, বললে এই দেখ মনিঅর্ডারের রসিদ। এই দেখ মা লিখেছেন পোস্টকার্ড—চাকরি করে নিয়মমতো মাস-মাস টাকা পাঠিয়ে তাঁর পর্যন্ত আশীর্বাদ যোগাড় করে ফেলেছি। টাকার কি মহিমা!

দর্শন বললে—মা চিঠি লিখেছেন, কই, আমাকে বলোনি তো?

—টাকা পাঠিয়ে তাঁর পর্যন্ত আশীর্বাদ পেয়ে গেছি, এখবর পেয়ে তুমি যদি মনে করো তাঁকে আমি অপমান করলাম?

—কবে চিঠি এলো?

—আজ। কি করবো বলো, আমার নামে বা কেয়ারে সব চিঠিই স্কুলের ঠিকানায় দিয়ে যায়, তাই চিঠিগুলি আমার হাতেই আগে পড়ে। নাও, পড়ে দেখ চিঠিখানা।

মুখ ভার করে দর্শন বলল—তোমার চিঠি আমি পড়তে যাবো কেন?

—বা, মা লিখেছেন যে। তোমার কথা আছে শেষের দিকে। এই যে—ইন্দ্রাণী পড়তে লাগলো: দর্শন কেমন আছে, কোনো কাজকর্মের সুবিধা করিতে পারিল কিনা জানাইও।

দর্শন মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে—থাক।

ইন্দ্রাণী হেসে বললে—আমি আজই জবাব দিয়ে দিলাম। লিখলাম: এইখানে আসিয়া উহার চমৎকার স্বাস্থ্য ফিরিয়াছে, কাজকর্মের আর কোনো দরকার আছে বলিয়া মনে করেন না। ইন্দ্রাণী আবার শব্দ করে হেসে উঠলো: তা তো হলো কিন্তু স্টেশন থেকে আমার টেবিলটা কখন এনে দিচ্ছ?

সেল্‌ফ্ থেকে একটা বই পেড়ে তার পাতা উল্‌টোতে-উল্‌টোতে দর্শন বললে—আমার দ্বারা কিছু হবে না।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। একবারটি স্টেশনে গিয়ে খোঁজ নেবে, তাতে তোমার পায়ে ফোস্কা পড়বে নাকি? এটুকু কাজও যদি না করে দিতে পারো, তবে আছ কি করতে? ইন্দ্রাণী প্রায় মুখিয়ে উঠলো।

দর্শন একেবারে চুপ। অনবরত বইয়ের পৃষ্ঠা ঘেঁটে কি সে খুঁজছে কে জানে।

ইন্দ্রাণী আর এক পশলা বিদ্রূপ বর্ষণ করলে: তোমাকে তো কাঁধে করে আর বয়ে আনতে হবে না, না হয় একটা গাড়ি ডাকিয়েই দিচ্ছি বাবুজিকে। মাগো, একটুও হাত-পা না নড়িয়ে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে লোকে যে কি করে একটানা মোটা হতে পারে ভাবতেই পারি না।

দরজার কাছে এসে ইন্দ্রাণী আর একবার পিছন ফিরলো : ভেবো না, তুমি না এনে দিলে জিনিসটা আমার মাঠে মারা যাবে। আমার টাকা, আমার জিনিস, আমিই আনিয়ে নিতে পারবো। বলে গলা ছেড়ে সে চাকরের উদ্দেশে হাঁক দিলো : মদন ! মদন !

কাপড়ে ভিজে হাত মুছতে-মুছতে চাকর এসে হাজির। ইন্দ্রাণী হুকুম করলে : যা তো এখুনি, স্কুলের কেরানিবাবুকে গিয়ে বল আমি একবার তাঁকে ডাকছি। চিনিস তো তাঁর বাড়ি ?

নিতান্ত আপ্যায়িত হবার ভঙ্গিতে ঘাড় হেলিয়ে চাকর প্রস্থান করল। ইন্দ্রাণীও আর দাঁড়াল না।

ঘরে আবার পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলো আলস্যের মেঘ। দর্শন ইজিচেয়ারে ভেঙে পড়লো। পৃথিবীতে কি যে তার করবার আছে এমন কোনো কাজ সে খুঁজে পেলো না।

এখানে এসে অবধি মা'র সে একখানাও চিঠি পায়নি, অথচ বাড়ি ছেড়ে চলে আসবার মুহূর্তে যে ইন্দ্রাণীকে তিনি মনে-মনে অভিশাপ দিয়েছিলেন তারই প্রতি এখন কিনা তাঁর মমতার সমুদ্র উথলে উঠেছে। তারই সঙ্গে তাঁর এখন যতো সম্পর্ক, যতো আত্মীয়তা। সত্যি, টাকায় কি না হয়, এমন যে মাতৃস্নেহ, তাও পর্যন্ত একটা পণ্য হয়ে ওঠে। প্রেম যায় টাকা দিয়েই কেনা, তাকে রাখা যায় টাকা দিয়েই টিকিয়ে। তার অতিরিক্ত কোনো মূল্য নেই—কথাটা কতো পুরোনো, কিন্তু এমন মর্মান্তিক নতুন করে দর্শন তা কোনোদিন বুঝবে বলে বিশ্বাস করেনি। ইন্দ্রাণীর যে-টাকাটা সকলের চোখে নিতান্ত অশুচি, নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন ছিলো, নিতান্ত টাকা বলেই তার আজ এতো সম্মান, এতো অভ্যর্থনা। সংসার দিব্যি দু হাত পেতে তাই আজ অকাতরে গ্রহণ করছে। টাকাই টাকার মূল্য। তার কাছে সাজে না কোনো অভিমান, থাকে না কোনো রুচিবিরোধ। টাকাটা যে ইন্দ্রাণীর, তাতে আজ আর কিছু এসে যায় না—টাকা টাকাই। টাকার জোরেই ইন্দ্রাণীর আজ এতো রূপ, এতো চরিত্রমর্যাদা ; টাকা দিয়েই কিনে নিয়েছে সে সবার সঙ্গে সখ্য, অচ্ছেদ্য সৌহার্দ্য : টাকা দিয়েই ফিরে পেয়েছে সে সংসারে নতুন জায়গা, সে জায়গা সকলের হৃদয়ে। মনে করে মাস-মাস ঠিকমতো টাকা পাঠায় বলেই সে আজ সবার কাছে 'এমন মেয়ে আর হতে নেই,' 'যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী,' 'কি চমৎকার কর্তব্যবুদ্ধি'—আরো কতো কি এমনিধারা। বড়বৌদির মেয়েদের কাছে যে-'ধিঙ্গি' ইন্দ্রাণী একদিন অসচ্চরিত্রতার মূর্তিমতী দৃষ্টান্ত ছিলো, টাকার জোরেই হয়তো সে আজ তাদের মায়ের ব্যাখ্যানুসারে একটা অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে উঠেছে। টাকায়

কি না অসাধ্য-সাধন করা গেলো! অথচ এই কথা ভাবতেই দর্শন একেবারে কালিয়ে আসে, টাকার জোরে ইন্দ্রাণী সকলের আত্মীয় হয়ে উঠলো, শুধু সে-ই হয়ে গেলো পর, শুধু সেই-ই রইলো দূরে! টাকা এলো আজ প্রেমের মূল্যনির্ধারন করতে।

শুধু দর্শনের কাছেই ইন্দ্রাণী আজ কুৎসিত, টাকায় কলঙ্কিত। তার রূপ আজ টাকার রজতলাবণ্যে, তার প্রেমের নিবিড় অনুভূতির আভায় নয়। টাকা দিয়ে সমস্ত বিরুদ্ধ সংসারকে সে বশ করেছে, সর্বাঙ্গে তার উছলে পড়ছে এই অহঙ্কার। এমনকি এই সোনার শৃঙ্খলে দর্শন পর্যন্ত বন্দী—চোখে তার সেই পাশবিক পরিতৃপ্তি। সকলের উপরে সে জয়ী, ব্যবহারে তারই একটা উদ্ধত নিষ্ঠুরতা। টাকার আলোয় আবিষ্কার করেছে সে তার নিজের অর্থ, জীবন নিয়ে এই আবিল মত্ততা। ইন্দ্রাণীকে কুৎসিত লাগে, কিন্তু বলতে গেলে, সে-ই তো তাকে কুৎসিত করে তুলেছে। দর্শনের সকল উত্তেজনা আবার জুড়িয়ে আসে। ইন্দ্রাণীর উপর রাগ করবার পর্যন্ত তার অধিকার নেই।

কয়েক দিন পর দর্শন ইন্দ্রাণীর কাছে এক আবৃজি নিয়ে হাজির হলো। চেয়ারে বসে সামনের টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে ইন্দ্রাণী তখন কতোগুলি পরীক্ষার কাগজ দেখছে।

দর্শন একটা সিগারেট টানতে-টানতে বার কয়েক নিঃশব্দে পাইচারি করলে।

টেবিলের থেকে মুখ না তুলে ইন্দ্রাণী জিগ্‌গেস করলে: কিছু বলবার আছে নাকি? কয়েকটা টাকা চাই? ক'টা?

দর্শন নীরক্ত, পাংশু মুখে বললে—না। আমি চাকরি পেয়েছি।

—চাকরি পেয়েছ? একসঙ্গে ইন্দ্রাণীর সমস্ত স্নায়ু-শিরা যেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো। খাতা-পত্র ফেলে-ছড়িয়ে রেখে সে একলাফে উঠে দাঁড়ালো: বলো কি? কোথায়?

দর্শন সাদা গলায় বললে—এইখানে।

—এইখানে? ইন্দ্রাণী ভুরু কুঁচকালো: এইখানে আবার কি চাকরি?

—হ্যাঁ, এইখানে একটা 'গণহিতৈষী' বলে প্রেস আছে, সেই প্রেসে। দর্শন একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো: হাফ্‌-ম্যানেজারের কাজ।

—প্রেসে? ইন্দ্রাণীর মুখের প্রচ্ছন্ন রেখাগুলি যেন নিষ্প্রভ, দুর্বল হয়ে এলো। সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললে—কতো দেবে?

মুখে কোনো ভাব নেই এমনি নির্লিপ্ত গলায় দর্শন বললে—বেশি নয়। টাকা ত্রিশেক।

—পাগল! নিদারুণ বিরক্তিতে ইন্দ্রাণীর মুখ টিল হয়ে উঠলো: একটা

ফার্স্ট-ক্লাস ফার্স্ট এম-এ তিরিশ টাকার চাকরি করতে যাবে? ইন্দ্রাণী চেয়ারে বসে পড়ে ফের একজামিনের খাতায় মন দিল : তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেলো নাকি?

—অনেক দিন। দর্শন এক পা এগিয়ে এসে বললে—আমি তাদের কথা দিয়েছি পরশু থেকে কাজে জয়েন করতে হবে।

—কথা দিয়েছ মানে? ইন্দ্রাণী দপ্ করে জ্বলে উঠলো : তুমি এতো সব পাস করে ঐ একটা নোংরা ইডিয়টিক কাজ নিতে যাবে তিরিশ টাকার জন্যে?

—মন্দ কি! ফার্স্ট-ক্লাস ফার্স্ট হয়েই তো বসে আছি, বরং দিনান্তে একটা করে টাকা রোজকার হবে। এতোদিনে একটা কিছু তবু করলাম।

—কেন, কেন তোমার কিসের আবার এতো টাকার দরকার পড়লো শুনি?

—বা, সংসারে কখনো টাকার অদরকার হয়?

—তাই ওই রকম একটা পুলিশ্ কাজ নিতে হবে—তিরিশ টাকা মাইনেতে? ঐ টাকায় তোমার কি এমন স্বর্গ মিলবে শুনি? ইন্দ্রাণী হঠাৎ তার টেবিলের টানা ধরে এক টান মারলো : কতো টাকা তোমার চাই, তাই বলো না।

দর্শন বললে—বারে-বারে তোমার কাছেই বা হাত পাতবো কেন? এ কটা টাকার উপর আমার তো একার কর্তৃত্ব থাকতে পারে?

—ও! গলাটা একটু নামিয়ে চিবুকটা ভারি করে ইন্দ্রাণী বললে—আমার কাছে নিজের বলে কিছু চাইতে বুঝি তোমার মানে ঘা লাগে? আর, ভাগ্যক্রমে তুমি রোজগার করলে তোমার কাছে টাকা চাইতে আমার তখন অপমান লাগতো না, না? স্বামীর কাছে স্ত্রীর টাকা চাওয়াটা আবদার ভালোবাসা, আর-স্ত্রীর কাছে চাইতে গেলেই সেটা পুরুষের অপমান, কেমন? কেন, কেন তুমি আমাদের মাঝে এই তফাত রাখবে?

দর্শন সিগারেটের পোড়া টুকরোটা জানলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে—কথাটা তুমি সেই দিক থেকে না দেখলেও পারো। তিরিশটা টাকা আয় বাড়ে, মন্দ কি!

—দরকার নেই তোমার আয় বাড়িয়ে। আমাদের এমন কিছু এখন অভাব নেই।

—কিন্তু তাদের যে আমি কথা দিয়েছি।

—কথা ফিরিয়ে নিতে কতোক্ষণ! খবদ্দার, তুমি ঐ চাকরি করতে পারবে না কিছুতেই।

দর্শন আমতা-আমতা করে বললে—কেন যে তোমার এতে আপত্তি হচ্ছে আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

—বুঝতে পারবেও না তুমি ইহকালে। ইন্দ্রাণী হেঁট হয়ে কাগজ দেখতে লাগলো : যাতে আমার সম্মান নষ্ট হয় এমন কোনো কাজ আমি তোমাকে করতে দিতে পারি না।

—তোমার সম্মান নষ্ট হয় মানে ?

—নিশ্চয়। এখানে আমার একটা পজিশন আছে, শহরসুদ্ধ সবাই আমাকে এতো মান্য করে—আমার স্বামী হয়ে শেষকালে তুমি একটা প্রেসের কেরানিগিরি করবে তিরিশ টাকা মাইনেয়—এ কিছুতেই হতে পারে না। আমার মুখ তখন থাকবে কোথায়, লোকে বলবে কি ?

দর্শন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। তার আর কোনো নিজের পরিচয় নেই, সে ইন্দ্রাণীর মাত্র স্বামী ? তার নিজের কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, সে কি করবে না করবে সব ইন্দ্রাণীর মুখ চেয়ে, ইন্দ্রাণীর মত নিয়ে, ইন্দ্রাণীর সম্মান বাঁচিয়ে।

দর্শন শুকনো একটা ঢোক গিলে বললে—বা, অনেস্ট লেবারে তোমার আপত্তি হবে কেন ?

ইন্দ্রাণী ঝাঁঝিয়ে উঠলো : তুমি যদি খুব ভালো একটা চাকরি পাও, সংসার স্বচ্ছন্দে চলে যায়, তখন ঐ অনেস্ট লেবারের অজুহাতে আমাকে তুমি ঝি-গিরি করতে দেবে ? তোমার স্ত্রী অনেস্ট লেবার করে সংসারের আয় বাড়াচ্ছেন দেখে তোমার মুখ বেয়ে তখন আহ্লাদের স্রোত গড়িয়ে পড়বে না ? যাও, ঐ চাকরিতে এখুনি তুমি জবাব দিয়ে এসো।

দর্শন একটা সিগারেট ধরিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তার চেয়ে ইন্দ্রাণীর সম্মানের দাম আজ অনেক বেশি—টাকাই তাকে আজ এই সম্মান এনে দিয়েছে।

॥ ১৫ ॥

গ্রীষ্মের ছুটি এসে পড়লো—প্রায় লম্বা দু মাস। ইন্দ্রাণী এ ছুটিতে কোথাও যাবে না, এইখানেই থাকবে, এইখানে তার অনেক কাজ। মেয়েদের দিয়ে এখানকার হাসপাতালের জন্য কি-এক চ্যারিটি নাটক করাবে তারই সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে সে মেতে আছে! বাংলা ভাষায় মেয়েদের উপযুক্ত কোনো নাটক নেই, কাজেই তাকে একটা লিখতে হচ্ছে মৌলিক, কাকে কোন্ পার্ট

দেওয়া যেতে পারে সেদিকে নজর রেখে। ছুটি হয়ে গেলেও ইন্দ্রাণীর কাজের কামাই নেই : সকালে থিয়েটারের মহড়া, দুপুরে গানের ক্লাস, বিকেলে আছে আবার তার 'যুগনারী'। কোথায় কি অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ নিয়ে সভা, সেখানেও ইন্দ্রাণী, কোথায় কি বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সমিতি, সেখানেও সে মাথা গলিয়েছে। কাজ, কাজ, কাজ—কাজ যেন তাকে একটা নেশার মতো পেয়ে বসেছে। কাজ করবো ভাবলে পৃথিবীতে কাজের কখনো নাকি অভাব হয় না, ইন্দ্রাণীর হয়েছে তাই; কিন্তু দর্শনের পৃথিবী ঘুরছে উল্‌টো দিকে, কাজ বলে আদৌ কিছু করবার আছে কিনা, তাতেই রয়েছে তার গভীর সন্দেহ।

ছুটির দিনেও ইন্দ্রাণীকে সে বিশ্রামে নরম, আলস্যে স্নিগ্ধ করে দেখতে পেলো না, এখনো সে তলোয়ারের মতো ঝকঝক করছে উজ্জ্বল, এখনো সে নদী-স্রোতের মতো ধারালো। নেই তাতে একটু শ্রান্তির কোমলতা, নেই একটুখানি অবসাদের মাধুর্য। ইন্দ্রাণীকে দেখে আর মনে হয় না সে নিজেকে ও স্বামীকে ভরণ-পোষণ করবার জন্যেই চাকরি করতে এসেছে—এসেছে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে বাইরের বাতাসকে তীব্রভাবে অনুভব করতে, তাতে ব্যাপ্ত করে দিতে তার বলিষ্ঠ অস্তিত্ব-চেতনা। চাকরিটা একটা তার প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ মাত্র, চাকরিই তার জীবনের শেষ কথা নয়। চাকরিটা তার জীবনের একটা ধাপ বলতে পারো, সেই তার সর্বোচ্চ চূড়া নয়। বাঘ যেন পেয়েছে রক্তের স্বাদ, তেমনি নিশ্বাসে পেয়েছে সে পৃথিবীর গন্ধ, গায়ে লেগেছে তার সমুদ্রের হাওয়া। ভুল, ভুল, সে এসেছে দর্শনের অক্ষমতার ক্ষতিপূরণ করতে; সে এসেছে প্রতিষ্ঠিত করতে তার নিজের সুস্পষ্ট স্বেচ্ছাতন্ত্র, উড্ডীন করে দিয়েছে সে তার উদ্ধত পতাকা। ইন্দ্রাণী তার স্বামীর জন্যে নয়, ইন্দ্রাণী তার নিজের জন্যে। কাউকে বাঁচাবার চাইতে নিজে বেঁচে ধন্য হবার তার সাধনা।

বিকেলে বেরুবার উদ্যোগ করতেই হঠাৎ পাশের ঘর থেকে কে যেন দর্শনকে ডেকে উঠলো : শুনছ?

এ যে ইন্দ্রাণী, দর্শন তা জানে, কিন্তু বিশ্বাস করতে তবু দেরি হচ্ছিলো, কেন না ইন্দ্রাণীর গলায় খেলেনি বহুদিন এমন একটি মিঠে সুর।

ইন্দ্রাণী তার চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। মোলায়েম করে বললে—তুমি বেরুচ্ছ নাকি? আজ আর বেরিয়ো না বাড়ি থেকে।

ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ একটি আবহাওয়া যেন ঘনিয়ে এলো। পিঠের উপর ইন্দ্রাণীর চুলগুলি ভিজা, উচ্ছৃঙ্খল, বুকের উপর আঁচলটা হাওয়ায় এলোমেলো। বৈকালিক গা ধুয়ে সে চা খাচ্ছে। প্রখর ও প্রচ্ছন্ন, সমস্ত গায়ে তার নির্মল শীতলতা। চায়ের স্বাদে সিক্ত, আরক্তিম দুটি ঠোঁটে কেমন একটা বিহ্বল লোলুপতা এসেছে। চোখের

দৃষ্টিটি গাঢ়, মুখের ডৌলটি নরম, চিবুকটি কেমন লোভী। অনেক দিন ইন্দ্রাণীর সে এমন লাস্য দেখেনি, এমন গোপন প্রগল্‌ভতা।

দর্শন তার দিকে অফুরন্ত চোখে চেয়ে বললে—কেন ?

—আজ সন্ধ্যের সময় সাব্‌-ডেপুটিবাবুদের বাড়িতে আমাদের 'যুগনারী'র একটা মিটিং আছে, সেখানে আমার না গেলেই নয়। ফিরতে হয়তো একটু রাত হবে, তাই আজ না বেরুলে। ইন্দ্রাণী চোখে একটা হাসির ঢেউ তুললে : তোমার তো এখানে ক্লাবও নেই, আড্ডাও নেই—এতোদিন কড়িকাঠ ছাড়া আর কারু সঙ্গে তো ভাব করতে পারলে না। শুধু রাস্তা ধরে একটু হেঁটে আসা—বার কয়েক উঠোনটায় চক্কর মারলেই তোমার সে এক্‌সারসাইজ হয়ে যাবে।

আবহাওয়াটা উড়ে যাচ্ছিলো, ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি তার মুখে আবার সেই অনুরাগের সুইচ টিপলে। লোভে সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত করে বললে—বেরুতে আমার এখনো দেরি আছে, চলো, আমরা ততোক্ষণ ঘাসের উপর গিয়ে একটু বসি। আর এক কাপ করে চা করে নিই—কেমন ?

দর্শনের মুখ চুপসে এসেছিলো, আবার তাতে রক্তের ছোঁয়াচ দেখা গেলো। ইন্দ্রাণী শরীরে লীলার একটা দক্ষিণ হাওয়া তুলে চলে যেতে যেতে বললে—দাঁড়াও, জল বসিয়ে শাড়িটা ছেড়ে নিই চট করে।

দু'বাটি চা সামনে নিয়ে দুজনে ঘাসের উপর এসে বসেছে। বেড়া দিয়ে ঘেরা নিভৃত এক টুকরো উঠোন, গা বেয়ে উঠে গেছে কুঞ্জ আর অপরাজিতার লতা, আসন্ন অন্ধকারে নরম, নমিত, স্নেহার্দ্র আকাশ। এদিকটায় কেউ নেই, কেবল দুজনের মাঝে গভীর অপরিচয়ের স্তব্ধতা। নিঃশব্দে চায়ের বাটিতে চুমুক দেওয়া ছাড়া এ সময়টাতে পৃথিবীতে আর যেন কিছু ঘটবার নেই। আশ্চর্য !

বাইরে বেরুবার পোশাকে ইন্দ্রাণী তারকাকীর্ণ আকাশের মতো ঝল্‌মল্‌ করছে। রাত্রির অন্ধকারের চেয়েও তার রহস্য আজ অগাধ—তাকে ঘিরেছে আজ অজানার অন্ধকার। এই ইন্দ্রাণীই একদিন তার দেহে জ্বেলেছিলো দীপ, চোখে এনেছিলো স্বপ্ন, একথা যেন আজ বিশ্বাস করতেও ভয় করে। একদিন দর্শনের বাহুতে সে সঙ্কুচিত, ঝঙ্কৃত হতো—এই ইন্দ্রাণী—এ কথা তাকে মনে করিয়ে দিলেও যেন তাকে অপমান করা হবে। আজ তাঁর বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটি পর্যন্ত তার অচেনা। তার বসবার ভঙ্গিতে আর সেই আগেকার প্রশ্রয়শীল স্নেহের সুষমা নেই, রেখায় নেই সেই তরঙ্গায়িত লীলা—তার বসবার ভঙ্গিটা পর্যন্ত এখন এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমিস্‌ট্রেসের।

এ রকম স্তব্ধ মুহূর্ত আগেও তাদের মাঝে এসেছিলো, কিন্তু তাতে উচ্চারিত

ছিলো স্পর্শপ্লাবিত মৌনভঙ্গের অসহ্য প্রতীক্ষা : স্তব্ধতা তখন গলে পড়তো স্পর্শের প্রস্রবণে। কোনো কথা না বললেও ইন্দ্রাণী থাকতো সর্বাঙ্গ বাঙ্ময়। সে সব মুহূর্ত যাযাবর পাখির মতো কবে বিদায় নিয়েছে, আজ সমস্ত আকাশে তাদের চলে যাওয়ার স্তব্ধতা। এই নরম, ঘনিষ্ঠ আকাশের নিচে ইন্দ্রাণীকে আজ একটা গান গাইতে বলা পর্যন্ত সামান্য একটা ভদ্র ন্যাকামির মতো শোনাবে। যে গান গেয়ে তার পয়সা রোজগার হয় না, তার প্রতি আর যেন তার কোনো আকর্ষণ নেই।

ইন্দ্রাণী কেন যে তাকে বাইরে বেরুতে বারণ করল তা সে বুঝেছে—তার নিজের বেরুবার সুবিধে করবার জন্যে! তার সুবিধে করবার জন্যেই তো দর্শন এখানে রয়েছে। তবু তার কাছে একটা আবদার করবার অছিলায় ইন্দ্রাণীর শরীরে যে লাবণ্যের নদী জেগেছিলো তারই একটা ঢেউ হয়তো সে আশা করেছিলো তার দেহের তটে এসে আছড়ে পড়বে! তারই আশায় সে ছিলো স্তব্ধ, প্রতিক্ষা-স্পন্দিত : কিন্তু নদীর উপর জেগেছে আজ চর, আজ চঞ্চল লাবণ্য নয়, কতোগুলি মৃত স্থূল মাংসস্তূপ।

দর্শন আস্তে-আস্তে চায়ের বাটিটা শেষ করলে। আরো খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। ভাবলো, কেন বা এই সন্ধ্যার আকাশ, এই ঘাসের উপর পা এলিয়ে বসা, ইন্দ্রাণীর এই বেশে-বাসে আরণ্য সমারোহ। সন্ধ্যা, ইন্দ্রাণীকে এখন বাইরে বেরুতে হবে বলে; সাজগোজ, সে 'যুগনারী'র প্রতিষ্ঠাত্রী; ঘাসের উপর বসা, খানিকটা সেন্টিমেন্ট্যাল আবহাওয়া তৈরী করে দর্শনকে একটু ঠাণ্ডা করে রাখা শুধু।

গলা খাঁখরে দর্শন বলে উঠলো : তুমি তো এ ছুটিতে কোথাও যাবে না? চায়ের বাটিতে শেষ চুমুক দিয়ে ইন্দ্রাণী বললে—কি করে যাই বলো? কেবলই কাজের জালে জড়িয়ে পড়ছি। কোথায়ই বা যেতাম? গেলেই তো কতোগুলি খরচ। এই বেশ আছি, এই জায়গাটা আমার খুব ভালো লাগছে।

আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়তে-খুড়তে দর্শন বললে—কিন্তু আমি কোথাও যেতে পারলে বাঁচতাম, ইন্দ্রাণী। কিছু টাকা আমাকে দাও না, কোথাও একটু ঘুরে আসি।

শিশুর মতো নিষ্পাপ দর্শনের মুখ, শিশুর মতো অসহায় তার কণ্ঠস্বরে ইন্দ্রাণীর মন হঠাৎ ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠলো। ধীরে একখানি হাত বাড়িয়ে, সরে এসে দর্শনের ডান হাত কোলের কাছে টেনে এনে বললে--কোথায় যেতে চাও?

—কলকাতায়।

—সেখানে গিয়ে কি হবে?

—প্রাণপণ করে দেখতাম কোথাও একটা চাকরি মেলে কিনা।

ডুঠোঁটের প্রান্তটা একটু কুঁচকে ইন্দ্রাণী বললে—আবার চাকরি!

—হ্যাঁ, এবার আমি ভয়ানক সিরিয়াস্। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপাতন।

—ঐ শেষেরটাই সার হবে। তার হাতের পিঠের উপর আস্তে-আস্তে হাতের পিঠ বুলোতে বুলোতে: কিন্তু কি তোমার জুটবে মনে করো?

—মনে করি তো অনেক কিছু, কিন্তু নিদেনপক্ষে একটা মাস্টারি অন্তত যোগাড় করতে পারবো আশা করি। দর্শন ইন্দ্রাণীর হাতখানা ঘুরিয়ে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে বললে—আমি একটা স্কুল-টিচার হলে তো তখন আর তোমার সম্মানহানি হবে না। মাস্টারের স্ত্রী মাস্টারনী—কি বলো? অল্প একটু হেসে: ব্যাকরণ শুদ্ধ থাকবে।

ইন্দ্রাণী সামান্য ক্ষুব্ধ হয়ে বললে—কিন্তু তোমার আবার চাকরি করার কি দরকার? এই তো দিব্যি আমাদের চলে যাচ্ছে।

—চলে যাচ্ছে না, ইন্দ্রাণী। একা-একা আমি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, কিছু একটা না করতে পারলে আমি আর শান্তি পাচ্ছি না।

—বলো কি? তোমার চিরকালের শান্তি তো এই 'পীরিতি বালিশে আলিস ত্যাজিব', তোমার আবার শ্রান্তি কিসের? কথাটা তরল করবার জন্যে ইন্দ্রাণী হেসে উঠলো। বললো একা-একা কেমন করে হলো—এই আমি তোমার কাছে নেই? আমার থেকে দূরে সরে গেলেই বুঝি তুমি ভরাট হয়ে উঠবে? বেশ আছ কিন্তু। আর আমি বেচারি তখন একা একা থাকব কি করে?

সশব্দে একটা নিশ্বাস ফেলে দর্শন বললে—আমি তোমার কাছে থাকি বা না থাকি, তোমার কি এসে যায়? আমাকে আর তোমার কি দরকার?

ইন্দ্রাণী মুখ ম্লান করে খানিকক্ষণ দর্শনের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। চোখ নামিয়ে গাঢ় গলায় বললে—এই কথা তো তুমি বলবেই। তোমার জন্যে আমি এতো করছি, এখন তোমাকে আর আমার কি দরকার? পুরুষরা এতো অকৃতজ্ঞ হয়! তোমার জন্যে না হলে আমি সাধ করে এই চাকরি করতে এসেছি, না?

দর্শন ফের মাটি খুঁড়তে-খুঁড়তে বললে—আমার জন্যেই হয়তো চাকরি করতে এসেছিলে, কিন্তু চাকরি করতে এসে তার কারণটা একেবারে তুমি তোমার দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে ফেলেছ, ইন্দ্রাণী। আমি আছি কি নেই, এতে তোমার কিছু এসে যায় না। আগেও যেমন, এখনো তেমনি, চাকরি করাই তোমার প্যাশান্, নিজের বাঁচবার আনন্দের জন্যেই তোমাকে চিরদিন চাকরি করতে হবে।

—মাগো, কি সেন্টিমেন্ট্যাল স্বামী নিয়ে আমাকে ঘর করতে হচ্ছে। ইন্দ্রাণী সতে-হাসতে উঠে পড়লো। বললে—চাকরি করা কিনা আমার বাঁচবার

আনন্দ! বেশি দিন এমন আনন্দ ভোগ করতে হলেই হয়েছে। তারপর হঠাৎ কাছে এসে নুয়ে পড়ে দর্শনের কাঁধের উপর সে হাত রাখলে। বললে—আমাদের থিয়েটারটা হয়ে যাক, তখন এক সঙ্গে দুজনে কোথাও বেরিয়ে পড়বো না হয়।

ঘাড়টা উঁচোয় তুলে ধরে দর্শন বললে—তারপর তোমার ছুটি ফুরতেই আবার দুজনে এক সঙ্গে এখানে সোজা চলে আসবো? এই তো?

দর্শনের চুলগুলি দু হাতে এলোমেলো করে দিতে-দিতে ইন্দ্রাণী বললে—উপায় কি তাছাড়া?

—না, এক সঙ্গে নয়। আমাকে তুমি একবার একা ছেড়ে দাও, ইন্দ্রাণী।

ইন্দ্রাণীর হাত শিথিল হয়ে এলো। তবু মুখে হাসি এনে বললে—একা ছেড়ে দেবার জন্যে মশাইকে এতো হাঙ্গামা-হুজ্জুৎ করে বিয়ে করা হয়নি। জোয়ান পুরুষ মানুষ—একাকীত্বকে ভয় করে না, কিন্তু জোয়ান মেয়েছেলের অনেক ল্যাঠা। ঐ বুঝি গাড়ি এলো আমাকে নিতে। অসীম উৎসাহে ইন্দ্রাণী হঠাৎ নুয়ে পড়ে দু হাতে দর্শনের গলা জড়িয়ে ধরলো: আমি তোমায় ফেলে কোথাও এক পা গেছি যে তুমি আমায় ফেলে চলে যেতে চাও একা! ভালোবাসার দায়িত্ব কেবল আমার, তোমার নেই এককণাও, না? তোমাকেই আমার অনুগমণ করতে হবে, আর আমাকে তোমার একটুও অনুসন্ধান করতে হবে না? আমি তোমার স্ত্রী হয়েছি বলে কি তোমার কাছেও এত ছোট হয়ে গেছি?

পরে আরো সে নিচু হলো, তার কথার তাপ লাগতে লাগলো দর্শনের মুখে। কানে-কানে বলার মতো করে ইন্দ্রাণী বললে—কোথাও তোমার যেতে হবে না, এইখানেই তুমি থাকো, আমার আঁচলের তলায়, বুঝলে? শোনো, ফিরতে আমার রাত হতে পারে, আমার জন্যে খেতে দেরি কোরো না যেন। মদন! মদন!

মদন এসে দাঁড়ালো।

—আমার সঙ্গে যাবি চল গাড়ির পেছনে চড়ে। ও মা, সাব-ডেপুটিগিন্নীই যে স্বয়ং এসে গেছেন। চললাম। বলে শরীরে যেন পাখির মতো হালকা পাখা মেলে ইন্দ্রাণী বাতাসে গেলো উড়ে।

বহুদিন পরে একটি মুহূর্ত এসেছিলো ভেসে, ইন্দ্রাণীর চলে-যাওয়ার শূন্যতায় বাজছে যেন অন্তরঙ্গতার সুর! দর্শনের সমস্ত স্নায়ু-শিরা নেশায় বিভোর হয়ে উঠলো। চোখে নামলো তন্দ্রার কুয়াশা। তার মেরুদণ্ডের ঋজুতা আলস্যের সুখা-বেশে আবার এলো স্তিমিত হয়ে।

রাত তখন অনেক, একঘুম থেকে জেগে উঠে দর্শন দেখলো বাইরে রাশি-রাশি জ্যোৎস্না ফুটেছে। শুক্লপক্ষের চাঁদ যে পুরন্ত হতে হতে আজকের রাতেই এতো

প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছে তা সে এতোক্ষণ টের পায়নি। দর্শনের মনে হলো যেন কার গান নিঃশব্দতায় তুষারীভূত হয়ে উঠেছে, সে নিঃশব্দতা যেন তারও মনে, ঝরে পড়েছে তার বিছানায়, ঘরময় ফিকে নীল্‌চে অন্ধকারে।

দর্শনের কি যেন মন কেমন করে উঠলো বলা কঠিন। আজ সন্ধ্যায় ইন্দ্রাণী হঠাৎ তার কাছে এসে পড়েছিলো—হয়তো তারই জন্যে : ভালোবাসার দায়িত্ব শুধু ইন্দ্রাণীর একার নয়—হয়তো তারই জন্যে : তাকে এখানে একা ফেলে কিছুতেই সে যেতে দেবে না—হয়তো তারই জন্যে একঘুমের পর জ্যোৎস্না এতো সুন্দর লাগছে, রক্তে ধরেছে স্বপ্নের শিখা, স্নায়ুতে শিরায় বাজছে এই নিশীথরাত্রির মৌনঝঙ্কার।

ভিতরের দরজাটা খোলাই থাকে বরাবর, দরজাটা আস্তে ঠেলে পা টিপে টিপে দর্শন ইন্দ্রাণীর ঘরে ঢুকে পড়লো। ইন্দ্রাণী কখন যে ফিরছে দর্শন টের পায়নি, ঠাকুর-চাকরকে জাগা রেখে সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। ফিরতে যে তার অনেক রাত হয়েছে, বেশিক্ষণ যে সে ঘুমোয়নি, তার শোয়ার এই বিশ্রস্তি-হীনতা থেকেই দর্শন তা আন্দাজ করতে পারলো। ওখান থেকেই হয়তো খেয়ে এসেছে, ঘরের ভিতর পিতলের টোপে ভাত ঢাকা। গা ভরে এতো তার ঘুম পেয়েছিলো যে ব্লাউজটা খুলে ফেললেও শাড়িটা সে বদলাতে পারেনি, মশারিটাও টাঙায়নি পর্যন্ত। বিছানায় শুতে না শুতেই গেছে ঘুমের গভীর কোলে ডুবে।

ফুলের মতো কোমল অন্ধকারে দর্শন বুক ভরে ইন্দ্রাণীর এই ঘুমের ঘ্রাণ নিতে লাগলো। ঘুমে ইন্দ্রাণীকে কি যে করুণ, কি যে অসহায় লাগছে। পা দু'টি দুর্বল রেখায় এসেছে বেঁকে, মুখের ঘুমন্ত ডৌলটিতে যেন একটি নির্মল বিষণ্ণতা। দর্শন কি যে করবে, নাম ধরে ডাকবে, না, তার পাশে বসে পড়ে নীরব গভীর স্পর্শে তার ঘুম ভাঙাবে, কিছু ঠিক করতে পারলো না। দিনের আলোয় সেই উদ্ধত বিজয়িনীকে রাত্রির এই একাকী অন্ধকারে কেমন অবনমিত, পরাভূত দেখাচ্ছে। তার জন্যে দর্শনের মায়া করতে লাগলো।

তবু সে করতে লাগলো দ্বিধা। কাছে এসে তার নাম ধরে ডাকবে, না, তাকে ছুঁয়ে জ্যোৎস্নাঙ্কিত করে তুলবে, তাই তার কাছে একটা সমস্যা হয়ে উঠলো। করতে লাগলো তার ভয়, যুক্তি দিয়ে বসলো সে সেই ভয় খণ্ডন করতে। করতে লাগলো বা তার লজ্জা, কিন্তু প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে সে যদি তার স্ত্রীর কাছে সান্ত্বনার জন্যে এসেই থাকে, তবে লজ্জা কিসের! অলক্ষিতে দর্শন দু'পা এগিয়ে এলো।

ঘুমের মধ্যে ইন্দ্রাণী টের পেয়েছে কার উপস্থিতির ঘনতা। তার ঘুমের

জ্যোৎস্নায় পড়েছে যেন কোনো কালো ছায়া। চোখ মেলেই সে হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো : কে ? কে ওখানে ?

আর্তনাদ শুনে দর্শন একমুহূর্তে যেন একটা নিষ্কম্প পাথর হয়ে গেলো। আওয়াজ করতে গেলো, গলাটা কাঠ হয়ে গেছে। ভাবলে খোলা দরজা দিয়ে ছুটে পালিয়ে যায়, কিন্তু পায়ে নেই এতোটুকু আর জোর।

আধো ঘুমে, স্বপ্নে যেন একটা অতিকায় মূর্তি দেখছে এমনি আতঙ্কে ইন্দ্রাণী আবার চীৎকার করে উঠলো: কে, কথা কয় না কেন ? পরে পাশের ঘরের দেওয়াল লক্ষ্য করেই হয়তো সে অন্ধকারে ডাকতে লাগলো : ওগো শুনছ, শীগ্‌গীর চলে এসো—

যেন চুরি করতে এসেছে এমনি অপরাধীর মতো ম্লান কণ্ঠে দর্শন বললে—আমি। ভয় নেই।

—তুমি ? এতোক্ষণে ইন্দ্রাণী চিনতে পেরেছে। চোখ দুটো কচলে নিয়ে সে বিছানার উপর উঠে বসলো। বিরক্ত, রুক্ষ গলায় বললে—তুমি এতো রাতে এই ঘরে কি করতে এসেছ ?

দর্শন প্রকাণ্ড একটা ঢোঁক গিলে বললে, দেয়াশলাই একটা খুঁজতে এসেছি।

—এই নাও। বালিশের তলা থেকে ম্যাচ-বাক্সটা দর্শনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ইন্দ্রাণী আবার বালিশে ভেঙে পড়লো। হাঁটুর দিকে কাপড়টা ঠিক করতে করতে বললে—বাবাঃ, কি ভয় যে পেয়েছিলাম। ভাবলাম কে-না-জানি কে। মানুষে একবার ডাকে, তা না, ভূতের মতো অন্ধকারে চুপ করে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

দেয়াশলাইটা দর্শনকে কুড়িয়ে নিতে হলো অবিশ্যি।

শরীরটাকে ফের শিথিল করে এনে ইন্দ্রাণী প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুরে বললে—এতো রাতে আবার তোমার আলোর দরকার পড়লো কিসের ? যাও, চুপ করে এখন ঘুমিয়ে থাকো গে। রাত জেগে আর বই পড়তে হবে না।

আসবার সময় অন্ধকারে ঠিক সে আসতে পেরেছিলো, ফিরে যাবার সময় দেয়াশলাইয়ের কাঠি জেলে দর্শনকে পথ চিনতে হলো। অথচ, কল্পিত আততায়ীর বিরুদ্ধে সেই ছিলো কিনা ইন্দ্রাণীর রক্ষক। ছি-ছি-ছি, এর আগে দর্শনের মরে যেতে কি হয়েছিলো ?

দর্শন বাকি রাত আর ঘুমুতে পারলো না। বিছানায় যেন কাঁটা ফুটছে, দেওয়ালগুলো নীরবে দাঁড়িয়ে করছে অট্টহাস্য। বারান্দায় চেয়ার টেনে এনে তন্দ্রাহত ক্লান্ত চোখে সে জ্যোৎস্নাময় রাত্রির শূন্যতার দিকে চেয়ে রইলো। দর্শনের ফেনিল ভালোবাসার মতো আকাশে উথলে উঠেছে জ্যোৎস্না, অথচ সমুদ্রে নেই

প্রতিধ্বনি। পথ চিনতে দেয়াশলাইর কাঠি জ্বেলে সেই যে ক্ষণিক আলো করেছিলো তার শিখার তীক্ষ্ণ রেখাটা বুকের মধ্যে তার ছুরি চালাচ্ছে।

নিশ্চয়, দর্শন তার কে? তার চেয়ে বড়ো ইন্দ্রাণীর 'কেরিয়ার', তার এই নির্বাধ উদ্দামতা, এই তার বিশাল পক্ষবিস্তার। দর্শন তো তার স্রোতের মুখে একটা বাধা, তার অস্তিত্বটা তার পক্ষে বিরাট একটা অত্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়।

॥ ১৬ ॥

ফার্স্ট-ইয়ারে পড়তে গরমের ছুটিতে দর্শন একবার জঙ্গিপুর গিয়েছিলো মনে আছে, তার দূর-সম্পর্কের এক দিদির বাড়িতে। সেখানে, কর্ণপরম্পরায় শুনতে পেয়েছিলো, এক ভদ্রলোক আজ প্রায় মাস দুয়েক ধরে সমানে শ্বশুরবাড়িতে অধিষ্ঠান করছেন। ভদ্রলোকটির চাকরি-বাকরির সুবিধে হচ্ছিলো না, তাই কয়েকটা দিন শ্বশুরবাড়ি এসেছিলেন হাওয়া বদলাতে। দিনের পর দিন ক্রমশই যেন তাঁর এই বোধোদয় হচ্ছিল যে এই রকম হাওয়া খেতে পেলে চাকরি করবার আর দরকার নেই। মনে আছে, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে দর্শনও তাঁর পিছনে ফেউ লেগেছিলো, তাঁকে শুনিয়ে-শুনিয়ে সেও কাটতো ছড়া, কথা কইতো চিম্‌টি কেটে। জামাইবাবু হয়তো বিকেলে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন, রাস্তার ধারে গুলতানি করছিলো একদল ছেলে— তাদের ভিতর থেকে একজন হয়তো বলে উঠলো : 'বাইরের জামাই মধুসূদন, ঘরের জামাই মেধো : ভাত খাওসে মধুসূদন, ভাত খেসেরে মেধো।' কেউ হয়তো হবির্বিনা হরির্যাতি আওড়ে দিলে ; কেউ বা বললে : লক্ষ্মীছাড়ার ভক্তি বেশি ; একজন একেবারে সুর করে গান ধরে উঠলো : 'যা ছিলো আমানি-পান্তা মায়ে ঝিয়ে খেলুম ; ঘরজামাই রামের তরে ধান শুকোতে দিলুম। মনে আছে, ভদ্রলোক কোনো দিকে না চেয়ে নিঃশব্দে হেঁটে যেতেন, আর তারা হাসির হিল্লোড়ে খানখান হয়ে যেতো। সে কটা দিন তার কি মজাতেই যে কেটেছিলো!

দর্শন পোস্টাপিসে যাচ্ছিলো চিঠির উইণ্ডো-ডেলিভারি আনতে। চিঠি ইন্দ্রাণীর হোক বা ইন্দ্রাণীর কেয়ারে তার নামেই আসুক, স্কুলে আর বিলি হয় না, পিওন সটান বাড়িতেই দিয়ে যায়—দর্শনের, অর্থাৎ ইন্দ্রাণীর স্বামীর হুকুমে। ইচ্ছে করলে মাঝে-মাঝে সে পোস্টাপিসে এসেও বিটের পিওন থেকে ডেলিভারি নিয়ে যায় কোনো দরখাস্তের জরুরি জবাব পাবার সম্ভাবনা থাকলে। তেমনি সে আজ যাচ্ছিলো।

পোস্টাপিসের সামনে রাস্তার পাশে একদল অল্পবয়সী যুবক জাঁকিয়ে আড্ডা দিচ্ছে। মফঃস্বলে নতুন লোক, কারুর মুখও সে ছুবার করে দেখেনি, দর্শন তাদের উপেক্ষা করেই চলে যাচ্ছিলো, হঠাৎ তার কানে এলো কে একজন বলছে : বাবু-বেয়ারা ঐ চললেন চিঠি আনতে।

এদের মাঝে একজন হয়তো আনাড়ি ছিলো, জিগ্‌গেস করলে—কে, কে ভাই ?

চাকে যেন ঢিল পড়লো, মৌমাছিরা ঝাঁক বেঁধে বেরিয়ে এলো শতমুখে হুল ফোটাতে। পায়ের ধাপগুলি দর্শন মন্থর করে আনলে।

—চিনিস না ওকে ? এখানে যে নতুন মিস্‌ট্রেস্‌ এসেছে—ও হচ্ছে তার অনারারি বাবু-বেয়ারা। বৌর মাথায় ধরে ছাতি, পরিয়ে দেয় জুতোর ফিতে। বৌ আছে মাস্টারি করতে, ও করে বাড়ির দারোয়ানি, উনুন ধরায়, গোবর শুকিয়ে ঘুঁটে দেয়, বিনে-মাইনের পোশাকী চাকর, ওকে চিনিস না ?

অনভিজ্ঞ ছেলেটির তখনো ধাঁধা লাগছে। বললে : নতুন মিস্‌ট্রেসের স্বামী নাকি ?

—হ্যাঁ রে, নতুন মিস্‌ট্রেসের ল্যাপ-ডগ্‌। প্রাণীজগতের একটা প্যারাসাইট্‌। বেচারি বউকে দিয়ে খাটিয়ে নিজে পয়সা লুটছে। ইম্‌মর‍্যাল ট্রাফিক্‌ এ্যাক্টএর মতো একটা ম্যারেজ ট্র্যাফিক্‌ এ্যাক্ট পাস করা উচিত।

—কি বলিস রে শচীন ? যা না কুট্টি, ওকে গিয়ে একবার জিগ্‌গেস কর না : কেমন আছেন মিসেস চ্যাটার্জি

—মিসেস চ্যাটার্জি কেন ?

—বা, অরিজিন্যালি ওর স্ত্রী যে চ্যাটার্জি ছিলেন, ওর সঙ্গে তাঁর সিভিল ম্যারেজ হয়েছে। আসলে ওর স্ত্রীই যখন কর্ত্রী, তখন ওরই তো উচিত ওর স্ত্রীর পদবী নেওয়া। মিস্টার না বলে ওকে মিসেস চ্যাটার্জি বললেই ও খুশি হবে।

দর্শনকে লক্ষ্য করে কুট্টি-নামীয় ছেলেটি, যাকে বলে খেঁকিয়ে উঠলো : এক পয়সা কামাবার নেই মুরোদ, তায় ছিবিল্‌ ম্যারেজ! তেলের ভাঁড়ে তেল নেই, তায় পলায় মারে ঘা। মরে যাই, মরে যাই।

কথাগুলি অসংলগ্ন হয়ে দর্শনের কানে আসছিলো। পোস্টাপিসে আর না দাঁড়িয়ে রাস্তা ধরে সে সোজা বেরিয়ে গেলো।

কথাগুলি শুনে ভীষণ রাগ হচ্ছিলো তার, কিন্তু এই সব শিভ্যালরাস্‌ ছেলে-ছোকরার দুর্বিনীত গ্রাম্যতার জন্যে নয়, রাগ হচ্ছিলো তার নিজের উপর, তার এই নির্লজ্জ অকর্মণ্যতার বিরুদ্ধে। অকর্মণ্য তো বটেই, এমনকি সে একটা

আপাঙ্‌ক্তেয় অপুরুষ। বিরাট একটা গাছের ছায়ায় লালিত, পরাশ্রিত একটা আগাছা। সব সময়ে ভঙ্গিটা তার ভিক্ষার অনমুয়ে শিথিল, নির্ভর করে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে তার মেরুদণ্ড গেছে বেঁকে। এখান থেকে চলে যাবে, তাতেও চাই তার ইন্দ্রাণীর অনুমতি ; রাত্রে স্ত্রীর ঘরে ঢুকে পড়েছে, তাতেও চাই তার একটা সম্মানজনক জবাবদিহি। কোনো কাজ যেন তার নিজে থেকে করবার নেই যা একবার না উপর থেকে মঞ্জুর হয়ে এসেছে। সে যেন ইন্দ্রাণীর হাতে একটা টিনের পুতুল, খানিকটা দম দিয়ে দিলে সে একটু তড়পাবে, নইলে আমরণ আছে সে তার মুখের দিকে চেয়ে।

সে আর ইন্দ্রাণীর পূর্বরাগ-পরিচ্ছেদের প্রেমিক নয় যে স্বপ্নের জালে জড়িয়ে থেকে বসেবসে প্রতীক্ষা করবে, সে তার স্বামী, প্রতিষ্ঠিত করবে সে তার প্রভূততর ব্যক্তিত্ব, বিস্তৃততর শাসন। তার ছন্দের অনুবর্তিনী হবে ইন্দ্রাণী, হবে তারই কামনার প্রতিরূপা। সে স্বামী হয়ে স্ত্রীর কাছ থেকে প্রেমের নামে নেবে না এই পরাভব, একীভূততার নামে মানবে না এই নিশ্চিহ্নতা। রাত্রিতে তার স্ত্রীর ঘরে যদি সে গিয়েই থাকে, তবে তাতে নেই তার স্বামিত্বের অগৌরব, সে প্রতিষ্ঠিত করবে তার নিজের অধিকার ; যদি সে এখান থেকে কোথাও চলে যেতে চায়, তার ইচ্ছাই সেখানে যথেষ্ট, তার স্বার্থের দাবিই হচ্ছে প্রথমতর। ইন্দ্রাণীকে সে ভালোবাসলেও স্বামীরই মতন ভালোবাসে।

ইন্দ্রাণীর ঘরে সেই তার ধরা পড়ে যাওয়ার দিন থেকে দর্শনকে ইন্দ্রাণী যেন কেমন একটু ঘৃণামিশ্রিত করুণার চোখে দেখছে। তার সেই প্রণয়োচ্ছ্বাস যে তার অকর্মণ্যতারই একটা কুৎসিত বিকার এই ধারণাই যেন ব্যক্ত হয়ে উঠেছিলো ইন্দ্রাণীর ব্যবহারে। তাতে দর্শন যে তার স্বামী এই স্থূল সত্য কথাটাও যেন সে এড়িয়ে যেতে চাইছে। তার স্বামীর চেয়ে, বড়ো তার এই আবিল স্বার্থপরতা, এই তার উদ্দাম, উড্ডীন পক্ষবিক্ষেপ—এই লাঞ্ছনা দর্শনের কাছে অসহ্য লাগছিলো। প্রেমের প্রতি দর্শনের আর মোহ নেই, কিন্তু তার স্বামিত্বকে অপমান! ইন্দ্রাণী আজকাল দরজায় খিল চাপিয়ে শোয়, স্বামী হলেও তাকে সে একটা আততায়ীর মতো অবিশ্বাস করে। প্রেম থাক অনুচ্চারিত, কিন্তু এই তার জাজ্বল্যমান স্বামিত্ব ইন্দ্রাণীকে কিছুতেই প্রতি পদে তেমন করে সে অস্বীকার করতে দেবে না।

রবিবার বিকেলে বারান্দায় ইজিচেয়ার টেনে দর্শন বসে একটা বই পড়ছিলো, ইন্দ্রাণী হয়তো তার ঘরে বৈকালিক বেশভূষা করছে, এমন সময় সুবেশ একটি

ভদ্রলোক বাড়ির গেট খুলে ভিতরে এসে দর্শনকে জিগ্‌গেস করলে : ইন্দ্রাণী দেবী আছেন ?

তেরছা চোখে তার দিকে চেয়ে দর্শন রুক্ষ গলায় বললে—কেন, কি দরকার ?

ভদ্রলোক অসহিষ্ণু হয়ে বললেন—থাকেন তো কাইণ্ড্‌লি একবারটি ডেকে দিন।

—কেন, কি দরকার বলুন ?

লোকটার গায়ে-পড়া কর্তৃত্ব দেখে ভদ্রলোক একটু গরম হয়ে উঠলেন। বললেন—তিনি এলে তাঁকেই বলা যাবে। তিনি আছেন ?

—আছেন। দর্শন গ্যাঁট্ হয়ে চেয়ারের উপর পা তুলে উঠে বসলো : কিন্তু আমাকে আগে বলুন কি দরকার। আমাকে না বললে তাঁর দেখা পাচ্ছেন না। আপনার নাম কি ?

ভদ্রলোক বললেন—আমার নামে আপনার দরকার নেই। আমাদের ও-পাড়ায় অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে একটা মিটিং হচ্ছে আজ, তাতে ইন্দ্রাণী দেবী একটা পেপার পড়বেন বলে কথা আছে। তাঁকে নিয়ে যেতে আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি। তাঁকে একবারটি দয়া করে ডেকে দিন।

দর্শন কটুকণ্ঠে বললে—গাড়ি নিয়ে আপনি স্বচ্ছন্দে ফিরে যেতে পারেন। ইন্দ্রাণী দেবী যাবেন না মিটিংএ।

—সে কি কথা ? ভদ্রলোকের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো : সব ঠিকঠাক, সাত দিন আগে থাকতে অ্যানাউন্স করে দেওয়া হয়েছে। কাল বিকেলে পর্যন্ত আমাদের লোক ইস্কুলে গিয়ে জেনে এসেছে তাঁর পেপার রেডি—তিনি আজ সাড়ে ছ'টায় গাড়ি পাঠিয়ে দিতে বলেছেন।

দর্শন বইয়ের দিকে চেয়ে পরম উদাসীনের মতো বললে—যা খুশি তিনি বলতে পারেন, কিন্তু আমি বলছি যাওয়া তাঁর হতে পারে না। দাঁড়িয়ে আছেন কি ? মিটিং করুন গে যান।

ভদ্রলোক বললে—আপনার কথায় যেতে পাচ্ছি না। তাঁকে একবার ডেকে দিন, আমাদের ডিফিকালটি-টা এক্সপ্লেন করলে নিশ্চয়ই তিনি যেতে রাজী হবেন। সব ঠিকঠাক, অনেকে এসে গেছে—

—এ তাঁর রাজী-অরাজীর কথা নয়। এ আমার মত। দর্শন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো : দৃঢ়কণ্ঠে বললে—অমি তাঁর স্বামী, আমি চাই না যে তিনি কোনো পাব্‌লিক্ মিটিংএ বক্তৃতা দেন।

দর্শনের কথা শুনে ভদ্রলোকের মুখের চেহারা এক নিমেষে বদলে গেলো,

রুক্ষতা এলো অতিবিনয়ে স্নিগ্ধ হয়ে। দুহাত জোড় করে আর্দ্র কণ্ঠে সে বললে—নমস্কার! আমি আপনাকে চিনতাম না, মার্জনা করবেন। আমাকে তাঁরা গাড়ি দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন যে করে হোক ইন্দ্রাণী দেবীকে নিয়ে যেতে। তা, কি বলবো গিয়ে তাঁদের আমি? ইন্দ্রাণী দেবী অসুস্থ, তিনি আসতে চাইলেন না?

—না, তিনি অসুস্থ নন। গিয়ে বলবেন, তাঁর স্বামী তাঁকে যেতে দিলো না।

—কিন্তু পেপারটা যদি পাওয়া যেতো, আর কেউ আমরা তাঁর হয়ে পড়ে দিতাম।

—না, তা-ও সম্ভব নয়।

—আচ্ছা, তবে আসি। বলে ভদ্রলোক দর্শনকে আর একটা বিনীত নমস্কার করে রাস্তায় গাড়ি নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

অপরিচিত ভদ্রলোক পর্যন্ত তার এই স্বামিত্বকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে গেলো, কিন্তু গাড়িটা মোড় ঘুরতেই ইন্দ্রাণী, বহির্বেশসজ্জিতা বাগ্মী ইন্দ্রাণী, হুড়মুড় করে বারান্দায় ঢুকে পড়লো: প্রখরকণ্ঠে বললে—আমাকে তুমি যেতে দেবে না মানে?

করুণ করে ঢের দর্শন কথা কয়েছে, হাঁটুর উপর ভেঙে পড়ে করেছে সে অনেক মিনতি, ভিক্ষা চেয়ে-চেয়ে আত্মদৌর্বল্যকে দিয়েছে সে অনেক প্রশ্রয়; আজ সে পুরুষ, অনিবার্যরূপে আজ সে ইন্দ্রাণীর স্বামী। দর্শন চেয়ারে বসে গম্ভীর হয়ে বললে—যেতে দেবো না, আমার ইচ্ছে।

—এ আমি নতুন যাচ্ছি নাকি বক্তৃতা দিতে?

আলো না থাকলেও সূক্ষ্ম চোখে দর্শন বইটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো।

বললে—তা জানি না, কিন্তু আমার ইচ্ছেটা নতুন।

ইন্দ্রাণী চঞ্চল হয়ে বললে—যেতে না দেবার তোমার কারণ কি? এ কোনো রাজনৈতিক সভা নয়, নিতান্ত একটা সামাজিক ব্যাপার।

—কারণ যাই হোক, আমার মত নেই, তাই যথেষ্ট।

ইন্দ্রাণী বললে—তুমি মত দেবার কে? কে তোমার মতের জন্যে বসে আছে? যা সর্বতোভাবে ন্যায়, করণীয়, তার বিরুদ্ধে তোমার একটা মতের দাম কি?

দর্শন কঠিন হয়ে বললে—আমি তোমার স্বামী আমার মতের পক্ষে তাই যথেষ্ট দাম।

—থাক, ইন্দ্রাণী নিষ্ঠুর শ্লেষ করে উঠলো: এটা থিয়েটার নয়, এরকম পালোয়ানি করবার জায়গা উপন্যাসে। আমি যাবো।

—আমি তাদের ফিরিয়ে দিলাম, তবু তুমি যাবে ?

—হ্যাঁ। আমাকে না জিগ্‌গেস করে তাদের ফিরিয়ে দিয়ে তুমি অন্যায় করেছ। আজ সাত দিন ধরে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেছে, এখন শেষ সময় 'না' বললে চলবে কেন ? তারা আমায় কি ভাববে ?

ইন্দ্রাণীর এই তেজোদৃপ্ত ভঙ্গির কাছে নিজেকে দর্শনের কেমন অসহায় লাগতে লাগলো : কিন্তু, আমার বারণ করে দেওয়ার পরও যদি তুমি যাও, তাহলে আমার মুখ থাকে কোথায় ?

—আর না গেলেই আমার মুখ একেবারে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, না ? ইন্দ্রাণীর ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপতে লাগলো : খালি তোমারই একটা সম্মান আছে, আমার নেই ? আমি তাদের কথা দিয়েছি, আমি যাবো ! বলে সে ডাক দিলো : মদন ! মদন !

হাতের কাজ ফেলে মদন এলো ছুটে।

দর্শনের দিকে দৃক্‌পাত না করে ইন্দ্রাণী হুকুম দিলে ; শীগ্‌গীর একটা গাড়ি ডেকে নিয়ে আয়।

মদন গাড়ি ডাকতে চলে গেলে দর্শন গম্ভীর অথচ ব্যথিত মুখে বললে—এতো করে 'না' বলা সত্ত্বেও তুমি যাবে ? আমাকে তুমি মানবে না কিছুতেই ?

অলক্ষ্যে দর্শন যেন ক্রমে-ক্রমে জুড়িয়ে আসছে—যা তার স্বভাব। কিন্তু ইন্দ্রাণী এক ইঞ্চি মাথা নোয়ালো না, কাঁধের উপর ব্রোচটা ঠিক করতে করতে বললে—এই ক্ষেত্রে তোমাকে মানা তো অন্যায়কে মানা, অসংলগ্ন তুচ্ছ একটা খেয়ালকে প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র। বলে সে উঠোনের উপর নেমে এলো, রাস্তায় বারে-বারে উঁকি মারতে লাগলো গাড়ি নিয়ে মদন এসে পৌঁছুলো কিনা।

অসহিষ্ণু হয়ে সে আপন মনে বললে—অনেক দূর, এদিকে দেরিও হয়ে গেলো বেজায়, নইলে সোজা হেঁটেই চলে যেতাম ঠিক। মহা মুশকিলেই পড়া গেলো দেখছি। ওঁর মতামত শুনে আমায় ওঠ-বোস করতে হবে ! না গেলে আজ যা আমার অখ্যাতি হবে, তার তুলনায় কি ওঁর এই মুখভার ! ভদ্রলোকের আর কিছু না থাক, স্বামিত্বজ্ঞানটি ষোলো আনা !

মদন ঠিকমতো গাড়ি নিয়ে এলো অবিশ্যি। তাকে কোচবাক্সে চড়িয়ে নিয়ে ইন্দ্রাণী সটান বেড়িয়ে পড়লো। রাগের চেয়ে দর্শনের ব্যথাই হচ্ছিলো বেশি। সেই মুহূর্তে কি যে সে করতে পারে কিছু ঠিক করতে পারলো না। বেদনায় মুহ্যমান চোখে দূরায়মান গাড়িটার দিকে সে চেয়ে রইলো।

॥ ১৭ ॥

মিটিংএ ইন্দ্রাণীর রচনাটা প্রবলকণ্ঠে অভিনন্দিত হয়েছে, সেই আনন্দে দর্শনকে সে মনে মনে ক্ষমা করতে পেরেছিলো, ইচ্ছে ছিলো বাড়ি ফিরে তার সঙ্গে আর স্বামিত্বের সম্মানজনক দূরত্ব না রেখে একেবারে বন্ধুর মতোই অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবে। কিন্তু রাত করে বাড়ি ফিরে এ-ঘর ও-ঘর করে কোথাও সে দর্শনের দেখা পেলো না। তার রচনা ও রচনা-পড়া শুনে জনতার চারদিক থেকে মাঝে-মাঝে কি সব সপ্রশংস উক্তি উচ্ছসিত হচ্ছিলো দর্শনের কাছে তার একটা আন্‌কোরা, টাটকা রিপোর্ট দিতে না পেরে ইন্দ্রাণীর খানিক রাগই হচ্ছিলো বলতে হবে। এই বুঝি তার বেড়াতে যাবার সময়? ইন্দ্রাণীর ফিরতে দেরি হচ্ছে বলে পথে এগিয়ে দেখতে গেছে নাকি? ইন্দ্রাণীর ফিরতে দেরি হলে তার সপ্তভুবন তো একেবারে রসাতলে যায়! নিজেকে ব্যর্থ ভেবে ফ্যাশান করে অভিমানের একটা মেয়েলি অভিনয় করতে হয়তো অন্ধকারে একটু পাইচারি করতে গেছে। খিদের সময় হলেই বাছাধন আবার সুড়সুড় করে বাড়ি ফিরে আসবেন।

আলো জেলে একা ঘরে ইন্দ্রাণী কখনো চুপ করে বসে, কখনো বা ছট্‌ফট্ করে এ-দিক ও-দিক হেঁটে সময় কাটাতে লাগলো। দশটা প্রায় বাজে—মফঃস্বলের শহরের পক্ষে রাত্রি এখন প্রায় তিন প্রহর, এখনো দর্শনের দেখা নেই। আজ তাকে ফেলে কিছুতেই ইন্দ্রাণী একা ভাতের থালা নিয়ে বসতে পারছে না। জানালার বাইরে চেয়ে দেখলো আগাগোড়া জমাট অন্ধকার, প্রায় একমাইল দূরে-দূরে মিটমিট করছে ল্যাম্পপোস্ট, কোথাও নেই এক ফোঁটা শব্দ, কারো ফিরে আসবার অস্ফুট স্থচনা। অন্ধকার যে কতো বড়ো ভয়ের জিনিস তা যেন আজ দর্শনের অনুপস্থিতিতে বেশি করে প্রতিভাত হচ্ছে। ইন্দ্রাণী কি করবে, অন্ধকারে যেন সে কোনো কিছুর কিনারা করতে পারলো না। লণ্ঠনটা নিয়ে চলে এলো সে দর্শনের ঘরে; ক্ষিপ্র, স্নিগ্ধ হাতে সে তার জিনিসপত্র ঘাঁটতে বসলো। কোথাও যে সে চলে গেছে, কোথাও নেই তার এতটুকু সঙ্কেত: যেখানে যতটুকু বিশৃঙ্খলা, যতোটুকু পারিপাট্য—সব আগেকার মতো তেমনি—কোনো আকস্মিকতায় নেই কিছুমাত্র বিস্মিত হবার হেতু। স্তূপাকার করে পড়ে আছে ময়লা জামা-কাপড়, এখানে কতোগুলি পোড়া সিগারেটের টুকরো, ওপাশে ছেঁড়া কাগজে-বইয়ে একরাজ্যের আবর্জনা, মশারির দুই কোণের দড়ি-দুটো পড়েছে খসে, গত রাতের বিছানাটা এখনো তোলা হয়নি। জিনিস-পত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে ঘরের চেহারা দেখে তার চোখ দুটো হঠাৎ ব্যথায় যেন টনটন করে উঠলো। ডাকলো: মদন।

মদনরা এখনো খেতে পায়নি, তাই মুখ কাঁচুমাচু করে দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে ভীরু গলায় সে জিগ্‌গেস করলে—কেন মাঠান্?

ইন্দ্রাণী তার মুখের উপর যেন একগাদা বারুদ ছুঁড়ে মারলো: বাবুর ঘরটা এমন একটা আঁস্তাকুড় করে রেখেছিস, তোকে মাইনে দেওয়া হয় কেন জানতে পাই? সমস্ত দিন ধরে বাসি বিছানা পড়ে, ঘরে জমে আছে একহাঁটু ধুলো—এ সব কে দেখে জিগ্‌গেস করি?

মদন বিনীত হয়ে বললে—আমি কি করবো মাঠান্, এঘরের কিছু কাজ করতে গেলেই বাবু আমাকে তেড়ে আসেন। বলেন: আমার ঘরের কোনো জিনিসে তুই হাত দিতে পারবি না। থাক আমার বিছানা-পত্তর অমন ছত্র-খান হয়ে। তা, কাজ করতে না দিলে আমি কি করবো বলো, মাঠান্।

ইন্দ্রাণীর মুখ বিষাদে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে এলো। চোখ নামিয়ে এটা-ওটা ঝেড়ে-পুঁছে তুলে রাখতে-রাখতে বললে—থাক, কাজ না করবার একটা ছুতো পেলেই তো তোদের পোয়া বারো। যা, তোরা দুজনে খেয়ে নে গে। আমাদের দুজনের ভাত একসঙ্গে করে ঠাকুরকে ঘরে দিয়ে যেতে বল। উনি এলে আমি আলাদা করে বেড়ে দিতে পারবো।

দরজা থেকে সরে যেতে-যেতে মদন বললে—বাবু তো এখনো এলেন না, মাঠান্।

ইন্দ্রাণী যেন হঠাৎ চমকে উঠলো। বললে—কেন আসছেন না কে জানে? বাবু কোথায় যেতে পারেন কিছু বলতে পারিস, মদন?

মদন বললে—কি করে জানবো, মাঠান্? আমি তো সেই তোমার সঙ্গে গেলাম।

—কিন্তু ঠাকুর কিছু বলতে পারে? তাকে একবার জিগগেস্ কর তো গিয়ে, বেরুবার সময় তাকে কিছু বলে গেছেন কিনা।

—তাকে জিগ্‌গেস করলাম, মাঠান্। সে কিছুই জানে না বললে।

—আচ্ছা, যা। দশটা কখন বেজে গেছে। মিছিমিছি তোরা কেন উপোস করে থাকবি?

ইন্দ্রাণী সযত্নে ঘরের সংস্কার করতে লাগলো, নতুন করে পাতলো বিছানা, গুছিয়ে দিলো টেবিলটা, মেঝেতে অণুতম ধূলিকণাটি পর্যন্ত থাকতে দিলো না। আজকে দর্শনের এই অনুপস্থিতি যেন তাকে অনুচ্চারিত, গভীর ধ্বনিতে ডাক দিয়ে এনেছে। আরো কতোক্ষণ কাটলো। মদন আর ঠাকুর খাওয়া-দাওয়া সেরে বারান্দায় ঘুমোবার যোগাড় করছে। দর্শনের তবু দেখা নেই।

দুশ্চিন্তায় শ্রান্ত হয়ে-হয়ে শেষকালে ইন্দ্রাণী দর্শনের বিছানায়ই গা ঢেলে শুয়ে পড়লো। থেকে-থেকে একটু তন্দ্রা আসছে, আর অমনি মনে হচ্ছে এই বুঝি কার পায়ের শব্দে তার ঘুম গেলো ভেঙে। এমনি ঝিমুতে ঝিমুতে কখন তার সত্যি-সত্যিই ঘুম এসে যাবে বা। দর্শনের চোখে প্রথম বিস্ময়ের ঘোর সে হয়তো আর দেখতে পাবে না। বিশ্বাসের অতীত সেই বিস্ময়ঃ তার ঘর-দোর আয়নার মতো ঝকঝক করছে, আর চারদিকের এই ফেনায়িত পরিচ্ছন্নতার মাঝে, ঠিক তার বিছানার উপর শুয়ে কিনা ইন্দ্রাণী, লজ্জায় লীলায়িত, প্রতীক্ষায় ভঙ্গুর। এমন একটা দৃশ্য একা সে দর্শনকে দেখতে দেবে, আর সে নিজে থাকবে ঘুমিয়ে, এ কখনো হতে পারে?

না, এগারোটাও ক্রমশ বাজতে চললো, কবিত্ব করবার আর সময় নেই। কিন্তু রাত্রিকালে ইন্দ্রাণী কোথায় তার খোঁজ করতে পাঠাবে? এখানে এসে অবধি কোথাও সে আড্ডা দেয় না, তার পরিচিত কোনো বাড়ি নেই, বন্ধু নেই—আছে বলে ইন্দ্রাণী অন্তত জানে না—কোথায় তার যাবার সম্ভাবনা? ইন্দ্রাণী চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলো। তবে সে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেছে নাকি? কোথায়ই বা সে যাবে? এ সংসারে ইন্দ্রাণী ছাড়া তার আর আশ্রয় কোথায়?

সারা রাত শুয়ে বসে জানালা দিয়ে চেয়ে থেকে ক্ষণে-ক্ষণে ভূত দেখে ইন্দ্রাণী কোনা রকমে অন্ধকার সাঁতরে ভোরের কিনারে পার হয়ে এলো। কিন্তু দিনের আলোতেও দর্শনের টিকি দেখা গেলো না।

ইন্দ্রাণী তার আপন মনে নেয়ে-খেয়ে স্কুল করতে চলে গেলো। ঠাকুর চাকরকে বলে গেলোঃ যদি বাবু এর মধ্যে ফেরেন, আমাকে ইস্কুলে গিয়ে চুপি-চুপি খবর দিয়ে আসিস।

স্কুলে গিয়ে রোজকার মতো ইন্দ্রাণী কাজ করে চললো। মনে-মনে যে সে এতো বড়ো একটা উদ্বেগ পুষে বেড়াচ্ছে মুখে নেই তার এতোটুকু চিহ্ন। এতো বড়ো একটা দুঃসংবাদ সে তার সখীশিক্ষয়িত্রীদের কাছে পর্যন্ত ভাঙলো না। যা হয়েছে, যেন ভালোই হয়েছে। এখানে চাকরি করতে আসা অবধি এই যেন সে প্রতি মুহূর্তে সমস্ত দেহ মন দিয়ে কামনা করে আসছিলো।

স্কুল করে বাড়ি ফিরে এসে তার আর সন্দেহ রইলো না, কালকের ঐ ঝগড়ার জন্যেই তার স্বামী-দেবতাটি বিবাগী হয়েছেন। এতোদিনে তার স্বামীত্বে লেগেছে ঘা, এতোদিনে বুঝেছে সে তার অপৌরুষের জালা। স্বামীত্বের নমুনা কি চমৎকার! বশীকরণ নয়, ত্যাগ; ভোগ নয়, বিসর্জন। শেষকালে একেবারে বানপ্রস্থ। এই স্বামীর জন্যে আবার তার এতো মায়া!

সত্যি-সত্যি সে যেন আর ফিরে না আসে, কোনোদিন আর ফিরে না আসে তার কাছে। ইন্দ্রাণী তার সংসারের পাট তুলে দিলো, চলে এলো সে মিসট্রেসদের কোয়ার্টারে। তবু যদি দর্শন মা'র কোলে বিকেলের খেলা থেকে ফিরে আসা ছেলের মতো তার কাছে এসে ফের আশ্রয় চায়, সে তাকে দেবে না সে-আশ্রয়, তাকে কায়মনো-বাক্যে অস্বীকার করবে, তার স্বামীত্বকে দেবে ধূলিসাৎ করে। সে এখন মুক্ত, ঝড়ের মতো জোরে সে এখন ঝাপটা দিয়ে চলবে, মানবে না সে আর কোনো সঙ্কীর্ণ জীবন-প্রণালী, বইবে না আর সে কারুর মতামতের আবর্জনা। এই সে বেশ থাকবে, আপনাতে সম্পূর্ণ, আপনাতে স্বপ্রকাশ। বয়ে গেছে তার আর দর্শনের খোঁজ করে বেড়াতে। যদি সে সত্যিই যাবার মন করে গিয়ে থাকে, যাক—আর যেন কোনদিন না এখানে ফিরে আসে। ইন্দ্রাণী বাঁচলো।

অঙ্কের মিসট্রেস্ চারুলতা চিমটি কেটে বললে—নীড় ভেঙে গেলো দেখি। ব্যাপার কি? কর্তাঠাকুর গেলেন কোথায়?

সহজ সুরে ইন্দ্রাণী বললে—কি-এক ধুয়ো ধরেছিলো, পত্নীরত্নং পরিত্যাজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি। জোর করে ঠেলেঠুলে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলাম। কাঁহাতক আর বৌয়ের কাঁধে চড়ে খাবে, মাঠে এবার একটু চরে খেতে শিখুক।

চারুলতা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো: রীতিমতো লজ্জা করা উচিত।

—নিশ্চয়, পুরুষমানুষের তো লজ্জা নেই, আছে কেবল বিজাতীয় রাগ।

চারুলতা ঠোঁটের পাশে বাঁ গালের খানিকটা মাংস একটু কুঁচকে জিগ্‌গেস করলে: তুই বিয়ে করতে গেলি কি দেখে?

নিচের ঠোঁটটা উল্‌টে ইন্দ্রাণী বললে—কি জানি কি দেখে! আমার কপাল দেখে আর কি!

—আমি ভেবে সত্যিই অবাক হচ্ছি ইন্দ্রাণী, তোর মতো একটা রত্ন কি বলে এমন একটা—এক পয়সা কামাবার যার মুরোদ নেই—

—হ্যাঁ, ইন্দ্রাণী মুচকে একটু হাসলো: কি যে তখন পাগলামি পেয়েছিলো কে জানে। ভাবলাম বিয়ে করে না জানি কি স্বর্গসুখই সম্ভোগ করা যাবে।

চারুলতা হাত ঘুরিয়ে বললে—সুখের মধ্যে তো এই কে-না-কে-এক সোয়ামীর জন্যে চাকরি করে মরা।

—আর বলিসনে। কোথায় নিজে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আরাম করবো, না, এই দুর্ভোগ।

—ভদ্রলোক শুনেছি এম. এ.?

—আমিও ভাই, তথৈবচ। শুধু শুনেইছি, গেজেটও দেখিনি, ডিপ্লোমাও দেখিনি। লোকে বলে, শুনেছি হিস্ট্রিতে নাকি ফাস্টো কেলাশ ফাস্টো।

—বলিস কি? চেহারাটাও তো দেখতে প্রায় ভদ্রলোক!

—হবে না? ইন্দ্রাণী হেসে উঠলো: এতো খেলে আর ঘুমুলে কারু চেহারা ভদ্রলোক না হয়ে পারে? ভাবনা করবার তো দুনিয়ায় কিছু নেই।

চারুলতা মুখ বেঁকিয়ে বললে—তবু নিজে সে খাটবে না? তোকে পেয়েছে বেশ।

—খাটবে কোন্ দুঃখে? মাগনা এমন স্ত্রী পেয়েছে, তার তো সোনায় সোহাগা। স্ত্রীতে স্ত্রী, আবার টাকা রোজগারে শিক্ষয়িত্রী।

চারুলতা খেঁকিয়ে উঠলো: তুইই বা কেন অমন অকর্মণ্যের জন্যে মিছিমিছি মরতে যাবি?

—ওর জন্যে না ঘেঁচু। ইন্দ্রাণী গাম্ভীর্যের সঙ্গে কৌতুক মিশিয়ে বললে—আমার নিজের জন্যে খাটচি, নিজের পেটটা তো চালাতে হবে। কি না-জানি বলে পাড়াগেঁয়ের মেয়েরা—গতরের নাম পরশমণি। আমার তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, ওর জন্যে চাকরি করতে বসবো! যাক না যেখানে খুশি, গেলেই তো হাঁপ ছেড়ে বাঁচি বাপু। ফিরে আসবে আবার? অহাহা, তার জন্যে হাতে মোয়া নিয়ে বসে আছি না?

॥ ১৮ ॥

কলকাতায়, শ্বশুরবাড়িতে, স্বামীর এই তিরোধানের খবর দিয়ে ইন্দ্রাণী একটা চিঠি লিখলে পারে, এই দুঃসংবাদটা সামাজিক সম্পর্কের খাতিরেও তার একবার জানানো উচিত হয়তো—কিন্তু কথাটা মনে হতেই তার কেমন হাসি পেতে লাগলো। দর্শন যে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে—ছোটো ছেলে যেমন মা'র উপর রাগ করে বেরিয়ে যায়—এ খবরটা চারুলতাকে জানাতে পর্যন্ত তার লজ্জা করেছিলো। স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব খাটাতে গিয়ে স্ত্রীকেই মানুষ বাড়ির বার করে দেয়; খিড়কির দোর দিয়ে নিজেই যায় চুপিচুপি বেরিয়ে—এমন লজ্জার কথা মহাভারতের কোথাও কিন্তু লেখা নেই। আর, দাম্পত্য-কলহ বা অপ্রণয়ের ফলে যারা সব ঘর ছেড়েছে শোনা যায়, সবাই তো মেয়ে, একটা পুরুষ শেষকালে মেয়ের মতো কুলত্যাগ করলো, এমন কথা কালি-কলম দিয়ে কারু কাছে লিখতেও তার মাথা কাটা যাচ্ছে।

কিছু লিখতে হলো না, যা ভেবেছিলো তাই। নিভা চিঠি লিখে

জানিয়েছে, দর্শন সশরীরে একদিন বাড়ি এসে হাজির, একেবারে খালি-হাতে এক-কাপড়ে। কেউ কিছু জিগ্‌গেস করলে কথা বলে না, চেহারা দেখলে মনে হয় দুরবস্থার একশেষ। ব্যাপার কি, ইন্দ্রাণী ?

ইন্দ্রাণী গভীর একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তক্ষুনি কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসলো। অত্যন্ত দ্রুত, টানা অক্ষরে—যাতে স্পষ্ট মনে হয় সে নিদারুণ চটেছে—লিখলো : তাকে আমি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি, মেজদি, পুরুষরা যাকে ত্যাগ করা বলে। আইনে এ ক্ষেত্রে কি বিধান আছে জানি না, আমি মাস-মাস তাকে কিছু-কিছু দেবো না হয় খোরপোশ বাবদ। তাকে বলো, দরকার হলে আমি আর একটা বিয়েও করতে পারি যে কোনো মুহূর্তে। আমি সকল দায় থেকে খালাস হয়ে গেছি একেবারে।

যা ভেবেছিলাম তাই। পায়রার মতো এখানে ওখানে খুঁটে-খুঁটে ক্ষুদ-কুঁড়ো খেয়ে আবার সে ফোকরে গিয়ে ঢুকেছে, মা'র আঁচলের ছায়ায়, দাদাদের করুণার জলসত্রে। আবার সেই সংসারের মাঝে সঙ্কুচিত কৃপাকুণ্ঠিত হয়ে থাকবার তার দারিদ্রতা। ইন্দ্রাণীর সমস্ত শরীর রি-রি করতে লাগলো। এতো বড়ো একটা প্রভু হয়ে সে কিনা আবার কাঁধে নিলো ভিক্ষার ঝুলি। ভাবতেও ইন্দ্রাণী মরে যাচ্ছে।

নিভাকে সেই চিঠি লেখার পর ও-দিক থেকে আর উচ্চবাচ্য নেই। ইন্দ্রাণীর এই উদ্ধত হঠকারিতায় হয়তো গেছে ছিঁড়ে সেই রঙিন আবহাওয়া যা সে এতোদিন ধরে রচনা করে রেখেছিলো তার টাকার রশ্মিজালে। তার এই কুৎসিত টাকার অহঙ্কার—যাতে সে তার স্বামীকে পর্যন্ত অস্বীকার করলো। এতোটা কেউ আর সহ্য করতে পারলো না।

তাতে বয়ে গেছে ইন্দ্রাণীর। চোটে সে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলো, এমন কি আজকাল রাজনীতি ঘেঁষে বক্তৃতা। হিন্দুসমাজে বিপ্লব আনবার জন্যে ছোটোখাটো একটা খাণ্ডবদাহন। বিবাহ হচ্ছে জীবনের একটা কলঙ্ক, তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পক্ষে একটা যন্ত্রণাদায়ক অন্তরায়, একটা মাত্র প্রচলিত কুসংস্কার—তা নিয়ে শুরু হলো যতো নিদারুণ অগ্ন্যুৎপাত। সমস্ত সত্যের চেয়ে বড়ো হচ্ছে যার-যার নিজের অস্তিত্ব, সমস্ত দায়িত্বের চেয়ে বড়ো হচ্ছে নিজের বাঁচবার দায়িত্ব, নিজের বাড়বার অধিকার, তার কাছে তুচ্ছ স্বামী, তুচ্ছ যতো দেশাচার। ইন্দ্রাণী সারা শহর তোলপাড় করে ছাড়লো, খবরের কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতাদের বাড়ি গিয়ে-গিয়ে নিজে অনুরোধ করলে : খবরগুলো খুব জমকালো করে কাগজে বার করবেন।

তাতেও ইন্দ্রাণীর ক্ষান্তি নেই। মাসিক কাগজে—ইংরিজিতে-বাংলায়, সে নিদারুণ নৃশংস প্রবন্ধ লিখতে লাগলো। এমন সব তাদের তেজস্কর আইডিয়া যে তা নিয়ে গল্প লিখতে গেলে যুবক-যুবতীর চরিত্র তাতে দূষিত হচ্ছে বলে দস্তুরমতো তার সাজা হয়ে যেতো। প্রবন্ধে শারীরিক কোনো নির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত থাকে না বলেই বাঁচোয়া। চারিদিক ঢি-ঢি পড়ে গেলো। শেষে গোপনে-গোপনে এমন পর্যন্ত কথা উঠছে এখন, এমন শিক্ষয়িত্রীকে স্কুলে বহাল রাখা আর ঠিক হবে কিনা।

ইন্দ্রাণী মুচকে একটুখানি হাসলো মাত্র। বললে—ওরে বাবা, চাকরি যাবে কি! এ সব কাজে এখন থেকে তবে ঢিল দিতে হয়, কি বল, চারু? চাকরি গেলে খাওয়াবে কে?

চারুলতা বললে—দিন কতক লাফালাফি করে তো এই দশা! স্বামী তো গেলোই,চাকরিটিও প্রায় যায়।

—স্বামী গেছে—গেছে, চাকরি যাবে কি? আজই গিয়ে সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে হয়, নাক কান মলে একটা মুচলেকা সই করে দিয়ে আসি: বলে ইন্দ্রাণী হাসলো।

--হ্যাঁ, আমাদের কি ও সব মানায়? চারুলতা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো: মাথার উপর আমাদের কেউ নেই, স্বাধীন হয়েছি বলে তো আর পুরুষ হয়ে যেতে পারিনি। যতোই কেননা তড়পাই, সেই মেয়ে—সেই মেয়েই আমাদের থাকতে হবে চিরকাল।

—না রে? মেয়ে, সেই মেয়েই আমাদের থাকতে হবে? বলে চারুলতাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে ইন্দ্রাণী খিলখিল করে হেসে উঠলো।

মাঝে-মাঝে কথাটা মনে হলেও, গোড়ার ক-মাস দর্শনকে ইন্দ্রাণী টাকা পাঠায়নি—যাকে সে আখ্যা দিয়েছিলো দর্শনের ন্যায্য মাসোহারা বলে, ক্রিমিন্যাল প্রসিডিয়োর কোড্-এর ৪৮৮ ধারা অনুসারে বিতাড়িত স্ত্রী যা আদালতের মারফত আদায় করে থাকে। পাঠায়নি, কেনই বা পাঠাবে, তার সঙ্গে আর তার কিসের সম্পর্ক? কিন্তু ইন্দ্রাণী না পাঠালে তো দর্শনের ভারি বয়ে গেলো। বিপদে আপদে তার মা আছেন, ফুল ব্রাদাররা আছে, রক্তের সম্পর্কে তাঁরাই তো তার বেশি কাছে, বেশি আপনার। তাদের কাছ থেকে করুণা কুড়োনো বরং সম্মানের, সেখানে দুঃখ থাকলেও লজ্জা নেই।

নিষ্ঠুর হয়ে যখন কিছু ফল হলো না, তখন ইন্দ্রাণীও গেলো করুণা দেখাতে। তার সঙ্গে তারও রক্তের একটা গভীরতর সম্পর্ক একদিন উচ্চারিত হয়েছিলো

বৈকি, তারই অজুহাতে সে-ই বা কেন একটু দয়া করবে না? দুর্বলের প্রতি সমবেদনা দেখাবার মতো বিলাসিতা মানুষের আর কি হতে পারে! এই সুখ ভোগ করার এই তো তার সময়।

কলকাতায় শ্বশুরবাড়ির ঠিকানায় ইন্দ্রাণী দর্শনের নামে পনেরো টাকা মনি-অর্ডার করলে—মাত্র পনেরো টাকা, কেননা তার যা মাইনে, তাতে মেইনটেনান্স বাবদ দর্শন তার বেশি ডিক্রি পেতে পারতো না, যদি অবিশ্যি দর্শন হতো পরিত্যক্ত স্ত্রী, আর ইন্দ্রাণী হতো দুর্জয় স্বামী। (ইন্দ্রাণী মনে-মনে প্রচুর হেসে নিলো) আর কুপনে লিখে দিলো স্পষ্ট ইংরাজিতে: তোমার নভেম্বর মাসের মাসোহারা।

দাদাদের কাছে কতো আর হাত পাতবে, বিধবা মা'র প্যাটরায় কতো আর রসদ আছে, বড়োজোর একটা টিউশনি যোগাড় করতে পারে, কিন্তু এই ডিপ্রেশানের দিনে কতোই বা তার দাম—টাকা কটা তার ভীষণ কাজে লাগবে নিশ্চয়। একেবারে আকাশফুটো পয়সা—ইজিপ্টের মরুভূমিতে ম্যান্না। দর্শনের নিশ্চয় তা হাতে করে কপালে এনে ঠেকানো উচিত। এই স্যালারি কাট্-এর দিনে জলজ্যান্ত পনেরোটা টাকাই বা কে কাকে গায়ে পড়ে দেয় শুনি—কোর্টের হুকুমে মাইনের উপর নিতান্ত একটা অ্যাটাচ্‌মেন্ট না হলে! এটুকু কৃতজ্ঞ হবার ভদ্রতা সে দর্শনের কাছ থেকে আশা করতে পারে বোধহয়, অন্তত যে এতোগুলি দিন তার সংস্পর্শে ছিলো, ছিলো তার রক্ষণাবেক্ষণে।

কিন্তু এ কি ভয়ানক কাণ্ড! ইন্দ্রাণী মরে গেলেও যে তা বিশ্বাস করতে পারতো না।

প্রায় মাসখানেক বাদে সেই মনিঅর্ডার ফেরত এলো। দর্শন কলকাতায় নেই, মনিঅর্ডারটা ঠিকানা কেটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো পাটনায় আবু-আস্‌লেনে, সেখানেই দর্শন আছে, নিঃসন্দেহ। বড়ো-বড়ো অক্ষরে লাল কালিতে ফর্মটার উপর লেখা—রিফিউস্‌ড।

প্রবল, তীব্র আলোর ঝাপটাই দুই চোখ ইন্দ্রাণীর ধাঁধিয়ে গেলো। ইন্দ্রাণীকে সে না চাইতে পারে, কিন্তু টাকা সে হাত পেতে নেবে না, তার জীবনে এমন দুর্ঘটনা কি ঘটতে পারে! বিদেশে পাটনায় সে আছে, অথচ তার টাকার দরকার নেই, ব্যাপার কি!

ঐ ঠিকানায় একটা সে চিঠি লিখবে নাকি—তার জীবনের প্রথম চিঠি! কথাটা ভাবতেই তার গা-ময় চঞ্চল রক্তের নদীতে ঝিরঝির করে আবেগের হাওয়া দিলো। এতোদিন তাদের এই সান্নিধ্যের মাঝে শারীরিক একটা ব্যবধান থাকলেও ছিলো না স্থানের ব্যবধান—আজকে দেখা গেলো স্থানের সঙ্গে-সঙ্গে শরীরের বিচ্ছেদটাও

অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে পড়েছে। তার জীবনের পটভূমি যেন অপসৃত হয়ে গেছে, তার জীবনের পরিপ্রেক্ষিত গেছে বদলে—একটা চিঠি তাকে লিখলে হয়। কিন্তু চিঠি লিখতে গেলেই—আজ তার মন সানন্দ সন্দেহে এমন ঘন-ঘন দুলে উঠছে—হয়তো শব্দের আবহাওয়ায় ঘনীভূত হয়ে উঠবে আবেগের কুয়াশা! দু-দুবার চিঠি লিখতে সে বসলোও, কিন্তু এই তার প্রথম চিঠি, দর্শন কলকাতায় না থেকে পাটনায় (যতদূর ইন্দ্রাণী জানে সেখানে তার কোনো বিশেষ আত্মীয় নেই), যতোই মনে এই মোহ সঞ্চারিত হচ্ছে, ততোই তার চিঠিতে এসে যাচ্ছে অস্ফুট একটি কবিতার দুর্বলতা। চিঠি লেখা আর হলো না, কোনো পুরুষের কাছে চিঠিতে নামমাত্র সেন্টিমেন্ট দেখাতেও তার ভীষণ লজ্জা করতে লাগলো।

—মুচ্‌লেকা সই করবে না হাতি! ইন্দ্রাণী হাঁপাতে-হাঁপাতে চারুলতার ঘরে এসে হাজির: আমার বয়ে গেছে এই চাকরি করতে!

চারুলতা অবাক হয়ে জিগ্‌গেস করলে: সেক্রেটারি শেষকালে তোকে কাগজে সই করে দিতে বললেন?

—প্রায় তাই। বললে কিনা মুখে অন্তত স্বীকার করতে হবে যে কোনোদিন আর পলিটিক্স্ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবো না। মুখে অন্তত প্রকাশ করতে হবে যে আমি আমার এতোদিনের আচরণের জন্যে দুঃখিত। তাহলেই নাকি চাকরিটি আমার বজায় থাকে।

—তুই কি বললি?

—বললাম, থাকুক। ভবিষ্যতে আমি কি করবো না করবো তা আমি নিজেই জানি নাকি? আমার মুখের কথায় আমার নিজের পর্যন্ত বিশ্বাস নেই।

—তার মানে? চারুলতা চমকে উঠলো।

—তার মানে চাকরিটা হয়তো গেলো।

—চাকরিটা গেলো? ইন্দ্রাণীর একটা হাত ধরে চারুলতা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে: কি বলছিস, ইন্দ্রাণী? সামান্য একটা মুখের কথার জন্যে এমন একটা চাকরি কখনো যেতে পারে, যখন সামান্য একটা মুখের কথায় আবার তা ফিরিয়ে আনা যায়? তুই কি পাগল হলি নাকি?

ইন্দ্রাণী শরীরে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বললে—অমন একটা চাকরি গেলে আমার কি হয়? এর চেয়ে কতো ভালো চাকরি আমি যোগাড় করতে পারবো ইচ্ছা করলে।

—হ্যাঁ, এই বাজারে তোর জন্যে চাকরি পড়ে আছে পথে-ঘাটে। চারুলতা

চোখ মুখ তীক্ষ্ণ করে তাকে সতর্ক করলে : মাথার উপর তোর কেউ নেই ইন্দ্রাণী, মারা পড়বি।

ইন্দ্রাণী তরলকণ্ঠে বললে—আমার আবার চাকরির অভাব! চাকরি আমার হাতের মুঠোয়। যে কোনো মুহূর্তে আমি আবার চাকরিতে গিয়ে বসতে পারি। আগে শুধু রূপ আর বিদ্যে ছিলো, এখন আবার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা হয়েছে! আমার চাকরি হবে না তো হবে কার! বলে ইন্দ্রাণী হাসির ঘায়ে টুকরো-টুকরো হয়ে পড়লো, দম নিয়ে বললে—মাথার উপর কেউ নেই বলেই তো এমন সাধা চাকরিটা অনায়াসে ছাড়তে পারলাম। নইলে চাকরি করে আজও পতিদেবতাকে খাওয়াতে হলেই হয়েছিলো আর-কি। মুক্তির এমন একটা তীব্রতা পর্যন্ত অনুভব করতে পারতাম না। ইন্দ্রাণী চারুলতার পিঠ ঠুকে দিলো : বিয়ে করিসনি বেঁচে গেছিস চারু। যখন যা খুশি করা যায়, মাথার উপর কেউ নেই যে সাধ করে এসে বাধা দেবে। আমিও অনেক চক্রান্ত করে এই তোদের অবস্থায় এসে পড়েছি। বলে তার আবার আর এক দমক হাসির শিলাবৃষ্টি!

চারুলতা তো এ কথা ভেবেই পেলো না এমন দুর্দিনে এমন একটা মোটা চাকরি হারিয়ে কি করে কোনো লোক হাসিতে এমন উথলে উঠতে পারে। তারপর যে মেয়ের উপর সমস্ত আশ্রয়ের দরজা সজোরে বন্ধ হয়ে গেছে। তবু বোঝা যেতো যদি নতুন করে বিয়ে হতো ইন্দ্রাণীর কোনো টাকাতে মাড়োয়ারির সঙ্গে। যা একখানা তার বিয়ে হয়েছিলো, তাতেও তো দিয়েছে সে ইস্তফা—তার আবার কিনা মুখের কথার বিলাসিতা করা! পরে না পস্তায় তো কি বলেছি।

বিজ্ঞের মতো মুখ করে চারুলতা জিগ্‌গেস করলে : এখন কি করবি?

ইন্দ্রাণী হেসে বললে—আজ আর ইস্কুলে না গিয়ে সারাদিন বসে ভাববো কি করা যায়!

—কি করা যায়, সারা জন্ম বসেই ভাবতে হবে। এমন একটা চাকরি কেউ ছাড়ে?

স্কুলের ছুটির পর চারুলতা ছুটতে-ছুটতে ইন্দ্রাণীর কাছে এসে হাজির। নিবিষ্ট মনে ইন্দ্রাণী তখন ঘরের মেঝের উপর তার কাপড়-জামা ছড়িয়ে পরিপাটি করে বাক্স গুছোচ্ছে।

খুশিতে চারুলতা একেবারে ভেঙে পড়লো : তোর চাকরি যায়নি তো ইন্দ্রাণী। কি বলছিলি তখন তুই যা-তা?

ইন্দ্রাণী ভুরু নাচিয়ে বললে—যায়নি নাকি?

—কখখনো যায়নি। কিসের মুচ্‌লেকা সই, কিসের কি আন্‌ডারটেকিং। তোর

চাকরি সম্বন্ধে এ নিয়ে কোনো কথাই নাকি হয়নি। খালি সেক্রেটারি তোকে ডেকে জিগ্‌গেস করেছিলেন, পলেটিক্যাল বক্তৃতা দেওয়ার রিস্‌ক আছে, আপনার কি এ নিয়ে মাতামাতি করা ঠিক হবে? এতে চাকরি থাকা না থাকার তো কোনোই কথা ছিল না!

ইন্দ্রাণী একটার পর একটা শাড়ি ব্লাউজ ভাঁজ করে রাখতে-রাখতে বললে—তুই এত রাজ্যের কথা জানলি কি করে, চারু?

—বা, আজ হেডমিস্‌ট্রেসের ঘরে যে এই নিয়ে তুমুল কাণ্ড। তোর চাকরি সম্বন্ধে কোনো কথাই ওঠেনি, সেক্রেটারি নাকি কিছুতেই কারুর কাছ থেকে মুচ্‌লেকা দাবি করতে পারেন না। তুইই বল, তার বেশি তিনি তোকে কিছু বলেছেন?

ইন্দ্রাণী স্যুটকেসের ডালাটা বন্ধ করে চাবি ঘুরোতে-ঘুরোতে বললে—না, তা কিছু বলেনি বটে। তবে তুইই বল, আমি বক্তৃতা দেবো কি না-দেবো, রিস্‌ক আছে কি না-আছে, তা নিয়ে আমাকে উপদেশ দেবারই বা তিনি কে! সেই তো যথেষ্ট অপমান। আমার ভালো-মন্দ আমি নিজে বুঝবো, তাতে কে-না-কে সেক্রেটারির কি মাথা-ব্যথা?

—বা, চারুলতা ঝাঁজিয়ে উঠলো: বললেনই বা, ভুল করে না-হয় তোর ভালোর জন্যেই বলেছেন, তাঁর উদ্দেশ্য তো ছিল না তোকে অপমান করবেন? তাতে চাকরি যাওয়ার কথা ওঠে কি করে?

—ইন্দ্রাণী বসলো এবার তার বিছানাটা গুছোতে। মৃদু-মৃদু হেসে বললে—চাকরি সব সময়ে যায়, এমন কোনা কথা নেই, চারু, চাকরি মাঝে মাঝে লোকে ছাড়েও।

চারুলতা স্তম্ভিত হয়ে গেলো। বললে—এই চাকরিটা তা হলে তুই ছাড়লি?

—মানে তাই দাঁড়াচ্ছে দেখতে পাচ্ছি।

চারুলতা বললে—কিন্তু ধরা-ছোঁয়া যায় এমন একটা কোনো কারণ চাই তো? এই একটা তোকে অপমান করা হল নাকি?

ইন্দ্রাণী লঘু সুরে বললে—কিসে কার অপমান হয় বোঝা কঠিন। সকলের চামড়া সমান পুরু নয়, চারু!

—আহাহা, আর ঢঙের কথা বলিসনি, কিন্তু নিশ্চয়ই তোর অন্য কোনো মতলব আছে। চারুলতা নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে তার কানের কাছে মুখ এনে বললে—অন্য কোথাও চাকরি পেয়েছিস বুঝি?

ইন্দ্রাণী এলো আঁচলে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—দেখি। কলকাতায় তো প্রথম যাই।

চারুলতা খুশিতে যেন মর্মরিত হয়ে উঠলো : বলিস কি ? কলকাতায় চললি নাকি ?

—হ্যাঁ, আজই।

—একা ?

ইন্দ্রাণী হেসে বললে—তুই যাস তো তবে দুজন হই।

চারুলতা তার মুখের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি ফেলে জিগ্‌গেস করলে : কি চাকরি ? এই মাস্টারির চেয়ে ভালো ?

—হ্যাঁ, এর চেয়ে অনারেব্‌ল্‌।

চারুলতা তার গায়ের উপর ঢলে পড়ে বললে—যদি পারিস আমার জন্যে একটা চেষ্টা করিস, ইন্দ্রাণী। মাস্টারি ছাড়া মেয়েদের কি আর কিছুই করবার নেই ?

চারুলতার নিরীহ, নিরানন্দ মুখের দিকে চেয়ে ইন্দ্রাণীর মায়া করতে লাগলো। তার রুক্ষ কপালের উপর যে কটি বিচ্ছিন্ন চুল এসে পড়েছে আঙুলে করে আল-গোছে একপাশে তা তুলে দিতে-দিতে স্নিগ্ধ গলায় সে বললে—চেষ্টা করে দেখবো, চারু। কিন্তু পারবি তো করতে ?

চারুলতা উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো : তুই পারলে আর আমি পারবো না ? মাইরি খবর দিস ইন্দ্রাণী, যদি কিছু পাস। আমি আশা করে থাকবো।

ইন্দ্রাণী তার মুখের দিকে চেয়ে করুণ করে একটু হাসলো, কোনো কথা বললো না।

॥ ১৯ ॥

ইন্দ্রাণী কাউকে কিছু খবর না দিয়ে সটান কলকাতায় চলে এলো, উঠলো—কোথায়ই বা সে উঠতো—শ্বশুরবাড়িতেই। ভোরবেলা সৌদামিনী মুখ ধুতে কলতলায় যাবার পথে দেখতে পেলেন সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্রাণী। মাথার থেকে মালগুলি নামাবার জন্যে পিছনে কুলিটা আর কারুর সাহায্যের প্রতীক্ষা করছে।

তাকে দেখতে পেয়ে সৌদামিনী চোখের পাতা সঙ্কুচিত করে শুধোলেন : কে ছোট বৌ না ?

ধারে-কাছে চাকরবাকর কাউকে আসতে না দেখে ইন্দ্রাণী নিজেই ধরাধরি করে মালগুলি নামালো যাহোক। বললে—হ্যাঁ মা, চলে এলাম।

সৌদামিনী হঠাৎ মুখ ঝামটা দিয়ে উঠলেন : এইখেনে আসবার আর তোমার ঠেকা কিসের ? সব সম্পর্কের মুখে তো ঝাড়ু মেরেছ, আবার এই সোহাগপনা দেখাবার কি দরকার ?

ইন্দ্রাণী অল্প একটু হেসে শাশুড়িকে প্রণাম করতে গেলো। সৌদামিনী সরে গিয়ে বললেন—বালাই, ষাট, আমরা সব হেজিপেজি লোক, আমাদের সামনে মাথা নোয়াবে কি ! কিন্তু হতচ্ছেদা করে যাকে চালচুলো নেই বলে তাড়িয়ে দিলে শুনতে পাই, আবার তার সম্পর্কে এ পথ মাড়াতে তোমার লজ্জা করলো না একটুও। তোমার জন্যে তো কতো মাঠ ঘাট পড়ে আছে চারপাশে, এখেনে এলে কার ইষ্টি-কুটুম হয়ে ?

ইন্দ্রাণী বৃথা বাক্যব্যয় না করে সোজা উপরে উঠে গেলো। সৌদামিনী ইনিয়ে-বিনিয়ে শোক করতে-করতে তার পিছন পিছন আসতে লাগলেন।

—অথচ এই সোয়ামির জন্যেই তো শুনতে পাই বাপ-মা ছেড়ে চলে এসেছ, সাত চড়ে রা কাড়োনি। আর আজ সেই সোয়ামিকেই কিনা তুমি এমনি মুখ খাওয়ালে। টাকার গরম কি এমনি গরম !

ইন্দ্রাণী হেসে বললে—পুরুষমানুষ কুলোয় শুয়ে কতো আর তুলোয় করে দুধ খাবে, শুনি ? তেমন লোককে কুলোর বাতাস দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়াই তো উচিত একশোবার।

—কে কাকে তাড়ায় তা দেখা যাবে। হাতে দুটো কাঁচা পয়সা আসতে খুব যে কচাল করতে শিখেছ, কিন্তু দর্শন আর এ অসইরন সইবে না মনে রেখো। পাটনায় তার চাকরি হয়েছে।

—সত্যি ? ইন্দ্রাণী ছুটে নিভাকে পাকড়াও করলে : ব্যাপার কি মেজদি ?

নিভার কাছ থেকে বিস্তারিত খবর পাওয়া গেলো। কোন এক সওদাগরি অফিসের পাটনাই ব্রাঞ্চে দর্শন বহুকষ্টে একটি কেরানিগিরি পেয়েছেন, মাইনে আপাতত একশো কুড়ি টাকা। ছোটো দেখে বাঁকিপুরের দিকে একটি বাড়ি নিয়েছে, কুড়ি টাকা ভাড়া, সঙ্গে নিয়ে গেছে বাড়ির চাকর মনোহরকে, সেই রাঁধে আর বাসন মাজে—চাকর আর ঠাকুর একসঙ্গে। প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই ঠাকুরপো মা ও বৌদিদিদের নমস্কারি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে, এই মাসে আবার সংসারকে কিছু সাহায্য করবার কথা।

—বা, ইন্দ্রাণী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো : ঐ টাকায় আবার সংসারকে সাহায্য কি ! তার জন্যে যে আর কিছু খরচ হচ্ছে না তাই তো যথেষ্ট সাহায্য। নিজেকে সাহায্য করতে পারলেই তো আমরা বাঁচি।

সৌদামিনী এখানেও আবার তাড়া দিতে এলেন।

কিন্তু কঠিন কিছু মুখ দিয়ে তাঁর বেরুবার আগেই ইন্দ্রাণী যাবার উদ্যোগ করলো ; বললে—না মা, এখানে আর আমার কোনো কাজ নেই, আমি চলি।

নিভা হঠাৎ তার হাত চেপে ধরলো : কোথায় যাবে ?

—বা, ইন্দ্রাণী হেসে বললে—আমার চাকরিতে।

—তাই তো যাবে। সৌদামিনী রুক্ষস্বরে বললেন—সোয়ামিকে পর্যন্ত তুমি ডিঙিয়ে যেতে চাও, তোমার এমন আস্পর্ধা। কিন্তু এই দেমাক তোমার গুঁড়ো হয়ে যাবে, ছোটবৌ, দর্শনের আবার আমি বিয়ে দেবো।

ইন্দ্রাণী সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে—সে স্বাধীনতা আমারও আছে, মা। কিন্তু আমি এমনি অন্যায় কথা-কাটাকাটি করতে আসিনি। কাউকে দিয়ে আমাকে একটা গাড়ি ডাকিয়ে দিন। আমি চললাম।

নিভা বললে—সে কি কথা ? এই এসেই তুমি আবার এখুনি চলে যাবে ?

ইন্দ্রাণী গম্ভীর হয়ে বললে—কি আর করবো, মেজদি। এই বাড়িতে যখন আর জায়গা নেই, তখন আর কোথায়ও একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে তো।

শীতকালে অতো ভোরে সারা বাড়ির ভালো করে তখনো ঘুম ভাঙেনি, ইন্দ্রাণী একটা ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। দিনটার জন্যে উঠল এসে সে তার পুরোনো ছাত্রীভবনে। খাওয়া-দাওয়া করে, বিশ্রাম নিয়ে, বিকেলে দু-চারটে টুকিটাকি দরকারী জিনিস কিনে, রাত্রের দিল্লী এক্সপ্রেসে সে পাটনা রওনা হল।

যতোই কেননা সে মুখে সোনার বাঙলা বলুক, আসানসোল পেরতেই তার সত্যিকারের কবিত্ব করতে ইচ্ছে হলো। কলকাতায় যে দর্শনকে চাকরি করতে হয়নি সংসারের ঐ একান্নবর্তী ডাস্টবিনএ, সেটা একটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

পাটনায় গাড়ি দাঁড়ালো প্রায় বেলা সাড়ে-দশটা। আগে খবর দেবার দরকার ছিলো না, এক্কাওয়ালা বাড়ি চিনে স্বচ্ছন্দে পৌঁছে দিতে পারলো। বড়ো রাস্তা থেকে মোড় ঘুরে গলির মুখে ছোট্ট একখানি দোতলা বাড়ি, কড়া নাড়তেই মনোহর দরজা দিল খুলে।

—এ কি, বৌমা যে!

—হ্যাঁ, তোর বাবু কোথায় ?

—বাবু তো এখন আপিসে, বৌমা। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে মনোহর বললে—বাবুকে গিয়ে খবর দেব ? এই কতটুকুন আর পথ ! আমি সব চিনি, বৌমা।

—দূর পাগল! ইন্দ্রাণী বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে চারিদিক চাইতে লাগলো। সিমেন্ট করা ছোট্ট একটি উঠোন, ওপাশে রান্নাঘর, কল, স্নানের জায়গা, পাইখানা,

ঢুকতেই এপাশে চাকরের শোবার ঘর শিকল দিয়ে আটকানো? ইন্দ্রাণী বললে— তার চেয়ে আমার জিনিসগুলি নামিয়ে আন। নে, চার আনা পয়সা দেগে এক্কাওয়ালাকে।

মনোহর ফিরে এলে ইন্দ্রাণী ফের জিগগেস করলে: তোর বাবু কখন আসবে রে।

—সেই সন্ধ্যে, বৌমা। বড্ড খাটুনি।

—না খাটলে পয়সা রোজগার করবে কি করে? আট-দশ টাকার জন্যে দিনে-রাতে তুই কি কম খাটিস?

তারপর রান্নাঘরের কাছে এসে ইন্দ্রাণী জিগগেস করলে: আজ কি রেঁধেছিলি, মনোহর?

মনোহর মুখ কাঁচুমাচু করে বললে—ভালো তেমন কিছু রাঁধতে পারি না, বৌমা। প্রায়ই হোটেল থেকে খাবার নিয়ে আসি।

—হ্যাঁ, তোর বাবুর আবার খাওয়া সম্বন্ধে নবাবি আছে। তা তোর ভয় নেই, আমি তোকে রান্না সব শিখিয়ে দেবো।

ইন্দ্রাণী উপরে উঠতে লাগলো। সিঁড়ির পরে ফাঁকা খানিকটা জায়গা, তার উত্তরে দুখানি পাশাপাশি ঘর। একখানি দর্শনের বসবার, পাশেরটা শোবার—তাদের উত্তরে আবার একটা চওড়া বারান্দা, সেখান থেকে বড়ো রাস্তা দেখা যায়। উপর-উপর সব দেখে-শুনে ইন্দ্রাণী দর্শনের শোয়ার ঘরে এসে দাঁড়ালো; বললে—ঘর-দোর বিছানা-বালিশ সব এমন নোংরা করে রেখেছিস কেন?

—নোংরা কই, বৌমা? বাবু তো দিব্যি এতে ঘুম যান।

—তোর বাবুর কি কিছু কাণ্ডজ্ঞান আছে? ইন্দ্রাণী সেই ময়লা বিছানার উপরই বসে পড়লো। খুলে ফেললো জুতো, গায়ের থেকে আলগা করে আনলো আঁচল।

মনোহর বললে—তুমি কি খাবে, বৌমা?

—যা হয় দুমুঠো হোটেল থেকে কিনে নিয়ে আয়। খিদে আর আমার বিশেষ নেই। তার চেয়ে আর একটা জিনিসের আমার বিশেষ দরকার, মনোহর।

—কি?

—জল। স্নান করবার জন্যে অনেক জল চাই। গায়ে রাজ্যের ধুলো জমে আছে, ভালো করে স্নান না করতে পারলে আমি মরে যাবো।

—তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

দুই ঘরে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে প্রত্যেকটি জিনিস দেখে, শুঁকে, নাড়াচাড়া করে স্নান আর খাওয়া সেরে নিতে-নিতে ইন্দ্রাণীর প্রায় তিনটে। শীতকালের বেলা, ঝুপ করে

পড়ে এলো দেখতে দেখতে। খাওয়া-দাওয়া সেরে জিনিসপত্র আর পর্যবেক্ষণ নয়, লেগে গেলো এবার সে সেগুলিকে সাজাতে-গুছোতে, পরিপাটি, ফিটফাট করে রাখতে। দড়ির উপর কাপড় চোপড় তেমনি এলোমেলো, টেবিলটা বইয়ে-কাগজে ছত্রখান।

মনোহর এগিয়ে এসে বললে—তুমি এই-সব ধুলো ঘাঁটবে কি, বৌমা? আমি তবে এসেছি কি করতে?

ইন্দ্রাণী হেসে বললে—আর আমিই তবে এসেছি কি করতে শুনি? যা, শীগগীর উনুনে আগুন দে গে, যা। তোর বাবু আপিস থেকে এসে কি খায়?

—কোন-কোনদিন দই-চিঁড়ে, কোনদিন বা রুটি-বিস্কুট। কোনদিন আবার আপিস থেকেই কি খেয়ে আসেন।

—চা খায় না?

—নিজের করে নিতে হয় বলে আপিস থেকে এসে আর উঠতে চান না।

—তুই আছিস কি করতে?

—আমি ভালো করে ওটা এখনো শিখলাম না, বৌমা। মনোহর হাত কচলাতে কচলাতে বললে : আমাকে তুমি শিখিয়ে দিও, কেমন?

আচ্ছা, দেবো। আপিস থেকে এসে তোর বাবু কি করে রে?

— জামা-কাপড় ছেড়ে তক্ষুনি বিছানায় লম্বা হয়ে পড়েন, বৌমা বেজায় খাটুনি যে। চেহারা এমনি কালি হয়ে গেছে।

—হবে না, তুই যখন আছিস রেঁধে খাওয়াতে? যা, এই দুটো টাকা নে, ভালো দেখে আধ সের ঘি আর ময়দা নিয়ে আয়। উনুনটা ধরিয়ে দিয়ে যাস। আমি ততক্ষণে ঝাঁটপাট দিয়ে বিছানা করে রাখছি। শোন, মনোহর।

মনোহর ফিরে দাঁড়ালো!

ইন্দ্রাণী বললে—লোহার এই ক্যাম্প খাটটা সরিয়ে ফেলতে হবে ঘর থেকে। শোবার ঘরে এতো সব জঞ্জাল রেখেছিস কেন? নে আমিই ধরতে পারবো, বাইরের ঐ বারান্দায় রেখে আসি।

নির্বোধ মনোহর চোখ বিস্ফারিত করে বললে—বাবু যে ওটাতে শোয়, বৌমা।

ইন্দ্রাণী হাসি চেপে বললে—তা নিয়ে তোর মাথা ঘামাতে হবে না। যা বলছি, তাই কর। ধর খাটটা।

খাটটা সরিয়ে রেখে মনোহর গেল উনুন ধরাতে।

ইন্দ্রাণী সতরঞ্জি বিছিয়ে মেঝেতে ঢালা বিছানা করলে—দুজনের মতো, দর্পনের বিছানার সঙ্গে নিজের বিছানাটা সে মিলিয়ে দিলো। তার গা-ময় স্পর্শের মতো

নরম বিছানা। পাশাপাশি বালিশ সাজিয়ে রাখলে, পায়ের দিকে পাশাপাশি দুখানা লেপ। তার গা-ময় স্পর্শের মতো নরম লেপ।

উনুনে আগুন দিয়ে মনোহর যখন উপরে এলো, দেখলে ইন্দ্রাণী মেঝের বিছানা পেতে তার উপর শুয়ে-শুয়ে একটা বই পড়ছে।

ঢোঁক গিলে মনোহর বললে—উনুন ধরিয়ে আমি এবার বাজারে চললাম, বৌমা। ঘি আর ময়দা, আর কিছু তো আনতে হবে না?

ইন্দ্রাণী বললে—কি আনতে হবে না হবে তা তো তুইই জানিস। আমি তো আজ এলাম।

—রাত্রে বাবু তবে বাড়িতেই খাবেন তো?

—তা আমি কি করে বলবো? তুই আছিস কি করতে? ইন্দ্রাণী ধমক দিয়ে উঠলো।

মনোহর একটা ঢোঁক গিলে বললে—হ্যাঁ, হোটেলকে তাহলে বারণ করে দিয়ে আসতে হয়, আজ থেকে আর খাবার পাঠাতে হবে না। এই সঙ্গে কিছু আলু আর হাঁসের ডিমও নিয়ে আসি, কি বলো। রাত্রে না হয় খিচুড়ি রেঁধে দিও বাবুকে।

—তা তোর ভাবতে হবে না। শীগগীর ফিরিস কিন্তু মনোহর, আমি একা থাকবো।

—সামনেই বাজার, তোমার কিছু ভয় নেই, বৌমা। নিচে সদরের পাশে ছিমনলাল ডালপুরি ভাজে, তাকে তোমার কথা বলে যাচ্ছি, সে চোখ রাখবে।

—কাউকে তোর চোখ রাখতে বলে যেতে হবে না।

মনোহর হেসে বললে—তাহলে উঠে এসে সদর বন্ধ করে দাও। বাবু কিন্তু এখুনি এসে পড়বে, বৌমা।

—যা তুই, উঠছি।

উঠি-উঠি করেও এই বিছানা ছেড়ে ইন্দ্রাণী কিছুতেই উঠতে পারলে না। কতোক্ষণ কাটলো কে জানে, হঠাৎ শুনতে পেলো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে কে ডাকছে—মনোহর! মনোহর!

সেই শব্দের উত্তরে সমস্ত ঘর-দোর, মেঝে-দেওয়াল যেন একসঙ্গে গভীর নীরবতায় প্রতিধ্বনি করে উঠলো।

শোবার ঘরে না ঢুকে বসবার ঘর দিয়ে দর্শন বাইরের বারান্দায় চলে এলো। আপন মনে বলতে লাগলো—ব্যাটা দেখি আজ ঘর-দোর খুব পরিপাটি করে রেখেছে। হলো কি? উনুনে ধোঁয়া দিয়েছে দেখতে পাচ্ছি যে! এই বাড়িতেই

তো, আমাদেরই তো রান্না ঘরে। ব্যাটা কি আজ আমার শ্রাদ্ধের রান্না বসিয়েছে নাকি? মনোহর! মনোহর!

কোনো সাড়া নেই।

—ব্যাটা এ সময় গেলো কোথায়? দর্শন আপিসের জামা-কাপড় ছাড়তে লাগলো: উপরে ব্যাটা জল রেখে যায়নি নিশ্চয়। ফিরুক আজকে হারামজাদা।

দর্শন দাঁড়িয়ে পড়লে—এ কি আমার খাট এখানে? মনোহর!

দর্শন দ্রুত পায়ে ছুটে এলো শোবার ঘরে।

ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি লেপটা গায়ের উপর মাথা পর্যন্ত টেনে দিয়ে, প্রায় জুজুর ভয়ে ছোটো খুকির মতো জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে রইলো। দর্শন ঘরে ঢুকে প্রবল চীৎকার করে উঠলো—ব্যাটা পাজি, আমার বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে লম্বা ঘুম মারা হচ্ছে? আরামের একেবারে যে হিমালয় দেখছি। ডাকলে হারামজাদায় কানে ঢোকে না। দর্শন তার গায়ে সবেগে পায়ের ঠোকর দিতে লাগলো: মনোহর, ও শূয়ার!

তবু তার সাড়া নেই।

—রাস্কেলটা মরে গেছে নাকি? বলে লেপটার এক প্রান্ত ধরে দর্শন সজোরে একটা টান দিলে—মেঘের ঢাকা থেকে বেরিয়ে এলো উচ্ছৃঙ্খল পূর্ণিমা, লেপের তলা থেকে এলোমেলো চুলে-আঁচলে, ঝিকিমিকি হাসিতে-লাবাণ্যে বিস্রস্ত, বিহ্বল ইন্দ্রাণী।

—তুমি?

একমুহূর্তে দর্শন অনড় একটা পাথর হয়ে গেলো।

ইন্দ্রাণী খিল-খিল করে হেসে উঠলো। হাঁটু গেড়ে বসে দর্শনের একটা হাত চেপে ধরে টেনে তাকে বিছানার এক পাশে বসিয়ে দিলে—আমাকে ধরে দেখ, আমি ভূত নই। আমি—আমি।

—তুমি এখানে কি মনে করে? হাত ছিনিয়ে নিয়ে দর্শন কঠিন, কটুকণ্ঠে জিগ্‌গেস করলো।

—কি আবার মনে করে? নতুন চাকরি পেয়েছি যে একটা। কথা বলবে, না হাসবে, ইন্দ্রাণী ভেবেই পাচ্ছে না।

—চাকরি? এখানে আবার কি চাকরি?

—এই। বলে ইন্দ্রাণী ব্যাকুলতায় নিটোল বাহু দিয়ে দর্শনের গলা জড়িয়ে ধরে তার ঠোঁটে গভীর একটা চুমু খেলো।

অতি কষ্টে দম নিয়ে দর্শন বললে—এ আবার কি অভিনয়। তুমি তো আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছ।

নিবিড়তর আলিঙ্গনে বুকের কাছে মুখ এনে ইন্দ্রাণী হাসিমুখে বললে—এবার তুমি আমাকে তাড়াও! বাবা:, কি গালটাই না আমাকে দিলে, পাজি, বদমাস শূয়ার, গাধা—উঃ কি ওয়েলথ্ অব ভোকাবিউলারি! শেষে লাথি পর্যন্ত মারলে। মা গো!

দর্শন হতবুদ্ধির মতো তার দিকে তাকিয়ে রইলো। আবার একটা চুমু খেয়ে ইন্দ্রাণী বললে—কিন্তু সব, সব—নাউ ড্রাউনড ইন এ কিস্।

বাইরে থেকে দরজার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে মনোহর বললে—বাজার করে ফিরেছি, বৌমা! উনুন যে এদিকে বয়ে যাচ্ছে। বাবুর খাবারটা—

—যাই। ইন্দ্রাণী খুশির তরঙ্গে ঝলমল্ করতে-করতে উঠে দাঁড়ালো। বললে: বাবুর জন্যে উপরে জল নিয়ে আয়, মনোহর। আর শোন।

সাহস পেয়ে মনোহর কাছে এসে দাঁড়ালো।

—খবরদার, আমাকে তুই আর বৌমা বলতে পারবি না! ইন্দ্রাণী গম্ভীর মুখে বললে—আমি এ বাড়ির গিন্নী, আমাকে এবার থেকে দস্তুরমতো মা বলবি। মনে থাকে যেন। আগে থেকে কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, মনোহর।

মনোহর পরম আপ্যায়িত হবার ভঙ্গি করে বললে—সে আমার সব সময় মনে থাকবে, বৌমা।

তৃতীয় নয়ন

এক

সমস্ত রাত ভরে' মিহির একটা সুতীব্র স্বপ্ন দেখছিলো যেন চারদিক ভীষণ সাদা হ'য়ে গেছে, কঠিন সাদা, উলঙ্গ সাদা—চেয়ে থাকতে-থাকতে চোখের দৃষ্টি যেন যন্ত্রণায় ওঠে হাহাকার ক'রে, কোথাও কিছু আঁকড়ে ধরতে পারে না বলে' উদ্ভ্রান্ত হ'য়ে ঘুরে বেড়ায়। যেন সে এক শুভ্রতার শুষ্ক মরুভূমিতে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছে। আগাগোড়া সাদা—শূন্যতার বিশাল শুভ্রতা। সেখানে এক ফোঁটা নেই রোদ, এক কণা নেই তারা, এক ফালি নেই চাঁদ। চাঁদ। লোক নেই, জন নেই, ঘর নেই বাড়ি নেই—একটা মৃত, বিস্তৃত সীমাহীনতার সমুদ্র। মিহির যেন নিষ্ঠুর একটা নির্জ্জনতার প্রান্তরে একেবারে একা এসে দাঁড়িয়েছে, তার পায়ের নিচে নেই মাটি, চারধারে নেই আকাশ—যেন তরঙ্গহীন, স্পর্শহীন সাদা জলের জোয়ার। যেন সে ম'রে গেছে, হারিয়ে ফেলেছে তার সকল সীমা ও সম্পর্ক—উত্তীর্ণ হ'য়ে এসেছে দিক্‌চিহ্নহীন অবারিত শূন্যতার শূন্যে—গতিহীন, শিলীভূত স্তব্ধতায়। পৃথিবীর নির্জ্জনতায় তবু চারদিকে থাকে আকাশের ঘনিষ্ঠতা, দূর থেকে দেখা যায় গুঁড়ো-গুঁড়ো নক্ষত্রের ধূলি, শোনা যায় মুহূর্ত্তের ম্রিয়মাণ, মন্থর পদশব্দ। এখানে সময় পড়েছে থেমে, আকাশ গেছে মুছে, সমস্ত সৌরসংসার গেছে হারিয়ে, কানের কাছে শব্দ করে' উঠছে শুভ্রতার স্তব্ধ কোলাহল। দুই চোখে এতো সাদা যেন সহ্য করা যায় না, দুই হাতে বহন করা যায় না শূন্যতার এতো ভার। রুক্ষ, ক্ষুধার্ত সাদায় মিহিরের দুই চক্ষু যেন শুকিয়ে গেলো।

ঘরের সবগুলি জানলা-দরজা দিয়ে নতুন ভোরের আলো ঢুকে পড়েছে, প্রাতঃকালীন চায়ের পিপাসায় সমস্ত সংসার উঠেছে শব্দ করে', নাকে পাওয়া যাচ্ছে উনুনের আঁচের গন্ধ—মিহির ধড়মড় করে' শোয়া ছেড়ে উঠে পড়লো।

চারদিক থেকে মশারিটা যেন তাকে চেপে ধরেছে, তাড়াতাড়ি দুই ক্ষিপ্র, অসহিষ্ণু হাতে মশারি তুলে সে বাইরে এলো—এ কি, এখনো ভোর হয় নি নাকি? বা, স্পষ্ট পাখি ডাকছে, রাস্তা দিয়ে হেঁকে যাচ্ছে ফিরিওলা, এ-ঘরে ও-ঘরে শোনা যাচ্ছে নানা কণ্ঠের খুচরো কোলাহল, সিঁড়ি দিয়ে নামা-ওঠা ঘড়িতে বাজছে এক দুই, সাতটা ঘণ্টা। তবে?

তার চশ্‌মা? রাত্রে শোবার আগে শিয়রের টেব্‌ল্‌টার উপর সে তা খোলা ফেলে রাখে, দূরত্বটা অনুভব করে' তাড়াতাড়ি সে হাত বাড়ালো। হাতে লাগলো দেয়ালের কঠিন একটা বাধা, অসহায় যন্ত্রণায় তার মুখ কাতর হ'য়ে উঠলো।

টেব্‌লটা কেউ রাতারাতি সরিয়ে ফেলেছে নাকি ? খাট থেকে নেমে প'ড়ে তাড়াতাড়ি সে গেলো জুতো খুঁজতে। পা দিয়ে অনুভব করে'-ক'রে জুতো সে খুঁজে পেলো না। নিচু হ'য়ে ব'সে প'ড়ে খাটের তলায় সে চোখ পাঠালো। কোথায় জুতো!

সুনয়নী নিচে কলতলায় কাপড় কাচতে বসেছেন, বাড়ির দেয়াল বিদীর্ণ ক'রে একটা দীর্ঘ, আর্ত চীৎকার তাঁর কানে এসে বিদ্ধ হ'লো : মা! মা!

যেন ভীষণ ভয় পেয়েছে এমনি একটা অসহায় চীৎকার। যেন আকস্মিক কোনো আততায়ী করেছে আক্রমণ, আত্মরক্ষার জন্যে প্রবল একটা কাতরতা।

সুনয়নী হাতের কাজ ফেলে ছুটে চ'লে এলেন উপরে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে বারান্দাটুকু পেরিয়ে আসতে-আসতে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন : কি, কী হয়েছে?

কণ্ঠস্বরের সান্নিধ্যে মা'র উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু তাঁকে দেখা যাচ্ছে না। সমস্ত সাদা, অন্ধকারের মতো সাদা।

সুনয়নী ঘরে ঢুকে দেখলেন মিহির খাটের বাজুটা ধ'রে মেঝের উপর দাঁড়িয়ে ঠক্‌ঠক্‌ করে, কাঁপ্‌ছে। কেমন একটা অস্বাভাবিক, আগোছাল চেহারা। দুই চোখে ভীত, তীক্ষ্ণ শূন্যতা। সমস্ত মুখে গভীর একটা ব্যর্থতার শ্রান্তি।

—এমন করছিস কেন? কী হ'লো? সুনয়নী তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে' ফেললেন।

মা'র স্পর্শে ভেঙে প'ড়ে মিহির কেঁদে উঠলো : আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না মা, কিছু না।

সুনয়নী ছেলের মুখ তাঁর বিশাল দুই প্রশান্ত চোখের কাছে নামিয়ে আন্‌লেন : দেখতে পাচ্ছিস্‌ না কী? কী বলছিস?

—না মা, সত্যিই কিছু দেখতে পাচ্ছি না। মিহির দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে' ধরলো : এই তো এতো সামনে তুমি আছো, কিন্তু কোথায় তোমার মুখ! এ আমার কী হ'লো? এখন তো ভোর হয়েছে, কিন্তু আলো কোথায়? আলো কোথায়?

যেন বিপুল অন্ধকারের ভারে তার নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছে, মিহির এমনি ছট্‌ফট্‌ করতে লাগ্‌লো।

সুনয়নী বিমূঢ়ের মতো বললেন,—চশ্‌মা, চশ্‌মা নেই যে চোখে।

সমুদ্রে পড়ে' কুটো আঁকড়াবার উদ্দীপনায় মিহির বলে' উঠলো : হ্যাঁ, আমার চশ্‌মা! টেব্‌লটার ওপর আছে, দাও, দাও এগিয়ে শিগ্‌গির।

সুনয়নী এগিয়ে দিলেন। ক্ষিপ্র হাতে মিহির তা চোখে পরালো। উঠলো তীক্ষ্ণতরো চীৎকার করে': এখনো না, এখনো কিছু দেখতে পাচ্ছি না, মা। আমার এ কী হ'লো? অন্ধকার, ভীষণ অন্ধকার! ডাকো, ডাকো সবাইকে।

চেঁচামেচি শুনে বাড়ির যে যেখানে সবাই এসে পড়েছে। চাকর কালিদাস পর্য্যন্ত।

সুনয়নী ব্যস্ত হ'য়ে কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে আনলেন, চোখ থেকে খুলে নিলেন চশমা। নতুন বৌদিদি তনিমা মশারিটা খুলে ফেলে বিছানাটা পাট করতে বসলো। শুইয়ে দিলো মিহিরকে। সুনয়নী বললেন,—ভিজুক, চোখে কয়েক ঝাপটা জল ছিটিয়ে দিলেই চোখ খুলে যাবে এক্ষুনি।

জলের ঝাপটা পড়ছে অনবরত, আর প্রাণপণে চোখ দুটো আকর্ণ প্রসারিত করে' মিহির চেঁচিয়ে উঠছে: খুলে যাবে কী মা, চোখ ত আমি খুলেই রেখেছি। কিন্তু আলো কই? শিগগির জ্বালো দেখি সুইচটা—অন্ধকারে আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।।

যন্ত্রচালিতের মতো তনিমা সুইচ্ টেনে আলো জ্বালালো। ভোরের টাটকা রোদে সেই বাসি, মিউনো আলো মৃতের মুখের বিবর্ণ হাসির মতো বীভৎস দেখাচ্ছে।

—এই তো আলো জ্বাললাম, ঠাকুরপো।

—কোথায়, কোথায়? দুই হাত বাড়িয়ে মিহির যেন ধরতে গেলো সেই আলো।

জলে বিছানা-বালিস গেছে ভিজে একসা হ'য়ে, কিন্তু মিহিরের চোখের অন্ধকার এতোটুকু তরল হ'লো না। রাত্রে, স্বপ্নে দেখেছিলো সে অবিচ্ছিন্ন সাদা, এখন চোখ মেলে দেখছে সে উত্তাল, উন্মথিত অন্ধকার—এমন কঠিন যে শাণিত সূচীমুখেও তাকে ভেদ করা যাবে না। যেন অতিকায় একটা জন্তু তার দুই তীক্ষ্ণনখ, বিশাল থাবা দিয়ে তার চোখ চেপে ধরেছে—যেন তার আর মুক্তি নেই। যেন তার চোখের দুই তারার উপর বহ্নিমান একটা ধূমকেতু পড়েছে বিচূর্ণ হ'য়ে—খানিকটা অগ্নিদীপ্ত শূন্যতার পর এখন অত্যুগ্র, উলঙ্গ অন্ধকার। এক ঝটকায় মিহির শোয়া ছেড়ে উঠে বসলো। দুই চোখ সজোরে কচলে সে যেন সেই কাঠিন্য গুঁড়ো করে' দিতে চাইলো। এক লাফে নেমে পড়লো খাট থেকে। ধ্বংস-স্তুপের এই ভার সে চোখ থেকে টেনে ফেলে দেবে। সমস্ত ঘরটা যেন তাকে পিষে ধরেছে। এখান থেকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারলে যেন সে বাঁচে। কিন্তু কোথায় সে যাবে? তার চারদিকের সমস্ত পথ আগলে সেই আরণ্য, অতিকায় জন্তুটা থাবা উঁচিয়ে আছে।

মেঝের উপর মিহির হুমড়ি খেয়ে পড়ে' যাচ্ছিলো, দাদা দ্বিজেন তা'কে ধরে' ফেললে। বললে,—দেখি, দেখি, কী হ'লো তোর চোখে ?

কিছুই হয় নি, তেমনি জ্বলজ্বল করছে চোখ, সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম ক'টি স্নায়ু রয়েছে ফুটে, তেমনি চোখের কালো তারায় গভীর স্বাভাবিকতা—না হয়েছে একটু লাল, না পড়েছে কোনো একটা আঘাতের কিছু চিহ্ন। বাইরে থেকে দেখতে দীঘির জলের মতো স্বচ্ছ, নির্ম্মল দৃষ্টি, মিহিরের এমনিতে যা চোখ—সেই প্রশান্ত, নীলাভ বিশালতা। কিন্তু দ্বিজেনও বেশ পরিষ্কার লক্ষ্য করলো, কথার আভায় যে-দৃষ্টি থাকতো প্রখর ও পিচ্ছিল, তা কেমন হঠাৎ নির্ব্বাক, নিরুচ্ছ্বাস হ'য়ে পড়েছে। দুই চোখে পরিব্যাপ্ত একটা ক্লান্তির জড়িমা—উড়ন্ত পাখি দু'টো হঠাৎ যেন তাদের ডানা গুটিয়ে বসে' পড়েছে।

দ্বিজেন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলো ডাক্তার ডাকতে।

মিহিরের মুখে আর কোনো কথা নেই। তার সমস্ত আকাশ গেছে ফুরিয়ে, কোটি-কোটি বর্ষ পরে ক্ষয়িষ্ণু সূর্য্য একদিন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে বৈজ্ঞানিকের সেই আপ্তবাক্য তার জীবনে আজ উচ্চারিত। চারদিকে উঠে গেছে অন্ধকারের দেওয়াল পাহাড়ে তার পথ পড়েছে ঢাকা। দুই চোখ তীক্ষ্ণ করে' মিহির সেই ভীমকান্ত অন্ধকারের অরণ্যে পালাবার জন্যে সঙ্কীর্ণ একটা পথ খুঁজতে লাগলো।

মুক্তি সত্যি তার কোথাও নেই নাকি ? শূন্যে দু' হাত বাড়িয়ে মিহির প্রাণপণে চীৎকার করে' উঠলো : আয়না, আয়নাটা পেড়ে আনো শিগগির।

সুনয়নী দেয়ালের পেরেক থেকে আয়নার আংটিটা আলগা করে' আনলেন।

কতো দীর্ঘ দিন ধরে' সে না-খেয়ে আছে, এমনি নিষ্ঠুর ক্ষুধায় মিহির আয়নাটার উপর ঝুঁকে পড়লো। কাচের উপর হাত বুলোতে-বুলোতে বললে,—আয়নাটা ঠিক সোজা ধরেছি তো ?

সুনয়নী বললেন,—হ্যাঁ, সোজাই তো আছে।

আস্তে-আস্তে, মুখের রেখাগুলি আগ্রহের তীব্রতায় ক্রমশ তীক্ষ্ণতরো করতে-করতে মিহির আয়নাটা ঠিক তার মুখের উপর নিয়ে এলো। কঠিন আয়নাটা যেন করছে না কোনো প্রতিধ্বনি, তাতে ফুটছে না একটা কোনো রেখা।

আয়না দিয়ে মুখটা চেপে ধরে' মিহির আর্ত্তনাদ করে' উঠলো : মা।

সমস্ত ঘর স্তব্ধতায় যেন শ্বাসরোধ করে' রইলো।

—আমার নিজের মুখও আমি দেখতে পাচ্ছি না মা, আমার নিজের মুখ। চোখে আমার একটা পাহাড় ভেঙে পড়েছে। বলে', সেই পাহাড়টাকে গুঁড়ো করে' দেবার জন্যেই বোধহয়, আয়নাটা মিহির মেঝের উপর ছুঁড়ে মারলো।

কী যেন ঝন্‌ঝন্ করে' গেলো ভেঙে।

মিহিরের কাচের সেই টিপয়টা—যার উপর স্তূপীকৃত তার প্রসাধনের জিনিস। তার দিবাস্বপ্নের রঙিন কতোগুলি টুকরো।

সন্দেহ নেই, মিহির চোখে কিছুই আর দেখতে পাচ্ছে না।

—কী, কী ভাঙলো, মা ?

—কিছু নয়, তুই এখন একটু বোস্ দেখি ঠাণ্ডা হ'য়ে। সুনয়নী তাকে দুই হাতে খাটের উপর টেনে আনলেন : চোখে কিছু জ্বালা করছে, মিহির ?

—এমনিতে কিছু জ্বালা করছে না মা, মিহির দুই হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠলো : কিন্তু এই অন্ধকারের যন্ত্রণা,—ঠাণ্ডা, মরা অন্ধকার। অন্ধকারে নিশ্বাস আমার বন্ধ হ'য়ে আসছে—যেন অন্ধকারের কি-একটা বিষাক্ত গ্যাস্ দিয়ে আমার কে মুখ চেপে ধরেছে।

তাকে বালিসের উপর শুইয়ে দিয়ে সুনয়নী অনুদ্বিগ্নতার ভাণ করে' বললেন, —একটুখানি চুপ করে' শুয়ে থাক্। দ্বিজু ডাক্তার ডাকতে গেছে, এখুনি এসে পড়বে। এ একটা সাময়িক স্নায়ুবিকার ঘটে' থাকবে, ওষুধ দিলেই সেরে যাবে দেখিস। কেন মিছিমিছি অমন ছট্‌ফট্ করছিস ?

নিরুদ্বেগ অবসাদে মিহির ক্ষণকালের জন্য তার সমস্ত শরীর শিথিল ক'রে আনলো। চোখের দু' পাতা বুজে অন্ধকারকে চাইলো স্বাভাবিকতায় স্নিগ্ধ করে' তুলতে। অন্ধকারটা যেন আলোর সাময়িক একটা অপসরণ মাত্র, একটা অসম্পৃক্ত কঠিন বিদ্যমানতা নয়। যেন খানিক পরে চোখ মেললেই চারদিক আবার আলোয় ঝলমল করে' উঠবে, যেন তার দৃষ্টির আঘাত পেয়ে সমস্ত দৃশ্যজগৎ রূপে-রেখায় স্বতন্ত্র, সবিশেষ হ'য়ে দাঁড়াবে, শূন্যতার সমুদ্রে উচ্ছ্রিত হ'য়ে পড়বে পুঞ্জ-পুঞ্জ বস্তুর দ্বীপ। যেন সে আবার মুক্তি পাবে, তার এই দৃষ্টিহীনতা থেকে ততো নয়, যতো এই দৃষ্টির দিগন্তরেখাহীন ভয়ঙ্কর উন্মুক্ততা থেকে।

চিঠির মোড়ক খুলে ফেললে যেন কী না-জানি প্রত্যাশিত শুভসংবাদ উঁকি দেবে, তেমনি, এক মুহূর্তে সব নিঃশেষ হ'য়ে না যায়— মিহির আস্তে-আস্তে চোখের পাতা দুটো উন্মোচন করতে লাগলো। প্রথমে আবছা একটা রেখা, যেন বননীল দূর দিগন্তের অস্পষ্ট একটা বঙ্কিমা সে দেখতে পাচ্ছে; তারপর আরেকটু ফাঁকে আলোয় কম্পমান আকাশের একটু আভাস—মিহিরের সে-উত্তেজনা আর সহ্য হ'লো না। দুই চোখ বিস্ফারিত করে ধরলো।

চেঁচিয়ে উঠলো : অসম্ভব, এ অসম্ভব। কিছুতেই এ আমি সহ্য করবো না।

সুনয়নী ব্যাকুল বাহুতে আবার তাকে ধ'রে ফেললেন : কী হ'লো ?

দুই হাতে চোখ দুটো সজোরে কচ্‌লাতে-কচ্‌লাতে মিহির বললে,—এ কিছুতেই হ'তে পারে না। আমাকে দেখতেই হ'বে, আমাকে ছিঁড়ে ফেলতেই হ'বে এই অন্ধকার। বৌদি!

তনিমা ম্লান মুখে কাছে এসে দাঁড়ালো।

মিহির আবার ডাকলো: বৌদি।

তনিমা যে তার খাটের এতো কাছে স'রে এসেছে দৃষ্টিতে তার সেই সামীপ্যের তাপ নেই। ধীরে তার একখানি হাত স্পর্শ ক'রে তনিমা বললে,—বলো।

—ও ঘর থেকে আমার সেই ছবিটা নিয়ে এসো তো—কালকেও যেটা বসে'-বসে' আঁকছিলাম। উত্তেজনায় মিহির সমস্ত দেহে আরক্তিম হ'য়ে উঠলো: নিয়ে এসো আমার তুলি, আমার রঙের বাক্স—আমার সেই ছবিটা আজ শেষ করতেই হ'বে।

পাশের ঘর থেকে তনিমা তাড়াতাড়ি সেই অসমাপ্ত ছবিটা তুলে নিয়ে এলো।

তার হাতে ছবিটা পৌঁছে দিয়ে তনিমা বল্‌লে, এই যে।

তীক্ষ্ণ চোখে মিহির যেন সেটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলো, হাত দিয়ে তার রেখা ও রঙের ঢেউগুলি অনুভব করতে-করতে নিষ্প্রাণ গলায় জিগ্‌গেস করলে: কী ছবি আঁকছিলাম, তুমি বলতে পারো, বৌদি?

মমতা-ম্লান মুখে তনিমা বল্‌লে,—তোমার তা মনে নেই?

—মন, শুকনো মন নিয়ে আমি কী করবো? হঠাৎ ক্ষিপ্তের মতো মিহির সেই ছবিটা দুই হাতে টুকরো-টুকরো করে' ছিঁড়ে ফেললে: আমি আমার সমস্ত আলো ফেলেছি হারিয়ে। ডাক্তার, ডাক্তার ডাকো, মা। অন্ধকারে আমার নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছে।

সুনয়নী আবার তাকে ঠাণ্ডা করলেন: এই এখুনি এসে পড়বে। ওষুধ দিলেই আবার সব দেখতে পাবি।

প্রতীক্ষার পাষাণীভূত অন্ধকারে মিহির নির্জ্জীব হ'য়ে পড়ে' রইলো। তার চারধারে চলেছে শব্দের শোভাযাত্রা: পাখির পাখায়, মোটরের গিয়ারে, মানুষের নিরলস ব্যস্ততায়। শুধু সেই রয়েছে থেমে, নিঃশব্দতার আকাশে। শুনছে মা'র গলা, বৌদির পা, এখানে-ওখানে টুকরো-টুকরো চাঞ্চল্য। সে ঘ্রাণ পাচ্ছে সে-সমস্ত কথার, তাপ পাচ্ছে সে-সমস্ত উপস্থিতির। নির্জ্জন একটা নির্ব্বাসনে বসে' শুনছে শুধু সে তার নিজের হৃৎস্পন্দন। পাশের বাড়ি থেকে জগৎবাবু ও তাঁর মেয়ে মিনতিও যে এসে পড়েছে এই গোলমাল শুনে, শব্দের শিহরণে মিহিরের তা বুঝতে

বাকি নেই। জগৎবাবুর মুখে নিশ্চয়ই সশঙ্ক সমবেদনার ছায়া, আর মিনতির মুখে অনির্ব্বচনীয় নীরবতা একবার চোখ মেলে সেই নীরবতা মিহির দেখতে গেলো। তাড়াতাড়ি দু' হাতে চোখে ঢেকে গভীর লজ্জায় তার এই দৃষ্টিহীনতাকে সে লুকিয়ে ফেল্‌লো : আজকের দিনে পৃথিবীতে এতো বড়ো একটা কুৎসিত কাণ্ড যেন আর কিছু হ'তে পারে না।

দুই

ডাক্তার এলো।

তার চোখে আমরা এ সংসারের বাইরের ছবিটা মোটামুটি দেখতে পেলাম।

ছোট দোতলা বাড়ি, প্রখর সৌন্দর্যবোধের দীপ্তিতে এর সমৃদ্ধি ও সম্ভ্রান্ততা উথলে পড়ছে, পরিবারের সমস্ত ক'টি লোকের আচারে-চেহারায় সেই শালীনতার আভিজাত্য। জিনিসে-পত্রে বোঝা যাচ্ছে রুচির পরিচ্ছন্নতা, আলাপের ভঙ্গিতে শিক্ষার ঔজ্জ্বল্য। এ-বাড়ির কর্তা যে দ্বিজেন তা তার দৃপ্ত প্রাধান্যবোধ থেকেই ধরা পড়ে সে নতুন ডেপুটি হয়েছে, এসেছে পুজোর ছুটিতে কল্‌কাতায়, এ-খবরগুলিও আর আজানা রইলো না। সম্প্রতি পোস্‌টেড্‌ সে তমলুকে, সেখানেই ফিরে যেতে হ'বে সটান, ছুটি ফুরোবার বেশি দেরি নেই। মা'র হার্টের অসুখের জন্যে এবার সে কোথাও বেরুতে পারলো না। তা, মা যেমন-তেমন যা-হোক্ আছেন, কিন্তু হঠাৎ এ কী অভাবনীয়!

নিচে ডাক্তার সুনয়নী দেবীকেও দেখলো। কী কাজে ত্বরিত পায়ে ফের উপরে উঠে যাচ্ছিলেন, দ্বিজেন অস্ফুট গলায় বললে,—ডাক্তারবাবু এসেছেন, মা।

সুনয়নী অভিনন্দনের সুরে বললেন,—আসুন।

সারা গায়ে বৈধব্যের কঠিন কৃশতার সঙ্গে মিশেছে করুণ একটি ধৈর্য্যের গাম্ভীর্য্য, বৈরাগ্যের নিষ্ঠুরতার উপর ছায়া ফেলেছে স্নেহের মলিন কোমলতা। সংসারে এ-মুখের সম্পদ-সৌন্দর্য্যের যেন তুলনা নেই।

ডাক্তার উপরে উঠে এলো।

চওড়া খাটের উপর প্রসারিত পেশল দেহে একটি যুবক শুয়ে আছে, বয়েস বড়-জোর তেইশ কি চব্বিশ, সমস্ত শরীরে বিমর্ষ আলস্য রয়েছে পুঞ্জিত হ'য়ে। ডাক্তার বুঝতে পারলো এ-ই তার পেসেন্ট্‌। শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে—খোঁপার উপর আধখানা একটা ঘোম্‌টা শিথিল হ'য়ে ফেঁপে রয়েছে, শুকনো সিঁথিতে সিঁদুরের বিবর্ণ একটু আভাস, দুই চোখে শক্তিমান সাহসের দ্যুতি হচ্ছে বিচ্ছুরিত,

মুখের ডৌলটিতে সতেজ সহিষ্ণুতা। খাটের রেলিঙের ওপার থেকে হাত বাড়িয়ে রোগীর কপালে, ভুরুতে চোখের পাতায় ধীরে-ধীরে আঙুল বুলিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত দাঁড়াবার ভঙ্গিটি থেকে ঝরে' পড়েছে মমতা : আঙুলের মুখে, চোখের আনমিত পলকে ভঙ্গুর স্নেহ। ডাক্তার তার সহজাত স্বাভাবিক বুদ্ধিতে টের পেলো ইনি নিশ্চয়ই দ্বিজেনের স্ত্রী, রোগীর বৌদিদি। বিছানার আরেক প্রত্যন্তে রোগীর পায়ের দিকে বসে' আছে আরেকটি মেয়ে · যার দিকে তাকালে তাকে ছেড়ে আগে চোখে পড়ে তার সর্বব্যাপী বিশাল স্তব্ধতা। বছর সতেরো-আঠারো হয়তো বয়েস, ম্লানানন কৃশাঙ্গ মেয়েটির নির্বাক কাতরতায় কী যেন একটা অমেয় রহস্য। এই রহস্যের ভাবটি তার চেহারায় এনেছে একটি ধূসর ঔদাস্য, একটি মধুর অশারীরিকতা। ডাক্তার ঘরে ঢুকে একটু অবহিত হ'তেই সে তার জলাক্ত চোখদু'টি যখন তার মুখের উপর তুলে ধরলো তখন তাতে ভেসে উঠলো যেন একটি কুণ্ঠিত প্রার্থনা। সারা রাস্তা দ্বিজেনের সঙ্গে এত দীর্ঘ আলাপ করে'ও সে জানতে পায় নি তাদের এমন কোনো একটি ছোট বোন আছে।

রুগীকে অন্ধকার ঘরে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার তার **opthalmoscope** বা'র করলো। বাইরে সকলের প্রতীক্ষায় এলো দুঃসহ তীক্ষ্ণতা। মিহির তার সমস্ত মাংসপেশী কঠিন করে' রইলো, প্রতীক্ষার প্রবলতায় তার রক্ত-চলাচল যেন বন্ধ হ'য়ে গেছে।

অনেকক্ষণ ধরে' নানারকম পরীক্ষা চললো। অনেকক্ষণ ডাক্তার কোনো কথা কইলো না। মুখে এমন একটা বৌদ্ধ নির্লিপ্ততা যে তার পাঠোদ্ধার করা সহজ নয়।

রোগের চিকিৎসার চাইতে তার কারণটাই যেন ডাক্তারের কাছে বড়ো কৌতূহলের বিষয়। রুমাল দিয়ে নিজের চোখ দুটো একবার মুছে সে জিগগেস করলে : খুব **near habits** ছিলো বলছিলেন না?

—হ্যাঁ, ছেলেবেলা থেকেই। দ্বিজেন এগিয়ে এলো : পড়াশুনো তো আছেই, তারপর রাত দিন বসে' কেবল ছবি আঁকা আর কী-সব বসে'-বসে' লেখা—এই ছিলো ওর প্যাশান। তাতে করে' খাওয়া-শোওয়ার খেয়াল তো ছিলোই না, হিসেবে সন্ধ্যে-সকাল পর্যন্ত ভুল হ'য়ে যেতো।

ডাক্তার গম্ভীর মুখে একটা বিভীষিকাসূচক শব্দ করলে ; বললে—গ্লাশ ব্যবহার করতো না?

—করতো বৈ কি, মাইনাস এইট প্রায় চোখের পাওয়ার।

ডাক্তার মুখের উপর পুরু ক'রে পর্দা টেনে দিলো। সেটা তার স্পর্দ্ধার না ব্যর্থতার ভাব, স্পষ্ট বোঝা গেলো না। এক হ'তে পারে, তার দ্বারা কিছু আর

সম্ভব নয়, মুখে তার অক্ষমতার বেদনা : আর হ'তে পারে, এ একটা আর এমন কী অসামান্য রোগ, আলগোছে একবার ছুরি চালালেই সমস্ত কুজ্ঝটিকা যাবে অপসৃত হ'য়ে—তার জন্যে এতো ঘটা করে' এতো চুনোপুটি থাকতে একেবারে তাকেই ডেকে আনবার কী হয়েছিলো!

ডাক্তার দ্বিজেনকে সঙ্গে করে' নিচে চলে' গেলো।

নিভৃতে পেয়ে দ্বিজেন জিগ্‌গেস করলে : কেমন দেখলেন?

ডাক্তারের মুখে আশঙ্কা এলো ঘনিয়ে ; ভারি, ঘোলাটে গলায় বল্‌লে, —খুব বেশি আশাপ্রদ বলে' মনে হচ্ছে না। **High miopea** ছিলো, **detach-mnet of retina** হ'য়ে গেছে দেখছি।

কথাটা যেন দ্বিজেন পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারলো না। শুকনো একটা ঢোঁক গিলে জিগ্‌গেস করলে : কোনো চিকিৎসা নেই?

—লোক-দেখানো চিকিৎসা করে' লাভ কী।

—কোনো অপারেশান্?

—অপারেশান্ করে' কী হবে?

—তবে, পাংশু মুখে দ্বিজেন একটা ভয়ার্তে শব্দ করে' উঠলো : তবে চিরকালই কি ও—

—কথাটা বলতে আমারো মনে খুব লাগছে, ডাক্তারের সেই সমাহিত, নির্বাপিত মুখে করুণার পেলব একটি আভা ফুটে উঠলো : কিন্তু বিজ্ঞানে যা নিষ্ঠুর সত্য, তার আর নড়চড় নেই।

দ্বিজেন অস্থির হ'য়ে উঠলো। ধরা গলায় বল্‌লে,—এ-রকম জায়গায় এসে আপনাদের বিজ্ঞান নীরব হ'য়ে গেছে? এর আর কোনো চিকিৎসা নেই, এ কখনো হ'তে পারে?

ডাক্তারের দুই ঠোঁট মৃদু একটি হাসিতে কুটিল হ'য়ে উঠলো, মুখে ছড়িয়ে পড়লো অবিশ্বাসের শাণিত একটা রুক্ষতা। গলার টাই-পিন্‌টা বাঁ হাতে একটু নেড়ে ডাক্তার বল্‌লে,—আমি বললেও সে-কথা আপনারা শুনবেন কেন? কল্‌কাতা সহরে আমিই হয়তো একমাত্র বা অদ্বিতীয় নই। চিকিৎসা আপনারা সাধ্যমতো করাবেন বই কি। যদি বলেন তো আমিও একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি, কিন্তু, ডাক্তার এবার যেন নিজের মনে-মনে গুঞ্জন ক'রে উঠলেন : কিন্তু আশা কি সত্যিই আছে?

মিনতি তনিমাকে গিয়ে জিগ্‌গেস করলে : ডাক্তাররা কী ব'লে গেলো, বৌদি?

তনিমা ম্লান গলায় বললে,—ওষুধ কতোগুলি দিয়ে গেছে বটে, কিন্তু বিশেষ নাকি কিছু আশা নেই।

—আশা নেই? ব্যথায় মিনতির দুই চোখ টল্‌টল্ ক'রে উঠলো: এ কখনো হ'তে পারে?

—কী কখনো হ'তে পারে না, মিনু? তনিমার মুখে উদাসীন, নিরাভ একটা ক্লান্তির বিমর্ষতা। পৃথিবীতে যেন এমনিই হামেসা ঘ'টে আসছে।

একটা আশ্রয় পাবার জন্যে মিনতি তাড়াতাড়ি তনিমার হাত দু'টো চেপে ধরলো: তুমি অমন মুখ ভার ক'রে অমন সব ভয়ঙ্কর কথাগুলো বোলো না, বৌদি। এমন একটা আশ্চর্য্য, আকস্মিক ঘটনা কখনো বিশ্বাস করবার মতো?

—তুমি তোমার মুখ ঠাকুরপোর চোখের সামনে নিয়ে তুলে ধরো, দেখবে, তোমার মুখও আর সে চিনতে পাচ্ছে না। তনিমা সস্মিত বিদ্রূপের তরলতায় কথাটাকে হাল্‌কা করতে গিয়েছিলো. কিন্তু স্বর যেন তেমন স্ফূর্ত্তি পেলো না, উঠলো কেমন বিষাদে ছায়াচ্ছন্ন হ'য়ে। ঘন ক'রে তার হাতখানি মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে তনিমা গাঢ় গলায় বল্‌লে,—জগতে যা কিছু বিস্ময়কর ঘটে মিনু, তার মধ্যে সব চেয়ে ভয়টাই হচ্ছে বড়ো বিস্ময়। খুব যখন কোনোদিন একটা অসহ্য আনন্দের মুখোমুখি হও, তখন ভয় থাকে, এতো সুখ বুঝি সইবে না। যখন দাঁড়াও এসে অভাবিত একটা দুঃখের গা ঘেঁসে, তখনো মনে ভয় থাকে, হয়তো এ-দুঃখই রইলো চিরস্থায়ী। তনিমা জোরে শব্দ ক'রে একটা নিশ্বাস ফেললো: আমাদের জীবনে আকস্মিকতাটাই তো বেশি ঘটে, নইলে নাটক জমবে কেন বলো? সন্দেহে দোলায়মান খানিকটা প্রতীক্ষা, তারপরেই সেই বিস্ময়। আর যা বিস্ময়কর, তোমাকে বললাম, তা আবার ভয়ঙ্করও।

সমস্ত বাড়ির আবহাওয়ায় ছড়িয়ে আছে এ বিষাদের গোধূলি, সবাইর মুখে মমতা-মলিন নিরুপায় নিশ্চেষ্টতা।

মিনতি গলায় জোর দিয়ে বললে—কিন্তু কে জানে আকস্মিকতার জগতেও একটা নিয়ম আছে। নইলে এ কখনো সম্ভব—

তনিমা মৃদু হেসে বললে,—কে জানে, হয়তো অনিয়মই তার নিয়ম।

—নইলে এ কখনো সম্ভব, মিনতি তার আগের অসমাপ্ত কথাটা টেনে আনলো এমন একজন সুস্থ, সবল লোক হঠাৎ এক মুহূর্ত্তে এমন পঙ্গু হ'য়ে যাবে? আর এ যে সে পঙ্গুতা নয়, একেবারে জীবন্ত সমাধি! আর, কথা বলতে গিয়ে মিনতি যেন ভয়ে শিউরে উঠলো: যার-তার পঙ্গুতা নয়, একজন গুণী, সক্ষম আর্টিস্‌টের? আকস্মিকতাটা শুধু একটা ঘটলেই তো হ'লো না সংসারে! তুমি-আমি অন্ধ হ'লে,

—না-হয় হ'তাম, কিন্তু ভাবো একবার, মিহিরের মতো ছেলে—যার হাতে বিধাতা এতো ভার সঁপে দিয়েছিলেন, যার চোখে ছিলো সৃষ্টির স্ফুলিঙ্গ,—সে যাবে অন্ধকারে তলিয়ে এ তুমি কখনো সূর্য্য-চন্দ্রের পৃথিবীতে বিশ্বাস করতে পারো? যার এতো বৃহৎ সার্থক হ'বার কথা, সে থাকবে সঙ্কুচিত, স্তব্ধ,—না এ-ই কখনো কল্পনা করা যায়?

মিনতির বাক্যচ্ছুরিত সুন্দর মুখের দিকে লোভীর মতো চেয়ে থেকে তনিমা বললে,—কখন মানুষ কিসে সার্থক হয় তুমি জোর করে' কিছু বলতে পারো?

—রাখো তোমার এ-সব খেলো আধ্যাত্মিকতা। মিনতি ভাগ্যের, মানুষের সেই অদৃশ্য শত্রুর উপর রাগে ঝাঁজিয়ে উঠলো: আকস্মিকতা নিয়ে কথা হচ্ছে, তাই নিয়েই হোক।

—আকস্মিকতাও তো এমনিই অন্ধ।

—তাই অন্ধও আবার আকস্মিক একদিন আলো ফিরে পাবে। যৌবনের দীপ্তিতে মিনতি যেন সর্বদেহে ঝঙ্কৃত, উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো: বিজ্ঞানের ধরা-বাঁধা আইন-কানুনের রাস্তায়ই আমরা সবসময় চলাফেরা করি না। সে-দিক থেকে বলতে গেলে আমরা বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক বড়ো। কিন্তু তোমাকে ব'লে রাখছি বৌদি, আকস্মিকতার নিয়মেই আবার ঘটবে আকস্মিক অঘটন। এ হ'তেই হ'বে, না হ'য়ে উপায়ই নেই যে। নইলে তুমি ভাবতে পারো, কথাটা শেষ করতে গিয়ে মিনতির গলা হঠাৎ কেমন শিথিল, স্তিমিত হ'য়ে এলো: পৃথিবীতে করবার যার এতো কাজ, এতো মুক্তি, সে যাবে এমনি একান্ত নিঃশেষ হ'য়ে? ঘটনা একটা খেয়াল-মতো ঘটলেই তো আর হ'লো না।

তনিমা তার হাতের চুড়ি ক'গাছ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মৃদু ক'টি শব্দ করতে-করতে বললে,—নিঃশেষ যদি হয়ই, তবে তুমি কী করবে মিনু, কী তুমি করতে পারো? মাত্র মানুষ হ'য়ে ভাগ্যের সঙ্গে তুমি কী ক'রে যুঝবে?

এক ফুঁয়ে মিনতির সমস্ত উৎসাহ যেন গেলো নিবে। শিশুর মতো অসহায়, করুণ মুখে বললে,—আমরা সেই অঘটনের জন্যে আশা ক'রে থাকবো।

তাকে অলক্ষ্যে একটু কাছে টেনে এনে তনিমা বললে,—আমরা আশা ক'রে থাকবো, আর আমাদের সেই আশা থেকে দেবো তাকে আলো, দেবো তাকে আরো বড়ো একটা অনুভবের বিশ্বলোক। কী বলো, মিনু? সেই অঘটনেরো তো একটাই মাত্র ধরা-বাঁধা রাস্তা নেই।

মিনতি তার অনুভবের সমুদ্রে খুঁজে পেলো না আর একটাও কথার বুদ্বুদ। মিহিরকে না-হয় সবাই মিলে খণ্ড-খণ্ড করে' দেয়া গেলো একটা বৃহত্তর অনুভবের

নীহারিকা, কিন্তু সেই অনুভব সে সৃষ্টির দ্যোতনায় খণ্ড-খণ্ড দ্যুতিপুঞ্জে রূপান্তরিত করবে কী করে'? তার দুয়ারে কত রাজ্যের পিপাসিত মানুষ যে কতোদিন থেকে প্রার্থী হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলো, তাদের আত্মিক ক্ষুধা কে লাঘব করবে এখন থেকে? সে তো চক্ষু নামক একটা ইন্দ্রিয় মাত্র হারায়নি, হারিয়েছে তার ছবি, তার কবিতা, তার জীবনধারণের অলৌকিক সম্রান্ততা। পৃথিবীর কাছে অপরিমাণ ঋণ করে' সে কিনা সামান্য একটা ঘটনার সঙ্গে চক্রান্ত করে' এতো সহজে দেউলে হ'তে বসেছে!

তনিমা তার সাংসারিক গলায় ফিরে এলো: তুমি কবে ফিরলে?

—কাল। কিন্তু এ-সব তুচ্ছ কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে মিনতি যেন আর ফুরসৎ পাচ্ছে না। বল্‌লে,—কিন্তু কী করে' আর ছবি আঁকবে বলো তো?

—মনে-মনে ছবি আঁকবে, অন্ধকারে একের পর এক তারার কণিকা। তনিমা গলার কুয়াসাটা শব্দের দ্রুততরো উচ্চারণে পরিষ্কার করে' নিলো: তারপর কদ্দূর গেছলে?

—বেশি দূর নয়, দিল্লি-আগ্রা হ'য়ে চিতোর-উদয়পুর। কথাটা তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে মিনতির গলা গম্ভীর খাদে নেমে এলো: কিন্তু অন্ধকারে তারার কণিকা দিয়ে কী হ'বে—কতোগুলি মরা, ঠাণ্ডা শূন্য বাষ্পবিন্দু! আমি এ-কথা ভাবতেই আর আমার চোখের দৃষ্টি খুঁজে পাচ্ছি না বৌদি, যে, চিরকালের জন্যে মিহির একেবারে চুপ করে গেলো।

—সবই অভ্যেস, মিনু। চোখ যাদের নেই, অন্ধকারকে আর তারা ভয় করে না।

—কিন্তু সে ছবি আঁকবে কী করে'? লিখবে কী করে'?

তনিমার চোখে একটি বিলোল লাস্য ফুটে উঠলো। তাকে ফের কাছে টেনে এনে তার খোঁপায় হাত রেখে বল্‌লে,—তুমিই তো তার আছ। তুমিই আনবে দৃষ্টি, তুমিই লেখাবে কবিতা।

কথাটা এমন অবিশ্বাস্য অদ্ভুত যে মিনতি গলা ছেড়ে হেসে উঠলো। একটা তার ডিক্‌টোফোন্ না-হয় হ'তে পারি, কিন্তু তুলি ধরবো কী করে'? আর তুলি যদি-বা কোনোদিন ধরি সে তো নেহাৎ আমারই ছবি হ'বে, তার ছবিকে আমি মূর্ত্তি দেবো কোথায়?

—তুমি, তনিমা তার মুখের দিকে পরিপূর্ণ, বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে আলগোছে বলে' ফেল্‌লে,—তুমিই হ'বে তার মূর্ত্তিমতী ছবি।

এ আরেকটা মজার কথা—মিনতি আবার হেসে উঠলো: কিন্তু আমাকে দেখে তো জগজ্জনের আধ্যাত্মিক রূপতৃপ্ত হ'বে না। হাসির স্রোতে মিনতি

ভাসিয়ে নিয়ে গেলো কথার পাথর : আমি তো শরীরী একটা বিধাতার সৃষ্টি মাত্র, কারো তো শিল্প-রচনা নই।

—কে জানে, তুমিই হ'য়ে উঠবে হয়তো কারো শিল্প-সাধনার পরম, প্রসন্ন পরিপূর্ণতা। কিছুই বলা যায় না, মিনু। জগতের চোখে তুমিই হ'য়ে উঠবে আরেকটি অমর মোনালিসা।

—উঃ, আমরা কী নিদারুণ মেয়েমানুষ! মিনতি হাসিতে যেন নিজেকে ধিক্কার দিয়ে উঠলো: একজনের অন্ধতায় সুযোগ পেয়ে যতো সব বাজে কবিত্ব করতে বসেছি।

কথাটার উলঙ্গ রূঢ়তা তনিমার স্বপ্নের সমস্ত সূক্ষ্ম লূতাতন্তুগুলো যেন ছিন্নভিন্ন করে' দিলো। নির্বাষ্প গলায় বললে—তুমি একবার দেখা করতে গেলে না?

—আর দেখা?

—সব দেখা আমরা চোখ চেয়েই দেখি না। একবার যাও। সে এখন ভারি একা। অলক্ষ্যে তনিমার গলা আবার ভারি হ'য়ে এলো: তার দৃষ্টিহীনতার অন্ধকার থেকে নির্জ্জনতাটাই এখন বেশি দুঃসহ।

—আমার যেতে ভারি ভয় করে, বৌদি।

—ভয়?

হ্যাঁ, মনে হয়, অতি অস্ফুট গলায় শূন্য, অনিমেষ চোখে মিনতি বললে—হাসতে গিয়ে মুখে ফুটে উঠলো করুণ একটা ভয়ার্ত্তি: মনে হয় তার দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে আমিও অন্ধ হয়ে যাবো। তারপর সেই ক্ষণিক মেঘলা গুমোটের উপর হানলে সে হাসির শিলাবৃষ্টি: মনে হয় তার সঙ্গে আমি আর সহজ সেই একটা মিল খুঁজে পাবো না। মনে হ'বে কী যেন ভীষণ এক অপরাধ করে' বসেছি।

—অপরাধ কিসে?

—মনে হ'বে, তুমি তা ঠিক বুঝবে না বৌদি, মনে হ'বে আমি আমার এই দু' চোখভরা আলোর তীব্রতায় তার সমস্ত দৃষ্টি ফেলেছি শুকিয়ে।

—এ যে আশাতীতরূপে মেয়েমানুষ হ'য়ে উঠছ, মিনু। তনিমা মৃদু হেসে তার হাতে একটু চাপ দিলো: তুমিই আবার তাকে ফিরিয়ে দেবে সেই আলো। তুমি একবার গিয়ে তার কাছে এখন বোস। অন্ধকারে চুপ ক'রে সে শুয়ে আছে।

—অন্ধকার!

—রৌদ্রালোকিত অন্ধকার আর কি।

আঁচলটা কাঁধের উপর গুছোতে-গুছোতে মিনতি বললে,—মাসিমা কোথায়?

—মা সারা দিন ধ'রে কাঁদছেন। অনেক কষ্টে এই খানিক আগে মুখে তাঁর

কিছু দেওয়ানো গেলো। তাঁর ব্লাড-প্রেসার ভীষণ বেড়ে গেছে। এখন একটু ঘুমিয়েছেন হয়তো।

তিন

বিকেল প্রায় হয়, একলা ঘরে মিহির চুপ ক'রে বিছানায় আছে শুয়ে, চারদিককার আবহাওয়ায় একটা ক্লান্ত পরাভবের ছায়া। যেন, পারলুম না, পারা গেলো না—এমনি একটা হতাশার কান্না স্তব্ধতায় গুমরে উঠছে।

কখন ফুটলো তার পায়ের শব্দ, হাওয়ায় লাগলো গায়ের ঢেউ,—মিহির দরজার দিকে তার নেবানো দুই চোখ বাড়িয়ে বললে,—কে, মিনু?

মিনতি কাছে এসে দাঁড়ালো : হ্যাঁ।

—তুমি সকালেও একবার এসেছিলে, না? মিহিরের গলায় এতোটুকু আর দারিদ্র্য নেই : তোমার বাবার গলা শুনতে পাচ্ছিলুম। তুমি কথা কিছু না বললেও দেখতে পাচ্ছিলুম তোমার সেই নীরবতা। কবে ফিরলে দেশ বেড়িয়ে?

—কাল।

—কাল? মিহির হঠাৎ তার নিস্তেজ চোখ দুটো প্রবল ঔৎসুক্যে ধারালো করতে চাইলো : কালকেই তবে একবার এলে না কেন?

—কাল ভারি ক্লান্ত ছিলুম, মিনতির গলা অনুশোচনায় আর্দ্র হ'য়ে এলো : রাস্তায় ভালো ঘুম হয় নি। ঘুমোলুম সমস্ত দিন, কথা বলতে-বলতে মিনতি তার বিস্তৃত বিছানায় এক পাশে ব'সে পড়লো : জিনিস-পত্র তছনছ, তাই সব গোছগাছ করতে-করতে সময় ক'রে উঠতে পারলুম না। তারপর বিকেলে এলেন এক অতিথি।

—উঃ, কাল যদি তুমি একবারটি আসতে মিনু, আমি তোমাকে চোখ ভ'রে একবার, শেষবার দেখে নিতুম।

মিনতি মিহিরের এলানো একখানা হাতের উপর সন্তর্পণে তার ডান হাতখানি তুলে দিলো : আবার দেখবে বৈ কি, ডাক্তাররা এমন-কিছু শক্ত কথা ব'লে যান নি। ওষুধটা লাগিয়ে এখন কেমন আছো?

সেই স্পর্শের নির্মল, শুভ্র একটা তাপ চলমান রক্ত-ধারায় ধীরে-ধীরে সঞ্চারিত ক'রে মিহির বললে,—ভালো আছি।

—ভালো আছো? উৎসাহে মিনতি যেন সমস্ত শরীরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো।

মিনতির আঙুল একটা তুলে ধ'রে মিহির বললে,—তোমার আঙুলটা যতোক্ষণ আমি এমনি ভাঙবার জন্যে টেনে ধরছি, ততোক্ষণই তোমার দুঃখ। যদি ছেড়ে

দিই, অমনি আবার তুমি সুস্থ, সহজ ; আর যদি ফেলি ভেঙে, তখনো তুমি শান্ত, নিশ্চিন্ত—দুই জায়গাতেই তোমার মুক্তি। শুধু মাঝের অবস্থাটাই ভয়াবহ, যখন তুমি ছেড়েও দিচ্ছ না, ভেঙেও ফেলছ না।

কথার তাৎপর্য্যটা মিনতির কাছে, চোখে এতো আলো থাকা সত্ত্বেও, স্বচ্ছ হ'লো না।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে মিহির আবার বললে,—প্রথমটা ভারি আর্ত্তনাদ ক'রে উঠেছিলুম, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও এই পাষাণের ভার থেকে, কিন্তু যখন ছেড়ে না দিয়ে ভেঙে-পিষে গুঁড়ো ক'রে ফেললো, তখন আরাম কিছু কম পেলুম না, মিনু। শূন্যতার আরাম। একটা বিশাল নিশ্চিন্ততা।

হাতের মধ্যে হাতখানি সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়ে মিনতি বললে,—তুমি অতো ভেঙে পড়ো না, ডাক্তাররা বলেছে এ তোমার ভালো হ'য়ে যাবে।

মিহিরের মুখে শ্রান্ত একটি হাসি ফুটে উঠলো : বরং ভেঙে গিয়েই তো আমি এখন ভালো আছি। যদি একদিন চোখ ফিরে পাই তো পাবো, কিন্তু আমি আর আশা করতে পারবো না, আমার এই অন্ধকারে এক বিন্দু আশা নেই। আশা মানুষকে ভারি ক্লান্ত করে—আমার এই কিছু-না-করবার কিছু-না-চাইবার অতল, চমৎকার আলস্য।

মিনতি তার শরীরময় এই অবারিত বিশ্রান্তির দিকে স্তব্ধ চোখে চেয়ে রইলো। পেশীতে শিরায় উছলে পড়তো যার কর্মপ্রবাহের দীপ্তি, সেই সম্পূর্ণাবয়ব সুস্থ লোক আজ পঙ্গুতার একটা বৃহৎ জড়পিণ্ড সজ্ঞানে, নিশ্বাস-নিতে-নিতে এ-কথা বিশ্বাস করাও যেন প্রকাণ্ড একটা 'ব্ল্যাসফেমি'।

—কথা কইছ না কেন, মিনু ? মিহির তার আঙুল নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে-করতে বললে,—আমি এখন কেবল শব্দ চাই, শব্দের ঝাপটা। পৃথিবীতে কতো রকম যে শব্দ আছে তা কোনোদিন শুনি নি এর আগে। চোখে দেখে যাকে আগে নীরব ব'লে ভাবতুম, এখন চোখ হারিয়ে দেখতে পাচ্ছি তার ঘুমন্ত মুখরতা। আমার অনুভবের স্তব্ধতায় শুধু মুহূর্ত্তের পদধ্বনি। আমি নিজে থেকে থেকে শুনছি শুধু এগিয়ে-যাওয়া যাত্রীর কোলাহল।

আরো একটু ঘেঁসে এসে মিনতি বললে,—তোমার চোখে কোনো যন্ত্রণা হচ্ছে ?

—একে যন্ত্রণা বলে না, স্পর্শের তাপে গ'লে আসা মিনতির নরম একখানি হাত মিহির তার চোখের উপর চেপে ধরলো : প্রকাণ্ড একটা বোঝা। এতো অন্ধকার দুই চোখে আমি কুলিয়ে উঠতে পারছি না। হঠাৎ মিহির বালিসে কনুয়ের ভর

রেখে উঠে বসলো : আর এ-সব বাজে কথা নয়, মিনু, তুমি এতো দিন ধ'রে এতো দেশ ঘুরে এলে, তার কথা বলো।

লজ্জায় চুপসে গিয়ে মিনতি বললে,—সে আবার কী একটা বলবার মতো কথা!

—বা, লোকে তো বেড়াতে যায় ফিরে এসে তার বর্ণনা দেবে বলে'ই। মিহির অল্প একটু হাসলো : জায়গাগুলো অমনিতে হয়তো সুন্দর নয়, শুধু বর্ণনার গুণেই তারা অবর্ণনীয় হ'য়ে ওঠে। মিনতির হাতখানি আবার সে টেনে নিলো : সৌন্দর্য্য উপভোগ করাই যদি মানুষের উদ্দেশ্য হ'তো তো এমন-সব জায়গায় হয়তো তারা যেতো, ভূগোলে-ইতিহাসে যারা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু গতানুগত্যই হচ্ছে মানুষের বংশানুক্রমিক ধাত। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা। মিহির উঠলো হেসে, মিনতির হাতে হাত বুলোতে-বুলোতে বললে,—তুমি তাই বলো, আমি তোমার চোখে সব দেখতে পাবো। সব দেখতে পাবো। তুমিই হ'বে আমার জীবনের বাতায়ন।

সেই একটুখানি স্পর্শের মাঝে মিনতি যেন তার সমস্ত শরীর নামিয়ে নিয়ে এলো। ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করলে : এমনি দেখেই কি তুমি পূর্ণ হবে, তুমি তা প্রকাশ করবে না?

—প্রকাশ? ম্লানায়মান আলোয় মিহির তার দুই চোখ প্রসারিত করে' ধরলো : এই অন্ধকারই কি আমার পরিপূর্ণ প্রকাশ নয়?

মিনতি তার কণ্ঠস্বরের বিহ্বল তন্ময়তায় মিহিরের একান্ত অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠলো : আমি যদি তোমার দেখবার দুই চক্ষু হই, তেমনি হ'বো তোমার দুই হাত। তুমি ব'লে যাবে, আমি লিখে দেবো তোমার কবিতা। অবিশ্যি ছবি আঁকা তোমার আপাততো বন্ধ রইলো, যতোদিন না আবার তুমি ফিরে পাও তোমার আসল চোখ।

মিনতিকে কাছে টেনে এনে মিহির ঝাপসা গলায় বললে,—আসল চোখ! তারপর সরে' গেলো সে তার উদাসীন নির্লিপ্ততায় : কিন্তু কী হ'বে আর লিখে বা ছবি এঁকে? কেনই বা মানুষে লেখে? কা'র জন্যে লিখবো?

মিনতি পুনরুক্তি করে' কথাটাকে গভীর ক'রে তুললো : কেন তবে মানুষে লেখে? কা'র জন্যে?

—কারো জন্যে নয়, শুধু নিজের জন্যে। মিহির বালিসে আবার ভেঙে পড়লো : ক্রমশ নিজে একটা কিছু হ'য়ে ওঠবার জন্যে। কেবল নিজের জন্যেই আর্ট—আর্টের জন্যে আর্ট নয়। মানুষ এই আর্টের মধ্য দিয়ে নিজেরই পূর্ণতা খোঁজে, তার যা

কিছু প্রকাশ দেখ, সবার ভিতরে প্রচ্ছন্ন থাকে তার একটা বিকাশের স্বপ্ন। নইলে মানুষ শুধু পরের জন্যে এতো পরিশ্রম করতো না। কিন্তু, মিহির তার ডান করতল উন্মুক্ত করে' নীরবে মিনতির স্পর্শের আশ্রয় ভিক্ষা করলো: কিন্তু আমি আর কেন লিখতে যাবো বলো? আমি পেয়ে গেছি আমার পূর্ণতা।

—পূর্ণতা? চমকে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে মিনতির হাত ভীরু পাখির মতো সেই স্পর্শের কুলায়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

—হ্যাঁ, আমার এই অন্ধকার। আমি পেয়ে গেছি আমার নির্ব্বাণ,—আমার পরিণতি এই শেষহীন সমাপ্তিতে এসে ঠেকেছে। আমি আজ একেবারে মুক্ত,—বুঝবে না তুমি আমার এই মুক্তির তীব্রতা। কাউকে কিছু দেবার নেই, কারু কাছ থেকে কিছু চাইবার নেই—এই অন্ধতা, এই ব্যর্থতাই তো আমার প্রকাণ্ড শিল্পসৃষ্টি। বলতে-বলতে তার কপালের নিচেকার শূন্য দুটো কোটর আগুনে ভরে' উঠলো। সে আবার বললে,—শুনেছি পৃথিবীতে আমাদের এই প্রাণ নাকি অলৌকিক একটা দুর্ঘটনা। পৃথিবীতে যতো সমুদ্র আছে, আর তাদের পারে আছে যতো বালুকণা, তাদের চেয়েও অসংখ্যেয় হচ্ছে নাকি আকাশের তারা—অগণনীয়, ভয়ঙ্কর তাদের বহুলতা। আর এতো বড়ো, এতো বিপুল সৌরজগতে কোথাও নাকি এক বিন্দু প্রাণ নেই। সব আগাগোড়া বিস্তীর্ণ একটা বধির শূন্যতা। আকাশে যতো তুমি স্থান দেখছ সব এতো ঠাণ্ডা যে প্রাণ সেখানে যাবে নীহারীভূত হ'য়ে; যতো দেখছ বস্তু, সব এতো গরম যে প্রাণের সম্ভাবনাও সেখানে পুড়ে ছারখার হ'য়ে গেছে। তুমি ভাবতে পারো মিনু, এতো বড়ো একটা ব্রহ্মাণ্ড, তাতে, শুধু এই এককণা আমাদের এই পৃথিবীটা ছাড়া কোথাও নেই প্রাণ, নেই প্রেম, নেই আশা, নেই প্রাণ থেকে প্রাণে অমর হ'বার এক বিন্দু প্রেরণা। ভাবতে পারো আমাদের এই প্রাণধারণ ও তার অনুষঙ্গের প্রতি সমগ্র বিশ্বময় কী প্রচণ্ড, নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য। সমস্তটা দিন শুয়ে-শুয়ে আমি কেবল এই কথা ভেবেছি। তুমি যদি আকাশের তারার তুলনায় আমাদের এই পৃথিবীর কথা ভাবো—এই বিশাল প্রাণহীন শূন্যতার সঙ্গে পরিমাপ করো একবার আমাদের এই ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র অকিঞ্চন প্রাণস্পন্দন,—তবে কী আশ্রয় তুমি পেতে পারো এই অকূল নির্জ্জনতায়? আমার কাছে আর তোমরা কিছু আশা করো না, মিনু, আমি তোমাদের এই পৃথিবীর ধূলিকণা ছেড়ে সেই মৃত, শীতল, স্তব্ধ বিশালতার অন্ধকারে চ'লে এসেছি। তোমরা তাকেই বলো মৃত্যু।

উত্তেজনায় মিহির আবার উঠে বসলো: কথা, কথা, আজ আমি কেবল কথা শুনতে চাই, মিনু। সেই মৃত্যুনীল স্তব্ধতা আমি একেকসময় আর সইতে পারি না।

মিনতি বললে—কী কথা কইবো ?

—তা জানি না। তবু যখন তোমাকে কথা বলতে শুনি তখন হাতড়ে-হাতড়ে আবার পৃথিবীকে খুঁজে পাই—এতো বড়ো ব্যর্থতার মরুভূমিতে ঘাসের এক কণা বিস্ময়, বিধাতার অনেক সব ছন্দপতনের মাঝে একটি নিখুঁত কবিতা। মনে হয়, এই পৃথিবীতে এখনো জাগে ঘাস, জ্বলে বাতি, নামে বর্ষা। কিন্তু আমাদের এই গ্রহতারার ঘূর্ণ্যমান অন্ধকারে—কী আর কথা তোমাকে কইবো, আমাকে আবার সব নতুন করে' আরম্ভ করতে হ'বে। নতুন ক'রে আরম্ভ করার মতো ভয়ঙ্কর আর কিছু নেই। চলতে সোজা, কিন্তু আরম্ভ করতে কতো কঠিন !

—কী কইবো ? মিনতি এই কথার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না : আমি একটা কিছু না-হয় বই পড়ি, তুমি শোনো।

—না, না, বই নয়। মিহির হাসতে চেষ্টা করলো : অনেক পড়েছি, আর বিদ্যে নয়, এখন বিস্ময়। তুমি তোমার বেড়ানোর গল্প বলো, সেই আমার খুব ভালো লাগবে। ব'লে মিহির তাকে একটু ধরিয়ে দিলে : এখান থেকে তো সোজা আগ্রা গেলে—

—হ্যাঁ, সাহস পেয়ে মিনতি গলা খুললো : উঠলুম এসে একটা হোটেলে, তাজমহলের পাড়ায়। আগ্রার তিনটে ষ্টেশান : ফোর্ট, সিটি, ক্যাণ্টনমেণ্ট। প্রথম ষ্টেশান থেকেই ট্রেনের পিছে-পিছে হোটেলের গাইড লেগে গেলো। রাত্রিকাল—কোথা দিয়ে কোথায় এসে পৌঁছুলুম, সব একটা শেষরাত্রের স্বপ্নের মতো ঝাপসা লাগছিলো। এক ঘুমে পার হ'য়ে এলুম সেই রাত।

—ছোটখাটো সব ডিটেইলস—কিছু বাদ দিয়ো না। ওগুলোই হচ্ছে গল্পের নুন।

—অসম্ভব। মিনতি বলবার উৎসাহে তপ্ত হ'য়ে উঠেছে : তাজমহল দেখার আগে ও-সব বলতে যাওয়া মানে ছ্যাচড়া দিয়ে নেমন্তন্নর খিদে মেরে রাখা। যতো শিগগির সেখানে গিয়ে পৌঁছুতে পারি।

—হ্যাঁ, তারপর ভোর হ'লো।

—ভালো ক'রে ভোর তখন হয়ও নি, অতিথিদের জন্যে হোটেলের টাঙা তৈরি। মুখ ধুলুম কি না-ধুলুম, গায়ে চাদর একটা জড়িয়ে—সেখানে বেশ একটু মিঠে-মিঠে শীত—বেরিয়ে পড়লুম সটান। নিরিবিলি রাস্তা—টু তাজ, টু তাজ,—রাস্তা আর ফুরোয় না ! দূর থেকে দেখা যাচ্ছে গম্বুজের চুড়ো, এঁকে-বেঁকে রাস্তা কেবল বেড়েই যাচ্ছে।

—টাঙা ছেড়ে দাও, মিহির আবেগে মিনতির দুই হাত চেপে ধরলো : শিগ্‌গির চলে' এসো তাজমহলের দরজায়।

—হ্যাঁ, তারপর তো এলাম। ফটক পেরিয়ে খানিকটা বাঁধানো রাস্তা হেঁটে একেবারে তাজমহলের মুখোমুখি। তবু দূর থেকে কী-একটা না-জানি-কী মনে হয়েছিলো, এখন সামনে দাঁড়িয়ে—এই, এই তাজমহল! এরি জন্যে এতো ঢাক-ঢোল, কবিতার এতো আতসবাজি। সীতেশবাবু তো তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন: তিনি এখুনি গিয়ে রেল-কোম্পানির নামে মামলা করবেন—তাঁর ট্রেনের ভাড়া ফিরিয়ে দিতে হ'বে। বললেন: এই হচ্ছে স্বপ্নে শ্বেতপাথর! এ আবার একটা ডিজাইন্!

মিহির তন্ময় হ'য়ে শুনছিলো, কিন্তু মাঝপথে তাকে বাধা দিতে হ'লো: সীতেশবাবু কে?

—কে এক ইঞ্জিনিয়ার, এলাহাবাদে আমাদের সঙ্গে আলাপ। ভারি আমুদে লোক, বাবার সঙ্গে ভীষণ ভাব হ'য়ে গেছে। যেমন হাসাতে পারেন, তেমনি পারেন চটাতে। আসা-যাওয়ার সমস্ত রাস্তাটা চমৎকার কেটেছে।

মিহির লঘু স্বরে বললে,—তাই বুঝি আর ঘুমুতে পারো নি। কিন্তু কে-এক ইঞ্জিনিয়ারের মান রাখতে গিয়ে তুমি কিনা এতো বড়ো তাজমহলকে একেবারে পথে বসিয়ে দিলে, মিনু।

—না, ঈষৎ উষ্ণ হ'য়ে মিনতি বললে,—প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়বার মতো তাজমহল এমন কিছু অপরূপ নয়, কিন্তু প্রেমের যা নিয়ম, পরিচয়ের গভীরতা থেকেই তার সৌন্দর্য্য হয় উদ্‌ঘাটিত। খানিকক্ষণ দাঁড়াতেই সেই অবারিত, প্রশান্ত শুভ্রতায় মনের সমস্ত কুণ্ঠা কেটে গেলো—ফুটে উঠলো অকায়িক একটা আপন কল্পনা। কাব্যবোধের দিক দিয়ে না এগোলে সৌন্দর্য্যবোধ হয় না, দুঃখকে মনেই হয়না কখনো উৎসবের মতো। দুঃখকে এমন ভাবে প্রকাশ করতে হ'বে যে পরকে দেবে আনন্দ। তাজমহলের এই গুণ আছে যে মনে তা আরেকটা নতুন তাজমহল তৈরি ক'রে দেয়। তাই তা এখনো সজীব, মনে হয় যেন কালকের অশ্রুজল জ'মে এ-পাথর গ'ড়ে উঠেছে।

—তোমার ইঞ্জিনিয়ার প্যাসেঞ্জারকে সে-কথা বললে?

বলা বৃথা। তার কাছে যমুনা হচ্ছে শুকনো একটা নর্দ্দমা, তাজমহল হচ্ছে মাত্র একটা structure। কিন্তু মুখে যে যতো snobberyই করুক, তার আবহাওয়ায় মনের চেহারা একটু বদ্‌লাবেই।

—তোমার ইঞ্জিনিয়ারের মনের চেহারা বদলালো টের পেলে?

কথার প্রচ্ছন্ন স্বরে মিনতি চম্‌কে উঠলো, মধুর মুখে বল্‌লে,—কবিতাকে যারা মনের একটা দুর্ব্বলতা ব'লে মনে করে, তাদের ওপর আমার সত্যিই

কোনো শ্রদ্ধা নেই। আমার তো মনে হয় তারা সম্পূর্ণ বাড়তে পায় নি। কিন্তু, ঢোঁক গিলে মিনতি বল্‌লে,—তাজমহলের কথা থাক্!

—হ্যাঁ, সেখান থেকে কোথায় তারপর গেলে?

কথার স্বরে মিনতির শরীরের দীপ্তি যেন ঠিকরে পড়তে লাগলো: চিতোরগড়। শেষরাত্রে পৌঁছলুম। নির্জ্জন অন্ধকার,—পাহাড় আর বন, স্টেশানের বাইরে ধারে-পারে কোথাও এক ফোঁটা নিশ্বাসের আভাস পাওয়া যায় না। কোথায় যে এসেছি, ভাবতে স্বপ্নের মতো অসম্ভব লাগে।

মিহির গম্ভীর মুখে বললে,—আমি যেন তা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

উৎসাহে মিনতির হঠাৎ ভাটা পড়লো, গলা এলো স্বাভাবিকতায় শান্ত হ'য়ে: কোথায় যাই, সামনে নাকি একটা ধর্ম্মশালা আছে, ডাক-বাংলোতে নাকি জায়গা নেই। কুলির মাথায় মোটঘাট চাপিয়ে বেশ খানিকটা রাস্তা পায়ে হেঁটেই ধর্ম্মশালা পৌঁছলুম। সেখানেও লোকে লোকারণ্য, উঠোনটায় এক দঙ্গল উট। ঘর খালি নেই, খবর পাওয়া গেলো, ভোরবেলায়ই এক দল বেরিয়ে যাবে, বারান্দাতেই অপেক্ষা করতে হ'বে ততোক্ষণ। সীতেশবাবু কিছুতেই দমবার পাত্র নন্, মাটিতে লাঠি ঠুকে বল্‌লেন: ভোর? ভোর তো সেই রাত বারোটার পরেই হ'য়ে গেছে। কই, দেখি কোন্ ঘর। সেই দেহাতি রাজপুতগুলোকে সেখানে থেকে তিনি ওঠালেন তবে ছাড়লেন। তাঁর হাতের টর্চ দেখে তো তারা ভয়েই অস্থির, পথ ছেড়ে দিতে পারলে বাঁচে। উঃ, ঘরের মধ্যে কী মশা আর দুর্গন্ধ—তার চেয়ে বাইরের ঐ উটগুলো অনেক ভালো।

—সীতেশবাবু তোমাদের সঙ্গে চিতোরও গিয়েছিলেন নাকি?

—বরাবর। মিনতির তখনকার চোখের বিরক্তি মিহির দেখতে পেলো না: বাবার সঙ্গে ভারি জমিয়ে ফেলেছেন যে। এমন-কি দু' জনে তখন—দু' জনই সই,—ট্রেইকে তাস খেলতে ব'সে গেছেন। চিতোরে এসেও তাস খেলা—ভাবতে পারো? কখন কি তাস হাতে আসে তার ঔৎসুক্যই যেন প্রচণ্ড। টাঙাওয়ালা তাড়া দিচ্ছে, চ'ড়ে যাচ্ছে রোদ, তবু তাঁদের হুঁস নেই। মিনতি হেসে উঠলো।

মিহির বললে,—তারপর তাঁদের তুলতে পারলে?

—তক্ষুনি। ঘুরে-ঘুরে টাঙায় ক'রেই পাহাড়ের ওপরে উঠে এলুম। সমস্ত পাহাড়টাই ছিলো দুর্গ—সে কী দৃশ্য, তোমায় কী বলবো? অমন দেশ না হ'লে প্রতাপ কখনো জন্মাতে পারতো না, অমন দেশ না হ'লে কারো প্রতিজ্ঞা এমন অটল, অভ্রভেদী হ'য়ে ওঠে না। সে কী কর্কশ কাঠিন্য, নির্ম্মম রুক্ষতা! এর কাছে

উদয়পুরকে দেখায় একটা পোস্ট্কার্ড পিকচার। অথচ চিতোর হচ্ছে উদয়পুরেরই অধীনে ছোট্ট একটা গ্রাম।

—সেখানে আর কী-কী দেখলে?

—মীরাবাইর মন্দির, রাণা কুম্ভের জয়স্তম্ভ, জহর কুণ্ড—মানে একটা সুড়ঙ্গ, কোথায় চৈতককে বেঁধে রাখা হ'তো, কোথায় মরেছিলো বাদল—কিছু মনে নেই। কিন্তু মনে পড়ছে শুধু সেই বর্ব্বর পার্ব্বত্য রুদ্রতা, সেই ক্লেশ, সেই সংযম, সেই তপস্যা।

মিহির মৃদু হাসলে: সেই কঠিনের আবহাওয়ায় এসেও মনের চেহারা আবার বদলে যায়, না মিনু?

মিনতি থতোমতো খেয়ে বললে,—কী রকম?

—ঐ তোমার সীতেশবাবু কেমন পল্টনি মেজাজ দেখালেন, টর্চ টিপে, লাঠি ঠুকে, রাত ক'রে বেচারা রাজপুতদের বা'র ক'রে দিলেন ধর্ম্মশালা থেকে।

—উঃ, সে যদি তুমি দেখতে! মিনতি ঝরঝর ক'রে হেসে ফেললো: ভদ্রলোক লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে প্রায় একটা ডগলাসি কাণ্ড বাধিয়ে বসলেন। একেকসময় ভয় করছিলো দস্তুরমতো। এই সব কৃত্রিম **knight-errantry** দেখে হাসিও যে পাচ্ছিলো না তা নয়।

মিহির যেন অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠেছে: তারপর আর কোথায় গেলে?

—উদয়পুর, বাইরেটা যেমন সাদা, ভিতরেও তেমনি তার সাহেবিয়ানা। তলাওগুলিতে মাছ ধরলে নাকি কঠোর শাস্তি, অবিশ্যি সাহেবদের ছাড়া। কৃত্রিম হ্রদ দেখে রোমাঞ্চিত হ'বার বয়েস নেই—যে বয়সে লাল-দীঘিটাকে বে অফ বেঙ্গল ব'লে ভাবতুম।

—কোন রাস্তায় ফিরলে?

—দিল্লী হ'য়ে। যাঃ, হাসতে গিয়ে মিনতি মাথায় হাত দিয়ে বসলো: আসল কথাই তোমাকে বলা হয় নি।

—সেটা কী? সীতেশবাবু লেইকের মধ্যে প'ড়ে গেলেন?

—না, আগ্রা থেকে ট্যাক্সিতে আমরা ফতেপুর-সিক্রি গেছলাম। এক দৌড়ে চিতোরে যাবার উৎসাহে মাঝখানে সে-জায়গাটা ফেলে এসেছি।

—আগ্রা থেকে কতো দূর?

—বেশি নয়, মাইল কুড়িক হ'বে বোধ হয়। হোটেলের ওদের সঙ্গে বাস-এই যেতে পারতুম অনায়াসে, তা না, সীতেশবাবুর জিদ, ট্যাক্সিতে যেতে হ'বে।

আমাদের কী, দিব্যি পরের মাথায় হাত বুলোলুম। সামনেই একটা ডাকবাংলোর মতো আছে—তার কী হেভি চার্জ, তাই আমাদের যেতে হ'বে। এমন খরচে লোক—

—তোমার ফতেপুর-সিক্রি সম্বন্ধে এইগুলিই বুঝি খুব ইম্‌পর্টেন্ট।

—তা না, নিজেকে মনে-মনে ধিক্কার দিয়ে মিনতি বর্ণনার মর্মস্থানে চ'লে এলো: ইম্‌পর্টেন্ট হচ্ছে তার সেই বিশাল ধ্বংসস্তূপ, বলতে পারো সেই ব্যর্থতার মরুভূমি। জাহাঙ্গিরকে পাবার পর আকবর তাঁর গুরু সেলিম চিস্তির পাদমূলে এসে নতুন রাজধানী বসালেন, ইতিহাসে তা আমরা পড়েছি, জল পাওয়া গেলো না ব'লে সেই রাজধানী শুকিয়ে গেলো, আকবর ফিরে এলেন আগ্রায়। কিন্তু জাহাঙ্গিরের জন্ম, মোগল-সাম্রাজ্যের পরবর্তী সম্রাটের পেছনে কী মর্ম্মান্তিক করুণ ট্র্যাজেডি, সেলিম চিস্তির কী বিরাট স্বার্থত্যাগের মহিমা লুকিয়ে আছে, ইতিহাসে কোনো পৃষ্ঠায় তা লেখা নেই।

—সেটা কী? মিহির যেন প্রথমটা কেমন হতভম্ব হ'য়ে গেলো: সীতেশবাবুর কানো—

—পাগল! তার চুলের মধ্যে ধীরে আঙুল চালাতে-চালাতে মিনতি বললে,—এর আগে আকবরের সন্তান নাকি হ'য়ে আর বাঁচছিলো না, বা একদম হচ্ছিলো না, এমনি একটা কিছু হ'বে—তাই যাতে জাহাঙ্গির সুস্থ, সম্পূর্ণ হ'য়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে, হয় দীর্ঘজীবী, সেই জন্যে সেলিম চিস্তি নিজের একমাত্র ছ' মাসের শিশুটিকে নিজ হাতে হত্যা করে। সিক্রির বাইরে একটেরে এক নির্জ্জন জায়গায় সেই ছোট ছেলেটির ছোট একটি কবর আছে। চার্মিং! কোথায় লাগে তোমার সেই বুলন্দ দরওয়াজা, কোথায় বা সেই হাতির দাঁতওলা মিনার—ঐ নিভৃত, পরিচ্ছন্ন, সুষুপ্ত কবরটির কাছে কেউ কিছু নয়। আমি তা'র একটা খসড়া ছবি এঁকে এনেছিলুম, ভেবেছিলুম তোমাকে দেবো—মিনতি হঠাৎ সন্ত্রস্ত হ'য়ে থেমে পড়লো।

—ছবি সব ফুরিয়ে গেছে, এখন কেবল কথা। তারপর?

—এতো তো দেখলুম, কিন্তু এর মতো কিন্তু খুঁজে পেলুম না। দেখাটা আমাদের চোখে নয়, আমাদের মনে।

—কিন্তু তোমার দিল্লি?

—সমারোহ আমার সত্যি ভালো লাগে না, বিতৃষ্ণায় মিনতির মুখ ভারি হ'য়ে এলো: যা কিছু সত্য, তাই অত্যন্ত সরল। দৈত্যকায় দুর্গ মিনার ইত্যাদি বিস্ময় জাগাতে পারে, যেন স্পর্শ করতে পারে না। ঔদ্ধত্যের চেয়ে ব্যর্থতাতেই তাই বেশি

কবিতা। সমস্ত দিল্লিতে মাত্র জাহানারার কবরটি আমার ভালো লেগেছে, খোলা আকাশ, মাটির একটি বাতি, করুণ দু'টি কবিতার লাইন।

কথা আর কথা, কথার শব্দ, কথার তাপ, কথার গন্ধ—মিহিরের অন্ধকৃত আলস্য নেশায় মদির হ'য়ে উঠলো। কথাগুলি চুম্বনের মতো মুখে পড়ছে ছিটিয়ে, চারদিকের হাওয়া ঘন হ'য়ে উঠছে স্পর্শের ফেনিলতায়। অন্ধকার আকাশে ফুটে উঠছে কথার তারকা, স্তব্ধতার সমুদ্রের উপর দিয়ে উ'ড়ে চলেছে কথার পাখিরা।

সুনয়নী দেবী ঘরে ঢুকলেন। কয়েক ঘণ্টাতেই তাঁর চেহারা কী ভয়ানক খারাপ হ'য়ে গেছে। মুখে আতঙ্কিত একটা বিশীর্ণতা, দুই চোখে যেন কতো রাত্রির নির্ঘুম ক্লান্তি। ভয়ে-ভয়ে মিহিরের শিয়রের কাছে এসে ততোধিক ভয়ে-ভয়ে জিগগেস করলেন: এখন কেমন আছিস?

বালিসে গলাটা একটু উঁচু ক'রে মিহির পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ত গলায় বললে,—বেশ ভালো আছি, মা।

সুনয়নী আনন্দে যেন অবশ হ'য়ে এলেন; তা'র উন্মুক্ত, তেমনি অবিকৃত চোখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অভিভূতের মতো চেয়ে থেকে বললেন,—তোর চোখ?

—না মা, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

সুনয়নীর মুখ যেন রেখায় আরো করুণ হ'য়ে এলো: ঝাপ্‌সা-ঝাপ্‌সা, একটু ফ্যাকাসে—

—না মা, ঠাণ্ডা, অনড় অন্ধকার।

সুনয়নী সুইচ-বোর্ডের কাছে গিয়ে বললেন,—আলোটা জ্বালি। দ্যাখ তো একবার চেয়ে।

—জ্বালো। স্বয়ং সূর্য্য যেখানে হার মানলো,—কিন্তু সন্ধ্যে কি হ'য়ে গেছে, মা?

ইতিমধ্যে সুনয়নী আলো জ্বালিয়েছিলেন।

মিনতি বললে,—হ্যাঁ।

—বেশ অন্ধকার হ'য়ে এসেছে? তারা ফুটেছে?

—এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি না।

—দেখতে পাচ্ছ না কী, মিনু?

মিনতি লজ্জিত হ'য়ে বললে,—হ্যাঁ, দুয়েকটা ক'রে ফুটছে।

ঝট্ ক'রে মিহির উঠে বসলো: আমাকে হাত ধ'রে একবারটি বারান্দায় নিয়ে যেতে পারো? চেয়ার পেতে বসতুম একটু। তুমি কি এখুনি বাড়ি চ'লে যাবে নাকি?

—না। এসো। মিনতি হাত বাড়ালো।

সুনয়নী বারান্দায় পাশাপাশি দু'খানি চেয়ার সাজিয়ে রাখলেন। সামনে ছোট একটি টিপয়।

মিনতির হাতের উপর তার পুঞ্জ-পুঞ্জ অন্ধতার অসহায় কাকুতি ঢেলে দিয়ে মিহির খাট থেকে মেঝেয় নেমে এলো। ঘরটা পার হ'য়ে যেতে-যেতে লঘু স্বরে বলতে লাগলো : অনুভবে আমি সব দেখতে পাচ্ছি, মিনু। এই বাঁ পাশে আমার আল্‌নাটা, ডাইনে ওপর-ওপর বাক্সগুলো সাজানো, দেয়ালে আমার সেই আঁকা ছবিটা—দাঁড়াও, চৌকাঠে ভীষণ লেগে গেলো পায়ে—

চেয়ারে এসে বসতেই মিহির ভেঙে পড়লো : আমাদের দক্ষিণটা তেমনি ফাঁকা, মিনু ? সেই দূরের মন্দিরের চুড়োটা দেখতে পাচ্ছ ?

মা কাছে আছেন মনে ক'রে তাড়াতাড়ি আবার সে চাঙ্গা হ'য়ে উঠলো : তোমার কিছু ভয় নেই, মা, ডাক্তারের ওষুধে না ভালো হই, নিজের কল্পনায় আবার চোখ ফিরে পাবো দেখো। ঐ তো সিঁড়ি দিয়ে কে উঠছে—নিশ্চয়, নিশ্চয় বৌদি।

—হ্যাঁ, মিনতি বললে,—তোমার চা নিয়ে আসছেন।

—সঙ্গে তোমার চা নেই ? বৌদি !

—আছে। সামনের টিপয়ে তনিমা কাঠের ট্রে-টা নামিয়ে রাখলো।

সিঁড়িতে আবার তক্ষুনি কা'র জুতোর আওয়াজ হ'লো। শব্দের ঝাপটায় মিহিরের চেতনা উঠলো কেঁপে, মিনতির দিকে মুখ তুলে ভীরু গলায় জিগগেস করলে : কে আসছে ? দাদার পায়ের শব্দ তো নয়।

মিনতি বললে,—নৃপতি।

উৎসাহে মিহির চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লো : এসো, এসো, নৃপতি। কতোদিন তুমি এদিকে আসো নি। নৃপতির জন্যে চা নিয়ে এসো, বৌদি। আরেকটা চেয়ার, মা।

চার

শেষকালে এমন হ'লো মিহিরের চোখের-জন্যে-আসা ডাক্তারই অপ্রস্তুত অবস্থায় সুনয়নী দেবীকে ইন্‌জেক্‌শান্ করলো। ব্যাপারটা ঘোরালো হ'য়ে উঠলো এমন আকস্মিক।

দিনের পর চলে' যাচ্ছে দিনের মিছিল, রাতের কিনারে আবার নতুনতরো

দিনের স্থচনা, তবু মিহিরের চোখ চাইবার নাম নেই। পাথরের মতো কঠিন অন্ধকার। স্থনয়নী রাত্রে ঘুমুতে পারেন না, চোখ বুজলেই অন্ধকারে তিনি হাঁপিয়ে ওঠেন, আর চোখ মেললেই আলোয় তাঁর দৃষ্টি আর্ত্তনাদ করতে থাকে। রাত-দিনের আর ব্যবধান নেই, সময়ের একটা বিবর্ণ, বিস্তীর্ণ একঘেয়েমি, অন্ধকারের একটা স্থূল, স্থাবর চিরস্থায়িত্ব—মিহিরের এই বন্দীত্ব স্থনয়নী সহ্য করতে পারছিলেন না। আর তাঁর সেই মিহির! চোখে যার ছিলো কতো স্বপ্ন, কতো আশা, কতো সন্ধিৎসা! আজ সে একস্তূপ অসার নিৰ্জ্জীবতা, একপিণ্ড স্তম্ভিত অন্ধকার!

স্থনয়নী শরীর একেবারে ছেড়ে দিলেন। তীক্ষ্ণ একটা আর্ত্তনাদকে যদি জোর করে' চেপে মূক করে' দেয়া যায়, তবে তার চেহারা হ'য়ে ওঠে হয়তো স্থনয়নীর এই মুখ।

ব্যাপারটা ঘটেছিলো সেদিন।

স্থনয়নী সকালবেলা, রোজকার মতোই ভয়ে-ভয়ে মিহিরের ঘরের দিকে আসছিলেন, খবর নিতে, আজ, অন্তত আজ চোখের কোনো তার পরিবর্ত্তন হ'লো কিনা। রোজই সেই একই উত্তর—সেই এক অন্ধকার। যে-তিমিরে সেই তিমিরে। রোজই সেই নিরুদ্দেশ, নির্ব্বাক শূন্যতা।

কিন্তু আজ স্থনয়নী ঘরে ঢুকেই স্থখে একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন। কথা বলতে গিয়ে গলায় জোর পেলেন না, দরজাটা ধরে' ফেলে তিনি এই বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলাতে চেষ্টা করলেন কোনো রকমে।

জানালার কাছে চেয়ার টেনে বসে' ভোরের নতুন আলোয় মিহির বই পড়ছে। মিহির বই পড়ছে! কোলের উপর দু' হাতে তার একটা বই ধরা। তার দুই চোখ আলোর অতৃপ্ত উচ্ছ্বাসে বিস্ফারিত হ'য়ে উঠেছে। পড়বার আগ্রহে মুখের রেখায় কঠিন একটা তীক্ষ্ণতা।

হ্যাঁ পড়েছে, সত্যি-সত্যি পড়ছে। অক্ষর অনুধাবন করবার জন্যে বিশেষ তার কোনো পরিশ্রম করতে হচ্ছে না, বইর সঙ্গে চোখের স্বাভাবিক দূরত্ব রেখে সে জোরে-জোরে পড়ছে, চেঁচিয়ে পড়ছে, গলায় এসেছে যেন তার আলোর জোয়ার, শব্দের উচ্চারণে ঝরে' পড়ছে যেন আলোর উচ্ছলতা। বসবার সমস্ত ভঙ্গিটি তার দৃষ্টির উত্তাপে প্রাণময়, উচ্চারিত কথার টুকরোগুলো তার দৃষ্টির আকাশে যেন কলকণ্ঠ পাখির মতো উড়ে' বেড়াচ্ছে।

স্থনয়নী আনন্দে মন্থর পায়ে সেই চেয়ারের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। তাঁর বুক কাঁপছে, সমস্ত শরীর সাতঙ্ক প্রতীক্ষায় শিউরে-শিউরে উঠছে, চোখ দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে আগ্রহের আগুনে। আসতে-আসতে নিঃশব্দে একেবারে মিহিরের

পিছনে এসে দাঁড়ালেন। দৃষ্টির দুঃসহ দীপ্তিতে মিহির চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বই থেকে কবিতা পড়ে' চলেছে—সেই শব্দের ঘ্রাণ নিতে-নিতে সুনয়নী নেশায় বিভোর হ'য়ে উঠলেন। মিহিরের ঘাড়ের উপর হাত রেখে একটু নুয়ে পড়ে' মুখের কাছে মুখ এনে স্নেহে গলে' গিয়ে জিগ্‌গেস করলেন: দেখতে পাচ্ছিস, মিহির?

বোবা চোখ তুলে শূন্য, সাদা গলায় মিহির বললে,—না তো।

—দেখতে পাচ্ছিস্ না কী! সুনয়নী কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না: তবে বই পড়ছিস কী করে'?

—বই পড়ছি না, মা মিহির শান্তমুখে হেসে বললে: মুখে-মুখে একটা কবিতা আবৃত্তি করছি।

সুনয়নী প্রায় ধম্‌কে উঠলেন: কবিতা আবৃত্তি করছিস, তবে কোলের ওপর তোর বই মেলা কেন?

মিহির গলা ছেড়ে নির্বোধ শিশুর মতো হেসে উঠলো: ওটা মা, আমার জানা বই, কাল সেল্‌ফ্‌ থেকে বেছে মিনু পেড়ে দিয়ে গেছে। যে-কবিতাটা আওড়াচ্ছিলুম, সেটা ষোলোর পৃষ্ঠায় সুরু, তা আমি ভুলিনি। গুনে-গুনে সেই পৃষ্ঠাটা বা'র করেছি—এই দেখ। যা আমি বলে' যাচ্ছি, প্রতিটি লাইন হুবহু এই পৃষ্ঠায় স্পষ্ট ছাপা আছে; কখন পৃষ্ঠাটা উল্‌টে যেতে হ'বে তা-ও আমি বলে' দিতে পারবো। কিন্তু—

সুনয়নী তবু প্রতিবাদ করলেন: ও তো তুই ইংরিজি বলছিলি, মিহির। চোখে না দেখলে এতো কথা ইংরিজিতে—

চেয়ারের হাতলের উপর মা'র একখানি হাত চেপে ধরে' মিহির বললে,—ইংরিজি হ'লে বুঝি আর তাকে মুখস্ত করে' রাখা যায় না! তুমি দাদাকে ডেকে নিয়ে এসো, বই ধরতে বলো, দেখুক কেমন একটা কথাও আমি ছেড়ে যাই। সামান্য কমা-সেমিকোলন পর্য্যন্ত আমার মুখস্ত, মা।

বিবর্ণ, বিরক্ত মুখে সুনয়নী আবার ধম্‌কে উঠলেন: মুখস্তই যখন আছে, তখন ঠাট করে' কোলের উপর বই টেনে বসা কেন?

—ভাবলুম মা, মিহিরের গলা বেদনায় মুহ্যমান হ'য়ে এলো: সেই সব আমার পরিচিত অক্ষর সারি-সারি সাজানো আছে, ভাবলুম উচ্চারণের সহানুভূতির তাপে হয়তো তাদের মূর্চ্ছা ভাঙবে, হঠাৎ একসময়ে চোখ চেয়ে হাসিতে তারা ঝল্‌মল করে' উঠবে, মা। মিহির সেই খোলা পৃষ্ঠার উপর কোমল করে' হাত বুলুতে লাগলো: চেষ্টা করে' দেখছিলুম ঘুম তাদের ভাঙে কি না, হাসিমুখে আবার আমাকে চিনতে পারে কি না, কিন্তু—

সুনয়নী মেঝের উপর একেবারে ভেঙে পড়লেন। এই রূঢ়, নির্লজ্জ আঘাতটা তিনি আর দেহ দিয়ে বইতে পারলেন না। দুপুরবেলা হঠাৎ মাথা ঘুরে, চোখে অন্ধকার দেখে, মেরুদণ্ড টলে' গিয়ে মুহূর্তে তাঁর কী যে অসম্ভব করে' উঠলো বোঝা কঠিন।

তাঁর পক্ষে বোঝা কঠিন, কিন্তু বুঝলো সেই চোখের ডাক্তার যে সেই সময় ঘটনাচক্রে সেখানে হাজির ছিলো। যাকে বলে কি না য়্যাপোপলেক্‌সি। হঠাৎ এক মুহূর্তে তাঁর গতি ও চেতনা যেন রুদ্ধ হ'য়ে গেছে।

তাঁর চারধারে নেমে এলো নিরাবরণ অন্ধকার, সেই অন্ধকার শব্দে স্পন্দিত হ'বার নয়, স্পর্শে তাতে অনুভবের দীপ্তি আনা যায় না।

সমস্ত পরিবারের ভিত গেলো নড়ে', আঁকড়ে ধরবার জন্যে দ্বিজেন হাতের কাছে একটাও যেন আশ্রয় খুঁজে পেলো না। ছুটির দরখাস্ত করে' পাঠালো, এবং সেই ছুটিও এলো প্রায় ফুরিয়ে।

তনিমা মিহিরের মাথা ধুইয়ে চুল আঁচড়ে দিতে-দিতে বললে,—তুমিও আমাদের সঙ্গে তমলুক যাবে চলো।

—তমলুক? সেখানে গিয়ে আমি করবো কী?

—নইলে এখানে একা-একা—

—তবু এখানকার অন্ধকার খানিকটা আমার চেনা হ'য়ে গেছে। মিহির ক্লান্ত গলায় বললে,—কালিদাসের হাত ধ'রে ধরে' তবু আমি একটু চলাফেরা করতে পারি। বাড়ি-ঘর-দোর প্রায় চিনে উঠেছি, কাল মাঝরাতে, তোমরা তখন ঘুমে, দিব্যি একাই তো রেলিঙ ধ'রে-ধ'রে ছাতে উঠে গেলুম, মিনু বলেছিলো কাল ছিলো নাকি পূর্ণিমা—

তনিমা বললে,—কিন্তু এখানে তোমাকে কে দেখবে?

—কে আবার দেখবে! কালিদাসই তো আছে। ও একাই একশো। ও আমার জন্যে যা করছে বৌদি, আর-জন্মে আমি ওর ভাই ছিলুম। ওকেই সব বুঝিয়ে দিয়ে যেয়ো, ও সব গুছিয়ে বন্দোবস্ত ক'রে নিতে পারবে। ঠাকুরটাকেও রেখে যেয়ো। আর—

—মিনুকেও ব'লে যাবো তোমাকে এসে যেন রোজ একটু করে' company দেয়—

—তা তোমাকে আর কষ্ট ক'রে ব'লে যেতে হ'বে না। তারপর নৃপতি-ওরা আছে, আমার জন্যে কিছু ভেবো না, বৌদি। একা আর কোথায়! এই ঘর জুড়ে মা'র মৃত্যুর ছায়া, আমার হারানো ছবির সব মুখ, আমার সব হারানো কল্পনা—

তারাই তো আমার রইলো। চারদিককার অন্ধকার দেয়ালগুলো পর্য্যন্ত আমার কতো কাছে। সেখানে নতুন জায়গায় অতো বড়ো একটা অচেনা আকাশ নিয়ে আমি হাঁপিয়ে উঠবো, বৌদি।

বিকেলের দিকে মিনতি এসে হাজির। কালকের অর্দ্ধসমাপ্ত গল্পটা এখন শেষ করতে হ'বে। বই টেনে নিয়ে বাইরের বারান্দায় মিহিরের চেয়ারের পাশে সে বসলো। তনিমা নিচে চা করতে গেছে।

মিহির মিনতির অবস্থানের ভঙ্গিটা অনুভবে লক্ষ্য ক'রে বললে,—জানো, বৌদিরা শিগগিরই চলে' যাচ্ছেন।

—চ লে যাচ্ছেন মানে?

—বা, দাদাকে চাকরি করতে হ'বে না? আর বৌদি সঙ্গে না গেলে দাদাকে দেখবে কে?

—তুমিও যাচ্ছ নাকি?

—পাগল। আমাকে দেখবার লোকের অভাব কী! আমিই না-হয় কাউকে দেখতে পারি না।

মিনতি মনে-মনে খুব হালকা বোধ করলো, তবু উদ্বেগের ভাণ ক'রে বললে, —বৌদি চ'লে গেলে সারা দিন তোমার কাটবে কী করে?

—সারা দিন কাটবে, কতোক্ষণে বিকেল হ'লে তুমি আসবে তারই প্রতীক্ষায়

—আর বিকেল যখন চ'লে যাবে?

—তখন সমস্ত রাত কাটবে তোমার চ'লে-যাওয়ার অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে। আমি যতোই কেননা একা হই মিনু, আমার আছে এই পরিপূর্ণ অন্ধকার। এই অন্ধকার না হ'লে তোমাকে কি আর পেতুম?

অন্তরের দিক থেকে সান্নিধ্যে আরো ঘন হ'য়ে এসে মিনতি বললে,—সেই কদ্দূর না-জানি পড়েছিলুম কাল, তোমার মনে আছে?

—কথাটা তুমি এড়িয়ে যেতে পারো, কিন্তু চোখ হারিয়েই তো তোমার চোখে এতো আলো ফিরে পেলুম, মাকে হারিয়ে তোমার মাঝে মা। আমরা কেবল হারাবার হিসেবই করি, কিন্তু পাওয়াটা আমাদের এতো প্রচণ্ড যে হিসেবের আর কোনো কূল খুঁজে পাই না।

—হ্যাঁ, তারপর, মিনতি বইর উপর ঝুঁকে পড়লো: **'The music began again and the dance'.**

—না, আজকে আর বই নয়, মিনু, আজ একটা গান গাও।

মিনু তাইতেও প্রস্তুত। এ গান তার কণ্ঠের পারদর্শিতা দেখাবার জন্যে নয়,

শুধু নিবেদন করতে তার আত্মার নিরাবেগ গভীরতা। তাই এ-গানে তার বাজনার দরকার নেই। কণ্ঠে যতো না কাকুতি, তার চেয়ে বেশি করুণা।

গান থামবার পর মুহূর্ত্তগুলো শীতল হ'য়ে এলো। মিহির বললে,—গান শুধু শুনে তৃপ্তি হয় না, গান দেখতে চাই।

—গান দেখতে চাও?

—তোমার মুখ। গানের আগুনে তোমার মুখ উঠেছে উদ্ভাসিত হ'য়ে, ঠোঁটে-ভুরুতে উছলে পড়ছে প্রকাশের দীপ্তি, শরীরে নেমেছে লাবণ্যের ধারা—তোমার মাঝে কবে আবার দেখতে পাবো সেই গান?

এই সব অসহায় কথা শুনে মিনতিকেও দেখাদেখি দুর্ব্বল হ'তে হয় অনেকখানি। আস্তে তার একখানি হাত মিহিরের শিথিল স্পর্শের নাগালে পৌঁছে দিয়ে সে বললে,—আমাকে তুমি এই তো দেখতে পাচ্ছ।

কথার মদির ঘ্রাণে মিহিরের নিশ্বাস আচ্ছন্ন হ'য়ে এলো। চোখের পাতা দুটো নিমীলিত ক'রে মিহির বললে,—একেকসময়ে অন্ধকারকে আমার বড়ো ভয় করে, তাকে বিশ্বাস করতে সাহস পাই না। মনে হয় এই অন্ধকারের জোয়ারে তুমিও একদিন মা'র মতো ভেসে যাবে, মিনু।

মিনতি হেসে উঠলো: এতো সকালে মরবো কী বলছ?

মিহির বললে,—মানুষের জীবনে মৃত্যুটাই বড়ো দুর্ঘটনা নয়। সেটা আমরা বুঝতে পারি, মানে কিছুই তার বুঝতে পারি না ব'লে একটা বিশাল নিশ্চিন্ততা অনুভব করি। সেটা মনে হয় নিঃশেষে মুছে যাওয়া, তার মাঝেও একটা ছন্দ আছে। কিন্তু আমি থেমে পড়েছি, আমি আমারই কাছে একটা ভার, গতিহীনতায় একটা জড়পিণ্ড। মৃত্যুর অন্ধকারের চাইতে এ-অন্ধকার কী ভীষণ!

মিনতি বিমর্ষ গলায় বললে,—তার জন্যে তুমি কেন ভাবছ?

—জানি, তুমি এই অন্ধকার রোমাঞ্চিত ক'রে ক্ষণে-ক্ষণে তারা ফোটাচ্ছ, তোমার স্নেহে, তোমার স্পর্শে, তোমার হাসির শব্দে। কিন্তু এই অন্ধকার তুমি কোনোদিন স্বচক্ষে দেখ নি, মিনু। তাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো না।

তনিমা নিচে থেকে চা নিয়ে এলো। পিছনে কালিদাস খাবারের প্লেট হাতে।

খাবারের প্লেট হাতে দিয়ে মিহির বললে,—তুমি এতো সব খাবার-দাবারের নজির রেখে মিনতিকে অপ্রতিভ ক'রে রেখে যাবে দেখছি। পরে তুমি চ'লে গেলে ও যখন বিকেলে গল্প করতে আসবে, তখন এর কিছুই আমি জোগাড় করতে পারবো না।

তনিমা বললে,—ও তোমার এখানে খাবার খেতে আসবে কিনা?

কালিদাস ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বললে,—তা এলেনই বা। দু'খানা লুচি কি আর ওনাকে আমি ভেজে দিতে পারবো না ?

সবাই হেসে উঠলো। মিনতি বললে,—তার চেয়ে রান্নাঘরটা আমাকেই ছেড়ে দিয়ো, কালিদাস।

—বটে আর কী! কালিদাস বললে,—তবে দাদাবাবুর কাছে কে বসবে ?

তনিমা মিনতিকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে,—আমরা দু'-একদিনের মধ্যে চ'লে যাচ্ছি। ঠাকুরপো এখান থেকে কিছুতেই নড়বে না। ওর দাদারো শরীর কী রকম, তা তো চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছ, আমি যে এখানে থাকি তার জো নেই।

মিনতি বললে,—ওর জন্যে কিছু ভেবো না, বৌদি। আমরাই তো আছি।

—আমাদের মধ্যে আর ওর কেউ নেই, মিনু, একা তুমিই আছ। তোমারই জন্যে সমস্ত সংসার ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি, এই ঘর তোমাকেই ভ'রে তুলতে হ'বে।

মিনতি চুপ ক'রে গাঢ় চোখে মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলো। বললে,—যতোদূর সাধ্যি, তার সেবার কোনো ত্রুটি হ'বে না।

—সেবার সত্যি আর কিছু নেই, তার দরকার এখন সঙ্গ। সে-সঙ্গ যতো দীর্ঘ হয়, যতো নিবিড়, ততোই তার ভালো। তুমি তাকেই যদি সেবা বলতে চাও তো মন্দ কী!

মিনতি বললে,—তোমাকে গম্ভীর হ'য়ে অতো কথা না বললেও চলবে।

—হ্যাঁ, কথা তো এতোদিন একরকম ঠিক হ'য়েই ছিলো, সে-কথাটা এবার তোমরা নিভৃতে ব'সে ঝালিয়ে নিয়ো। আমাকে তারপর দিন ঠিক ক'রে একখানা চিঠি লিখো, কেমন ?

—তোমার যে আর তর সইছে না দেখছি। মিনতি হেসে ফেললে।

সত্যিই সইছে না। তনিমা মুগ্ধের মতো মিনতির স্তিমিতাভ কোমল দুটি চোখের দিকে চেয়ে বললে,—প্রেমের জন্যে অনেক প্রতীক্ষা করতে হয় শুনেছি, কিন্তু অতো আর ওর সময় নেই। এখন করুণা, শুধু ওকে একটা আরোগ্যের পথে নিয়ে আসা। তুমি, তুমিই ওর **panacea**, মিনু।

—সর্ব্বজ্বরকালান্তক। মিনতি আরেক পর্দা হাসি চড়িয়ে দিলো : এতো কথা এতোদিন পর তোমার কাছ থেকে শুনতে হ'বে নাকি ?

পাঁচ

নৃপতি হচ্ছে সেই জাতের ছেলে যারা যে-মেয়ের সঙ্গেই যখুনি আলাপ হয় তখুনি অনায়াসে পিছলে প্রেমে প'ড়ে যায়, এবং কালক্রমে সেই-সেই মেয়েদের পাত্রস্থ হ'বার বেলায় খাড়া হ'য়ে উঠে যারা মুখচন্দ্রিকার সময় কনের পিঁড়ি তুলে ধরে ও বরযাত্রীদের পেট পুরে খাওয়াবার জন্যে কোমরে গামছা জড়িয়ে দোহাত্তা করে পরিবেশন। মেয়েদের সঙ্গে তার প্রেম, যদি বলতে পারা যায়, ভীষণ রকম প্লেটোনিক্: গায়ের স্পর্শ দূরে থাক, আঁচলে হাওয়া লাগিয়েই সে উড়ে চলেছে। তাদের কাছে আর কিছু তার কামনা নেই, শুধু তাদের জন্যে সাড়ি ও জুতো, ছিট্ ও চুলের কাঁটা কিনে এনে দিতে পারলেই সে খুসি। নৃপতি খুব ভালো বাজার করতে পারে ব'লে বাজারে তার নাম-ডাক আছে, সাড়ির জমি ও পাড় সম্বন্ধে সে নাকি একটা অথরিটি, এমন-কি দূর মফঃস্বল থেকে মেয়েরা কাগজে পায়ের মাপ তুলে জুতা কিনে পাঠাবার জন্যে তাকে অনুরোধ ক'রে বাধিত করে। মেয়েদের কাজ ক'রে দিতে পারলে সে বনবাসে যেতেও প্রস্তুত। মেয়েদের ডাকে এক পায়ে সে খাড়া আছে। কোথায় কা'কে কোন জায়গায় পৌঁছে দিতে হ'বে নৃপতিকে একটা খবর পাঠালেই হ'লো—যাওয়া নিয়েই হচ্ছে তার কথা। ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার পর মেয়েদের রোল-নাম্বার পকেটে নিয়ে বেড়ানোই হচ্ছে তার পেশা, বছরের প্রথম দিকে কা'কে ক'টা ক্যালেণ্ডার উপহার দিতে পারে এ নিয়েই সে মেতে আছে। জ্বলন্ত সিগারেটের মুখে মুখ ঠেকিয়ে যেমন নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে নেয়া যায়, তেমনি এক মেয়ের পরিচয়ের সুতো ধ'রে সে আরেক মেয়ের দুয়ারে এসে উত্তীর্ণ হয়, এসেই সরাসরি জিগগেস করে: তোমার কিছু কাজ ক'রে দিতে হ'বে? কোথায় মেয়েরা কোন্ একজিবিশান খুলেছে তার ইলেকট্রিকের পয়েণ্ট লাগানো থেকে সুরু ক'রে দেয়ালে বিজ্ঞাপন সাঁটা পর্য্যন্ত সব কাজে নৃপতি। সেই একজিবিশান উঠে গেলে অবিক্রীত জিনিসের বস্তা কাঁধে ক'রে দোরে-দোরে ফিরি করতেও সে-ই। মেয়েদের স্ত্রী-অভিভাবকরা নৃপতির উপর ভারি প্রসন্ন। এমন সরল, পরোপকারী ছেলে আজকালকার দিনে বড়ো একটা দেখা যায় না। দস্তুরমতো রান্নাঘরে সে বরাবর ঢুকে পড়ে, সোজা খাবার চেয়ে খায়, আরো দিলে আরো খায়, দরকার হ'লে ছোট-ছোট ছেলেপিলেদের কোলে ক'রে রাখে। মেয়েদের সঙ্গে সে-ও হয়তো চপ গড়তে ব'সে গেলো, কা'র লুচি ঠিক গোল হচ্ছে না, হাত থেকে সে টেনে নিলো তার চাকি-বেলুন। তার বিরুদ্ধে কারুরই কোনো নালিশ করবার নেই। কারুর সে দাদা বা কাকা বা মামা—নিজে সে কিছু না-ই

বা হ'লো,—এবং আশ্চর্য্য, সব জায়গাই সে নিখুঁত সূক্ষ্ম ভাবে সম্পর্কের তারতম্য রক্ষা ক'রে চলে। সব চেয়ে বিশেষ প্রশংসনীয় হচ্ছে এই যে মেয়েদের সঙ্গে ক'রে বেরুবার সময় ট্যাক্সিতে সে অবশ্যকর্ত্তব্য হিসেবে ড্রাইভারের পাশেই বসে ও বায়স্কোপের পর্দ্দায় তেমন একটা দৃশ্য উপস্থিত হ'লে ভালো ছেলের মতো চোখ বুজে হাই তুলতে থাকে। এটা তাকে তার একটা দুর্ব্বলতা বলতে পারো, কিন্তু এই দুর্ব্বলতা ছিলো ব'লেই চরিত্রে সে বেঁচে গেছে।

মিহিরের সঙ্গে কলেজে নৃপতি কিছুকাল পড়েছিলো, কিন্তু দুপুরের অমূল্য সময়টা এমনি ক'রে অযথা নষ্ট করা তার পোষালো না। মিহিরের সঙ্গে যখন চেনা, তখন তার মা'র আপন হ'য়ে উঠতে কতোক্ষণ! যা তার forte—এক লাফে সে চৌকাঠ পেরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়লো, যখন সেখান থেকে ভাজা মাছের সঙ্গে একটি মেয়ের চুলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সে আজ প্রায় ছ'-সাত বছরের আগের কথা। তারপর সেই থেকে জগৎবাবুরো সে হাতের পাঁচ হ'য়ে উঠেছে। খাগড়াই বাসন কিনে দেয়া থেকে সুরু ক'রে রূপোয় তাঁর হুঁকো বাঁধিয়ে দেয়া পর্য্যন্ত সব কাজ নৃপতি অম্লানবদনে ক'রে দিয়েছে, এখনো দিচ্ছে। অম্লানবদনে, যাতে মিনতির মুখ না ম্লান হয়। জগৎবাবু মিনতির বাবা ছাড়া আর কেউ নন্ তার কাছে। মিনতিকে খুসি করতে পারলে সে গন্ধমাদন নিয়ে আসতো, এ তো সামান্য তার বাবাকে খুসি করা।

এর চেয়ে নৃপতির জীবনে আর কোনো মহত্তর উচ্চাভিলাষ নেই। মিনতিকে সুখী করবার জন্যে সে তার সংশ্রব ছাড়তেও রাজি আছে, যে কোনো সময়, যদি সে অবিশ্যি মুখ ফুটে তা বলে। মুখ ফুটে বলার কোনো মানে হয় না, কেননা হাতের কাছে মাথায় ছাতা ধরবার জন্যে একটি অনুরাগী লোক থাকা মন্দ কী: তাকে যখন সস্তা একটু হাসি, মোলায়েম দুটো ভঙ্গি দিলেই দাম পোষায়। সঙ্গে তার আবার একটা সাইকল্ আছে, দয়া ক'রে একবার বললেই হ'লো, রোদ-বৃষ্টি নেই, নৃপতি ছুটলো তক্ষুনি তার ফরমাজ খাটতে। মেয়েদের মন রাখতেই সে ব্যস্ত, মন পেতে তার বিশেষ মাত নেই। এমন পরোপকারী ভালো ছেলে দেখা যায় না, যার ব্যগ্র উপচিকির্ষার তলায় নেই প্রবল কোনো স্বার্থপরতার ঝাঁজ। নৃপতি একেবারে সাদা, আয়নার মতো অচ্ছোদ। মেয়েদের জন্যে বাস্এ জায়গা ছেড়ে দিতে সে সবার চেয়ে অগ্রগামী। আগের কালে নাইট-এরেণ্টরা দেশ-ভ্রমণে বেরুতো দুঃসাহসিক য়্যাড্ভেঞ্চারের আশায়, নৃপতি তেমনি রাস্তায় বেরোয় অযাচিত ভাবে মেয়েদের কোনো সে উপকারে আসতে পারে কিনা। মেয়েরা তার কাছে একেকটি দেবী, স্যাড়তে-সেমিজে একেকটি বো-আইডিয়েল্:

মেয়েদের দেখে যতো না সে আকৃষ্ট হয় তার বেশি হয় আবিষ্ট, যতো না তার ভালোবাসা, তার বেশি ভয়। এবং যা কিছু ভয়ের তাই হচ্ছে নাকি বিস্ময়ের।

মেয়েরাও তাই তাকে খুব পছন্দ করে, তার নানা কারণ। শুধু যে সে তাদের জুতোর ফিতে বেঁধে দেয় তার জন্যে নয়, কেননা শুধু তারই কাছে পদযুগ তারা এতোখানি এগিয়ে দেবে কেন? প্রথমতো, তার চেহারাটি ভারি মিঠে: টানা ভুরু, ধারালো চোয়াল ও বাঁকা পিছল ঠোঁটে মুখখানি তার খাঁটি ফরাসি। কথা-বার্ত্তায় মেয়েদের সঙ্গে সে সমান জায়গায় নেমে আসে—এ দ্বিতীয় কারণ: সেই একটি অফুরন্ত **chatterpie,** যতো কথা তার মেয়েদের সাজগোজের প্যাটার্ন নিয়ে, মেয়েদের মোটা হওয়া নিয়ে, খেলার মাঠে জলে ভিজে হেমেন-মজুমদারের ছবি হওয়া নিয়ে। মেয়েদের একটু ঠেস্ দিয়ে কথা কইলেই যে মেয়েরা খুসি হয়, একের কাছে অপরের নিন্দে করলে, এটুকু তার জ্ঞান হয়েছে। সে মেয়েদের কাছে যাকে বলে একটি **bully-boy**—দেহের কাছে কোনোদিন এসে পৌঁছুবে না ব'লে তাকে সবাই লম্বা দড়ি ছেড়ে দেয়। মোটকথা, তাকে মেয়েরা অনায়াসে বুঝতে পারে, তার কথা-বার্ত্তা, ভাব-ভঙ্গি কিছু বুঝতেই তাদের অনাবশ্যক মাথা ঘামাতে হয় না। আসলে সব মেয়েই সমান, তাই কথাবার্ত্তায় সে তাদেরকে স্তব্ধ ক'রে দিতে চায় না, এমন কি খবরের কাগজের জাঁকালো খবরগুলো পর্য্যন্ত সে তাদের কাছে উহ্য রাখে। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলবার এতো জিনিস আছে। এবং বাজে, বিস্বাদ ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যালিটির সে অবতারণা করে না ব'লেই মেয়েরা তাদের কাছে তাকে বসতে জায়গা ছেড়ে দেয়। চুপ্‌সে ভেজা বেড়াল না হ'য়ে থেকে তারা তখন পেখম মেলতে পারে। তৃতীয় কারণ, সেইটেই হচ্ছে সব চেয়ে জরুরি, সে গজল গায়; আর মেয়েদের মায়েদের কাছে অবিশ্যি স্বদেশী গান।

এবং এরি জন্যে, বহু মেয়ের আঁচলের হাওয়া গায়ে লাগিয়ে নৃপতি একেবারে আকাশে উড়ছে। যে-ই তাকে খাটায় তারই সে প্রেমে পড়ে, তার বিয়ের রাত পর্য্যন্ত সে সেই খাটুনি থেকে ছুটি নেয় না। প্রেম যে ক্ষণস্থায়ী একটা 'ওয়েদারের' মতো, এতোটুকু দিব্যজ্ঞান তার হয়েছে, তাই আজকের মেঘে কালকের সূর্য্যোদয়ের জন্যে সে বুদ্ধিমানের মতো জায়গা ক'রে রাখে। ফতুর হাওয়া তার ধাতে নেই, জমার ঘর তার সব সময়েই ফেঁপে আছে, শুধু বয়েসই যা যাচ্ছে বেড়ে। বাড়লেই আর কিছু এগোনো যায় না। তা, একসময়ে সে-ও না-হয় একজনকে বিয়ে ক'রে থিতিয়ে বসবে, পুরুষ নাকি পরিশ্রান্ত হ'লেই বিয়ে করে।

নৃপতি যখন আজ মিহিরের ঘরে ঢুকলো তার মুখে-চোখে ছিটিয়ে পড়ছে উৎসাহের আভা। মেঝেটা ঝল্‌মল্‌ ক'রে উঠলো তার পায়ের তলায়।

ঘরে ঢুকে দেখলো মিহির আছে আধখানা শুয়ে আর তার সামনে টেবল্‌ ঘেঁসে বসেছে মিনতি, পিঠের উপর ভারে-ভারে চুল রয়েছে খুলে, কোলের কাছে একটা খাতা-পেন্সিল। বস্‌বার ভঙ্গিতে সুকোমল একটি বিশ্রামের শিথিলতা।

মিনতি বলছে : বেশ তো, তুমি আস্তে-আস্তে ব'লে যাও না—বেশ ভেবে-ভেবে, আমি এক লাইন লিখবো আর পরের লাইনের জন্যে যতোক্ষণ বলো প্রতীক্ষা ক'রে ব'সে থাকবো। তুমি চেষ্টা করো, ঠিক হ'য়ে যাবে।

মিহির বলছে : পাগল! আমি তেমন মিল্‌টন্‌ নই। আমার লাইনগুলি অত্যন্ত লাজুক, উচ্চারণ করলেই তারা ভেঙে পড়বে। তোমাকে দেখে তারা মাথায় ঘোমটা টেনে মুখ লুকিয়ে ব'সে আছে।

—না, আমাকে তাদের কিছু ভয় নেই।

—ভয় নয়, কিন্তু জানো না তো একেকটি কথার পেছনে কতো নিঃশব্দতা থাকে, কতো চেষ্টা, কতো আপ্রাণ পরিশ্রম। পৃথিবী পর্য্যটন ক'রে তুমি যা কিছু চাও খুঁজে পেতে পারো, কিন্তু একেকটি এমন কথা আছে স্তব্ধতার সমুদ্র থেকে তাদের আর উদ্ধার করা যায় না। আমরা যা ভাবি তার তুলনায় কথা কতো দুর্ব্বল। তোমরা তো ছাপার অক্ষরে আমাদের কবিতাই দেখ, কিন্তু কাগজে-কলমে আমাদের সেই ব্যর্থতাগুলি দেখতে পাও না। অথচ সেগুলি না পেলে কবিতার আবহাওয়াই আসে নিষ্প্রভ হ'য়ে।

—বেশ তো, আমিই তো সেই কাটাকুটিগুলি করতে পারবো, তুমি বলো আগে কী লিখতে হ'বে, পরে বলো কোন্‌ কথাটা কোথায় কাটতে হবে। তোমার সমগ্র কবিতার চেহারাটা তো অন্তত একজনের কাছে, আমার কাছে ধরা পড়বে।

—না, ও বৃথা চেষ্টা তুমি রাখো। তার চেয়ে তুমি কথা কও, আমি চুপ ক'রে ব'সে শুনি, সেইটেই হ'বে কবিতার মতো কবিতা।

নৃপতি জুতো মস্‌মসিয়ে ঘরে ঢুকলো। তার চারদিকে এমন একটা সে দ্রুততার দীপ্তি নিয়ে এসেছে যেটা মিহিরের ঘরের স্তিমিত আবহাওয়ার সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। যে যখনই এ-ঘরে ঢোকে তার চারদিককার আভা সে নিজেরই অজানতে কখন একটু ফিকে ক'রে নিয়ে আসে, কিন্তু নৃপতির আজ এ কী কাণ্ড! ঘরে ঢুকেই মিহিরের হাতটা সে নিজের হাতে তুলে নিলো; একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে,—খুব একটা শুভ সংবাদ আছে, মিহির।

মিহির আবেগের কোনোরকম প্রতিধ্বনি করলো না, মুচকে একটু হেসে বললে, —বোস। ওকে একটা চেয়ার এগিয়ে দাও, মিনতি।

কিন্তু মিনতি উঠেছে খুসিতে ঝিলিক দিয়ে। এ ক'দিন ধ'রে নৃপতি লক্ষ্য ক'রে আসছিলো মিনতির চেহারা কেমন প'ড়ে গেছে: যা ছিলো আগে খর রৌদ্র, এখন হয়েছে যেন অবসন্ন গোধূলি। মলিন ক'টি রেখায় বিষণ্ণ আবছায়া। তার সাড়িতে নেই আর সেই এলো-মেলো চাপল্য, চুলে সেই বিহ্বলতা: কাতর কমনীয়তা এসেছে সমস্ত চেহারায়। সে আর রাত নয় চান্দ্রমসী, যেন আকাশের কোণে একপুঞ্জ শিথিল, কালো মেঘ। যেন সে ছিলো কেবল একজনকেই দেখাবার জন্যে, তাই সেই একজনের চোখে আলোর ফুরিয়ে-আসার সঙ্গে-সঙ্গে সে-ও এসেছে ফুরিয়ে। তার দুই ভুরুতে ভয়, চোখে ক্লান্তি, হাতে আলস্য। কথায় সেই দীপ্তি নেই, চলায় নেই ছটা। যেন সে-ও পড়েছে থেমে। তারো আকাশ যেন এসেছে ছোট হ'য়ে। তাই তাকে খুসি করবার জন্যে সে প্রায় স্বর্গ-মর্ত্য তছনছ ক'রে এই শুভ সংবাদ ব'য়ে এনেছে। কথার চটকে মিনতি একটু ঝলসে উঠলো দেখে নৃপতি দস্তুরমতো একটা শারীরিক আরাম অনুভব করলো। মিনতিকে খুসি করা দিয়েই তার কাজ, মিনতি খুসি হলেই সে আর কিছু চায় না।

মিনতি তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে,—কি, কী খবর?

নৃপতি চেয়ারে বসলো না, থিয়েটারি ঢঙে দু'পা পাইচারি ক'রে চুলের উপর আলগোছে হাত বুলোতে-বুলোতে বললে,—তোমার চোখ আমি ফিরিয়ে দেবো, মিহির।

তার চেয়ে ছাতটা বিনা-আভাসে ভেঙে পড়লেও বোধকরি মিনতি এতোটা চমকাতো না। মিনতি চেয়ারের কাঁধটা মুঠোর মধ্যে সজোরে চেপে ধ'রে বললে, —তুমি কী বলছ, নৃপতি? একটু স্থির হ'য়ে বোস দিকি আগে। ব্যাপার কী?

নৃপতি কাটা-কাটা কথায় থেমে-থেমে বললে—ব্যাপার খুব সহজ, মিহির আবার দেখতে পাবে।

মিহির নিরুত্তেজ গলায় বললে,—আমি তো সবই দেখতে পাচ্ছি, নৃপতি।

—তেমন দেখা নয়, দস্তুরমতো চক্ষুরিন্দ্রিয় দিয়ে দেখা। এমন অনুভবের আচ্ছাদনে নয়, একেবারে নয়নের নির্লজ্জ রূঢ়তায়। দেখবে মিনতির আজকাল কী নিদারুণ দুর্দশা হয়েছে, পরনে কেবল ময়লা সাড়ি, মুখে যেন কতো বর্ষার মেঘলা আকাশ। নৃপতি হেসে উঠলো: তোমার চোখের আলো না পেলে এ আঁধার কি আর ঘুচবে?

মিনতি বিরক্ত মুখে বললে—বাজে কথা রাখো দিকি এখন। কী হ'লো তাই খুলে বলো না।

—বললাম যে মিহিরকে আমি চোখ ফিরিয়ে দেবো।

—তুমি?

—সত্যি কি আর আমি নিজে? নৃপতি একটু পিছু হটলো: দেখতে পাওয়া দিয়েই কথা, কে ফের চোখ ফোটালো তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না।

মিনতি গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে,—তুমি বাজে একটা রসিকতা করছ না আশা করি।

—পাগল! মানুষের চোখ নিয়ে রসিকতা! মিনতি মুখ ভার করেছে দেখে নৃপতি ভূমিকার আড়াল থেকে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলো: আমি আজ সকালে সোমানন্দর কাছে গিয়েছিলাম।

—কে সোমানন্দ?

—বা, সোমানন্দকে চেনো না? সন্নেসি সোমানন্দ, মস্ত বড়ো একজন **occultist**।

—হ্যাঁ, শুকনো গলায় ঢোঁক গিলে মিনতি বল্‌লে,—কী করেছেন তিনি?

—কী করেছেন তিনি! নৃপতি এমন একটা মুখভঙ্গি করলে, যেন মিনতি নেহাৎ মেয়ে হয়েছে ব'লেই তাকে এ-যাত্রা ক্ষমা করা গেলো: সমস্ত সহরে ভীষণ সোরগোল প'ড়ে গেছে—এমন সোরগোল উনিশ শো চোদ্দ-আঠারোর যুদ্ধেও কখনো পড়ে নি—আর তোমাদের কানে তা এখনো পৌঁছয় নি? কী ক'রেই বা আসবে? আমি এতোদিন খবরটা ইচ্ছে ক'রেই চেপে ছিলাম, আজ তাঁর থেকে ফাইন্যাল কথা নিয়ে তবে বলতে এসেছি।

মিনতি বললে,—কথা তো অনেক-কিছুই বললে শুনলুম। কিন্তু কোন্‌টা তোমার ফাইন্যাল?

—দাঁড়াও, হাঁপ নিতে দাও। নৃপতি চেয়ারে বসলো: সোমানন্দ সপ্তাহ খানেক কলকাতা এসেছেন, আসতে-না-আসতেই একেবারে মির‍্যাক্‌ল। ব্যাগে তাঁর নানা রাজ্যের ওষুধ-বিষুধ, একেকটা একেবারে বিস্ময়ের অগ্ন্যুৎপাত। হেসো না মিনতি, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। চেয়ারে ব'সে থাকা নৃপতির পক্ষে অসম্ভব, সে উঠে দাঁড়ালো: আমার এক আত্মীয় আজ দু'বছর ধ'রে ক্যান্‌সারে ভুগছিলো, সোমানন্দের দেয়া কী-এক শেকড় চিবিয়ে খেয়ে তার আর এক ফোঁটা ব্যথা নেই। তার চেয়ে আশ্চর্য্য হ'বার তুমি কি পাবে? তবু বলি, তুমি উমাকে চিনতে তো, তার দিদির হয়েছিলো এক্‌লেম্প্‌সিয়া, সেরে উঠলো সোমানন্দর ওষুধ

খেয়ে। আমাদের আপিসের মাধববাবু পাগল হ'য়ে গিয়েছিলো, চাকরি খুইয়ে কাল যাচ্ছিলো তাঁকে মেণ্টাল হস্‌পিটালে, এমন দুরবস্থা। তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, সোমানন্দ মাত্র তার চোখের দিকে তাকিয়ে তার পাগলামির ভূত নামিয়ে দিয়েছে। আজ সকালে তাকে নিজহাতে চাকরির দরখাস্ত করতে দেখে এলাম।

মিহির বললে,—তোমার সোমানন্দর দেখাদেখি তুমিও গাঁজা ধরলে নাকি, নৃপতি ?

নৃপতি বললে,—বেশ তো একটা ট্রায়াল দিয়েই দেখা যাক্ না। পয়সা তো আর বেশি লাগছে না। হয়তো বড়ো জোর শ-খানেক লাগবে। সেটাও ভালো হ'য়ে, কোনো বাইণ্ডিং নেই।

সুখে মিনতি মর্ম্মরিত হ'য়ে উঠলো ; বললে,—টাকার কথা কে ভাবছে ? তুমি সত্যি বলছ তোমার ঐ অকালটিষ্ট চোখের হারানো দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে পারবেন ?

—আমি আজ গেছলাম তাঁর কাছে। সব কথা তাঁকে খুলে বললাম। তিনি শুনে চোখ বুজে কী খানিক ধ্যান করলেন, পরে বললেন, নৃপতি মিনতির মুখের দিকে চেয়ে দেখলো তার সমস্ত চেতনা দুই তীক্ষ্ণ চোখে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে : পরে বললেন, পারবো।

—পারবে ! মিনতির সমস্ত কঠিন দেহ যেন উড়ন্ত একটা পাখির মতো হালকা হ'য়ে গেলো : তুমি সত্যি বলছ ?

নৃপতি গম্ভীর মুখে বললে,—মিথ্যা কথা বলার আমার অভ্যেস নেই।

মিনতি দুই হাতে তার হাত চেপে ধরলো : না, তা বলছি না। তবে কবে তাঁকে এখানে আনা যাবে ?

নৃপতি শরীরের প্রতি তন্তুতে শিহরিত হ'য়ে বললে,—যেদিন তুমি বলো।

—না, আমাকে এ নিয়ে বিরক্ত করো না, নৃপতি। মিহির প্রতিবাদ ক'রে উঠলো। নিটোল, পরিতৃপ্ত গলায় বললে,—আমি এ বেশ আছি।

—বেশ আছো কী ? নৃপতি চোখ বড়ো ক'রে বললে,—এই অন্ধকারে ?

—হ্যাঁ, হোক্ অন্ধকার। **Existence is enough occupation.** বেঁচে যে আছি এই আমার বেশ থাকা।

—একদম চোখে না দেখে ?

—পৃথিবীতে কতোই যেন তোমরা অহরহ দেখতে পাচ্ছ। এই যে এতোদিন আলোয় ছিলুম, দেখে-দেখে কতো কিছু যেন ফুরিয়ে দিয়েছিলুম আর-কি। হেলান ছেড়ে মিহির সোজা হ'য়ে বসলো : চোখে দেখাই আর সব-কিছু দেখা নয়, নৃপতি।

নৃপতি এই অদ্ভুত মনোভাবের মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পাচ্ছে না। চেয়ারে ব'সে প'ড়ে বললে,—তা হ'লে তুমি ভালো হ'তে চাও না?

মিহির হেসে উঠলো: বা, এই তো আমি যথেষ্ট ভালো আছি।

—চোখ হারিয়েছ ব'লে তোমার দুঃখ নেই?

—আমরা যা হারাই তাই কেবল দেখি, যা পাই তা দেখি না।

বিমূঢ় হ'য়ে নৃপতি অগত্যা মিনতির শরণ নিলে: এ বলে কী, মিনতি? কেউ সেধে চোখ ফিরিয়ে দিলেও ও হাত পেতে তা গ্রহণ করবে না?

—এ-চোখ আমার কোনো কালে ভালো হ'বার নয়, মিহির স্বচ্ছ, সহজ গলায় বললে,—এ আমি স্পষ্ট দৃষ্টিতে বুঝতে পারছি। তার জন্যে দুঃখ করতে আমার এখন হাসি পায়। আমরা বদলাই না, নৃপতি, আমরা হই। এ-অবস্থাটা আমার জীবনে একটা আকস্মিক ঘটনা নয়, এটা আমার হওয়া। খানিক চুপ ক'রে থেকে মিহির উঠে দাঁড়ালো, মিনতি গেলো তাঁকে ধরতে, কিন্তু তার বিশেষ দরকার নেই। আস্তে খোলা জানলাটার পাশে এসে হাওয়ার দিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে বললে,—তোমাদের বলতে কী নৃপতি, আলো-কে আমার এখন বড্ড ভয় করে। মনে হয়, চারদিক আবার আলো হ'য়ে উঠলেই সব ধুয়ে-মুছে প্রখর সাদা হ'য়ে যাবে। আমার দারিদ্র্যেরই মতো অনাবরণ, রুক্ষ সাদা। সে তীব্রতা আর আমি সইতে পারবো না। এই অন্ধকারই আমার ভালো, ভারি নরম, ভারি ঘনিষ্ঠ। এই অন্ধকারেই আমি সব সময়ে ভরা, বিভোর হ'য়ে আছি, নৃপতি। তুমি জানো না, এই অন্ধকারকেই আমার আত্মার নিকটতমো আত্মীয় ব'লে মনে হয়।

নৃপতি প্রায় মুখিয়ে উঠলো: এ সব তুমি কী রাবিশ বলছো একধার থেকে? এমনতরো একটা গুরুতর অঙ্গবৈকল্য নিয়ে কেউ কবিত্ব করতে পারে জীবনে এই প্রথম শুনলাম। তা হ'লে তুমি এই chance নেবে না?

—নেবে বৈ কি: এবার মিনতি এলো এগিয়ে: তুমি ওঁর কথায় কাণ দিয়ো না, নৃপতি। তুমি সোমানন্দকে গিয়ে খবর দাও, আজই, এক্ষুনি। যেদিন তাঁর আসবার সুবিধে হ'বে, সেদিনই আমরা প্রস্তুত হ'য়ে থাকবো। টাকার জন্যে কালকেই আমি দাদার কাছে টেলিগ্রাম ক'রে দিচ্ছি।

—না, না, তার জন্যে তোমার ভাবতে হ'বে না। নৃপতি মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বললে,—সে আমি সম্প্রতি চালিয়ে নিতে পারবো।

মিহির কথার একটা চিম্‌টি কাটলে: তোমার সন্ন্যেসি-ঠাকুর তা হ'লে রীতিমতো ফি চার্জ্জ করেন বলো?

মিনতি গ'র্জ্জে উঠলো: কেন করবেন না? যদি তোমার চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরে

পাওয়া যায়, তার বিনিময়ে কী ঐ ক'টা তুচ্ছ টাকা। এমনিতে ডাক্তারি-কোবরেজিতে তো কম পয়সা যায় নি। কোন্ চেষ্টাটা করতে আমরা বাকি রেখেছি শুনি? এটাই বা কেন দেখবো না একবার?

নির্লিপ্ত, নির্ব্বাপিত গলায় মিহির বল্‌লে,—দেখ।

—হ্যাঁ, এতো যখন নাম-ডাক, তখন কিছুতেই তাঁকে ছাড়া হ'বে না। মিনতি নৃপতিকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লে—তুমি আজই যতো শিগ্‌গির পারো, গিয়ে দেখা করো তাঁর সঙ্গে। যতো শিগগির সম্ভব, সব বন্দোবস্ত ক'রে ফেল, নিয়ে এসো তাঁকে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।

কথা বলতে-বলতে মিনতির শরীর যেন যৌবনে হঠাৎ তরঙ্গায়িত হ'য়ে উঠলো উচ্চারিত, বিস্ফুরিত হ'লো যতো সব লীলা-পিচ্ছল শাণিত রেখা। তার শরীর-উপবনে যেন বসন্তের হাওয়া দিয়েছে। মিনতির এমন চেহারা নৃপতি যেন অনেক দিন দেখে নি। তার ভুরুতে ঠিকরে পড়ছে খুসি, ঠোঁটে পিছলে পড়ছে খুসি, বুকে উছলে পড়েছে খুসি। যেন তারই চোখ ভ'রে এসেছে আলোর জোয়ার, তারই সামনে থেকে স'রে গেছে পাষাণের যবনিকা। প্রতীক্ষার তৃষ্ণায় তারই দু'চোখ যেন অন্ধ হ'য়ে যাবে। এ-আলো যেন তারই নিজের জন্যে চাওয়া।

বলতে কি, নৃপতিও তাই চেয়েছিলো : মিনতিকে খুসি করা নিয়েই তার কাজ। নইলে, মিহিরের চোখের জন্যে তার বিশেষ মাথা-ব্যথা ছিলো না; স্বীকার করতে লজ্জা নেই, বরং মিহিরের চক্ষুহানির পর মনে-মনে সে সক্রিয় একটা সুখভোগ না করলেও অলস একটা আরাম অনুভব করছিলো—প্রেমের ব্যাপারে একটু ঈর্ষাক্লিষ্টতা অপৌরুষেয় নয়। নিজে তো আর সে মিহিরের চোখ অন্ধ ক'রে দেয় নি, বিধাতার ব্যবহারটা নেপথ্য থেকে একটু সমর্থন করেছিলো মাত্র। নিজে ঠিক সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী না হ'লেও এটা আশা করা স্বাভাবিক, যে কোনো নারী-সঙ্গলোভীর পক্ষে স্বাভাবিক যে, সে একট অধিকারের একাধিপত্য চাইবে। এ-ক্ষেত্রে সেটার সম্ভাব্যতার সূচনা হয়েছিলো মিহিরের এই নিশ্চক্ষু, নিঃসহায় অবস্থার অবতারণা থেকে। আর যাই হোক, অন্ধকে করুণা করা যায়, ইউজেনিকসের দিক থেকে বার্ট্র্যাণ্ড্ রাসেলি অর্থে তাকে নিশ্চয়ই ভালোবাসা যায় না। আর যাই হোক, মিনতির জলজ্যান্ত দুটো চোখ আছে। বিয়ে পর্য্যন্ত অতোটা নৃপতি সুস্থ হ'য়ে এক নিশ্বাসে ভাবতে পারে না, তার মেটাবলিজমই হচ্ছে অন্য ধাতুতে তৈরি, অন্তত দুটো সন্ধ্যা মিনতিকে সে সিনেমা বা গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে আনতে পারতো। কিন্তু বিধাতাকে সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করা মানুষের সাধ্যি নয়। তাস পাশাতে-পাশাতে কখন যে হঠাৎ তুরুপ ক'রে বসেন তার ঠিক নেই। মিনতির

এমন হয়েছে যে সে মিহিরের পায়ের নিচেকার মাটি কামড়ে প'ড়ে আছে : সিম্‌লার কথা পাড়া দূরের কথা, পারতপক্ষে মিহিরকে ফেলে নিচে নামতে পর্য্যন্ত সে নারাজ। চা-টা পর্য্যন্ত কালিদাসের এলেকায়। বাড়ির অবস্থিতিটা কুৎসিত রকম কাছে, ও অতো বড়ো মেয়েকে শাসন বলতে যতোটুকু বোঝায় তা অসম্ভব রকম শিথিল ব'লে মিনতি একেবারে টঙে উঠেছে। শাসন শিথিল, তার এ-ও হয়তো এক কারণ যে অন্ধ লোক মাত্রই নিরীহ, অবিসম্বাদী, কোনো দিকেই তার রূঢ় হস্তক্ষেপ করার সুবিধে নেই, দরকার পড়লে তাকে এড়িয়ে যাওয়া একেবারেই কঠিন নয়। অন্ধ লোককে দয়া দেখানো একটা বোধোদয়-কথিত পুণ্য কাজ। কিন্তু তাকে সঙ্গ দিতে এসে তার ছোঁয়াচ লেগে নিজেকেও অন্ধ হ'তে হ'বে এ কোন্ শাস্ত্রে লিখেছে ? একজনের চোখ গেলো শুকিয়ে, তার যতো কান্না এসে জমা হ'লো যেন আর একজনের চোখে। নইলে, এ কী চেহারা হয়েছে মিনতির ? আয়নার কাছে মুখ এনে চোখে সে কিছু আর দেখতে পায় না নাকি ? সেই তন্বঙ্গী মিনতি এখন এক আঁটি শুকনো হাড়ে এসে ঠেকেছে। কতোদিন যে তাকে তার ষ্টেশনারি জিনিস কিনে আনবার ফরমাজ খাটতে হয়নি গুনে তার হদিস পাওয়া যায় না। বহুদিন পায়ে তার জুতো দেখে নি, বাইরের পৃথিবীটা এখন তার কাছে বোজা একটা পুঁথি। মানুষের প্রতি সমবেদনা দেখাবারো একটা সীমা আছে, শেষকালে নিজের প্রতিও যদি পরের সমবেদনা আকর্ষণ করতে হয় তা হ'লে ব্যাপারটা তুলনায় দস্তুরমতো করুণতরো হ'য়ে ওঠে।

কিন্তু মিনতির এই আলোর উপবাস চোখ মেলে সহ্য করা যায় না। তাকে যে ক'রে'ই হোক খুসি করতে হ'বে—আর মেয়েদের খুসি করা নিয়েই যখন তার কাজ। এবং তাকে সম্প্রতি খুসি করতে হ'লে মিহিরের চোখ ফোটাবার যে একটা সূক্ষ্ম চেষ্টা হওয়া দরকার সেটা নৃপতি মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝেছে। তাতে তার দুঃখ নেই, মিনতি খুসি হ'লেই মিনতির কাছে সে আর কিছু চায় না।

নৃপতির পিছে-পিছে মিনতি নিচে নেমে এলো। নিভৃততরো হ'য়ে অতি নিবিড় কণ্ঠে সে জিগগেস করলে : যা বললে, তা সত্যি ?

নৃপতি বুক চিতিয়ে দাঁড়ালো : বর্ণে-বর্ণে সত্যি। এই দেখ না পকেটে আমার সব কাটিংস। ব'লে এক তাড়া কাটা কাগজের টুকরো সে মিনতির হাতে দিলো : অনেক সব গণ্যমান্য সার্টিফিকেট দেখা যাচ্ছে। আর তিনি যখন বলেছেন, পারবো, তখন তাঁর কথা ককখনো মিথ্যে হ'তে পারে না। তবু তুমি তাঁকে দেখ নি, দেখলে আমার কথা আরো বিশ্বাস করতে।

—হ্যাঁ, দেখো। মিনতি তার দুই চঞ্চল চোখে এতো দীপ্তি যেন ধ'রে রাখতে পারছে না : অনর্থক ব্যর্থতার বোঝা বইতে মিহির আর তৈরি নয়। সে ভীষণ ক্লান্ত, একটা কাঙাল শিশুর চেয়েও সে এখন দুর্ব্বল, ছেলে-মানুষ হ'য়ে গেছে। তাকে নিয়ে—

—তুমি পাগল হয়েছ নাকি? নৃপতি মুগ্ধকণ্ঠে বললে, —অন্তত তোমাকে নিয়ে আমি কখনো একটা বাজে রসিকতা করবো না।

নৃপতি চ'লে গেলে নিচেটা মিনতির কাছে ভীষণ ফাঁকা ঠেকতে লাগলো— কথনো-কথনো অত্যন্ত পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠলে নিজেকে এমনি নির্জ্জন, এমনি একাকী মনে হয়। অনুভবের নিদারুণ তীব্রতা মাত্রই একটা প্রখর শূন্যতা উদ্‌ঘাটিত ক'রে ধরে। মিহির যদি চোখ ফিরে পায়, তবে মিনতিই যেন সেই উত্তাপে সর্ব্বাঙ্গে মঞ্জরিত হ'য়ে উঠবে। মিহিরের চোখ নেই এ যেন মিনতিরই নিজের লজ্জা, তার কলঙ্কিত পরাভব। এ যেন, সে-ও একটা সঙ্কীর্ণ গারদের মধ্যে এসে ঢুকেছে, মিহিরের চোখের আলোয় আবার যেন সে পাবে উলঙ্গ মুক্তি, বিশাল একটা আশ্রয়। তার জীবনে পাবে যেন একটা উদ্ধত সমর্থন—মিনতি একেক লাফে দুই ধাপ ক'রে সিঁড়ি ডিঙিয়ে উপরে উঠতে লাগলো।

ছয়

আলোর কাছে মিনতি এ আশ্রয় চায়, কেননা দেখাতে চায় সে স্পষ্ট ক'রে যে এটা মাত্র করুণা নয়, তার চেয়ে অনেক অবর্ণনীয় বেশি। সে যে শুধু জীবে দয়া করতেই আছে—সীতেশের এই ঠাট্টা তার সহ্য হয় না। আলোর কাছে তাই সে একটা উগ্র ও উদ্ধত প্রমাণ দিতে চায়। মিহিরের দু' চোখ ভরা অন্ধকারের কাছে মিনতি কেমন ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে, সেই শীতের দেশে পারে না সে আবেগের আগুন পোয়াতে। সে যেন মাত্র নির্ভাড়াটে একটা নার্স। অন্ধকারে সমস্ত জিনিসটা এমন চাপা, ঝাপসা দেখাচ্ছে। সে যদি মিহিরকে আজ বিয়েও করে, সেটা তার নাকি শুধু দাক্ষিণ্যের পরিচয় হ'বে, প্রেমের নয়। অন্ধকারকে তাই মিনতির এতো লজ্জা করছে। সমস্তটাই কেমন যেন একটা ক্লেশনিবারণের করুণার মতো দেখায়, সম্পূর্ণ, উত্তপ্ত, স্বসমুখ আত্মনিবেদনের মতো দেখায় না। মিনতির সমস্ত প্রেমের আলো মিহিরের এই তুষারীভূত অনাদৃষ্টির দেশে এসে করুণায় কালো হ'য়ে ওঠে। দাবির থেকে দয়া জিনিসটায় ভীষণ গা-ঘিনঘিন করে। তাই মিহিরের দু' চোখে মিনতি আলোর অজস্রতার আশায় সর্ব্বাঙ্গ ভ'রে যৌবনে অজস্র হ'য়ে উঠলো : সেই

আলোয় মিলবে তার ব্যবহারের সমর্থন, তার জীবনের ছন্দোময় সামঞ্জস্য। মাত্র যে একটা করুণা নয় সেই আলোয় পারবে সে তার একটা অতি-প্রকট প্রমাণ দিতে। তখন মিহিরেরো থাকবে না এই অপরাধবোধের গ্লানি, মিনতিরো থাকবে না এই করুণাবোধের কাতরতা।

সীতেশ ঠোঁট বাঁকিয়ে বলতো : বেচারা অন্ধ হয়েছিলো বলেই যা-একটু দয়া-মায়ার আশা করতে পারে, কিন্তু যদি কালা হ'তো—ভাবো দিকি একবার, সীতেশ হেসে উঠতো : তখন তুমি নিশ্চয়ই না হেসে থাকতে পারতে না। কালা ব'লে ততো নয়, যতো কালা নয় প্রমাণ করবার দুশ্চেষ্টায়। তোমার মিহির কিন্তু খুব **lucky**, ওকে কালা হ'তে হয় নি। তোমার একটাও কথা শুনতে পেতো না, অথচ বুঝেছে ব'লে সব সময় মুখে একখানা **wise** ভাব ক'রে থাকতো—সেটা দেখতে তুমি নিশ্চয়ই কষ্ট ক'রে ও-বাড়ি অতো ঘন-ঘন যাওয়া-আসা করতে না। লোকটা তার এই অন্ধতার জন্যে তপস্যা ক'রে থাকবে।

এই সুরে কথা বলবার একটা অধিকার সীতেশ এরি মধ্যে কায়েমি ক'রে নিয়েছে। তার একটা কারণও হয়তো ছিলো. এবং সে-কারণ অন্যের বেলায় স্বভাবতো যতো অগ্রহণীয়ই হ'তো না কেন, সীতেশের কাছে তাই ছিলো যথাতিরিক্ত। সূক্ষ্ম একটা সুতো হাতে পেলেই তার হ'লো, তাকেই সে হাত প্যাঁচ ক'রে জটিল একটা গ্রন্থিলতায় নিয়ে যাবে। সামনে থেকে সময়ের চুলের ঝুঁটি আঁকড়ে ধরবার জন্যে হাত তার উঁচিয়েই আছে। সীতেশ এটা জানে, জীবনের সুবিধেগুলো সোজা রাজপথ দিয়ে আসে না, এদিকে-ওদিকে ফিকে চোখে উঁকি মারতে থাকে, তাদের জন্যে জানলাগুলো আলোয় অবারিত ক'রে দেয়া দরকার। হ'লোই বা না ট্রেনের আলাপ, না-হয় মিনতি ক'টা দিন পশ্চিমের রুক্ষ আবহাওয়ায় শ্যামল, নরম একটি পটভূমি রচনা ক'রে রেখেছিলো—ব্যাপারটাকে সেইখানেই ছেড়ে দেয়ার মতো উদারতা সীতেশের নেই। ব্যাপারটাকে গল্পে সঙ্কেতময় ক'রে রাখার চাইতে উপন্যাসে পরিস্ফীত করার দিকেই তার বেশি ঝোঁক। তার সব সময়েই একটা স্থূল সমাপ্তি চাই, বিশেষতো মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্কে, এবং বিশেষ ক'রে এই মিনতির বেলায়—কেননা এতো ভালো কোনো মেয়েকেই তার লাগেনি আগে, অতএব সেই পরিচয়ের সুতোটা পাকিয়ে-পাকিয়ে মোটা করবার জন্যে সে জগৎবাবুর বাড়িতে ঘন-ঘন আনাগোনা করতে লাগলো।

জগৎবাবুকে বশ করতে তার দেরি করবার কথা নয়। তার আর কিছু না থাক, টাকা আছে, আর সেই টাকা ব্যয় করবার একটা উদগ্র উদ্দামতা। সেইটেই তার প্রকাণ্ড য়্যাডভার্টিজমেণ্ট। তার জীবনধারণের সংবাদটা উচ্চণ্ড স্পর্দ্ধায় জাহির

করবার জন্যে সব সময়ে সে উঁচিয়ে আছে। তার সর্ব্বাঙ্গে ঝলসাচ্ছে এই তামসিকতার রাজত দীপ্তি: সেই আগুনে মৃদুপক্ষ পতঙ্গের মতো জগৎবাবু ঝাঁপ দিলেন। জগৎবাবু স্মল-কজ-কোর্টের উকিল, সংসারে তাঁর দাবির অনুপাতে পাওনাটাও নিতান্ত ছোট, তাই আয়ের অঙ্কটাকে অতিকায় করবার প্রলোভনে তিনি রেস্-কোর্সে প্রতি শনিবার নিজেকে নিয়মিত দৌড় করাতেন, সেখানে সাথী জুটলো তাঁর সীতেশ। জীবনের সমস্তটাই নাকি অনিশ্চিত, এবং যা কিছু অপ্রত্যাশালব্ধ তারই নাকি বরং কিছু স্বাদ আছে—এই নীতিতে প্রেরিত হ'য়ে সীতেশ তাঁকে ঋণে ভারি ক'রে তুলতে লাগলো। হাতে যে একটা পাখি, তার তুলনায় ঝোপের দুটো পাখি যে বেশি মূল্যবান তাতে সীতেশের সন্দেহ নাই। প্রতীক্ষার চাইতে আকস্মিকতাকে সে বেশি বিশ্বাস করে। যা করো আজকেই, মরো-বাঁচো, পরের কথা পরে,—এখুনি, এই মুহূর্ত্তে সমাধা ক'রে ফেলার উলঙ্গ তীব্রতা তুমি লক্ষ বছর অপেক্ষা ক'রে ব'সেও উপভোগ করতে পারবে না। টাকা যতোক্ষণ আছে ওড়াও, যখন না থাকবে, তখন, কেবল তখনই হাহাকার করা যাবে। দারিদ্র্যের সদর রাস্তা থেকে তখন তো কেউ তোমাকে আর তাড়াতে পারছে না।

যে ঘোড়া তুমি ধরেছ সেই বিদ্যুদ্গতিমান ঘোড়া ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে, পৃথিবীতে উপভোগের এমন উন্মাদনা আর আছে ক'টা! তার জন্যে টাকা খরচ করবার একটা মানে হয়। ব্লাইণ্ডই সে খেলে যাবে, প্রতিপক্ষ 'শো' দিলে তাস তুলে দেখতে পাবে টেক্কার একটা 'ট্রায়ো'। সত্যি-সত্যি দেখতে পাক্ বা না পাক্, যতোক্ষণ সে ব্লাইণ্ড, ততোক্ষণ পৃথিবীতে তার মতো আর সুখী কে? বাস্তবতাটা নিতান্তই সীমাবদ্ধ, স্পষ্ট, অনিশ্চয়তার মাঝে নির্নির্দ্দেশ একটা বৃহত্ব আছে—ততো বড়ো একটা ফাঁকা জায়গা না হ'লে সীতেশ নিশ্বাস নিতে পারে না। জীবনে পাওয়াটাই বড়ো কথা নয়, পেলেও সে পেতে পারে, সেইটেই মহান।

এমন ছেলে আর হ'তে নেই। জগৎবাবু বিস্ময়ে একেবারে বিস্ফারিত। টাকা এমন-কি তাদের বয়েসের ব্যবধানটা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ণ ক'রে এনেছে। যেখানে হাতে-হাতে টাকার লেন-দেন চলে সেইখানে স্থূল পদার্থ-শাস্ত্র অনুসারেই দূরত্ব ব'লে কিছু থাকতে পারে না। নেহাৎ মিনতির পিতৃদেব না হ'লে সীতেশ স্বচ্ছন্দে তাঁর কাঁধ চাপড়ে দিতো। সত্যি এমন ছেলে হ'তে নেই, রূপে বলো, চরিত্রে বলো। রূপ আর চরিত্র যেখানে এসে সম্মিলিত হয় তার আছে সেই অয়স্কান্ত শরীর—লোহার মতোই দৃঢ়, লোহার মতোই টেঁকসই। পুরুষের এই দার্ঢ্যই হচ্ছে রূপ, তার চরিত্র হচ্ছে এই তার নিষ্কলঙ্ক অক্ষয়ে। যতোক্ষণ তুমি শরীরকে জীর্ণ করছ না, ততোক্ষণই তুমি চরিত্রবান। সেই দিক থেকে সীতেশ একটা অসুর। শরীরকে ক্লান্ত ক'রে যে

উত্তেজনা তাতে তার রুচি নেই, সামান্ত এক গ্লাশ মদে সে কোনোদিন চুমুক দেয় নি। শরীরের সম্ভোগশক্তি তার এমনিতেই এতো প্রবল যে তাকে কৃত্রিম একটা পানীয়ের কোনোদিন শরণাপন্ন হ'তে হয় না, তার শরীরের রক্তই তার পক্ষে যথেষ্ট মদিরা। তার মুহূর্তগুলো এতো নিষ্প্রভ নয় যে তাদের হাওয়ায় উড়িয়ে দেবার জন্তে ব'সে-ব'সে তাকে ধোঁয়া ফুঁকতে হ'বে। দুর্ব্বলতার এ-সব প্রতিষেধকগুলি তার কাছে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়। সে চায় মনের রোমাঞ্চন, শরীরের এই আবিল বিক্ষোভ নয়। সে চায় তার জীবনে সব সময়ে একটা প্রখর অনিশ্চয়তার দুঃসহ শুভ্রতা। সে শুধু চায় যে-ঘোড়া সে ধরেছে তাই তার কাছে ছুটে আস্থক, সেই রহস্যময় **dark horse.**

—ধার কী বলছেন ? সীতেশ জগৎবাবুর মুখের দিকে চেয়েও দেখে না, চেক্এ অঙ্কের সংখ্যাটা মোটা ক'রে লিখে দেয় : নিন্ না, যা আপনার লাগে। যদি জেতেন, ক্যাপিটেলটা ফিরিয়ে দেবেন, যদি হারেন তো আমার গেলো।

জগৎবাবুর পলক পড়তে চায় না। এমন অবস্থায় লোকের যা হয়, জগৎবাবু ভীরু মুখে, মিনমিনে গলায় বলেন : তোমার এতো ঋণ যে কী ক'রে শোধ করবো, তাই ভাবি।

সীতেশ মৃদু হেসে জবাব দেয় : টাকা দিয়েই সব সময়ে টাকা শোধ করতে হয় এই বর্ব্বরতা আমি সইতে পারি না। আপনাদের এই স্নেহ, এতো যত্ন—ব্যবহারিক জগতে থিওরি অফ ভ্যালুটা কিঞ্চিৎ বদলে নিতে হয় বৈ কি।

তাঁদের যত্ন-স্নেহটা এমন কিছু পর্ব্বতপ্রমাণ নয় যার বিনিময়ে দানের এই পাহাড় তুলে দেয়া যেতে পারে। জুয়োর নেশায় অন্ধ হ'লে কী হ'বে, জগৎবাবু সেটা অনায়াসে বুঝতে পারেন। হ্যাণ্ডনোট কাটতে হয় না ব'লে তাঁর উকিলি মন আশ্বস্ত থাকলেও তাঁর মানুষের মনটা সর্ব্বদাই কেবল উসখুস করতে থাকে, টাকায় না হোক, রকমে শোধ করতে হয় বৈ কি। টাকা জিনিসটা এতো স্থূল তার বিনিময়ে তেমন-কিছু একটা স্থাবর, স্পর্শনীয় জিনিস প্রত্যর্পণ করা দরকার, মাত্র অশরীরী একটা যত্ন-স্নেহের কোনো অর্থ হয় না। লব্ধব্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যে তার মিনতি, মেয়ের বাপ হ'য়ে জগৎবাবুর বুঝতে তা আর বাকি নেই। তা-ই যদি হয়, —জগৎবাবুর চোখের সামনে নিষ্তৃণ মরুভূমিটা সহসা শ্যামকান্ত অরণ্যে রমণীয় পরিণতি লাভ করলো—জগৎবাবু আনন্দে একেবারে আত্মহারা হ'য়ে উঠলেন। পাত্রের দিক থেকে এমন টেকসই, মজবুত পাত্র আর তিনি পাবেন কোথায় ? হাতে মোটা চাকরি, এবং সঙ্গে-সঙ্গে সে-চাকরি খুইয়ে দেবারো একটা নির্বন্ধন স্বাধীনতা আছে—কেননা বাপ তারই ভোগে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি উৎসর্গ ক'রে গেছেন। তাই

জগৎবাবু মিনতির চারপাশে সীতেশের গতিবিধিগুলো অব্যাহত ক'রে রেখেছিলেন। তাঁর পক্ষে, সীতেশ মিনতিকে বিয়ে করলে, মুস্কিল হ'বে এই, এতোদিন তাকে তিনি ভাই ব'লে ডেকে এখন কী ক'রে বাপ ব'লে ডাকবেন।

হ্যাঁ, সীতেশ এ-সব বিষয়ে অত্যন্ত খোলা-মেলা, যেটাকে সে পাবে ব'লে ঝুঁকেছে, সেটাকে অন্তত পাওয়ার জন্যেই পাওয়া চাই। সে একটা তপ্ত খোলা—তার খাঁই বড়ো। আজ নগদ, কাল ধার,—জীবনে এই ছিলো তার তারকা। সাজ করতে ঢোল ফুরোবার সে পক্ষপাতী নয়। সেই প্রবাদের বেড়ালের মতো মাছ ধরবে অথচ জল ছোঁবে না তেমন দুর্বল চতুরতাকে সে ঘৃণা করে। নাচতে যখন নেমেইছে, তখন ঘোমটা টানতে যাওয়া বৃথা। হ্যাঁ, মিনতিকে তার চাই, আর যখন চাই-ই, তখন সেটাকে দিবালোকের মতো স্পষ্ট ক'রে দেয়াই ভালো। কবিত্ব-এ যাবার একটাই কেবল সোজা রাস্তা আছে: অলিতে গলিতে অনর্থক ঘুরঘুর না ক'রে সীতেশ একেবারে সদর রাস্তার উপর মিনতির সামনা-সামনি এসে দাঁড়ালো। তার মেরুদণ্ডে জোর আছে ব'লে, মানে পেছনে তার জগৎবাবুর প্রেরণা ও সম্মতি আছে ব'লে ভঙ্গিটা কিছু তার উদ্ধত। কিন্তু, সীতেশ টের পেলো, শুধু বাপের মতটাই যথেষ্ট নয়, মেয়েরো একটা বক্তব্য আছে। সেটা এমন রূঢ় ও স্পষ্ট, রূপে-গুণে সীতেশ একটি নিটোল ইঁট হ'লে কী হ'বে, আঘাতে তাতে ফাটল ধরলো।

এবং, বলতে কি, তারি জন্যে বেশি ক'রে বিশেষ ক'রে মিনতিকে তার চাই। যাই বলো, ফ্ল্যাট রেস থেকে হার্ডল রেস্‌টাই বেশি রোমাঞ্চকর। প্রাপ্তির আদ্ধেক মজাই যায় নষ্ট হ'য়ে, যদি প্রেমে না হোঁচট খেতে হয়। বাধা-বিদারণের মাঝেই জীবনের সত্যিকারের সুখ। জোর ক'রে বন্দী করার চাইতে জোর দেখিয়ে বশীভূত করাতেই প্রেমের অহঙ্কার। শত্রুকে শৃঙ্খলিত ক'রে আনতে পারো, কিন্তু তার উদ্ধত অভিমানকে তুমি নত করতে পারো না, কিন্তু শত্রু যদি নিজে থেকে অস্ত্র ত্যাগ ক'রে তোমার বশ্যতা স্বীকার করে, সেইখানেই তোমার জয়। মিনতিকে এমন ভাবে পাওয়া চাই, যাতে ক'রে বোঝাবে যে মিনতিরো তাকে ফেরাফিরতি না পেলে চলে না। প্রেমের ব্যাপারে আসলে পথ বা পদ্ধতিটা কিছু নয়, দেখতে হ'বে কী তুমি পেলে। জীবনটা এখানে আর্টের একেবারে বিপরীত: বিষয়টাই তার বড়ো, বিবৃতি নয়। নিজেকে সুখী করা দিয়েই সীতেশের কথা, মেয়েদের সুখে সে বিশেষ বিশ্বাস করে না। অভ্যেসটাই তাদের সুখ, অমুদ্ঘাতিনী একটা ছুসি পেলেই তারা দাঁড়াতে পারলো। মন-নামক ব্যাধি বা যদি কিছু তাদের থাকে, বিয়ের পর তা অনেক জুড়িয়ে আসে,

সম্পূর্ণ সেরে ওঠে একটি সন্তান প্রসব করলে। সেই দিক থেকে, মিনতির সুখের জন্যে বড়ো বেশি সে একটা মাথা ঘামায় না. একটা axiomএর মতো সেটা সে একরকম স্বতঃসিদ্ধ ব'লেই ধ'রে রেখেছে—জিজ্ঞাস্য হচ্ছে নিজে সে কী ক'রে সুখী হয়. তার সুখের তুলনায় সামান্য একটা মেয়ের স্বার্থত্যাগের কী এমন মূল্য! Burdianএর গাধার মতো সে দ্বিধায় দুর্বল থাকবার ছেলে নয়, প্রেম ও বিয়ের মধ্যে কোন্ কাজটা আগে সম্পন্ন করতে হ'বে সেটা আর তাকে বুঝিয়ে বলতে হ'বে না।

তার ইচ্ছার স্পষ্টতার কাছে মিনতি যতোই অসম্মতিতে সঙ্কুচিত হ'তে লাগলো ততোই সীতেশ বাইরে প্রচার ক'রে বেড়াতে লাগলো মিনতি তার প্রেমে প'ড়ে গেছে, শুধু পড়া নয়, একেবারে হাবুডুবু, যাকে বলে খাবি খাওয়া। বিজ্ঞাপনের কায়দায়, এ দিক থেকে, সীতেশ নৃপতির উল্‌টো : সে নিজে থেকে মেয়েদের প্রেমে পড়ে না, নিজে থেকে মেয়েদের সে প্রেমে পড়ায়। যাই বলো, আমি কোনো মেয়ের প্রেমে পড়েছি এ-খবরটা লোকের শ্রুতিগত করানোর মধ্যে পৌরুষের একটা লজ্জাকর অপমান আছে। তুমি প্রেমে পড়েছ মানে, অনেকটা নিচেয় নেমে এসেছ। কিন্তু কোনো মেয়ে যদি তোমার প্রেমে প'ড়ে মূর্চ্ছা যায়, তা হ'লে তুমি তাকে হাত ধ'রে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিতে পারো। সেটায় মহত্ত্ব আছে। সীতেশ বাইরে ব'লে বেড়াতে লাগলো মিনতি ব'লে জগৎবাবুর একমাত্র মেয়েটি এমনি প্রবল পরাক্রমে তার প্রেমে প'ড়ে গেছে। সে অসহায়। এখন সীতেশকে সে এমন জায়গায় নিয়ে এসেছে, সীতেশ গলা খাটো ক'রে বন্ধুদের কানে কানে সংবাদ দিলে, মিনতিকে তার বিয়ে না করলেই নয়। প্রেম যেখানে দুর্দমনীয়, চরিত্রটা সেইখেনে একটা কলঙ্ককর গ্লানি—সেই দিক থেকে মিনতিকে বিচার করতে গেলে প্রেমের প্রতি দুর্বিচার করা হবে। সাপের বিষে যে ঘায়ের খুব ভালো ওষুধ হয় সে-কথা ভুলে গিয়ে সাপের বিষে লোক মারা যায় কেবল এ কথাটায় জোর দিলে চলে না। শেষ পর্য্যন্ত সীতেশ যখন তাকে বিয়েই করছে তখন আর ভাবনা কী, কিউপিডের সিসের বাণটা দেখতে-দেখতে সোনার হ'য়ে উঠবে।

সীতেশের বাইরের জগৎটা এতো বিশাল যে গুজবটা সে নিজেই সেই লোকারণ্যে লেলিহান একটা অনলাকার ক'রে তুললে। সেই আগুনের তাপ ও গন্ধ এসে লাগলো জগৎবাবুর চোখে-নাকে, তিনি প্রথমটা কি-রকম ধাঁধিয়ে গেলেন। বাজারে যা-কিছু তাঁর খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিলো সব প্রায় নিঃশেষ হবার জোগাড়। বার লাইব্রেরিতে উকিল-বন্ধুরা এমন পর্য্যন্ত বলাবলি করতে লাগলো যে সীতেশ

নাকি তাসের আড্ডায় তাদের বলেছে : নইলে মেয়েটার বাপকে আমি দু' হাতে এতো ধার দিচ্ছি কেন, এটা তোমাদের সহজ বুদ্ধিতে আসে না? তলায় কোথাও তাপ না থাকলে জল তো খামোকা এমন উথলোতে পারে না। টাকা রোজগারের এই একরকম ফেরেববাজি। তা, আমি পুরুষ, তাঁর মেয়েকে আমি বাপের পাপে উচ্ছন্নে যেতে দেবো কেন?

কথাগুলি জগৎবাবুকে ক্লিষ্ট, ক্লেদসিক্ত ক'রে তুলতে লাগলো, তিনি একদিন সীতেশকে সরাসরি জিগগেস করে, বসলেন : ব্যাপার কী বলো তো, সীতেশ। ক্লাবে-লাইব্রেরিতে আমার তিষ্ঠানো যে দায় হ'য়ে উঠলো।

যেন কিছুই জানে না এমনি একখানি সুগোল মুখ ক'রে সীতেশ বললে,—কী হয়েছে?

জগৎবাবু জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁটটা একবার চেটে বললেন,—এরা সব তোমাকে আর মিনুকে নিয়ে যাচ্ছেতাই অপবাদ দিচ্ছে।

—অপবাদ! আমাদের মাঝে অপবাদের অবকাশ কোথায়?

—বলছে, জগৎবাবু গলাটা একটু চুলকে নিলেন : তোমাদের বিয়ে না করলেই নাকি নয়।

—ভালোই তো। সীতেশ লজ্জিত মুখে হেসে উঠলো : বিয়ে ব্যাপারটার পাবলিশিটির মধ্যে অপবাদ কোথায়?

—কিন্তু কেন যে তোমাদের বিয়ে হচ্ছে তারই একটা মন-গড়া কারণ বা'র করতে গিয়ে জিহ্বাকে তারা উচ্ছৃঙ্খল ক'রে দিয়েছে।

সীতেশ আবার হাসলো : একদিন ভোজ দিয়ে তাদের সেই বিষাক্ত জিহ্বাকে না-হয় ঠাণ্ডা ক'রে দেয়া যাবে। বুঝলেন স্যর, সীতেশ মুখে একটা গাম্ভীর্য্যের মুখোস টেনে দিলো : নুড়ি ধ'রে-ধ'রে যেমন পাহাড়ে ঝর্নার পথ খুঁজে পাওয়া যায়, তেমনি এ-সব নিন্দা অপবাদের চিহ্ন ধ'রে-ধ'রে আমরা খাঁটি সত্যে এসে পৌছুতে পারি। জীবনে যে-সব সুবিধে থেকে আমরা আমাদের অযোগ্যতার জন্যে বঞ্চিত হই, অন্যের জীবনে তার সদ্ব্যবহার দেখলে আমাদের চোখ একটু টাটায় বৈকি। টক আমরা তকেই বলি যে-আঙুর আমাদের নাগালের বাইরে।

—বলছে নাকি মিনুর চরিত্র—এবং তারি জন্যে—

সীতেশ একেবারে গলা ছেড়ে কড়ি-দেয়াল কাঁপিয়ে হেসে উঠলো : তারি জন্যে আমি তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত! সে-মেয়ের বিয়ে হ'য়ে গেলে আর তার চরিত্র-হানির কথা ওঠে কী ক'রে? যতোক্ষণ আমার কাছে সে কুমারী ততোক্ষণই তাদের

কাছে সে নিন্দাভাজন, আর যখুনি আমার পাশে সে স্ত্রী হ'য়ে দাঁড়াবে, তখুনি সবারই কাছে সে আদর্শ সতী হ'য়ে গেলো। এই তো?

অপরিমিত উৎসাহে জগৎবাবু তার হাত চেপে ধরলেন: তুমি তাকে গ্রহণ করবে?

—না ক'রে উপায় তো কিছু আর দেখতে পাচ্ছি না। সীতেশ মুখের উপর পুরু ক'রে একটা চিন্তার পোঁচ বুলোলো: আমার জন্যে একটি নিষ্পাপ মেয়ে নিন্দাভাগী হ'য়ে থাকবে, এ আমি কিছুতেই সইতে পারবো না। দিন কতক ধ'রে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে মিশছি বলে'ই তো এই লাঞ্ছনা, তার পর সারা জীবনভোর তার সঙ্গে সীতেশ গলাটা একবার খাঁখরালো: তখন দেখবো কোন শর্মা কী বলতে আসে! হাতের লাঠিটা সীতেশ মেঝের উপর সজোরে একবার ঠুকে দিলো।

জগৎবাবু এতোদিন আকাশে উড়ছিলেন, এবারে এলেন শক্ত, নিরাপদ মাটিতে নেমে। সীতেশের কাঁধে একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন,—তুমি আমাকে বাঁচালে, সীতেশ। তোমার মামাকে তা হ'লে একটা চিঠি লিখে দিই।

—এ-সব ব্যাপারে আমার গার্ডিয়ান মামা নন্, আমার চাকরি। সায় দেবার জন্যে আমার চাকরিটাই যথেষ্ট।

—তবে কবে নাগাদ তোমার সুবিধে হ'বে বলো দিকি?

সীতেশ এক সেকেণ্ডও গণনা করলো না, বললে,—সুবিধে আমার সব সময়। যেদিন বলবেন সশরীরে আমি হাজির থাকবো।

—মাঘ মাসটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় বৈ কি।

—করবেন, তাতে যদি আপনাদের সুবিধে হয়। আমার দিক থেকে যদিও তার কোনো দরকার ছিলো না। সীতেশ উঠে দাঁড়ালো: এতো সময় নেবার কী-বা কারণ থাকতে পারে?

জগৎবাবু বললেন,—একটা পারিবারিক উৎসব, সবাইকে কিছুদিন আগে থেকে খবর দিয়ে রাখতে চাই। আর এ-দিকে আমারো তো কিছুটা জোগাড়-যন্ত্র করতে হয়।

সীতেশ অবাক হ'বার ভাণ ক'রে বললে,—আপনার আবার জোগাড়-যন্ত্র কিসের! জোগাড়-যন্ত্র তো আমি করবো। আপনার মেয়ের তো আপনি বিয়ে দিচ্ছেন না, আপনার মেয়েকে আমি বিয়ে করছি। বেশ ক্লীন্, পরিচ্ছন্ন বিজিনেস্। লক্ষ্মীর জন্যে তার বাহনটিকে না ডাকলেও চলবে। এ-ক্ষেত্রে আমার আর তো কোনো দাবি-দাওয়া নেই, যতো টাকা আপনি আমার কাছে ধারেন, কথা কয়টা প্রায় সীতেশের নির্লজ্জ ব্যবসাদারির মতোই শোনাচ্ছিলো, কিন্তু সে কায়দা ক'রে

সামলে নিলো : তা আমাকে যৌতুক দিতেই না-হয় শোধ ক'রে দিলেন। এর আবার জোগাড়-যন্ত্র কী !

জগৎবাবুর বুক থেকে নিশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে কঠিন একটা ভার নেমে গেলো। হ্যাণ্ড-সেইক করার ভঙ্গিতে তার হাতটা চেপে ধ'রে বললেন,—তুমি মহানুভব। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনদের খানিকটা সময় না দিলে—তারা সবাই দূরে থাকে—

—বেশ তো, তাদের ঠিকানার লিষ্টটা আমাকে দিন, সীতেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিলো : আমিই তাদের আসবার খরচ পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিছুই তাদের আমি অসুবিধে হ'তে দেবো না।

জগৎবাবু আরেকবার তার কাঁধটা নেড়ে দিলেন। ঢোঁক গিলে বললেন—এইবারই তাঁর আসল কথাটা বেরুলো : ইতিমধ্যে মিনুরো মত ক'রে ফেলতে হয়। বুঝছই তো সব—মেয়ে বড়ো হ'য়ে উঠেছে—কথাটা যে কী ব'লে শেষ করবেন জগৎবাবু তা ভেবে পেলেন না।

—মত, সীতেশ চিন্তাকুল গলায় বললে,—তা, এ-ক্ষেত্রেও একটা মত নিয়ে তাকে মাথা ঘামাতে হ'বে নাকি ?

—একদম বিয়েই করবে না বলে কি না—যা আজকালকার ফ্যাসান্। জগৎবাবু অভয় দিলেন ; তা মিনতি এমন কিছু অবুঝ হ'বে না। নিজের ভালো-মন্দ সে যাচাই ক'রে দেখতে শিখেছে।

—হ্যাঁ, দয়া ক'রে তাকে অবুঝ হ'তে বারণ ক'রে দেবেন। মুখ-চোখ ঘোরালো ক'রে সীতেশ বাইরে বেরিয়ে গেলো।

সাত

এ-বাড়িতে সীতেশ মাঝে মাঝে সকালবেলার দিকে আসতো, কিন্তু জগৎবাবুর প্রশ্রয়ে ইদানি তার গতিবিধির কোনো আর বাঁধন নেই। নিজের স্বাভাবিক ভদ্রতার দূরত্বটুকু নিজেই সে অন্তরঙ্গতায় অতিক্রম ক'রে এসেছে। আগে যদি বা সে নিচে থেকেই বিদেয় হ'তো, এখন সরাসরি উঠে আসছে উপরে। কথা বলবার কেউ থাক্ বা না থাক তার ব'য়ে গেলো। চেয়ারে ব'সে প্রতীক্ষা করার চেয়ে পাতা বিছানাটাতেই সে বিশ্রাম নিতে পারে।

বিকেলবেলা লাঠি ঘুরোতে-ঘুরোতে সীতেশ এসে হাজির। জগৎবাবুর সামনে চেয়ারে থিতিয়ে বসবার আগেই তার চোখের সামনে দিয়ে মিনতি এলো-আঁচলে গতির একটা বিস্ফারিত পাল তুলে ছুটে বেরিয়ে গেলো। ভুরু দুটো কুঁচকোবার

পর্য্যন্ত সীতেশের সময় হ'লো না। শুধু আলোড়িত হাওয়ায় দ্রুততার যে একটা ঝাঁজ পাওয়া যাচ্ছে তাতেই খানিকটা বিহ্বল হ'য়ে সীতেশ জিগগেস করলে : ও ও-বাড়িতে এতো ঘন-ঘন যায় কী করতে ?

আজকাল সর্ব্বনামের প্রয়োগেই যেন নামের গুণ-বাচ্যতা আরো বেশি ব্যাপক হ'য়ে উঠেছে।

জগৎবাবু সাফাই গাইলেন : মিহিরের ঐ অবস্থা হওয়ার পর থেকে মিনু ওর কাছে মাঝে-মাঝে গিয়ে একটু বসে—এইটুকু ছেলেবেলা থেকে আলাপ—একাধটু গল্প-সল্প করে আর-কি।

সীতেশ বললে,—তার জন্যে, দরকার হয়, একটা নার্স রাখলেই তো চলে। বিলেতে যাকে বলে কিনা **companion**। তা আমাদের বিয়ে হ'য়ে গেলে ওর বদলে ঐ ভদ্রলোকের জন্যে আমাকে একটা নার্স রেখে দিতে হ'বে নাকি ?

জগৎবাবু হেসে উঠলেন : তা কেন, তোমার কখন কোথায় বদলি হ'তে হয় ঠিক কী !

—হ্যাঁ, সীতেশ মুখ-চোখ অন্ধকার ক'রে বললে,—আমি ও-সব কিছু পছন্দ করি না। লোকে যে চরিত্রের উপর কটাক্ষ ক'রে কথা কয়, শুধু এরি জন্যে।

জগৎবাবু চমকে উঠলেন : কিসের জন্যে ?

—এরি জন্যে। একজন সুস্থ, সম্পূর্ণ, সচেতন মেয়ে একটা জড়ত্বপ্রাপ্ত পঙ্গু, রুগ্ন, লোকের সঙ্গে ব'সে-ব'সে দুঃখে শুধু ভাবাবেগের উদ্গার দিচ্ছে—**O hateful**, আমি এ-সব পছন্দ করি না মোটেই। সীতেশের চোখে কুটিল একটা চাউনি ফুটে উঠলো : ও বাড়িতে ওরা দু'জন ছাড়া আর কোনো বাসিন্দা আছে ব'লে তো শুনতে পাই না।

জগৎবাবু সমস্ত শরীরে ত্রস্ত, হতভম্ব হ'য়ে গেলেন। একটু থেমে, গলায় স্বর পেয়ে বললেন,—ও-দিকটায় ওদের নিরন্ধকার সাদা, সীতেশ। নিতান্ত শিশুকালে ওর মা মারা যাবার পর মিহিরের মা-ই ছিলো ওর মাসিমা। মিহির ওর ভাইয়ের মতো।

—**Rot.** সীতেশ টেবলের উপর প্রকাণ্ড একটা চড় মারলো : মাসতুতো ভাই আবার একটা ভাই। না-হয় তর্কের খাতিরে মানলাম আপনার **proposition**—শাস্ত্রে আছে ভ্রাতৃমতী মেয়েকে বিয়ে করবে, সেই দিক থেকে একটা শালা থাকা নেহাৎ মন্দ হ'বে না। কিন্তু জিগগেস করি, মেয়েদের জীবনে ভাই-কি সব, তার চেয়ে বড়ো আর কোনো কিছু তাদের কর্তব্য নেই ? যাই বলুন, সীতেশ অতিরিক্ত গম্ভীর হ'য়ে গেলো : এ-সব বড্ড দৃষ্টিকটু লাগে।

আমাকে নিয়ে অপবাদ যখন একটা উঠেইছে, তখন সেটার চরম প্রতিবাদ করবার জন্যে আমারই সঙ্গে কি তার মেলা-মেশা করা উচিত হ'তো না? আমি শুধু, ক্র্যাঙ্ক লোক, প্যাঁচ ক'ষে কথা বলতে শিখিনি, লোহা-লক্কর ঘেঁটে-ঘেঁটে একেবারে কাঠ হ'য়ে গেছি। অর্থ-টা বোঝানো দিয়েই হচ্ছে কথা, কথার পাতা-বাহার আমাদের কাছে আবর্জনা।

—হ্যাঁ, দুর্বল গলায় জগৎবাবু সায় দিলেন: মিহিরের তখন তার দাদার সঙ্গে তমলুক চ'লে যাওয়াই উচিত ছিলো। এখানে থেকে সে করছে কী?

—আরেকজনের জীবনে তার অন্ধকার সংক্রামিত করে দিচ্ছে। দেখুন, সীতেশের মুখের ডৌলটা রেখায় রুক্ষ হ'য়ে উঠলো: রোগ তবু আমি সহ্য করতে পারি, কিন্তু কিছুতেই সইতে পারি না এই রোগ নিয়ে কাবত্ব। দুঃখের চেয়ে বেশি কুৎসিত লাগে তার সহানুভূতির ভাণটা। পরের দুঃখে প্রতিবাসী মানুষ হিসেবে আমাদের যেখানে নিশ্চিন্ত না হোক উদাসীন থাকার কথা, সেখানে নিজের মুখে এমন একটা সমবেদনার উৎসব করার মতো ভয়াবহ আর কী হ'তে পারে? অস্বাস্থ্যের চেয়েও দারুণতরো অস্বাস্থ্য। সীতেশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো: যদি আমাদের বাঁচতে হয়, কথাটাকে একটু নাটুকে শোনাতে পারে, আমাদের চ'লে আসতে হ'বে অন্ধকার থেকে আলোকে, অস্বাস্থ্যকর পরহিত-ব্রত থেকে আত্মলীন স্বার্থপরতায়।

—তুমি যেয়ো না, সীতেশ। জগৎবাবু আতিথ্যে একেবারে উদ্বেল হ'য়ে উঠলেন: বোস, বোস। আমি মিনুকে কালই বলবো, কালকেই বারণ ক'রে দেবো দেখো।

সীতেশ কোনো কথা বললে না, ঠোঁটের কোণে ধারালো একটি হাসির রেখা ফুটিয়ে আস্তে-আস্তে চ'লে গেলো।

সিঁড়ির মুখে জগৎবাবু মিনতিকে ধ'রে ফেললেন।

অবতীর্য্যমান মিনতির গতিতে-পিছল গা থেকে ঝ'রে পড়ছে সুষমার ধারা, হঠাৎ থামতে গিয়ে বেণীটা পড়েছে তার বুকের উপর ছিট্‌কে, হাতে অড়ের মধ্যে বেঁটে একটা এস্রাজ, প্রস্তর-প্রতিহত ঝর্নার মতো তার সর্ব্বাঙ্গে যেন স্ফূর্ত্তির ফেনিলতা।

জগৎবাবু তাকে ধ'রে ফেললেন: কোথায় যাচ্ছিস এ-সময়?

মিনতির স্বর কেমন হালকা, গায়ে যেন তার উড়ালদেয়া পাখির ডানার লঘুতা। চোখের পাতা নাচিয়ে সে বললে,—কোথায় আবার! মিহিরের কাছে।

—সেখানে তোর কী কাজ ?

বাপের কাছে মিনতি একেবারে ছেলেমানুষ। সে ঠোঁট উলটে বললে,—কতো! সরো, সরো দেখি, তাকে আমি একলা ছাতের ওপর বসিয়ে রেখে এসেছি।

—এই বাজনাটা কেন ?

—বাজাবো। মিনতি খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো : আর খানিক বাদেই চাঁদ উঠবে, বাবা।

—এ কী ছেলেমানষি! জগৎবাবু ধমকে উঠলেন : আর ক'দিন বাদে তোর বিয়ে হচ্ছে, আর এখনো তুই এমনিধারা খুকি হ'য়ে থাকবি ?

—খুকিই যখন আছি বাবা, মিনতির চোখ হাসিতে সজল হ'য়ে উঠলো : তখন মিছিমিছি অসময়ে আর বিয়ে কেন ?

—না, বিয়ে আমি তোর ঠিক ক'রে ফেলেছি। জগৎবাবু মুখমণ্ডল পাশবিক গম্ভীর ক'রে তুললেন : এই মাঘমাসেই তোর বিয়ে।

—তার অনেক দেরি আছে, বাবা। মিনতি রেলিঙের পাশ দিয়ে পথ খুঁজতে চেষ্টা করলো : ততোক্ষণ আকাশে চাঁদ উঠে গেছে। প্রশস্ত পথ না পেয়ে মিনতি থামলো; বললে,—তুমি যে দিন-ক্ষণ সব একেবারে ঠিক ক'রে ফেলেছ, দেখছি।

—হ্যাঁ, মিছিমিছি দেরি করা আর ঠিক হ'বে না। এ দিকে চারদিকে কান পাতা প্রায় দায় হ'য়ে উঠেছে।

মজা পেয়ে মিনতি মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলো। দীপ্ত কণ্ঠে বললে,—তার আগে চোখ চাওয়াই হয়তো অসহ্য হ'য়ে উঠবে, বাবা।

—তার মানে ?

—মানে, তার আগে আমাদের জীবনে কতো কী দুঃসাধ্যসাধন ঘ'টে যেতে পারে তার ঠিক নেই।

বিমূঢ় চোখে জগৎবাবু তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

মিনতি হঠাৎ গতির নতুন তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বললে,—যেতে দাও বাবা, মিহির আবার তার চোখ ফিরে পাচ্ছে। ভাবতে পারো ? তখন আবার তার দিকে চোখ মেলে তাকাতে পারবে ?

জগৎবাবু তার মুখের উপর রুখে এলেন : সে চোখ ফিরে পেলে তোর কী ?

—বা, আমার কী! কা'র তবে ? সে চোখ ফিরে পেলে তারি আলোয়ই তো আমার আকাশটা নির্মল সাদা হ'য়ে যাবে। কথার স্রোতেই যেন কোন ফাঁকে বাকি সিঁড়িগুলি বেয়ে মিনতি নেমে এলো।

সোজা চ'লে এলো বাইরের ঘরে। দেখলে একটা চেয়ারে ব'সে সীতেশ মেঝের উপর তার লাঠি ঠুকছে।

—এই যে, সীতেশবাবু যে, নমস্কার। ব'লে সর্ব্বাঙ্গে দ্যুতিমান গতির একটা হাওয়া বইয়ে মিনতি বেরিয়ে গেলো।

মনে-মনে সীতেশ একটু হাসলো। আজ যে এমনি দূর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে সে এক দিন কেমন অবলীলায় সান্নিধ্যের তাপে ও সৌরভে সর্ব্বাঙ্গে উছলে উঠবে। হাত বাড়িয়ে আঁচলটা তখন চেপে ধরা কতো সহজ হ'তো।

জগৎবাবু ঘরে ঢুকে রাগে গরগর করতে লাগলেন। মিনতি তো নেই-ই, সীতেশ-ও কখন আলগোছে স'রে গেছে।

আট

ততোক্ষণে ওরা ছাত থেকে নেমে এসেছে। সীতেশ পা টিপে টিপে উপরে উঠে এলো। নিচে কালিদাসকে বলতে সে-ই সিঁড়ি দেখিয়ে দিলে। সীতেশের চেহারায় এমন একটা ঝাঁকালো স্পর্দ্ধিত ব্যস্ততা আছে যে তাকে দেখামাত্রই জায়গা ছেড়ে দিতে হয়, কোনো কিছু বিশীর্ণ সৌজন্যের সে অপেক্ষা করে না।

উপরে উঠেই দেখতে পেলো কোণের একটা ঘরে আলো জ্বলছে। জুতোর যাতে না আওয়াজ হয় দুই পায়ে সাবধান হ'য়ে দরজার কাছে এসে সীতেশ ঘরের মধ্যে উঁকি মারলো। চাপা, মিঠে আলো, ঘরময় পরিচ্ছন্ন একটি শুচিস্মিতি। টেব্‌লের কাছে চেয়ার টেনে ব'সে মিনতি সশব্দে একটা বই পড়ছে, সমস্ত মুখে সেই অনুভবের আভা, বসবার ভঙ্গিতে প্রশ্রয়শীল স্নেহের একটি সুষম নম্রতা। কাছাকাছি আরেকটি চেয়ারে মিহির ব'সে, আগ্রহে উচ্চকিত উগ্র তার ভঙ্গি—দুই নির্ব্বাপিত চোখে যেন সে উচ্চারিত শব্দগুলির জ্যোতি-বিদারণ দেখছে। শব্দের নদীতে যেন সে করছে অবগাহন, যেন প্রতিটি শব্দ কা'র খণ্ড-খণ্ড স্পর্শের মতো তার সর্ব্বাঙ্গে পড়ছে ছিটিয়ে।

দেখে সীতেশের ভারি দুঃখ হ'লো। বলা বাহুল্য মিহিরের জন্যে নয়, যে গ্রহ ম'রে গেছে, যেখানে সামান্য এককণা ঘাসও অঙ্কুরিত হবার প্রত্যাশা রাখে না, সেই সুন্দর, নিরুত্তাপ চাঁদের জন্যে তার মায়া করতে পারে, কিন্তু সমবেদনা নয়। তার দুঃখ মিনতির জন্যে, যে-গ্রহে এতো তাপ, যেখানে এখনো প্রাণের অণুতম সম্ভাবনা নেই, কিন্তু একটু জুড়িয়ে এলেই যেখানে সৃষ্টির সবুজ শোভাযাত্রা সুরু হ'বে —সেই অগ্নিপিণ্ড বৃহস্পতির জন্যেই তার ভাবনা। ভাবের এতো আগুন অসহ্য,

বুদ্ধি দিয়ে তাকে একটু ঠাণ্ডা ক'রে আনতে হ'বে। তুষারীভূত চাঁদ আর বহ্নিমান বৃহস্পতি—তাদের দুয়ের মাঝখানে এই পৃথিবী, সীতেশ নিজে। ভিৎটা তা'র শক্ত, উপরে তার নির্ব্বারিত উন্মুক্ততা। যদি বাঁচতে হয়, তো এই মাঝামাঝি পৃথিবীতে নেমে এসো।

সীতেশ ঘরে ঢুকে সজোরে লাঠিটা একবার ঠুকে দিলো: এই যে। বাজনা থামিয়ে এখন বুঝি বই প'ড়ে শোনানো হচ্ছে? কী বই ওটা? কা'র?

মিনতি বিস্ময়ে একেবারে কালো হ'য়ে গেলো। শুকনো গলায় বললে,—এ কী! আপনি এখানে কোত্থেকে?

—নিচে থেকে।

—এখানে আপনি কী চান?

—কা'কে চান বললে উত্তরটা খুব সহজে দেয়া যেতো। সীতেশ হাসিমুখে বললে,—তোমার নামের এমনি মহিমা যে উচ্চারণ করতে-না-করতেই এ-বাড়ির সমস্ত দরজা আমার কাছে আলগা হ'য়ে গেলো।

—আমার সঙ্গে দেখা করতে চান যদি তো আমার বাড়িতেই গেলে পারতেন। মিনতির দণ্ডায়মান দেহে শান-দেয়া শীর্ণ একটা ছুরি ঝকঝকিয়ে উঠলো।

সীতেশ বললে,—তোমার সঙ্গে দেখা করাটা দেখছি এ-বাড়িতেই প্রশস্ত। এখানেও সেই নিভৃতিই অব্যাহত থাকবে আশা করি। কী বলেন, মিহিরবাবু?

মিহির তার চেয়ারে ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠলো। আবছা গলায় বললে,—আপনি সীতেশবাবু আশা করি।

—আশ্চর্য্য। আপনি যে আপনার তীব্র ঘ্রাণশক্তির জন্যে দু' দিনেই ফেমাস হ'য়ে উঠবেন।

মিহির শরীরে একটা ক্লান্ত ভঙ্গি এনে বললে,—বসুন। ওঁকে একটা চেয়ার এগিয়ে দাও, মিনতি।

সীতেশ নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে পড়লো। বললে,—থাক, আমার জন্যে কাউকে ব্যস্ত হ'তে হ'বে না। আমি নিজেই নিজের যথেষ্ট।

মিনতি দূরে দাঁড়িয়ে ঝাঁজালো গলায় বললে,—আপনার এখানে কী দরকার তাই বলুন।

—তোমার এখানে আসবার যেমন কিছু দরকার নেই, তেমন আমারো হয়তো নেই। সীতেশ উদাসীন মুখ ক'রে বললে,—তোমার এখানে আসবার যতোটুকু দরকার, ঘুরিয়ে বলতে গেলে, আমার তার চেয়ে অনেক বেশি।

মিনতি সীতেশের দিকে পিঠ করে টেব্‌ল ঘেঁসে বসে পড়লো। বইটা ফের

কুড়িয়ে নিয়ে বললে,—আমাদের সেই পর্য্যন্ত হয়েছিলো—য়্যালিস আর আর্নল্ড প্যারি থেকে Orient Expressএ করে ভেসে পড়লো।

মিহির পীড়িত কণ্ঠে বললে—ও এখন থাক্।

—হ্যাঁ, নির্জ্জীব অন্ধকারে চুপচাপ ব'সে প্রেমের গল্প শুনে কী লাভ? সীতেশ কথার উৎসাহে যেন উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো: তার চেয়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেহে পরিপূর্ণ একটি প্রেম নির্ব্বাহ করায় পৃথিবীর অনেক বেশি উপকার।

খানিকক্ষণ মিহির স্তব্ধতায় অবিচল হ'য়ে রইলো। পরে উঠবার একটা অসহায় চেষ্টা করতে-করতে বললে,—তোমরা গল্প করো, মিনতি, আমি বারান্দায় গিয়ে বসছি।

—না, না, আপনার উঠতে হবে না। কথার প্রবল ঝাপটায় সীতেশ তাকে ফের দুর্ব্বলতায় অভিভূত ক'রে ফেললো: আমাদের এমন কিছু সব রঙিন কথা-বার্ত্তা নয় যে আপনার উপস্থিতিতে তা হাওয়ায় উড়ে যাবে। বেশ সরল, স্পষ্ট, বোধগম্য কথা। সে-রকম কথা বলতেই আমি ভালোবাসি। আপনি দয়া ক'রে ওঁকে ছুটি দিন, আমি ওঁকে নিয়ে যেতে এসেছি।

—কোথায় নিয়ে যেতে এসেছেন? দৃষ্টিহীন চক্ষুর তীক্ষ্ণতায় মিহির যেন অস্ফুট একটা আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো।

—মাঘ মাসে অবিশ্যি আমার বাড়ি য়্যাশটন রোডে—আপাততো রাস্তায়, এ-বাড়ির বাইরে, একটু ফাঁকা হাওয়ায়। সীতেশ উঠে দাঁড়ালো: আপনি তো দিব্যি কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু দিন-কে-দিন ওঁর চেহারার এই হাল দেখে আমরা যে চিন্তিত হ'য়ে উঠছি, মশাই। সেবা করাই তো আর ওঁর একমাত্র কাজ নয়।

—কিন্তু মাঘ মাস, মাঘ মাস আপনি কী বলছেন?

—ও! সে একটা আছে। আপনি জানতে পারবেন ঠিক। আপনার নামে ঠিক চিঠি আসবে। মিনতির দিকে চেয়ে সীতেশ ঠোঁটের একটা প্রান্ত একটু সূঁচলো করলো: মিনতি না পারেন, আমিই আপনাকে পড়িয়ে যেতে পারবো। যাবেন কিন্তু সেই নেমন্তন্নে।

মিনতির সমস্ত শরীর বাক্যের তীব্রতায় বিচ্ছুরিত হ'য়ে উঠলো: আপনি আমাকে অপমান করবার জন্যেই এমনি অনাহূত এখানে চ'লে এসেছেন নাকি?

—অপমান! তোমাকে অপমান ক'রে আমার সুখ কী! সীতেশ তার মুখের রুক্ষতা কোমলতায় আর্দ্র ক'রে আনলো: তোমাকে যে আমি ভালোবাসি

তারই একটা চক্ষুষ্মান প্রমাণ দেবার জন্যে আমি একটা আয়োজন করছি মাত্র। তোমার জীবনের এই অন্ধকারের ভার থেকে মুক্ত ক'রে প্রখর অনাবৃত এক সত্যের আলোয় তোমাকে নিয়ে আসবো—এর চেয়ে বড়ো সম্মান মেয়ে হ'য়ে তুমি কী আশা করতে পারো শুনি?

যেন গভীর একটা গহ্বরের তলা থেকে মিহিরের গলা এলো: মাঘ মাসে আপনাদের বিয়ে হ'বে ব'লে বুঝি ঠিক হ'য়ে গেছে?

মিনতি চীৎকার ক'রে উঠলো: মিথ্যে কথা।

সীতেশের হাসি এবার শাণিত না হ'য়ে স্নিগ্ধতায় প্রশান্ত হ'য়ে উঠলো: অন্যকে খামোকা সান্ত্বনা দেয়ার চাইতে নিজেকে সুখী করাই তোমার কর্ত্তব্য হওয়া উচিত। সীতেশ মিহিরে দিকে এক পা এগিয়ে এলো: হ্যাঁ, জগৎবাবুর সঙ্গে তাই আমার কথা হয়েছে।

মিনতি ফের উঠলো চেঁচিয়ে: আপনি যান এখান থেকে।

—আমি এখান থেকে চ'লে গেলেই তো আবার সেই অন্ধকার। সীতেশ নির্ম্মল হাসিমুখে বললে,—আমি যতোক্ষণ এখানে আছি, ততোক্ষণই তো তোমার এঁদো স্যাঁতসেঁতে মনের ওপর বুদ্ধির খানিক রোদ পড়ছে। ততোক্ষণই বরং তুমি নিজের দিকে সম্পূর্ণ চোখ মেলে তাকাবার একটা অবকাশ পাচ্ছ।

মিনতি রাগে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো: আপনি যান, আমাদের এই অন্ধকারই ভালো।

—তুমি বললেই তো আর সেটা ভালো হ'য়ে যাবে না। সীতেশ ভারিক্কি চালে একটু ঘাড় দোলালো: প্রচুরতম মুহূর্ত্তের জন্যে প্রভূততম তোমার যে-ভালো তা তুমি এই অন্ধকারে ব'সে দেখতে পাচ্ছ কি ক'রে? আমার সঙ্গে বাইরে একটু বেরুবে চলো, দেখতে পাবে। সীতেশ হেসে উঠলো।

কিন্তু মিনতি উঠলো ঝাঁজিয়ে: আপনি কে? আপনার কিসের এই স্পর্দ্ধা শুনি যে আমাকে হুকুম করতে আসেন? আপনি আমার অভিভাবক?

—দু'দিন আগে আর পরে। লাঠির উপর হাতের একটা কঠিন ভঙ্গি ক'রে সীতেশ বললে,—স্পর্দ্ধা যদি বলো তো তার সীমা নেই। আমি আগাম বিয়ের যৌতুক পর্য্যন্ত পেয়ে গেছি—যাকে বলে কিনা দাদন—আমার কাছে তোমার বাবার প্রকাণ্ড দেনা—pots of money। কিন্তু অভিভাবক সত্যি আমি হ'তে চাই না, তোমার উদ্ভাবক হ'তে পারলেই আমি খুসি।

—বেশ, তাতেই যদি আপনি খুসি, থাকুন আপনি আপনার স্বপ্ন নিয়ে।

আমাদের অন্য কাজ আছে। মিনতি টেবলের কাছে ঘুরে গেলো। নিজের দুর্ব্বলতা লুকোতে বই-খাতা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

—নিজের সুখটা এক‌েকসময় পুরোপুরি ভোগ করা চলে না আর-কাউকে সেই সঙ্গে সমান খুসি করতে না পেলে। সীতেশ ফেরবার মুখে দরজার কাছে একটু এগিয়ে এলো: তুমি তো কেবল স্পর্দ্ধাই দেখলে, কিন্তু তার মেরুদণ্ডটা যে দৃপ্ত অধিকারবোধে এতো কঠিন সেই অধিকারটাই তুমি দেখতে পেলে না।

—অধিকার! মিনতি আহত সাপের মতো ফুঁসে উঠলো: সেই অধিকার আপনি বাবার বিরুদ্ধে আদালতে গিয়ে সাব্যস্ত করবেন যান। তাঁর মেয়ে তাঁর ঋণের জন্যে দায়ী নয়।

—কিন্তু তাঁর মেয়ে আমার এই আগ্রহের জন্যে দায়ী। সীতেশ লাঠিটা হাওয়ায় একটু খেলাতে-খেলাতে বললে,—স্বপ্ন দেখা আমার ধাতে নেই. আমি দিনের আলোর মানুষ—আমি বুঝি স্পর্শসহ, কঠিন স্পষ্টতা। তোমার জীবনটাকে তেমনি সুখে স্পষ্ট. সমতল একটা জায়গায় অধিষ্ঠিত দেখতে চাই। তুমি চ'লে যেতে বললেই তো যাওয়াটা সহজ হ'য়ে দাঁড়ায় না। তোমাকে সুস্থ, দূরিতকলঙ্ক, কী না বলে— শুক্লীভূত দেখে যেতে হ'বে তো?

—কলঙ্ক? মিনতি দুঃসহ জ্বালায় আবার সর্ব্বাঙ্গে ঝলসে উঠলো: আপনি কি আজ ভদ্রতার মুখোসটুকুও খুলে ফেলেছেন নাকি?

—আমার সঙ্গে তোমার কী না বলে যে একটা কুৎসা রটেছে আমি সেই কথা বলছি না। সীতেশ চৌকাঠটা প্রায় পেরিয়ে এলো: কলঙ্ক তোমার এই তমসোপাসনা, তোমার এই অযৌক্তিক অনর্থকতা।

কী-একটা রূঢ় কথা বলবার জন্যে মিনতিও চৌকাঠ পেরিয়ে বাইরের বারান্দায় চ'লে আসছিলো, ঘরের মধ্যে কিসের একটা ভারি-রকম শব্দ হ'তেই সে ছুটে ফিরে গেলো। দেখলো মিহির হাত বাড়িয়ে শোবার খাটটা ধরবার জন্যে স্খলিত, চঞ্চল পায়ে জিনিস-পত্রের আগোছাল ভিড় সরিয়ে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হচ্ছে। মিনতি তাকে ধ'রে ফেললো।

সেই মুহূর্ত্তে দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকলো নৃপতি!

নৃপতি শাসনের সুরে গর্জ্জন ক'রে উঠলো, ঐ লোকটাকে এ-বাড়িতে ঢুকতে দিলো কে? সিঁড়িতে আমি ওকে কাট্ করলাম। ওকে দেখে অবধি সমস্ত গা আমার রি-রি করছে।

মিহির মিনতির গায়ে ভর রেখে বিছানায় এসে বসলো। বললে,—তুমি ওকে চেন?

—আলাপ নেই, কিন্তু ওর হাট-হদ্দ আমি চিনি! লোকটা নিখুঁত একটা স্কাউণ্ড্রেল। জগৎজোড়া ওর বদনাম।

মিহির অল্প একটু হেসে বললে,—যাদের নাম আছে তাদেরই ওটা অবশ্যম্ভাবী পুচ্ছ।

—কিন্তু এখানে ওকে ঢুকতে দিলো কে?

—কেউ না। নিজের অধিকারবোধ সম্বন্ধে এমন উনি প্রবল সচেতন যে কোনো বাধাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট নয়।

—তাই ব'লে, নৃপতি তড়পাতে লাগলো: তাই ব'লে এমন একটা কুচরিত্র—দিন-রাত যে জুয়ো খেলে—তুমিই বলো না মিনতি, ওর সঙ্গে তোমাকে নিয়ে মিছিমিছি কতোগুলি স্ক্যাণ্ডালাস্ কথা রটে নি?

এই মন্তব্যগুলি মিনতির মনঃপূত হচ্ছিলো না। তাকে মিনতি না-হয় পছন্দ না করতে পারে তার রূঢ় অমিতচারিতার জন্যে, নৃপতির পছন্দ না করবার কারণ আরো গূঢ়তর হ'তে পারে, কিন্তু কারুর চরিত্র নিয়ে আলোচনা করাটাই তার কাছে অত্যন্ত বিশ্রী লাগছিলো। সে প্রতিবাদ না ক'রে পারলো না: কিন্তু অন্যে অপবাদ রটালে তাঁর কী দোষ?

—হ্যাঁ, মিহির উচ্ছ্বসিত গলায় বললে—আর সেই অপবাদের কলঙ্ক যখন পারিপার্শ্বিক শুভ্রতার বিশাল একটা আতিশয্যকে চিহ্নিত করছে। মিহির একটা ঢোঁক গিললে: যাদের আর কিছু নেই নৃপতি, তারাই সারশূন্য চরিত্রের জাঁক করে। শুধু চরিত্র দিয়ে আমরা কী করবো? চরিত্রের চাইতে জীবন অনেক বড়ো। সীতেশবাবু হচ্ছেন এই জীবনের সন্ধানী।

মিনতিও সাহস পেয়ে সুর মেলালো: আমরা যখন আর-কিছুর নাগাল পাই না, তখন আমরা মানুষের নামটাকে টেনে এনে তাকে পায়ে থেঁৎলাতে থাকি।

—যেমন তোমার নামটা নিয়ে ও করছে। নৃপতি রাগে ফেনিয়ে উঠলো: আমি এখানে থাকলে ওকে কিছুতেই তোমার ছায়া মাড়াতে দিতাম না, মিনতি। তা তোমরা যাই বলতে, আর যাই করতে।

—তার সঙ্গে পারতে না ককখনো। নিজের অধিকারের অহঙ্কারে সে এতো উচ্চণ্ড। মিহির বালিশে হেলান দিয়ে নির্লিপ্ত গলায় বললে,—সাপের মাথা ভাঙবার জন্যে অন্ধের হাত থেকে তার লাঠিটাও সে ছিনিয়ে নিতে পারে। প্রচুরতম মুহূর্তের জন্যে প্রভূততম ভালো। ছায়া? তখন আর ছায়া কোথায়? ইচ্ছে করলে মিনতিকে

সে সশরীরেই উৎপাটিত ক'রে নিয়ে যেতে পারে। মিহির মার্জিত, স্বচ্ছ কণ্ঠে হেসে উঠলো।

মিনতি গাঢ় গলায় বললে,—কিন্তু মিনতির মূল অনেক গভীর।

ভরসা পেয়ে নৃপতি বললে,—জুয়াড়ির জারিজুরি আমি সব বা'র ক'রে দিচ্ছি। লোকটা blackmail ক'রে কি না বিয়ে করতে চায়।

মিনতি অসহিষ্ণু গলায় বললে,—থাক, তার জন্যে তোমাদের কাউকে ব্যস্ত হ'তে হ'বে না। কিন্তু এ দিকে খবর কী? সোমানন্দ কবে আসছেন?

—টুয়েন্‌টিনাইনথ।

—তবে তো আর দেরি নেই। উপর-ডালের একরাশ কচি পাতার মতো মিনতি মর্মরিত হ'য়ে উঠলো : তাঁর কথার কোনো নড়চড় হ'বে না? তাঁর প্রতিজ্ঞা তিনি রাখবেন?

অক্ষরে-অক্ষরে।

সমুদ্রের শেষে দূরে ধূসর তীর দেখা যাচ্ছে। মিনতি আত্মগত ভাবে ব'লে উঠলো : আমি স্পষ্ট ক'রেই সবাইকে দেখাবো।

মিহির শিশুর মতো অসহায় গলায় বললে,—আর যদি এই অন্ধকার দিগন্ত পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিত হ'য়ে থাকে?

মিনতি বললে,—সেই স্পষ্টতা শতযোজনব্যাপী অন্ধকারও আবিল করতে পারবে না।

নয়

সীতেশের সম্পর্কে মিনতির এই ছিলো প্রধান আকর্ষণ যে তার নামের পাশে তার নামটা ব'সে একসঙ্গে হাওয়ায় উড়ছে। সে-কথাটা এমন-কি পাশের বাড়ির বৌটিরো কানে উঠেছে, মিনতির সঙ্গে চোখোচোখি হওয়াতে ভুরু বেঁকিয়ে জানলাটা সে কেমন সজোরে বন্ধ ক'রে দিলো। স্থানীয় আত্মীয়-স্বজনরা পর্য্যন্ত তার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। অথচ যাকে নিয়ে তার এই দুর্নাম, তার মুখের উপর দরজা বন্ধ ক'রে দেয়াও অসম্ভব। কেননা সীতেশবাবু সর্ব্বাঙ্গীণ ভদ্রলোক, তার নিজের দিক থেকে ব্যবহারের বিন্দুতম বিচ্যুতিও তারা লক্ষ্য করে নি। ভদ্রলোকের যেটুকু দোষ অতিমাত্রিক হ'য়ে চোখে পড়ে সেটা তার উচ্ছ্রিত অজস্রতা—চলায়, বলায়, পরিণাম-অন্ধ বলীয়ান একটা উদ্দামতার দীপ্তিতে। যে-লোকের সম্বন্ধে বাইরে এতো নিন্দা, এতো ভয়,—তাকে চোখের সামনে এতো

উন্মুক্ত-উচ্ছ্বসিত, এতো অকুণ্ঠিত-অকৃপণ ক'রে দেখতে পেলে তার উপর স্বভাবতই একটা সহানুভূতির ভাব আসে। যে-লোককে দূরে থেকে সবাই এতো ভুল বুঝেছে, কাছে থেকে সেই ভুল নিরাকরণের ব্যাখ্যায় স্বভাবতই তাতে রঙ একটু বেশি চড়াতে হয়। কলঙ্ক কথনের সেই মিথ্যাটা তাই মিনতির চোখে সতীশের চরিত্রের একটা রঙিন চিহ্ন ব'লেই মনে হচ্ছিলো।

কিন্তু নৃপতির মুখে এই দুর্নামের নতুন ভাষ্য শুনে মিনতি রাগে আগুন হ'য়ে উঠলো। সীতেশকে একা খুঁজে পেতে দেরি হ'লো না। সীতেশ এমনিই অকারণে সেদিন মিনতির উপরের ঘরে চেয়ারে ব'সে মেঝের উপর একমনে লাঠি ঠুকছিলো।

সূর্য্যাস্তরশ্মির ছটায় নদীর সন্ধ্যা-স্তিমিত জলের ঝলমলানির মতো রাগের রক্তিমায় মিনতি ঐশ্বর্য্যশালিনী হয়ে উঠেছে। ঘরে ঢুকেই সীতেশকে সে দেখতে পাবে ততোটা প্রত্যাশা সে করে নি। যে-ঝাঁজটা এতোদিন তার রক্তের স্রোতে ফেনিয়ে উঠছিলো, গলার স্বরে তা আজ আত্ম-প্রকাশ করলে। মিনতি হাতের বইটা টেবলের উপর সজোরে ছুঁড়ে দিয়ে কঠোর গলায় বললে,—আপনিই আমার নামে চারদিকে যা-তা বলে বেড়াচ্ছেন এ কথা সত্যি?

সীতেশ চমকাবার এতোটুকু ভাণ করলো না। হাসিমুখে বললে—কাকে তুমি যা-তা বলছ?

—যে, আপনি আমাকে বিয়ে করছেন, বিয়ে করা ছাড়া আমাদের সম্পর্কের আর কোনো সমাধান নেই বলে? মিনতির চোখ থেকে কণা-কণা আগুন বেরুচ্ছে, তার কথা থেকে, তার বুক-ভরা নিশ্বাস থেকে।

সত্যিকারের রাগ হলে মেয়েদের যে কতো অকৃত্রিম সুন্দর দেখায় চোখ ভরে তাই দেখতে-দেখতে সীতেশ বিহ্বল গলায় বললে,—গ্রহানুকূল্যে তোমাকে বিয়ে করছি সেটা তো তোমার ও আমার একটা সম্মিলিত সৌভাগ্যের কথা। প্রতি ভালোবাসা এমনি একটা সর্ব্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণতার জন্যেই পথ খোঁজে।

মিনতির কণ্ঠস্বর অতিমাত্রায় বিষিয়ে উঠলো: আপনাকে এই ভালোবাসার অধিকার কে দিয়েছে শুনি?

—এতে অধিকারে দরকার হয় না; এটা বোধের জিনিস নয়, সৃষ্টির জিনিস।

—এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে আপনি আমার নামে কলঙ্ক সৃষ্টি করে চলেছেন?

সীতেশ হাসলো, লাঠিটা সজোরে একবার ঠুকে দিয়ে বললে,—সেটা হয়তো আমারি স্নেহের একটা অমিত অতিশয়তা। কিন্তু কলঙ্ক তুমি কাকে বলছ?

—যে আমিও আপনার প্রেমে প'ড়ে গেছি ?

—অন্তত পড়া তো উচিত। সীতেশ মুখভাব কোমলতরো ক'রে বললে,—তুমিও তো আর ছোঁয়াচ লেগে অন্ধ হ'য়ে যাও নি, sense of valuesটা তো অন্তত তোমার আছে। আমি কারু চেয়ে কোনো অংশেই তো কম নই—এমন-কি এমন একটা সর্ব্বগ্রাসী কামনায় পর্য্যন্ত নয়। নিজের সম্বন্ধে নিজের বিজ্ঞাপন দিতে আমার বেশ ভালোই লাগছে।

কথার পরাক্রান্ত স্পষ্টতায় মিনতি মুখোমুখি কেমন অভিভূত হ'য়ে পড়লো। সীতেশের অনুপাতে সে যেন ততো জোর দেখাতে পাচ্ছে না। সেই প্রবল ব্যক্তিত্বের কাছে কেমন সে একটুখানি যেন নরম হ'য়ে এলো। রাগ এবার ততো কথায় না এসে মুখের রেখায় উঠলো ধারালো হ'য়ে। বিতৃষ্ণ মুখে মিনতি বললে,—আপনি কি তবে জোর ক'রে আমার ভালোবাসা আদায় করতে চান নাকি ?

—আসলে সেইটেই হচ্ছে পুরুষত্ব। সীতেশ সমস্ত শরীরে কঠোর একটা ভঙ্গি আনলো : ভালোবাসার জন্যে চুপ ক'রে ব'সে প্রতীক্ষা করলে তাকে পাওয়া যায় না, তাকে নিতে হয় খাজনার মতো জোর ক'রে আদায় ক'রে।

—কিন্তু যার ওপর আপনি এই বর্ব্বর জোর খাটাতে চাচ্ছেন সে আপনাকে কোনোদিন ভালোবাসতে পারবে ?

—পারা তো উচিত। সীতেশ আবার হেসে উঠলো : জোরটাই আমার আশ্রয়, আমার অধিকার—নিজের বিজ্ঞাপন দিতে পারলেই আমি খুসি,—জোরটাই আমার চরিত্রের পয়েণ্ট। সীতেশ উঠে পড়লো : কথাটা এমনি খোলাখুলি উঠে গেলো ব'লে ভালোই হ'লো। প্রেমটাকে তার ভাবের কুয়াসা কাটিয়ে যুক্তির রৌদ্রালোকে নিয়ে আসতে পারলে মানুষের এতো ফাঁকা দুঃখ থাকতো না। ভালোই হ'লো কথাটা উঠে পড়েছে। সীতেশ মেঝের উপর একবার লাঠি ঠুকলে : আমি তোমাকে ভালোবাসি এই কথা জানানোর মধ্যে কেমন একটা প্যাচ্‌পেচে দুর্ব্বলতা আছে, কিন্তু তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই, এটা ঠিক একটা করুণ আবেদনের মতো শোনায় না—এটার মধ্যে আছে একটা নিষ্ঠুর স্বাস্থ্য, একটা বলিষ্ঠ উজ্জ্বলতা। আমি তো কখনই প্রেম প্রার্থনা করতে পারতুম না, দাবি করাই আমার স্বভাব।

মিনতি বললে—আপনি কি মনে করেন জোর ক'রে আমাকে আপনি বিয়ে করতে পারবেন ?

—তা অবিশ্যি করি না। কিন্তু যাতে তোমার মন একদিন এদিকে, মানে

পরিচ্ছন্ন আলোর দিকে উন্মুখ হ'য়ে ওঠে তার সক্রিয় চেষ্টায় আমি বিশ্বাস করি।

মিনতি গলা নামিয়ে বললে,—থাকুন আপনি আপনার বিশ্বাস নিয়ে। দয়া ক'রে আমার পথ থেকে এখন স'রে দাঁড়ান। যে-বিয়েতে আমার প্রেম উহ্য রইলো, তার জন্যে আমার এতটুকু লিপ্সা নেই।

সীতেশ বললে—স'রে দাঁড়াবার আগে তোমাকে আরো অনেক কথা বলা দরকার। মেয়েদের জীবনে প্রেমটাই বড়ো নয়, মিনতি, বড়ো হচ্ছে সুখ, যে-ই শুধু পারে প্রেমকে উদ্ভাবন করতে, তাকে জীবন দিতে, তাকে লালন ক'রে টিকিয়ে রাখতে। প্রেমের থেকে যে-সুখ সে-সুখ বেশি দিন থাকে না, শিগগিরই তা ক্লান্ত, জীর্ণ হ'য়ে আসে। কিন্তু সুখের থেকে যে-প্রেম তা-ই হয় পরিপূর্ণ। সীতেশ তার বিস্ময়-বিগাঢ় চক্ষু দিয়ে ভারি একটা স্পর্শের মতো মিনতিকে যেন চেপে ধরলো: আমার কাছে প্রথম এসে যদি তুমি সুখ পাও, তবেই খুঁজে পাবে তুমি তোমার প্রেম। আর কেনই বা পাবে না? আমি—

দ্রুত বাধা দিয়ে মিনতি বললে—থাক্, নিজের সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দেবারো একটা সীমা আছে।

—আমার জন্যে সে-সীমারেখাটা অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত। সীতেশ দু'-এক পা পায়চারি ক'রে এলো। বললে,—জীবন নিয়ে আমি জুয়ো খেলতে ভালোবাসি জীবনে যা কিছু আকস্মিক, তারই ওপর আমার একটা প্রকাণ্ড প্রলোভন। আর যে-জিনিসটা একবার আমি আমার ব'লে ধরতে চাই তা নিঃশেষে না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি শান্ত হ'তে পারি না।

—কিন্তু দয়া ক'রে একটু শান্ত হোন্, নিজের কথা বলার ঢঙে নিজেই মিনতি হেসে ফেললো: শান্ত হ'য়ে চেয়ে দেখুন আমি আপনার যোগ্য নই। আমরা ছায়ার মানুষ, আপনার সুখের অতো তীব্র মধ্যাহ্ন-সূর্য্যালোক আমরা সইতে পারবো না। সুখকে আমরা বড়ো ভয় করি।

—তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ, বুঝতে পারছি। কিন্তু যতো আমাকে খারাপ ভাবো, আমি ততো হয়তো নই।

—কথাটা এখন করুণ প্রার্থনার মতো শোনাচ্ছে না? কেননা সত্যিই আপনাকে খারাপ ভাবি না, তা আপনি নিজেও হয়তো জানেন। বরং আপনার এই দুঃসহ স্পষ্টবাদিতায় আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আমার আরো বেড়ে গেছে। নম্র চোখে মিনতি তার আঁচলের প্রান্তটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো: সব কথা খুলে বলার সময় এসেছে ব'লে আমিও অনেকটা হালকা বোধ করছি।

আপনার থেকে সাহস নিয়ে আমার গলার স্বরও সাহসী হ'য়ে উঠেছে। আমি মিহিরকে—

—ভালোবাসো। তার মুখের থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সীতেশ বললে—সে তো আমি অন্ধকারে থাকলেও দেখতে পেতাম। কিন্তু এই ভালোবাসায় সুখ কী, কিসের সার্থকতা ?

মিনতি বললে,—আপনাকে বলেইছি তো আগে, সুখ জিনিসটাকে আমরা বড়ো বেশি পছন্দ করি না।

—ওটা তোমার কবিত্বের একটা সস্তা বাবুয়ানি হ'লো, মিনতি, কঠিন স্পর্শসহ একটা যুক্তির কথা হ'লো না।

—জীবনটা আমাদের পাকা সড়ক দিয়েই চলে না, আমাদের মন মাঝে-মাঝে মন স্তত্বের বিজ্ঞানকেও হার মানায়, সীতেশবাবু।

সীতেশ অস্থির হ'য়ে বললে,—তা হ'লে তুমি মিহিরকেই বিয়ে করবে ?

—আমাদের প্রেম সব ক্ষেত্রে বিয়ের মধ্যেই প্রমাণ বা পরিণতি খোঁজে না, সীতেশবাবু।

—আমার সম্পর্কে তোমার এতো কলঙ্ক থাকা সত্ত্বেও ?

—আপনিই তো বলছিলেন ওটা আপনার স্নেহেরই একটা আতিশয্য। মিনতির গলা ব্যাকুলতায় আবার আর্দ্র হ'য়ে এলো : আপনার সেই অকৃপণ স্নেহ আমার জীবনে খুব বড়ো একটা মুক্তি এনে দিক।

—তোমার কথাগুলি শুনতে আমার খুব ভালোই লাগছে বলতে হ'বে, সীতেশ সামান্ত চঞ্চল হ'য়ে বললে, —কিন্তু জীবনে কথাটাই কি সব ? তোমার অন্তঃসারশূন্ত কথা, আর আরেকজনের অন্তর্দৃষ্টিহীন অন্ধতা—এই নিয়ে তোমরা কতোদিন থাকবে, কী ক'রে থাকবে ? ভাবতেই যে আমার সাফোকেশান্ হচ্ছে। কাব্যের মতো শোনাচ্ছে এমন কতোগুলি বাজে কথার পুঁজি নিয়ে জুয়ো খেলতে বোসো না, মিনতি। সীতেশ মিনতির দিকে দু'পা এগিয়ে এলো : ও তোমার সেবার দাবি করতে পারে, কিন্তু প্রেমের করতে পারে না। সঙ্কীর্ণ একটা অতীতের চাইতে তোমার ভবিষ্যৎ অনেক বেশি বিশাল। তোমাকে আকস্মিকরূপে স্নেহ করতে সুরু করেছি বলে'ই তোমার জীবনের এই বীভৎস সম্ভাবনাটা সহ্য করতে পারছি না। সীতেশের গলা গাঢ়তায় আরো এক পরদা চ'ড়ে গেলো : সত্যি ও তোমার কে ? অতীতের খানিকটা অচল অন্ধকার মাত্র। খাঁচায় শৃঙ্খলিত অনাহারী একটা পশুর জন্যে আমাদের মায়া হ'তে পারে, সেইটে হয়তো মানবিক, কিন্তু তার জন্যে তার ক্ষুধিত গ্রাসের সামনে নিজেদের খাদ্যরূপে আমরা উৎসর্গ করতে পারি না। পরের

ওপর মায়া দেখাতে গিয়ে নিজের ওপর নির্দয় হওয়ায় কোনো মহত্ত্ব নেই, মিনতি। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে নীতির মানদণ্ডও অনেক স'রে এসেছে। এখন পরের উপকার করতে গিয়ে নিজেকে অকারণে ক্ষয় করার চেয়ে নিজেকেই আগে সম্পূর্ণ, সার্থক ক'রে তোলাই মানুষের আদিমতমো কীর্তি। কথা বলতে-বলতে সীতেশ মিনতির উপস্থিতির তপ্ত পরিবেশের মধ্যে চ'লে এলো: ও কে? ও যেদিন থেকে চোখ হারিয়েছে, সেদিন থেকে তোমার জীবনে ও ছন্দচ্যুত, মৃত—ওর অন্ধতা তোমার জীবনের একটা কলঙ্কিত ব্যাধি। প্রেমের মুখ রেখো মিনতি, তাকে মাত্র একটা মমতায় পর্য্যবসিত ক'রে তাকে অপমান কোরো না। পৃথিবীতে তার নামে অনেক আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত আছে জানি, কিন্তু তাই ব'লে তোমার এই কুৎসিত আত্ম-হত্যায় তাকে অপমান কোরো না। মিনতিকে স্তব্ধতায় পাষাণাকার দেখে সীতেশ আরো সাহস পেলো। ধীরে তার একখানি হাত তুলে নিয়ে বললে,—তুমি আমার সঙ্গে চলো, এই অন্ধকার গ্রাস থেকে বেরিয়ে চলো—দূরে, অনেক দূরে, দেখতে পাবে কা'কে বলে আলো, কা'কে বলে মুক্তি।

হাতখানি তেমনি আলগোছে সরিয়ে নিয়ে মৃদু হেসে মিনতি তরল গলায় বললে,—অনেক বক্তৃতা দিয়েছেন, এখন একটু বসুন। আপনাকে একটা শুভ-সংবাদ দিই। মোহরের এই অন্ধতা আর থাকবে না।

সীতেশ ফের চেয়ারে বসতে যাচ্ছিলো, চমকে লাঠিটা একবার ঠুকে দিয়ে বললে,—তার মানে? তার মানে তুমিই হ'বে তার তৃতীয় নয়ন!

—না, তেমনি কোনো আলঙ্কারিক অর্থ নয়, প্রাঞ্জল, পরিষ্কার। মিনতি হাসির লঘুতায় একবার চোখ নাচালো: সোমানন্দর নাম শুনেছেন তো? তিনি আসছেন চোখ ফিরিয়ে দিতে।

সীতেশ হাসিতে চীৎকার ক'রে উঠলো: তুমি এ-সব বিশ্বাস করো?

—সে যে চোখ হারাবে তাই কি কোনোদিন বিশ্বাস করতুম?

—লোকটার অনেক সব কীর্তির কথা এখানে-ওখানে শুনতে পাই বটে, কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো, সীতেশ আবার হাসিতে ফেটে পড়লো: যে, মরা চোখ আবার বেঁচে উঠবে? তোমার সোমানন্দ অসুখই ভালো করেন শুনেছি—কিন্তু এটা আর একটা ব্যাধি নয় মিনতি, একটা জলজ্যান্ত মৃত্যু—এখানে তাঁর কী করবার আছে? তুমি তা বিশ্বাস করো? আমার হাতের লাঠিটাকে তিনি সাপ বানিয়ে দিতে পারেন, তোমার ঐ খোঁপাটাকে একটা বাঁধাকপি? সীতেশ আবার হাসিতে শতাচর হ'য়ে পড়লো।

দৃঢ়কণ্ঠে মিনতি বললে,—কিন্তু যদি পারেন ? যদি পারেন তিনি তার চোখ দৃষ্টির বন্যায় উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে ?

সীতেশ এক মুহূর্ত্তও চিন্তা করলো না। দৃঢ়তরো গলায় বললে,—যদি পারেন, যদি সত্যি তা হয়, তা হ'লে আর আমার কোনো কথা নেই, মিনতি। মিহির অন্ধ হয়েছিলো, আমি না-হয় স্তব্ধ হ'য়ে যাবো। আমি তখন নিজে থেকেই তোমাদের বিয়ে দেওয়াবো, আমার কাছে তোমার বাবা যা পাবেন, সব তোমাকে—তারো বেশি তোমাকে উপহার দেবো। আমি তখন কিছুতেই, বেঁচে থাকতে কিছুতেই, এতো বড়ো ভালোবাসাকে আমার টাকা বলো পদমর্যাদা বলো আকাঙ্ক্ষা বলো কিছু দিয়েই উপহাস করতে আসবো না। আমি তোমাদের সেই শুভ্রতার আকাশ থেকে তখন ছুটি নেবো।

হাসি-হাসি মুখে মিনতি বললে,—ধন্যবাদ।

সীতেশ তক্ষুণি মেঝের উপর লাঠিটা ঠুকে দিলো আর যদি তা না হয় ?

বাজি রাখবার মতো ক'রেই সীতেশ প্রশ্নটা করেছিলো ; আশা করেছিলো উত্তরে মিনতির মুখ থেকে তার প্রস্তাবের বিপরীতার্থক কথাটাই সে শুনতে পাবে।

কিন্তু মিনতি হঠাৎ গলার স্বরটা গভীরে নিয়ে গিয়ে বললে,—দয়া ক'রে তখনো আপনাকে আমাদের সেই অন্ধকার সমুদ্রের নিচে ডুবে যেতে হ'বে।

—তখনো ? সীতেশের গলা চিরে যেন আওয়াজ বেরুলো : সেই অন্ধকারেও ?

—হ্যাঁ, সেই অন্ধকার আর তখন অন্ধকার থাকবে না। মিনতি সহজ গলায় বললে,—আপনি যা বললেন আমিই আছি তার তৃতীয় নয়ন।

সীতেশ একমুহূর্ত্তের জন্য আশিরপদনখ স্তব্ধ হ'য়ে রইলো। তার বিস্মিত দৃষ্টির প্লাবনে মিনতির সর্ব্বাঙ্গ পরিস্নাত ক'রে সে শেষবার তাকে জিগগেস করলে : তুমি তাকে এতো ভালোবাসো ?

— জানি না। মিনতির দুটি চোখের সম্মিলিত চাওয়া বেদনার শিশিরে একটি ফুলের মতো ফুটে রয়েছে : তবে এটুকু শুধু বলতে পারি আমরা যখন কাউকে প্রণাম করি, তখন তার পা দুটোকেই প্রণাম করি না। যখন কাউকে ভালোবাসি, তখন শুধু তার চোখ দুটোকেই ভালোবাসি না, সীতেশবাবু।

সীতেশের মুখ-চোখের চেহারা নিমেষে বদ্‌লে গেলো। প্রতিজ্ঞায় রূঢ় রেখাগুলি যেন মমতায় প্রশান্ত হ'য়ে এলো। নির্লিপ্ত মুখে সে বললে,—তোমাকে নমস্কার, মিনতি দেবী। তোমার কাছে আমি হারলাম। উপলব্ধির কাছে হারলো সব তার্কিকতা। তোমাদের দুঃখের মিলন সুখের হোক।

ব'লে লাঠিটা দোলাতে-দোলাতে সীতেশ সিঁড়ি গুনে-গুনে নিচে নেমে গেলো।

দশ

নদীতে নৌকো যখন ডুবু-ডুবু, তখন ঘোরতরো যে নাস্তিক সেও জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে একবার ঈশ্বরের নাম নিয়ে চেষ্টা ক'রে দেখে। কখন যে কিসে কী হয়, কিছুই বলা যায় না। নিঃসহায়তার চরম সীমায় পৌঁছুলেই হয়তো লোকে অলৌকিকে বিশ্বাস করে, বা বিশ্বাস না ক'রে আর কোনো পথ খুঁজে পায় না। কেন যে ঘটলো তার যখন কোনো আপাতগ্রাহ্য স্পষ্ট কারণ নেই, তখন সেই ঘটনাটাই বা যে ফের অঘটিত হবে না তার কারণ কী? আলো যদি একদিন অকস্মাৎ এক ফুঁয়ে উড়ে যেতে পারে, তখন এক ফুঁয়েই বা সেই নির্ব্বাপিত শূন্যতা থেকে ফের আলো কেন উৎসারিত হ'বে না? বল্‌তে গেলে, সত্যের কঙ্কালটা নিয়েই বিজ্ঞানের যতো দম্ভ, মিহিরের চোখ কেন অন্ধ তাই শুধু সে বলতে পারে, কিন্তু পৃথিবীতে এতো লোক থাকতে মিহির কেন অন্ধ হ'তে গেলো তার বেলায় সে চুপ। প্রকৃতির কতোটুকু আমরা জানি যে তার নিয়মানুসারিতা নিয়ে আমরা বড়াই করবো? অন্তত তার আয়ু, তার বয়সের অনুপাতে তার স্খলন তার বিচ্যুতি, সমুদ্রের তুলনায় এককণা একটা বালুকারো ভগ্নাংশ নয়—কে তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্যে ব'সে থাকবে? পদে-পদে এখানে অনিয়ম ঘটছে, মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে ছন্দপাত—পৃথিবীর বৃহৎ ক্রমান্বিত বিবর্ত্তনের ইতিহাসে তা লক্ষ্য করবারই নয়, সুন্দর যে-দেহ কে লক্ষ্য করতে যায় তার অঙ্গরাগের ত্রুটি? ঘূর্ণ্যমানতটা যতো বেশি প্রচণ্ড, তার স্থিতিটাও তেমনি ততো বেশি স্বাভাবিক। কারণটা এসেছে সৃষ্টির অনেক পরে। নইলে এই পৃথিবীর আবির্ভাবেরই কোনো কারণ ছিল না। কারণের তুলনায় কাজ এখানে কতো বিপুল, কতো বিচিত্র—কারণ দিয়ে তা কুলিয়ে ওঠা যাবে না। নইলে সেই অরণ্যচারী শ্বাপদের বংশে কেন জন্মাবে এই মানুষ, সেই অগ্নিপিণ্ডে কেন জন্মাবে ঘাস, এই কঙ্কালময় দেহে কেন জাগবে প্রেম, কেন জাগবে গান, কেন জাগবে পিপাসা? বিজ্ঞান দিয়ে তুমি কতোটুকু ব্যাখ্যা করতে পারো? তোমার দুর্ঘটনার বেলায় বিজ্ঞান কোথায়, আকস্মিকতার জগতে কোথায় তোমার বৈধতা? বোধ ছেড়ে তখন বিধিলিপির কথা মনে জাগে কেন? মিহির একদিন হঠাৎ অন্ধ হয়ে গেছে এটা যদি তোমার বিজ্ঞান হয়, তবে একদিন আবার সে চক্ষুষ্মান হ'য়ে উঠলে সেটা কেন হ'বে একটা স্বেচ্ছাচার? কেনই বা তা ঘটবে না? নিয়মের ব্যতিক্রম থেকেই নিয়মের অস্তিত্ব, মাত্র পার্থিব একটা সম্ভাব্যতা দিয়েই জগতের দুর্ঘটনাগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় না। নিশ্চয় তা ঘটবে, কারণ চাও, পিছনে তার প্রকাণ্ড একটা কারণ আছে। কারণ—মিহিরের আলো চাই, মিহিরের দু' চোখ ভ'রে আবার এ পৃথিবী বাঁচতে চায়।

জলে পড়লে ডুবন্ত লোক সামান্য একটা কুটোকেও আঁকড়ে ধরতে চায়, তেমনি বহুব্যাপী নৈরাশ্যের মরুভূমিতে এসে মিহির এই দুর্ব্বল বিশ্বাসটুকুর ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছে। দেহধারী মানুষ যখন, মুখে তার এখনো বিজ্ঞান, কিন্তু মনের দূর নেপথ্যে ক্ষণিক একটু আশার শিখা, অঘটন-সম্ভাবনার অবিশ্বাস্য একটু বিস্ময় এখনো আছে জেগে। দেহই মাত্র মানুষের সম্বল নয় ব'লে সে এখনো বিজ্ঞানের বদলে বিস্ময় খোঁজে, বিধিবদ্ধতার বদলে আকস্মিকতা।

সেদিন মিনতিকে মিহির বলেছিলো: তুমি এ-কথা কখনো বিশ্বাস করো? এ কখনো হ'তে পারে?

মিনতি বলেছিলো: নিশ্চয়তার মধ্যে আরাম থাকতে পারে বটে, কিন্তু সুখ কোথায়? সব একেবারে হ'বে এমন কী কথা আছে? হ'লেও হ'তে পারে এই আমাদের যথেষ্ট।

হ'লেও হ'তে পারে। তাই বা মন্দ কী! চেষ্টা ক'রে দেখতে কোনো ক্ষতি নেই। হওয়ায় কোনো মহত্ত্ব নেই, মহত্ত্ব হচ্ছে প্রত্যাশায়। হ'লেও হ'তে পারে। সেই প্রত্যাশাই যে দুঃসহ। সজ্ঘটনার চেয়ে সম্ভাব্যতাটাই যে বেশি নিষ্ঠুর।

মিহির একটা নিশ্বাস ফেলে বলেছিলো: তা হ'লে আমার এই আঁধারই ভালো—আমার এই অন্ধকারের নিশ্চয়তা? আলো দিয়ে আমি কী করবো?

মিনতি বলেছিলো: তোমার জন্যে না হোক, আমার জন্যে এই আলো চাই।

—কেন?

—এই আলোতে আমি নিজেকে আরো সুস্পষ্ট ক'রে দেখাবো।

মিহির খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলেছিলো: কিন্তু এই অন্ধকারেই কি আমি তোমাকে স্পষ্ট ক'রে দেখতে পাচ্ছি না?

—শুধু তোমার দেখায় আমার তৃপ্তি হচ্ছে না, সমস্ত সংসার আমাকে দেখবে।

—কিন্তু আমার বড্ডো ভয় করে, মিনতি।

—কা'কে?

—এই আলো-কে। মনে হয় সে একটা ভীষণ উৎপাতের জিনিস হ'বে, সব চারদিকে লণ্ডভণ্ড ওলোট-পালোট হ'য়ে যাবে। মিহির সমস্ত শরীরে কেঁপে উঠে-ছিলো: সে আমি কখনো সহ্য করতে পারবো না, ততো বড়ো একটা বিস্ময়কে জায়গা ক'রে দিতে আমার দু' চোখে কখনো কুলোবে না মিনতি, আমি আবার অন্ধ হ'য়ে যাবো।

মিনতি বলেছিলো: পাগল!

মিনতি তারপর শান্ত গলায় বলেছিলো: তোমার বিশ্বাস হয় মিনতি, আমি,

আবার সব দেখতে পাবো, তোমার শরীর, আকাশের তারা, আমার নিজের দুই চক্ষু ? এ কখনো হয়, এ কখনো হয়েছে ? নিজের মনে নিজেই সে হেসে উঠেছিলো : আর যদি তা হয়-ও, আমি সেই তীব্রতরো শূন্যতার সামনে যেন দাঁড়াতে পারবো না।

—শূন্যতা !

—হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে মিনতি, ততো আলোয় কোনো কিছুই যেন বাঁচে না, বাঁচতে পারে না—সে যেন একটা আলোর মরুভূমি। সেখানে আবার আমার সব হারিয়ে যাবে। এই অন্ধকারই আমার ভালো।

মিনতি আবার বলেছিলো : পাগল !

মুখেই তার বিজ্ঞান, মনে আবার সেই ভীরুতমো আশা, সেই বিশ্বাসাতীতের বিস্ময় : যদি তা না হয় ?

—কী হ'বে না ?

—যদি চোখ না ভালো হয় ?

—না হ'লে না হ'বে। তাতে কী ! মিনতি এগিয়ে এসে গাঢ়তরো গলায় বলেছিলো : তোমার এই অন্ধকারই তো আছে।

—না হ'লে না হ'বে। কথাটা আস্তে-আস্তে আবৃত্তি ক'রে মিহির উদাসীন মুখে বলেছিলো : সেই জন্যে খবরটা আমি দাদা-বৌদিদের পর্য্যন্ত জানাই নি। এটা শুধু আমার ও তোমার মধ্যে—এর ফলাফলের আনন্দ বা লজ্জা শুধু আমাদের দু' জনের। আমাদের আলোই বা কী, অন্ধকারই বা কী ! কী বলো ?

এগারো

একেবারে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবার জন্যে নৃপতিকে সকাল বেলা অনেক আগে থাকতেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু দেয়া সময়ের অনেক আগেই সোমানন্দ এসে হাজির। নিচেটা খালি, কালিদাস গেছে বাজারে, চারদিক তাকাতে-তাকাতে সোজা সে উপরেই উঠে এলো। পায়ে ক্যাম্বিশের জুতো, আওয়াজ নেই। বারান্দায় থামতে-থামতে একেবারে শেষের ঘরটার দরজার কাছে সে দাঁড়িয়ে পড়লো। মুহূর্ত্তের জন্যে সে কোনো শব্দ করতে পারলো না।

স্তব্ধতায় শীতল ঘর, বেদনায় নম্র তার আবহাওয়া। কাছাকাছি মুখোমুখি দুটো চেয়ারে ব'সে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে,—দু'জনের মাঝেকার স্বল্প ব্যবধানটুকু দু' জনের অন্তরনিঃসৃত গভীর স্তব্ধতায় ভরাট হ'য়ে রয়েছে। দু' জনের বলবার

ভঙ্গি প্রতীক্ষায় বিবশ, সেই আলস্যের মাঝে স্তূপাকার হ'য়ে আছে যেন পরস্পরের প্রতি, বাক্যের নয়, ভাবের বিহ্বলতা। ছেলেটির চোখ দরজার দিকে, আর মেয়েটির পিঠ,—তাই তাকে যার দেখবার সে তাকে সম্প্রতি দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু সোমানন্দ তাকে দেখতে পেয়েছে। ঠিক দেখতে পেয়েছে। পরিপূর্ণ আকাশ থেকে প্রথম যে ধারাপাত নামে তারই মমতা দিয়ে যেন ও তৈরি। ওর দেহের আনমিত সুষমার পবিত্র একটি আসক্তির আভা। পিঠের উপর কেশের মুক্তিতে ওর যেন বিদ্রোহের রুদ্রতা। কে এই মেয়েটি?

হঠাৎ মিহির তার চেয়ারে ভীষণ চঞ্চল হ'য়ে উঠলো পারের কাছে নদীর ঢেউয়ের মতো। চেঁচিয়ে বললে,—ও কে মিনতি, দরজার কাছে কে ওই দাঁড়িয়ে?

মিনতি চম্‌কে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো। তার চোখ পড়লো দরজার উপর।

একে মূর্তি বলতে পারো না, বলতে হয় একটা আবির্ভাব। দরজার বাইরে যেন অশরীরী একটা শিখা, নিস্তাপ, নির্ধূম, নিষ্কম্প। প্রথম প্রগল্‌ভ চন্দ্রোদয়ের সামনে পৃথিবীর আদিমতমো মানুষের বিস্ময়-বিমোহে মিনতি অভিভূত হ'য়ে পড়লো। মানুষের দেহ যে এতো অতীন্দ্রিয় সুন্দর হ'তে পারে এ সে ভাবতেই পারতো না। বিশাল বলবান দীর্ঘকায় চেহারা, বয়সটা তার শরীরে ভার হ'য়ে নেই যে পরিমাপ করা যাবে, পরনে আগাগোড়া গেরুয়া, মাথায় উঁচু পাগড়ি, হাতে ছোট একটা ব্যাগ,—সমস্ত মিলে একটা অপার্থিব অবাস্তবতা। ব্যক্তিত্বে ব্যঞ্জনাময় তার কান্তি, মুখমণ্ডলে তীব্র উজ্জ্বলতা, দুই বিশাল চক্ষু তীক্ষ্ণ, জ্যোতির্ময়। মিনতির নয়, যেন মাংসময় পাষাণের থেকে আওয়াজ বেরুলো: আপনি কে?

অবারিত গতিতে ঘরে ঢুকে হাসিমুখে সোমানন্দ বললে,—তোমরা যাকে খুঁজছিলে আমি সেই সোমানন্দ।

দু' জনে জলের মতো আনন্দে আলোড়িত হ'য়ে উঠলো। মিনতি বল্‌লে,—আপনার জন্যে যে লোক পাঠিয়েছিলুম—

টেবলের উপর ব্যাগটা রেখে সেটা খুলতে-খুলতে সোমানন্দ বললে—দরকার ছিলো না। আসবার জন্যে নিজেরই কেমন একটা চাঞ্চল্য হচ্ছিলো—কথা দিয়েছি আজ আসবো।

হাতে ক'রে কি-একটা ওষুধ আর ব্যাণ্ডেজ নিয়ে সোমানন্দ ঘুরে দাঁড়িয়ে জিগগেস করলে: এরই তো, না?

মিনতির মৌখিক একটা সম্মতি দেবার আগেই মিহির আনন্দার্ত কণ্ঠে হঠাৎ

চীৎকার ক'রে উঠলো : আমি—আমি দেখতে পাচ্ছি মনে হচ্ছে। সোমানন্দর দিকে এক পা এগিয়ে এসে : আপনার কপালে ও কিসের দাগ ?

সোমানন্দ হাসিমুখে বললে—ছেলেবেলায় শামুক কুড়োতে গিয়ে খালের মধ্যে প'ড়ে চোট পেয়েছিলাম। সে-দাগটা এখনো মেলায় নি।

মিনতি তাড়াতাড়ি উচ্ছ্বসিত আবেগে মিহিরের হাত চেপে ধ'রে বললে,—তুমি দেখতে পাচ্ছ ?

—দেখতে পাবে বৈ কি, নিশ্চয় পাবে। কি-একটা ওষুধ আর ব্যাণ্ডেজ নিয়ে সোমানন্দ এগিয়ে এলো। বললে,—আসুন তো। ওষুধটা লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজটা বেঁধে দিই। চব্বিশ ঘণ্টা মাত্র। তারপর কাল ঠিক এমনি সময় ব্যাণ্ডেজটা ফের খুলে দিতে হ'বে। খুলে দিলেই—

মিনতি ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো : খুলে দিলেই—

—খুলে দিলেই দেখবে দু' চোখের হারানো দৃষ্টি আবার ফিরে এসেছে।

মিনতি নির্ব্বাক ; সোমানন্দর স্পর্শের নিচে মিহিরের সমস্ত শরীর আনন্দের বেদনায় মুহ্যমান।

ব্যাণ্ডেজটা বাঁধতে-বাঁধতে সোমানন্দ জিগ্‌গেস করলে : এ-বাড়িতে আর লোক নেই কেন ?

মিনতি গলায় এতোক্ষণে কথা পেলো : এ-বাড়িতে উনি একলাই থাকেন।

—আর তুমি ?

—আমি থাকি ঐ পাশের বাড়িতে।

— তবে এ-বাড়িতে আছো যে ?

—আমি ছাড়া ওঁকে দেখবার কেউ বিশেষ নেই। আমার পরেই ওঁর ভার।

চোখ দিয়ে তার মর্ম্মমূল পর্য্যন্ত সন্ধান ক'রে সোমানন্দ জিগ্‌গেস করলে : তুমি ওর কে ?

সঙ্কুচিত হ'য়ে চোখ নামিয়ে মিনতি বললে,—কেউ না। বিশেষ কেউ না। আমি ওঁর বন্ধু। পরে সেই বিশাল-ব্যাপ্ত দৃষ্টির উত্তাপে তার মুখ থেকে অভিভূতের মতো বেরিয়ে এলো : বলতে গেলে, আমিই ওঁর সব। আপনার কাছে আর আমার কোনো কুণ্ঠা নেই, আমি ওঁকে ভালোবাসি।

—তবে আর কোনো কথা নেই। সোমানন্দ ব্যাণ্ডেজটা ততোক্ষণে বেঁধে এনেছে : আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা। তার পর নিজ হাতে তুমি এই বাঁধন খুলে দিয়ো, দেখবে আর নেই এক কণা অন্ধকার।

মিহির এবার উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো : আমি সত্যিই দেখতে পাবো ?

সোমানন্দ গম্ভীর গলায় বললে,—পাবে।

—দেখতে পাবো? সব? মিহির একেবারে শিশুর' মতো স্ফূর্তিভরা গলায় বললে,—সংসারে যেখানে যা কিছু আছে—সূর্য্য থেকে সুরু ক'রে মিনতির পায়ের নোখটুকু পর্য্যন্ত—সব পাবো দেখতে?

—সব দেখতে পাবে। বিশ্বাস করো।

—বিশ্বাস করতে আমার ভয় করছে। আমি আবার পাবো দেখতে, লিখতে, ছবি আঁকতে? আমার এতোদিনের অন্ধকারের কল্পনা আলোয় আকারময়ী হ'য়ে উঠবে? সেই বিশ্বাসের বিপুলতায় মিহির সর্ব্বাঙ্গে উদ্বেল, উন্মথিত হ'য়ে উঠলো: দেখতে পাবো মিনতির মুখ—অন্ধকার রাতের সেই এক কণা তারা, ভুরুর নিচে তার চোখ—সে কি পাখি, না, মেঘ, না নিশীথরাত্রি? তারপরেও আমি বাঁচবো? সত্যি?

টেব্‌লের দিকে ফিরে যেতে-যেতে প্রশান্ত, স্নিগ্ধ গলায় সোমানন্দ বললে,—কোনো ভয় নেই, সব দেখতে পাবে।

—ঝড় দেখতে পাবো? মিনতির আলুলিত চুলের মতো উড়ো মেঘের ঝড়? ওর হাসির মতো চঞ্চল নদী? আবার দেখতে পাবো মানুষের মুখে পাপ, ঈর্ষা, সন্দেহ? মৃত্যু দেখতে পাবো? সত্যি? আশায়, আনন্দে উদ্ভাসিত আমার এই মুখ আয়নায় দেখতে পাবো আবার?

ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে যাবার উপক্রম ক'রে সোমানন্দ বললে,—আমার কথার নড়চড় হ'বে না। আমি এখন যাই, আমার সময় খুব বেশি নেই। কাল কী হয় আমাকে খবর দিয়ো। বেশি দিন নয়, মাত্র কাল—চব্বিশ ঘণ্টা। পরে মিনতির দিকে সস্নেহ একটা ইসারা ক'রে বললে—আমাকে নিচে দিয়ে আসবে চলো।

মিনতি মুগ্ধের মতো তাকে অনুসরণ করলে। বারান্দাটা পেরিয়ে আসতে-আসতে বললে: আপনি মহাপুরুষ। আপনার এই কীর্ত্তির তুলনা নেই।

সোমানন্দ বললে,—চলো, বলছি।

দু' জনে নিচে নেমে এলো।

সোমানন্দ দাঁড়ালো। হাসিমুখে বললে,—আমি মহাপুরুষ-টুরুষ কিছু নই। আমি একজন যোগী সন্ন্যাসী, ভালো কতোগুলি ওষুধ জানি মাত্র।

—আপনার ওষুধে ফল হ'বে তো?

—হ'বে। তবে সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি ফিরে না-ও আসতে পারে।

—তবে?

—ভয় নেই, তুমিই সেই তার ক্ষণস্থায়ী দৃষ্টিকে অবিনশ্বর ক'রে তুলতে পারো।

—আমি পারি ? মিনতি আকস্মিক চমকে চারদিকে চাইতে লাগলো : আপনি পারেন না, আমি পারি ?

—হ্যাঁ, তুমি পারো। আমি তার অন্ধ চোখে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনবো বটে, কিন্তু সেই দৃষ্টি চিরস্থায়ী করে' রাখতে পারো তুমি। সান্ত্বনায় সোমানন্দর গলা আর্দ্র হ'য়ে এলো : আমি মাত্র সন্ন্যাসী, আর তুমি হচ্ছো ম্যাজিসিয়ান্। একমাত্র তুমিই পারো অসাধ্যসাধন করতে।

মিনতি ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো : বলুন কী ক'রে ?

সোমানন্দ গভীর গলায় প্রশ্ন করলে : সত্যি বলো, তুমি ওর কে ?

—কে আবার ! বলেইছি তো—বন্ধু। ছেলেবেলা থেকে বন্ধু। পাশের বাড়ি থাকি। আমার মা মারা যাবার পর থেকেই ওঁর মা আমারো মা। মিনতির গলা কেঁপে উঠলো : ছিলেন, এখন আর নেই। অন্ধতার চেয়েও দূরতরো অন্ধকারে বিদায় নিয়েছেন। আগে ছিলো ওঁর সঙ্গে ভাব, এখন হ'য়ে উঠেছে তা ভার। সকাল-সন্ধেয় ওঁকে আমার সঙ্গ দিই, একসাথে ব'সে গল্প করি, মিনতি অন্তঃপ্রেরিত হ'য়ে অনর্গল ব'লে চলেছে : বই পড়িয়ে শোনাই, রাত্রিবেলা খাইয়ে-দাইয়ে বিছানায় ওঁকে ঘুম পাড়িয়ে তবে আমার ছুটি হয়।

— ছুটি হয় ! সোমানন্দ উৎফুল্ল হ'য়ে বললে,— ছুটি আর পাবে না, মিনতি।

—ছুটি পাবো না মানে ?

—মানে, সোমানন্দ তার মুখের উপর দুই স্নেহমণ্ডিত শীতল চোখ রেখে বললে,—বিছানায় ওকে একা ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেলে চলবে না, ওরি পাশটিতে তোমাকেও এবার ঘুমুতে হ'বে।

মিনতি বিমূঢ় ভাবে বললে,—তার মানে ?

— মানে, তুমি ওকে বিয়ে করো।

মিনতি চমকে উঠলো : বিয়ে ?

—হ্যাঁ, তুমি তো ওকে ভালোবাসো, তবে আর তাতে বাধা কী ?

—কিন্তু তাতে ভালোবাসা যদি ম'রে যায় ? মিনতির গলা কাঁপছে।

—ভালোবাসা মরবে কিনা জানি না, কিন্তু ওর দৃষ্টিশক্তির আর ক্ষয় নেই।

—ক্ষয় নেই !

—তোমার সেবায়, প্রেমে, সান্নিধ্যে সে-দৃষ্টিশক্তির আর ক্ষয় নেই, মিনতি।

মিনতি দুই শূন্য, অসহায় চোখ তুলে বললে,—কিন্তু সে-সেবা সে-সান্নিধ্যের তো অভাব নেই।

—এখন হয়তো নেই, সোমানন্দ স্নেহে একেবারে গ'লে গেলো : কিন্তু চিরকাল

তো তুমি এমনি বন্ধুতার তাগিদে ওর কাছে-কাছে থাকতে পারবে না। তা তো সম্ভব নয়। তোমার কাজ আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, ভবিষ্যৎ আছে। ওর কাছে থাকতে পারো বটে, কিন্তু তোমার কাছে ও না পাবে পরিপূর্ণ সমর্পণের সুখ, না পাবে পরিপূর্ণ অধিকারের অহঙ্কার। প্রেমে অধিকার নেই, যেন আকাশে সূর্য্য নেই। কাছে থাকবে, অথচ কোটি-কোটি যোজন দূরে তোমার বাসা। তখন ওর মনে কেবল সন্দেহ, কেবল কুণ্ঠা। পাছে হারায় সেই ভয়ে হাতটিও ও বাড়াতে পারে না। তার চেয়ে, মিনতি—

মিনতির মুখ থেকে ঝ'রে পড়লো : তার চেয়ে—

—তার চেয়ে মিহিরকে তুমি বিয়ে করো। সোমানন্দর কণ্ঠস্বর উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলো : ওর স্তিমিত স্নায়ুমণ্ডলীকে উজ্জীবিত ক'রে তোলো। ওকে বুঝতে দাও মিনতি যে, তুমি ওর, একমাত্র ওর—সংসারে, সমাজে, নিভৃতে, ঈশ্বরের কাছে। ওর চোখের দৃষ্টিকে যদি অবিনশ্বর ক'রে রাখতে চাও, তবে এ-জীবনে প্রেমে ও আসক্তিতে তুমিও ওর প্রতি অবিনশ্বর হ'য়ে থাকো।

মিনতির গলা কাঁপতে লাগলো : কিন্তু সময়ের শত্রুতাকে কি ক'রে বাধা দেবো ? উজ্জীবিত স্নায়ুমণ্ডলী আবার কখন স্তিমিত হ'য়ে আসবে।

সোমানন্দ জোর গলায় বললে,—তুমি তাকে স্তিমিত হ'তে দেবে না। আকাশের সূর্য্যের মতো আত্মার দীপশিখাকে দেহে তুমি অনির্ব্বাণ ক'রে রাখবে। দুটি মুহূর্ত্তের একরকম রঙ নয়, প্রত্যেকটি ভোরবেলার নতুন চেহারা। তুমিও প্রতিটি দিন নতুনতরো সৌন্দর্য্যে উদ্‌ঘাটিত হ'তে থাকবে। ওকে তুমি একলা ঘুমিয়ে পড়তে দেবে কেন ?

মিনতির ভয়ানক অস্বস্তি লাগছিলো—বিয়ের অন্ধকার বন্ধনের মধ্যে যেতে যতো নয়, তার চেয়ে বেশি এই একটা প্রাণহীন সর্ত্তের মধ্যে যেতে। নিজে থেকে বিয়ে হয়তো সে করবে—তা যে কোনো অবস্থায়—তার মধ্যে আছে তার একটা স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতা ; কিন্তু সেই করণীয়টাই যদি অন্যের প্ররোচনায় করতে হয় তা হ'লেই সেটা মনের কাছে যেন তক্ষুনি সায় পায় না। ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠতে হ'বে সবাই তা জানে, কিন্তু গায়ে ঠেলা দিয়ে জাগাতে গেলেই শরীর বিদ্রোহ ক'রে ওঠে।

মিনতির গলায় বিরক্তির খানিক ঝাঁজ পাওয়া গেলো। চোখের দৃষ্টিটা ধারালো ক'রে সে জিগগেস করলে : সোজাসুজি আপনি তা হ'লে বলতে চাচ্ছেন আমি মিহিরকে বিয়ে করলেই সে দেখতে পাবে ? তবে এতো সমারোহ ক'রে মিছিমিছি আপনাকে ডেকে এনে আমাদের কী লাভ হ'লো ?

সোমানন্দ তেমনি প্রশান্ত গলায় বললে,—ব্যাপারটা ভালো ক'রে বোঝো, মিনতি। তুমি তাকে বিয়ে করলেই সে দেখতে পাবে না। আমি ওর যে দৃষ্টিশক্তি ফের ফিরিয়ে আনবো তাকে চিরস্থায়ী করতে হ'লে তোমার ওকে বিয়ে করা চাই। তুমি যদি এ-জীবনে ওকে ত্যাগ না করো, তবে আকাশের আলোও ওকে ত্যাগ করবে না। তুমিই হ'বে ওর দিনের তারা। বড়ো কঠিন সাধনা, মিনতি, কিন্তু প্রেম ছাড়া এমন কঠিন সাধনা কে আর করতে সাহস পাবে বলো?

মিনতি নিষ্প্রাণ, শুকনো গলায় বললে,—আর যদি ধরুন, বিয়ে না করি, তা হ'লে ওর দৃষ্টিশক্তি চিরস্থায়ী হ'বে না?

—কী ক'রে বলি।

মিনতি বিরক্ত, বিতৃষ্ণ মুখে বললে,—আচ্ছা, দেখা যাক। কাল—এমনি সময়।

সোমানন্দ অল্প একটু হাসলো; বললে,—আমাকে তুমি পরীক্ষা করতে চাও? তা করো। কিন্তু আমার কথা ঠিক কি না তা দেখতে গিয়ে মিহিরকে তার চক্ষু থেকে বঞ্চিত করো না। ওর চোখের কাছে আমার কথার কী দাম?

—কিন্তু, মিনতির মুখে বিরক্তি আরো ঘনিয়ে উঠলো: চোখের চিকিৎসার সঙ্গে বিয়ের যে কী সম্বন্ধ আছে তা আমি মোটেই বুঝতে পাচ্ছি না।

সোমানন্দ শিশুর মতো পবিত্র, প্রসন্ন সারল্যে বললে,—আমাকে যে বরপক্ষ থেকে কেউ ঘটক পাঠায় নি তা আশা করি তুমি বুঝতে পাচ্ছ। আমি তো তোমার দিকের লোক, তোমারই হ'য়ে কথা বলছি।

মিনতি উপরে উঠে যাবার জন্যে উসখুস করতে লাগলো। বললে,—আচ্ছা সে হ'বে।

সোমানন্দ গম্ভীর গলায় ডাকলে: শোনো।

মিনতি স্তব্ধ হ'য়ে গেলো।

সোমানন্দ বললে,—মিহিরকে আমি তার মিনতির মুখ দেখাবো এই প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি, কিন্তু তার মিনতি কি এমন কোনো প্রতিজ্ঞা করবে না যে সেই মুখ সে অস্ত যেতে দেবে না কোনো দিন?

মিনতি বললে,—শুধু প্রতিজ্ঞায় কী হয়?

—আমি সেই প্রতিজ্ঞা রাখবো, তুমিও রাখবে তোমার প্রতিজ্ঞা।

মিনতি হেসে ফেললে: তা হ'লে বলুন, কৃতিত্ব খালি আমারই একা। আপনার ওষুধ-টষুধ শক্তি-টক্তি সব বাজে কথা।

প্রত্যুত্তরে সোমানন্দ হেসে ফেললো: নিশ্চয়। প্রেমের চেয়ে পৃথিবীতে কী আর এমন শক্তি আছে?

বারো

সারা রাত অন্ধকারে ঢেউ ঠেলে-ঠেলে মিনতি ক্লান্ত হ'য়ে ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলো, ধড়মড় ক'রে জেগে উঠে দেখলো রোদের পশলায় তার বিছানা-বালিশ সব ভ'রে গেছে। সর্ব্বস্ব যেন সে হারাতে বসেছে এমনি উত্তেজনায় সে তাড়াতাড়ি উঠে বসলো। টেব্‌লের উপরেই টাইম-পিস্ ঘড়িটা টিক্‌টিক্ করছে, চেয়ে দেখলো সেই সময় এখনো আসে নি। মুখে-মাথায় একটু জল দিয়ে সে সামান্ত এক পেয়ালা চা খাবার জন্তে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করলো না। গায়ে সেই ঘুমে-মলিন সাড়িই রইলো আগোছালো হ'য়ে, রুক্ষ চুল গালে-গলায় গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে উড়ে পড়ছে, কতো রাত যেন সে ঘুমুতে পায় নি—চোখে সেই পুঞ্জীভূতো ক্লান্তি—মিনতি দ্রুত পায়ে নিচে নেমে এলো।

নিচে বসবার ঘরে বড়ো সেক্রেটারিয়েট্ টেবলটার ধারে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে ব'সে জগৎবাবু আর সীতেশ একই প্রসারিত কাগজের উপর ঝুঁকে প'ড়ে ঘোড়দৌড়ের খবর নিচ্ছিলেন, চাকর জানুয়া এককোণে চায়ের ট্রে নামিয়ে তার পাহারায় দাঁড়িয়ে আছে, সাড়ির খস্‌খসানির শব্দে দু' জনেই মাথা তুলে মিনতির দিকে তাকালো।

এ তার কী অসম্ভব চেহারা হ'য়ে গেছে! তাকে যেন এক নিমেষে আর চেনা যায় না। এক রাতে তার বয়েস যেন গেছে অনেক বেড়ে, মুখের চামড়ায়, চোখের নিচে পুরু ক'রে যেন ব্যর্থতার কাতরতা রয়েছে মিশে। তার লাবণ্যের নদী শুকিয়ে গিয়ে এখন যেন শুকনো একটা বালুচর।

জগৎবাবু অস্ফূট একটা ভৎর্সনা ক'রে উঠলেন : ঐ চল্‌লেন অমনি।

চায়ের একটা কাপ তুলে নিয়ে সীতেশ হাসিমুখে বললে,—চা-টা খেয়ে যাও, মিনতি।

—না, আমার এখন সময় নেই। মিনতি অনুযোগ বা অনুরোধ কিছুই গ্রাহ্য না ক'রে সোজা বেরিয়ে গেলো।

কতোটুকুই বা আর পথ। এক পা বাড়াতে-না-বাড়াতেই পাশের বাড়ির সদর। তবু সেই এক নিশ্বাসের পথ পেরিয়ে আসতে যেন মিনতির এক জীবন লাগছে।

নিচেটা ভীষণ স্তব্ধ। যেন অতিকায় একটা আদিম জন্তু গুহার মধ্যে শিকারের প্রতীক্ষায় ওৎ পেতে ব'সে আছে। সেই স্তব্ধতাটা এতো কঠিন যে হাত দিয়ে তা স্পর্শ করা যায়, যেন হাত দিয়ে তা ঠেলে-ঠেলে উঠতে হয় উপরে।

কালিদাস এরি মধ্যে সব ঘর-দোর গোছগাছ, ফিটফাট ক'রে রেখেছে—কেবল

মিনতি এলেই উনুন থেকে কেৎলিটা নামিয়ে চা-টা তৈরি ক'রে দেবে। মিহির আলোর দিকে মুখ ক'রে চুপ ক'রে ব'সে আছে—প্রতীক্ষায় তার সমস্ত শরীর কঠিন, কাঠ হ'য়ে আছে। নৃপতিও এসে আরেকটা চেয়ারে বসেছে। কারু মুখে কোনো কথা নেই। ঘর-দোর, আসবাব পত্র, কড়ি-বরগা – সমস্ত কিছু যেন অবিচল স্তব্ধ। ঘরের মধ্যে বাতাস পর্য্যন্ত যেন প্রতীক্ষায় শ্বাসরোধ ক'রে আছে।

অনুভূতির তাপ পেয়ে মিহির উচ্চকিত হ'য়ে উঠলো। বললে,—মিনতি?

—হ্যাঁ, মিনতির স্বর অত্যন্ত মৃদু, ভয়ে অস্ফুট তার উচ্চারণ: ঘুম ভাঙতে দেরি হ'য়ে গেলো।

—কালিদাসকে বলো তোমাদের চা এনে দিক।

—আর তুমি?

—আমার লাগবে না। ঐ সময়ের আগে কোনো কিছুতেই আমি আর স্পৃহা খুঁজে পাচ্ছি না।

নৃপতি বললে,—বেশ তো, চা-টা না-হয় পরেই হ'বে।

সবাই আবার স্তব্ধতায় গেলো ডুবে। তিনটি প্রাণী কাছাকাছি আপন-আপন নির্জ্জনতা নিয়ে একাকী ব'সে আছে। পৃথিবী সময়ের পাথায় উড়ে চলেছে কি না কারু কোনো খেয়াল নেই; এটা দিন না রাত্রি তারই বা কে হিসাব রাখে? যেন আর সব কিছুরই সীমা ছিলো, পরিমাপ ছিলো, কেবল এই অপরিমাণ স্তব্ধতারই কোনো সীমা নেই।

এই স্তব্ধতার দেশে একমাত্র দেয়ালের ক্লকটাই হঠাৎ অস্বাভাবিক শব্দ ক'রে উঠলো।

নৃপতি উঠলে চেঁচিয়ে: সময়, সময় হয়েছে মিহির।

মিনতি স্খলিত পায়ে থামতে-থামতে মিহিরের কাছে এগিয়ে আসতে লাগলো। ভয়ে সে যেন একটা পাখির মতো অসহায় হ'য়ে গেছে। মুষলধার অনর্গল বৃষ্টির মাঝে শূন্য মাঠে দাঁড়িয়ে অবোলা গরু যেমন ভিজতে থাকে, মিনতির এখন সেই রকম নিরাশ্রয় চেহারা। কাগজের একটা ছবিকে যেন মাটির ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে, হাওয়ায় কখন যে লুটিয়ে পড়ে তার ঠিক নেই।

মিহিরের কাছে এসে প'ড়ে মিনতি অন্তরের গভীরতমো গুহা থেকে যেন ডাক দিলো. এসো।

মিহির একেবারে একটা দেয়ালের মতো স্থির, নির্লিপ্ত। সহজ, স্বাভাবিক গলায় বললে,— ব্যাণ্ডেজ এবার খুলে দেবে?

—হ্যাঁ।

—তার পর ?

মিনতি কোনো কথা বল্‌লো না, কম্পমান শিথিল ক'টি আঙুল দিয়ে আস্তে-আস্তে ব্যাণ্ডেজটা খুলতে সুরু করলে।

নৃপতি পিছনে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ধীরে-ধীরে মিনতির রাশীভূতো তপ্ত আঁচলের মধ্যে মুখ ঢেকে মিহির বল্‌লে, —এই আমার অন্ধকার রাত্রির শেষ মুহূর্ত, মিনতি। উঃ, কী অন্ধকার! The hour is darkest before dawn. এর পর আলোয়—আলোয় চ'লে এসে আমি সারাজীবন এই অন্ধকারের কাহিনী লিখবো।

আরেকটা ভাঁজ ছাড়াতে মাত্র বাকি—গাছের একটা পাতার মতো মিনতি কাঁপছে।

তারপর, একটুখানি থেমে, দশ আঙুলে যৌবনের সমস্ত দুঃসাহস ডেকে এনে সে এক ঝট্‌কায় ব্যাণ্ডেজের শেষ ভাঁজটা টান মেরে খুলে ফেল্‌লে।

চোখের পলক পর্য্যন্ত ফেলবার সময় হ'লো না, মিহিরের সমস্ত শরীরে নেমেছে বিপুল বহ্নিবন্যা—সে দাঁড়িয়ে দুই হাত মেলে চীৎকার ক'রে উঠলো: আমি দেখতে পাচ্ছি, সব দেখতে পাচ্ছি—

মিনতি অসহ্য আনন্দে থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো। আশ্রয়ের আশায় তাড়াতাড়ি মিহিরকে স্পর্শ ক'রে সে চেঁচিয়ে উঠলো: দেখতে পাচ্ছো ?

—সব, সব দেখতে পাচ্ছি, মিনতি। তোমার চোখ, মুখ, চুল, সাড়ি—দেয়ালে ঐ ঘড়ি, মা'র ফটো, টেবলে এই সব আমার বই, ঐ নৃপতি—চোখে তার চশমা, নতুন ফ্রেম বদলেছে, সব দেখতে পাচ্ছি। মিনতির স্পর্শ সরিয়ে মিহির সহজ, দৃঢ় পায়ে অনায়াসে জানলার কাছে স'রে এলো: আলো, বাইরের ঐ রাস্তা, মোটরের নম্বর, ছাতে শুকোতে দিয়েছে কা'রা কাপড়, মোড়ের মুদির দোকানে পলায় ক'রে মেপে দিচ্ছে ঐ তেল, ঐ পিছনে লোক নিয়ে কে চ'ড়ে যাচ্ছে সাইকেল—এ কী, সব আমি দেখতে পাচ্ছি যে। স্পষ্ট, ভীষণ স্পষ্ট—

নৃপতি হাততালি দিয়ে উঠলো: দেখতে পাচ্ছো ?

—সমস্ত। এ কী ভীষণ আশ্চর্য্য কথা! ঐ যে যে-ছবিটা আমি শেষ করতে পারিনি, সেটা বাঁধিয়ে রেখেছে বৌদি, ঐ টেবলের নিচে প'ড়ে আছে আমার তুলির ভাজ'টা। এ কী, আমি পাগল হ'য়ে যাবো নাকি? আমি যে পড়তেও পাচ্ছি, মিনতি। টেবলের থেকে একটা বই তুলে যে-কোনো একটা পৃষ্ঠা খুলে কয়েক লাইন ক'রে প'ড়ে যেতে লাগলো: কী ভয়ানক বিস্ময়! আয়নায় নিজের মুখ পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সেই আমার আগের দুই

চোখ! কে বলে আমি অন্ধ হয়েছিলুম! সেই—সেই, চোখ বুজে আবার চোখ মেলে সেই সমান দেখতে পাচ্ছি।

—দাঁড়াও। আমি আসছি। মিনতি আলোর একটি পলাতক, বিচ্ছুরিত রেখার মতো ঘর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেলো।

মিহির জিগগেস করলে: মিনতি কোথায় গেলো, নৃপতি?

নৃপতি বললে,—বলতে পারি না তো। কিছু তো ব'লে গেলো না।

মিহির হাতড়ে-হাতড়ে একটা চেয়ার খুঁজে পেলো। তাতে ভেঙে প'ড়ে ক্লান্ত, করুণ গলায় বললে,—আমার এতো আলো সে সইতে পারলো না নাকি? তার কাজ বুঝি এখন থেকে সব ফুরিয়ে গেলো, তাকে বুঝি আর আমার প্রয়োজন নেই।

নৃপতি ঘাড়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে—তুমি চোখ যখন ফিরে পেলে, তখন আর তাকে তোমার দরকার কী?

—দরকার কী! দুই হাতে মিহির তার চোখ চেপে ধরলো: এতো আলো নিয়ে তবে আমি কী করবো?

মিনতি সটান চ'লে এসেছে বাড়ি। বাবা কোনো কাজে হয়তো ভিতরে অন্তর্ধান করেছেন, সীতেশ একা-একা একটা কাগজে ঘোড়ার বয়সের অঙ্ক কষছে।

মিনতি তার সামনে গিয়ে ডাকলে: আসুন।

এমন ভাবে মিনতি তাকে কোনোদিন ডাকেনি। সীতেশ আপাদমস্তক শিউরে উঠলো; জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—কোথায়?

—ও-বাড়ি। মিহির চোখ ফিরে পেয়েছে।

—বলো কী? সীতেশ এক সেকেণ্ড পাথর হ'য়ে রইলো: সেই সন্নেসির ওষুধে?

—হ্যাঁ, চলুন। মিনতি হাসবার চেষ্টা করলো: আপনার তো তখন বিশ্বাস হয় নি। স্বচক্ষে দেখবেন চলুন। সে একটা দেখবার মতো জিনিস।

আকস্মিকতার আক্রমণে অভিভূত হ'য়ে বিমূঢ় গলায় সীতেশ বললে,—চলো।

এবারো নিচে ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা। সিঁড়ি দিয়ে সীতেশকে নিয়ে উপরে উঠতে-উঠতেও সে স্তব্ধতা মিহিরের আনন্দ-আর্তধ্বনিতে বিগলিত হ'লো না।

দু' জনে ঘরের মধ্যে নীরবে এসে দাঁড়ালো।

নৃপতি জানলার কাছে ছটফট করছে, আর মিহির চেয়ারের মধ্যে দু' হাতে চোখ ঢেকে নিঝুম, নিস্পন্দ হ'য়ে ব'সে।

পায়ের আওয়াজ, অনুভূতির তাপ—কিছুতেই যেন তার চাঞ্চল্য নেই।

মিনতি কথা বললো। তরল গলায় বললো,—ব্যাণ্ডেজটা খুলে দিতেই সব আবার দেখতে পেলেন। আশ্চর্য্য। বলো তো, দেখ তো চিনতে পারো কি না, মিনতি মিহিরকে স্পর্শ করলে: আমার সঙ্গে কে এসেছেন?

মিহির চোখের কোটর দুটো শূন্যতায় তীক্ষ্ণ ক'রে মিনতিকে দেখতে গেলো। এবং তার ঐ অসহায় ভঙ্গি দেখে সীতেশ উঠলো জোরে সশব্দে হেসে।

সেই হাসির ঘায়ে সমস্ত ঘনীভূতো স্তব্ধতা যেন শতখান হ'য়ে গেলো।

মিনতি জিগগেস করলে: বলতে পারছো না? বলো তো কী রকম চেহারা?

মিহির শান্ত গলায় বললে,—কিছুই, কিছুই আমি আর দেখতে পাচ্ছি না।

—দেখতে পাচ্ছো না? সে কী? মিনতি চেঁচিয়ে উঠলো।

আর সীতেশ উঠলো আরেক দমক হেসে।

মিহির নিজের মধ্যে নিমগ্ন হ'য়ে বললে,—আবার সেই পুরোনো অন্ধকার।

মিনতি সেই মুহূর্তে যে কী করবে কিছুই ভেবে পেলে না। পরাভূত, বিপর্য্যস্ত দেহে সে মেঝের উপর হয়তো ট'লে পড়তে যাচ্ছিলো, সীতেশ তাকে দুই হাতের মধ্যে ধ'রে ফেললে। কোমলতায় একটা পাখির মতো অসহায়, মুখে-চোখে তার ভয়ের পাণ্ডুরতা। তার বলিষ্ঠ হাতে তাকে একটা কঠিন নির্ভর দিয়ে সীতেশ বললে, —এখানে আর তবে কী করতে দাঁড়িয়ে আছো? চলো।

মিনতি না পারলো যেতে, না বা পারলো দাঁড়াতে।

সীতেশ বললে,—তখন তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলে, এখন আমি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি।

বিমূঢ়, বিহ্বল মিনতি কী করছে কিছু ঠিক বুঝতে না পেরে শেষ পর্য্যন্ত সীতেশেরই সঙ্গে নিচে নেমে গেলো।

নৃপতি আরো কতোক্ষণ চুপ ক'রে উপরে ব'সে ছিলো, কিন্তু এইবার মিহির সঙ্গে-সঙ্গে বোবাও হ'য়ে গেলো নাকি?

শেষকালে হাই উঠতে সুরু করতেই নৃপতি উঠে পড়লো। বললে,—যাই, চা-টার অন্তত জোগাড় করতে হয়। উমার জন্যে এক্ষুনি আবার লালিম্‌লির উল্‌ কিনে নিয়ে যেতে হ'বে। কী মুস্কিল!

ছিনিমিনি

অশ্রুকে দিলাম

সুধা রান্নাঘরের কাছাকাছি বারান্দার কোণটিতে বসিয়া চা করিতেছিল। মামাবাবু আপিস হইতে এখনো ফিরেন নাই। তিনি আসিলে উনুন হইতে ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া কেৎলিতে আবার জল চড়াইতে হইবে। এখনকার চা মামিমার জন্য। একটু দেরি হইলে বকিয়া আর তাহাকে আস্ত রাখিবেন না। কাল সামান্য একটা কাঁচের গ্লাশ ভাঙিয়াছিল বলিয়া অনায়াসে তাহাকে বাপ-মা তুলিয়া গালি পাড়িয়া বসিলেন। মুখে একটু বাধিল না পর্য্যন্ত।

দরজার কড়া নড়িল। নিশ্চয়ই মামাবাবু নয়। সুধা তাহাকে চিনিয়াছে। বাটি-বাসন সব এলো রাখিয়া সে দরজা খুলিতে ছুটিল।

দরজা খুলিতেই যে-যুবকটি বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল তাহার চেহারা দেখিলেই মনে হয় সে যেন ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছে। কিছু একটা এখুনিই সমাধা করিয়া তাহাকে আবার ছুটিতে হইবে। তাহার নিশ্বাস নিবার পর্য্যন্ত সময় নাই। এক মাথা রুক্ষ চুল, কপালের শিরাগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে, দুই চোখে অসহিষ্ণু উত্তেজনা! ভিতরে ঢুকিয়াই সে সদর দরজাটা শব্দ করিয়া বন্ধ করিয়া দিল।

বীরেনকে দেখিয়াই সুধা ভয় পাইয়াছে। কিন্তু ভয় আর সে করিবে না।

বীরেন দম নিয়া বলিল,—সব ঠিক-ঠাক ক'রে এলুম। দেরাদুন এক্‌স্‌প্রেস সাড়ে আটটায় ছাড়বে। টিকিট কিনে এনেছি। বলিয়া সে বুক-পকেটের মধ্যে হাত দিয়া মনি-ব্যাগ বাহির করিল।

সুধা এইবার হাসিল; কহিল,—এতক্ষণে বাঁচলুম। ভাবলুম হ'ল না বুঝি। কিন্তু আমার ভারি ভয় করছে।

জোরে হাসিতে গিয়া বীরেন থামিয়া পড়িল। কহিল,—কিসের ভয়? লোকনিন্দাকে আমরা কেয়ার করি না। টাকার ভয় করি না—বন্ধুরা আমাকে বিপদে সাহায্য করবে। আর আইন? তুমি এখন কত? সতেরো?—তুমি এখনো রেডি হও নি কেন?

সুধা আরেক বার কহিল,—তবু আমার ভয় করছে। আমি কাল রাত্রে মা'র মরা মুখ স্বপ্ন দেখেছি, সে মুখের ছায়া এখনো আমার মন থেকে মুছে যাচ্ছে না। কি হবে!

—তবে তুমি বুঝি আমার মরা মুখ দেখতে চাও! বুঝেছি। বলিয়া মুখ নিদারুণ গম্ভীর করিয়া বীরেন তলার পকেট হইতে কি-একটা বাহির করিয়া ফেলিল।

—এ কী? ছুরি? সুধা আঁৎকাইয়া উঠিয়াছে।

মুরুব্বিয়ানা করিয়া বীরেন বলিল,—তবে তুমি ভাবছ বুঝি যে একেবারে নিরস্ত্র

হ'য়েই তোমাকে নিয়ে পথে বেরুব! বিদেশ বিভুঁয়ে একা দু'টিতে থাকব কিসের ভরসায়। কোন দিকেই অভাব নেই। বলিয়া তলার পকেট দুইটায় দুইটা চড় মারিতেই অনেকগুলি খুচরো টাকা ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া উঠিল।

তবু যেন সুধার চোখে প্রতিজ্ঞার দীপ্তি দেখা দিল না। খালি কহিল,—একটু দাঁড়াও, মামিমাকে চা-টা দিয়ে আসি।

যাইবার জন্য ফিরিতেই টের পাইল বীরেন তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিয়াছে। কহিল,—এতদূর এগিয়ে এসে তুমি যদি আজ মুখ ফেরাও তবে আমি তোমারই সামনে নিজের বুকের মধ্যে ছুরি বসাব, সুধা। আজকের সাড়ে আটটার পরে আমার স্নায়ুগুলোকে আর উত্তেজিত রাখব না, তাদের চিরকালের জন্যে অবসন্ন ক'রে দেব। বল, তোমার কিসের ভয়?

—বলছি। একটুখানি—সুধা চলিয়া যাইবার জন্য আবার পা বাড়াইল।

সুধার ডান হাত হঠাৎ মুঠা চাপিয়া ধরিয়া ফেলিয়া দৃপ্তস্বরে বীরেন কহিল,—না এখুনিই বলতে হবে।—বীরেনের দুই চোখ উদাস হইয়া উঠিয়াছে: তা হ'লে তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না?

ম্লান হইয়া সুধা কহিল,—ছি! ও-কথা বোলো না বলছি।

বীরেন নিবিড় করিয়া সুধার বাঁ হাতও চাপিয়া ধরিল—নিশ্চয়ই তুমি আমার ভালোবাসায় বিশ্বাস কর না। কিসের তোমার ভয়?

এইবার সুধার চোখ ছলছল করিয়া উঠিয়াছে। বীরেনের কাছে অলক্ষ্যে আরো একটু সরিয়া আসিয়া সে কহিল,—তোমাকে বিশ্বাস করি না বলে'ই ত' এতদিন তোমার মুখ চেয়ে এত অত্যাচার সহ্য করলুম। আমার সত্যিই আর ভয় নেই। তুমি আমাকে মাথায় ক'রে রাখ বা পায়ের তলায় মাড়াও আমি আমাকে তোমারই হাতে সমর্পণ করলুম। বলিয়া সুধা বিনা-দ্বিধায় বীরেনের কাছে আরো ঘন হইয়া সরিয়া আসিল।

বীরেন তাহাকে দূরে সরাইয়া দিয়া কহিল,—ভাবাবেশে তুমি যদি আত্মসমর্পণ কর—তবে সেটাকে আমি তোমার একটা দেহবিকার ব'লে সন্দেহ করব, সুধা। বেশ স্পষ্ট ক'রে ভেবে দেখ। সত্যিই আমি তোমার অযোগ্য নই।

একটু হাসিয়া সুধা কহিল,—এতদিন পরে তোমাকে সেই কথা মনে করিয়ে দিতে হবে নাকি?

—তা ছাড়া এমনিই তোমার বিয়ে হচ্ছিল না। পাত্রের জন্যে তোমার মামাবাবু পাতালে নেমেও ফিরে এসেছেন। প্রথমত কালো, দ্বিতীয়ত তুমি একটু খুঁড়িয়ে চল। পৃথিবীর কোন কাব্যের নায়িকাই জঘনে ও গুল্‌ফে খাটো নন্‌ সুধা, তবু আমি

তোমাকে যে-চোখে দেখলুম শকুন্তলাকে লুকিয়ে দেখবার সময়ও দুষ্মন্তের সে-চোখ ছিল না।

জোরে হাসিয়া সুধা কহিল,—কিন্তু মামিমা যদি লুকিয়ে এ দৃশ্য দেখেন ত' তোমার দেরাদুন একসপ্রেসের এঞ্জিন উল্‌টে যাবে।

হাসিয়া প্রতিধ্বনি করিয়া বীরেন কহিল,—বেশ, মামিমাকে চা দিয়ে এস।

—আর তুমি?

—এইখানে দাঁড়ালুম।

ভুরু পাকাইয়া সুধা কহিল,—বটে আর কি! এখুনিই মামাবাবু এসে পড়বেন। তোমাকে দেখলেই হাতের লাঠি দিয়ে মাথায় এক ঘা যে বসিয়ে দেবেন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।

মুচকি মুচকি হাসিয়া বীরেন কহিল,—নিশ্চিন্তই ত' আছি। আমার পকেটে লাঠির চেয়েও বড় ওষুধ আছে। বেমালুম সেটা প্রয়োগ করব।

ঘাড় বাঁকাইয়া সুধা বলিল,—দিন-দিন তোমার বুদ্ধি যে খুলছে দেখছি। তোমাদের দুই বীরের যুদ্ধের ফলে মাঝখান থেকে বেচারি আমার কাশী যাওয়াটাই মারা পড়বে।

কানের পাশটা চুলকাইয়া বীরেন কহিল,—সে একটা কথা বটে। ভেবে দেখি নি।

—এমন অনেক জিনিসই তুমি ভেবে দেখ না। সে-জন্য পরে আফশোষ করলেও চলবে। এখন এক কাজ কর দিকি। আমার সঙ্গে রান্নাঘরে এস।

উৎসুক হইয়া বীরেন জিজ্ঞাসা করিল,—কেন?

—এস-ই না। বলিয়া সুধা একটু অগ্রসর হইয়া দেখিয়া নিল উপর হইতে নীচের বারান্দায় কেহ লক্ষ্য করিতেছে কি না। কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সে হাতছানি দিয়া বীরেনকে সঙ্কেত করিল। তাড়াতাড়ি তাহাকে রান্নাঘরে ঢুকাইয়া দিয়া সুধা কহিল,—আমি রান্নাঘরের একচ্ছত্র রাণী। এখানে আর তোমার ভয় নেই!

বীরেন চঞ্চল হইয়া উঠিল: আমি কি ভয় করি নাকি?

—করলে একটু ভালো করতে। দেখ, কার্য্যসিদ্ধিটাই উদ্দেশ্য; হঠকারিতা ক'রে তোমার ভয় নেই প্রমাণিত করতে পার, কিন্তু তোমার বুদ্ধিও যে নেই সঙ্গে-সঙ্গে সেটাও সপ্রমাণ হ'বে। মামাবাবুকে কী দেখাতে এসেছ?—ভয় নেই? না, সুধা নেই? আচ্ছা, এক কাজ কর। এইখানে দাঁড়াও। এই বলিয়া যে-ধারটাতে

অনেকগুলি ঘুঁটে স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে তাহারই কাছে সুধা বীরেনকে দাঁড় করাইয়া দিল।

ড্রিল-মাষ্টারের উপদেশ শুনিয়া দুর্ব্বল ছাত্র শরীরের যেমন একটা অসহায় ভঙ্গি করে তেমনিই ভাবে বীরেন আসিয়া ঘুঁটেগুলির পাশে দাঁড়াইল। বিস্মিত হইয়া, কহিল,—তার মানে ?

—তার মানে আমি চ'লে গেলে কেউ যদি রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে, তবে তুমি সোজা ঘুঁটেগুলির মধ্যে ডুবে যাবে। পারবে না ?

মজা পাইয়া বীরেন কহিল,—একশোবার।

সুধা বলিল,—সেই জন্যেই আলোটা আর জ্বালালুম না। তুমি ভুষো রঙের র‍্যাপারটা প'রে এসে ভালই করেছ। মামিমাকে চা দিয়ে আসি। এসে আবার তোমার জন্যে করে দেব। ঐ মামাবাবু এলেন বুঝি। কড়া নাড়ছেন।

বলা নাই কহা নাই বীরেন ঘুঁটের গহ্বরে গিয়া প্রবেশ করিল। সুধা হাসিয়া কহিল,—অমনি থাক। মামাবাবুর অবশ্যি এখানে ঢোকবার সম্ভাবনা নেই। আমি চল্লুম। দোহাই তোমার,—ঐখানে চুরুট খেয়ো না কিন্তু। আমি এসে খুব ভালো ক'রে চা ক'রে দেব।

বীরেন মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল : চায়ে মিষ্টি কিন্তু আমি বেশি খাই।

—আচ্ছা।

সুধা তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিল।

মামাবাবু ধম্‌কাইয়া উঠিলেন : কি করছিলি এতক্ষণ ? শুনতে পাস্ না ?

নম্র হইয়া সুধা উত্তর দিল : চা করছিলুম।

মামাবাবু মুখ ভেঙচাইলেন : চা করছিলুম। দু' বেলা চা না খেলে বুঝি বিবি সাজা যায় না !

নম্রতর হইয়া সুধা বলিল,—মামিমা ত' দু' বেলাই খান্।

স্বরটা নরম হইলেই বুঝি শ্লেষটা প্রখর হইয়া উঠে। মামাবাবু রুখিয়া উঠিলেন : তবে এতক্ষণ তাঁকে দিস্ নি কেন ?

এ-কথার উত্তর দেওয়ার সাধ্য সুধার বুদ্ধিতে কুলাইবে না। খালি কহিল,—আপনি এলে একসঙ্গেই হ'য়ে যাবে ব'লে অপেক্ষা করছিলুম।

মামাবাবু কহিলেন,—এই ক'রে বুঝি কাজের গা-ফিলি করছিস আজকাল। বেশ, আজ আমি দশটার সময় চা খাব।

নির্ব্বিবাদে ঘাড় হেলাইয়া সুধা কহিল,—আচ্ছা।

মামাবাবুর পিছে-পিছে সুধা চায়ের বাটি লইয়া উপরে আসিল। মামিমা

পরিপাটি করিয়া খাটে বিছানা পাতিতেছেন। সুধাকে দেখিয়াই গর্জিয়া উঠিলেন : এখনো সন্ধ্যে দিস নি যে। এক পেয়ালা চা করতে তোর দু'ঘণ্টা লাগে! অলক্ষ্মী কোথাকার!

মামাবাবুও চাপকানের বোতাম খুলিতে খুলিতে কি-একটা সায় দিবার জন্য গলা খাঁথ্‌রাইলেন, কিন্তু তাহা শুনিবার জন্য সুধা আর দাঁড়াইল না। প্রতিদিনের এই অপবাদ ও অত্যাচারের একটা জলজ্যান্ত প্রতিবাদ দিবার জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। দেয়ালে বড় ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিল ছয়টা বাজে।

তাড়াতাড়ি মামিমাদের দুয়ারের গোড়ায় দেরখোতে মাটির বাতিটি জ্বালাইয়া সুধা গলায় উপর ছোট আঁচলটি তুলিয়া দিয়া প্রণত হইল। কি কামনা করিবে বুঝিল না। একবার ভাবিল বলে, হে আকাশের সন্ধ্যাতারা, আকাশের বহুদূর নির্জ্জনতা থেকে নেমে এসে এই ঘনায়মান অন্ধকারে আমাকে পথ দেখাও; আরেক বার ভাবিল ঈশ্বরের কাছে তাহাদের নতুন বাসায় এমনি একটি অম্লান সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইবার প্রার্থনা করিলেই বুঝি ভাল হয়। মামিমা ঠাট্টা করিলেন : মেয়ের ভক্তি দেখ।

মামাবাবু কহিলেন,—তবু যদি কপালে একটা পাত্র জুট্‌ত!

ক্ষিপ্রহাতে ঘরের আরো দু'-চারটি কাজ সারিয়া সুধা সিঁড়ি দিয়া তরতর করিয়া নামিয়া আসিল। তাহাকে যে একটু খোঁড়াইয়া চলিতে হয় সে-কথা আজ কেহ তাহাকে মনে করাইয়া দিলেও সে বিশ্বাস করিবে না।

নিশ্বাস নিবার জন্য বীরেন হয় ত' তখন ঘুঁটের পাহাড় ভেদ করিয়া মাথা তুলিয়াছিল, দরজার কাছে হঠাৎ কাহার পায়ের শব্দ হইতেই তাড়াতাড়ি আবার মাথা গলাইল। সুধা হাসিয়া অনতিস্পষ্ট স্বরে কহিল,—আমি গো আমি!

গা ঝাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া বীরেন কহিল,—না, এভাবে আত্মগোপন পোষাবে না। এতে প্রেমের অমর্য্যাদা হয়। সম্মুখ সমরে জয় লাভ করব।

—আবার খেপ্‌লে বুঝি! জয় লাভ তোমার তাতে হ'তে পারে বটে, কিন্তু আমাকেই লাভ করা হবে না। আরেকটু বোস—এই ধামাটা তোমার মাথার উপর চাপিয়ে দিচ্ছি। বাস্! মামিমা এখন কলতলায় গা ধুতে আসবেন। আমার কাছে তোমার এক-পেয়ালা চা পাওনা আছে। দু' মিনিট্‌।

নীলচে বাটিতে সোনালি চা ভরিয়া সুধা সেই ঘুঁটের স্তূপকে সম্বোধন করিল,—চিচিম্, ফাঁক!

হাতে-মুখে কালি লইয়া বীরেন উঠিয়া আসিল। চায়ের বাটিটা মুখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া সুধা বলিল,—চুমুক দাও, প্লেট্‌টা আমি ধরছি।

এক চুমুক দিয়াই বীরেন কহিল,—ছাই, একটুও মিষ্টি হয় নি। বলিয়া কাপ্‌টা সরাইয়া দিতেই সেটা মেঝের উপর খান্‌ খান্‌ হইয়া ভাঙিয়া পড়িল। স্তম্ভিত বিবর্ণ সুধাকে তাড়াতাড়ি বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল,—চায়ের মিষ্টি আমি চাইনে, সুধা।

নীচে সিঁড়ির কাছে অমনি মামিমার গলা শোনা গেল : কাপ একটা ভাঙলি বুঝি পোড়ারমুখি!

বীরেনকে আর বলিয়া দিতে হইল না। তাড়াতাড়ি সে ঘুঁটের কোটরে গিয়া প্রবেশ করিল। ঝাঁকড়া-চুল মাথাটা একটু নামাইতেই সুধা তাহাতে ধামা-চাপা দিল। ইত্যবসরে যে-কুপিটা সে জ্বালাইয়াছিল আঁচলের ঝাপটায় তাহাও নিভাইয়া ফেলিতে ইতস্তত করিল না। জ্বলন্ত উনুনের আলোতে ঘরের যেটুকু দেখা যায় তাহাতে ঘুঁটের আয়তন বৃদ্ধি ধরা পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই।

রান্নাঘরে ঢুকিয়া মামিমা আরেক দমক ধম্‌কাইয়া লইলেন। সুধা মুখ নীচু করিয়া বলিল,—মামাবাবুর জন্য চা নিচ্ছিলুম, হাতটা কেমন ফস্‌কে গেল।

—দেখ্‌লে, দেখ্‌লে! এমন সুন্দর কাপ্‌টা কেমন কাণা ক'রে দিল দেখ্‌লে। এখন পরেশকে আমি কিসে ক'রে চা দিই। তোর মরণ হয় না কেন?

প্লেটের ভাঙা টুক্‌রো কুড়াইতে কুড়াইতে সুধা কহিল,—এবার হ'বে, দেরি নেই।

—কি তুই আমাকে শাসাচ্ছিস্‌? তুই মরলে আমরা হরির লুট দেব বুঝ্‌লি? এখন যা দিকি ভাঁড়ার থেকে ময়দা আর চাকি-বেলন্‌ নিয়ে আয় শিগ্‌গির ক'রে। কতদিন পরে পরেশ এল—ওকে লুচি ক'রে দিই।

ঘুঁটের স্তূপে হঠাৎ বুঝি ভূমিকম্প সুরু হইল। না, ও একটা বেরাল। ঘুঁটের চূড়ায় উঠিয়া একটা পোকা ধরিবার কস্‌রৎ করিতেছে।

মহা মুস্কিল হইল যা হোক্‌। বীরেনের দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া সুধার সমস্ত শরীর অস্থির হইয়া উঠিল। যেমন উচ্ছৃঙ্খল, তাহার তেমনই শিক্ষা হইয়াছে। তাহার এই অধৈর্য্যের জন্যই সুধার বড় ভয় করে। কিন্তু এই পরেশ আবার কোত্থেকে আসিয়া জুটিল! বীরেনকে ঐ ঘুঁটের চাপে পড়িয়া দম বন্ধ হইয়া মরিতে হইবে নাকি। সুধার হাত-পা ছুঁড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল,—তাহাকে ভগবান এমন অলৌকিক শক্তি কেন দেন নাই যে পরেশের নামটা স্মরণ করিতে করিতেই সে ভস্ম হইয়া যাইবে!

ভাঁড়ার হইতে জিনিস-পত্র নিয়া রান্নাঘরের কাছে আসিতেই দেখিতে পাইল কে একটা লোক সামনে দাঁড়াইয়া আছে। বুঝিল, এই পরেশ। ইহার বহু প্রশংসা

মামিমার কাছে সে শুনিয়াছে, এবং যে-মেয়ে ইহার অঙ্কশায়িনী হইবেন তিনি যে বিষ্ণু-অঙ্কলীনা লক্ষ্মীর চেয়েও সৌভাগ্যবতী এই উক্তি করিয়া তিনি সুধার কুৎসিত চেহারা ও কদর্য্য স্বভাবের প্রতি প্রখর কটাক্ষপাত করিতে পর্য্যন্ত ছাড়েন নাই। লোকটাকে এখন স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার আপাদ-মস্তক জ্বলিতে লাগিল। এই অসময়ে ও মরিতে আসিল কেন? আর যদি আসিল'ত একেবারে রান্নাঘরের চৌকাঠের ধারেই সভা জাঁকাইয়া তুলিল কোন হিসাবে?

সুধা ঘরে ঢুকিয়াই হাতের জিনিস-পত্রগুলি নামাইয়া রাখিতেছে। মামিমা পরেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন: এই আমার সেই ভাগ্নি—যার কথা তোকে লিখেছিলুম। চেনা-শোনা ছেলে আছে বলতে পারিস্? হাড় ক'খানা ঝরঝরে ক'রে ফেল্‌লে।

স্নেহনিবিড় দুইটি চক্ষু দিয়া পরেশ সুধার ব্যথাসমাহিত মুখকে স্পর্শ করিল। সন্ধ্যার আবছায়ায় সেই মুখখানিকে তাহার মন্দ লাগিল না। ভুরু দু'টি টানা, ঠোঁট দু'টি দৃঢ়নিবিষ্ট, মুখখানি ঢল্‌ঢলে।

পরেশ বলিল,—পাত্র হাতে আছে, দিদি। ভালো পাত্রই।

—সত্যি? দিদি উৎফুল্ল হইলেন, কিন্তু তখুনিই মুখ গম্ভীর করিয়া কহিলেন,—মেয়ে কিন্তু এদিকে আবার খোঁড়া। কম হাঙ্গামায় কি পড়েছি ভাই?

পরেশ অভয় দিল: তা হোক।

—পয়সা-কড়ি কিছু দিতে পারবো না তা ব'লে। ওঁর তেমন আর আয় নেই। এবার পাটের বাজার প'ড়ে গিয়ে আমাদেরো বসিয়েছে। বড় ছেলেটা পুষায় পড়ছে, মেজ এবার শিবপুর কলেজে গিয়ে ঢুক্‌লো—তা' ছাড়া এখানেও ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনা। পাঁচশোটি টাকা না হ'লে কলকাতায় সংসার চলে না। তাই ওকে লেখাপড়া শেখানো গেল না এত বড় সংসার,—আমি কি একলা তদারক করতে পারি? তা ছাড়া গত ভাদ্র মাস থেকে হাঁটুতে বাত নেমেছে। তা' পাত্র কেমন শুনি?

পরেশ লক্ষ্য করিল হঠাৎ সুধা কেন জানি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আঁচল দিয়া বারে বারে কপাল ও ঘাড়ের ঘাম মুছিতেছে; একবার অকারণে ঘরের বাহিরে যাইতেছে আবার তৎক্ষণাৎই ফিরিয়া আসিয়া কি করিবে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দিদি তখন তপ্ত কড়ায় লুচিগুলি ছাড়িতেছেন বলিয়া সুধার এই অস্থিরতা লক্ষ্য করেন নাই, কিন্তু পরেশের ভারি সন্দেহ হইল। শাবক হারাইয়া বিড়াল যেমন অসংলগ্ন ভাবে ঘুরিয়া ফেরে সুধাও যেন তেমনই করিয়া কিছু একটা করিতে না পারিয়া একেবারে ঘামিয়া উঠিয়াছে। উহার

মুখ পাংশু, ঠোঁট দুইটি যেন শুকনো-শুকনো। আবার সুধা ঘর হইতে বাহির হইতেই পরেশ এক ফাঁকে দিদিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল : তুমি একটু বোস। আমি এই এলুম ব'লে। কলতলা থেকে মুখটা ধুয়ে আসি গে।

বাহির হইয়া দেখিল সুধা সামান্য দূরে বারান্দার উপরেই দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে। পরেশ তাড়াতাড়ি তাহার একান্ত কাছে আসিয়া পৌঁছিতেই সে চম্‌কাইয়া উঠিল। ষড়যন্ত্রের অপরাধীরা যেমন নিঃশব্দে কথা বলে, তেমনি করিয়া পরেশ কহিল,—আমাকে তুমি মাপ কোরো। তুমি আমাকে হয় ত' চিন্‌বে না। কিন্তু আমি যা প্রশ্ন করছি তার উত্তর দাও।

সুধা ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। তবু জিভ দিয়া উপরের ঠোঁটটা একটু চাটিয়া কহিল,—কি ?

গলার স্বর আরো নামাইয়া পরেশ জিজ্ঞাসা করিল : বীরেন এসেছে ?

মুহূর্তে সুধার মাথায় খান্ খান্ হইয়া আকাশ ভাঙিয়া পড়িল বুঝি। বোধ হয় সে ধরা পড়িয়া গেল! এই লোকটা হয় ত' সকল কেরামতি ধরিয়া ফেলিয়াছে। এইবার কেলেঙ্কারির আর সীমা থাকিবে না। মামাবাবু নিশ্চয়ই পুলিশ ডাকিবেন। ছি ছি! তাহাকে শেষ কালে গলায় দড়ি ঝুলাইয়াই মরিতে হইবে! ইহার আগে তাহার মরণ হইল না কেন ?

প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া সুধা রুক্ষ হইয়া বলিল,— কে বীরেন ?

সান্ত্বনাসিক্তিতস্বরে পরেশ কহিল,—যদি এখানে এসে থাকে, শিগ্‌গির আমাকে বল। ছ'টার সময় তার টিকিট কিনে এখানে পৌঁছুবার কথা। মোড়ে তোমাদের জন্যে মোটর দাঁড়িয়ে আছে। বল শিগ্‌গির ক'রে।

ন্যাকা সাজিয়া সুধা কহিল,—এ সব কী বল্‌ছেন আপনি ?

বিরক্ত হইয়া পরেশ বলিল,—এখন আর ওসব ভণিতা আমার সঙ্গে কোরো না। আমার সময় কম—মোটরটা আমাদের অফিসের এক সাহেবের। তোমাদের হাওড়া-ষ্টেশনে নামিয়ে দিয়ে সাহেবকে গাড়ি ফিরিয়ে দিতে হবে। আটটার সময় গ্রাণ্ড্ হোটেলে তার নাচ আছে। শিগগির। ওজ্‌বুকটা এখনো আসে নি ?

চোখের সামনে ভোজবাজি হইতেছে নাকি ? লোকটা কি গণক না গুপ্তচর ? সুধা একদৃষ্টে পরেশের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। বোধ করি না চাহিয়া পারিল না। ছ' ফুট লম্বা চেহারা, প্রশস্ত কপালে যেন বরাভয়, দুই চোখে যেন প্রশান্ত আকাশের উদার সহানুভূতি! সুধা বলিয়া উঠিল,—এসেছে।

—এসেছে ? কোথায় ?

বার দুই ঢোঁক গিলিয়া সুধা কহিল,—রান্না-ঘরে ঘুঁটের নীচে লুকিয়ে আছেন।

পরেশ চম্‌কাইয়া উঠিল: বল কি? এই দুর্দ্দশা ওর? দিদিকে তা হ'লে ত' রান্নাঘর থেকে সরাতে হয়। ঐ বাল্‌তিটা থেকে আমার হাতে একটু জল দাও ত', মুখ-চোখটা ভিজিয়ে নি। ভালোবাসা এমনি হাঙ্গাম যে শেষকালে ঘুঁটের মেডেল গলায় ঝুলাতে হয় দেখ্‌ছি!

হাতে করিয়া কতকটা জল কপালের উপর থাব্‌ড়াইতে থাব্‌ড়াইতে পরেশ রান্নাঘরের দরজার কাছে আসিয়া হাজির হইল। কহিল,—তোমার রান্নাঘরে যে ধোঁয়া—একটু বসতে-না-বস্‌তেই মাথা ধ'রে গেল। তোমার ভাগ্নিই বরং লুচিগুলি ভেজে ফেলুক; তুমি চল ওপরে। কতদিন বাদে দেখা, একটু গল্প করি গে। এই ধোঁয়ার মধ্যে ভদ্রলোক বস্‌তে পারে! আমার আবার একটুতেই মাথা ধরে। মাথা ধরলে রাত্রে আবার ঘুম হয় না।

—তাই চল্‌। বলিয়া উনুন হইতে কড়াটা নামাইয়া দিদি উঠিয়া পড়িলেন। —এক শহরে থাকিস্‌ অথচ গুণে ছ'টি মাস না গেলে দিদির বাড়ি ভুলেও একবার মাড়াস্‌ না। তোর আজ কাল কত মাইনে হ'ল? বলিয়াই মামিমা হাঁক দিলেন,—সুধা! ও সুধা।

সুধা ভয়ে-ভয়ে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেই মামিমা কহিলেন,—এগুলো সব তৈরি ক'রে ফেল্‌ শিগ্‌গির ক'রে। এই ডালনার তরকারি রইল। একটু ঝাল্‌-ঝাল্‌ করিস যেন। পরেশ কিন্তু ঝাল ভালবাসে।

ঘটির জলে হাত ধুইয়া দিদি উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন,—চল।

পরেশ দিদিকে লইয়া অন্তাহত হইল।

উহাদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সুধা ঘুঁটেগুলি দুই হাতে সরাইয়া ফেলিয়া বীরেনকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। বীরেনের বাহু দুইটা এমন ভাবে জড়াইয়া ধরিল যেন সে তাহার বাহু-বেষ্টনের মধ্যে একটা সমুদ্রকে লাভ করিয়াছে। বীরেন তাহার কানে কানে কহিল,—পরেশ এসেছে, না? আর ভয় নেই। তোমার মামি কোথায়?

সুধা কহিল,—ওপরে গেছেন।

—পরেশ সরিয়েছে বুঝি? যাক্‌, এবার প্রস্তুত হ'য়ে নাও। তুমি এমন বোকা একটা ভালো শাড়িও প'রে থাক নি। আমাদের এক্ষুনি বেরুতে হ'বে।

—এক্ষুনি?

—হ্যাঁ, আর নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। গলির মোড়ে পরেশ নিশ্চয়ই

আমাদের জন্যে গাড়ি ঠিক রেখেছে। আর দেরি নয়, সুধা। তোমার এখনো ভয় করছে নাকি ?

সুধার চক্ষু দুইটি হাসিতে টল্‌টল্ করিয়া উঠিল। কি ভাবিয়া কহিল,—আর ভয় নেই। কিন্তু ওপরে একবার যাব না ? কিছু জামা কাপড় নিয়ে আসি। বাক্সে চারগাছি চুড়ি আছে, প'রে আসি অন্তত। অসময়ে কাজে লাগতে পারে।

বীরেন বাধা দিল ; কহিল,—না, থাক্। এখন ও সব বাবুগিরিতে কাজ নেই। ওপরে গেলেই ওরা টের পেলে সব ভেস্তে যাবে।

সাহসিকার মত সুধা কহিল,—কেউ টের পাবে না। মার ফটো প্রণাম করে না এলে আমি এক পা-ও চলতে পারবো না।

সুধা তাড়াতাড়ি উপরে চলিয়া আসিল। চিরুনি দিয়া মাথা আঁচড়াইয়া তাড়াতাড়ি একটা এলো খোঁপা বাঁধিয়া নিল ; শাড়িটা বদলাইয়া লইলে ভাল হইত, কিন্তু এখন আর ঐটুকু বাবুগিরি করিবারও সময় নাই। করযোড়ে মাকে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিল,—মা, তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে কি না জানি না, কিন্তু এই অন্ধকূপের অন্তরালে বসিয়া বসিয়া জীবন ক্ষয় করিয়া ফেলিলেই কি তোমার মুখ প্রসন্ন হইত। আমি ধাবমান স্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিতেছি ; যদি কূল পাই মা, সে আমার পরম আবিষ্কার। আমি তাহারই সন্ধানে চলিলাম।

সেমিজের মধ্যে মা'র একখানি চিঠি গুঁজিয়া, আঁচলের খুঁটে দু'টি শুক্‌নো প্রণামী ফুল বাধিয়া চুড়ি ক'গাছি পরিয়া সুধা জলস্রোতের মত তরতর করিয়া নামিয়া আসিল। পরেশ চালাকি করিয়া দিদিকে এমন জায়গায় সরাইয়াছে যেখান হইতে এ-সব কিছুই তাঁহার চোখে পড়িল না।

নীচের বারান্দাটায় অন্ধকারে বীরেন ভূতের মত দাঁড়াইয়া আছে। সুধা নিঃশব্দে আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। বীরেন দরজাটা খুলিল। গলিতে বিশেষ লোক-জন নাই। দূর হইতে মোটর দেখা যাইতেছে। পরেশ নিশ্চয়ই এমন সময় কাহাকেও জানালায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দিবে না। কি যে করিতেছে সেই সম্বন্ধে সংজ্ঞা হারাইয়া তাহারা ধীরে ধীরে মোটরের কাছে আসিয়া থামিল। ড্রাইভার বীরেনকে চিনিত—তাহাকে বিনা পয়সায় কতগুলি ইন্‌জেক্‌শান্ দিয়া বীরেন তাহাকে কেনা করিয়া ফেলিয়াছে। সে তক্ষুনিই দরজা খুলিয়া দিল। গাড়ির মধ্যে গিয়া উহারা বসিতেই ড্রাইভার ষ্টার্ট দিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে যে কি হইয়া গেল সুধা কিছুই আয়ত্ত করিতে না পারিয়া একেবারে বোবা হইয়া রহিল। সে

এত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে যে বীরেন তাহার মাথাটা বুকের কাছে টানিয়া আনিলেও সে সামান্য একটু বাধা দিতে পারিল না।

এদিকে পরেশ তাহার দিদি ও ভগ্নীপতির সঙ্গে খুব আলাপ জমাইয়া ফেলিয়াছে। দিদি বলিলেন,—শুনছ? পরেশের হাতে নাকি খুব ভাল পাত্র আছে, পয়সা কড়ি নেবে না।

ভগ্নীপতি উৎসাহিত হইলেন, তাই নাকি? কি করে ছেলেটি?

দিদি মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন,—আবার করাকরি কি? যেমন তোমার বোন্-ঝির ছিরি তাতে এখন একটা পুরুত-ঠাকুর জুটলেও চ'লে যায়। পার করতে পারলে হাড় ক'খানা ঠাণ্ডা হয়!

পরেশ কহিল,—ছেলেটি ভালই। মেডিকেল কলেজে সিক্‌স্থ ইয়ারে পড়ছে।

ভগ্নীপতি আকাশ হইতে পড়িলেন,—বল কি? সুধির এত ভাগ্যি হ'বে? কি নাম ছেলেটির?

পরেশ আম্‌তা আম্‌তা করিল না; স্পষ্ট করিয়া, কথায় জোর দিয়া কহিল,—বীরেন্দ্র বসু।

পরেশ নেশা করিয়া আসিয়াছে নাকি? নহিলে কায়স্থের ছেলের নাম করিয়া সে বামুনের জাত মারিবার স্বপ্ন দেখিতেছে! ভগ্নীপতি হঠাৎ কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। তবু হাসিবার ভাণ করিয়া কহিলেন,—হঠাৎ এ রকম একটা মারাত্মক ঠাট্টা করবার মানে?

গম্ভীর হইয়া পরেশ বলিল,—ছেলেটি সুধাকে ভালবাসে, বিয়ে করলে দু'জনেই সুখী হ'ত। তা' ছাড়া আইনের নানা রকম উপায় আছে; বিয়েটাকে বৈধ করতে বেগ পেতে হবে না। হিন্দুপ্রথার বিয়েটাই যে আদর্শ বিয়ে সে-মত আজকাল অনেকেই মানতে চাইছে না।

এবার ভগ্নীপতির কাছে ব্যাপারটা যেন আস্তে আস্তে খোলসা হইল। তিনি চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন: দাঁড়াও, এবার আমি চিনতে পেরেছি বোধ হয়। ছেলেটা কালোপানা বেঁটে—নাকটা থ্যাবড়া, বেশ জোয়ান, না? ওটা ত' একটা আস্ত বদমাস, স্কাউণ্ড্রেল। তোমার সঙ্গে ওর চেনা আছে? ওকে এক দিন পাঠিয়ে দিও ত' এখানে। আমার জেল হোক হবে, কিন্তু ডাম্বেলটা দিয়ে আমি ওর মাথা যদি গুঁড়ো না করি ত' কি বলেছি। বলিয়া তিনি তাক হইতে একটা ডাম্বেল তুলিয়া লইলেন।

পরেশ হাসিয়া ফেলিল; কহিল, —ওকে এখানে না পাঠানোই তা হলে উচিত

হবে। কেন না, তাতে আপনার জীবনো বিপন্ন হতে পারে। ও বদমাস কি না জানি না, তবে ভারি বলিষ্ঠ।

—বদমাস না? একশোবার বদমাস। পাজিটাকে একবার পেলে আমি দেখে নেব। আসুক না আমার সঙ্গে লড়তে! বলিয়া ভগ্নীপতি অনুপস্থিত শত্রুর বিরুদ্ধে আস্তিন গুটাইলেন।

পরেশ বলিল—আমি বীরেন বন্ধু নই, বা যদি বলেন ত' তার পক্ষ হ'য়েও লড়ব না। কিন্তু ওকে আপনি জানলেন কি ক'রে?

ভগ্নীপতি হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিলেন,—আর বলো না সে-কথা। এই ত' মাস ছয়েক হ'ল—তুমি ত' আর ভুলেও এদিকে আস না; কি ক'রে বা জানবে? দিদিদের খোঁজখবর কি কিছু নাও?

দিদি এইবার কথা পাইলেন। এতক্ষণ নিশ্বাস রোধ করিয়া স্বামীর মুখ হইতে সেই লোকটার বৃত্তান্ত শুনিবার আশায় একেবারে নিস্পন্দ হইয়া ছিলেন, এইবার বিষাদের সুরে কহিলেন,—ও আসবে! দিদির কাছে এলে যে ওর বিকেলের বায়স্কোপ মাটি হ'য়ে যায়। আজ সূর্য্যি বোধ হয় পশ্চিমে উঠে পুবে ডুব্‌ল।

পরেশ কহিল,—সেটা এখন রাতের অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাবে না। হ্যাঁ, তারপর? ব্যাপারটা জানা দরকার।

রেখা-সঙ্কুল মুখে অসহনীয় বিরক্তির ভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ভগ্নীপতি কহিলেন, —এই ত' আষাঢ় মাসে সুধার পায়ে কি-রকম একটা ঘা হয়। দেখতে দেখতে ঘায়ে পচ ধরতে সুরু করে। তখন ডাক্তার না ডাকিয়ে করি কি! বোনের শ্বশুরকুলটা একেবারে ফাঁকা—মেয়েটাকে আমারই ঘাড়ে চাপিয়ে বোন ত দিব্যি আরামে চোখ বুজলেন। এই ছুঁড়িটাকে নিয়ে আমার কি কম ঝক্কি? ঘাড়ে-গর্দানে খালি বেড়েই যাচ্ছে—

দিদি টিপ্পনি কাটিলেন: চেহারার যেমন বহর তেমনি রূপের বাহার!

পরেশ কহিল,—হ্যাঁ, ডাক্তার ডাকালেন। তারপর?

—ডাক্তার এসে বল্লে হাড় পর্য্যন্ত ধরেছে। হাঁসপাতালে গিয়ে চেঁছে ফেলতে হ'বে, নইলে সমস্ত পা য়্যাম্‌পুটেট করা ছাড়া উপায় থাকবে না। সে যে কী বিপদে পড়লাম, তুমি বুঝবে না। একা মানুষ, ছেলেগুলো বিদেশে—তোমাকে যে একটা খবর দেব তা' তোমার ঠিকানাটা পর্য্যন্ত কোনোদিন দাও নি। এক শহর থেকে ছাড়াছাড়ি আত্মীয়দের মধ্যে হয় ব'লে শুনি নি।

পরেশ কহিল,—তারপর কোন রকমে হাঁসপাতালে ত' নিয়ে গেলেন। সেই-খানেই বুঝি বীরেনের সঙ্গে দেখা হ'ল।

—সেইখেনেই।

দিদির বুদ্ধি এতক্ষণে পরিষ্কার হইল। আর ভুল নাই, এইবার তিনি বুঝিয়াছেন। মুখব্যাদান করিয়া বলিয়া উঠিলেন: ও! ঐ গুণ্ডাটা? ও! আমি এতক্ষণ ভাবছিলাম কে-জানি আর কে হবে। ও! এইবার বুঝেছি। ঐ হারামজাদা কোথায়?

পরেশ কহিল,—বীরেন কি করলে?

—প্রথম ত' কত আপ্যায়িত করলে—একেবারে বাড়ির ছেলের মত!

দিদি সায় দিলেন: প্রথম দেখে ত' মনে হ'ল দেবদূত—স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন! নিজেই সব ব্যবস্থা করলে; হাঁসপাতালে জায়গা ঠিক ক'রে দিলে। এমন কি গাঁটের পয়সা পর্য্যন্ত খরচ করতে কসুর করলে না। দু'বেলা এসে মেয়েটার খোঁজ নিয়ে যেত—আমাদের পর্য্যন্ত এত প্রবোধ দিত যে ভাবতাম সোনার টুকরো ছেলে!

ভগ্নীপতি গলা ভারি করিয়া কহিলেন,—আমরা অকৃতজ্ঞ ছিলাম না, পরেশ! সুধার জন্য যে ও কী পরিশ্রম ও সেবা করেছে তা ত' আমরা স্বচক্ষেই দেখেছি। তাই সুধা ভাল হ'য়ে বাড়ি ফিরলে ওকে একদিন খেতে নিমন্ত্রণ করলাম। তাই থেকে ছেলেটা প্রায়ই আসা-যাওয়া করতে লাগ্‌ল। মুখের ওপর না-ও বলতে পারি না; কিন্তু কেন যে ও এত ঘন-ঘন আসে তাও বুঝ্‌তে বাকি রইল না, পরেশ।

দিদি বলিলেন, —একদিন ত' স্বচক্ষেই দেখলাম সদর দরজার কাছে দু'জনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কি-সব ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলাবলি করছে। আমাকে দেখে ওরা এমন আঁৎকে উঠ্‌ল যে, একটা ভদ্র সম্বোধন পর্য্যন্ত করতে পারল না। দু'জনের মুখ ছাইয়ের মত শাদা,—মেয়েটা ত' একটা পাতার মত কাঁপছে। কী নির্লজ্জ ঐ ছেলেটা। মুখের ওপর দিব্যি ব'লে গেল সুধাকে এই দু'টো বই দিতে এসেছিলুম মামিমা! আমি তার মামিমা না হাতী!

পরেশ কহিল,—তা তুমি বাতে যেমন ফুলছ!

ভগ্নীপতি বলিলেন,—কোর্ট থেকে ফেরবার সময় আমিও একদিন দেখে ফেল্লাম। এসে দেখি ঝাপসা অন্ধকারে দু'জনে আমার বৈঠকখানাটায় খুব ঘেসাঘেঁসি ক'রে ব'সে আছে। মক্কেল ভেবে প্রথমটা ত' খুসিতেই লাফিয়ে উঠেছিলাম। পরে ভাল ক'রে চেয়ে দেখি মক্কেল ত' নয়ই, সুধা আর সে যণ্ডামার্কা ইতরটা! ছোঁড়াটা আমাকে যেন চেনেই না এমনি ভাবে সুধাকে ব'লে গেল: বহুদূরে যাচ্ছি, হপ্তায় দু'খানা ক'রে চিঠি লিখো কিন্তু। যাবে কোথা? পথ আটকালাম। বেটা এমন পাজি, বললে কি জান? বললে: গাইবান্ধা থেকে আমাদের একটা সেকেণ্ড আপিল

আছে, আপনাকে দিয়েই রুজু করাব ভাব্‌ছি। ফি সম্বন্ধে একটু বিবেচনা করবেন ত'? কি আর বলি তখন? বললাম: কাগজপত্র এনেছ নাকি? বেমালুম বললে: গলির মোড়ে মোটরে আমার দাদা অপেক্ষা করছেন। আপনি বাড়ি আছেন কি না জানতে এসেছিলুম। ছাড়ুন, দাদাকে ডেকে আনছি। ব'লে সেই যে গেল আর ফিরল না।

পরেশ কহিল,—ফিরল না মানে নথি-পত্র নিয়ে ফিরল না?

—হ্যাঁ, তাই। খানিকক্ষণ নীচেই অপেক্ষা করলাম। তারপর গলির মোড়টাও দেখে এলাম। কোথায় বা মোটর, কোথায় বা কে! বল, তুমিই বল,—এ জোচ্চুরি সহ্য হয় কারো? আমি পারলাম না সইতে। এসে আচ্ছা ক'রে মেয়েটাকে পিট্‌লাম।

পরেশ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল,—পিটলেন? এত বড় মেয়েকে? ওর দোষ কি?

মুখবিকৃতি করিয়া ভগ্নীপতি বলিলেন,—না ওর দোষ কি! যার-তার সঙ্গে গলাগলি করবে আর আমি তাই ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে দেখব! অভিভাবক হয়েছি খালি দুধ-কলা দিয়ে পুষতে নাকি,—শাসন করতে পারব না? চুলের মুঠি ধ'রে মাথাটা দেয়ালে এমন ঠুকে দিতে লাগলাম যে দস্তুরমত হাতের সুখ হ'লে তবে ছাড়লাম। কেরোসিনে দেহ পুড়িয়ে ছাই হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু মুখ পুড়িয়ে ওকে বাঁচতে দেব না। পায়ে ধ'রে প্রতিজ্ঞা করল আর কোনদিন ও-লোকটার ছায়া মাড়াবে না। নাকে খৎ দেওয়ালাম পর্য্যন্ত।

পরেশ কহিল,—এখন বেশ সায়েস্তা হয়েছে, না? বেশ শান্ত মেয়েটি—দেখে ত' মনে হয় বেশ বাধ্য, ঠাণ্ডা! পেটে-পেটে বুদ্ধি আছে নাকি?

দিদি কহিলেন,—তা আবার নেই! হাড়ে-হাড়ে শয়তানি! লুকিয়ে চিঠি-পত্র কোন্ না লেখে? খালি আমার সঙ্গে ঠোকাঠুকি বেধেই আছে। এই দেখ্ না একটু ডাল্‌না রাঁধতে ওর কত দেরি! এ মেয়েটাকে নিয়ে যে আমি কী বিপদেই আছি। একে খোঁড়া তায় নষ্ট! বলিয়া জান্‌লায় দাঁড়াইয়া কর্কশকণ্ঠে হাঁক দিলেন: সুধা! বলি তোর হ'ল?

কোন সাড়া নাই। সাড়া আসিল না বলিয়া পরেশ যেন একটু নিশ্চিন্ত হইল। দিদি কহিলেন,—দেখলে? সাড়া দেবার পর্য্যন্ত নাম নেই। স্বর সপ্তমে তুলিয়া আবার হাঁক দিলেন।

পরেশ কহিল,—অত জোরে চেঁচালে লোকে ভাববে তুমি সুধার জন্যে বুঝি বুক ফাটিয়ে শোক করছ!

এ-ডাকেরো সাড়া মিলল না। রাগে গর্‌গর্‌ করিতে করিতে দিদি নীচে নামিয়া গেলেন।

পরেশ কহিল,—বীরেনটা এত বজ্জাত! তা ত' জানতাম না! দাঁড়ান, আমার সঙ্গে দেখা হ'লে আমি ওকে ভীষণ ব'কে দেব। আমাকে কিন্তু ও-সব উল্টো করে বলেছিল।

ইহার মধ্যে কি-বা উল্‌টা করিয়া বলা যাইতে পারে তাহা ভগ্নীপতির ভাবিয়া নিবারও সময় হইল না। নীচে হইতে স্ত্রী চেঁচাইয়া উঠিয়াছেন: ওগো, সুধা কোথায় গেল?—সুধা!

কি-একটা অভাবনীয় বিপদ হইয়াছে ভাবিয়া দু'জনেই দ্রুত পায়ে নামিয়া আসিল—ভগ্নীপতি আগে, পরেশ পিছনে। আসিয়া দেখিল নীচে কোথাও সুধার চিহ্ন নাই। উনুনের উপর কড়াটা তেমনি বসানো, তরকারি পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া গেছে। ঘুঁটেগুলিকে রান্নাঘরের চারিদিকে কে হরির লুট দিয়াছে। কলতলাটা ফাঁকা, পাইখানার দরজাও ভেজানো নয়। আনাচ কানাচ কোথাও উঁকি মারিতে বাকি রহিল না। পাশের বাড়িতেও খোঁজ নেওয়া হইল। কাকস্য পরিবেদনা! সুধা কোথায়?

আধ ঘণ্টা পর পরেশ কহিল,—দাঁড়ান, আমি এক্ষুনি থানায় গিয়ে খবর দিয়ে আস্‌ছি। বলিয়া কাহারো কথায় কান না পাতিয়া সে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। গলি পার হইতেই বড় রাস্তায় সে একটা ট্যাক্সি পাইল। ট্যাক্সিতেই চাপিয়া সে হাঁকিল: হওড়া ষ্টেশন। হাতের ঘড়িতে দেখিল দেরাদুন একসপ্রেস ছাড়িতে এখনো দেরি আছে।

গাড়ি এখনো প্ল্যাটফর্মে আসিয়া দাঁড়ায় নাই। আট নম্বর প্ল্যাটফর্মের বাহিরে জনতার থেকে একটু দূরে সুধা আর বীরেন চুপ করিয়া চারিদিকে চোখ ফেলিতেছে—তাহাদের নিজেদের মধ্যে আর যেন কোনো কথা নাই। মাঝখানে পরেশ আসিয়া না দাঁড়াইলে তাহারা বুঝি পরস্পরের পানে অপলক চোকে চাহিতে পারিবে না।

ড্রাইভার হাতে করিয়া একটা বড় সুটকেস আনিয়া হাজির করিল। বীরেন আশ্চর্য্য হইয়া কহিল,—কি ওটা?

ড্রাইভার কহিল,—এটার মধ্যে আপনাদের জন্যে জামা-কাপড় আছে। গাড়িতেই ছিল।

—জামা কাপড় এল কোত্থেকে?

—সারা কলেজষ্ট্রীট্‌ ঘুরে পরেশবাবু রাজ্যের জামা-কাপড় কিনেছেন। শাড়ি-

সেমিজ ধুতি-চাদর—কত কি! আয়না চিরুনি ফিতে, পাঁচ সেল্-এর একটা টর্চ পর্য্যন্ত।

বীরেন স্বধার পানে চাহিয়া কহিল,—পরেশ কি-সব ছেলেমান্‌সি করেছে দেখ।

স্বধা বিস্ফারিত চোখে বিপুল জনস্রোতের কিনারা খুঁজিতেছিল। সব মিলিয়া চারিদিকে কেমন-যেন একটা ব্যস্ত বিশৃঙ্খলা চলিয়াছে; সবাই দিশেহারা! এত সব লোক কোথায় চলিয়াছে! ছোট-ছোট কোলাহল রাশীকৃত হইয়া যেন একটা শ্রুতিকটু আর্তনাদের মত কানে লাগে। স্বধা এ কান্নার অর্থ বোঝে না।

অনেকক্ষণ পরে বীরেনের কথা শুনিয়া সে চমকাইয়া উঠিল। কহিল,—কি?

স্বটকেসের দিকে আঙুল দেখাইয়া বীরেন বলিল,—পরেশের কাণ্ড! সঙ্গে এমনি ত' একটি জীবন্ত পুঁটলি আছে-ই, তার ওপর আরেকটা শাকের আঁটি এনে জোগাড় করেছে। এখন কোনো রকমে পালাতে পার্‌লে বাঁচি, তা না, আবার লটবহর!

স্বধা বলিয়া উঠিল: পালাবে, কিন্তু কাশীতে পৌছেই ত' তক্ষুনি কাপড় জামা ছাড়তে হ'বে। তার একটা ব্যবস্থা না ক'রেই ত' পালাচ্ছিলে। শেষকালে সেখানে গিয়ে করতে কি শুনি? কোথায় জামা-জুতো, কোথায় বা বিছানা-পত্র! তুমি এত বেশি হঠকারী হ'য়ে বিপদ বাধাবে দেখছি।

বীরেন অলক্ষ্যে স্বধার আরো কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া কহিল,—বিপদ আমার কেন জানি না ভারি ভাল লাগে। এক্‌বার ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে পারলেই হ'ল, সাঁতার কেটে পার আমি পাবই। হাতের সামনে কোনো কাজ পেয়ে তাকে ফেলে রেখে-রেখে দুশ্চিন্তায় ঘোলা বা ঘোরালো ক'রে তুলবো আমার অত সময় নেই, স্বধা। হঠকারী আমি নিশ্চয়ই, কিন্তু হটবো না। বীরেন হাত দিয়া দৃঢ়তাসূচক একটা ভঙ্গি করিল।

মৃদু ভীতস্বরে স্বধা কহিল,—কাশীতে বাড়ি ঠিক আছে?

বীরেন মুখভঙ্গি করিয়া কহিল,—অত পাঁজিপুঁথি দেখে চলবার আমার অভ্যেস নেই। বাড়ির ভাবনা তোমাকে করতে হবে না, কাশীতে বিস্তর হোটেল আছে।

স্বধা আঁৎকাইয়া উঠিল: হোটেল কি গো? সেখানে ভদ্রলোকে থাকে নাকি?

এমন অর্ব্বাচীনের মত কথার যে কি উত্তর দিবে বীরেন ভাবিয়া পাইল না। ততক্ষণে ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ঢুকিবার ফটকের সামনে একটা তুমুল ঠেলাঠেলি লাগিয়া গেল। স্বধা এক পা পিছাইয়া কহিল,—আমি পাঁচজন

ব্যাটাছেলের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে লোক হাসাতে পারবো না। এ তোমার কেমন ব্যবস্থা ?

বীরেন অস্থির হইয়া কহিল,—তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি! তোমাকে চিরকাল একটা হোটেলেই আটকে রাখবো নাকি? পরে সস্তায় একটা বাড়ি নেব নিশ্চয়ই। কাশী না পৌঁছুতেই তোমার সে ভাবনা কেন?

পুরুষের একখানা ইণ্টার-ক্লাশ কামরায় দু' জনে উঠিল। মন্দ ভিড় ছিল না। বেঞ্চির কোণে সঙ্কুচিত হইয়া সুধা বসিয়া আছে—ভয়ে গা তাহার ছম্‌ছম্‌ করিতেছিল। এতক্ষণে বাড়িতে না জানি কী হট্টগোল লাগিয়া গেছে! মামাবাবু এখানে যদি পুলিশ লইয়া আসিয়া পড়েন! সে কি তাহা হইলে এতগুলি লোকের সাম্‌নে উঁচু গলায় স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিবে: যাব না। এই বীরেনকেই আমি বরণ কর্‌লাম। নিজের অগোচরে সুধা বারকতক গলা খাঁখ্‌রাইল। মামাবাবু কি করিয়া জানিবেন যে, তাহারা কাশী চলিয়াছে। পরেশবাবু নিশ্চয়ই সে-সুযোগ আসিতে দিবেন না, গাড়ি-ছাড়ার সময় পর্য্যন্ত বাড়ির চৌকাঠ হইতে নড়িবেন না। কিন্তু কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার আগে তাঁহাকে আরেকবার না দেখিলে সুধার বড় আফশোষ থাকিবে। যিনি এত করিলেন, তাঁহাকে সামান্য একটু কৃতজ্ঞতার কথাও বলা হইল না। আবার কবে দেখা হয় কে জানে!

গাড়ি ছাড়িবার আর দেরি নাই, ছুটিতে ছুটিতে পরেশ আসিয়া হাজির। বীরেন প্ল্যাটফর্মে হাঁটিতেছিল, সহজেই তাহার দেখা মিলিল। দম নিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—স্যুটকেসটা উঠেছে? সুধা কোথায়?

বীরেন কহিল,—ভেতরে।

পরেশ কহিল,—কেমন বুঝছ? খুব নার্ভাস হ'য়ে পড়েছে?

—তা আর হবে না? বাঙালি মেয়ে, তায় নিতান্ত ছেলেমানুষ—কোনোদিন বাইরে বেরোয় নি।

পরেশ সায় দিয়া কহিল,—মুষড়ে পড়াই স্বাভাবিক। তবু বাইরে বেরুবার জন্য যে ওর সাহস হ'ল সেই জন্য ওর তেজস্বিতাকে প্রশংসা করছি, বীরু। সমাজের দিক থেকে ও যত অন্যায়ই করুক, ব্যক্তিত্বসাধনের পক্ষে এর চেয়ে বড়ো কৃতিত্ব আর কী হ'তে পারে?

বীরেন হাসিয়া কহিল—এটা প্ল্যাটফর্ম বটে, কিন্তু বক্তৃতার নয়, পরেশ।

পরেশ গম্ভীর হইয়া কহিল,—সত্য ক'রে যা অনুভব করেছি কথায় তা ব্যক্ত করতে গেলেই বক্তৃতার মত শোনায়। ও আমার ভারি দোষ। কিন্তু কি করি বল, না ব'লে পারিও না থাকতে। ডাক ত' সুধাকে। ওকে একটা উপহার দেব।

ভিতরে মুখ বাড়াইয়া হাতছানি দিয়া বীরেন সুধাকে ডাকিল : পরেশ এসেছে।

ভয় না আনন্দ সুধা প্রথমে ঠিক ঠাহর করিতে পারিল না। এমন একটা রোমাঞ্চময় অনুভূতির হয় ত' ভাষা নাই। যাহা কিছু অপ্রত্যাশিত, তাহারই অন্তরালে বোধ করি ক্ষুদ্র একটি আঘাত থাকে। সুধা ধড়ফড় করিয়া খোলা দরজা দিয়া নামিয়া পড়িল—পরেশ যেন তাহাকে বাড়িতে ফিরাইয়া নিতে আসিয়াছে। ফাঁকা জায়গায় আসিয়া সুধা হাঁপ ছাড়িল। বাঁচিয়াছে।

সত্যই, সামান্য এতটুকু সময়ের মধ্যে সুধা গরমে ও দুর্ভাবনায় একেবারে ঘামিয়া উঠিয়াছে। বাড়ি ফিরিয়া গেলে তাহাকে হয়ত অমানুষিক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু সেখানে হয় ত' এমন অস্বস্তিকর বিমূঢ়তা নাই। মুক্তির নামে এমন একটা জটিল গোলমেলে ব্যাপারের চেয়ে পিঠের উপর দুইটা লাথি খাওয়াও সোজা। সহজেই তাহার মীমাংসা হয়; নিঃশব্দে খানিকটা অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেই তাহার সমাধান মেলে। এমন পাকা বাঁধানো রাস্তা ফেলিয়া সে কেন গলি-ঘুঁজিতে মরিতে চলিয়াছে।

সুধা মুখ ফুটিয়া কিছু বলিয়া বসিত হয় ত', কিন্তু তাহার আগেই পরেশ ব্রাহ্ম আচার্য্যের ঢঙে একটা আশীর্ব্বচন আওড়াইয়া সব মাটি করিয়া দিল। সামান্য আটপৌরে শাড়িখানিতে মেয়েটিকে এমন স্নিগ্ধ লাগিতেছে যে বলা যায় না। যেন শ্রাবণের স্তিমিত অশ্রুসিঞ্চিত সন্ধ্যায় অনতিস্ফুট একটি ম্লান অপরাজিতা। এতদিন শহরে থাকিয়াও চোখে-মুখে এমন একটি অপ্রগল্‌ভ শ্যামল গ্রাম্যতা আছে যে সুধাকে বর্ষার আকাশের মতই পরেশের কাছে একটা দেখিবার জিনিসের মত মনে হইল। সুধা ঠিক বাঙালি মেয়ে—তেমনি একটা কুণ্ঠার কুয়াসা মাখিয়া নিজেকে এতটা মন্থর ও মধুর করিয়া তুলিয়াছে। ভুরুর উপর ছোট একটি কাটার দাগ চোখের দৃষ্টিকে অর্থবান করিয়াছে; সামান্য একটু খোঁড়াইয়া না চলিলে তাহার গতিলাবণ্য মলিন হইয়া পড়িত। এমন ছোট দু'খানি পা যে, মুঠির মধ্যে ভরিয়া লওয়া যায়!

পরেশ হঠাৎ তাহার পকেট হইতে একটা ছোরা বাহির করিয়া কহিল,—এই অস্ত্রটা তোমাকে উপহার দিচ্ছি, সুধা। এর মতই তোমার ভালবাসা তীক্ষ্ণ ও প্রবল হোক। যে মহৎ পরীক্ষায় তুমি ঝাঁপ দিলে তাতে আত্মরক্ষার জন্যে খালি নিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়, অস্ত্র চাই। প্রয়োজন হ'লে প্রয়োগ করবার শক্তি পাও তোমাকে আমি এই আশীর্ব্বাদ করি।

পরেশের মুখে এই সব লম্বা-চওড়া কথা শুনিয়া ও ষ্টেশনের ইলেকট্রিক আলোতে ছোরাটাকে ঝিক্‌মিকাইতে দেখিয়া সুধার মনের কথা জিভের ডগায় আসিয়া

শুকাইয়া গেল। মনের কত করিয়া একটি কথাও সে কহিতে পারিল না। ছোরা দেখিয়া তাহার বুদ্ধি আবার ঘুলাইয়া উঠিয়াছে। হাত পাতিয়া সে তাহা নিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে-হাত উহা বাড়াইয়া দিয়াছিল তাহা ধরিয়া এই বিরাট অন্ধকূপ হইতে বাড়ির মুখে বাহির হইতে পারিলেই সে বাঁচিত বোধ হয়। ছোরা সুধার সেমিজের তলায় খাপের মধ্যে রহিল সত্য, তবু তাহার ভয় যাইতেছে না। সে বলিয়া বসিল : আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে।

পরেশ হাসিয়া কহিল,—আমি গিয়ে তোমাদের সকল আনন্দ পণ্ড ক'রে দি আর কি! তা ছাড়া আমার ছুটি কোথায়! আমি এখানেই আছি; দরকার হ'লে ঠিক আমার দেখা পাবে।

সুধা কহিল,—কবে দরকার হবে ঠিক বুঝব কি ক'রে?

পরেশ কহিল,—দরকার যাতে না বোঝ তাই ত' ভালো। অকারণে পরের সাহায্য নেওয়ায় গৌরব নেই। তুমি এই যে নিজের সত্যোপলব্ধির প্রেরণায় সমস্ত বন্ধনমুক্ত হয়ে বাইরে এলে পুরাণে তার মাত্র একটি উদাহরণ আছে—সে সাবিত্রী। সত্যবানের অকালমৃত্যু হবে জেনেও তার প্রেম ভ্রষ্ট হয় নি। মৃত স্বামীকে সে ফিরে পেয়েছিল এই তার সতীত্বতেজের বড় পরিচয় নয়, স্বামীকে ভালবেসে সে অকাল-বৈধব্যের ব্যর্থতা হাসিমুখে বহন করতে পারবে সে-প্রতিজ্ঞাই তার সত্যিকারের সতীত্ব। বীরেনের প্রেমের প্রতি তোমার তেমনি প্রখর প্রতিজ্ঞা হোক। ওঠ, আর দেরি নেই, গার্ড এখুনি ফ্ল্যাগ নাড়বে।

দু'টি মুহূর্ত্তের জন্য সুধা সামান্য একটু ইতস্তত করিল ও সেই ধূলিলিপ্ত প্ল্যাট-ফর্মের উপরেই পরেশের পায়ের কাছে উবু হইয়া প্রণাম করিয়া বসিল। পরেশ এমন হকচকাইয়া গেল যে পা দুইটা সরাইয়া নিতে পারিল না। এই প্রণাম সুধা যে হঠাৎ কেন করিল, তাহা ঠিক বীরেনের প্রতি তাহার ভালবাসার অবিনশ্বরতা প্রার্থনা করিয়াই বা কি না—বীরেনের অত-শত ভাবিবার সময় ছিল না। এই দৃশ্যটিতে তাহার সামান্য একটু ঈর্ষা হইল। সুধা তাহাকে প্রণামের চেয়েও বেশি দিয়াছে, কিন্তু চুম্বনের মাদকতার চেয়ে প্রণামের স্নিগ্ধতায় বেশি কবিত্ব! চুম্বনের নৈকট্যটা অতিমাত্রায় প্রখর, প্রকাশিত—প্রণামের অদূরবর্ত্তী আত্মীয়তার মধ্যে অপরিচয়ের একটা সূক্ষ্ম অন্তরাল আছে, তাহা রহস্যঘন!

গাড়ি ছাড়িলে গাড়ির সঙ্গে চলিতে চলিতে পরেশ বীরেনকে কহিল,—পৌঁছেই চিঠি লিখো। ছুটি নিয়ে আমি শিগগিরই যাব'খন। পরে সুধাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—আচ্ছা আসি, নমস্কার। কোনদিকে তোমার ভাবনা নেই, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

সুধা জানালা দিয়া ভাল করিয়া মুখ বাড়াইতেছিল, বীরেন তাহাকে প্রায় জোর করিয়াই বেঞ্চির উপর বসাইয়া দিল। এইবার সুধার ঠিক চোখে ঠেকিল যে তাহারা চলিয়াছে। পরিচিত আবাস পরিচিত আত্মীয়বন্ধু সব পিছনে পড়িয়া রহিল। কোথায় চলিয়াছে! একবার কি ভাবিয়া বীরেনের মুখের পানে তাকাইল, অন্ধকারে তাহাতে একটি অক্ষরো পড়িতে পারিল না।

কাশী!

বীরেনের হাতের ঠেলায় সুধা জাগিয়া উঠিল। বাহিরের রৌদ্র ঘুমের কুয়াসাটুকু অপসৃত করিতে পারে নাই—ঘুমাইয়া-ঘুমাইয়া সে আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখিতেছিল। কাহারা যেন তাহাকে বাঁধিয়া নিয়া চলিয়াছে, কে যেন আসিয়া তাহার বন্ধন খুলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল: শিগ্‌গির পালাও,—যে দিকে চোখ যায়! সুধা ছুটিতে চায় অথচ ছুটিতে পারে না। ডাকাতের দল তাহার পিছু নিয়াছে। হাত বাড়াইয়া এখুনি ধরিয়া ফেলিবে। হঠাৎ বীরেন তাহার ঘুম ভাঙাইয়া তাহাকে রক্ষা করিল।

বীরেন কহিল,—পরের ষ্টেশন বেনারস ক্যান্টন্‌মেণ্ট—আমরা সেখানে নামব।

সুধা ভীত হইয়া কহিল,—কেন, এই ত' কাশী!

—এখান থেকে সহর ঢের দূর, পরে নামলেই সুবিধে। তোমার খুব বুঝি খিদে পেয়েছে?

সুধা হাসিয়া কহিল,—তা কি আর পেয়েছে? ভালবাসার বদলে ভাত পেলে আমি এখন বেঁচে যেতাম। ষ্টেশন থেকে তোমার হোটেল কত দূর?

বীরেন ব্যস্ত হইয়া কহিল,—তার জন্য তুমি ভাবছ কেন? ষ্টেশনে নেমেই অনেক হোটেল-ওয়ালার সঙ্গে দেখা হবে। তখন কথাবার্ত্তা ক'য়ে একটা ঠিক ক'রে নেব'খন।

চক্ষু বড় করিয়া সুধা কহিল,—বল কি? বিরানা জায়গায় মেয়ে-ছেলে নিয়ে একটা অচেনা হোটেলে তুমি বাসা পাত্‌বে? লোকে বল্‌বে কি?

বীরেন কহিল,—তোমার কাছে এমন একটা অনিশ্চয়তা খুব মোহময় লাগে না? দু'দিন আগে কে ঠিক ক'রে রেখেছিল যে আঁচলের গিঁট না বেঁধেও এক সঙ্গে ভেসে পড়্‌বে? অচেনা জায়গা বলেই ত' হোটেল আমাদের আশ্রয়। লোকে কি বল্‌বে সে ভয় যদি তুমি এখনো রাখ তবে এই কাশীধামের সকল মাহাত্ম্যই নষ্ট হয়ে যাবে, সুধা। আমি যখন তোমার সঙ্গে আছি তখন তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমাকে বুঝি এখনো তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?

সুধা আশ্বস্ত হইল—বীরেনের মনে এই সন্দেহের অস্পষ্ট ছায়া পড়িয়াছে! বীরেন একটু সন্দিগ্ধ হইলে সুধার মনে জোর আসে। সে বীরেনের একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া গদ্‌গদ্‌স্বরে কহিল,—পাগল! তোমার মত ভগবানকেও আমি বিশ্বাস করি না! তোমার জন্য আমি সব ছাড়লাম,—সব!

—সে সব ছাড়তে বুঝি তোমার কষ্ট হচ্ছে?

—একটুও না! সে-ঘরের মূল্যই বা কী ছিল? ছি! প্রথার দাসত্ব করতে হয় ব'লে মেয়েমানুষকে পাথর হয়ে থাকতে হ'বে এমন দৈন্য আমি তোমাকে পেয়ে সইবো কি ক'রে? সে-জন্য আমার কোনোকালে অনুতাপ হবে না। বলিয়া সুধা একটা নিশ্বাস ফেলিল।

ক্ষণকালের জন্য সুধার সৌম্য প্রশান্ত মুখের উপর এমন একটি শীতল বিষাদের ছায়া পড়িল যেন উচ্চারিত কথার অন্তরালে কোথায় একটি সঙ্কেত উহ্য রহিয়াছে। দুইটি চোখের শুভ্রতায় একটি সলজ্জ কুণ্ঠা একটু কাঁপিয়া ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। বীরেনের হাতের উপর জোরে আরেকটু চাপ দিয়া সুধা কহিল,—তোমার হাতে আমার জীবন ত' দিলাম-ই তার চেয়েও অনেক বড়ো জিনিস দিতে কার্পণ্য করলাম না। আমি মান-সম্ভ্রম জাতি-কুল কিছুই বড়ো ক'রে দেখি নি। কিন্তু জীবনে হয় ত' আমিও নূতনতর সম্ভাবনার প্রত্যাশা করতাম। আমি স্বচ্ছন্দে আজ সমস্ত প্রত্যাশা তোমার হাতে তুলে দিলাম!

এমন পরিপূর্ণ সমর্পণের আভাস পাইয়া বীরেন আশ্বস্ত হইল। কহিল,—তোমার জন্য আমারো স্বার্থত্যাগের পরিমাণটা বিচার ক'রে দেখো। বাপ-মার আমি বড় ছেলে, আমাকে দিয়ে বাবা অর্দ্ধেক রাজত্বলাভের স্বপ্ন দেখেন; এ-খবর পেলে তিনি কতদূর আহত হবেন তা আমি ভাবতেও পারি না। মা পাগল হয়ে যাবেন হয় ত'। তবু এ-ছাড়া উপায় ছিল না, সুধা। জীবনে বৃহত্তর উপলব্ধির সুযোগ সহজে আসে না, কঠিন সঙ্কল্পের মধ্যে তাকে অধিকার না করতে পারলে জীবনের আদর্শ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আসে। সেইখানেই আমাদের অপঘাত মৃত্যু ঘটে। সেই অপঘাত মৃত্যু থেকে আমরা পরস্পরকে উদ্ধার করব। কি বল? এই যে—এইবার নামতে হবে।

ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও কোনো হোটেল-ওয়ালার দেখা মিলিল না। বীরেন কহিল,—একটা টাঙা ক'রে দশাশ্বমেধ-ঘাটের দিকে গেলেই হোটেল একটা মিলে যাবে। সেখানে গিয়ে একদিন থেকে পরের সব ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ফেলব।

ওভার-ব্রিজ এর উপরে উঠিয়াছে এমন সময় একটি ভদ্রলোক আসিয়া উহাদের

সম্বোধন করিল : আপনারা হোটেল নেবেন? বাঙালি হোটেল, মশাই। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের কাছেই—ত্রিপুরা-ভৈরবী। ও-সব মেড়োর হোটেলে যাবেন না, মশাই। আমাদের ওখানে দোতালায় দিব্যি ঘর পাবেন। ফি-রোজ ঘর ভাড়া মাত্র পাঁচ সিকে। চলুন। হোটেলের গাড়ি মজুত আছে। বলিয়া একটা ছাপা কার্ড প্রসারিত করিয়া ধরিল।

সব বৃত্তান্ত শুনিয়া বীরেনের পছন্দই হইল হয় ত'। বলিল,—জল পাব ত', মশাই? রাত্রে আমরা কিন্তু লুচি খাই।

—সব হবে, মশাই। যখন যা চাইবেন তখুনি তাই মিলবে। বাঙালি হ'য়ে আমাদের নূতন কারবার যদি আপনারা না দেখেন ত' কোথায় যাই?

ভদ্রলোকটি বেশ অমায়িক। কিসের জন্য একবার জেল খাটিয়া আসিয়া আর কোন চাকরি মিলে নাই বলিয়া এই হোটেল ফাঁদিয়াছেন। দেখিতে যেমনি কৃশ, তেমনি ঢ্যাঙা। পাঞ্জাবির ঝুল হাঁটুর কাছে নামিয়াছে। মাথার পেছন ও ধার দুইটা ক্ষুর দিয়া চাঁছিয়া একেবারে চামড়া বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। পান খুব বেশি খায় বলিয়া কথার মধ্যে একটা জড়তা আছে, তাহাতেই কথাগুলি খুব পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠে না। হোটেলের স্বত্বাধিকারী সে নিজেই। নাম হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়।

লোকটাকে দেখিয়া সুধা প্রসন্ন হইল না; তবু দু'-একদিনের জন্য এত খুঁটিনাটি বাছবিচারের কোনো মানে হয় না। হেমন্তবাবুকে অনুসরণ করিয়া উহারা টাঙায় উঠিল।

গলির মধ্যে হোটেল। বাড়িটি পুরানো, নড়বড়ে। নীচের উঠানটায় রাজ্যের ময়লা জড়ো করা হইয়াছে। তাহারই স্তূপ ডিঙাইয়া হেমন্তবাবু বীরেন ও সুধাকে উপরে লইয়া আসিল। হোটেলের মাঝে হঠাৎ একটি ব্রীড়াবনতমুখী মেয়েকে দেখিয়া অন্যান্য অতিথিরা সব চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, আগোচরে পরস্পরের মধ্যে গোটা কতক চাউনির বেতার চলিয়া গেল। একজন হাতের তালুটা উল্টাইয়া কহিল,— কলিকালের কেলি!

আরেক জন সায় দিল : আছে বেটা বিশ্বনাথ, কাশীতে কেউ আর কারুর তোয়াক্কা রাখে না। গঙ্গার জলে কলঙ্ক মোছে!

উপরে আসিয়া দেখিল ঘরটি ছোট, দক্ষিণে দুইটি জানালা আছে। মন্দ না, দুই জনের চলিয়া যাইবে যা হোক্। দু' একদিন বৈ ত' নয়। তবে আরেকটা ছোট তক্তপোষ ফেলিতে হইবে। হেমন্ত আমৃতা আমৃতা করিয়া কহিল,— উনি ত' আপনার স্ত্রী, না?

বীরেন কহিল,—হ্যাঁ। তবু দুইখানি চৌকি চাই।

—আচ্ছা আচ্ছা; সে আবার এমন কি কথা? আপনারা বিশ্রাম করুন, ওপরে চাকর পাঠিয়ে দিচ্ছি।

হেমন্ত নীচে নামিলে সবাই তাহাকে ছাঁকিয়া ধরিল: কি ব্যাপার হে ম্যানেজার?

ম্যানেজার বলিল,—এমন আবার কি! ও ত হামেসাই হচ্ছে। তবে মেয়েটাকে মনে হ'ল নেহাৎ কচি—ভদ্রলোকেরো সবে হাতে-খড়ি। মাথায় সিঁদুর নেই তবু বলা হ'ল কিনা ই-স্ত্রী। অমন ই-স্ত্রী আমরা ঢের দেখেছি। কি বল হে নটবর?

নটবর, হোটেলের বাজার করে। ঠিক চাকর নয়। হিসাব রাখে, তদারক করে, বিকালের চা বানায়। সে দাঁত বাহির করিয়া বলিল,—তা আর বলতে। কিন্তু এখেনে ওদের নিয়ে একটা কেলেঙ্কারি যেন না হয়। ওদের সামলে দিতে হবে, ম্যানেজার। শেষকালে পুলিশের হাঙ্গামায় পড়লে হোটেল-কে-হোটেলই লোপাট হয়ে যাবে।

ম্যানেজার তবু রসিকতা করিতে ছাড়িল না: ওপরে আবার দু'খান খাট চাই বাবুদের—ঘর কিন্তু একটা। দরজায় খিল পড়লে এক খাটে আর এমন-কি অকুলান হবে। ই-স্ত্রী যখন! বলিয়া লোকটা বিকট-শব্দে হাসিয়া উঠিল: যাও হে নটবর, বাজারটা ঘুরে এস। এই রইল ফর্দ্দ।

দক্ষিণের জানলা দুইটা খুলিয়া দিলে বহু দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত হইবে ভাবিয়া সুধা জানলা খুলিল। কিন্তু উদ্যতশাসন প্রহরীর মত একটা বিপুলকায় প্রাচীর সঙ্কীর্ণ গলির ওপরে বাধা বিস্তার করিয়া আছে। এ ধারটাতে কাহাদের বাসা—একটা তারের বেড়া দেওয়া জানালার মধ্য দিয়া লোকজনের যেটুকু আভাস পাওয়া গেল তাহাতে মনে হইল বাঙালিরই। সুধার ভয় করিতে লাগিল, কে জানে যদি উহারা তাহাদের ধরাইয়া দেয়। লোকজনের সঙ্গে বন্ধুতা করিবার সখ উহার নাই; বীরেনের শিগগির একটা হিল্লে হইলেই হইল। বাড়ির শাসন একটু শিথিল হইলেই উহারা আবার কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে—বীরেনের পশ্চাদ্বর্ত্তিনী সুধা, সীমন্ত সিন্দুরলিপ্ত—সর্ব্বাঙ্গে ব্রীড়ার রক্তিম সুষমা। বীরেন তাহার সম্মুখে থাকিলেই চিরকালের জন্য তাহার মুখরক্ষা হইবে। পৃথিবীতে আর কিছুই তাহার চাহিবার নাই।

বীরেন কহিল,—জান্‌লা বন্ধ করলে কেন?

সুধা কহিল,—বড্ড রোদ এসে পড়ছে। তখন ত' সাত-তাড়াতাড়ি ছুটে

পালিয়ে এলে, একটা বিছানাও সঙ্গে আনো নি। এখন কি পাতবে তক্তপোষের ওপর ?

বীরেন কহিল,—পকেটে পয়সা থাকলে বিছানা পিছিয়ে থাকে না। তা ছাড়া বিশেষ বাবুগিরি ক'রে পয়সা ওড়াবার সময় এখনো আসেনি। পরেশের টাকা না আসা পর্য্যন্ত একটু কষ্ট হয় ত' হবে।

সুধা বিরক্ত হইয়া কহিল,—তার জন্য খালি তক্তপোষে কাঠের ওপরই শোব নাকি? যদি না-ই বা হ'ল, একটা কাঁথা ও বালিশ ত' অন্তত চাই।

হয় ত' চাই, কিন্তু যে-মেয়ে ভালবাসিয়া ঘর ছাড়িয়াছে তাহার মুখে অন্তত আজিকার জন্য এমন একটা রূঢ় সত্য কথা না শুনিলেই হয় ত' বীরেন খুসি হইত। প্রেম অর্থই যে তপস্যা, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা এ সম্বন্ধে সুধা এখনো সচেতন হয় নাই দেখিয়া তাহার ভালবাসা যে নিবিড় নয় এমন একটা সন্দেহও বীরেনের মনে ঘনাইয়া উঠিল। তবু স্বর নরম করিয়াই কহিল,—কিন্তু সত্যি যদি কাঁথাও আমাদের কপালে না জোটে তা হ'লে আমাকে তুমি ত্যাগ করবে নাকি, সুধা ?

সুধা সুটকেসটা খুলিতে খুলিতে কহিল,—তোমাকে ত্যাগ ক'রে আর কোন্ চুলোয় যাব শুনি ? একবার হাত যখন ধরেছি তখন তোমার নাগাল পাই বা না পাই সে হাত আমার আঁকড়েই থাকতে হবে। কিন্তু পথের যারা ভিখিরি তাদেরো শোবার জন্য একটা বালিশ থাকে।

বীরেন স্বচ্ছ স্বাভাবিক স্নেহে হাসিয়া কহিল,—কিন্তু প্রেমের যারা ভিখিরি তাদের কিছু না থাকলেও কিছু এসে যায় না। ভাবছ কেন, আমার জঙ্ঘা তোমার উপাধান হবে ; আমার আদর হবে তোমার সুখশয্যা।

সুধা ঝট করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও তৎক্ষণাৎ তক্তপোষের একটা প্রান্ত শূন্যে তুলিয়া পুনরায় সশব্দে মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া কহিল,—দেখ দেখ, ছারপোকার কেমন মিছিল চলেছে। এই তোমার সুখশয্যা ? যাই বল, বিনি-বিছানায় আমি শুতে পারবো না ককৃখনো।

বহু বৎসরের মৌরসি স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হতভাগ্য ছারপোকাকুল মেঝের উপর কিলবিল করিতে লাগিল। তবু, চোখের সমুখে তাহা দেখিয়াও সুধার এই নিষ্ঠুর মন্তব্যটা বীরেনের সহ্য হইল না। বিরক্ত হইয়া কহিল,—আচ্ছা আচ্ছা হবে, সোনার খাটে শুয়ে রূপোর খাটে পা রাখবার ব্যবস্থা আমি করছি। মামা-বাড়িতে কিসে শুতে ? হাতীর হাওদায় ?

সুধা কোনই উত্তর দিল না। নিঃশব্দে সুটকেসের ডালাটা খুলিয়া বোঝাই-করা রাজ্যের জিনিসপত্র লইয়া হাঁপাইয়া উঠিল। তাহার চোখের সামনে এই ছোট বাক্সটা যেন কুবেরের ভাণ্ডার খুলিয়া ধরিয়াছে। সব জিনিসের নামও সে জানে না। একটা ধুপদানি পর্যন্ত আছে। চন্দনকাঠের তৈরি। তাহার নীচে ছোট একটি কাগজের টুকরা আঠা দিয়া আটকানো। তাহাতে একটুখানি লেখা : ঘুমাইয়া পড়িবার আগে শিয়রে ধূপকাঠি জ্বালাইয়া রাখিয়ো। স্মৃতির মত ধীরে ধীরে ইহার সুগন্ধ অস্পষ্ট হইয়া আসিবে।

বীরেন ধমক দিয়া কহিল—স্নান করতে হবে না? ভোর হয়েছে, মুখও ত' ধোও নি এখনো। সমস্তদিন এগুলিই ঘাটবে নাকি?

—কী এমন গণেশ উল্টোবে? আজ ত' আমি ছাড়া পেয়েছি, দুপুর হ'তে না হ'তেই স্নান করতে হবে এমন-সব ধরা-বাঁধা নিয়ম আর আমার ওপর খাটবে না। দাঁড়াও, দেখেছ কী সুন্দর ব্লাউজের এই ছাঁটটা। কাশ্মীরি শাড়ির আঁচলটা দেখেছ? কত রকম দিশি স্নো-ই যে বেরিয়েছে। চামড়ায় একটু ঘসতে না ঘসতেই মিলিয়ে যায়। এস না, তোমার মুখে একটু মাখিয়ে দি। তোমার চামড়ায় অবশ্যি শিগগির মেলাবে না। গণ্ডারের চামড়া।

শেষোক্ত রসিকতা করিবার সময় হয় ত' এখনো আসে নাই। বীরেন তাহার পূজারী মাত্র, অধিকারী নয়। তাই সেও ঠাট্টা করিল, এবং সেই ঠাট্টার ঝাঁজ সুধা সহজে হজম করিতে পারিল না : আর তোমার বুঝি শূয়োরের চামড়া! নিজের রূপের ছিরি নিজে ত' আর ঠাওরাও না, তাই খোঁড়া পা নিয়ে পাহাড় ডিঙোতে চাও। কিন্তু হোটেলের চাকরগুলো ত' তোমার কথায় উঠবে বসবে না, অতগুলো চাকর রাখ্‌বার মুরোদও তোমার হয়নি। ওসব ছাইপাঁশ রেখে স্নান কর গে। বাসিমুখ আর বার করো না। ওঠ, আমাকে আবার বেরুতে হ'বে।

—বেরোও না। কে তোমাকে ধ'রে রাখছে? সুধাও খেঁকাইয়া উঠিতে জানে : যাব না চান করতে। কি করবে তুমি?

বীরেন দেখিল গতিক সুবিধার নয়। কথার পিঠে কথা বলিতে গিয়া এমন জায়গায় সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে আরেক পা অগ্রসর হইতে গেলেই তাহাকে মহাশূন্যে পদস্খলন করিতে হইবে। সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি সুধার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া তাহার খোঁপায় হাত দিয়া একরাশ চুল পিঠের উপর ভাঙিয়া ফেলিল। কহিল,—রাগ করো না, সুধা। বাঃ, কী সুন্দর এই শাড়ির পাড়টা! এই রঙটা তো তোমাকে ভারি মানাবে! এই বুঝি সেই টর্চটা? দেখি। হঠাৎ উঠিয়া বীরেন দরজাটা বন্ধ করিয়া দিতেই ঘর অন্ধকার হইয়া গেল। তাহার পর টর্চ

টিপিয়া এক ঝলকে ধাঁধাঁলো আলো সুধার মুখের উপর ফেলিয়া কহিল,—বাঃ, কী সুন্দর তোমাকে দেখতে!

টর্চ হইতে আঙুলটা সরাইয়া নিতেই ঘর আবার পুঞ্জ-পুঞ্জ অন্ধকারে ভরিয়া উঠিল। সুধার স্বর শোনা গেল: ছাড়, ছাড়, কি যে তুমি বাঁদর হয়েছ! দিনকে রাত ক'রে ছাড়বে।

বীরেন হিসাব করিয়া দেখিল গণ্ডার হইতে বাঁদর অধিকতর ভদ্র সম্বোধন। তা না হইলে কত কাল আগেই ডারউইন-এর বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা আনা যাইত। সুধাকে ছাড়িয়া দিয়া সে দরজাটা খুলিয়া দিল।

সুধা বলিল,—কলে জল পাব এখন? কাশীতে কলের জল কখন বন্ধ হয়? ভাত এখেনেই দিয়ে যাবে ত'? কাপড় শুকোব কোথায়? খেয়ে-দেয়েই কিন্তু বেড়াতে বেরুব। আরেকটা বাড়ি ঠিক করবে না? এ-ঘরে ভদ্রলোক টিকতে পারে না। বেছে-বেছে কী হোটেলেই যে আনলে। ম্যানেজারটি যেন একটা বক। আর তুমি একটি ওজবুক। পরেশবাবুর কাছে থেকে আবার টাকা চাওয়া কেন? বিছানা না হয় নাই হবে। পারতপক্ষে পরের কাছে সাহায্য নিতে নেই। শোন নি পরেশবাবুর উপদেশ?

বীরেন কহিল,—শুনেছি। তোমায় মাথা ঘামাতে হ'বে না, বুঝলে?

—না, ঘামাতে কি আর হ'বে? আমি বুঝি তোমার কেউ নই?

বীরেন তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল,—তুমি আমার সব।

দরজার বাহিরে শব্দ হইতেই বীরেন সুধাকে ছাড়িয়া দিল। ছিটকিনিটা খুলিয়া দিতেই ঘরে ঢুকিল চাকর—হাতে ছোট একটা কাগজের পুঁটলি।

বীরেন কহিল,—ও! কত নিলে?

চাকর কহিল,—ছ' পয়সা বাবু।

—ছ' পয়সা কি রে? এক বাণ্ডিল সিঁদুরের দাম ছ' পয়সা? তিন পয়সার এক আধলা বেশি নয়। চল দোকানে ফিরে—আয় আমার সঙ্গে।

সুধা ঠোঁট কুঁচকাইল: সামান্য তিন পয়সার জন্যে ঝগড়া করতে তোমার ভাল লাগে? কিন্তু সিঁদুর কি জন্যে?

বীরেন রাগ করিয়া কহিল,—তিন পয়সা তোমার সামান্য হ'ল? জান আমার ব্যাগে মোটে আর সাড়ে ন-আনা পয়সা আছে। তুমি আবার এমন বাবু হয়েছ যে, গদিতে না শুলে তোমার গতর থাকে না। তাতেই সাড়ে সাতটাকা বেরিয়ে গেছে।

ময়লা কাপড়-চোপড়গুলো যে কাল ধোবাবাড়ি থেকে ধুইয়ে আনব তার পর্য্যন্ত সম্বল নেই। তুমি কী বুঝবে?

সুধা চাকরকে কহিল,—তুই যা এখন। ম্যানেজারকে বলিস রাত্রে আমি খাব না।

চাকরটা চলিয়া যাইতেই বীরেন বলিয়া উঠিল,—কেন, রাত্রে খাবে না কেন?

বিমর্ষমুখে সুধা কহিল,—আমার খিদে পায় নি।

—খিদে পায় নি মানে? এখন ত' সবে সন্ধ্যা—রাতের খাবার খেতে এখনো তিন-চার ঘণ্টা বাকি।

—খিদে আমার তিন-চার ঘণ্টা পরেও পাবে না।

সুধার মুখ কালো, থমথমে। বীরেন তাহার একখানা হাত নিজের হাতের মুঠায় তুলিয়া নিয়া কহিল,—তুমি আবার রাগ করলে বুঝি। আগের মত আবার তাহার ঈষন্নমিত পিঠ নিজের কাঁধের কাছে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—তোমাকে নিয়ে আর পারি না।

বীরেনকে হঠাৎ ঠেলিয়া দিয়া সুধা উঠিয়া দাঁড়াইল: কে তোমাকে গদি আন্‌তে বলেছে? বেরবার আগে মনে থাকে নি যে শেষ পর্য্যন্ত ব্যাগে তোমার সাড়ে ন-আনা পয়সার বেশি ধরবে না? খোঁড়া পা নিয়ে আমিই কেবল পাহাড় ডিঙোতে চাই, না? সামান্ত তিন পয়সার জন্যে যার এত নাকে কান্না, না খেয়ে আমি তার পয়সা বাঁচাবো। কোনদিন খাব না, কক্‌খনো না।

বীরেনের ইচ্ছা হইল সুধার গালে তৎক্ষণাৎ ঠাস করিয়া একটা চড় মারিয়া বসে। এ কী লক্ষ্মীছাড়া, অবুঝ মেয়ে! অথচ খানিক আগেই এই নিভৃত নিরালায় সন্ধ্যাকালটি কেমন রহস্ত-রঙিন হইয়া উঠিয়াছিল! সে কি তাহার মরিবার আগে বিলীয়মান বর্ণচ্ছটা নাকি। খানিক আগেই সুধা নিজ হাতে নতুন বিছানাটা সুন্দর করিয়া পাতিয়াছে। ম্যানেজার বলিয়া গেল: আলাদা তক্তপোষ আর পাওয়া যাইবে না, উপরি ভাড়া দিলে ছুতোরের দোকান থেকে জোগাড় হইতে পারে। বীরেন একটা মাদুরের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সুধা বলিয়াছিল: তার মানে, ঠাণ্ডা মেঝেয় শুয়ে জর ক'রে তুমি খাটে উঠে এস। তখন ত' আর আমার মেঝের ওপর নেমে গেলে চলবে না, তোমারই পাশে ব'সে সেবা করতে হবে। খাটে যখন উঠ্‌তেই হবে তখন আর আমাকে অস্পৃশ্ত ক'রে রেখে লাভ কি? হাসিয়া হাসিয়া সুধা বিছানার উপর পাশাপাশি বালিশ গুছাইয়াছে। নরম পুরু বিছানার উপর বসিয়া কেরোসিন-কাঠের টেবিলটা সামনে টানিয়া তাহারা এখন চা খাইতেছিল। সুধা টেবলম্যানার্স জানে না বলিয়াই চা খাইবার সময়ে ঠোঁট ও জিহ্বার সজ্যাতে

একটা বিশ্রী শব্দ করিতেছিল—সেই শব্দে সূক্ষ্ম একটি মাদকতা আছে। চায়ের পেয়ালা ছাড়িয়া বীরেন সুধার ঠোঁটের পেয়ালায় চুমুক দিবার জন্য মুখ বাড়াইল—যেন চারিদিকের ইটের দেয়ালগুলো পর্য্যন্ত প্রাণময় হইয়া শিহরিয়া উঠিতেছে। বোধ হয় পাঁচ মিনিটও হয় নাই; ঘরের মধ্যেকার সেই স্নিগ্ধ সন্ধ্যামায়া, সেই সুখস্বপ্নাবেশ এক নিশ্বাসে ফুরাইয়া গেল। চারিদিকে তেমনি সেই ইটের দেয়াল—বন্ধনস্তূপ।

—পরেশবাবু পয়সা দেবেন! লজ্জা করে না বলতে? নিজের মুরোদ নেই, পরের কাছে ভিক্ষে চাইতে মুখ পোড়ে না তোমার? লম্বা তিঙোবেন তিনি, আর ল্যাজ ধার করবেন অন্যের থেকে? ছি ছি!

বলিয়া সুধা নিজেই হাসিয়া ফেলিল।

কহিল,—আবার সিঁদুর দিয়ে কি স্বর্গ কিনবে শুনি? তার চেয়ে খানিকটা আফিং কিনে আনলেই ত' পারতে। প্রথম ঢোঁকে নেশা হ'ত দ্বিতীয় ঢোঁকে দু'জনে দিব্যি টেঁসে যেতাম। তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি।

পর মুহূর্তেই মুখভঙ্গি কুটিল করিয়া কহিল,—খবরদার, তুমি যদি পরেশবাবুর টাকা ছোঁও ত' আমার মরা মুখ দেখবে। আমার জন্যে তুমি ভিখিরি সেজে কারুর কাছে মুখ কাঁচুমাচু ক'রে খোসামুদি করবে সে আমি সইবো না, আমাকে কেটে ফেললেও না। যদি পার নিজে হাতে ধ'রে সঙ্গে নেবে, নয় দাও ছুঁ'ড়ে গঙ্গার জলে ফেলে। কী আমার পরেশবাবু রে! তিনি টাকা চালবেন আর তুমি তাতে প্রেমের নেশা চালাবে। ছি! পুরুষ হয়েছ কি করতে শুনি?

বীরেনের কঠিন মুখ আর্দ্র হইয়া আসিল। যে-হাতটা উদ্যত আক্রমণের আশায় দৃঢ় ছিল তাহা সহসা শিথিল ও দুর্বল হইয়া গেল। চড়ের নিকটবর্তী প্রতিবেশীই যে চুম্বন, শরীরতাত্ত্বিকরা তাহা স্বীকার করিবে না হয় ত'। কিন্তু—

—পুরুষ হয়েছি কি করতে শুনবে? শুনেছ? তারপর দুই হাত দিয়া সুধাকে একটু দূরে সরাইয়া বীরেন কহিল,—তুমি আমার—এ-কথা ভাবলে স্বর্গও আমার কাছে লোভনীয় নয়।

সুধা কহিল,—স্বর্গ কিনতে পয়সা লাগে না, স্বচ্ছন্দে আরামে চোখ বুজলেই পগার-পার। কিন্তু স্বর্গের চেয়ে আমিই যদি লোভনীয় হই, তবে আমার লোভকেও তোমার সম্মান করতে হবে।

—তোমার কি লোভ?

—বাঃ, কি লোভ! ক্ষুধা! হ্যাঁ, দু'বেলা পেট পুরে খেতে চাই গো, ভালো বিছানায় চাই ঘুমুতে! ভালো বিছানায় না শুলে আবার ভালো স্বপ্ন দেখা যায়

না। সুন্দর বাড়ি চাই—হয় গঙ্গার ধারে, নয় পাহাড়ের কোলে, নয় ধর কাশ্মীরে কিম্বা কুমারিকায়। তুমি একটি আস্ত পাগল! সিঁদুর এনেছ কি করতে?

বীরেন তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল,—আজকে যে আমাদের বিয়ে।

—বিয়ে? চমকিয়া উঠিয়া সুধা দুই পা পিছাইয়া আসিল: তার মানে?

বীরেন ঘাবড়াইল না: এতদূর চ'লে এসে মানে বুঝ্‌তে তুমি ফের কল্‌কাতায় যাবে নাকি?

—কিন্তু, বিয়ে মানে? এ কেমন ধারা বিয়ে? বাজনা নেই, উলু নেই, পুরুত নেই—বলিয়া সুধা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বীরেন কহিল,—আর সব বিয়েতে বাজনা থাকে, উলু থাকে, পুরুত থাকে—খালি বর-কনেই থাকে না। এ বিয়েতে সব চেয়ে দামি জিনিসটেই আছে, সুধা। তুমি আর আমি—বর আর বধূ।

কৌতুকপূর্ণ দুই চক্ষু মেলিয়া সুধা কহিল,—তুমি কবিতা না লিখে ডাক্তারি পড়তে গেলে কেন? হাঁসপাতালে মড়া কেটে তুমি এই গবেষণাই করেছ নাকি এতদিন?

বীরেন কহিল,—এটুকু কবিত্ব মানুষের মজ্জাগত জীবনীশক্তি, সুধা। এটা একেবারেই অবাস্তব নয়, খাঁটি সত্য কথা। এস, সিঁদুর পরিয়ে দি।

—এতদূর এগিয়ে এসে ফের বর্ব্বরযুগে চ'লে যেতে হবে নাকি? তোমার প্রেম যদি খাঁটি সত্য কথা হ'য়েই থাকে, তবে এটুকু আড়ম্বরের কোন দরকার নেই। বুঝলে বোকারাম?

—হয় ত' থাক্‌তো না, কিন্তু আমরা এখনো যে-সমাজে বাস করি তাকে বর্ব্বর বল্‌লে বেশি বলা হয় না। একটা লৌকিক প্রমাণ দরকার, সুধা।

সুধা কঠিন হইয়া উঠিল: কার জন্য? মামাবাবুকে বোঝাতে? সিঁদুর মাখলেই আমার কালোমুখ তাঁর কাছে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌বে না। তোমার হোটেলের ম্যানেজার সন্দেহ করবে? ফুঃ!

—খালি তাই নয়, সুধা। আইন আছে। এখনো আমরা স্থান পাই নি, মানও পাব না। ততদিনের জন্যে এমনি একটা সার্টিফিকেট চাই।

—কিসের আইন? আমি তোমাকে চাই এর চেয়ে বড় আইন পৃথিবীতে আর কিছু নেই, হ'তে পারে না।

—কিন্তু ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে আছে, সুধা। তুমি হয় ত' বলবে যে, তোমার বয়েস সতেরো, কিন্তু তোমার অভিভাবকরা অনায়াসে প্রমাণ ক'রে দেবেন

যে, তুমি ঢের নীচে। এই সুখনীড় তখন শ্রীঘর হ'য়ে উঠবে। সাদা কপালে থেকে কেন তুমি লোকের সন্দেহ কুড়োবে বল?

সুধা কহিল,—তার মানে তুমি নিজেকে নিরাপদ করবার জন্যে আমার কপালে এই কলঙ্ক মাখাতে চাও? পর্‌বো না সিঁদুর। হ্যাঁ, কলকাতায়ই ফিরে যাব তা'লে।

মুস্কিল! মেয়েটা নিতান্ত অবুঝ। গোঁ ধরিলেই হইল।

বীরেন কহিল,—আপাতত কল্‌কাতার রিটার্ণ-টিকিট কাটা হয় নি, বুঝলে?

ঠোঁট উল্‌টাইয়া সুধা কহিল,—ঈস্। আমি অমনি চ'ড়ে বসব ট্রেনে। পথে ধর্‌লে বাড়ির ঠিকানা দেব। মামাবাবু পিঠে লাথি মারবেন মারুন, কিন্তু পয়সা নেই ব'লে তোমার ভয় দেখানোকে আমি কেয়ার করি না। বুঝলে?

—শুধু লাথি মারবেন! মাথা মুড়ে ঘোল ঢেলে রাজ্যের বার ক'রে দেবেন। কপালে সিঁদুর না মাখলেই তোমার কপালটা চক্‌চক্ কর্‌বে না।

—ঈস্। উনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। যাবই ত' আমি কল্‌কাতা। এক্ষুনি, এই মুহূর্ত্তে। উনি ভয় দেখিয়ে আমাকে কাবু কর্‌তে চান! আমি অত সস্তা নই বীরেনবাবু। দাও, এই টর্চ আমার, সুটকেশটা আমার—সব পরেশবাবু আমাকে দিয়েছেন। তাঁকে না হয় জিজ্ঞাসা করো। বলিয়া সুধা সুটকেশ গুছাইতে বসিল।

বীরেন গর্জ্জিয়া উঠিল: এ সব কী হচ্ছে সুধা?

—তোমার বিছানা আমি চাই না। এ কি? তুমি ধূপদানি থেকে সেই কাগজের টুকুরোটা ছিঁড়ে ফেলেছ? কেন ছিঁড়লে? কেন ছিঁড়লে?

বীরেন দাঁতে দাঁত ঘসিয়া কহিল,—বেশ করেছি, একশো বার ছিঁড়বো। বলিয়া টেবিলের উপর হইতে ধূপদানিটা তুলিয়া সে জানলা দিয়া রাস্তার উপর ছুঁড়িয়া মারিল।

মুহূর্ত্তে একটা প্রলয়কাণ্ড বাধিয়া গেল। সুধা দুই ক্ষিপ্র হাতে পাতা-বিছানাটা উলটাইয়া দিল, এক দোয়াত কালি ছিল তাহা বালশগুলির উপর উপুর করিয়া ফেলিল। লাথি মারিয়া টেবিল কাৎ করিতেই টর্চের কাচটা টুকরা-টুকরা হইয়া গেল। চেঁচাইয়া কাঁদিয়া কেলেঙ্কারির সে আর সীমা রহিল না।

অসহ্য। বীরেন মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কি করিতেছে কিছুই আয়ত্ত করিতে না পারিয়া সুধার চুলগুলি হঠাৎ ভীষণ জোরে টানিয়া ধরিল। সুধাও দেরি করিল না; ডান হাতে বীরেনের একটা গাল খামচাইয়া ধরিয়াই নিবৃত্ত হইল না, তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল: মেরে ফেল্‌লে গো—

হোটেলে তখন বিশেষ কেহ ছিল না, সবাই সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছে। নীচে ম্যানেজার ঠাকুরের সঙ্গে বচসা করিতেছিল—উপর হইতে হঠাৎ একটা আর্ত্তনাদ শুনিয়া সে তাড়াতাড়ি চটি-পায়ে উঠিয়া পড়িল। সিঁড়িতে জুতার আওয়াজ হইতেই বীরেন সুধাকে ছাড়িয়া দিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। সুধা চেঁচাইয়া উঠিল : মেয়েমানুষের গায়ে হাত তোল নির্লজ্জ বেহায়া, দরজা বন্ধ করছ কোন্ সাহসে? দেখুক না, সবাই তোমার কীর্ত্তি। ইতর কোথাকার!

বীরেনকে ঠেলিয়া দিয়া সুধা দরজাটা খুলিয়া ফেলিল। সাম্‌নেই ম্যানেজার—মুখে তাহার কেমন একটা চাপা হাসি। তাহাকে দেখিয়া নিমেষে সুধার সমস্ত প্রখরতা স্তিমিত হইয়া আসিল। লোকটা সরিয়া না গিয়া বরং ঘরের দিকেই আগাইয়া আসিতেছে, ঘরের মধ্যে বীরেনকে হয় ত' দেখিতে পায় নাই।

হঠাৎ সুধা জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি এখানে কি চান? নিজেই আবার কথার মোড় ঘুরাইল : ও! ভালই হ'ল। আপনাকেই ডেকে পাঠাচ্ছিলুম। রাত্রে খাব না ব'লে দিয়েছিলুম—এখন মত বদ্‌লেছি। রাত্রে এক আত্মীয়-বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিলো, সেটা রাখ্‌লুম না বুঝ্‌লেন? রাত্রের খাবারটা ওপরেই দিয়ে যাবেন।

বীরেন হতভম্ব হইয়া বিপর্য্যস্ত বিছানাটার উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল। এত অস্বস্তি, এত অপমান, এত সংগ্রাম সে সহিতে পারিবে না। আত্মসমর্পণ যেখানে নাই, সেখানে অধিকারের মর্য্যাদা কোথায়? মাধুর্য্যহীন মাদকতায় তাহার অন্তর তৃপ্ত হইবে না। ছি ছি,—সুধা যে এমন বন্য ও গোঁয়ার—এটুকু সন্ধান লইবার জন্যও সে প্রতীক্ষা করিল না। সুধা যে তাহাকে হঠকারী বলে ঠিকই বলে।

হেমন্ত যেন সুধার কত আপন জন : আপনিই বুঝি চেঁচিয়ে উঠেছিলেন?

—তার মানে? আমি কখন চেঁচালুম। না ত'। যান, নিজের কাজ দেখুন গে।

খোলা দরজা দিয়া উঁকি মারিয়া হেমন্ত কহিল,—ঘর-দোরের এ কী বেহাল হয়েছে। ঐ লোকটা আপনার ওপর অত্যাচার করছিল নাকি?

সুধা রাগে জ্বলিয়া উঠিল। বীরেনকে কহিল, - এস ত' এদিকে। দেখ ত' ও লোকটার কী আস্পর্ধা!

বীরেন দরজার বাহিরে আসিয়া প্রশ্ন করিল : কি বল্‌ছেন?

হেমন্ত একটু ভীত হইল; কহিল,—নীচে থেকে মেয়ে-মানুষের একটা কান্না শুন্‌লাম কিনা, তাই একটু খোঁজ নিতে এসেছিলাম—কি হ'ল। আমারই ত' হোটেল, কোনো অতিথির কিছু বিপদ ঘট্‌লে আমাকেই ত' দেখ্‌তে হবে—কি বলুন। ভাব্‌লাম মেয়েছেলের কান্না—একটা অঘটন কিছু ঘ'টে থাক্‌বে। বলুন, ঠিক কি না।

বীরেন কহিল,—আচ্ছা, আচ্ছা, যান।

—যাচ্ছি।

হেমন্ত তবু যায় না। বিস্রস্তবাস অবগুণ্ঠনহীন সুধার দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকে।

সুধা জ্বলিয়া উঠিল : আমাদের স্বামী-স্ত্রীতে যদি কিছু ঝগড়া-ঝাটি হয় তাতে আপনার এমন কি মাথা-ব্যথা!

দাঁতের মধ্য দিয়া কি-একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া ম্যানেজার নামিয়া গেল।

বীরেন চেয়ারে আবার কখন বসিয়া পড়িয়াছিল—এই উত্তরঙ্গ সমুদ্র সাঁতরাইয়া কবে পার হইবে! সে কি একটা শস্যসমৃদ্ধ তীর, না বালুকা-বিকীর্ণ মরুভূমি! সুধা মরীয়া হইয়া বীরেনের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—আমাকে ক্ষমা কর। আমার অপরাধের সীমা নেই, আমি অত্যন্ত অবাধ্য গোঁয়ার—যা-তা।

বীরেন নড়িল না। তাহার স্থির অটল দেহটা যেন সুধার একটা প্রকাণ্ড আশ্রয়। সে তাড়াতাড়ি বীরেনের কণ্ঠলগ্ন হইয়া কহিল,—তুমি আমার স্বামী। সাধারণ বাঙালি-মেয়ে যে অর্থে স্বামীকে বোঝে তুমি আমার কাছে তার চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক বেশি। ঐ ম্যানেজারটা সমস্ত সমাজের প্রতিনিধি হ'য়ে জবাবদিহি করতে এসেছিলো—তাকে আমি জোর-গলায় ব'লে দিয়েছি—আমাদের দু'য়ের মধ্যে কোনো বাধা কোনো নিয়মের অনধিকার প্রবেশ আমরা সইবো না। তোমার কলঙ্ক আমার কলঙ্ক, তোমার অহঙ্কার আমার অহঙ্কার। দাও সিঁদুর পরিয়ে, দাও এবার। বলিয়া মেঝের উপর পা দুইটা দুমড়াইয়া সুধা একেবারে লতার মত বীরেনকে আরো ঘন করিয়া জড়াইয়া ধরিল—তারপর ব্যাকুল হইয়া বীরেনের মাথায় পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল।

বীরেন তেমনি অটল। তবু এমন অজস্র স্পর্শবন্যায় সে অভিভূত না হইয়া পারিল না। কহিল,—ঠিক বল্‌ছ?

বীরেনের কোলের মধ্যে মুখটা ডুবাইয়া দিয়া সুধা কহিল,—এর চেয়ে সত্য কথা ভাগবানও বল্‌তে পারেন না। না, পারেন না, কক্‌খনো না।

—তবে কেন তুমি এমন-ধারা ব্যবহার করলে? এমন চেঁচালে যে, ম্যানেজার পর্য্যন্ত হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এলো।

মুখ তুলিয়া সুধা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে বীরেনের মুখের দিকে চাহিল—অশ্রুতে আর কৌতুকে উচ্ছল দুইটি আয়ত চক্ষু। তরলকণ্ঠে কহিল,—খালি একঘেয়ে মিষ্টিতে মুখ ফিরিয়ে আনে, ঝগড়ার ঝাল-চাট্‌নিটা ভালোবাসা হজমের পক্ষে উপকারী। এই

নাও, শিগগির —আমার সিঁথিটা উস্‌খুস্‌ করছে। আমাকে শাসন কর তুমি। টেবিলের উপর হইতে সিন্দুরের বাণ্ডিলটা তুলিয়া সে বীরেনের হাতে দিল।

বীরেন আর দ্বিধা করিল না; এক মুঠো সিঁদুর লইয়া সুধার চুলে-কপালে লেপিয়া দিল। আয়নাটা পাড়িয়া আনিয়া কহিল,—চেয়ে দেখ।

আয়নায় নিজের চেহারা দেখিয়া সুধা হাসিয়া কহিল,—একেবারে ভূত সাজিয়ে দিয়েছ।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই কি-একটা অপরিজ্ঞাত গূঢ় রহস্যে সুধা ক্ষণকালের জন্য বিমূঢ় হইয়া রহিল। ভূত সে সত্যই সাজিল নাকি। কিন্তু সামান্যতম দেহ ভঙ্গি করিবার আগেই বীরেন তাহাকে একেবারে নিজের কাছে টানিয়া লইল: উৎসবের এখনো একটু বাকি আছে। তোমার দণ্ড চাইলে না?

আর কথা শোনা গেল না। আলিঙ্গন শিথিল করিয়া বীরেন কহিল,—নৌকা ক'রে গঙ্গায় বেড়াতে যাবে?

সুধা প্রথমটা রাজি হইতে যাইতেছিল, কিন্তু কি ভাবিয়া আর সায় দিল না। কহিল,—তা' কি ক'রে হয়? ঘর দোর আবার আমায় সাফ্‌ করতে হবে। এই কালি-মাখা নোংরা বিছানায় আমাদের ফুলশয্যা হবে নাকি?

কালি-মাখা বিছানা! সুধা আবার স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বীরেন কহিল,—দু'জনে মিলে দু'মিনিটে সাফ্‌ করে ফেল্‌ছি। এ আর কতক্ষণ!

বীরেনের হাত ধরিয়া বাধা দিয়া সুধা কহিল—না। আমিই কর্‌ছি সব। তুমি বরং আরেকটা হোটেল দেখ। মুন্সির ঘাটে আমার এক দূরসম্পর্কের মাসি থাকেন বটে,—তা তাঁর ঠিকানাটাও নিয়ে আসি নি, এখন অবশ্যি তাঁর ওখানে যাওয়া যেত না। না, না, গেলেই বা মন্দ কি, তিনি ত' আর এ-সব কিছু জানেন না— আমরা তাঁর জামাই মেয়ে ব'লে স্বচ্ছন্দে চ'লে যাব।

বীরেন প্রতিবাদ করিল: চ'লে যাব মানে?

—না, না; চলে যাব মানে—সত্যি-সত্যিই ত' আমরা তাঁর মেয়ে জামাই। মানে, তিনি কিছুই সন্দেহ কর্‌তে পারবেন না। তুমি তাঁরই খোঁজ কর গে যাও। মুন্সির ঘাট বার করতে পারব ত'?

—তা বার কর্‌তে কতক্ষণ? কিন্তু ঠিকানা?

—ঠিকানাই ত' নেই। ঠিকানা জানা থাকলে ত' আমিই যেতে পার্‌তাম।

বীরেন আবার প্রতিবাদ করিল: আর আমি?

সুধা কথা ঘুরাইল: বাঃ আমি গেলে তুমিও যেতে বৈ কি সঙ্গে। কান

টান্‌লেই ত' মাথা আসে। তোমাকে ছাড়া আমার এই সিঁদুরের কিছু মান আছে নাকি ? তাই কয়। ওঁকে খুঁজে বার করতেই হ'বে। নাম ওঁর মোক্ষদা। কাশীতে শুনেছি ওঁকে সবাই বামুন-দিদি বলে। মুন্সির ঘাটে উঠে ও-নাম বল্‌লে ওঁকে বার করতে দেরি হবে না। আমার নাম ক'রে জামাই ব'লে পরিচয় দেবে। যদি উনি ওখানে বেঁচে থাকেন, তবে দিন-কয়েকের জন্য সকল ঝঞ্ঝাট মি'টে যাবে নিশ্চয়। এ হোটেল্‌টা একটুও ভাল নয়—ম্যানেজারটা যেন একটা বুনো বেড়াল। কেমন এক জোড়া গোঁফ দেখেছ। ওদিকে ঘাড় চেঁচেছে, গোঁফটা ছাঁটতে পারে নি।

—তাই যাচ্ছি। কি বল্‌লে ? মোক্ষদা ? বামুন-দিদি ?

বীরেন জুতায় ফিতা বাঁধিতে লাগিল।

সুধা কহিল,—মা যেবার মারা যান সেবার ওঁকে দেখেছিলুম, ধব্‌ধবে রঙ—এই জোয়ান্ চেহারা। বুড়ো হয়েছেন বটে কিন্তু এখনো রূপের বড়াই করতে পারেন—

—তা হ'লে ত' দারুণ মাসি দেখছি।

সুধা হাসিয়া কহিল,—নিদারুণ। তা ছাড়া লোহার সিন্দুকে ওঁর অনেক-কিছুই আছে শুনেছি। মামাবাবু ওঁর কোনো খোঁজ-খবর নেন্ না ব'লে তাঁর প্রতি উনি বিশেষ সন্তুষ্ট নন্। চাই কি এ-যাত্রায় কিছু একটা দাঁও-ও মেরে দিতে পারি আমরা।

—তাই নাকি ? টাকার গন্ধ পাইয়া বীরেন লাফাইয়া উঠিল।

সুধা গম্ভীর হইয়া কহিল,—এখন ভগবান করুন ওঁর দেখা পাও তবেই হয়। দেখা পেলেই তক্ষুনি ছুটে এসে আমাকে খবর দেবে। এই হোটেলের মুখে লাথি মেরে আমরা বেরিয়ে পড়্‌বো। সেখানে গিয়ে আমাদের একটা হিল্লে হবে—সেখানেও যদি জানাজানি হবার সূচনা দেখি, আবার চম্পট দেব দু'জনে। বলিয়া সুধা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল : এর মধ্যে মাসিমার থেকে মোটা একটা রাহা-খরচ হাতিয়ে নিতে পারব নিশ্চয়।

সুধা ক্ষিপ্রহাতে বিছানা পাট্ করিতে বসিল।

বীরেন কহিল,—মাসির নামে যে একেবারে মেতে উঠ্‌লে। আমি তোমার কে ? কেউ না। জোর ক'রে সিঁদুর পরিয়ে দিলেই ত' আর বউ হয় না।

সুধা এইবার বুঝিল যে, সে মাসিমার বাড়ি যাইবে শুনিয়া আনন্দ দেখাইয়া নিতান্ত ভুল করিয়াছে। তাই সে এখন মুখ ভার করিয়া কহিল,—তুমি ত' তা বল্‌বেই। আমি একটা কালো-কুচ্ছিত মেয়ে, খুঁড়িয়ে চলি—আমাকে নিয়ে তোমার

মন উঠবে কেন? তোমাকে দিয়ে তোমার মা পরীর মত রূপসী মেয়ে আর অর্দ্ধেক রাজত্বের স্বপ্ন দেখেন—আমি সেই রূপসীর বাঁদি হবারো যোগ্য নই। আমি-ই বা তোমার কে? তা কি আর আমি জানি না। তুমি বল্‌বেই ত' ও কথা। কিন্তু বউ যারা সত্যি করে'ই হয় তাদেরো সিঁথেয় অম্‌নি জোর করেই সিঁদুর পরায়।

—সত্যি নাকি? বলিয়া বীরেন সুধার মুখখানি দুই হাতের মধ্যে ধরিয়া চিবুকের উপর একটা চুমা খাইল: চাদরটা দাও ত'।

সুধা কহিল,—শিগ্‌গিরই এস কিন্তু। মাসিমার খবর আনা চাই-ই চাই।

—নিশ্চয়।

চাদরটা গুছাইতে গুছাইতে বীরেন বাহির হইয়া গেল।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে কি-একটা কথা ভাবিতে গিয়া বীরেনের মাথা ঘুরিয়া উঠিল। কলিকাতা ছাড়িবার আগে সে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই যে, কাশীতে সুধার এমন আশ্রিতবৎসলা মাসি আছে। বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্টের ওভারব্রিজএর উপর দাঁড়াইয়া যখন সে একটা হোটেলওয়ালার খোঁজে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, তখনো ত' সুধা বলিয়া উঠে নাই: ভয় কি, এক্কা একটা নিয়ে মুন্সির ঘাটে চল, সেখানে আমার মাসি আছে বামুন-দিদি বল্‌লে সবাই তাঁকে চিন্‌তে পারে। তখন পরিপূর্ণ বিশ্বাসে বীরেনেরই হাতের মুঠায় সে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছিল, বীরেনের সহযাত্রিণী হইয়া মৃত্যুকেও সে অমৃত করিতে পারিত। কিন্তু আজ সে বীরেনেরই হাত থেকে আত্মরক্ষা করিতে চায়, কোথাকার কে এক মাসি খাড়া করিয়া তাহার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করে। বীরেন তাহার কত পর হইয়া গিয়াছে, কত পর বা না-জানি গোড়া হইতেই ছিল! তাই, একবার মাসির আঁচলের তলায় গিয়া দাঁড়াইতে পারিলে সুধা স্বচ্ছন্দে তাহাকে পুলিশের হাতে তুলিয়া দিতেও সঙ্কোচ করিবে না। নির্লজ্জ রূঢ়তায় এমন-সব কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়া বসিবে হয় ত' যে, সে-ই আগা-গোড়া পরিচ্ছন্ন, যত আবিলতা বীরেনের ব্যবহারে। সামাজিক খ্যাতি বাঁচাইতে মেয়েমানুষ বলিতে না পারে এমন মিথ্যা কথা ভাবা যায় না। বীরেন তাহা জানিত। সুধা এত সহজেই গুটি-গুটি দু-চারটি পা ফেলিয়া এই মহাসমুদ্র পার হইয়া যাইতে চায়! কাশীতে তাহার মাসি থাকিলেও বীরেনের কাছে সে মামাবাড়ির বায়না না ধরিলেই ভালো করিবে। সে গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া এখানে শিবের মাথায় হাত বুলাইতে আসে নাই। সুধাকে যদি এত সহজেই ফস্‌কাইতে দেওয়া যাইত, তাহা হইলে কলিকাতায়

থাকিতেই ত' তাহার কপালে কলঙ্কের চিহ্ন আঁকিয়া সে আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িতে পারিত—এত কঠিন হইয়া চাকরটার সঙ্গে সিঁদুরের দর লইয়া বাক্‌বিতণ্ডা করিবার দরকার ছিল না! কাশী থাকিত চুলোয়, পরেশ যাইতে জাহান্নমে। কিন্তু অত সহজে সুধাকে সে ফুরাইয়া দিতে চাহে নাই বলিয়াই ত' এতখানি তপস্যা করিবার জন্য সে প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রেমে প্রতীক্ষাই ত' তপস্যা। বীরেন দেহতত্ত্বজ্ঞ হইয়াও কবির অশরীরী কল্পনাকেই প্রাধান্য দিয়াছিল কি বলিয়া, সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে সেই কথাই সে ভাবিতে লাগিল।

একবার ভাবিল সুধাকে ফেলিয়া সোজা সরিয়া পড়িলে কী এমন ক্ষতি হইবে! তাহার প্রতি যাহার পদে-পদে এমন অসন্তোষ ও অবিশ্বাস তাহাকে শাসন করিবার দরকার আছে। এবং সে-দণ্ড নির্ম্মম হোক্‌। তখন সুধা কাটা ছাগলের মত দাপাইয়া মরুক। বীরেন মনে-মনে একটা হিংস্র আনন্দের স্বাদ পাইল। কিন্তু ক্ষতি কিছু হয় না বটে, লাভ ই বা কী হয়! সুধাকে জব্দ করাই যদি ইচ্ছা ছিল, তবে সেই রান্নাঘরে মামিমার সামনে ঘুঁটের পাহাড় ভেদ করিয়া উঠিয়া আসিলেই তাহার মুখ থাকিত কোথায়! কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা পার হইতে না হইতেই যে তাদের মধ্যে এমন সব জটিল গিঁট পড়িতে থাকিবে ইহা বীরেনের হিসাবেই আসে নাই। একেবারে খোলা আকাশের তলায় সান্নিধ্যের অবারিত মুক্তিতে তাদের কি চেনা হইবে না?

বীরেন দশাশ্বমেধের দিকেই পা চালাইল। ঘাটের মুখে বহুবিচিত্র নর-নারীর মেলা; ধাপে ধাপে অজস্র জনতা। এত সব ভিড় ও কোলাহলের মধ্যেও তাহার মনে একটি কণ্ঠস্বর অতি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। অমন একখানা সাদাসিধে করুণ মুখে এত বিষ উঠিবে ইহা সে কবে ভাবিতে পারিয়াছিল? তবু, এতটা পথ ডিঙাইয়া আসিয়া পাড়ে আনিয়া নৌকা ডুবাইবে সে এত ভাবপ্রবণ নয়। নাই-মামার চেয়ে কাণা-মামা ভাল বৈ কি। সুধাকে পিছলাইয়া যাইতে না দিয়া সেই বরং আর পিছাইবে না।

সিড়ির ধাপে কোথাও কীর্ত্তন কোথাও বা ন্যাংটা-সন্ন্যাসী ঘিরিয়া মোক্ষপ্রার্থিনীদের স্তবগান, কোথাও বা কথকতা চলিয়াছে, কাতারে কাতারে মেয়ে-পুরুষের অজস্র স্রোত—তাহারই মধ্য দিয়া বীরেন দুয়েক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া অনেকগুলি ঘাট পার হইয়া মুন্সির ঘাটে উঠিয়া আসিল। খাড়া সিঁড়ি উঠিয়াছে, তাহাই এইবার ভাঙিতে হইবে। মাসির দেখা পাইলে যদি কিছু এ-দুঃসময়ে হাত্‌ড়ানো যায় তবে ত' তা কাশীপ্রাপ্তির চেয়েও দামি।

—এখানে বামুন-দিদি ব'লে কেউ থাকে?

পথে বিশেষ কেউ ছিল না। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। যাহাকে বীরেন প্রশ্নটা করিল সে সাত-পাঁচ কিছু না বুঝিয়া হাঁ করিয়া রহিল। পরে কহিল,—বামুন-দিদি? বামুন গেছে রাঁধ্‌তে, দিদি গেছে বাগ্‌দি পাড়ায়।

লোকটা নেশা করিয়াছে।

বীরেন কহিল—এটা মুন্সির ঘাট ত'?

—মুন্সির ঘাট? বলেন কি মশাই। সে ত' বহুদিন লোপাট্ হ'য়ে গেছে—এটা মুহুরির ঘাট।

লোকটা হোঁচট খাইতে খাইতে আগাইতেছে।

একে দিয়া কিছুরই কিনারা হইবে না। কিন্তু আর কাহাকেও প্রশ্ন করিয়া সদুত্তর পাইতে পারে এমন একটা মুখও চোখে পড়িল না। অগত্যা বীরেন সামনের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়িল। কোনো সাড়া শব্দ নাই। এই ত' এক রাশি মোটে রাস্তা—খান কয়েক বাড়ি; এর মধ্যে কেহ-না-কেহ নিশ্চয়ই সন্ধান দিতে পারিবে। নাম মোক্ষদা, পদবী বামুন-দিদি, বিধবা, যৌবনে রূপসী ছিলেন। সুধা আর কোন্ ন্যাকামি করিয়া এমন জলজ্যান্ত মিথ্যা কথা কহিবে! দেখা যাক্।

বীরেন দরজায় ধাক্কা মারিতে লাগিল।

এই বাড়িটারই রাস্তার উপরে দরজা ছিল। অন্যান্য বাড়িগুলিতে ঢুকিবার পথই বা কোথায়! না, ভিতর হইতে যখন বন্ধ আছে, তখন জবাব না লইয়া আর বীরেন ফিরিবে না। জুতা-শুদ্ধ পা তুলিয়া দরজায় এইবার সে লাথি মারিল।

ভেতর হইতে গলা এইবার শোনা গেল যা হোক্। যেন কে দুইটা চাঁছা বাঁশের কঞ্চি ঘসিতেছে তেমনি গলা: কে রে আবাগির বেটা মিন্‌সে? কে রে হারামজাদা সন্ধ্যের সময় এসে দোর ঠেলিস্? মরতে আর জায়গা পাস্ নি?

স্বরটা দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বীরেন মিনতি করিয়া কহিল,—দরজাটা খুলুন্। আমি ভদ্রলোক, একটু বিপদে প'ড়ে এসেছি।

—কেমনতর তুমি ভদ্রলোক গা? বলা নেই কওয়া নেই দরজার ওপর যে বাঘের মত লাফিয়ে পড়েছ? অমন ভদ্দরলোকের চৌদ্দপুরুষের মুখে আমি ঝাঁটা মারি।

বীরেন হঠাৎ চটিয়া উঠিল। কিন্তু দরজা খোলা না পাইলে চলিবে না, ত'। তাই সে স্বর মোলায়েম করিয়াই কহিল,—বড় বিপদ, একটুখানি খুলুন্ না দরজা। আপনার কিছু ভয় নেই।

—ওর বিপদ, দেহ আমার জুড়িয়ে গেল আর কি। বিপদ হতভাগা, ধর্ম্মশালায় যেতে পারিস নে? এখেনে মরতে এসেছিস কেন? নেমে যা না পুব দিকে স'রে—

সাম্‌নেই গঙ্গা। মরণ হয় না তোর—সন্ধ্যেবেলায় ভদ্দরলোকের বাড়ির দরজায় ধাক্কা মারিস!

বীরেন ঢোঁক গিলিয়া কহিল,—দরজা না খুলুন, কিন্তু বামুন-দিদি এ পাড়ায় কোথায় থাকে ব'লে দিতে পারেন?

—বামুন-দিদি? তার খোঁজে তোর কি দরকার রে আবাগির বেটা? সে তোর খায় না পরে, যে ভর-সন্ধ্যেয় এমন জুলুম চালাবি? যা যা বেরো।

বীরেন নাছোড়বান্দা: যদি জানেন ত' বলুন,—আমি তাঁর জামাই।

—জামাই?

দরজা এইবার খুলিল।

বীরেন দেখিল তাহার সাম্‌নে একটি বিধবা নারীমূর্ত্তি, চোখ কটা, চুল শাদা, চামড়া কুঁচ্‌কাইয়া আসিয়াছে। বয়সের ভারে দেহটা বাঁকানো। চেহারাটার মধ্যে একটা প্রখর রূঢ়তা আছে। বীরেন ঘাবড়াইয়া গেল। বলিল,—আপনিই কি বামুন দিদি?

বামুন-দিদি স্তম্ভিত হইয়া ছিলেন,—প্রশ্ন করিলেন—কেন?

—ও!

মাসি বলিতে যে-চেহারাটি মনে মনে মূর্ত্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল, ইহার সঙ্গে তাহার প্রতি রোমকূপে অমিল রহিয়াছে। কিন্তু চেহারার বিচার এখন থাক্, বীরেন তাড়াতাড়ি বামুন-দিদির পায়ের কাছে প্রণত হইয়া কহিল,—যাক্, তোমার দেখা পেয়ে একটা মহা ভাবনার দায় থেকে উদ্ধার পেলাম, মাসিমা।

বামুন দিদি দাঁত খিঁচাইলেন: উদ্ধার তোমাকে পাওয়াচ্ছি। ও বিশে, তোর বাসন-মাজা ফেলে আয় ত' একবার ইদিকে, এই হতচ্ছাড়া বে-আক্কেল বেটাকে ঘাড় ধ'রে বার ক'রে দে দিকি!

অদূরে একটা চৌব্বাচার পাড়ে বসিয়া বিশ্বনাথ তেওয়ারি তাহার লোটায় নারকেলের ছিব্‌ড়ে ঘসিতেছে। তাহার ভুঁড়ির বহর ও গর্দ্দানের নমুনা দেখিয়া বীরেনের প্রাণে আর জল নাই। প্রথম সাড়াতেই সে উঠিয়া আসিল না বটে, কিন্তু চক্ষু পাকাইয়া একদৃষ্টে তাহারই দিকে লক্ষ্য করিয়া আছে। তাহার ঐ উদ্যত ভঙ্গিটা বীরেনের একটুও ভাল লাগিল না, যেন দরকার হইলে সে এখনই ছোঁ দিয়া তাহার মুণ্ডুটা ছিঁড়িয়া লইবে। কিন্তু গুটি-সুটি পিছাইয়া গেলেই বা সে কি করিয়া আয়নায় নিজের মুখ দেখিত!

বীরেন হাসিয়া কহিল,—তাড়িয়ে দেবে কি মাসিমা? তুমি আমার মাসি হও, আমি তোমার জামাই।

—মাসি, মাসি কি রে শতেকখোয়ারের বেটা? কাশীর ঘাটে কোন্ মাগীটা মাসি নয়? মা নেই তোর, মাসির বাড়ি ধন্না দিতে এসেছিস্? বেরো, বেরো। জামাই-গিরি ফলাবার আর জায়গা জোটে নি! 'আমি তোমার জামাই'—কথার কি ছিরি দেখ না! আমার আবার মেয়ে কোথায় রে যে তুই জামাই হ'তে যাবি, পাজি? জামাই! তোর মত জামাই কাশীর রাস্তায় পাঁচশো গণ্ডা গড়াগড়ি যাচ্ছে। যা, যা, দরজা আগ্‌লায় না। ভালয় ভালয় বিদেয় হ পোড়ারমুখো। কৈ রে বিশে, হ'ল।

তেওয়ারি হাত ধুইতেছে। আসিয়া পড়িল বুঝি।

বীরেন কহিল,—তোমার আপন জামাই হবার সৌভাগ্য হয় নি, মাসিমা। কলকাতায় তোমার এক ভাই আছেন না—যোগেন বাঁড়ুয্যে, উকিল,—ঠিক কিনা?

—যোগেনের নাম আবার বেঠিক হ'তে যাবে কেন? ভূ-ভারতে তাকে না চেনে এমন জানোয়ার আছে নাকি কোথাও? তার নাম কল্‌কাতা-কাশী উলুবেড়ে-উল্টাডিঙি—সব্বাইর মুখে-মুখে। তেরো বছর আগে বিশুই ত' লগ্নি-পত্তনি করতে কল্‌কাতা গিয়েছিলো। হাওড়ায় নেমে কাউকে আর কিছু বল্‌তে হ'ল না,—যেই বল্লে—যোগেনবাবুর বাড়ি যাবো, অম্‌নি পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চ'ড়ে একেবারে হওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেলো। বিশ্বেস না হয় বিশুকেই জিগগেস কর্ না।

বিশু কাছেই দাঁড়াইয়াছে। নাকের সাহায্যে সে একটা হুঙ্কার করিল। বিশ্বাস না করিয়া উপায় কি?

বীরেন আমতা আমতা করিয়া কহিল,—তোমার আরেক বোন ছিল না? একটি মেয়ে হ'তে মারা যান,—ঠিক কি না?

—সে ত' কোন আদ্যিকালের কথা। আমার সৈরভিকে জামাই কী ঠ্যাঙানটাই না ঠ্যাঙাত! হ'তাম আমি, হামান্‌দিস্তে দিয়ে দিতাম অমন সোয়ামির দাঁত গুঁড়ো ক'রে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই বোনেরই এক মেয়ে আছে। যোগেনবাবুর বাড়িতে বড় হচ্ছিল। আমারই সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। নাম সুধা। মাসি বল্‌তে অজ্ঞান। তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পাগল।

বামুন-দিদি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বীরেনের আপাদমস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন: তুমি আমার সৌরভির জামাই? বল্লেই হ'ল? নচ্ছার, ছুঁচো কোথাকার! সৈরভির মেয়ের নাম কখনো সুধা হয়? মেয়ের বিয়ে দিল, আর যোগেন আমাকে চিঠি লিখ্‌লে না? এ কখনো হ'তে পারে?

বীরেন বলিল,—বড্ড তাড়াতাড়ি হ'য়ে গেল কি না, তাই তোমাকে জানানো হয় নি। বেশ, আমাকে বিশ্বাস না কর সুধাকে নিয়ে আস্‌ছি।

বামুন-দিদি চেঁচাইয়া উঠিলেন : ধর্‌ ধর্‌ ত' বিশু বেটাকে। কোন একটা মেয়ে-মানুষ কুড়িয়ে নিয়ে এনে দিব্যি জামাই-মেয়ে সেজে মৌরসি-পাট্টা করবে, বেটা মতলোব মন্দ করে নি। ধর্‌ শিগ্‌গির।

অনন্যোপায় হইয়া বীরেন রাস্তায় নামিয়া আসিতেছিল, তেওয়ারি তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল।

হাতটা সজোরে ছিনাইয়া নিয়া বীরেন কহিল,—মুখ দেখে তুমি তোমার বোনঝিকে চিনতে পারবে না!

বামুন-দিদি মুখ-বিকৃতি করিয়া কহিলেন,—সৈরভি মরেছে ষোল-সতেরো বছর হ'ল, আমি তখন রামেশ্বরে। তার গুষ্টিগোত্রের মুখ-চোখ আমার মুখস্থ কি না। কোন্‌ একটা বেউশ্যে ধ'রে এনে এখানে একটা কেলেঙ্কারি বাধাবার মতলোব আমি বার করছি। ঘাড় গুঁজড়ে দে বেটাকে গঙ্গার জলে চুবুনি দিয়ে।

বিশু এইবার বীরেনের ঘাড়ের উপরই হাত রাখিল।

তেওয়ারি চক্ষু খুলিয়া কিছুই আর দেখিতে পাইল না, পৃথিবীর আহ্নিক গতি তাহার কাছে দিবালোকের মত প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। নাকের উপর প্রকাণ্ড ঘুসি খাইয়া তেওয়ারি টাল সাম্‌লাইতে রাস্তায় ছিট্‌কাইয়া পড়িল। বামুন-দিদি একটা পাথর তুলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল : ডাকাত পড়েছে গো, ডাকাত। হারামজাদা জামাই সেজে এসেছে গো—ওরে হরকিষণ, ওরে রামলাল, ওরে গণপতি —

বীরেন দিগ্বিদিক্‌ চাহিয়া দেখিল না। পা তুলিয়া বুড়ির পেটে এক লাথি মারিয়া তাহাকে উঠানের উপর উল্‌টাইয়া ফেলিল : মর্‌ বুড়ি, বুড়ি মরে' রইল হে বিশে, তোমার জ্ঞান হ'লে গঙ্গায় ওটাকে ভাসিয়ে দিয়ো।

বীরেন চলিয়া যাইতেছিল, কি ভাবিয়া আবার ফিরিল। রাস্তায় একেবারে লোক নাই বলিলেই চলে। ধারে-কাছে অলি-গলির অন্ত নাই। গা-ঢাকা দিতে বেগ পাইতে হইবে না। বীরেন মরিয়া হইয়া উঠিল।

কাল ভোর হইলেই অর্থাভাবের জন্য সুধার কাছে যদি অপমানসূচক ব্যঙ্গোক্তি শুনিতে হয়, তাহা তাহার সহিবে না। কিছু একটা আব্‌দার করিয়া চাহিলে বীরেনকে ঘাড় চুল্‌কাইতে হইবে। না, পরেশের কাছে সে হাত পাতিবে কোন লজ্জায়? তাহার এইটুকু নির্ভীক পুরুষকার না থাকিলে সে তাহার নাম বদ্‌লাইয়া রমণীরঞ্জন রাখুক। সে জানে সুধা তাহাকে কখনই এত ভালবাসে না যে, তাহার জন্য দময়ন্তী সাজিয়া বসনাঞ্চল ভাগ করিয়া নিবে। প্রেয়সীর জন্য দেশত্যাগ যদি করা

যায়. তবে তার হৃদয়জয়ের জন্য সামান্য চুরি করা যাইবে না তাহাতে যুক্তি কোথায়? অন্যায় হয় ত' সে করিবে, কিন্তু এই অর্থসঞ্চয়ে বামুন-দিদি তাহার চেয়ে বেশি ন্যায়পরায়ণা ছিলেন না হয় ত'। কিছু টাকা হইলে বীরেন যদি সুধার আরো সমীপবর্ত্তী হইতে পারে, তাহা হইলে মাসি হইয়া বামুন-দিদিরই ত' বরং মোটা রকম একটা যৌতুক দিয়া ফেলা উচিত ছিল। ভূপতিতা বামুন-দিদির দিকে চাহিয়া বীরেন একটু হাসিল।

তেওয়ারি উঠিয়া বসিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িতেছিল, বীরেনকে দেখিয়াই আবার রুখিয়া আসিল। বীরেন তাহাকে তর্জনী তুলিয়া সাবধান করিল। তেওয়ারি দুই পা পিছাইয়া গেল।

বাঁ হাত দিয়া তেওয়ারির একটা হাত ধরিয়া বীরেন কহিল,—আয় আমার সঙ্গে ভেতরে। বুড়ি কোথায় তার টাকা-পয়সা লুকিয়ে রাখে দেখিয়ে দে শিগ্‌গির—

তেওয়ারিকে লইয়া বীরেন বাড়ির মধ্যে চলিয়া আসিল। উঠানের উপর মূর্চ্ছিত বামুন-দিদি যে গোঙাইতেছে সে দিকে ভ্রূক্ষেপ পর্য্যন্ত করিল না। একটা প্রায়ান্ধকার কুঠুরির মধ্যে আসিতেই তেওয়ারি কহিল,—বেটি কি কম জমিয়েছে মশাই, হাঁড়ি হাঁড়ি, এই প্যাঁটরার মধ্যে কোম্পানির কাগজ, এটার মধ্যে গয়না-গাটি। কিন্তু কিছু নগদ টাকা-কড়ি হ'লেই ত' আপনার ভাল হয়, না?

বীরেন কহিল,—বিস্তু বেশ রসিক আছ দেখছি। এ-সব বিষয়ে তোমার হাত বোধ হয় আরো পাকা। মাসির পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে'ও যখন পেলাম না কিছু, তখন কিছু লুট না ক'রে যাই কি ক'রে? কি বল?

অন্ধকারে পথ খুঁজিতে খুঁজিতে বীরেন বলিল, আমি অকৃতজ্ঞ নই, বিশ্বনাথ। তোমাকে নিশ্চয়ই আমি ভাগ দেব। চল,—কোথায় নগদ টাকা-কড়ির বাক্স।

—সত্যি? বিশ্বনাথ লাফাইয়া উঠিল: তা' হ'লে এখানে একটু দাঁড়ান, বাক্সটা আমি নিয়ে আসছি।

বলিতে বলিতেই বিশ্বনাথ কি-একটা দরজা খুলিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া গেল। বিশ্বনাথও অকৃতজ্ঞ নয়। সে আর ফিরিয়া দেখিল না, বামুন দিদিকে জাগাইয়া দিয়া সোজা ছুট দিল। একেবারে থানায় আসিয়া হাজির।

কেন যে বিশ্বনাথ তাহাকে সঙ্গে না নিয়া হঠাৎ নিজেই বাক্স আনিবার শ্রম স্বীকার করিতে গেল, আনাড়ি বীরেন প্রথমটা বুঝিল না। বুঝিল, যখন দেখিল বিশ্বনাথ আর শীঘ্র ফিরিয়া আসিতেছে না। বীরেন ঘাড়ের ঘাম মুছিতে মুছিতে সেই অন্ধকার গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া আসিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

কিন্তু একটি নিশ্বাস মাত্র।

সামনেই ফটকের সামনে বামুন-দিদি চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া বেশ একটা ভিড় জমাইয়াছেন। লাঠি হাতে ঐ দুইটা গুণ্ডাই হয় ত' গণপতি আর রামলাল। বীরেনের মুখ শুকাইয়া গেল। এ ব্যূহ ভেদ করিয়া তাহার আর সুধার হৃদয়ে প্রবেশ করা হইয়া উঠিল না বুঝি। কিন্তু কিছু ত' একটা করিতে হইবে! কি করা যায়!

বীরেনকে কাঠের মূর্ত্তির মত অদূরে খাড়া দেখিতে পাইয়া সৈন্য-পুরোভাগে সেনাপতির মত বামুন-দিদি চেঁচাইয়া উঠিলেন: ঐ যে বেটা ডাকাত। ধর বেটাকে মার গণপতি ওর মাথায় লাঠি। ঘিলু বা'র ক'রে দে। থেৎলে দে হাত-পা। চ্যাং-দোলা ক'রে গঙ্গায় ডুবিয়ে মার শালাকে।

জনতা বিক্ষুব্ধ হইয়া ঢেউয়ের আকারে বীরেনের উপর ভাঙিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু সহসা তাহার পাংশু মুখে স্বচ্ছ জ্যোৎস্নালেখার মত একটি শীর্ণ হাসি উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়া সবাই একটু চমকিত হইল! বীরেন হাসিয়া কহিল,—জামাইকে কোন শাস্ত্রেই শ্বাশুড়ি শালা বলে নি, মাসিমা। এ জন্মের পুণ্যফলে আস্‌চে-জন্মে যদি তুমি কাছা প'রে জন্মাতে পার, তবে আমার বড় দিদির সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমার বিয়ে দেব। কিন্তু এত সব লোক ডেকেছ কেন?

—লোক ডেকেছি কেন? শুয়োরের বেটা শুয়োর, আমার বাড়ি ঢুকেছিস ডাকাতি করতে,—সব আমার কেড়ে-কুড়ে নিলে রে; তোরা হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস রামলাল, মার না লাঠি, হারামজাদার মাথাটা চৌচির ক'রে দে, গলগল ক'রে রক্ত বেরুক—

লাঠিগুলি নাচিয়া উঠিল।

বীরেন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। রামলাল গণপতি প্রভৃতি যেখানটায় ঘন হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহারই কাছে আসিয়া সে কহিল,—ডাকাতি করতে এসেছি শ্বশুর-বাড়ি? কেন, নতুন বিয়ে করেছি, মাসিমাই ত' কত টাকা-কাপড় দিয়ে আশীর্ব্বাদ করবেন। কষ্ট ক'রে ডাকাতি করতে যাব কেন? আমি জামাই কি না, এই মাসিমা সন্দেহ করছেন? বেশ, আমার সঙ্গে চল, বৌকে নিয়ে আসি; শ্বশুরকেও কলকাতায় টেলি ক'রে দি। তাঁরা সবাই আসুন। তা' হ'লে ত' আর লুকোছাপার কিছু থাকবে না। তখন লেঠেল ভাড়া ক'রে জামাইকে ঠ্যাঙানোর লজ্জায় মুখ দেখাবে কি ক'রে, মাসিমা?

লোকগুলি কিছু প্রশমিত হইল বটে, কিন্তু বামুন-দিদি আবার গর্জ্জিয়া উঠিলেন: তবে তুই আমাকে তখন পেটে লাথি মারলি কেন গুখোর বেটা?

—তোমাকে লাথি! ছি! কী যে ব'ল মাসিমা। তুমি আমার গুরুজন না? মা মারা যাবার পর তোমাকেই ত' মনে-মনে পূজো ক'রে আসছি। ও কথা মুখেও এনো না! ছি ছি! বলিয়া বীরেন নীচু হইয়া বুড়ির পায়ের ধুলা কপালে, বুকে ও জিভে ঠেকাইল।

কথা বলিতে বলিতে বীরেন ক্রমশ ফটকের দিকে আগাইয়া আসিতেছে: নতুন বিয়ে হ'ল, ভাবলাম বিদেশে এসেছি, মাসিমার খোঁজ নি গে। ও বাবা, এখানে এসে যে এমন কাণ্ড-কারখানা বেধে যাবে এ স্বয়ং মুনি-ঋষিরাও ভাবতে পারতেন না। তোমার বোনঝি শুনলে আত্মহত্যা করবে মাসিমা, ভাই শুনলে কপাল কুটবেন। জামাইকে কৈ পঞ্চ ব্যান্নন রেঁধে খাওয়াবে, না তার ওপর লাঠিবাজি!

বলিতে বলিতে সিঁড়ির কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, একজন খপ্ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া কহিল.—দেখি প'কটে তোমার কি আছে?

বামুন-দিদি চেঁচাইয়া উঠিলেন: ওগো, আমার তাগা-বাজু, বিছে-চিক—সব নিয়ে চললো গো—

বুড়ির কান্নার আরো অনেকে বীরেনকে চাপিয়া ধরিল।

বীরেন পরুষস্বরে কহিল,—দেখাচ্ছি। স'রে দাঁড়াও। কিন্তু পকেটে ঐ শুকনি-বুড়ির গয়না-পত্র যদি কিছু না থাকে, তবে মজাটা টের পাওয়াবো।

এক মুহূর্ত্তের জন্য রামলাল ও গণপতির লাঠি সংজ্ঞা হারাইল। সেই ক্ষীণতম দোদুল্যমান মুহূর্ত্তটিতে বীরেন ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘাটের দিকে ছুট দিল।

বীরেন ছুটিতেছে—

এইবার সকলের হুঁস হইল। চীৎকার করিতে করিতে বামুন-দিদিও পিছু নিলেন।

ঘাটের সমস্ত জনতা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ওদিক হইতে বিশুও এক পাল পুলিশ লইয়া আসিয়াছে। বীরেনের আর পথ নাই। সে এমন অন্যায় কাজ করে নাই যে গঙ্গায় ডুবিবে। সে স্বচ্ছন্দে ধরা দিল।

দারোগা বলিল,—আপনার স্ত্রী কোথায় আছেন?

—ত্রিপুরা-ভৈরবীর একটা বাঙালি মেসএ।

—তাঁর জবাববন্দি চাই।

—সেখানে যাবেন? চলুন।

ত্রিপুরা-ভৈরবীতে পৌছিতে প্রায় বারোটা।

সদর-দরজা শেষকালে ভাঙিয়া খুলিতে হইল। বাড়িটা যেন অন্ধকারে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া আছে। বীরেনের নির্দেশমত সবাই উপরে উঠিয়া আসিল।

উহাদের ঘরটা খোলা পড়িয়া আছে, জিনিসপত্র ছত্রখান। সুধা নাই। কেহ কোনো খবর দিতে পারিল না। ম্যানেজার অদৃশ্য।

বীরেনের আর মুখ রহিল না। সে এমন একটা নিদারুণ মিথ্যা বানাইল কি করিয়া?

বীরেন সেই যে জামাই সাজিয়া বাহির হইয়া গেল আর তাহার ফিরিবার নাম নাই।

সমস্ত মেসটা নিঝুম—কেহই ফিরে নাই বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সুধাকে এই সঙ্কীর্ণ ঘরের মধ্যে আটকাইয়া রাখিয়া এত ঘটা করিয়া বীরেনের এখন গঙ্গার হাওয়া না খাইলে কোনো ক্ষতি ছিল না। হয় ত' মাসির বাড়ি সে একা-ই সন্দেশের থালা সাবাড় করিতেছে। এত বড় স্বার্থপর দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের কথা আগে কখনো শুনিয়াছে বলিয়া সুধার মনে হইল না।

চাকর টেবিলের উপর একটা ভাঙা লণ্ঠন রাখিয়া সেই কখন অদৃশ্য হইয়া গেছে আর তাহার টিকিটিও দেখা যাইতেছে না। গলা বাড়াইয়া যে ডাকিবে এমন সাহসটুকুও সুধা হারাইয়া বসিল। তাহাকে পাইলে কিছু বকশিস কবুল করিয়া একবার গঙ্গার ঘাটে পাঠাইয়া দিত। চুপি চুপি সে নিজেই বাহির হইয়া পড়িবে নাকি? ভাবিতেও সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়া উঠে।

স্বল্পালোকিত বিশৃঙ্খল ঘরের মধ্যে বন্দিনী সুধা বীরেনের প্রতীক্ষায় ঘামিয়া উঠিতেছে। গলির ও-প্রান্তের ঘরটির কোলাহল মৃদুতর হইতে হইতে স্তব্ধ হইয়া গেল। জানালায় ও-বাড়ির বউটিই বোধকরি আসিয়া দাঁড়াইল—সমস্ত দিনরাত্রির পরিশ্রমের পর ঐ জানালাটুকুই বোধকরি তার মুক্তি! তাহাকে পাইয়া সুধা যেন শূন্য প্রান্তরে দীপ দেখিল। তক্তপোষটা ডিঙাইয়া জানালার সমীপবর্ত্তী হইতে না হইতেই বধূটি কি ভাবিয়া যে সহসা তাহার জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল সুধা বুঝিল না। মনে হইল সে ভয় পাইয়াছে।

ভয় পাইয়াছে! সত্যিই ত'। বীরেন যদি আর ফিরিয়া না আসে, যদি সোজা ক্যান্টন্‌মেণ্ট ষ্টেশনে গিয়া কলিকাতার মুখে উধাও হয়! ভয়ে সুধার মেরুদণ্ড শিরশির করিয়া উঠিল। পুরা একটা দিন হয় নাই, ইহারই মধ্যে তাহারা মুখোস খুলিয়া ফেলিয়া একেবারে মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল কেন? এত স্পষ্ট এত রুক্ষ! কিন্তু এ

সংসারে বীরেন ছাড়া তাহার আর গতি কৈ? সে থামোকা এমন মেজাজ দেখাইতে গেল কোন সাহসে? জুতায় পেরেক উঠিলে তাহাকে ঠুকিয়া সমান করিয়া নিতে হয়; পেরেক যদি বরাবর রুখিয়া থাকে তবে পা তাহাকে বহন করিবে কেন,—ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে নিশ্চয়।

তাড়াতাড়ি পেছন চাহিতেই সুধা দেখিল পেছনের দেয়ালে তাহার প্রকাণ্ড একটা ছায়া পড়িয়াছে। ছায়াটা যেন তাহার ভবিষ্যতের ভয়াবহ অনিশ্চিততার প্রতীক। ভয় পাইয়া সে তাড়াতাড়ি বালিশের তলা হইতে ছোরাটা বাহির করিয়া সেমিজের তলায় বুকের মধ্যে পুরিয়া রাখিল। সে সত্যিই কি মনে মনে বীরেনকে এতখানি আকর্ষণ করে না যে, সে নিতান্ত বিজ্ঞানের নিয়মানুসারেই তাহার দেহের দুয়ারে আসিয়া উত্তীর্ণ হইবে? সুধার এত সুনিবিড় সাধনা কি একেবারেই উড়িয়া যাইবে নাকি? সে যাহার জন্য পরিচিত ঘর-দোর ছাড়িয়া বাঁকা অচেনা পথে পা ফেলিল, যাহার জন্য ললাটের সিন্দুরে কুলটার কলঙ্ককে মহীয়ান ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে, বিবাহের সমস্ত লৌকিক সাক্ষী ও উপচার অস্বীকার করিয়া সে যাহাকে তাহার জীবনে স্বয়ং বিশ্বেশ্বরের প্রতিভূজ্ঞানে গ্রহণ করিল—সেই স্বামী এত বড় একটা আত্মসর্পণের মর্য্যাদা রাখিবেন না, ইহা সুধা মরিয়া গেলেও মানিতে পারিবে না। হ্যাঁ, স্বামীই ত' তিনি! এত বড় নির্ম্মুক্ত আনন্দোদ্ভাসিত আকাশের দর্পণে কোন মেয়ে ইহার চেয়ে সত্য করিয়া স্বামীর শুভদৃষ্টি লাভ করিয়াছে শুনি। বিপদের মধ্যে বিপুল সম্ভাবনার মধ্যে স্বপ্নময় স্বর্গের সৌধতলে ইহার আগে কবে কাহারা মিলিতে পারিয়াছিল! নিশ্চয়ই তিনি আসিবেন, এই আসিলেন বলিয়া। খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া শুইয়া থাকিলেই সে দরজায় বীরেনের টোকা শুনিবে। হ্যাঁ, ঐ ত সিঁড়িতে তাঁহার জুতার শব্দ হইতেছে। আসুন, সুধা ককখনো তাঁহার সঙ্গে কথা কহিবে না, আদর করিয়া চুমা খাইতে চাহিলে বালিশে-মুখ ডুবাইয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকিবে।

তবু, দেয়ালে তাহার সেই ঝাপসা ছায়াটা দেখিয়া কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল যে, অমন করিয়া বাহির হইয়া না পড়িলেই বুঝি ভালো হইত। এক ফুঁয়ে সে কোথা হইতে কোথায় উড়িয়া আসিয়াছে। এক ঘুমের পর সে যদি উঠিয়া দেখিতে পারিত যে কালকের রাত্রিটা ঝড়ের মুখে হালকা মেঘের মত উড়িয়া গেছে, আর সে,—কাশীতে ত্রিপুরা-ভৈরবীর মেস্‌এ নয়, তাহাদেরই পটুয়াটোলা লেনএর বাড়িতে দোতলায় মা'র ফটোর নীচে মেঝেতে মাদুর বিছাইয়া শুইয়া আছে; এবং অবহেলায় শুইয়া আছে বলিয়া পাশের ঘর হইতে মামিমা গলা চিরিতেছেন, তাহা হইলে—দূর ছাই বিশ্বেশ্বর, সুধা মামিমার বকুনিকেই আরতির স্তোত্রের চেয়ে

বেশি দামি মনে করিত। নিজের পেটের মেয়ে খোয়া গেলে মামিমা এমন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেন নাকি? তিনি হয় ত' এখন আবার কেৎলিতে জল চাপাইয়া হাই তুলিতেছেন। ঘুণ্টু হয় ত আলো জালিয়া উপক্রমণিকা পড়িতেছে। আজকে হয় ত' ধুনা জ্বালাইয়া সন্ধ্যা দেওয়া হয় নাই, রেলিঙের উপর শুকাইতে দেওয়া কাপড়গুলা হয় ত' তেমনি ঝুলিতেছে, মামাবাবুকে আজ কে তামাক সাজিয়া দিল? তাহার আজ কত কাজ বাকি, সে কি না বিছানায় গড়াইয়া আড়-মোড়া ভাঙিতেছে? সুধা ধড়ফড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল।

যাক, বাবুর এতক্ষণে হাওয়া খাওয়া শেষ হইল। জুতা মস্‌মসাইয়া সিঁড়ি ভাঙিতেছেন। আলোটা উস্কাইয়া সুধা যতদূর সম্ভব ভয়গ্রস্ত মুখখানা গম্ভীর করিয়া বীরেনের পরিচিত স্বর শুনিবার নিদারুণ আকাঙ্ক্ষায় কান দুইটা খাড়া করিয়া রহিল। সিঁড়ির জুতার শব্দ কোন দিকে আবার মিলাইয়া গেল না-জানি। কিন্তু না, দেরি করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই হয় ত' সে এখন চোরের মত অগ্রসর হইতেছে।

দরজাটা খুলিয়া গেল। সুধার বুক ঠেলিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস উঠিতে না উঠিতেই গলার কাছে আসিয়া আটকাইয়া রহিল। ঘরে বীরেন নয়—ম্যানেজার, হেমন্ত। দুই মুঠার মধ্যে বিছানার চাদরটা আঁকড়াইয়া ধরিয়া সুধা এই ব্যর্থ প্রত্যাশার ঘা সামলাইল। সে যেন এতক্ষণ এমনি একটা আতঙ্কময় আবির্ভাবের দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিল। সুধা কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। লোকটা কোন কথা না কহিয়া নিতান্ত অভদ্রের মতন দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া চক্ষু দিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ লেহন করিতেছে অনুভব করিয়া সুধা ক্ষেপিয়া উঠিল: হঠাৎ দোর ঠেলে আমার ঘরে ঢুকলেন যে—কি চাই আপনার?

হেমন্ত সামনের উঁচু দাঁত কয়টা বিকশিত করিয়া কহিল,—হেঁ হেঁ, আমার আবার কি চাই? বলতে এসেছিলাম যে আপনার বাবু ত' এখনো এলেন না—আপনার খাবারটা কি পাঠিয়ে দেব ওপরে? সবাই ত' খেয়ে-দেয়ে সাফ হয়েছে। আপনাদের জন্যে মেস আমি কতক্ষণ খোলা রাখবো? অত চোখ রাঙাবেন না গো, ঠাকরুণ, বুঝলেন?

সুধা দমিল না; কহিল,—মেস আপনাকে কে খোলা রাখতে বলছে? রাত্রে আমরা কেউ খাবো না; আমার স্বামী নেমন্তন্ন রাখতে গেছেন, এক্ষুনি ফিরে এলেন ব'লে।

—নেমন্তন্ন রাখতে গেছেন? হেমন্ত ভূতের মত হাসিয়া উঠিল: তিনি আর ফিরছেন না গো, ফিরছেন না।

সুধা লাফাইয়া উঠিল : ফিরছেন না মানে? কি বলছেন আপনি?

চেয়ার টানিয়া তাহাতে বসিয়া হেমন্ত বলিল,—বলছি সত্যি কথাই। স্বামী! কত হেঁয়ালিই যে তোমায় জানো ঠাকরুণ—হেমন্ত আবার বিকট কণ্ঠে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

সুধা তবু ভড়কাইল না, রুক্ষস্বরে কহিল,—ভদ্র মেয়ের সঙ্গে সংযত হ'য়ে কথা বলতে শেখেন নি? কি শুনেছেন আমার স্বামীর সম্বন্ধে? বলুন শিগগির। বলুন।

আরেক চোট হাসি থামিলে হেমন্ত কহিল,—সোহাগপণা ক'রে কী সোয়ামিই যে পাকড়েছিলে! বেটা ডাকাত, গুণ্ডা—গেছল মুন্সির ঘাটে দিন-দুপুরে ছুরি বসাতে। পড়ল পুলিশের হাতে—যাবে কোথা? থানায় নেমন্তন্ন রাখতে গেছে ঠাকরুণ, পিঠে খেলেই পেটে সইবে এবার।

—মুন্সির ঘাট! সুধা আঁৎকাইয়া উঠিল।

—হ্যাঁ গো, মুন্সির ঘাট। খবরটা এই ত কানে এল। এখন এখানে কোনো হাঙ্গাম-হুজুৎ না বাধে। বলি, তোমাকেও কি ও হাত-সাফাই করেছে নাকি? এসেছিলে ত ষাঁড়ির মত, এখন ত' সিঁথেটাকে দিব্যি চকচকে ক'রে তুলেছ? সতীপণা রাখো ঠাকরুণ, এখন ধাতে এস। ও বেটা তোমার কে? জামাই বাবু? না, পিসেমশাই?

সুধা বিছানা ছাড়িয়া নামিয়া আসিল। দেহ-ভঙ্গী কঠিন ও ঋজু, চক্ষু প্রদীপ্ত। দৃপ্ত নির্ভীকের মত ধমক দিয়া কহিল,—মুখ সামলে কথা বলুন বলছি। কোন সাহসে আমার ঘরে ঢুকেছেন আপনি। বেরিয়ে যান, এক্ষুনি বেরিয়ে যান। গেলেন?

হেমন্ত নড়িল না, মুচকি-মুচকি হাসিয়া কহিল,—বেরিয়ে যাব কি ঠাকরুণ? আমার বাড়ি, আমার ঘর—বেরুতে বললেই ত' আর বেরনো চলে না।

সুধা কহিল,—তবে দরজা থেকে স'রে বসুন দয়া ক'রে। আপনার ঘরবাড়ি নিয়ে রাজত্ব করুন, আমিই বেরই। বলিয়া সুধা এক পা অগ্রসর হইল।

দরজার কাছে আগাইয়া আসিতেই হেমন্ত হঠাৎ হাত বাড়াইয়া দিয়া সুধাকে ধরিয়া ফেলিল, কহিল,—এত বা'র-মুখো হ'লে কি চলে ঠাকরুণ? বোস, দুটো খোসগল্প হোক—তারপর এক সাথেই বেরুনো যাবে'খন। বোস। বলিয়া হেমন্ত সুধাকে বলপূর্ব্বক নিজেরই কাছে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছিল—

পলকে যে কি হইয়া গেল হেমন্ত স্পষ্ট করিয়া ধারণা করিতে পারিল না। ভয়হীন গোঁয়ার মেয়ে হেমন্তের কলুষিত স্পর্শ হইতে সবেগে নিজেকে ছিঁড়িয়া নিয়া সহসা তাহার গালের উপর প্রবল এক চড় বসাইয়া দিল। রাগে অপমানে দুঃখে

মুখ দিয়া তার কোনো কথাই বাহির হইল না। থরথর করিয়া সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে—পাংশুমুখে অটল তেজস্বিতা। হেমন্ত চেয়ার হইতে একেবারে ছিটকাইয়া পড়িল।

কী নিষ্ঠুর তেজে সামান্য নিরাশ্রয় মেয়ে আততায়ীকে এমন করিয়া শাসন করিতে পারে মুহ্যমান হেমন্ত তাহার হদিস পাইল না। আঘাতটা সামলাইয়া লইতে তাহার একটু সময় লাগিল। এই আঘাতের শাস্তি দিবার জন্য প্রবলতর লোলুপতায় সে তাহার বাহু বিস্তার করিয়া দিবে, হঠাৎ টের পাইল সুধা দোর ডিঙাইয়া সিঁড়ির নাগাল পাইয়া একেবারে তরতর করিয়া নামিয়া যাইতেছে। না বা করিল স্বামীর প্রতীক্ষা, না বা দাঁড়াইল তাহার জিনিস-পত্রগুলি গুছাইয়া লইতে। বান্ধবহীন কাশীর পথে সে একাকিনী পা বাড়াইল।

একটা অকথ্য গালি পাড়িয়া বড় বড় পা ফেলিয়া হেমন্ত সুধার পশ্চাদ্ধাবন করিল। সুধা এতক্ষণে রাস্তা নিয়াছে। নির্জ্জন রাস্তা, বিশ্বেশ্বরের গলির মোড়ে টাঙাও একটা চোখে পড়িল না। সুধা ব্যাধানুসৃতা মৃগীর মত শূন্য দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। পায়ে হাঁটিয়াই ষ্টেশনে যাইতে হইবে। সে না জানি কতদূর! কে তাহাকে পথ বলিয়া দিবে? ইহার চেয়ে থানায় চলিয়া গেলেই হয় ত' ভালো হয়। বীরেনের সেখানে দেখা পাইতে পারে। কিন্তু ঐ ম্যানেজারের কথাই যে ঠিক, এমন বিশ্বাসে সুধার জোর নাই। তবু, থানায় গেলেই শেষ পর্য্যন্ত নিশ্চয় একটা সুরাহা হইবে। আরো খানিকটা আগাইলে বিটের একটা কনেষ্টেবলও কি সে দেখিতে পাইবে না?

দ্রুত পা ফেলিয়া সুধা সামনের দিকেই প্রায় ছুটিয়া চলিয়াছিল, হঠাৎ মগ্নানুভূতিতে তাহার জ্ঞান হইল কে তাহারই পিছু নিয়াছে বুঝি। সত্যই। সুধা পেছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল মালকোঁচা বাঁধিয়া হোটেলের সেই ম্যানেজারটাই এই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। দুয়ের মধ্যেকার ব্যবধানটা সঙ্কীর্ণতর হইয়া আসিতেই হেমন্ত নির্লজ্জের মত চীৎকার করিয়া উঠিল: পাক্‌ড়ো শালিকে!

সম্মুখের সমস্ত পৃথিবী সুধার চোখের কাছে সহসা যেন ফুরাইয়া গেল—পায়ের নীচে প্রকাণ্ড একটা সমুদ্র যেন হাঁ করিয়া আছে। ইহার পর কি করা যায় সুধার হিসাবে আর কুলাইয়া উঠিল না। সামনে যে বাড়ি পাইল তাহারই বন্ধ দরজায় সে সজোরে করাঘাত সুরু করিল। দরজা তবু খোলে না। লাথির পর লাথি, শেষকালে সে দরজায় মাথা ঠুকিতে লাগিল। হেমন্ত একেবারে কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

দরজা খুলিয়া গেল।

—আমাকে শিগগির বাঁচান। বলিয়া সুধা দিগ্বিদিক সম্বন্ধে একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া প্রদোষকে জড়াইয়া ধরিল: আমাকে বাঁচান দয়া করে।

প্রদোষের বাহুর মধ্যে সুধা মূর্চ্ছা গিয়াছে। ব্যাপারটা প্রদোষ আদপেই আয়ত্ত করিতে পারিল না! গভীর রাত্রি, জনশূন্য পথঘাট, ইহার মধ্যে এই সঙ্গীহারা পথচারিণী মেয়েটি হঠাৎ ভীত আর্ত্তস্বরে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াই অচেতন হইয়া পড়িল—প্রদোষ না পারিল সুধাকে মেঝের উপর শোয়াইয়া দিতে, না বা বাহিরে একবার উঁকি মারিয়া দেখিতে কেহ এই মেয়েটি:কে আক্রমণ করিবার জন্য অনুসরণ করিতেছে কি না। তাড়াতাড়ি হাঁক দিল: রঘুয়া!

—জী। বলিয়া রঘুয়া একলাফে আসিয়া হাজির।

রঘুয়ার চক্ষু স্থির। সুধার চোখের উপর হইতে আলুলিত চুলগুলি কপালের দিকে সরাইয়া দিয়া প্রদোষ কহিল,—তোর লাঠিগাছটা নিয়ে বাইরে দু' পা এগিয়ে দেখে আয় ত' কেউ একে তাড়া করবার জন্যে ওৎ পেতে রয়েছে কি না। যা' শিগগির—

—ডাকু?

রক্তের আস্বাদে ক্ষিপ্ত বাঘের মত রঘুয়া দেয়ালের কোণ হইতে লাঠিগাছটা তুলিয়া লইয়া এক বিকট হাঁক দিয়া রাস্তায় নামিয়া আসিল।

হেমন্ত ততক্ষণে গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে পাশের গলি দিয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

শিথিলকায় সুধাকে অতি সন্তর্পণে দুই হাতে তুলিয়া লইয়া প্রদোষ সিঁড়ির ধাপ গুনিয়া গুনিয়া উপরে উঠিতেছিল। আগাগোড়া অন্ধকার। একবার পা পিছলাইলে আর কেহ ঠেকাইতে পারিবে না। তাহা হইলে মেয়েটি এই চক্ষু মুদিল!

অতি নিবিড় আগ্রহে সুধাকে বুকের সঙ্গে ঘনলগ্ন করিয়া প্রদোষ উঠিতে লাগিল!

রঘুয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—কোই নেই হ্যায় বাবু। ভাগ গিয়া।

—উপরে উঠে গিয়ে আলোটা জ্বালা দিকিন্ শিগগির।

পাশ কাটাইয়া উপরে উঠিয়া রঘুয়া আলো জ্বালাইল। দোতলার নিজের পরিষ্কার তকতকে বিছানার উপর সুধাকে আলগোছে শোয়াইয়া দিয়া প্রদোষ কহিল,—পাথরের বাটি ক'রে কুঁজো থেকে শিগগির খানিকটা জল গড়া—

জল গড়াইয়া রঘুয়া কহিল,—ডাগ্‌দার বাবুকো বোলানে হোগা?

—দরকার নেই। চোখে-মুখে একটু জল ছিটোলেই এক্ষুনি চোখ চাইবে হয় ত'। সদর দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়েছিস ত'?

বন্ধ করা হয় নাই। রঘুয়া নীচে নামিয়া গেল।

যূথী-বনে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। পায়রার পাখার মতন নরম, ভীরু দু'খানি হাত,—ঘুমে লীন দেহটি কুয়াসার আড়ালে চাঁদের মতন করুণ। সিঁথিতে সিঁদূরের ক্ষীণ একটি ইসারা। ঐ ইসারাটিতেই সুধার সকল মাধুর্য্য। কপালে ও চোখে জল ছিটাইতে ছিটাইতে প্রদোষ ভাবিতে লাগিল এ কাহার নিরুদ্দেশ অভিসারে মৃত্যুর অনুযাত্রিণী হইয়াছে! কোথা হইতে আসিল, কোথায় আবার যাইবে!

গভীর শ্রান্তিতে সুধার সর্ব্বাঙ্গে সুপ্তি নামিল বুঝি। সে পাশ ফিরিল। দেহের কাঠিন্য শ্লথ হইয়া আসিল,—শুইবার ভঙ্গিটিতে একটি সুকোমল অবসাদ। পা দুইটা এখনো একটু ঠাণ্ডা আছে। কুণ্ঠিত কলির মত দু'টি পা। প্রদোষ তাহাতে হাত বুলাইতে লাগিল।

রঘুয়া দরজায় দাঁড়াইয়া নতুন কোনো আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল; প্রদোষ তাহাকে ইসারায় নীচে পাঠাইয়া দিল। সে দরজায় পাহারা দিক; দরকার হইলে ডাকিয়া আনিবে।

এমন একটা ব্যাপার ঘটিবে কে ভাবিতে পারিয়াছিল? কাশীতে প্রদোষ আসিয়াছে সন্ন্যাস-ধর্ম্মের প্রথম পাঠ নিবার জন্য। বাড়ি-ঘর মা-বাপ ছাড়িয়া সে দীর্ঘ পথে পাড়ি দিয়াছিল, কবে ফিরিবে বা একেবারে ফিরিবেই না তাহার কিছুই হিসাব ছিল না। বীণার অন্যত্র যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে শুধু তাহাই নয়, পরীক্ষায়ও সে ফেল হইয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। পার্থিব জীবনে তাহার আর স্পৃহা নাই। ভাবিয়াছিল কাশীতে দিন কতক বিশ্রাম করিয়া সে এলাহাবাদ হইয়া প্রথমত দিল্লী যাইবে, সেইখান হইতে হরিদ্বার। কিন্তু বলা-কহা নাই, হঠাৎ এ কী উৎপাত জুটিয়া গেল!

উৎপাতই ত'। কতদিন আটকাইয়া থাকিতে হয় কে জানে! কাহার ঘরণী কুল ডিঙাইয়া তাহাকে ত্রাণকর্ত্তা ঠাওরাইয়া এমন সশরীরে আত্ম-সমর্পণ করিয়া বসিল। কতক্ষণে জ্ঞান হয় কে জানে। জ্ঞান হইয়া চোখ আবার চাহিবে ত'! চোখ না চাহিলেই ত' ফর্সা!

বিছানার উপর পা দুইটা গুটাইয়া লইয়া প্রদোষ সুধাকে আরো জোরে হাওয়া করিতে লাগিল। আঁজলা ভরিয়া জল লইয়া তাহার কপালে ও চোখে ঠোঁটে ও গলায় কানের পিঠে ও ঘাড়ে ছিটাইতে লাগিল। সুধার সর্ব্বাঙ্গে যেন চেতনার

চাঞ্চল্য আসিয়াছে। মেয়েটির উন্মীলচক্ষু মুখের মধুরতর লাবণ্যটি দেখিবার জন্য মমতাবিহ্বল দৃষ্টিতে প্রদোষের সে কী প্রতীক্ষা!

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ সুধা ধড়মড় করিয়া উঠিল। কিছু যেন ভাল করিয়া ঠিক ঠাহর করিতে পারিল না। এখনো একটা তন্দ্রার কুজ্ঝটিকা তাহাকে ঘিরিয়া আছে। তাহার চাহনি ফিকে, ঘোলাটে,—দৃষ্টিতে অপার শূন্যতা!

ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রদোষ কহিল,—তোমার আর কোন ভয় নেই।

কাহার মমতাময় কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুধার স্নায়ুগুলি সেতারের তারের মত ঝঙ্কার করিয়া উঠিল। অস্পষ্ট লণ্ঠনের আলোকে সে কাহাকে যে নিমেষে চিনিয়া বসিল বলা কঠিন; একান্ত অন্তরঙ্গের মত অনুরাগময় অভিমানে সে সহসা প্রদোষের কোলের উপর মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইয়া উঠিল: এতক্ষণ আমাকে ফেলে তুমি কোথায় ছিলে?

এই মুহূর্ত্তেই আকস্মিক স্বপ্নভঙ্গের নিদারুণ আঘাত এই মেয়েটিকে সহিবে না। সে বুঝুক, বুঝিয়া স্বস্তি পাক যে সে নিরাশ্রয় নয়, তাহাকে রক্ষা করিবার মত তেজ ও শক্তি, মমতা ও মনুষ্যত্ব এখনো সংসারে দুর্লভ হয় নাই। কপালের কাছে ভিজা চুলগুলিতে আঙুল বুলাইতে বুলাইতে প্রদোষ গাঢ়স্বরে কহিল,—আর কিছু ভয় নেই, এইবার চুপ ক'রে লক্ষ্মীটির মত ঘুমোও, কেমন?

আরো নিবিড় সান্নিধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া সুধা কহিল,—তুমি আমাকে ফেলে যাবে না বল।

—পাগল! প্রদোষ তাহার পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল।

কয়েকটি স্তব্ধ, নিস্পন্দ মুহূর্ত্ত! সুধার হয় ত' ঘুম আসিল। এই ভয়ঙ্কর উত্তেজনা ও প্রাণ লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন-প্রয়াসের পরিশ্রমে তাহার শরীর একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছে! বিস্তৃত দেহটিতে এমন একটি আলস্যের লাস্য রহিয়াছে যে প্রদোষের সমস্ত চেতনা বিহ্বল, বিমূঢ় হইয়া গেল। সে না পারিল তাহাকে বালিশের ওপর তুলিয়া দিতে, না পারিল এই একাকী রাত্রের অপরিচিত অন্ধকারে এই মেয়েটিকে অসংলগ্ন ভাষায় বীণা বলিয়া সম্বোধন করিতে! চিত্রার্পিতের মত সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার দেহে যেন স্নায়ু নাই, স্বর!

হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়িয়া সুধা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল: ঐ, ঐ! ওরা এল, এল আমাকে ধরতে—ঐ—

প্রদোষ তাহাকে ঘনতর স্নেহাবেষ্টনে বুকের মধ্যে টানিয়া কহিল,—কৈ, কেউ না। কার সাধ্য তোমাকে ধরে? আমি আছি কি করতে তা' হ'লে? অমন ক'রে কেঁপো না, লক্ষ্মীটি—এই যে আমি। কিসের ভয়?

কতক ভয়ে, কতক আবেশে সুধা আর চোখ মেলিল না। তাহার হাতের মুঠিটা ঠাণ্ডা, আঙুলগুলি বাঁকানো—নীচের পাতলা ঠোঁটটি রজনীগন্ধার পাপড়ির মত কাঁপিতেছে। প্রদোষ আঙুল দিয়া ঠোঁট দুইটা সরাইয়া দেখিল দুই পাটি দাঁত পরস্পরের সঙ্গে লাগিয়া রহিয়াছে, নিশ্বাস কেমন চাপা ; নাড়ী দেখিতে চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার সঙ্কেত ঠিক বুঝিল না—মনে হইল কেমন-যেন অবসন্ন, মন্থর! ভাবিল রঘুয়াকে একটা হাঁক দিবে কি না। কিন্তু ভয়বিকৃতকণ্ঠে অমন একটা খোট্টা নাম হাঁকিয়া উঠিলে হয় ত' দুঃস্বপ্নের মাঝেই মেয়েটি মিলাইয়া যাইবে। সে তাড়াতাড়ি সুধাকে প্রসারিত অবস্থায় শোয়াইয়া দিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া তাহার হাত-পা গরম করিতে বসিল। হাতে-পায়ে রক্ত একটু অতিরিক্ত হইয়া উঠিতেই সে আবার চোখে মুখে জল ছিটাইতে লাগিল।

নিতান্ত অসহায়ের মত সুধা কহিল,—তুমি কৈ?

তাড়াতাড়ি তাহার গা ঘেঁসিয়া সরিয়া আসিয়া প্রদোষ কহিল,—এই ত' আমি—তোমার কাছে। কেন তুমি অমন ভয় পাচ্ছ?

—না, ভয় পাচ্ছি না। তুমি আমাকে খুব জোরে জড়িয়ে ধর। আমাকে চ'লে যেতে দিয়ো না। তোমার কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে দলে দলে লোক আসছে—হাতে ছোরা,—ঐ যে! ঐ আবার এলো! ঐ আমার দিকে তাকিয়ে শাসাচ্ছে—

প্রদোষ ব্যাকুলতর দুর্ভাবনায় মেয়েটিকে লতার মত জড়াইয়া ধরিল; কহিল—আমার কাছ থেকে কেউ তোমাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এবার তুমি ঘুমোও।

সুধার শরীরে সাড়া নাই, দয়িতালিঙ্গনের মাঝে সে যেন নিজেকে ঢালিয়া ঢালিয়া ফুরাইয়া দিয়াছে।

এই স্পর্শে না আছে রমণীয় রোমাঞ্চ, না বা শীতল শিহর! কেমন একটা মূঢ় আবেশ—জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখার মত একটা আনন্দহীন নিষ্প্রাণ আকাঙ্ক্ষা! প্রদোষ কিছুই আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না, না চিন্তায় না চেতনায়!

পাছে এই স্পর্শটুকু শিথিল করিয়া দিলে মেয়েটি আবার নিরুত্তাপ শয্যায় সহসা চীৎকার করিয়া উঠে, সেই ভয়ে প্রদোষ তাহাকে দুই বাহুর মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিল। প্রখর ও অবিচ্ছিন্ন মনোযোগ সহকারে সে মনে মনে মুহূর্ত্ত গুনিতে লাগিল। টেবিলের উপর ক্ষুদে রিষ্ট-ওয়াচটা একধারে পড়িয়া আছে, তাহার হার্ট-বিট এখান হইতে শোনা যাইতেছে না। এই প্রগাঢ় নিস্তব্ধতায় প্রতিটি মুহূর্ত্ত মুখর—অন্ধকারে তাহাদের অগণন শোভাযাত্রা চলিয়াছে। এই মুহূর্ত্তের সমুদ্র কবে পার হইবে ভাবিয়া সে হাঁপাইয়া উঠিল।

সে খুঁটিয়া খুঁটিয়া মেয়েটিকে দেখিতে লাগিল। কে বলিবে এ তাহার বীণা নয়। যেন বাসরশয্যা হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। সাহসিকা অভিসারিকা নয়, ত্রস্তা বেপথুমতী। মুখখানি তেমনি করুণ,—অস্তমিত চাঁদের কিনারে আকাশটুকুর মত অশ্রুম্লান! ঠোঁট দু'টিতে সেদিনের বিগতগন্ধ স্মৃতির আভাসটুকু এখনো যেন লাগিয়া আছে। ললাটে সেই আভা। এক দিন এমনি করিয়াই তাহার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া থাকিতে থাকিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল! সেই দিন এখনো অবসান হয় নাই। মাঝে প্রদোষ দুরন্ত শিশুর মত মা'র কোলে ঘুমাইয়া ছিল বুঝি—হ্যাঁ, প্রথম প্রেমের বিস্মৃতিটি মা'র মতই তাপবিমোচিনী! বীণা আবার আসিয়াছে। কিম্বা, বীণা বলিয়া হয় ত' কেহ ছিল না। কে জানে, হয় ত' এই বীণা আবার স্তব্ধ হইয়া যাইবে।

এই রাত্রি দীর্ঘায়ু হোক!

প্রদোষের মনে কবি-কল্পনার মত সুধার দেহ ভরিয়া এখন ঘুম নামিয়াছে। তাহার দেহভঙ্গীটি এখন স্বাভাবিক, সুস্থ—মুখের সেই কঠিন পাণ্ডুরতা তরল হইয়া আসিয়াছে। নিশ্বাস লঘু, গাত্রোত্তাপ স্নিগ্ধ। আলগোছে সে মেয়েটিকে বালিশে ভর করিয়া শুইতে দিল। একটু চঞ্চল হইয়া উঠিতেই সে আবার তাড়াতাড়ি সরিয়া আসিল। সুধা কথা কহিল না, খালি দুর্ব্বল ডানহাতটি প্রদোষের কোলের উপর বিছাইয়া দিয়া পরম স্বস্তিতে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

ক্রমে লণ্ঠনের তেল ফুরাইয়া আসিল এবং আলোটা নিবিয়া যাইতেই প্রদোষ টের পাইল কৃষ্ণপক্ষের বিবর্ণ চাঁদ মেঘের জানালায় মুখ বাড়াইয়াছে। তাহাকে আর বুঝি সন্ন্যাসী থাকিতে দিল না। মূর্চ্ছিত সুধা ও ঘুমন্ত সুধায় কত প্রভেদ! যেন লণ্ঠনের আলো আর কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ! হঠাৎ সে নত হইয়া নিজের মুখের উপর সুধার মৃদু-মৃদু নিশ্বাসটি বারকতক অনুভব করিল। আরো একটু নত হইতেই সুধার বুকের মধ্য হইতে কি একটা কঠিন জিনিস হঠাৎ তাহার হাতে খোঁচা মারিয়া বসিল। প্রদোষের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

তাড়াতাড়ি অথচ অতি সন্তর্পণে সে মেয়েটির বুকের বস্ত্রবাহুল্য স্বল্প করিতে সুরু করিল। বোধহয় মেয়েটির জামার অন্তরালে তাহার জীবন-রহস্যের চাবি আছে। সেমিজের ধারটা টানিয়া তুলিতেই যে অল্প একটু ফাঁক হইল তাহারই একটুখানিতে ভীরু নির্লোভ হাতখানা খানিকটা ঢুকাইতেই সে সেই শক্ত জিনিসটার নাগাল পাইল। অতি ধীরে তাহাকে বাহির করিয়া আনিল। আলো না থাকিলেও বুঝিতে তাহার দেরি হইল না যে এ একটা খাপে-ঢাকা ছোরা!

একটা ভয়ঙ্কর রূপক। নারীপ্রেমাতুর সন্ন্যাসীর শাসনদণ্ড।

প্রদোষ হটিয়া গেল। এইবার সে ভয় পাইয়াছে। মায়াবী কাশী!

কিন্তু মেয়েটির মুখে কী সুচারু বিষণ্নতা! প্রিয়বিরহবিধুরা গভীর রাত্রে চুম্বনের স্বপ্ন দেখিয়া সানন্দ লজ্জায় যেমন করিয়া অধরে একটি ক্ষণ-তৃপ্তির ক্ষীণ রেখা টানে, তেমনি একটি হাসি তাহার ঠোঁটের বালিশে ঘুমাইয়া আছে। এ মেয়েটি কাহাকে হত্যা করিতে বাহির হইয়াছিল! বস্ত্রান্তরালে ছোরা, অথচ মুখে এমন একটি নিষ্পাপ মাধুর্য্য!

প্রদোষ তক্তপোষ হইতে নীচে নামিয়া অতি তাচ্ছিল্যভরে কাশীর দেবতাকে জোড়হাতে নমস্কার করিয়া কহিল,—জয় বাবা বিশ্বনাথ!

কোনো একদিন আকাশের সূর্য্য নাকি গলিয়া-গলিয়া ফতুর হইয়া যাইবে। ভাগ্যিস সে-লগ্ন এখনই আসিয়া পৌছে নাই। অট্টালিকার সারি সরাইয়া প্রথম রশ্মিরেখা উঁকি দিয়াছে।

সুধা এখনও ঘুমে। ক্লান্ত দেহে ঘুমের সুষমাটি লাবণ্যকে গাঢ় করিয়াছে। যেন এই রাত্রি প্রভাত হইলে কোন আকাঙ্ক্ষিত সূর্য্যের সঙ্গে তাহার শুভদৃষ্টি ঘটিবে। তাহার দৃষ্টির অজস্র বন্যায় সে স্নান করিয়া নির্ম্মল হইয়া উঠিবে, তাহারই দৃষ্টির বন্যায় সমস্ত অন্ধকার অপসৃত; অপরিচিত পথের কিনারা খুঁজিতে তাহার আর দেরি নাই।

প্রদোষ ঘরের মধ্যে অস্থির পদে পাইচারি করিতেছিল।

এত বেলায় উঠা সুধার অভ্যাস নয়। তাই একটু বিব্রত হইয়াই সে তাড়াতাড়ি গায়ের উপর শিথিল বস্ত্রাঞ্চল টানিতে টানিতে উঠিয়া বসিল। এতক্ষণ তাহার মনে হইতেছিল সে কলিকাতায় তাহাদের পটুয়াটোলার বাড়িতে দোতালার ঘরে তাহার মায়ের ফোটো শিয়রে রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মধ্য রাত্রে মূর্চ্ছিত চেতনায় তাহার একবার মনে হইয়াছিল সে বীরেনেরই কোলে মাথা রাখিয়া একাকীত্বের ভার লাঘব করিতেছে—তাহার নিরুদ্দেশ পথ-সাথী, তাহার উড্ডীন দুই পাখার আকাশ-আশ্রয়! কিন্তু তাহা ত' নয়,—তবে?

সহসা সম্মুখে অপরিচিত পুরুষকে দেখিয়া সুধা ভয়ে লজ্জায় দুঃখে ভাবনায় একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। দুর্ব্বল অসুস্থ শরীরটা প্রবল উত্তেজনায় ভাঙিয়া পড়িতে চাহিল। তবু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া সে কহিল,—আমি কোথায়?

প্রদোষ একটু সরিয়া আসিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল,—তার চেয়ে বলুন আপনি কে? যেখানে আপনি আছেন সেখানে কেউ এসে আপনাকে ছোঁয়া দূরে থাক, ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াতে পারবে না। আপনার কিছু ভয় নেই।

সুধা তাড়াতাড়ি মাথার উপর ঘোমটা টানিয়া দিল। লজ্জায় তাহার দুই চক্ষু ফাটিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

খবর পাইয়া কলিকাতা হইতে বীরেনের বাবা দেবেন বাবু কাশীতে আসিয়া হাজির হইলেন। ছেলে তাঁহার গুণ্ডামি করিয়া পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়াছে এমন একটা খবর তাঁহার ডার্বি-জেতার মতই অসম্ভব ছিল! ব্যাপারটা সোজা নয়, ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কাশীর অন্য কিছু কারসাজি আছে!

তীক্ষ্ণ এক জোড়া গোঁফে দেবেনবাবুর রেখাকুটিল মুখের রুক্ষতা বাড়িয়াছে। ছোট ছোট চোখে নিষ্করুণ সন্দেহ; উঁচু কপালটায় ঔদ্ধত্য, রোমশ হাত দুইটা যেন জহ্লাদের! বাপকে বীরেন বাঘের চেয়েও বেশি ভয় করিত। তাই দেবেনবাবুকে সশরীরে লক্-আপ এ উপস্থিত হইতে দেখিয়া বীরেন একদিকে নিশ্চিন্ত হইল বটে, কিন্তু বাবার কাছে কি জবাবদিহি করিবে—সেই ভয়ে তাহার হাত-পা সির-সির করিয়া সমস্ত গায়ে ঘাম দিল।

দেবেনবাবু প্রতিপত্তিশালী লোক বলিয়া ব্যাপারটা তাঁহার মিটাইয়া ফেলিতে মোটেই বেগ পাইতে হইল না। ছেলের এই অশোভন আচরণের জন্যে তিনি নিজেই এমন একটা ধমক হাঁকিলেন যে বীরেন বসিয়া পড়িল। তাহার পর আচ্ছা করিয়া তাহার কান মলিয়া দিলেন। বীরেন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু একটুও প্রতিবাদ করিতে পারিল না।

মুন্সির ঘাটের মোক্ষদা ঠাকরুণ হঠাৎ কিছু মোটা টাকা পাইয়া স্বস্তিতে হাই তুলিলেন।

দেবেনবাবু বলিলেন,—আপনার ত' কিছু আর খোয়া যায় নি। দেখেছেন ত' ভালো ক'রে?

টাকাগুলি গুনিতে গুনিতে মাসি বলিল,—তা যায় নি বটে।

—ছেলে আমার ভীষণ গোঁয়ার, মুখের কথায় মাথা ফাটায়। আপনার কাছে এসেছিলো জল চাইতে। তেষ্টার সময় জল পায়নি কি না, তাই অমন তেড়ে-ফুঁড়ে মারমুখো হ'য়ে ছুটে এসেছিলো। তা, পুলিশ আর ওকে কম ঠ্যাঙায়নি।

মাসি কপালের উপর চোখ তুলিয়া বলিলেন,—জল? কাশীতে আবার জলের অভাব? ডুবে মরতে চেয়েছিলো ত গঙ্গাই আছে—তেষ্টা মেটাতে ইহকালের। ছোঁড়া আমায় এসে বল্লে কি না, মাসি তোমার বোনঝিকে আমি বিয়ে করেছি, পঞ্চব্যান্নন রেঁধে দাও এক্ষুনি। মার ঝাঁটা পোড়ারমুখো।

—ছেলেটা আমার অমনিই পাগলা। বলিয়া দেবেনবাবু হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন: মিছিমিছি তোমার পৃষ্ঠে লেগে তোমায় হায়রানি ক'রে ছাড়লো, নাও, জলখাবার খেয়ো, বুঝলে? এ নিয়ে আর কোনো কেলেঙ্কারি করো না।

থানায় ফিরিয়া আসিয়া দেবেনবাবু আবার বীরেনকে লইয়া পড়িলেন। এ সময়টুকুতেও তাহার মুক্তি ছিল না, দস্তুরমত পুলিশের জিম্মায় বসিয়া থাকিতে হইয়াছে। বসিয়া বসিয়া তাহার উদ্বেগের আর পার ছিল না। সেই রাত্রে পুলিশের সঙ্গে মেসএ ফিরিয়া সে সুধাকে দেখিতে পাইল না কেন? কোথায় গেল সে? তাহার পর পুরা দুই দিন কাটিয়া গেল, কক্ষচ্যুত তারার মত কোথায় ছিটকাইয়া পড়িল না-জানি? কে তাহাকে কুড়াইয়া লইয়াছে? সে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে, না অবিশ্বাস! এমনি করিয়াই কি সে তাহাকে সর্ব্বনাশের পথে ঠেলিয়া দিয়া নিজে একা কলিকাতা ফিরিয়া চলিয়াছে? ঘরের স্নেহছায়ার পিয়াসী হইয়া আসিয়া সে কি এখন নিষ্পাদপ মরুভূমির প্রান্ত খুঁজিয়া ফিরিবে?

বীরেনের ইচ্ছা হইল থানার সমস্ত আগল ভাঙিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে। হেমন্তকে পুলিশে ধরাইয়া সুধার কিনারা পাইতে হয় ত' তাহার দেরি হইবে না। সুধা এই চলমান জনস্রোতের মধ্যে অস্পষ্ট পদচিহ্নের মত মুছিয়া যাইবে, আর সে নিশ্চিন্ত প্রসন্নতায় দিন-রাত্রির ঢেউয়ে ভাসিয়া ভাসিয়া আবার হয় ত' কোনোদিন আরেকটি কিশোরীর দেহের ঘাটে তরী ভিড়াইবে,—সুধা হয় তখন শশ্মানের ধূলা, নয় ত' পথের পণ্যবীথিকায়! সে কেন সুধার সঙ্গে ঝগড়া করিতে গিয়াছিল? কেন সে উহাকে সঙ্গে লইয়া বাহির হয় নাই? যা থাকে বরাতে, ঐ কনেষ্টবলটার মুখে একটা লাথি মারিয়া তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া ভোঁ ছুট দিবে—সোজা ত্রিপুরা-ভৈরবী।

কিন্তু কিছু একটা করিবার আগেই দেবেনবাবু আসিয়া উপস্থিত। সোজাসুজি কহিলেন,—এখুনি কলকাতায় যেতে হবে।

—এক্ষুনি? বীরেন ঘাবড়াইয়া গেল।

—হ্যাঁ, এখুনি। এই রামপ্যারী, একঠো টাঙা বোলাও জলদি।

বীরেনের মুখে ভাষা জুয়াইল না। ছোট জানলা দিয়া রৌদ্রদগ্ধ আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

টাঙা আসিলে দেবেনবাবু বলিলেন,—চান্ টান্ ষ্টেশনেই সেরে নেওয়া যাবে। খাওয়া রিফ্রেস্‌মেণ্ট রুমে। চল্। আর এক মুহূর্ত্তও দেরি না—নে, ওঠ্।

জনবিরল রাস্তাটার চারদিকে ব্যাকুল সন্ধিৎসু দৃষ্টি ফেলিতে ফেলিতে বীরেন

টাঙায় উঠিয়া বসিল। একবার শুধু বলিল,—ভেবেছিলাম একবার লাক্ষ্ণৌ যাবো। এখন ত' আমার ছুটি।

দেবেনবাবু এ-কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া কোচোয়ানকে কহিলেন,—ঘোড়াকে চানা ছুটো বেশি খাওয়াতে পারিস না?

বীরেন মুখ গোমরা করিয়া বসিয়া রহিল। ষ্টেশন আসিয়া পড়িয়াছে।

স্নানে বা আহারে তাহার আর রুচি নাই। তবু মাথাটা ধুইয়া কিছু তাহাকে গিলিতে হইল। নিজে রাঁধিয়া ভাত বাড়িয়া থালাটা বীরেনের সামনে আগাইয়া দিয়া সুধা পাখা-হাতে কাছে বসিয়া ভোজন-ব্যাপারটাকে সুষমামধুর রমণীয় করিয়া তুলিবে—এই স্বপ্ন কোনোদিন সে ভুলেও দেখিয়াছিল বলিয়া আজ তাহার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল।

গাড়ি আসিয়া ভিড়িল, ছাড়িতে তখনো আধ ঘণ্টার উপর দেরি। দেবেনবাবু বীরেনকে লইয়া একটা থার্ড-ক্লাশ কম্পার্টমেণ্টে ঢুকিলেন। বীরেন প্ল্যাটফর্মে নামিয়া পাইচারি করিতে যাইতেছিল, দেবেনবাবু বাধা দিলেন: না। রোদ্দুরে আবার হাঁটা কেন? শুয়ে ঘুমো না। এই নে, আমার কাছে একটা বই আছে। বলিয়া হাত-ব্যাগ হইতে একটা সস্তা ছেঁড়া ডিটেক্‌টিভ্ উপন্যাস বাহির করিয়া দিলেন। বীরেন বইটা স্পর্শও করিল না; অন্যমনস্ক হইয়া বাহিরে চাহিয়া রহিল।

বিদ্রোহ বীরেন করিতে পারে না এমন নয়; কিন্তু দরজা খুলিয়া ছুট দিলেই সে রেহাই পাইবে আর বাবা বসিয়া বসিয়া আলস্যে হাই তুলিবেন এমন ব্যবস্থা রাম-রাজত্বেও কাহারো কল্পনায় আসিত না। বাবা যে শুধু পশ্চাদ্ধাবন করিবেন তাহা নয়, পকেট হইতে তাঁহার নিদারুণ অস্ত্রটাও হয় ত' প্রয়োগ করিতে দ্বিধা করিবেন না। এত বড় উচ্ছৃঙ্খল যে বিদ্রোহী, সে দুর্ভাগ্যক্রমে সন্তান হইয়াছে বলিয়াই পরিত্রাণ পাইবে, দেবেনবাবুর নিয়ম-কানুনগুলি তত শিথিল নয়। ধরা ত' সে পড়িবেই, লাভের মধ্যে দুপুর রৌদ্রে ভরা-পেটে খানিকটা দৌড়-ঝাঁপ করিয়া হুমড়ি খাইয়া আছাড় পড়া ছাড়া আর কী? না, মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া তাহাকে পথ খুঁজিতে হইবে। আর সে হঠকারিতা করিবে না। তাহার স্বভাবের এই অপরিণামদর্শী উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য সুধা তাহাকে কতদিন বকিয়াছে! বকিবার সময় সুধার চিবুকের উপর কেমন ছোট দুটি টোল পড়িত! নাকের ডগায় দুটি বিন্দু ঘাম! কপালের কিনারে দুটি কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ সাপের ফণার মত সর্ব্বদা ফুলিয়া থাকে!

কিন্তু এই কি সুধার রূপ ধ্যান করিবার সময়? বীরেন কহিল,—একটা লেমনেড্ খেয়ে আসছি বাবা—

দেবেন বাবু কহিলেন,— না। মোগলসরাইয়ে গিয়ে খাবে!

—ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে যে।

—থাক্। মনে থাকে যেন, তুমি এখনো পুলিশ-কাষ্টডিতে—

বীরেন চুপ করিয়া গেল। এই প্রকাণ্ড পৃথিবীর কোন স্বল্পপরিমিত স্থানটিতে সুধা এই মুহূর্ত্তটি যাপন করিতেছে না জানি! শেষকালে ঐ জানোয়ার ম্যানেজারটা তাহাকে লুফিয়া নিবে? তাহার প্রতিকারের জন্য সে কোনো চেষ্টা করিবে না? বাবাকে সে সব কথা খুলিয়া বলিবে? লাভ কি হেমন্ত ধরা পড়িবে বটে, কিন্তু সুধা?

গাড়ি ছাড়িল। দেবেনবাবু গম্ভীর হইয়া কহিলেন,—তোমার জন্যে পাত্রী ঠিক হ'য়ে গেছে, দিন দশেক পরে একটা দিন আছে দেখেছি। মনে মনে তুমি তৈরি হ'য়ে নাও। পাত্রী সুন্দরী, নগদ টাকাও পাওয়া যাবে। বিয়ে ক'রেই বিলেত চ'লে যাও, দিশি ডিগ্রি সিকেয় তুলে রাখ।

অন্য সময় হইলে বীরেন লাফাইয়া উঠিত। জীবনে সে এতদিন খালি লণ্ডনের কুয়াসাচ্ছন্ন আকাশের স্বপ্ন দেখিয়াছে। কিন্তু আজ সে বাঁকিয়া বসিল। সোজা বাবার মুখের উপর বলিয়া বসিল,—বিয়ে আমার হ'য়ে গেছে—

গলাটা সামনে বাড়াইয়া দিয়া দেবেনবাবু বলিলেন,—কী বল্লে?

জিভ্ দিয়া উপর-ঠোঁটটা একটু চাটিয়া বীরেন বলিল,—সম্প্রতি আমি বিয়ে করেছি।

—কোথায়?

—এই কাশীতে।

—কাশীতে? দেবেনবাবু গলাটাকে গুটাইয়া স্বাভাবিক ভঙ্গিতে নিয়া আসিলেন: কাশীতে? বলিয়াই হাসি। সে-হাসি রুক্ষ, জ্যৈষ্ঠের তপ্ত হাওয়ার মত তাহাতে এক কণা আর্দ্রতা নাই।

বীরেন দেবেনবাবুর মুখের পানে চকিতে একবার দৃষ্টি ফেলিয়াছিল, কিন্তু ভস্ম হইয়া যাইবার ভয়ে বাহিরের দিকে চোখ ফিরাইয়া লইল। কহিল,—বিলেত আমি যেতে পারি, কিন্তু আর একলা নয়, সস্ত্রীক। এবার আর পড়তে নয়, দেশ দেখ্‌তে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হবে। তুমি চল না একবার কল্‌কাতা!

ভয় পাইয়া বীরেন আবার বাবার দিকে তাকাইল: কিন্তু বিয়ে আর করছি না।

দেবেনবাবুর মুখে সেই নিষ্ঠুর, চাপা হাসি: তাতে কি? কাশীতে অমন এক-

আধটা বিয়ে সবাই ক'রে থাকে। তাতে স্ত্রীর সংখ্যাবৃদ্ধির কলঙ্ক লাগে না, বুঝলে ?

বীরেন বুঝিল। তাই আর একটিও বাক্যস্ফুরণ করিল না। সুধাকে সে পৃথিবীর জনতার মধ্যে ছুঁড়িয়া দিয়া স্বচ্ছন্দে পিঁড়ি টানিয়া আরেকটি কিশোরীর মুখোমুখি হইয়া শুভদৃষ্টির লালসায় রোমাঞ্চিত হইতে থাকিবে—বিধাতা তাহার অদৃষ্টে কি এই লিখিয়াছিলেন ? সুধার সঙ্গে এই দুটি দিন তাহার বনিবনা হয় নাই বটে, কিন্তু তাহারই হাত ধরিয়া ত' সে এই বিপুল জনারণ্যে পা বাড়াইয়াছিল ? তাহারই সন্তানধারণের গৌরবে ত' সে সীমন্তে সিন্দুরের সঙ্কেত ধারণ করিয়াছে ! মেয়েটির স্বভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার যে রুদ্রতার আভাস পাওয়া যায়, তাহাই ত' তাহার চরিত্রের মহিমা ! উহাকে লইয়া সে আগ্রায় নির্জ্জন যমুনার ধারে একটা মুসাফির-খানা তৈরি করিয়া দিন গুজ্‌রাইবে আর রাত্রে তাজমহলের শ্বেত পাথরের মেঝের উপর শুইয়া আকাশ দেখিবে—কানে কানে সেইদিনও বীরেন এই কথা বলিয়া তাহাকে চুমা খাইয়াছিল। জীবনে সুধাই উহার ডাক্তার, সুধার সুখসান্নিধ্যই উহার মহৌষধি ! কিন্তু সেই সুধাকে ফেলিয়া তাহাকে কি না বিষবৃক্ষে জলসিঞ্চন করিতে হইবে ? কখনই না, সে নিশ্চয়ই পালাইবে। ধরা সে পড়ুক, কিন্তু জোর করিয়া তাহাকে কেহ ঢেঁকি গিলাইতে পারিবে না। বিয়ে যদি সে করেও, সুধাই তাহার পৃথিবীব্যাপিনী আকাশ ! দেহসুখবিধায়িনীর প্রতি তার কোনো দায়িত্ব নাই, জুতার সে সুখতলা !

হ্যাঁ, মারবোই ত, একশো বার মারবো। কেন তুমি সুধার চিঠি ছিড়্‌লে ?

বেশ করেছি। ওর ফটোটা টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে দেব আমি। ঘটা ক'রে আবার টেবিলের ওপর টাঙিয়ে রেখেছেন—

ছেঁড় দিকিন্। জুতো দিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব না ?

আমার জুতো নেই ?

তোমার ত' লপেটা, আমার সু। এসো না, কে কার মুখ ছেঁড়ে !

বীরেন ধড়্‌ফড়্ করিয়া জাগিয়া উঠিল। গাড়ি আসিয়া মোকামার ঘাটে লাগিয়াছে। সে দিন-দুপুরে স্বপ্ন দেখিতেছিল বুঝি। ভাগ্যিস্ দুপুরের স্বপ্ন ফলে না।

বীরেন বলিল,—বিয়েতে আমার মত আছে বাবা, নগদ কত দেবে ?

দেবেনবাবু খুসি হইয়া কহিলেন,—পাঁচ হাজার। গয়নাও আটাশ ভরি। নাই বা হল কুলীন। টাকা পেলে ঔদার্য্য একটু বাড়ে বৈ কি।

--নিশ্চয়। আপনি তোড়জোড় করুন। আমি পাশপোর্টের বন্দোবস্ত দেখি।

—কিছুরই তোমার বন্দোবস্ত দেখ্‌তে হবে না। আমি তা হলে মাথার ওপর আছি কি করতে? কালকেই আমার সঙ্গে তা হলে চলো মেয়ে দেখ্‌তে কেমন?

—আচ্ছা।

বাবাকে এইরূপে একটা জরুরি কাজে ব্যাপৃত হইতে দিয়া বীরেন সাজিয়া-গুঁজিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

এই সজ্জার আড়ম্বরটুকু দেবেনবাবুর চোখ এড়াইল না। স্ত্রীকে বলিলেন,—বিয়ের নাম শুন্‌লেই ছেলেরা কেমন-একটু উস্‌খুস্‌ হয়ে ওঠে, দেখ্‌লে? ছোঁড়া গোঁফের প্রান্তে দিব্য একটু এসেন্স্‌ লাগিয়েছে, সিল্কের রুমালটা পাঞ্জাবির বুক্‌-পকেটের মধ্যে লুকিয়ে রাখ্‌তে মন সরে নি, কোণ্‌টা আল্‌গোছে উঁচিয়ে দিয়েছে একটু।

স্ত্রী বলিলেন,—কিন্তু পথে যে তোমাকে বল্‌ছিল কাশীতে কাকে বিয়ে করেছে তার কিছু খোঁজ নিলে?

দেবেনবাবু তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন; কহিলেন,—ওটা হচ্ছে আধুনিক কালের ছেলে-ছোক্‌রার একটা শস্তা প্যাঁচ। লোকচরিত্র আমার চেয়ে তুমি আর বেশি বোঝ না নিশ্চয়ই। মানুষ ঠেঙিয়ে হাড় কখানা আমার ঝুনো হয়েছে! তার মানে হচ্ছে এই ত বল্‌তে চায় আমাদের পছন্দে ওর মন ওঠ্‌বে না, নিজের বৌ ও নিজে বাছ্‌বে। কিন্তু পাঁচের পেছনে তিন শূন্য শুনে বাছাধনের মুখখানা আহ্লাদে কেমন পাঁচ হয়ে গেছে দেখ্‌লে? তারপর মেয়েও আমি দেখাবো। আলাপ করার আগে সব যুবতীই ছেলের মনে ধ'রে থাকে—ওটা মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের মতই স্বতঃসিদ্ধ। কনে ওর যে পছন্দ হবে তা আমার ক'ড়ে আঙুলটি পর্য্যন্ত ব'লে দিতে পারে—

বাবা মার চোখে ধুলা দিয়া বীরেন সোজা পরেশের বাড়ি আসিয়া হাজির হইল।

চন্দ্র চাটার্জ্জি ষ্ট্রীটে ছোট একখানা দোতলা বাড়ি। সন্ধ্যা। পরেশ বেড়াইতে বাহির হইয়া না গেলে হয়! উহাকে অন্তত পাঞ্জাব মেইল ধরিতে হইবে।

বাসিন্দা খালি পরেশ ও তাহার বাবা। পরেশকে প্রসব করিয়া তাহার মা মারা যাইবার পর প্রসন্নবাবু ছেলেকে লালন-পালনে সাহায্য করিবার অজুহাতে আর বিবাহ করেন নাই, চরিত্র রক্ষা করিবার নির্লজ্জ প্রয়োজনীয়তাও কোনদিন

অনুভব করেন নাই। যা হোক সদাশিব প্রফুল্ল মানুষটি! সংসারে এই পরেশই তাঁহার পরেশ।

প্রসন্নবাবু কোথা হইতে একটি মেয়েও কুড়াইয়া আনিয়াছেন—দূর-সম্পর্কের অনিন্দিতা পরেশকে দাদা বলিয়া ডাকে। অনিন্দিতা গোখেলে নীচু ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াছে, প্রাকৃতভাষায় বয়েসের যদিও তাহার গাছপাথর নাই। প্রসন্নবাবু এই দু'টি ছেলে-মেয়ে লইয়া সংসারের হাট জমাইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, এ দুইটি সহসা একদিন পরস্পরের কণ্ঠমাল্য হইয়া শোভা পাইলেই তিনি ওঁ বলিয়া সহাস্যে সরিয়া পড়িবেন। কিন্তু এই দুইটি প্রাণী নিজেদের ঘিরিয়া এমন দুর্ভেদ্য প্রাচীর তৈরি করিয়া আছে যে, প্রসন্নবাবু অন্ধকারের একটিও ঘুল্‌ঘুলি আবিষ্কার করিতে না পারিয়া ক্ষণে-ক্ষণে হাঁপাইয়া উঠিতেছেন। তবু সময়ের স্রোতে মুহূর্ত্তের পাপ্‌ড়িগুলি ভাসিয়া চলিয়াছে, সেই বিচ্ছিন্ন দলগুলিতে হয় ত' একদিন মালা গাঁথা সমাধা হইবে—গোপনে, সূর্য্যের অগোচরে, নিশীথরাত্রে।

এই কারণে এই বাড়িটা পাড়ার পাঁচজনের কাছে রহস্যের একটা ডিপো ছিল। রোয়াকে বসিয়া যাহারা সান্ধ্যমজলিস্ গুল্‌জার করে তাদের কাছে পরেশ-অনিন্দিতার সম্পর্কটার মত মুখরোচক চাট্‌নি আর কিছু নাই। অনিন্দিতাকে যাদের চোখে ভাল লাগিয়াছে তাহারা সমাজ-সংস্কারের অছিলায় পরেশকে দু' ঘা বসাইয়া দিতে পর্য্যন্ত কোমর বাঁধে। কেন না তাহারা কোথা হইতে না জানি আবিষ্কার করিয়াছে পরেশ অনিন্দিতার কাজিন্। বাঙলা সমাজকে উহারা উল্‌টাইয়া দিবে নাকি? উহারা মাঝে মাঝে এত প্রবল হইয়া উঠে যে প্রসন্নবাবুর মৃত্যুও বুঝি আসন্ন হয়।

শুধু বাহিরে নয়, অন্তপুরেও রহস্যের সমাধান মেলে না।

অনিন্দিতার আদর্শ—দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিবে। কল্যাণে উৎসর্গে প্রীতিতে।

পরেশের আদর্শ—জীবনকে খালি ভোগ করিয়া যাইবে। অক্লান্ত কর্ম্মে, পৃথিবী পর্য্যটনে। ঘরে কাহারো মন টেঁকে না।

দুই হাতে দুইটি ঘুড়ি আকাশে উড়াইয়া দিয়া বুড়ো প্রসন্নবাবু খালি সুতো গুটান্।

বীরেন ডাকে—পরেশ! পরেশ বাড়ি আছ?

পরেশ আফিস্ হইতে ফিরিয়া সাধারণত সন্ধ্যায় আর বাহির হয় না। শনিবার

অনিন্দিতাকে নিয়া বায়স্কোপে যায়, রবিবার যায় মাঠে কিম্বা চীনা হোটেলে। বীরেন তাহা জানিত। আজ ত' বৃহস্পতিবার, নিশ্চয়ই সে দোতলার বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বই পড়িতেছে।

ডাক শুনিয়া পরেশ উপর হইতে মুখ বাড়াইল।

ব্যাপার কি?

অনিন্দিতা দুয়ারের সাম্‌নে বসিয়া কালো মখ্‌মলের ওপর চিক্কণ সবুজ সুতোয় গাছের পাতা তুলিতেছিল। পরেশ কহিল,—দু' পেয়ালা চা ক'রে দাও, অনি।

বীরেনের মুখের দিকে চাহিয়া ব্যাকুল উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—তুমি শরীরী ত' বীরেন? দেখি তোমার হাত?

বীরেনের হাত ঠাণ্ডা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতার ঘাম দেখা দিয়াছে। তাহাকে কাছে বসাইয়া পরেশ ফের প্রশ্ন করিল,—সুধা কৈ? বাইরে একা দাঁড়িয়ে নাকি? তোমার যেমন সব কাণ্ড, মড়া কেটে কেটে তোমার মন একেবারে কাঠ হয়ে গেছে।

পরেশ উঠিতে যাইতেছিল, বীরেন বাধা দিয়া কহিল,—সঙ্গে কেউ নেই।

—কেউ নেই মানে? সুধাকে কোথায় রেখে এলে?

ঢোক গিলিয়া বীরেন কহিল,—সুধাকে কাশীতে হারিয়ে এসেছি।

এক মুহূর্ত্ত পরেশের মুখ দিয়া কোনো কথা সরিল না। সহসা ঝড়ো নদীতে তাহার যেন নৌকাডুবি হইল। তাড়াতাড়ি বীরেনের একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—হারিয়ে এসেছ মানে? পথে? খুঁজে পেলে না কোথাও?

—ওকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে।

—তোমার কাছ থেকে? তুমি তখন কী করছিলে হাঁদারাম? লড়্‌তে পারো নি? মর্‌তে পারো নি? তাকে তুমি স্বচ্ছন্দে ফেলে রেখে ফিট্‌বাবু সেজে পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছ?

বীরেন কহিল,—খবরটা ধৈর্য্য ধ'রে আগাগোড়া শোন, ব্যস্ততা দেবাবার সময় এখনো ফুরিয়ে যায় নি।

—খবরটা তাড়াতাড়ি সঙ্ক্ষেপে সারো বল্‌ছি।

মুখ ভার করিয়া বীরেন বলিল,—সঙ্ক্ষেপে সার্‌বার নয়।

রিষ্ট্‌ ওয়াচে সময় দেখিয়া সে পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া আগাগোড়া সব বলিয়া চলিল। জীবন উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর!

পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল,—ঐ হেমন্তই। কী বল্লে? ত্রিপুরা-ভৈরবীর গলি? বিশ্বনাথের গলিতে ঢুকেই ডান দিকে? ও অনি, অনি! চা আর করতে হবে না, শিগ্‌গির আমার ব্যাগটা গুছিয়ে দাও ত!

ডাক শুনিয়া পাশের ঘর হইতে প্রসন্ন বাবু আসিলেন। খাটে বসিয়া এতক্ষণ এক মনে পেসান্স খেলিতেছিলেন। কহিলেন,—কী হ'ল পরেশ বাবু?

—এক্ষুনি আমাকে কাশী যেতে হবে, বাবা। আর সময় নেই। ভারি জরুরি কাজ।

হাসিয়া প্রসন্ন বাবু কহিলেন,-তা না-হয় যাবে। কিন্তু বন্ধু এলে আতিথ্য করবে না সেটা কি ভাল দেখায়?

ব্যস্ত হইয়া জুতা পরিতে পরিতে পরেশ বলিল—আতিথ্য তোমরা করো, আমার সময় নেই। রামদীন কোথায়?

—রামদীন গেছে তার বৈকালিক আহ্নিক করতে।

—আহ্নিক করতে? কাজের সময় লক্ষ্মীছাড়া বাড়ি থাকে না, ওকে আমি আজই বরখাস্ত করবো।

সৌম্য হাসিতে প্রসন্নবাবুর মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কহিলেন,—বেচারা মশলা পিষছিল, সন্ধে হয়ে আস্‌চে দেখে দে ছুট্। বাজারে যেতে পারেনি ব'লে বেচারার গাঁজার পয়সা আজ রোজগার হয়নি। নিজের মনে বক্ বক্ করছিল এত খাটুনি তার আর পোষাবে না। পকেট থেকে চারটে পয়সা তাকে ছুঁড়ে দিলাম: যা ব্যাটা, দোকান এখনো বন্ধ হয় নি। পয়সা পেয়ে আর কি ও দাঁড়ায়?

—গাঁজা খেতে তুমি ওকে পয়সা দিলে?

—মায়া হয় না? ওর অমন বিবর্ণ মুখ দেখলে তুই ওকে সমরখন্দ আর বোখারা দিয়ে দিতিস্। যাক্ গে সে-কথা। ওকে কেন দরকার?

—বাঃ, আমার বিছানা-পত্র প্যাক্ ক'রে দেবে না?

প্রসন্নবাবু আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন,—ও! এই কথা? তা, আমি আছি কি করতে? ছোট খাটো একটা বেডিং বৈ ত' নয়? অনি, হোল্ড্-অল্‌টা কোথায়?

অনিন্দিতা ততক্ষণে প্লেটে ফলের টুকরা ও কাপে করিয়া চা লইয়া আসিয়াছে।

পরেশ বলিল,—জিনিস-পত্র সব ব্যাগটার মধ্যে চট্ ক'রে গুছিয়ে দাও, অনি। সেবারের মত কামাবার সরঞ্জামগুলো ভুলে যেয়ো না কিন্তু। বিছানাটা আমি বেঁধে ফেল্‌ছি। দেরাদুন এক্‌স্‌প্রেস্ কখন ছাড়ে?

প্রসন্নবাবু কহিলেন,—আর পথের জন্যে কিছু খাবার দিতে হবে না?

পরেশ ঘাড় নাড়িয়া কহিল,—না। ও একটা নুইসেন্স্। রেষ্টুরেণ্ট্ কার আছে।

—তবু। কিছু ফ্রুট্‌স্ থাকা ভালো। যাই বাজারটা ঘুরে আসি। ছ' বাক্স আঙুর,—কি বল?

অনিন্দিতা কহিল,—তোমার বিছানা বাঁধ্‌তে বাঁধ্‌তে ষ্টোভে কিছু আমি তৈরি ক'রে দিচ্ছি। এই হ'ল ব'লে।

হঠাৎ ফিরিয়া বীরেনকে বলিল,—আপনি নিঃশব্দে ওগুলো খেতে থাকুন্।

পরেশ বলিল,—কিন্তু লণ্ড্রিতে যে আমার এক গাদা কাপড় প'ড়ে আছে। হ্যাঁ আজকেই ডিউ ডেইট্। কাপড় না হ'লে যাবো কি ক'রে? যাই, তুমি বোস বীরেন্।

—তুমি বোস বাপু। বন্ধুকে ফেলে চ'লে যাওয়াটা কোন্ দিশি ভদ্রতা। দাও আমাকে রসিদটা। বলিয়া প্রসন্নবাবু নিজেই খুঁজিয়া-পাতিয়া রসিদ লইয়া ক্ষিপ্রপদে প্রস্থান করিলেন।

আধঘণ্টার মধ্যে সব গোছগাছ হইল। চোখ রাঙা করিয়া রামদীন অন্ধকারে উদিত হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই পরেশ হাঁকিল,—রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সি ধ'রে আন্ জল্‌দি। রিষ্ট্-ওয়াচে সকাল বেলা দম দিয়েছিলে অনি? শ্লো যাচ্ছে বুঝি? তোমার ঘড়িতে ক'টা? বলিয়া সে বীরেনের মুখের দিকে তাকাইল। সে-মুখ কেমন ফ্যাকাসে, যেন রক্তের লেশমাত্র আভাস নাই। খাবারের থালায় হাত ছোঁয়ায় নাই, দেয়ালে পিঠ দিয়া ক্লান্ত করুণ ভঙ্গিতে যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

—এ কি খেলে না যে কিছু?

বীরেন কোন কথা কহিল না। শান্ত নির্লিপ্ত সংসার কেমন সহসা উদ্‌ভ্রান্ত মুখর হইয়া উঠিয়াছে তাহাই সে অভিভূত হইয়া দেখিতে লাগিল।

প্রসন্নবাবু কহিলেন,—সঙ্গে যথেষ্ট টাকা-কড়ি রইলো ত'? যাচ্ছ জরুরি কাজে, কত দিন থাকতে হয় কে জানে?

গায়ে কোট্ আঁটিতে আঁটিতে পরেশ বলিল,—জরুরি ব'লে জরুরি। বিস্তারিত বলবার আর এখন সময় নেই বাবা। তবে ভয়-টয় কিছু নেই। সশরীরে ফের ফিরে আস্‌বো। দরকার হ'লে টেলিগ্রাম-পাঠ টাকা পাঠাবে। কিছু মস্‌লা দাও, অনি। লবঙ্গ নেই?

প্রসন্নবাবু দেরাজ হইতে আরো কিছু টাকা টানিয়া হাসিয়া বলিলেন,—আরো কিছু স'ঙ্গে নাও, বৎস। বিস্তারিত সংবাদ দেবার যখন এখন সময় নেই, তখন নোটটাই বিস্তৃত হোক্। ভয়-টয় আমার কিছু নেই। ভালো কাজেই নিশ্চয় যাচ্ছ। যখন যা দরকার লিখবে। তোমার কাঁধ বেয়ে এখনো যে জল গড়াচ্ছে। স্নান ক'রে তোয়ালে দিয়ে মাথাটাও ভালো ক'রে মোছ নি। এসো। বলিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া স্বহস্তে তিনি পরেশের ঘাড়ের জল মুছিতে লাগিলেন।

মনি-ব্যাগে পরেশ আরো টাকা লইল।

—গিয়েই কিন্তু খবর দিয়ো। এদিকে আফিসে বন্দোবস্ত আমি ক'রে রাখ্‌ব'খন। ম্যানেজার কাল সকালেই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।

—চলো হে বীরেন—

বীরেন কলের পুতুলের মত খাড়া হইল, কে যেন তাহাকে সিঁড়ি দিয়া নীচে ঠেলিয়া দিতেছে।

দুয়ারের কাছে আসিয়া অনি ভীরুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—কবে ফিরবে?

—কেমন ক'রে বলি? তবে একলা বোধ হয় ফির্‌বো না।

কথাটা শুনিয়া ক্ষণকালের জন্য অনি হয় ত' চম্‌কাইল। কিন্তু যে কথার অর্থ বুদ্ধির আলোকে উদ্ঘাটিত নয় তাহার গূঢ়তার অনুধাবনের বৃথা চেষ্টা করিয়া সে মনকে চঞ্চল করিতে চায় না। ধীরে টিফিন্‌-কেরিয়ারটা পরেশের হাতে দিয়া কহিল —লুচি, ভাজা, আর চাট্‌নি আর কয়েকটা অমলেট্‌ ক'রে দিলাম। রেষ্টুরাণ্ট্‌ কার-এ রাত্রি ক'রে যা-তা খেয়ে ঘুমকে বিপন্ন করো না। তাছাড়া দেরাদুন্‌ এক্স্‌প্রেস্‌এ কি খাবার গাড়ি আছে?

—না, নেই। দাও শিগ্‌গির। চলো বীরেন, ওঠ।

ট্যাক্সিটা ছাড়িতেই পরেশ ফের চেঁচাইয়া উঠিল: তাড়াতাড়িতে তোমাকে কিন্তু প্রণাম করা হ'ল না, বাবা। এখান' থেকেই হোক্—কি বল? প্রসন্নবাবু প্রতিধ্বনি করিলেন: এখান থেকেই।

দূর হইতে ফের পরেশের গলা শোনা গেল: কাল সকালে বীরেন এসে তোমাকে সব বুঝিয়ে বল্‌বে। খবর শুন্‌লে তুমিও এ-যাত্রায় আমার সঙ্গে বিশ্বনাথ-দর্শনে খেপে উঠ্‌তে—

গাড়ি এল্‌গিন রোড পার হইয়া চৌরঙ্গিতে পড়িল।

পরেশ কহিল,—তুমি হঠাৎ এমন গম্ভীর হ'য়ে গেলে কেন?

নিতান্ত উদাসীনের মত বীরেন বলিল,—কী আর কইব বল।

—না, কী আর কইবে? হেমন্ত চাটুয্যে, ত্রিপুরা ভৈরবীর গলি—কত নম্বর বল্লে? তেরো? চোখের সাম্‌নে সব আমার ভাস্‌ছে। লোকটার চেহারা পর্য্যন্ত। ছোট চোখ, পুরু ঠোঁট, মোটা ঘাড়, না?

—কি জানি!

—জান না কী। ওকে আমি টিট্‌ না করেছি ত' কী বলেছি। মেস করেছেন! দাঁড়াও আর কিছু বলতে হবে না—ঐ আমার যথেষ্ট ক্লু। চাই কি, এর পর বিলেত গিয়ে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে চাকরি বাগাতে পারবো।

ট্যাক্সি জি-পি-ও পার হইল।

অনেক পর বীরেন কহিল,—সুধাকে তুমি কি খুঁজে বার করতে পারবে? একা?

—খুঁজে বার করব মানে? স্থায়ী সুস্থ শরীরে তোমার বাম পাশে দাঁড় করিয়ে দেব। পাঁচটি দিন সবুর কর—

বুক হইতে পাথরটা একটু আল্‌গা হইতেছে: ওকে এনে কোথায় তুল্‌বে?

—কেন, তোমার মাথায়।

—কিন্তু ও যদি মামাবাড়ি যেতে চায়?

পরেশ রূঢ় কণ্ঠে কহিল,—অমন মামাবাড়ির আবদার যেন আমার সঙ্গে না করে। ও! তোমাকে আসল কথাই বলা হয় নি। জগৎবাবু—ওর মামা—গোড়ায় ওকে খোঁজ করবার জন্যে কোমর বেঁধেছিলেন, সন্দেহ ছিল তোমারই ওপর। তোমাকে জব্দ করাই ছিল ওঁর উদ্দেশ্য। বললাম,—বৃথা। ভাগ্নি আপনার লায়েক্, কিড্‌ন্যাপিঙের কিড্ নয়। তা ছাড়া এমন মেয়েকে ঘরে তোলাই পাপ, জামাইবাবু। পথে যে বেরোয়, পথই তাকে একদিন পথে বসাবে। তোমার জন্যে কম ওকালতি করেছি ভাই? কিন্তু তুমি এমন নদের চাঁদ যে, হাতের চাঁদ নদীর জলে ডুবিয়ে এলে। যাও, বিছানায় শুয়ে ঢেউ গোন গে, রাহু স্বয়ং তোমার বাহুর বালিশে সে-চাঁদ উপহার দিয়ে যাবে।

সেকেণ্ড ক্লাশ্‌টা ফাঁকা। হোল্‌ড্ অল্ খুলিয়া নীচের বার্থে পরেশ বিছানা করিয়া লইল। কহিল,—অশ্রুজলের দাম দিয়ে প্রেম কিনতে যাও, দেখ্‌বে সে-প্রেম ম্লান, বাসি; দস্যুতা ক'রে আয়ত্ত কর, দেখ্‌বে সে-প্রেম মূক মূঢ়। পাও, আকাশ শুকিয়ে যাবে, না-পাও আকাশ যাবে ফুরিয়ে, শূন্য হ'য়ে। উঠি, এবার ছাড়্‌বে। পুনরাগমনায় চ।

প্লাটফর্ম্ম হইতে ট্রেনটা অন্তর্হিত হইলেও বীরেনের বাড়ি যাইতে মন সরিল না। এখন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াও ট্রেনের নাগাল পাওয়া যাইবে না, আর খানিকক্ষণ আগে বুদ্ধি খেলিলে সে এই সঙ্গেই ভাসিয়া পড়িত। লাভ হইত কী? বাবা ফের কান ধরিয়া লইয়া আসিতেন; এইবার একেবারে স্বহস্তে হাতকড়া পরাইয়া মুখে লপ্‌সি গুঁজিয়া দিতেন। কিন্তু পরস্মৈপদী এই জয়ে তাহার চরিতার্থতা কৈ? সুধা পরেশকে চিনিবে, দৃপ্ত নির্ভীক বিজেতা পরেশ; বীরেন তাহার কাছে ঘৃণ্য কাপুরুষ, সঙ্কীর্ণ-চিত্ত, স্বার্থপর!

থাকিয়া-থাকিয়া পরেশের দেওয়া সেই ধূপদানিটার কথা তাহার মনে হইতে লাগিল: ঘুমাইয়া পড়িবার আগে শিয়রে ধূপকাঠি জ্বালাইয়া রাখিয়ো। স্মৃতির মত ধীরে ধীরে ইহার সুগন্ধ অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া যাইবে।...

স্মৃতির মত ? কিসের স্মৃতি ? পরেশ কি তবে সুধাকে ভালবাসে ?

বাক্স ভরিয়া এত জিনিস দিয়াছে,—শাড়ি-ব্লাউজ, স্নো-সাবান, টর্চ, এমন-কি একটা ছোরা ! তাই কাশীতে তাহাকে উদ্ধার করিবে ভাবিয়া বাবুর আর স্ফূর্ত্তির শেষ নাই,—কেমন ব্যস্ত, কেমন উচাটন ! তাহার এত সব অপ্রত্যাশিত সাহায্যের অন্তরালে কি খালি নিঃস্বার্থ পরার্থপরতা ! কোথাও কি একটুও গোপনলালিত বাসনা নাই ? সে-বাসনায় কি সুধা তাহার চোখে সোনার মত, বসন্তের ফুলের মত, কবিতার উপমার মত সুন্দর হইয়া দেখা দেয় না ?

দরকার কি মৃগতৃষ্ণিকার অনুসরণে ?

বাবা তাহার ঠিকই বলিয়াছেন,—কাশীতে অমন এক-আধটা বিয়ে সবাই ক'রে থাকে।

ঝগ্‌ড়াটে, গোঁয়ার, একগুঁয়ে। মুখে-মুখে বচসা, পদে পদে অমিল। ছিঁড়িয়া-ছানিয়া জীবন তাহার ঝালাপালা করিয়া দিবে। বীরেন স্বচ্ছন্দ পরমায়ু চায়, ছন্দহীন প্রেম চায় না। দরকার নাই, পরেশকে সে পথ ছাড়িয়া দিবে।

চোখে ভাল লাগিয়াছিল তাহাই হইল প্রেম, অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে নিজেকে আজো সম্পূর্ণ অনাবৃত ও নিরাভরণ করে নাই বলিয়াই তাহা মোহ—দরকার নাই এই বিলাসিতায়। তাহার চেয়ে বেনেপুকুরের ললিত ধরের মেয়েকে বিয়ে করিয়া সে সোজা লোহিত সাগর পার হইয়া যাইবে ! প্রেমে ছিপি আঁটিয়া সে এম-আর-সি-পি হইয়া আসুক।

বাড়ি আসিয়া বীরেন মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—বিকেলে বেনেপুকুর থেকে লোক এসেছিলো ?

মা বলিলেন,—এসেছিলো বৈ কি। তারা ত' এই আটাশে তারিখেই করতে চায়।

—লাগিয়ে দাও তা হ'লে। আর দেরি ক'রে কাজ নেই।

— কাল তবে নিজে একবার মেয়ে দেখে আয়। বন্ধু-বান্ধব দু'চারজন সঙ্গে নিস না হয়।

বীরেন বিরক্ত হইয়া কহিল,— বন্ধু-বান্ধব নিয়ে কী হবে ? আমার পছন্দই যথেষ্ট। টাকা দেবে ত' পাঁচ হাজার ?

—দেবে বৈ কি। কর্ত্তা অমন কাঁচা কাজ করবার নয়।

—বেশ। মেয়ে আমার পছন্দ হয়েছে, মা।

—না দেখেই ?

প্রায়।

বীরেন জামা কাপড় ছাড়িয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। মা কাছে বসিয়া কহিলেন,—তবে বল্‌ছিলি কাশীতে কাকে বিয়ে ক'রে এসেছিস্‌?

হাসিয়া বীরেন কহিল,—চোখে একটি মেয়ে হঠাৎ ভালো লেগেছিল মা। চোখে ভালো লাগলেই কি আর বিয়ে করতে হয়, না তার জন্যে চোখের জল ফেললে মানায়? ও-সব বাজে কথা।

বীরেন পাশ ফিরিল।

কিন্তু ঘুম আসে না। অনাগতা নববধূর লাবণ্য কল্পনা করিয়া নয়, এই কথা ভাবিয়া, পরেশ এতক্ষণে গ্র্যাণ্ড্‌কর্ডে আসানসোল পার হইয়া গিয়াছে।

ওভার-ব্রিজএর উপর হেমন্তর লোক পরেশকে পাক্‌ড়াও করিল।

পরেশ বলিল,—আমি ত' আপনাদের ওখানেই যাচ্ছিলাম।

দূর দেশ হইতে সাধিয়া খদ্দের আসিয়াছে—নটবরের খুসি আর ধরে না। বলে, —যাবেনই ত' আমাদের হোটেলে। ও অঞ্চলে আর যত সব বাঙালি হোটেল আছে—সব যথন নোংরা তেমনি বিচ্ছিরি। আর কোথাও থাওয়া রুচ্‌বে না মশাই। একথা হলফ্‌ ক'রে বলতে পারি।

চলিতে চলিতে পরেশ বলিল,—তা আর বল্‌তে! আমি কি আর খোঁজ না নিয়ে এসেছি মশাই? আপনাদের মেস্‌ ত্রিপুরা ভৈরবীতে ত'?

নটবর হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে বলিল,—আজ্ঞে হাঁ।

—হেমন্ত চাটুজ্জে আপনাদের ম্যানেজার না? খুব অমায়িক লোক শুনেছি। ঐ মেসে যে আমার বন্ধু একজন থেকে গেছে প্রায় দু' মাস আগে। মনে ছিল কাশীতে এলেই হেমন্তবাবুর মেস্‌ ছাড়া আর কোথাও পাত ফেল্‌ছি না।

হাত জোড় করিয়া নটবর কহিল,—আপনাদের দয়া!

—দয়া আবার কী! কর্ত্তব্য নেই? প্রবাসে এসে কয়েকজন বাঙালি মিলে' যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এই মেস্‌টা খাড়া করলেন, ভেতো বাঙালি হ'য়ে আমরা যদি তাকে না দেখি তবে বিধাতার শাপ লাগবে যে। টাঙা ঠিক করুন একটা।

—এই যে, আমাদের মেসেরই ঠিকে টাঙা আছে। আসুন।

হেমন্ত নীচে বসিয়াই হিসাব কষিতেছিল। কুলির মাথায় বিছানা-ব্যাগ চাপাইয়া নূতন যাত্রী লইয়া নটবর আসিয়াছে—দেখিয়া হেমন্ত দন্ত বিকশিত করিয়া অধিকমাত্রায় আনন্দ দেখাইয়া ফেলিল। হাসিলে লোককে এত বীভৎস দেখায়! পরেশের চিনিয়া নিতে দেরি হইল না: আপনিই ম্যানেজার? হেমন্ত বাবু? ও! নমস্কার।

হেমন্ত থতমত হইয়া বাধিত হইবার ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া রহিল।

—বাঙালির মেস, শুক্‌তো-ঝোল খেতে পাবো মশাই,—দেশি চচ্চড়ি আর শাক। মেড়োগুলোর কি খাবারের কিছু রসবোধ আছে? তা, এ-অঞ্চলে কি বাঙালি হোটেল ছিল না? ছিল, কিন্তু আপনার প্রশংসায় কল্‌কাতা একেবারে গম্‌গম্ করছে।

এতটা হেমন্ত বিশ্বাস করিতে পারিল না। তবু চোখের সাম্‌নে জীবন্ত প্রমাণকে সে কি করিয়া অস্বীকার করিবে। ঠোঁট দুইটা প্রাণপণে প্রসারিত করিয়া কহিল,—কার কাছে থেকে শুন্‌লেন?

—কার কাছ থেকে আবার? আমার কত বন্ধু এখানে থেকে গেছে। ধরুন্ না পরেশ মুখুজ্জে—সেই চশ্‌মা-চোখে ফর্সা-পানা—

হেমন্ত মুখের কথা কাড়িয়া নিয়া কহিল,—হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক চিন্‌তে পেরেছি। চমৎকার ভদ্রলোক। যাবার আগে মেসের সব চাকর-বাকরকে ডেকে দু'-দু টাকা করে' বক্‌শিস্ দিয়ে গেলেন। এমন লোককে চিন্‌বো না মশাই? কত দিন বাইরে খেয়েছেন, তবু ভদ্রলোক হোটেলের গোটা দিনের চার্জ দিয়েছেন। পরেশ বাবুকে চিন্‌লি না নটবর?

নটবর স্বচ্ছন্দে ঘাড় হেলাইল।

লোকটা ঘুঘু,—সায়েস্তা করিতে বেগ পাইতে হইবে।

সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে পরেশ কহিল,—দাড়ি কামিয়ে স্নান-টান সব সেরে ফেল্‌ছি, মাঝে সময় ক'রে একবারটি আপনি আসবেন, হেমন্তবাবু। আর, দু' বেলাই কিন্তু আমার মাংস চাই। বুঝ্‌লেন ত'?

নটবর পরেশকে বীরেনদের ব্যবহৃত ঘরেই নিয়া আসিয়াছে। সারা মেসে এইটিই ভালো ঘর, অতিথির মধ্যে কোনো বিশিষ্টতার ছাপ থাকিলে তাহাকে এই ঘরই খুলিয়া দেওয়া হয়। দক্ষিণে দুইটি জানালা; পূবের জানালা দিয়া আবার রোদ আসে।

দরজা খুলিতেই কিসের একটা চাপা হাল্‌কা গন্ধ পরেশের নাকে লাগিল।

অদরকারী জিনিসপত্র এখানে-ওখানে তখনো এলোমেলো হইয়া পড়িয়া আছে—লেফাফা, চুলের ফিতের খানিকটা, সিঁদুরের কৌটার ঢাক্‌নি। পরেশ জিজ্ঞাসা করিল,—কারা ছিল এ ঘরে?

নটবর কহিল—তা আর বলবেন না মশাই।

—কেন, কেন? এখানে ছেলেমেয়েও আসে নাকি?

—এসে উঠ্‌লে ত' আর তাড়িয়ে দেওয়া যায় না। কে কোথা থেকে কাকে বা'র ক'রে এনেছে, মেসে এসে দু'দিন গা-ঢাকা দিয়ে ভেসে পড়ে।

পরেশ লাফাইয়া উঠিল : তাই নাকি? মেয়েমানুষ বার ক'রে এনে তোমাদের এখানে তা হ'লে দিব্যি দু'-তিন রাত্তির—তা, তোমরা কী ক'রে বুঝবে যে এ স্ত্রী নয়!

—সে আমরা পায়ের শব্দ শুনে ব'লে দিতে পারি।

—নিশ্চয়ই। পাকা ঝুনো লোক—তোমাদের সঙ্গে চালাকি? এ-ঘরে যারা ছিল তারাও বুঝি কুলে কালি দিয়ে এসে শেষকালে তোমাদের মেসেই আস্তানা গাড়লো। তোমরা এমন সদাব্রত জান্‌লে আমিও এমন খালি হাতে আস্‌তাম না।

নটবর কহিল,—কাশীর ঘাটের হাটে জুটে যেতে কতক্ষণ?

—তার পর দিব্যি তারা আবার ভেসে পড়েছে?

—পাগল! পুলিশ নিয়ে কত হাঙ্গামা—

—বল কি? পুলিশ!

—কার-না-কার বউ নিয়ে ভেগে এসেছে, বিশ্বনাথ তা সইবেন কেন?

—ও! তোমরা আশ্রয় দিলেও বিশ্বনাথ বুঝি ছাড়্‌বেন না। তা, লোকটাকে বুঝি পুলিশে ধরলে?

নটবর ঘাড় নাড়িয়া কহিল,—ধরবে না? পরের মেয়েমানুষের সঙ্গে কোনোদিন বনে মশাই? একটি দিন ছিল, তা চব্বিশ ঘণ্টা খালি চুলো-চুলি! চুলোচুলিই যদি করবি, ত' চুলবুলুনি কেন?

পরেশ কথা ঘুরাইল : লোকটার ছ'বছর জেল—তুমি ঠিক দেখে রেখো। কিন্তু মেয়েটার কী হ'ল? তাকেও পুলিশে ধরলে?

তক্তপোষের উপর তোষকটা পাতিতে-পাতিতে নটবর কহিল,—তাকে নিশ্চয়ই তার স্বামীর কাছে পৌঁছে দিয়েছে। এখন নিলে হয়!

—তুমি ঠিক জানো পুলিশ তাকে নিয়ে গেছে?

প্রশ্নটার মধ্যে কোথায় যেন একটু প্রাবল্য ছিল.—নটবর ভয় পাইয়া গেল। মুখ তুলিয়া কহিল,—কা'র খবর কে রাখে বলুন। কাশীর ভিড়ে কে কোথায় ছিট্‌কে পড়ে কে জানে!

নটবর হয় জানে না, নয় জানিলেও বলিতে চাহিতেছে না।

পরেশ কহিল,—তোমাদের চাকর গোবিন্দ না-কে-গদাধর আছে, তাকে একবার ডেকে দাও দিকি। কিছু জিনিস এনে দেবে।

সুধা পুলিশের হেপাজতে নাই—এ-কথা পরেশ ভাল করিয়াই জানে। তাহা

হইলে দেবেনবাবু বীরেনকে এত সহজে পার পাইতে দিতেন না। তবে এই মেস হইতে বাহির হইয়া কোথায় ডুবিল সে? বীরেন আসিয়া সুধা আর ম্যানেজার কাহাকেও দেখিতে পাইল না, পুলিশ ভাবিল বীরেনের মুখে তাহার নব-পরিণীতা স্ত্রীর গল্প আগাগোড়াই কপোলকল্পিত। তাই তাহারা সুধাকে সম্পূর্ণ উড়াইয়া দিয়া বীরেনকে নিয়াই পড়িল এবং বেশি কিছু বাড়াবাড়ি হইবার আগেই দেবেনবাবুর আবির্ভাবে সমস্ত গোলমাল থামিয়া গেল; বীরেনেরো আর মুখ ফুটিল না। পাছে সুধাকে হারাইতে হয় সে-ভয়ে বাবার সামনে জিভ তাহার পেটের মধ্যে ঢুকিয়া গেল. অথচ এ নির্বান্ধব দেশে এই কয়দিনে মেয়েটার কী গতি হইবে সে-কথা সে এক বার ভাবিয়া দেখিল না। নারীকে, লাভ মানে কি তার শরীর লাভ নাকি? নহিলে নিজের চামড়া বাঁচাইতে বীরেন কি করিয়া একটি অসহার নির্ভর-কাতর মেয়েকে বিশ্বময় সর্ব্বনাশের পথে ঠেলিয়া দিয়া সন্তর্পণে সরিয়া পড়িল! পুলিশকে বলিলে পাছে উল্টা তাহাকেই জড়াইয়া পড়িতে হয়, সেই ভয়ে সে আলগোছে গিঁট খুলিয়া পিট্‌টান দিয়াছে! এই না হইলে ভালোবাসা! এই ভালবাসাকেই যশস্বী করিবার জন্য সে সুধার হাতে ছোরা উপহার দিয়াছিল। সেই ছোরা নিয়ে সে করিল কী!

কিন্তু বীরেনকে গাল দিলে কোন লাভ হইবে না। পুলিশে এখনো সে খবর দিতে পারে বটে, কিন্তু তাতে সেই বীরেনকেই আসিয়া মাথা গলাইতে হইবে। আর, পুলিশে খবর দিলেই যে তৎক্ষণাৎ একটা কিনারা হইবে এমন কথাও কেউ লেখে না। সুধার এই তিরোধানের মধ্যে নিশ্চয় হেমন্তর কোনো কারসাজি আছে। হেমন্ত হয়ত বলিবে সুধা আর প্রতীক্ষা করিতে না পারিয়া বীরেনের খোঁজে বাহির হইয়া পড়িয়াছে; সে তার কী জানে? কিন্তু হেমন্ত বলিলেই ত' আর হইবে না। কাশী ত' আর সুধার পটুয়া টোলার বাড়ির রান্নাঘর নয় যে, দেয়ালের চুণ-বালিটি পর্য্যন্ত মুখস্ত! অতএব এ ক্ষেত্রে পুলিশ দিয়া হেমন্তকে ধরাইয়া দিলে সুরাহা ত হইবেই না, মধ্য হইতে বীরেনের বীরত্ব বাহির হইয়া যাইবে!

পরেশ মনে মনে প্রস্তুত হইতে লাগিল। সীমা যেখানে শেব হইয়াছে সেখানে পা ফেলিতেও সে হটিবে না। হেমন্তকে হাত করা চাই। কিছু না হইলে না-হয় থানায় হানা দেওয়া যাইবে। তখনকার চিন্তা তখন!

চটি ফট্ ফট্ করিতে করিতে হেমন্ত আসিয়া হাজির। মুখ হইতে টুথ্-পেইষ্টের ফেনা ফেলিয়া পরেশ কহিল,—আসুন! কৈ, আপনাদের গদাধর বা গোবর্দ্ধন কে চাকর আছে, এলো না ত' উপরে।

হেমন্ত বলিল,—কেন আমাকে বলুননা।

হাসিয়া পরেশ বলিল,—দুপুরে যে আমার দু'টি ভাল্লুক চাই, মশাই। এখানে আপনাদের চলে ত' ও-সব।

সেই শব্দহীন কুৎসিত হাসি! হেমন্ত বলিল,—চালাতে চান ত চোলাই চলে, এ ত সামান্য দু'টো বিয়ার্। পচানো ফল খেয়ে কী হবে মশাই? চলুন দিব্যি শাদা ঘোড়া চ'ড়ে হাওয়া খেয়ে আসবেন।

—তা ত' আছেই। সন্ধ্যে হোক্ না। ক' ঢোঁক খেতে চান?

—ঢোক? হেমন্ত হাতের তালুটা দিয়া একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করিয়া বলিল,—ফুঃ!

—বেশ ত'। সন্ধ্যার সময় আমার ঘরে চ'লে আসবেন দিব্যি। শাদা ঘোড়ায় চ'ড়ে দুজনে ঘোড়দৌড় লাগানো যাবে।

—বহুৎ আচ্ছা। হেমন্ত লাফাইয়া উঠিল: কিন্তু, এই ঘরে ব'সে কেন?

—সে আরেক দিন হ'বে খন। আজ আপনার দৌড়টা একটু বুঝি।

—এই কথা ত'? আচ্ছা। মনে থাকে যেন। আমি বল্‌ছি গোবিন্দকে।

দু' বোতল বিয়ার আসিল। ছিপি শুদ্ধ্ বোতল দুইটাকে তোষকের তলায় লুকাইয়া রাখিয়া পরেশ স্নান করিতে গেল।

হেমন্ত যে পাঁড় মাতাল—তাহার চোখ বলিবে। লালসায় সে-চোখে এখন আগুন জ্বলিতেছে।

মদ পরেশ জীবনে কোনদিন ছোঁয় নাই,—সুযোগ জুটে নাই বলিয়াই। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় সুধার জন্য তাহাকে মদ না খাইলেই নয়। কেমন তাহার স্বাদ না-জানি! পরেশ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

অতিথি-সম্বর্দ্ধনার সে কী আয়োজন! পরেশের পাতে হেমন্ত কাশীর সমস্ত বাজার উজাড় করিয়া দিয়াছে। খাইয়া দাইয়া পরেশ একটু ঘুমাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু ট্রেনেও যেমন বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়াছে এখনো তেমনি চোখের পাতা বুজিতে পারিল না। অস্পষ্ট করিয়া সুধার বিধুর মুখখানি তাহার মনে পড়ে। চারু কৃশ অবসন্ন দেহটিতে ললিত মালিন্য, চোখের দৃষ্টিতে কী করুণ কুণ্ঠা! চক্ষু বুজিয়া সে-মুখখানি সে কিছুতেই মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছে না কেন? এই বিপুল জনারণ্যে অনাথবতী একাকিনী মেয়েটি কোথায় পথ হারাইল! হয় ত' একটু তন্দ্রা আসে, বিশ্বনাথের গলিতে বিক্ষুব্ধ জনতার কোলাহল কানে আসিয়া একটু লাগিতেই মনে হয় যেন কে একটি রুদ্ধনিশ্বাস বন্দিনী মেয়ে গুমরাইয়া মরিতেছে!

পরেশ আর শুইয়া থাকিতে পারে না।

বিকেলে সে ঘাটগুলি একবার ঘুরিয়া আসিল। তারার হাট বসিয়াছে, কিন্তু সেই ভীরু সলজ্জ অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত সন্ধ্যাতারাটিকে কোথাও দেখা গেল না। রাত্রি যতই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল ততই, মদ তখনো পেটে না গেলেও, পরেশের মনে হইতে লাগিল অন্ধকারের সমুদ্র সাঁত্‌রাইয়া সুধা কূলের সমীপবর্ত্তী হইতেছে। সে কূল-পরেশের দৃঢ় দুই বাহু, দুর্গের মতো দুর্ভেদ্য!

অবোধ মেয়ে! জীবনের পথে প্রথম যেদিন পুরুষের পদচিহ্ন পড়িল, সে ভাবিল—সুপ্রভাত, কল্যাণ-লগ্ন! জীবনকে প্রসারিত করিবার জন্য পথকে বিস্তীর্ণ করিয়া দিল। না মানিল বন্ধন, না বুঝিল ভবিষ্যৎ। ভৈরবের আনন্দের আস্বাদ পাইবার জন্য দুঃখকে করিল পাথেয়, ব্যর্থতা হইল বিভূতি!

কিম্বা কে জানে হয়ত ইহার পশ্চাতে আত্মার উপলব্ধি নাই, আছে স্নায়ু আর শিরা, লোহিত শোণিত—তপ্ত, গাঢ়! কে জানে।

রাত্রে মেসের খাওয়া-দাওয়ার পাট হেমন্ত সকাল সকাল চুকাইয়া ফেলিল। গোবিন্দকে বলিল—মাংসের বাটিটা ওপরে ঐ নতুন বাবুর ঘরে নিয়ে যা, আর এই সোডার বোতল ক'টা। গ্লাশ আমি আন্‌ছি।

হেমন্ত ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। পরে ওয়াল্‌-ল্যাম্পের সল্‌তেটা একটু উস্‌কাইয়া দিয়া কহিল,—বড্ড নিরিমিষ থেকে গেল কিন্তু। এক টুকরো মাংস মুখে ফেলিয়া পরেশ কহিল,—বোতলটা সাবাড় ক'রে না হয় চকে গিয়ে চক্কর দেওয়া যাবে। শাদা চোখে সব্বাইকে মনে হয় পেঁচি খেঁদি, পেটে একটু গিয়েছে কি আর সবাই লাল-টুক্‌টুকে—বারান্দায় যেন রামধনুকের মিছিল বসেছে।

এ-সব পরেশের শোনা কথা। কিন্তু অভিনয় তার নিখুঁত।

হেমন্ত উৎফুল্ল হইয়া বোতলে মদ ঢালিতে লাগিল। গ্লাশ ভর্ত্তি করিয়া পরেশের দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল,—চালান্। নিচ্ছি আমি।

পরেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া তোষকের তলা হইতে একটা বিয়ারের বোতল বাহির করিয়া হেমন্তর চোখের সাম্‌নে আনিয়া ধরিল: আপনার জন্য সযত্নে একটা রেখে দিয়েছি মশাই। আপনাকে না দিয়ে সবটা সাবাড় করতে আমার মন উঠ্‌ছিল না কিছুতেই। জানেন হেমন্তবাবু, আসল বন্ধুত্ব হয় মদের গেলাশে। আপনি আমার বন্ধু, কি বলুন।

—নিশ্চয়। বলিয়াই হেমন্ত হাসিয়া একেবারে পরেশের ঘাড়ের ওপর ঢলিয়া পড়িল। পেটে একটু পৌঁছিতেই লোকটা দিব্যি বেচাল হয় যে। তাহার উপর আবার পাঞ্চ্ করিয়া খাইতেছে।

পরেশও স্বচ্ছন্দে চুমুক দিল। তিক্ত, বিষাক্ত স্বাদ। নাড়িভুঁড়ি উল্‌টিয়া আসে।

হেমন্তর প্রায় হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় পরেশ উৎসুক হইয়া বলিয়া উঠিল: দেখুন দেখুন ত', বাইরে কে একটি মেয়ে এসেছে—

—মেয়ে? মদের ঝোঁকে হেমন্ত একেবারে লাফাইয়া উঠিল।

—হ্যাঁ মশাই, দস্তুরমতো মেয়ে। ধ'রে নিয়ে আসুন না। ঝড়ের রাতে বন্দর একটা পেলেই হ'ল।

—নিশ্চয়। হেমন্ত দরজা খুলিয়া ভেতরের বারান্দায় চলিয়া আসিল। এই ফাঁকে গ্লাশের সমস্তটা মদ পরেশ জানালা দিয়া বাইরে ফেলিয়া দিয়া রুমাল দিয়া ঘন-ঘন মুখ মুছিতে লাগিল। যেন এইমাত্র সবটা সে গলাধঃকরণ করিয়াছে।

—কৈ, কেউ কোথাও নেই ত' মশাই। হেমন্ত টলিয়া পড়িতেছে।

পরেশ বলিল,—বসুন। মদ খেলেই আমি তার স্বপ্ন দেখতে থাকি। দিন, ঢালুন। বলিয়া শূন্য গ্লাশটা সে বাড়াইয়া দিল।

—কাকে স্বপ্ন দেখেন?

—দুঃখের কথা আর কাকে বলি বলুন। লোকে মদ খায় দুঃখ ভুল্‌তে, আমার বেলায় হয় উল্‌টো। মানুষে করে বমি, আমার পায় কান্না। বলিয়া পরেশ হেমন্তর একটা হাত ধরিয়া সত্যই ভেউ-ভেউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

—কেন, কেন, কী হয়েছে? আমাকে বলতে আর কী দোষ? আমরা যখন বন্ধু।

—নিশ্চয়ই, তোমাকে বলতে আর বাধা কী? মানুষের জীবনে কখন কী ক'রে বন্ধু জুটে যায় কে বলবে। তোমাকে বলবো বৈ কি। কিন্তু বন্ধুকে সাহায্য করতে পিছিয়ে থাক্‌বে না হেমন্ত?

—তুমি পাগল হয়েছ? হেমন্ত মদের ঋণ শোধ করতে রক্ত ঢালতে কোনদিন পেছপাও নয়।

পকেট হইতে কতগুলো খুচরো নোট বাহির করিয়া হেমন্তর হাতের মুঠার মধ্যে গুঁজিয়া দিতে দিতে পরেশ কহিল,—তাকে যে ক'রেই হোক্ উদ্ধার করা চাইই, হেমন্ত। যত টাকা লাগে।

—কাকে? মদ পেলে হেমন্ত পারে না এমন কাজ নেই। খালি মরা মানুষকে বাঁচাবার জন্যেই কেউ হেমন্তকে মদ অফার্ করেনি, নইলে তাও একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তাম। রাখ তোমার টাকা। ব্যাপারখানা কি, খুলে বল দিকিন্।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া গভীর হতাশের সুরে সজলকণ্ঠে পরেশ কহিল,—বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, হেমন্ত। নতুন একটি ছুঁড়ি বাগিয়েছিলাম ভাই, বসন্তের নতুন পাতার মতন কচি, সদ্য ছিপি-খোলা মদের মতন টাট্‌কা। হঠাৎ এক বন্ধু এল,

তাকে বিশ্বাস ক'রে সব কথা বল্লাম। বল্লাম,—একে আমি রাখবো, একটা ঘর টর ঠিক ক'রে দিতে পারো ভাই? বন্ধু বল্লে,—নিশ্চয়ই। চেৎলা অঞ্চলে আমারই ত' ছোটখাটো বাড়ি আছে একটা—সেখানেই ওকে রেখে দেবো। এই ব'লে সব বন্দোবস্ত পাকাপাকি করবার আগেই বন্ধু তাকে নিয়ে টুপ্ ক'রে কোথায় স'রে পড়লো কিছুরই হদিস্ পেলাম না। কী পাজি লোক, কী বদ্‌মাস। মাতালের সভায় ব'সে যে লোক মদ খায় না, তার মত ক্রিমিন্যাল দুনিয়ায় আছে নাকি? সম্প্রতি খবর পেলাম ওরা নাকি কাশী এসেছে।

গ্লাশটা হেমন্তের হাতে একবার কাঁপিয়া উঠিল : ছুঁড়িটাকে কি রকম দেখ্‌তে বল ত'?

—পাৎলা মতন! পায়ে সামান্য একটু দোষ আছে। চোখ দুটো ডাগর—

হেমন্তর মুখ-চোখের চেহারা বদ্‌লাইয়া গেল।

পরেশ বলিয়া চলিল : ওকে আমাদের খুঁজে বা'র করতেই হবে। এই রাতে ওকে যদি সত্যিই পাওয়া যেত, হেমন্ত, ত, গঙ্গাকে জনি-ওয়াকার ক'রে ছাড়্‌তাম। যত টাকা লাগে—ওকে চাই—

হেমন্ত পরেশের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—সত্যি বল্‌ছ? যদি ওর খোঁজ দিতে পারি আমাকে ভাগ দেবে বল?

—ভাগ? ভাগ মানে? তুমি হ'য়ো সিংহ, আমি খরগোস। যদি খোঁজ দিতে পারো, চাই-কি দু' রাত্তির পরে ওকে আমি তোমার কাছে ছেড়েও দিতে পারি। মদ ছুঁয়ে শপথ করছি, হেমন্ত, এ সব তোমার কালী-ফালির দিব্যি নয়। স্বয়ং মদ—তোমাদের বিশ্বনাথের সিদ্ধির চেয়ে কড়া। চলনা, কোথায় আছে? সেই ইতর লোকটাকে সাম্‌নে পেলে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে দেব বল্‌ছি। অমন শস্তায় পস্তাব ব'লে এতদিন অনর্থক ডন-বৈঠক করিনি, হেমন্ত। কিন্তু শুন্‌ছি, লোকটাকে নাকি পুলিশে ধরেছে।

—ঠিক। আর সন্দেহ নেই। বলি তা হ'লে। দাঁড়াও, এই গ্লাশটা—

হেমন্ত তার পর বলিয়া চলিল : ছুঁড়ি খুঁড়িয়ে চলে বটে, কিন্তু আমার গালে চড় মেরে কী উর্দ্ধশ্বাসে যে ছুটল, নাগাল পেলাম না। কোন্ বাড়িতে গিয়ে উঠেছে তা আমি চিনে রেখেছি। দ্বিতীয় পক্ষের বাবুকে যখন পুলিশে ধরেছে তখন কোন্ চুলোয় আর যাবে? সেই বাড়িতেই হয়ত' আর কারু সঙ্গে আশ্‌নাই জমিয়েছে—

আদ্যোপান্ত ব্যাপার শুনিয়া মনে মনে নিদারুণ সুখী হইলেও পরেশ তাহার লেশমাত্র আভাস দিল না। বরং বলিল,—ছুঁড়ির আস্পর্দ্ধা ত' ভারি বেড়েছে।

আধ-পয়সা দামের সতীত্ব, তার আবার এত দেমাক। তোমাকে মারে চড়—আমার বন্ধুকে। চল, ওকে নিয়ে সারা রাত যদি তোমার পা না টেপাই ত' মদ আমি আর ইহজন্মে ছোঁব না।

মাতালের কাছে ইহার চেয়ে বড় শপথ হয়ত কিছু আর নাই।

—চল। টলিতে টলিতে হেমন্ত দরজা খুলিয়া অগ্রসর হইল: কিন্তু আমাদের সঙ্গে ও আসবে ত'?

—আস্‌বে না মানে? ওর চোদ্দ পুরুষ আস্‌বে। আমার মেয়েমানুষ না? আমার জন্যে ও বাপ-মা ছাড়ে নি? সংসারে আমি ছাড়া কে আর ওর এখন আছে শুনি?

—কিন্তু আমাকে কি বরদাস্ত করবে?

—ও কি কুলের বউটি নাকি? ও ত' পথের ধুলো! আজকের রাতের জন্য নদীতে নৌকোই যথেষ্ট। কাল সকালে শাদা চোখে একটা কিছু ভেবে চিন্তে ঠিক করা যাবে'খন।

পুলকপ্রাবল্যে হেমন্ত অন্ধকারে বার কয়েক হুমড়ি খাইয়া আগাইয়া চলিয়াছে। ওয়াল-ল্যাম্পটা নিবাইয়া দিয়া পরেশ তাহার পিছু নিল। দুয়েকটা ধাক্কা না খাইলে চলিবে না।

হেমন্ত বলিল,—খুব যে! আস্তে এসো। এখানটায় একটা গর্ত্ত আছে।

ঘটনার ঘূর্ণিতে সুধা কোথায় আসিয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

সেই রাত্রে মূর্চ্ছার মধ্যে সে বোধকরি স্বপ্ন দেখিয়াছিল যে সে বীরেনেরই বুকের কুলায়ে আবার আশ্রয় পাইয়াছে—যে তাহার পথ-প্রদীপ, মরুভূর উপরে আকাশবিস্তীর্ণ মেঘছায়া। তাই বুঝি ঘুমের মধ্যে মৃত্যুকে সে ফিরাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু চক্ষু মেলিতেই সে এক নতুন রাজ্যে নিজেকে নির্ব্বাসিত করিল! অন্য পুরুষের স্পর্শে নিজে সে কাল স্নান করিয়াছে ভাবিয়া তাহার পীড়িত স্নায়ুগুলি যেন ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল। ঘুম ভাঙিবার আগে মৃত্যু আসিয়া তাহার এই ঘুমের লজ্জা হইতে তাহাকে ত্রাণ করিল না কেন? ছি ছি!

কিন্তু যাহাই বল, প্রদোষের প্রতি সুধার শ্রদ্ধার আর সীমা রহিল না। আশ্রয়-প্রার্থিনী অসহায়া নারীকে সে সেবা দিয়া সুস্থ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার বিনিময়ে মূল্য চাহিতে আসিয়া কর্কশ কঠিন হাত প্রসারিত করিয়া দেয় নাই। এই নির্জ্জন নির্বান্ধব বাড়িতে সুধার একাকীত্ব-বোধের মধ্যে কোথায়ও যেন আর সন্দেহের দাহ

ছিল না—তিমিরময়ী রাত্রি তাহার কাছে আর বিভীষিকা নয়, স্নেহময়ী সখী! প্রতীক্ষার প্রতিটি মুহূর্ত্ত তার সঙ্গীতমুখর, সময়ের স্রোত ফেনহীন, তরল, সুস্নিগ্ধ।

কিন্তু আর কত দিন! প্রদোষ কাশীর জনসমুদ্রের প্রতিটি তরঙ্গ ভাঙিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজো সে বীরেনের দেখা পাইল না। গলি ঘুঁজি মেস-হোটেল মন্দির-মেলা থানা হাঁসপাতাল আনাচ-কানাচ কিছুই আর সে বাকি রাখে নাই। ভাগ্যের রথের চাকার তলে পড়িয়া তবে সুধা কি এম্‌নি করিয়াই গুঁড়া হইয়া যাইবে?

প্রদোষ রঘুয়াকে সুধার পাহারায় রাখিয়া সেই যে সকালে বাহির হয়, দুপুর দুইটায় চুপি-চুপি চোরের মত দুইটা ভাত খাইতে বাড়ি ঢোকে; আবার এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম না করিয়া রাত্রি বারোটা-একটায় বাড়ি ফিরিতে পথে নামিয়া পড়ে। তবু আজো কোনো সন্ধান মিলিল না। সুধার না জানি কেন কেবলই মনে হয় বীরেন কলিকাতায় ফিরিয়া গেছে। আর আসিবে না, পরিচয়ের পালা ফুরাইয়া গেল!

এ কি হইতে পারে কখনো? সুধা তবে নিজের মনের মধ্যে এমন প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতেছে কেন? পূর্ণিমার চাঁদ দেখিয়াও সমুদ্র এমন উত্তরঙ্গ হয় না। হাঁসপাতালের সেই অবসন্ন মিলন সন্ধ্যাটির বর্ণচ্ছটাই ত' তাহার সিঁথির এই সোনার সঙ্কেতে অবিনশ্বর হইয়া আছে। সেই দিনই বীরেন তাহাকে প্রথম স্পর্শ করিয়াছিল। সেই স্পর্শ ডাক্তারের নিষ্ঠুর হাতে নয়, কবি যেমন করিয়া তাহার লেখনী ধরে; তাহার ক্ষীণ আলোর স্পর্শ—অসম্পূর্ণ, অথচ অসম্বৃত করিয়া ফেলে। অতীতের সেই দিনটার কথা মনে করিয়া সুধা বিস্ময় ভবিষ্যতের মরুভূমিতে একটি প্রতীক্ষার প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিয়াছে। সে কখনো মিথ্যা হয়?

সুধা বলে,—আমাকে কল্‌কাতায় মামাবড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে চলুন।

—কল্‌কাতায়! প্রদোষ বেদনায় চমকাইয়া উঠে: মুখে চূণ-কালি মেখে ফিরে যাবার জন্যেই তুমি সিঁথিতে সিঁদুর এঁকেছ নাকি? এখানে থাকতে আর তোমার কিসের ভয়?

—ভয় আবার কী! তবু এই অনিশ্চিত অবস্থা থেকে ত্রাণ পেলে আমি বাঁচি। আমার ঢের শিক্ষা হয়েছে।

—তোমার শিক্ষা হয়েছে মানে? শিক্ষা তুমি আর সবাইকে দেবে—সেই সব ভীরু আত্মশক্তিহীনা পথবিবর্জিতা মেয়েদের—যারা চড় তুলে আততায়ীকে শাসন করতে পারে না, যারা প্রেমিকের জন্য দুঃখের তপস্যা করতে পরাঙ্মুখ হ'য়ে সহজ আলস্যকে আঁকড়ে থেকে বিলাসী হয়। এত অধীর হয়ো না, আরো দু' দিন

অপেক্ষা কর। বিধাতা তোমাকে অগ্নিকুণ্ডে না ফেলেই সিংহাসন দেবেন তাঁকে এত পক্ষপাতী ক'রে দেখো না, সুধা।

সুধার মুখে কথা আসে না, গাঢ় চোখে প্রদোষের উদ্দীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া থাকে।

প্রদোষ বলে,—আর যদি কোনো অসতর্ক মুহূর্তে আমার সিভ্যালরির অভাব ঘটে, যদি দেখ যে আমিও অবিনয়ী কাপুরুষ হ'য়ে উঠেছি, তবে স্বচ্ছন্দে তোমার ছোরা আমার বুকে বসিয়ে দিয়ো। আমি এমন মায়ের সন্তান নই সুধা, যে, তোমাকে আঘাত করতে দেখে আক্রমণ করতে উদ্যত হ'ব—তোমার ছুরির আঘাত বুক পেতে সইতে আমার একটুও কষ্ট হবে না। বলিয়া স্বচ্ছ স্নিগ্ধ হাসিতে প্রদোষ সমস্ত গাম্ভীর্য নিমেষে হালকা করিয়া ফেলে। ফের বলে: বেরিয়েছিলাম সন্ন্যাসী হ'তে, কিন্তু সংসারে কোনো প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ পেয়েও যদি সাহায্য না করি সুধা, তবে বৃথাই আমার তপস্যার আয়োজন। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

তবু নিশ্চিন্ত সুধা হইতে পারিতেছে না। পৃথিবীতে হেমন্ত আছে, প্রদোষও আছে—এমন দরাজ হৃদয়, এমন বলিষ্ঠ দেহ—নির্ভীক, উদার উত্তুঙ্গ। একটা পঙ্কিল ডোবা হইতে উঠিয়া সে যেন মানসসরোবরে স্নান করিতে নামিয়াছে। এমন অবারিত সান্নিধ্যের মাঝেও এতটুকু অবিচলতা নাই, এতটুকু স্খলন। যে একরাত্রের স্পর্শে এত অজস্র হইয়াছিল সে যে কেমন করিয়া এতখানি নিঃস্পৃহ হইয়া যাইতে পারে— নারীর জীবনে এমন অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা আর কী আছে!

বীরেনের সন্ধান ছাড়া প্রদোষের জীবনে যেন আর কোনো কাজ নাই—মুখে সেই কথা ছাড়া অন্তরঙ্গতার বাসনায় অন্য কোনো অবান্তর আত্মবিবৃতি নাই। এই নিষ্ঠুর অনৌৎসুক্যই বা কেন? রঘুয়া সব সময়ে হাত জোড় করিয়া রহিয়াছে—সুধার মুখের একটি আদেশ পাইলে সে যেন বেণীমাধবের ধ্বজাটা দুই হাতে ছিনিয়া আনিতে পারে। হেমন্তকে কেন যে ছাতু বানাইয়া কাঁচা লঙ্কা দিয়া খাইয়া হজম করিয়া ফেলিতে সুধা বা প্রদোষ কেহই হুকুম করিতেছে না তাহা সে ন্যাড়া মাথা চুলকাইয়া কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

পরেশকেও একটা খবর দেওয়া হইল না—কে তাহার ঠিকানা জানে! প্রদোষ বলে: সব আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি। আজ যাচ্ছি তোমার মাসির বাড়ি—মুন্সির ঘাটে, সেখানেও যদি কিছু সুরাহা না হয়, তবে আমিই তোমাকে কলকাতা নিয়ে যাবো। খুব একটা হৈ-চৈ ক'রে লাভ নেই, সুধা। ইচ্ছা করলে হেমন্তকে জেলে পোরা যায়, মামাবাড়িতে দরজায় হত্যা দিয়ে মাথা ঠুকতে পারো, কিন্তু তোমার

কপালের সিন্দুর যে তোমার পঙ্কতিলক হ'য়ে উঠ্‌বে। জীবনে সাধনা তোমার প্রেম —চাই তার অভিষেক। হঠকারিতায় লাভ নেই, চাই চতুরতা। আর তোমার মামাবাড়ি এমন মামাবাড়ি নয় যে তুমি গেলেই বীরেনবাবুকে নেমন্তন্ন ক'রে ডেকে পাঠাবে। অতএব ধৈর্য্যং কুরু। কল্‌কাতায় যেতে হ'লে আমিই ঘটকালির বাকি অধ্যায়টা সারা করবো। যাবে ত' আমার সঙ্গে?

সুধা ছলছল চোখে চাহিয়া বলে: আপনি ছাড়া আমার কে আছে?

—কে আছে? কেন, তোমার তুমি আছ। তোমার আবার ভয় কি?

তবুও, থাকিয়া-থাকিয়া সুধার কেবলই মনে হয় সেই মামাবাড়ির পরিচিত আশ্রয়টুকুর দামে সমস্ত পৃথিবীও সে আজ কিনিতে চায় না। সংসারের সঙ্গে সেই একান্ত ঘনিষ্ঠতাটুকু এই অব্যবস্থার তুলনায় কত আরামদায়ক! সকালে উঠিয়া চা করা থেকে সুরু করিয়া বিকালে ঘর-ঝাঁট দেওয়া, কাপড় তোলা, বিছানা পাতা—রাত্রে কলতলায় বসিয়া বাসন মাজা রান্নাঘর নিকোনো—ইহার চেয়ে বড় সুখের স্বপ্ন সে না দেখিলেই বুঝি ভালো করিত। কালক্রমে তাহার কি আর বর জুটিত না? নিজের বিচারে সে-ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হইত না বলিয়াই কি তাহার আর দিন কাটিত না, রাত ফুরাইত না? সিঁদুরের মহিমা কি ম্লান হইয়া যাইত? বিকেলবেলা জানলায় না বসিয়া থাকিয়া বাড়িতে ঘুণ্টুর সঙ্গে লুকাইয়া ঝালচানা খাওয়া কত সুখের ছিল। একরত্তি পুণ্টুটার জন্য তাহার বুক পুড়িয়া যাইতেছে।

পাশের ঘর হইতে প্রদোষ বলিয়া উঠে: জীবন-দেবতা, তোমাকে নমস্কার।

নীচে সদর দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল।

রঘুয়া ধমক দিয়া উঠিল: কোন্ হ্যায়?

উত্তর নাই। তেমনি কড়া-নাড়ার শব্দ।

সেই শব্দ হাওয়ায় ভাসিয়া উপরে পৌছিয়াছে। অশেষ-বিস্তীর্ণ সমুদ্রের ঝোড়ো রাত্রে নোঙর-ছেঁড়া-জাহাজ যেন বন্দরের আলো দেখিল। নতুন তীর দেখিয়া কলম্বাস্‌ও বোধ হয় এতটা উল্লসিত হয় নাই। রাশি রাশি নৈরাশ্যের অন্ধকার সরাইয়া ইদের চাঁদ যেন দেখা দিয়াছে। সুধা চেঁচাইয়া উঠিল: শিগগির চলুন নীচে উনি বুঝি এলেন। হ্যাঁ, এই শব্দ।

প্রত্যাসন্ন বিবাহ-মুহূর্ত্তের কুণ্ঠিতকায়া অপ্রগল্‌ভা কুমারীর মত সুধা কাঁপিতেছে।

প্রদোষ তাড়াতাড়ি নীচে নামিল। রঘুয়া কিছুতেই দরজা খুলিবে না, নাম বলা চাই। প্রদোষ বলিল,—দে না খুলে।

দরজা খুলিতেই অসংলগ্ন পদে প্রথমেই হেমন্ত ঢুকিয়া পড়িল—পেছনে পরেশ। দুই জনের চেহারা দেখিয়াই প্রদোষের চক্ষু স্থির। কী যে করিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না। রঘুয়াও কেমন ভ্যাবাচাকা মারিয়া গেছে।

হেমন্ত পরেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—হ্যাঁ, এই বাড়ি। অব্যর্থ। ঐ লোকটাই দু'দিন আগে মেয়েমানুষের খোঁজ করতে আমার মেসে এসেছিলো। ঐ লোক। নেশা করলেও লোক আমি ঠিক ঠাওরাতে পারি; নিজে হাত-সাফাই ক'রে দিব্যি সাফাই গাইতে গিয়েছিলে বাপ। এস, দু' পাণ্ডব এখনো আমরা মরিনি। পথ ছাড়—

পরেশ হঠাৎ ধমক দিয়া উঠিল : চুপ। সেই স্বরে এতটুকু তরলতা নাই, তীরের মত শাণিত, রুক্ষ রৌদ্রের মত। রঘুয়াকে বলিল,—সদর দরজা বন্ধ ক'রে দাও।

রঘুয়া প্রচণ্ড কণ্ঠে একটা খোট্টাই হুমকি দিয়া উঠিল। তাহা গ্রাহ্য না করিয়া পরেশ নিজেই দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া কহিল,—আমরা চোর কিম্বা ডাকাত নই, তা হ'লে বাড়ি ঢুকে পালাবার পথ বন্ধ ক'রে দিতাম না। একে ত' আপনি চেনেনই, ইনি স্বনামধন্য ম্যানেজার। আমার পরিচয় আমি দিচ্ছি। আগে একটা কথার আমার উত্তর দিন্, সুধা এখানে আছে?

প্রদোষের তখন হইতেই মনে হইতেছিল এই বীরেন—যদিও সুধার বর্ণনানুসারে চেহারায় খুব অল্পই মিল ছিল। এইবার সুধার নাম শুনিয়া তাহার আর সন্দেহ রহিল না; হাসিয়া বলিল,—তার চেয়ে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন্। এ বাড়ি যখন আমার, জিজ্ঞাসাটা আমিই করি। আপনি কে? সঙ্গে একে কেন নিয়ে এসেছেন?

মধ্য থেকে হেমন্ত বলিয়া উঠিল : কে জানো না? তোমার ইয়ে। স্বয়ং বাবা বিশ্বনাথ!

বজ্রনির্ঘোষে পরেশ আবার আস্ফালন করিয়া উঠিল : খবরদার হেমন্ত। সুধাকে বলুন, কল্কাতা থেকে পরেশ এসেছে। বল্লেই চিন্তে পারবে।

প্রদোষের কেমন ধোঁকা লাগিয়া গেল। পরেশ ফের কহিল,—আর একে কেন সঙ্গে এনেছি এক্ষুনিই তা টের পাবেন।

দন্তরাজি বিকশিত করিয়া হেমন্ত বলিল,—হ্যাঁ বাছা, এখুনি। রাত না পেরতেই।

—বলুন গে বীরেনের বন্ধু। সুধার মামিমার ভাই—পরেশ মুখুজ্জে। বলিবার

দরকার হইল না। সুধা উপরে সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া রুদ্ধনিশ্বাসে নীচের কথা-বার্ত্তা শুনিতেছিল। নিজেকে আর সে সম্বরণ করিতে পারিল না। সত্যবানের উজ্জীবিত দেহ লইয়া সাবিত্রীর কাছে যম আসিয়াছেন। ত্রস্তপদে আলুল অঞ্চলে সে সিঁড়ির অর্দ্ধপথে আসিয়া থামিয়া গেল। পরেশবাবুই ত'—

সুধাকে দেখিয়া হেমন্তর জিহ্বা আবার ফেনিল হইয়া উঠিল: এই যে শ্রীমতী। সেদিন যে-গালে চড় মেরেছিলে সেই গালে দয়া ক'রে একটা চুমু খাও দিকিন্।

প্রত্যুত্তরে পরেশ সহসা হেমন্তর গাল বাড়াইয়া সজোরে এমন এক চড় মারিল যে হেমন্ত আর টাল সাম্‌লাইতে পারিল না, ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। পৃথিবী আজ রাত্রে যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া রসাতলে যাইতেছে।

পরেশ রঘুয়াকে কহিল,—বেটাকে কান ধ'রে খাড়া কর ত', তারপর হিড় হিড় ক'রে ওপরে টেনে নিয়ে এস। বলিয়া সে নিজেই সিড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া সুধার কাছে আসিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল,—চিন্‌তে পারছ, সুধা ?

—নিশ্চয়। বলিয়া সুধা নীচু হইয়া পরেশকে প্রণাম করিল: ওঁর খবর কী ?

—সব হচ্ছে। চল ওপরে। ভীষণ খিদে পেয়েছে, সুধা। ঘরে কিছু আছে ? (প্রদোষকে) বড় অসময়ে আতিথ্য ভিক্ষা করছি। (রঘুয়াকে) ওকে নিয়ে এস ওপরে।

সুধা উঠিতে উঠিতে কহিল,—ও এ-বাড়িতে কেন ? ওটাকে দূর ক'রে দিন্ না।

পরেশ কহিল,—ওকে না বাগাতে পারলে কোনো কাজই হাসিল্ করতে পারতাম না। মদ খাইয়ে ওর সমস্ত মনগড়া অসৎ প্রস্তাবে সায় দিয়ে পথ চিনেছি, বাড়ি চিনেছি। তোমাকে যে ও জঘন্য অপমান করেছিলো সেই কথাও ও-ই বলেছে। (রঘুয়াকে) নিয়ে এস শিগগির।

হেমন্ত বিড়-বিড় করিয়া খানিকটা কি বকিল, রঘুয়াকে কয়েকটা আঁচড় কাটিল ও শেষে তাহার প্রভূততর শক্তির প্রাবল্যে অভিভূত হইয়া অবশ দেহটাকে ছাড়িয়া দিল। রঘুয়া তাহাকে পাঁজা-কোলে করিয়া তুলিয়া আনিয়া দোতলার বারান্দায় ধুপ করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল।

হেমন্ত করুণ অথচ কুৎসিত দুই চক্ষু তুলিয়া পরেশকে কহিল,—শেষকালে এই ছলনা করলে বন্ধু সেজে ?

পরেশ দৃঢ়স্বরে কহিল,—শিগ্‌গির এঁর পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাও চল্‌ছি, নইলে তোমাকে আর আস্ত রাখ্‌বো না। এস ত' সুধা এগিয়ে, পা বাড়িয়ে দাও।

সুধা কুণ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, হেমন্ত খানিকটা গড়াইয়া হাত বাড়াইয়া তাহার পা আঁকড়াইয়া ধরিল।

মুঠিতে তাহার চুলগুলি লইয়া মেঝের উপর কপালটা ঠুকিতে ঠুকিতে পরেশ কহিল,—আর এমন কাজ করবে ?

প্রদোষ এতক্ষণে কথা কহিল,— মাতালকে শাসন ক'রে কী লাভ ?

হেমন্তর মাথাটা ছাড়িয়া দিয়া পরেশ কহিল,—ঠিক বলেছেন। সারা রাত ওকে ঘুম পাড়িয়ে রাখ্‌বো, পরে কাল ভোরে নেশা ছুটে গেলে তখন ওর শাসন হবে।

—কী দরকার ! সুধা তার আত্মীয়ের সন্ধান পেয়েছে—একটা কূল-কিনারা হ'ল সেই যথেষ্ট। মাতালকে মেরে কি কিছু বীরত্ব আছে ? যা ত' রঘুয়া, মোড় থেকে একটা এক্কা নিয়ে আয়, ত্রিপুরা-ভৈরবীর বাঙালি মেসে একে পৌঁছে দেবে।

রঘুয়া যখন তাহাকে টানিয়া এক্কায় তুলিল, তখন হেমন্ত একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছে।

পরেশ সুধায় আলাপ খরতর হইয়া উঠিল। প্রদোষ আসিয়া সামান্য বাধা দিল : বীরেনবাবুকে পুলিশে ধরেছে শুন্‌লাম, সত্যি ?

পরেশ বলিল,—ধরেছিলো, কিন্তু পিতৃ পুর্ব্বিক ক্ষিক্‌ প্রত্যয়ের জোরে সশরীরে কলকাতায় ফিরে গেছে। যাই হোক, সুধার জন্যে আপনি যা করেছেন তার ঋণ কেউ আমরা শোধ করতে পারবো না।

প্রদোষ একটু হাসিল মাত্র।

পরেশ কহিল,—ঘুমে চোখ আমার ঢুলে পড়্‌ছে, খিদেয় আর দাঁড়াতে পারছি না। খেতে কিছু পাবো ?

—নিশ্চয় পাবেন। আসুন আমার সঙ্গে রান্নাঘরে।

সুধার চেহারা দেখিতে-দেখিতে বদ্‌লাইয়া গেছে। ওর দেহে এখন লাবণ্য-তরঙ্গ ! দুই জনে রান্নাঘরে নামিয়া গেল। পরেশের জন্য সুধা নতুন করিয়া রান্না করিবে। উহাদের সভায় যোগ দিতে তাহাকে উহারা ডাকিবে কেন ? কিন্তু পরেশের বদলে বীরেন আসিলে প্রদোষ নিশ্চয় গায়ে পড়িয়া আলাপ জমাইত, উহাদের পরস্পরের সান্নিধ্যটিকে সম্পূর্ণতর করিবার অভিলাষে নিজেই একটি অন্তরাল রচনা করিয়া পরিচয়ে মাধুর্য্য বিস্তার করিত, এমন করিয়া পলাইয়া বেড়াইত না। প্রদোষ ছাতে একেলা চলিয়া আসিল। নিরালয়ে কতক্ষণ কাটিয়া গেল, তবু নীচে উহাদের গল্পগুজব এখনো ক্ষান্ত হইল না। আজ প্রদোষের আর ক্ষুধা নাই—উহাদের ক্লান্তিহীন কল-গুঞ্জন শুনিতে শুনিতেই সে ঘুমাইবে।

বিদায়, নিশীথ রাত্রির তারা, বিদায় ! তোমাদের ক্ষণ-স্পর্শে একাকী আকাশ

রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল, এইবার আবার তোমরা অস্ত যাও। বন্ধুর পথে আবার আমার অসীমযাত্রা! হে মোর বিষাদিনী নিশীথিনী, বিদায়!

সুধার আর তর সহে না। সকালের ট্রেনেই সে কলিকাতা ফিরিবে—কাশীতে আর তাহার আকর্ষণ কি? শিবের জটায় গঙ্গা এইবার শুকাইয়া যাক্!

ইহাতে প্রদোষের অভিমান করিবার কী আছে? তাহার ঘরে ঢুকিয়া একমুঠো পথহারা দখিন বাতাস দোলা দিয়াছিল বলিয়াই কি চৈত্রের নির্বারিত নিরানন্দ রূঢ়তা অশ্রুশীতল হইয়া উঠিবে! আরো দু' দিন থাকিয়া গেলে পারিত! কিন্তু দু'টি দিন বই ত' আর নয়। সে ত' নিতান্ত দু'টি দিনই। প্রদোষের কাছে সুধার কি বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতার ঋণ নাই—চোখে কি তাহার বন্ধুতার এতটুকু আভাস মিলিবে না? কপালের ঐ সিন্দুরবিন্দুটা কি সমস্ত কিছু আড়াল করিয়া থাকিবে? কিসের বা কী! কে কাহাকে মনে করিয়া রাখে! আসে আর মিলায়, মিলে আবার খসিয়া পড়ে। জীবন বুদ্‌বুদ!

—বুঝ্‌লি রঘুয়া, তলপি গোটা এখান থেকে, আজই বিকেলে প্রয়াগযাত্রা। কথাটা সুধাকে শোনাইয়া বলে। সুধা বলে: আজই?

প্রদোষ উদাসীনের মত বলে: কাশীর ধর্ম্মকর্ম্ম আমার শেষ হ'ল।

—কিন্তু আপনার সঙ্গে আর দেখা হবে না?

—দেখা আর হয় না কোনোদিন। আমার ফিরে যাবার আর পথ কৈ?

পরেশের সঙ্গে পরামর্শ করিতে সুধা তখুনিই সরিয়া পড়ে। প্রদোষের কেন যে আর ফিরিয়া আসিবার পথ নাই সে-কথা ভুলেও একবার জিজ্ঞাসা করে না। পরেশ বলে: এই ভালো। একেবারে ফাঁকা। আমি রিক্তহস্ত, তুমি মুক্তপদ। বাক্স-বিছানাগুলো হেমন্ত পরবর্ত্তী অতিথিদের সৎকারে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারবে।

ষ্টেশনে না আসিলে ভালো দেখায় না। ট্রেন ছাড়িলে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া প্রদোষ সুধাদের কামরা লক্ষ্য করিয়া ঘন ঘন নাড়িতে থাকে। সুধা কোন দিকে তাকাইয়া আছে কে জানে!

পরেশের কাছে সুধার আর অপরিচয়ের কুণ্ঠা নাই,—সে বিজয়িনী, মুক্তধারা নির্ঝরিনীর মত তার অবাধ গতি, অজস্র চাঞ্চল্য। উদ্বেগহীন তরলকণ্ঠে সুধা প্রশ্ন করিল: এখন আমাকে নিয়ে কী করবেন।

পরেশ বলিল,—আপাতত আমাদের বাড়ি নিয়ে যাব, পিঠে ধামা না বেঁধে মামাবাড়ি আর যেতে পাচ্ছ না।

—কে যেতে চায়? ফিরে যাবার জন্য ত' আর বেরই নি। যদি কোনোদিন ফিরি, বেরবার জন্যেই ফিরবো। তার পর?

হাসিয়া পরেশ বলিল,—হ্যাঁ, তার পরেরটাই আসল। বীরেনকে ডেকে এনে তার জিনিস তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে একটা নেমন্তন্ন আদায় করবো।

সুধা চিন্তিত হইবার ভাণ করিয়া কহিল,—কিন্তু আমাকে তিনি কোথায় রাখবেন? আবার তাঁকে কাশী এসে মেস ভাড়া করতে হবে নাকি?

—না, দ্বিতীয় অঙ্ক এবার কল্‌কাতাতেই। যবনিকা উঠ্‌বে আমাদেরই বাড়ির উঠোনে—ছাঁদ্‌নাতলায়!

সুধার চিবুকের ছোট টোলটি হাসির ঘায়ে দুলিয়া উঠিল: ব্যাপারটা এবার তা হ'লে জানাজানি হ'য়ে যাবে?

জোর দিয়া পরেশ বলিল,—জানাজানি হওয়াই ত' ভালো। প্রকাশ্যে বিদ্রোহাচরণ না করলেই তার মধ্যে পাপ ঢোকে। সে আত্মপ্রকাশে আত্মার মর্য্যাদা বাড়ে না। লোকের বিস্ফারিত চোখের সাম্‌নে তোমাদের আমি বিয়ে দেব—শালগ্রাম শিলা সাম্‌নে রেখে, অগ্নয়ে স্বাহা ক'রে।

—কিন্তু লক্ষ লক্ষ বাধা যে উত্তাল হ'য়ে উঠ্‌বে।

—উঠুক। তোমার মামাবাড়ির তরফ থেকে আর কারুর তড়পানি নেই—তাঁরা দোরে খিল দিয়েছেন। বাধা যদি কেউ দেন, ত বীরেনের বাবা। সে দায় স্বয়ং বীরেনের—যে তোমাকে ঝড়ের রাতে বিদ্যুৎবিদীর্ণ আকাশের নীচে ডাক দিয়েছে, পথও তাকেই তৈরি করতে হবে। আমি হ'ব কন্যার অভিভাবক, সারা দিন উপোস ক'রে থেকে আনন্দে তোমাকে সম্প্রদান কর্‌বো।

সুধা বলিল,—সম্প্রদাত্রী আমি না হয় নিজেই হ'ব—আমি হলাম সাবিত্রীসমা। কিন্তু আপনার বন্ধু যদি শেষপর্য্যন্ত আর অগ্রসর না হ'ন?

—হবে না মানে? তার স্কন্ধ হ'বে। অমন কথা মুখেও এনো না, সুধা।

পরেশের অদ্ভুত উচ্চারণে সুধা সামান্য একটু হাসিল বটে, কিন্তু তা সামান্যই। মুখমণ্ডল সহসা মলিন, দৃষ্টি ঘোলাটে হইয়া উঠিল।

পরেশের মনেও খট্‌কা লাগিল। এমন কথা কেন সুধার মুখে আসে?

পরেশ কহিল,—"কপালে ত' একটা সার্টিফিকেট্ এঁটেছ। ওটা কার কীর্ত্তি? বীরেনের নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ, উনিই আমার কপালে সিন্দুর দিয়েছেন। কিন্তু সেটা কি সাধারণ আত্মরক্ষার ছলনামাত্র না তাঁর প্রেমের চিহ্ন সেইটেই আমি বুঝ্‌তে পারছি না। আমার দিক থেকে সন্দেহ নেই, এতটুকু মাত্র দ্বিধা নেই—তাঁর দেওয়া সিন্দুরই আমার ধ্রুবতারা। যাঁর সঙ্গে পথে বেরিয়েছি, তিনিই আমার পথের শেষ। কিন্তু

প্রকাশ্যে বিদ্রোহাচরণ করবার শক্তি বা সাহস যদি তাঁর থাকে, তবে তিনি আমাকে এখানে একলা ফেলে কি ক'রে তাঁর বাবার সঙ্গে সুড়্ সুড়্ ক'রে কল্‌কাতায় চ'লে যেতে পারলেন ? কেন তিনি আমাকেও সঙ্গে নিতে পারলেন না ?

সুধার দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া পরেশ বলিল,- তার বাপকে যে তখনো সে তৈরি করতে পারে নি। ভীষণ কড়া বাপ—বীরেন তাঁর কাছে তেলাপোকা, একবার চিৎ ক'রে ফেল্‌লেই ব্যস্। তা ছাড়া কাশীতে তুমি তখন কোথায় ?

সুধা প্রশ্ন করিল,—এ কি একটা কথা হ'ল ? কাশীতে আমি তখন কোথায়! গঙ্গার জলে, ট্রেনের তলায়, কড়িকাঠে না দড়ির দোল্‌নায়। তাই উনি স্বচ্ছন্দে পিঠ দেখালেন। এমন যে গোঁড়া পিতৃভক্ত, সে যে আবার উল্টো গোঁ ধরবে না, আমার বিশ্বাস হয় না।

পরেশ বলিল,—বাজে ব'কো না সুধা। প্রেমের পথ ত' স্বর্গের পথ নয় যে দশহরার দিন চোখ বুজে গঙ্গায় ডুব্‌লেই মোক্ষ মেলে। অনেক তার অন্ধিসন্ধি। সে সব ভেবে তুমি মন খারাপ করো না। আলগোছে বিয়েটা দিয়ে দিই, বীরেন ছেড়ে তার বাপ পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।

সুধা প্রবলকণ্ঠে কহিল,—না। বিয়ের আর বাকি কী ? যার জন্য ঘর ছাড়লাম সেই আমার বর। আমি সমাজের কাছে হেঁট হ'য়ে করুণা ভিক্ষা করতে চাই না। আমার প্রেমকে টিকিয়ে রাখবার জন্য অমন একটা সস্তা মলাট আঁট্‌তে পারবো না কখনো। যদি না টিঁকে, ছিঁড়ে ধূলায় ফেলে দেব। উনি নিজ হাতে আমার কপালে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছেন সেই আমার জয়টীকা।

—বেশ ত'। একেবারে ছোটখাটো একটি বাড়ি ভাড়া ক'রে দু'টিতে মিলে থাক্‌বে। হিন্দু-বিয়ের প্রমাণের জন্য ভাবনা নেই। স্বামী-স্ত্রীর মতন আছ—এই তার প্রধান প্রমাণ। সে সব কথা কল্‌কাতায় গিয়ে সবিস্তারে ভাবা যা'বে খন। বীরেনের প্রতি অন্যায় সন্দেহ ক'রে মনকে পীড়িত করো না।

সন্ধ্যায় আকাশে তারা ফুটিতেই হঠাৎ সুধার প্রদোষের কথা মনে পড়িয়া গেল। কে যেন আকাশ ভরিয়া বিদায়ের রুমাল উড়াইতেছে। তাহার সঙ্গে আর দেখা হইবে না। যে-রহস্যের সমাধান নাই, সেই সুমধুর রহস্যের মতই তাহার স্মৃতিটি মনে লাগিয়া থাকিবে।

পরেশ বলিল,—এবার ঘুমোও, সুধা।

জানলার বাহিরে মুখ করিয়া অবেণীবদ্ধ চুলগুলি ছাড়িয়া দিয়া সুধা বিমনা হইয়া বসিয়া ছিল। কহিল,—ঘুম যে আস্‌ছে না মোটে।

—আসবে'খন। তুমি শোও।

—আর আপনি?

—আমি জেগে থাক্‌বো।

—কেন?

—বা, আমি তোমার বডি-গার্ড, না? হেমন্তর মতন যদি কেউ গাড়িতে ঢুকে পড়ে, লড়্‌তে হবে না?

— আমার জন্যে কেন আপনি লড়্‌তে যাবেন? আমি আপনার কে?

—কে! তুমি আমার বন্ধুর জীবন-নায়িকা।

—আপনার বন্ধুই যে হেমন্তর মতন আমার জীবনে ঢুকে পড়ে নি তার কোনো প্রমাণ দিতে পারেন? লড়্‌বেন তার সঙ্গে?

—তখন লড়্‌তে গেলে তুমিই ত' ছোরা উঁচিয়ে আসবে। দরকার নেই। তুমি এবার ঘুমোও দিকি।

সেই স্নেহ-সম্ভাষণে সুধার স্নায়ুগুলি নিস্তেজ হইয়া আসিল। বেঞ্চির উপর গা এলাইয়া কহিল,—কল্‌কাতায় কখন পৌঁছুব?

—ও! আর বুঝি দেরি সইছে না, না সুধা?

—না। আপনাদের বাড়িতে আমাকে একটা চাক্‌রানির কাজ দেবেন ত'?

—কি ক'রে দেব বল?

—কেন? চাক্‌রানি আছে বুঝি আপনার? আর কে আছে?

—তুমি ছাড়া আর সবাই। আচ্ছা, আমি যদি তোমার মাথাটা কোলের ওপর শুইয়ে দিই, তবে তুমি ছোরা নিয়ে আমাকে তাড়া করবে?

—বালিশ অভাবে শুতে সত্যিই ভারি অসুবিধা হচ্ছে। বলিয়া সুধা তাহার মাথাটা পরেশের হাঁটুর উপর ধীরে তুলিয়া দিল: কতক্ষণ জেগে থাক্‌বেন শুনি? কী ভাবছেন?

পরেশ কহিল,—তোমাদের বিয়েতে কাকে-কাকে নেমন্তন্ন করবো তার একটা ফর্দ্দ করছি।

—দয়া ক'রে লিষ্টি থেকে আমাকে বাদ দেবেন।

—নিশ্চয়ই। তুমি ত' উপোস ক'রে থাক্‌বে।

—বলছিলেন যে আপনিও উপোস করবেন?

—সে ত' তোমাকে সম্প্রদান করতে।

—ও! সুধা ধীরে ধীরে মাথাটা আবার নামাইয়া আনিল।

রাস্তার দিকের বারান্দায় বসিয়া অনিন্দিতা বই পড়িতেছিল। পেছনের ঘরে একটা লম্বা সোফার উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া প্রসন্নবাবু গড়গড়ায় তামাক টানিতেছেন। বারান্দায় যাইতে দরজাটা খোলা।

প্রসন্নবাবু অনিন্দিতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—টেলি যখন এলো না এখনো, তখন নিশ্চয়ই রাত্রে দেখো এসে পড়্‌বে। ঠাকুরকে ব'লে রাখো, অনি। শেষকালে খাবারের জন্যে তুমুল চেঁচামেচি সুরু ক'রে দেবে। খেতে চেয়েই এক মুহূর্ত্ত আর মুখ বুজে বস্‌তে পারে না।

বই হইতে মুখ তুলিয়া অনিন্দিতা কহিল,—কিন্তু সকালে ওঁর বন্ধুর ত' এদিকে আসবার কথা ছিলো— তিনিও দিব্যি গা-ঢাকা দিলেন।

—হ্যাঁ, তাই ত' ভাবছি। কেন যে এমন হন্ত-দন্ত হ'য়ে কাশী ছুট্‌লো কিছুরই হদিস্ পেলুম না। কিন্তু আমি ব'লে রাখ্‌ছি অনি, এই এলো ব'লে। আমাকে ভাবাবার ছেলে ও নয়। ঠাকুরকে তুমি বল।

—সে বল্‌তে কতক্ষণ!

—না। এসে যদি খাবার না পায়— না, সে হ'তে পারেনা। বিকেলের আলোয় আর পড়ে না— চোখ দুটো যাবে।

বই বন্ধ করিয়া অনিন্দিতা জনযানসঙ্কুল রাস্তার দিকে চাহিয়া রহিল।

কতক্ষণ পরে প্রসন্নবাবু কহিলেন,—বাড়িতে আমাদের একটা টাইম্-টেবল ছিল না, অনি?

—ছিল ত'।

—খুঁজে বার করে দাও ত' এসে।

উদাসকণ্ঠে অনিন্দিতা কহিল,—কী হবে টাইম্-টেব্‌লে? এত রাত্রে কাশী-ফেরৎ কোনো ট্রেন নেই।

—নেই? তুমি ঠিক জানো? তবে এসো দু'জনে ব'সে খেলি।

—তাস খেল্‌তে আমার ভালো লাগবে না, জ্যাঠামশাই।

—তবে দিয়ে যাও দিকি আমাকে, নিজে নিজেই পেসান্স খেলি। কোথায় রেখেছ?

—টেবিল্‌-বাস্‌কেটটার ওপরেই ত' আছে। নাও না হাত বাড়িয়ে।

—না, থাক্। পার্কে গিয়েই একটু ঘুরে আসি। তুমি যাবে, অনি?

—দু'জনে চ'লে গেলে যদি এসে পড়েন? বাড়ি ফিরে কাউকে না দেখ্‌তে পেলে রাত্রে আর তাঁর খাওয়া হয়েছে!

প্রসন্নবাবু সোফার উপর আবার বসিয়া পড়িলেন: তবে থাক্। এসে পড়তে পারে, অনি? তবে এই যে বল্‌ছিলে কাশী-ফেরৎ আর কোনো ট্রেন নেই?

—বা, টাইম্‌-টেব্‌ল আমার মুখস্থ নাকি?

—তা ও ত' বটে। তবে ব'সে ব'সে আমি একটু ঝিমোই, অনু। পরেশ এলেই কিন্তু ছুটে এসে আমার দাড়ি টেনে জাগিয়ে দিস্ দুষ্টু মেয়ে।

অনিন্দিতা স্কুল করিয়া বাড়ি ফিরিয়া বাকি সময়টুকু পরেশের কাপড় কুঁচাইয়াছে, টেবিল সাফ্ করিয়াছে, বুরুস্ অভাবে আঁচল দিয়া জুতা মুছিয়াছে, না চাহিতে মনোমত খাবার তৈরি করিয়াছে,—একদিন আঁট করিয়া টাই বাঁধিতে গিয়া গলায় ফাঁস দিয়া ফেলিয়াছিল! কিন্তু কোনোদিন এমন করিয়া উচাটন হয় নাই। কেহ বাড়ি ফিরে নাই, বা বিদেশে গিয়া খবর দিতে দেরি করিয়াছে বলিয়া রাত্রে সে ঘুমাইতে পারিবে না, অশুভ আশঙ্কায় হৃৎপিণ্ডটা স্তব্ধ হইয়া থাকিবে—এ-কথা তার স্বপ্নের অতীত ছিল। কেন যে কাশী গেলেন, কেনই বা যে একলা ফিরিয়া না আসার দুরূহ একটা ইঙ্গিত করিয়া বিদায় লইলেন কিছুই বুঝা গেল না। ফিরিয়া একবার আসুন, টব হইতে রজনীগন্ধা ছিঁড়িয়া অনিন্দিতা কখনই আর তাঁহার বালিশের নীচে লুকাইয়া রাখিবে না, তরকারিতে এমন ঝাল্ দিবে মুখে দেন কাহার সাধ্য।

আশ্চর্য্য! নীচে কে রামদীনকে ডাকিতেছে? এ কী! রেলিঙে ভর দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িতেই—না হইয়া আর যায় না। পরেশ-দাই। রামদীনটা এরি মধ্যে সদর দিয়াছে বুঝি? এমন আহাম্মক না হইলে কি আর সেদিন চুলের ব্রাস্ দিয়া জুতা ঘষিয়াছিল? অনিন্দিতা ছুটিয়া ঘরে ঢুকিয়া প্রসন্নবাবুর চুলে টান মারিল: শিগ্‌গির ওঠ জ্যাঠামশাই, পরেশ-দা ফিরেছেন।

এক গাল হাসিয়া প্রসন্নবাবু কহিলেন, —আসবেই ত'। নিশ্চয়ই ট্যাক্সি ক'রে। দেখবে এস ভায়োলেট ট্যাক্সিটার রঙ্। ঘুমের মধ্যে স্পষ্ট আমি দেখতে পেলুম যে—বলিয়াই তিনি দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেলেন।

অনিন্দিতার পা আর সরিতেছে না। তাহার দেহে যেন কে সহসা ঝঙ্কার দিয়াছে। অনেক কষ্টে নিজেকে সম্বৃত করিয়া সে ধীরে ধীরে নামিতে লাগিল।

পরেশ একলা ফিরে নাই,—তাহার সঙ্গে একটি কৃশকায়া কিশোরী, মাথায় ছোট একটু ঘোমটা। মাথার উপরে কাপড়ের পাড়টা যেখানে শেষ হইয়াছে তাহারই কাছে সিঁথিতে সিঁদুরের শীর্ণ একটি রেখা।

উপর হইতে নীচে নামিবার সিঁড়িটা সহসা যেন অনিন্দিতাকে গ্রাস করিবার জন্য আগাইয়া আসিল ; পায়ের নীচে মেঝেটা যেন সরিয়া যাইতেছে। অনিন্দিতাকে দেখিয়া প্রসন্নবাবু কহিলেন,—বলিনি আমি ? ট্যাক্সির রংটা ভায়োলেট্ না হ'য়ে না-হয় চকোলেট্ হয়েছে। বলিনি ? টাইম-টেব্‌ল্ ওঁর মুখস্থ! ভাগ্যিস্ বাজি রাখোনি অনি, নইলে সারা-রাত জ্যাঠামশায়ের পাকা চুল তুল্‌তে হ'ত। এই মেয়েটি কে, পরেশ ?

পরেশ ভাড়া চুকাইতে চুকাইতে কহিল,—বল্‌ছি। আপনার মেয়ে। একে ভিতরে নিয়ে যাও, অনি।

অনিন্দিতার কান দুইটা ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল।

—এসো মা। প্রসন্নবাবুই সুধাকে পথ দেখাইলেন : সংসারে মা'র মতো কি মধু আছে ? সুধা নত হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল।

ক্লান্তিতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পরেশ কহিল,—ভীষণ খিদে পেয়েছে, অনি। আর দাঁড়াতে পারছি না। শিগ্‌গির। পেটে কিছু দিতে না পারলে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠ্‌তেই আমি পঞ্চত্ব পাবো।

প্রসন্নবাবু সিঁড়ির মধ্য পথ হইতে সহাস্য মুখে অনিন্দিতার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—কেমন ? হ'ল ? লেগে যাও চট্ ক'রে।

অনিন্দিতার বহিয়া গেছে।

সিঁড়ি ভাঙিতে যাহার পা দুম্‌ড়াইয়া পড়িতেছে তাহাকে এত অনায়াসে ও এত আগ্রহে আবার সিঁড়িই ভাঙিতে দেখিলে কাহার না পিত্ত জ্বলিয়া যায় ? অনিন্দিতা হঠাৎ পরেশকে বাধা দিয়া কহিল,—এ কী কাণ্ড করলে বল দিকিন্ ? জ্যাঠামশাইর ত' আর শাসন নেই,—ছেলে যা করেন তাই তাঁর কাছে মহাভারত! কিন্তু আগে আমাদের খবর দিলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত ? আমরা কি তোমার বউকে কেড়ে রাখ্‌তাম ?

পরেশ ছেলেমানুষের মত হাসিয়া ফেলিল : দূর পাগ্‌লি! এ যে আমার বন্ধু বীরেনের বউ!

সে-হাসিতে অনিন্দিতার লজ্জার আর অন্ত রহিল না। সে কি না প্রকাশ্যে পরেশের আচরণের প্রতিবাদ করিতে গিয়া নিজের ঈর্ষা ও বেদনার পরিচয় দিয়া ফেলিয়াছে! কিন্তু কেনই বা যে সে সমস্ত শরীরে সহসা তীব্র দাহ অনুভব করিল, কী যে তাহার দুঃখ, সে এতদিন তাহার হিসাব লইতে ভয় পাইয়াছিল নাকি ? অনিন্দিতা তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া সুধার সঙ্গে মামুল আলাপ জমাইয়া ফেলিল। নিমেষে অনিন্দিতা যেন হাল্‌কা হইয়া গেছে। উপন্যাসের শুক্‌নো পৃষ্ঠা হইতে

নায়িকা সশরীরে তাহার চোখের সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়াছে বুঝি! কিন্তু গল্প বেশিক্ষণ চলিতে পারিল না। পরেশ আসিয়া কহিল,—তুমি ত' বেশ মেয়ে, অনি। খিদেয় পেট আমাদের চোঁ-চোঁ করছে, আর তুমি কি না দিব্যি পা ছড়িয়ে গল্প শুন্‌ছ। এদিকে একা-একা ঠাকুর কিছুয়ই কূল-কিনারা পাচ্ছে না।

অনিন্দিতা বিরসমুখে নামিয়া গেল এবং ঠাকুরকে সব রান্নার জোগাড় করিয়া দিয়া ফের ফিরিয়া আসিয়া এ-কথা তাহার আর মনে হইল না যে ক্ষুধার পরেশ ও সুধা আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না। দিব্যি রেলিঙ ধরিয়া পাশাপাশি দাঁড়াইয়া বারান্দার কোণ্‌টিতে অনুচ্চস্বরে দু'টিতে কী গল্প হইতেছে কে জানে, পরস্পরের সান্নিধ্যসুধায় দু'জনে এমন মত্ত যেন আজিকার রাত আর ফুরাইবে না। অতি নিঃশব্দে অনিন্দিতা পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাবিল একবার ডাকে, ক্ষুধাবোধ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া আবার সরিয়া পড়ে। উহারা খাইতে নামিয়া গেলে হয়ত বারান্দার ঐ কোণ্‌টিতেই আসিয়া দাঁড়াইবে,—কিন্তু একেবারে একা! খাইবার জন্য উহাকে আর কাহারো মনে করাইয়া দিতে হইবে না।

অনিন্দিতার মুখে কথা সরিল না। দুইজনে কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিয়া গেছে। সেই স্তব্ধতার সমুদ্রে পড়িয়া অনিন্দিতা হাঁপাইয়া উঠিল। বাণী যেখানে মূক, সেখানেই হয় ত' তাহা বেশি প্রকাশময়! অনিন্দিতা দেখিল হাওয়ায় সুধার চুল উড়িয়া উড়িয়া পরেশের বাহু ও গালের কাছে খেলা করিতেছে—পরেশ বোধ হয় গভীর স্তব্ধতায় নিশ্বাস ভরিয়া নারীদেহের সুবাসের স্বাদ নিতেছে, তাই তাহার দেহভঙ্গিতে এমন অটুট তন্ময়তা!

অনিন্দিতা ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া গেল, পেছন ফিরিয়া একবার চাহিয়া দেখিল তাহার এই নিঃশব্দ যাওয়াটিও কেহ লক্ষ্য করিল না।

প্রসন্নবাবু সোফায় শুইয়া তেমনি ঝিমাইতেছেন, অনিন্দিতা শিয়রের কাছে একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া তাঁহার চুলে আঙুল বুলাইতে লাগিল।

প্রসন্নবাবু চম্‌কাইয়া উঠিলেন : কে মা অনি?

—হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই। বাজি ত' আমি হেরে গেছি।

—তা, হেরে গেছ ত' নিশ্চয়ই। কিন্তু ওদের খাওয়া-দাওয়া হ'ল?

অনিন্দিতা ধীরে কহিল,—ওঁরা আজ খাবেন না।

—খাবে না মানে? এত দাপাদাপি এত হৈ-চৈ—

—সব বৃথা। ওঁরা এতক্ষণে টের পেয়েছেন সত্যি ওঁদের আজ্‌কে আর খিদে নেই।

প্রসন্নবাবু অবাক হইয়া কহিলেন,—তুমি কী বল্‌ছ অনি? এত দূর পথ থেকে ট্রেনের ধকলে—

—যা বল্‌ছি, স্বচক্ষে দেখে এস না। দেখ না ওদের খাওয়ানো আজ আর সম্ভব কি না। এবার বাজি রাখ্‌লে নির্ঘাৎ হেরে যাবে, জ্যাঠামশাই। সাবধান।

প্রসন্নবাবু ব্যস্ত হইয়া সোফার নীচে পা বাড়াইয়া জুতা খুঁজিতে লাগিলেন: তুমি যে আমাকে ধাঁধা লাগিয়ে দিলে, অনি।

সমস্ত মুখ কালি করিয়া অনিন্দিতা কহিল,—ধাঁধা আর ওরা কম লাগাবে না। যাও না বারান্দায়।

পরেশকে দেখিয়া বীরেনের মুখ এতটুকু হইয়া গেল। মুখের সেই বিবর্ণ চেহারা দেখিয়া সে কহিল,—ভয় নেই বন্ধু, রিক্তহস্তে ফিরে আসিনি। পরেশ তেমন ছেলে নয়। একটি দিনেই এস্‌পার। রাস্‌কেল্‌ হেমন্তকে মেরে সিধে ক'রে দিতাম, কিন্তু মাতালকে দৈহিক পীড়ন করা নাকি বিংশতাব্দীর এটিকেটে বাধে। হিম এবার অস্ত হ'ল, বন্ধু।

বীরেন ঢোঁক গিলিয়া কহিল,—সুধাকে পেলে? কোথায়? এত শিগ্‌গির!

বীরেনের এই নিস্তেজ ঔদাসীন্য দেখিয়া পরেশ গম্ভীর হইয়া গেল: তোমার কি তবে ধারণা ছিল যে সুধাকে আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না? প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ তা নয়। চল, ভেতরে একটু বস্‌বো? তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

বীরেন কহিল,—বাড়িতে বস্‌বার আর ফাল্‌তু ঘর নেই, বাবা আছেন। এস না ঐ রোয়াকটায় বসি।

দুইজনে অদূরে এক বাড়ির রোয়াকে আসিয়া বসিল।

পরেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল,—কিন্তু এখানে ব'সে আর কী হবে? চল আমার বাড়ি—সেই ত' তোমার সুধা-সৌধ।

বীরেন অল্প একটু হাসিল—মুমূর্ষু হাসি। কোনো উৎসাহ নাই। পরে আস্তে কহিল,—আমি একটা কথা ভাবছিলাম, পরেশ—

—সে-সব ভাবনা আমার বাড়িতে গিয়েই হ'বে খন। সুধা আঁচল পেতে তোমার পথ চেয়ে ব'সে আছে।

বিবর্ণ মুখে বীরেন প্রশ্ন করিল,—আমাকে কী করতে হবে?

—কী করতে হবে মানে? আমি কি বাল্মীকি নাকি যে আগে থেকে রামায়ণ আওড়াবো? সুধা তোমারই ত' নিজের রচনা। কিন্তু যাই এবার কর, সাম্‌নাসাম্‌নি—বীরেন্দ্র নামকে অর্থবান করা চাই।

—সব বুঝ্‌লাম। কিন্তু আরো অনেক ভাবনা আছে—

—ভাবনা আছে, ভাব্‌বে। তাতে কী? জীবন ত' সমুদ্র,—কত তার ঢেউ!

—কিন্তু আমি বলছিলাম সুধাকে তার মামাবাড়ি রেখে এলে কেমন হয়?

কথা শুনিয়া পরেশের সমস্ত শরীর জুড়াইয়া গেল আর কি! ষ্টেজে নামিয়া পার্ট ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়া নায়ক যেন সোজা উইং দিয়া সরিয়া পড়িল! কপাল কুঞ্চিত করিয়া পরেশ কহিল,—তার মানে?

বীরেন আর ঘাব্‌ড়াইল না: মানে এর চেয়ে স্পষ্ট হয় নাকি কোনোদিন? তুমি গিয়ে ওকে রেখে এস, বলো—কাশীতে মাসির বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিলো। অত কথা বলবারই বা কি দরকার?

—এ সব তুমি কী বল্‌ছ বীরু? মামাবাড়ি রেখে আসবে কী?

—এ ছাড়া অন্য উপায় যদি থাকে, ভেবে দেখ্‌তে পারো। আমি ভেবে দেখলাম প্রেম জিনিসটা অত্যন্ত বাজে; কাজের যদি কিছু থাকে ত' বিয়ে।

হ্যাঁ, সেই বিয়েই ত' তোমাকে করতে বল্‌ছি। স্পষ্ট রাত্রিকালে, ঘোমটার নীচে স্পষ্ট শুভদৃষ্টি ক'রে।

কুটিল হাসি হাসিয়া বীরেন কহিল,—হ্যাঁ, সেই বিয়েই আমি করছি।

—কাকে?

—বেনেপুকুরের ললিত ধরের মেয়েকে।

পরেশ খাড়া হইয়া উঠিল: আর সুধা?

বীরেনের মুখে সেই কদর্য্য হাসি: যাকে ভালবাসা যায় তাকে বিয়ে করাও বিংশশতাব্দীর এটিকেটে বাধে যে।

দৃঢ়স্বরে পরেশ কহিল,—এ-সবের অর্থ?

—অর্থ যদি তোমার মাথায় না ঢোকে তা আমি কী করবো? ললিত ধর বাবাকে এত টাকা দিচ্ছেন যে তাঁর দু'হাতে সমস্ত ধরবে না বলে'ই আমার লণ্ডন একান্ত কাছে এসে পড়েছে। আমি তুচ্ছ প্রেমের জন্যে যদি এমন দাঁও ছাড়ি, তবে আমার কাণ্ডজ্ঞান দেখে তোমার বিংশশতাব্দী শত মুখে ধিক্কার দিয়ে উঠ্‌বে। মনে হচ্ছে সুধাকে নিয়ে এত হাঙ্গাম না করলেও কোনো ক্ষতি ছিলো না। কাশীতে হেমন্ত ওকে কষ্টে রাখতো না বোধ হয়। ওর পক্ষে তা মন্দ কি?

—মুখ সামলে কথা বল, বীরু। দুই স্কন্ধ বিস্তৃত করিয়া নির্ভীক পরুষ-কণ্ঠে পরেশ কহিল,—ভীরু মিথ্যাচারী, পাষণ্ড, এর পর আমি তোমার কী করতে পারি জানো?

বীরেন ভয় পাইয়া গেল। তবু, আমতা-আমতা করিয়া কহিল,—ভুল জীবনে

একটা করেছি বলে'ই তাকে তাপ্পি লাগিয়ে-লাগিয়ে চিরকাল টিকিয়ে রাখ্‌বো এতে আমার বিবেকের সায় পাই না, পরেশ। তুমি আমার ছেলেবেলার বন্ধু বলে'ই বলছি, তুমি বুঝ্‌তে পারবে হয় ত'। সুধার আমি কোনো ক্ষতিই করি নি, চেষ্টা করলে ওর জন্যে তুমি এখনো সুপাত্র পাবে। আমি ত' পাষণ্ডই।

—নিশ্চয়ই পাষণ্ড, একশোবার। তুমি কি ভেবেছ একটি সরল বিশ্বাসী মেয়ের ভাবপ্রবণতার সুবিধে পেয়ে তাকে নিয়ে তুমি ছিনিমিনি খেলবে? এবং সে-খেলা ফুরিয়ে গেলেই তাকে ফাটা ফুটবলের মত ছুঁড়ে ফেলে দেবে? অত সোজা ভেবো না। আমাকে চেন না তুমি।

চেহারা দেখিয়া মনে হইল সত্যিই বীরেন তাহাকে চেনে না।

পরেশ বলিয়া চলিল: এর চেয়ে তার আর তুমি কী ক্ষতি করতে পারতে? ভালবাসার ভাণ ক'রে তাকে ঘর ছেড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে মাঠের মাঝে ফেলে এসে পিঠ দেখালেই পার পাবে ভেবো না। তার হ'য়ে আমি আছি। আমি দেখে নেব।

অত্যন্ত ভীত হইয়াও বীরেন বলিল,—কী আবার দেখে নেবে? একটা তুচ্ছ প্রেম আমার জীবনের মহত্তর সম্ভাবনাকে আড়াল ক'রে দাঁড়াবে তোমার বিচারে সেই যদি কল্যাণ হয়, তবে নমস্কার, পরেশ। যা পারো দেখে নিয়ো।

রূঢ় কণ্ঠে পরেশ কহিল,—ললিত ধরের টাকা আর তোমার বাবার অঞ্জলিতে ধরলো না বীরেন, আমি এখুনি থানায় যাচ্ছি। তুমি ফুস্‌লিয়ে ছলে ও পরে বল প্রয়োগ ক'রে একটি সাবালিকা মেয়েকে গৃহত্যাগিনী করেছ,—মনে রেখো। আর, এও মনে রেখো, সুধা তোমার এমন নির্জ্জীব পুত্তলিকা নয় যে, একটিও আঙুল না তুলে এই অপমান নীরবে হজম করবে। দেখি, কেমন তোমার বিয়ে হয়।

বীরেন বিমর্ষ হইয়া কহিল,—তোমার কি ইচ্ছা লণ্ডনে না গিয়েই তার কুয়াসায় আমার জীবন অন্ধকার ক'রে তুলি? এই কি তোমার ধর্ম্ম?

—ধর্ম্ম? তোমার ধর্ম্ম কি এই যে একটি মেয়েকে এমন ক'রে পথে বসিয়ে ষ্টিমার ধরবে? এক পক্ষকাল না পেরতেই ভালবাসা যার বাসি হয়, স্নায়ু যার জুড়িয়ে আসে, তাকে শাসন করবার অস্ত্র আমার হাতে নেই এমন কথা মনেও স্থান দিয়ো না।

বীরেন অল্প একটু হাসিয়া কহিল,—আমার ভালবাসা ত' তবু বরং দীর্ঘায়ু। আসলে ও চব্বিশ ঘণ্টার বেশি টেঁকে না। স্বয়ং সূর্য্যই ক্ষয় পাচ্ছেন, আর এ ত' স্নায়ু! আচ্ছা, কে-না-কে একটা মেয়ের জন্যে তোমারই বা হঠাৎ এত মমতা উথ্‌লে উঠ্‌লো কেন? ওকে ব'য়ে যেতে দিলে কোথায় ট্রেনে কলিশান্‌ লাগতো, কোথায়ই বা ল্যাণ্ড্‌ স্লিপ্‌ হত শুনি? এম্‌নি কত মেয়েই ছিট্‌কে খসে' ভেসে পড়্‌লো—

তার হিসেব নিয়ে মাথা ঘামালে কি আমাদের চলে? হেমন্তর কাছে ছিল, বেশ ছিল—

হঠাৎ পরেশ ক্ষিপ্র বলিষ্ঠ হাতে বীরেনের জামার গলাটা চাপিয়া ধরিল: এক ঘুষি মেরে দাঁতগুলো সব ভেঙে দেব। আচ্ছা দাঁড়াও, আগে তোমার বাবাকে জানাই, দেখি বিহিত করিতে পারি কিনা। বলপ্রয়োগের সুযোগ এখনো চ'লে যায়নি। পরেশ বোধ করি দেবেনবাবুর সন্ধানে বাড়ির মধ্যেই যাইতেছিল, বীরেন বাধা দিল। কহিল,—বাবা বিশ্বাস করবেন না।

—তোমার বাবার রায়ই নত মস্তকে আমাদের পালন করতে হবে মনে করো না। তবু তাঁকে একবার জানিয়ে রাখি।

—রেখো, সময় আছে ঢের। কিন্তু আমি বলছি যে-মেয়ে হেমন্তর কাছে ছিল তাকে আমি গ্রহণ করলেই কি মহাভারত পবিত্র হ'বে?

—হেমন্তর কাছে ছিল মানে? বিলেত যাবার নাম ক'রে ভদ্রতাও বিসর্জ্জন দিলে নাকি? দৈহিক বলপ্রয়োগ না করলে তোমার দেখ্‌ছি বুদ্ধি খুল্‌বে না।

বীরেন কহিল,—দোহাই তোমার। দয়া ক'রে তুমিও যদি ভদ্রতা না বিসর্জ্জন দাও, ত' বাধিত হ'ব। কেননা তুমিও গ্রেপ্তার হ'লে সুধা একেবারে যাবে। ওর আর কেউ থাকবে না।

—খুব যে দরদ দেখ্‌ছি। তার একমাত্র ভাবোন্মত্ত নির্ভরশীল মূর্ত্তিই তুমি দেখ্‌লে, আত্মার বলে সে যে কী দৃপ্তা, তা দুর্ভাগ্য বলে'ই তোমার চোখে পড়্‌লো না। দৈহিক বলপ্রয়োগ করে'ই ও হেমন্তকে কাবু করেছে—তাকে ছোঁয় হেমন্তর সাধ্য কী! বলিয়া ঘটনাটা সে বিবৃত করিল: এবং যার ঘরে গিয়ে ও আশ্রয় পেয়েছিলো তার মহত্ত্ব তুমি স্বর্গে গিয়েও কল্পনা করতে পারবে না। ছি ছি, তুমি এত নীচ। প্রদোষের সামান্য যে চাকর রঘুয়া, পরজন্মে তার মত হ'তে পারলেও ভেবো এ জন্মে পুণ্য করেছিলে। কিন্তু তোমার মত ভিলেইন্‌কে তর্ক ক'রে বোঝানো যাবে না—আমি যাচ্ছি দেবেনবাবুর কাছে।

বীরেন এইবার বুঝিল ব্যাপার সুবিধার নয়। সোজা পথে চলিলে আর সিদ্ধি নাই, মোড় ফিরিতে হইবে। পরেশ এমন জেদী যে সত্যিই সহজে ছাড়িবে না। তুমুল একটা কাণ্ড পাকাইয়া তুলিবে। উনিশ শো একত্রিশ সনেও কোনো যুবক চিন্তায় ও ব্যবহারে এমন প্রাচীন থাকিতে পারে বীরেনের তাহা বিশ্বাস করিতে কষ্টবোধ হইল। কিন্তু ব্যবস্থা একটা করিতেই হইবে। প্রথমত, সুধা যে এত সহজে ধরা পড়িবে বীরেন ভাবিয়া রাখে নাই। ধরা পড়িলেও অন্তত এক সপ্তাহের আগে নয়—এই ভাবিয়াই পুরুত ডাকাইয়া পাঁজি-পুঁথি উল্টাইয়া বিয়ের দিনটা সে

আগাইয়া আনিয়াছিল। হেমন্ত এমন কাঁচা লোক কে জানিত! একটা পুঁচকে মেয়ে স্বচ্ছন্দে তাহার গালে চড় মাড়িয়া যায়, আর সে পিছু নিয়া তাহাকে ল্যাং মারা দূরে থাক্ একটা ঢিল ছুঁড়িয়াও জখম করিতে পারে না! আর, সে কিনা দু'চুমুক মদ খাইয়া গল্‌গল্ করিয়া পেটের সব কথা উগরাইয়া দিল! আর পরেশের এমন ধর্ম্মজ্ঞান যে পথের ধুলায় মোহরের থলি পাইয়াও সে আত্মসাৎ করিল না মালিককে ফিরাইয়া দিতে আসিল। এমন যে অনাধুনিক অথচ মুগুড় ভাঁজিয়া বুকের ছাতিটাকে অসম্ভব রকম চওড়া করিয়াছে তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইবারই ত' কথা। ভাবিয়াছিল কাঁধ চাপড়াইয়া অস্কার ওয়াইল্‌ডের অনুসরণে দু' একটা জাঁকালো এপিগ্রাম বলিলেই সে ঠাণ্ডা হইবে। কিন্তু যেই ভাবে সহসা গলাটা চাপিয়া ধরিয়াছিল, আরেকটু হইলে বীরেনের নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইত। অতএব মোড় না ফিরিলেই নয়।

সরল স্বচ্ছ হাসিতে মুখমণ্ডল স্নিগ্ধ করিয়া বীরেন কহিল,—এ-জন্মের যেমন সব পুণ্যের বহর, পরজন্মে রঘুয়া হ'তে পারব কি না জানি না। তবে পূর্ব্ব জন্মে যে রাঘব ছিলাম সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। নইলে আশ্রয়চ্যুতা সুধাকে কখনো সন্দেহ করি?

কথার সুর ফিরিল দেখিয়া পরেশ অবাক হইয়া গেল। পরেশের কাঁধে হাত রাখিয়া বীরেন কহিল,—তুমি পাগল হ'লে, পরেশ? আমার আশ্রয় থেকে বঞ্চিত ক'রে ওকে আমি সন্দেহ করব, আমাকে তুমি এত বড় অমানুষ পেয়েছ? আমার কি সামান্য দায়িত্ব নেই? বাবার চোখে ধুলো ছুঁড়ছি কি আর সাধে? চল, যাই সুধাকে দেখে আসি। কিসের আমার বিলেত, কিসের বা কী! চল। বলিয়া সে পা বাড়াইল।

পরেশ বিস্মিত হইয়া কহিল,—তবে মাঝে এমন বাজে চাল মারছিলে কেন?

হাসিয়া বীরেন কহিল,—কারণটা বল্‌লে ফের থিয়েটারি ঢঙে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবে না তো? বল্‌তে আর আপত্তি কি? আমার কেন-জানি মনে হয়েছিল সুধা তোমাকে চায়!

পরেশ ধমক দিয়া উঠিল: বাজে কথা রাখ। চল শিগ্‌গির, বেচারি তোমার জন্য ভেবে হায়রান্ হ'য়ে গেল। আমাদেরই পাড়ায় নন্দন লেনএ ছোট একখানা দোতালা বাড়ি খালি প'ড়ে আছে—বহুদিন। বাড়িওয়ালার একটা হিল্লে হবে। আপাতত সেই বাড়িতেই তোমরা ওঠ, সামনের শুভ লগ্নেই তোমার বিয়ে দি—

সে-কথায় কান না দিয়া বীরেন কহিল,—কিন্তু এমন অটল তোমার বন্ধুতা যে, এতটুকু বিচ্যুতি হবার ফাঁক নেই। একেবারে নিরেট। এতক্ষণ মিথ্যা কথা ব'লে

তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম, পরেশ। তুমি যে ছাগলের মত গীতা খানা বিল্‌কুল চিবিয়ে খেয়েছ সেটা বিংশশতাব্দীর পক্ষে একটা প্রকাণ্ড শুক্‌। আমি কিন্তু খুসিই হয়েছি, ভাই। নইলে বিয়েই বল, বা বিলেতই বল—সবই আমার সুধাকে না পাওয়ার অভিমান। তাকে আবার যখন ফিরে পেলামই, তখন বিধাতার প্রমাণ সম্বন্ধে আর আমার দ্বিধা রইল না, চল, সঙ্গে কিছু টাকা নেব?

পরেশ কহিল,—দরকার নেই। দু' দিনে আমি সব ঠিক-ঠাক্‌ ক'রে ফেল্‌বো। কিন্তু বাবা যদি তোমার জানতে পেরে বাধা দিতে আসেন?

কথাটাকে বীরেন হাসিয়া উড়াইয়া দিল: সে কি একটা কথা হ'ল? বাবাকে আমি কেয়ার করি নাকি? আমি বলি কি জান পরেশ, আমাদের পাঁজি-পুঁথি মান্‌বার আর কোনো দরকার নেই। কালকেই কাজটা সেরে ফেলা যাক্‌। পাঁজি মিলিয়ে বিয়ে হয় নি এটা হিন্দুত্বে আট্‌কাবে না নিশ্চয়ই। কি বল? ফ্যাক্টাম ভ্যালেট্‌?

—বেশ। তোমার যা ইচ্ছে। তাতে আমার কি বল্‌বার আছে?

পরেশের এই অন্যমনস্কতাটুকু বীরেনের দৃষ্টি এড়াইল না।

বীরেনের এই মত-পরিবর্ত্তনে পরেশ যে তাহাকে সহসা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিয়া ফেলিল এমন নয়; কিন্তু সুধাকে পথে বসাইয়া সে যে তাহারই বুকের উপর দিয়া আনায়াসে রথ চালাইয়া যাইবে এত বড় অত্যাচার সে স্বচক্ষে দেখিতে পারিত না। উচ্ছৃঙ্খলকে বাঁধিতে হইবে। একবার বিবাহের ফাঁস গলায় লট্‌কাইয়া দিতে পারিলেই হইল। তার পরের ব্যাপারে পরেশ সাতেও নাই, পাঁচেও নাই। যেমনটি ছিল তেমনটি থাকিবার সুর যদি সহসা কাটিয়া গিয়া থাকে বরং সেই এইবার লোনাজলের উপর দিয়া ভাসিয়া পড়ুক।

বাস্‌এ বসিয়া দুই জনেই চুপ করিয়া রহিল। পরেশ জানিত এই বিবাহে সুধা সম্পূর্ণ হইবে না, কেননা প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়ার নিয়মেই তাহারা হয় ত' ভিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তবু তাহাতে তাহার কী যায়-আসে! সে সংসারে প্রেমকে স্থায়ী করিবার জন্যই সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধং দেহি বলিয়া কোমর বাঁধিয়াছিল! কিন্তু যেখানে সমাজ নাই, সংসার যেখানে আর সরিতে চাহে না, মানুষের সেই মন লইয়া সে আর কী মেরামতি করিবে?

বীরেন কথা না কহিলে পরেশ আরো কত কি যে ভাবিয়া বসিত ঠিক নাই। বীরেন কহিল,—দায়িত্ববোধ আমারই কম ছিল না, পরেশ। তুমি কি ভাব, আমি সুধাকে হারিয়ে যেতে দিতাম?

পরেশ বিমনা হইয়া বলিল,—দায়িত্ববোধই বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা, তুমি

সুধাকে ভালোবাস। তাকে তুমি জয় করেছ, সেই জয়টীকা তার কপালে শোভা পাচ্ছে। চরাচরে লৌকিক আচারটাই ত' আর বড়ো নয়।

—নিশ্চয়। নন্দন লেনএর বাড়িটা আজই ঠিক ক'রে ফেলা যাক্। সম্ভব হ'লে আজই আমাদের গৃহপ্রবেশ হবে। লৌকিক আচার আমিও মানিনে।

তাই যদি হয়, বীরেন সুধাকে লইয়া কাশীর দিকে ভাসিয়া পড়িল কেন? সোজাসুজি নন্দন্ লেনএই ত' নন্দনকাননের পত্তন করিতে পারিত! যদি সে বাধাকে না ডরায়, জীবনে সুবিধাকেই সুখ মনে না করে, ভীরুর মত ঘুঁটের তলায় মাথা গুঁজিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল কেন? প্রেমে প্রাপ্তিই কি বড়, অধিকারহীন চির-অধিবাসে কি তার তৃপ্তি নাই?

পরেশের মন যেন বীরেনের চোখে ধরা পড়িয়াছে। সে ফের কহিল,—ভেবেছিলাম কাশীতেই কাজটা সেরে ফেলে একেবারে যুগলমূর্ত্তিতে বাবার কাছে এসে দাঁড়াবো, হনি-মূন্‌টাও বাকি থাকবে না। কিন্তু মানুষের জান ত', দশ দশা,—কভু হাতী, কভু মশা! মশা আবার হাতী হয়েছে। বলিয়া সে এক বাস্ লোকের মধ্যেই জোরে হাসিয়া উঠিল।

পরেশের আগে বীরেনই লম্বা পা ফেলিয়া সিঁড়ি ডিঙাইয়া উপরে উঠিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে হাঁক দিল,—কৈ, সুধা কৈ?

বীরেন আর আসিবে না এই অসম্ভব প্রত্যাশাটি লইয়া সুধা মর্ম্মরিত হইতেছিল। হঠাৎ দুয়ারের বাহিরে সেই পরিচিত স্বর শুনিয়া সুধার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত কাঁটা দিয়া উঠিল। অনিন্দিতা কাছেই বসিয়াছিল, সে মুচকিয়া হাসিয়া বলিল,—ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে। মাথায় ঘোমটা টান, সুধা।

সুধা যেন নিমেষে পাথর হইয়া গেছে। পরেশের ইঙ্গিতে পর্দ্দা সরাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া বীরেন আনন্দে কহিল,—এই যে! এ কী, আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছ না নাকি?

সুধা তাড়াতাড়ি মাথার উপর সুদীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া দিয়াছে।

ঠাট্টা করিয়া পরেশ কহিল,—আমাদের সাম্‌নে এত রাজ্যের লজ্জা নিয়ে তুমি যে দম আট্‌কে মারা পড়্‌বার জোগাড় কর্‌লে দেখছি। চল অনি, দাঁড়িয়ে থেকে ওদের মধু-মিলনোৎসব পণ্ড ক'রে আর লাভ নেই, চল। বলিয়া পরেশ প্রস্থান করিল। সুধার দিকে কৌতুকপূর্ণ কটাক্ষ হানিয়া পর্দ্দাটা বিস্তৃত করিয়া অনিন্দিতাও অদৃশ্য হইল।

একটি সম্পূর্ণ মিনিট ধরিয়া অটল নিষ্ঠুর নিস্তব্ধতা। কাহারো মুখে কথা নাই। ভিতরে ভিতরে কুটিল ঘৃণা কুণ্ডলী পাকাইতেছে—দুই জনেরই। বীরেন মুখে মুখোস

টানিয়া দিল। কহিল,—পরস্পরকে আবার যে আমরা পাবো এ ষড়যন্ত্র খালি আমাদেরই নয়, প্রত্যেকটি গ্রহ-নক্ষত্রের। আমাদের প্রেম যদি সত্য না হবে তা হ'লে আবার আবার আমাদের দেখা হ'ত না, সুধা। সময়-সমুদ্র সাঁতরে আবার আমরা একই কূলে এসে আশ্রয় পেয়েছি। কিন্তু কপালের সিঁদুর তুমি মুছে ফেলেছ যে? বলিয়া বীরেন সন্নিহিত হইয়া সুধার খোঁপাটা স্পর্শ করিল।

এই স্পর্শেই সুধার আকাশে তারা জাগিয়াছে, অরণ্যে ঝটিকা। এই ইন্দ্রজালেই সে আপনাকে রঙিন করিয়া তুলিয়াছিল। সুধা নিমেষে আবার নিজেকে নূতন করিয়া ফেলিল। কহিল,—বালিশের ঘষায় সিঁদূর মুছে গেছে, কিন্তু—কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না।

বীরেন কহিল,—কিন্তু কি?

—মনের দাগ ত' আর কৃত্রিম নয় যে মুছবে।

—ঠিক। তুমি এত কথা শিখ্‌লে কোত্থেকে বল ত'?

—জানি না। কে যেন এক মুহূর্ত্তে সব শিখিয়ে দিয়েছে। নিজেকে একবার চিন্‌তে পারলেই হ'ল।

বীরেন থামিয়া গেল। একটু কি ভাবিয়া পরে কহিল,—মামাবাড়ি ফিরে যাবে, সুধা?

—মামাবাড়ি ফিরে যাবার জন্যেই ত' আর কাশীতে তোমাকে মাসি-বাড়ি পাঠাইনি।

—না, না। সে-রকম ফেরা নয়, সে ত' তোমাকে ফেরানো। দু'জনে সশরীরে গিয়ে হাজির হ'ব গাঁটছড়া বেঁধে। তোমার ডাইনে আমি।

—কিন্তু সে-দিন ত' এখনো আসেনি। পরেশবাবু বল্‌ছিলেন এর আগেই আমাদের সামাজিক একটা বিয়ে হওয়া দরকার। বরং সেই বিয়েতেই মামাকে নেমন্তন্ন করা যাবে।

—মন্দ নয়, সেই ভালো আইডিয়া। দিন-ক্ষণ বাছাবাছি করাটা নেহাৎ সেকেলে। কালই সেরে ফেলি, কি বল? কালিঘাট থেকে গোটা দুই পুরুত, আর কিছু যজ্ঞকাষ্ঠ—ব্যস্‌। কিন্তু ও-রকম একটা অভিনয়ের কি খুব বেশি দরকার ছিল মনে হয়?

—পরেশবাবু বল্‌ছিলেন, দরকার আছে নাকি। প্রত্যক্ষ আচরণের মধ্যে কেমন একটা জোর পাওয়া যায়, শালগ্রাম-শিলা পর্য্যন্ত জীবন্ত হ'য়ে ওঠে।

—তবে তাই; পরেশকে ডাকি।

নিজেকে গুছাইয়া নিতে সুধার আর দেরি হইল না। কোথা হইতে কী সঙ্কেত

পাইল, সে আবার নিজের পথ দেখিয়া লইয়াছে। সেই পথে বীরেনই তাহার বন্ধু—জন্ম-মৃত্যু ডিঙাইয়া অমরতার পথে তাহারই সাথে তাহার অশেষ যাত্রা! জন্মিবার মুহূর্ত্তে তাহার নক্ষত্র এই পথই দেখাইয়া দিয়াছিল হয় ত', সে না চাহিলেও পথ তাহার জন্য হাত বাড়াইয়া দিয়াছে। হোক্ আতপ্ত মরুভূমি, বিদ্যুতের কটাক্ষ থাক্, তবু সে থামিবে না। হঠাৎ বীরেনের পায়ের গোড়ায় প্রণত হইয়া সুধা কহিল,—তোমাকে আজ আমার ভারি প্রণাম করতে ইচ্ছা হচ্ছে। তুমি আমাকে আর ছেড়ে যাবে না বল?

দূর পাগ্‌লি! বীরেন আদর করিয়া সুধার খোঁপাটা খুলিয়া ফেলিল: আমাকে তুমি ছেড়ে যাবে না বল?

এই কথায় কী ছিল কে জানে, সুধা বীরেনের কাঁধের উপর মুখ গুঁজিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বীরেন তাহার চুলের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নিগ্ধস্বরে কহিল,—তবে বোঝ, অমন নিষ্ঠুর কথা বল্‌লে কেমন লাগে! আর বল্‌বে?

কাঁধের মধ্যেই মুখটা বারকতক নাড়িতে নাড়িতে সুধা বলিল,—না, আর বল্‌বো না কক্‌খনো না। তারপর অশ্রুসিক্ত স্নিগ্ধ মুখখানি তুলিয়া কহিল,—এখানে আমার একটুও মন টিক্‌ছে না, আজই আমাকে নূতন বাড়িতে নিয়ে চল। সেখানে দুইজনে মিলে সংসার পাত্‌বো। টাকার জোগাড় কী হ'বে?

—সে-সব কথা তোমাকে ভাব্‌তে হবে নাকি? আমার দুটো হাত নেই? না-হয় দোতলা বাড়ি ছেড়ে মাটির ঘরে গিয়েই বাসা বাঁধ্‌বো। আমার সঙ্গে মাটির ঘরে থাক্‌তে তোমার কষ্ট হবে?

উচ্ছ্বসিত হইয়া সুধা কহিল,—মাটির ঘরই ত' আমার স্বর্গ। ছোট্ট একটি উঠোন, কোণে তুলসী-মঞ্চ, বেড়ার গা বেয়ে অপরাজিতা লতা! মাটিই ত' মিঠে। বলিয়া সুধা কি-রকম করিয়া যেন চাহিল।

বীরেন বুঝিয়াও বুঝিল না।

পরেশকে ভূতে পাইয়াছে। বাজার হইতে বাড়িওয়ালাকে পাক্‌ড়াইয়া, তালা খুলাইয়া, এক মাসের আগাম্ ভাড়া চুকাইয়া রামদীনকে দিয়া বাল্‌তি-বাল্‌তি জল, ফিনাইল, ক্লোরিন্ ও পোটাস্ পারম্যান্‌গেনেট্ ঢালাইয়া বাড়িটাকে রীতিমত ঝকঝকে করিয়া তুলিল। অবশ্য বীরেনেরই তদারকে। বীরেনের উৎসাহ আর ধরে না; বলে: এ ঘরটাকে করবো ভাঁড়ার, ওটা রান্নার, গ্যাস্ ষ্টোভ বসাবো; নইলে কয়লার ধোঁয়ায় ত' খালি হাইড্রোকার্বন। কল্‌কাতায় দিনে পঞ্চাশ টন ধোঁয়া জমা

হয়, জান? আর বাড়ির এত গা ঘেঁষে গাছ লাগানো হয়েছে কেন? আলো হাওয়া বন্ধ রেখে ঘরটাকে যে ড্যাম্প ক'রে ফেল্‌বে। ইঁটের যে capillary attraction আছে তা বুঝি এরা কেউ জানে না? ওগুলো কাট্‌তে হবে।

পরেশ হাসিয়া বলে,—সে হবে'খন। দক্ষিণে কেমন সুন্দর বারান্দা দেখেছ?

—হ্যাঁ, কয়েকখানা চেয়ার পাত্‌তে হ'বে। দক্ষিণ যদি খোলা থাকে, তবে আমি স্বর্গেও যেতে চাই না।

—কি হ'লে বাড়িটা স্বর্গ হ'য়ে ওঠে সে ব্যবস্থা ত' আগেই করেছ। কৃত্রিম সুধায় আর প্রয়োজন কি?

বীরেন হাসিল; পরে মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল,—তুমি আমার জন্যে অনেক খরচ করলে যা হোক। আবার একটা খাট আন্‌তে গেলে কেন? দক্ষিণের বারান্দাই ত' যথেষ্ট দক্ষিণা। একটা ফর্দ্দ ক'রে ফেলো।

—কেন? শোধ দেবে নাকি?

—নিশ্চয়ই। শোধ দেব না?

—থাক। এ-সব তোমার বিয়েতে যৌতুক দিচ্ছি। পণ ত' আর দিতে পারবো না।

কথা বলার ধরণ দেখিয়া বীরেন হাসিয়া উঠিল: তা বটে।

—এ সব গোছগাছ ক'রে আমাকে আবার দোকান ঘুরতে হ'বে। খালি-হাতে মেয়েকে ত' আর শ্বশুর-বাড়ি পাঠানো যায় না, লোকে নিন্দে করবে যে।

গম্ভীর হইয়া বীরেন বলে: ফের আরেকটা ছোরা কিনে দেবে নাকি?

—দরকার কি! ছোরার চেয়ে চপেটাঘাতই তার বেশি কার্য্যকরী। তাই কাশীতে ছোরাটা সে ফেলে এসেছে। কিম্বা প্রদোষবাবুই হয় ত' ওটা রেখে দিয়েছেন। সন্ন্যাসী মানুষ,—কাজে লাগ্‌তে পারে। সন্ন্যাসীর কাছেও স্মৃতিচিহ্নের মূল্য আছে বোধ হয়।

—হুঁ! কিম্বা একটা ধূপদানি?

—তারো দরকার নেই। দিব্যি দক্ষিণের বারান্দা, তিথিটা কৃষ্ণপক্ষ হ'লেও এক ঘুম পরে চাঁদ দেখতে পাবে, পাশেই ফুলদানি তোমার। উপমাটা সুবিধের হ'ল না, না?

—খাসা উপমা! তবে কী এমন কিন্‌বে শুনি?

—বাসন-কোসন, হাঁড়ি-কুঁড়ি, খুন্তি বেলুন। সুধা ত' আর এখন শুধু-লক্ষ্মী নয়, গৃহলক্ষ্মী। কিন্তু সে-সব কেনা-কাটা বিকেলে করলেও চল্‌বে। দু'জনেই বেরুনো যাবে, কি বল?

—বেশ।

—এখন চল, খাওয়া-দাওয়া সেরে নিই গে। সুধা তোমার জন্যে রাঁধছে।

—খাবে ত' তুমিও।

—রামদীনও। সে-কথা হচ্ছে না। কিন্তু তোমার বাবা যদি টের পেয়ে একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসেন?

হাতে-মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করিয়া বীরেন কহিল,—সেই ফ্যাক্টাম ভ্যালেট্। বড় জোর ত্যাজ্যপুত্তুর করতে পারেন। মিতাক্ষরার দেশে যখন জন্মাইনি তখন এ অত্যাচার সইতেই হবে। তা ব'লে সুধাকে ত' আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। তাই এ-বাড়িতে শিকড় গাড়তে হ'বে ব'লেই ত' বাড়িটার হাইজিনিক্ অবস্থা সম্বন্ধে এত মাথা ঘামাতে হচ্ছে। সে-সব আর মোটেই প্রব্লেম্ নয়। যাক্ গে, ঝাঁপিয়ে যখন পড়েছি, কিনারা একটা পাবই। মা যখন বর্ত্তমান, তখন বাঙলা-দেশ সম্বন্ধে এত সহজে হতাশ হওয়া সাজে না। চাই কি একদিন সমারোহে পিতৃ-সিংহাসনেই আরোহণ করবো। এখন চল দিকিন, সুধার হাতের রান্না খেতে আমিও কম ব্যস্ত হইনি। বাড়িটা তালাবন্ধ করবে?

—কেন, রামদীন পাহারা দেবে'খন।

প্রসন্নবাবু বলিয়াছিলেন: বিয়েটা আমাদের এখানে সেরে ফেল্‌লেই ত' হ'ত। আরেকটা বাড়ি ভাড়া ক'রে টানা-হেঁচ্‌ড়া ক'রে কী লাভ?

পরেশ বলিল,—সেই নতুন বাড়িতে ত' ওদের যেতেই হবে, দেবেনবাবু ত' আর সহজে আশ্রয় দেবেন না। তা ছাড়া এখানে একটা হাঙ্গাম করতে গেলে বাইরে জানাজানি হবার ভয় আছে। তামাসাটা কোন রকমে চুকিয়ে ফেল্‌তে পারলেই আমাদের ছুটি।

অনিন্দিতা কাছেই দাঁড়াইয়াছিল, একটু ঝাঁঝালো গলায় সে বলিয়া উঠিল: আমাদের এ নিয়ে এত মাথা ঘামাবার যে কী দরকার ছিল বুঝি না। কোথাকার কে-না-কে, তার ঝক্কি মাথা পেতে নিয়ে এমন সব কাণ্ড বাধিয়ে তুল্‌লে, শেষকালে কিছু একটা গোলমাল হ'লে মুস্কিল-আসান্‌কে সিন্নি দিয়েও পার পাবে না।

পরেশ কহিল,—গোলমাল যাতে না হয় সেই জন্যেই ত' কোনোরকমে বিয়েটা ওদের দিয়ে ফেল্‌তে চাই।

—তাই। কোন রকমে বিয়েটা দিয়ে ফেলে চুপটি ক'রে স'রে এস। তোমার কী এমন মাথা-ব্যথা! কাশীতে বিপন্ন হয়েছিল, বেশ, তাকে উদ্ধার করেছ। কিন্তু এ-বাড়িতে এনে তোলবার এমন কি দায় পড়েছিল? যার সঙ্গে বেরিয়েছে তারই সঙ্গে বোঝাপড়া করুক না। সে তাকে বিয়ে ক'রে নিজের কাছে রাখুক, মুখে কালি

মেখে মামাবাড়ি পাঠিয়ে দিক্, অবলা-আশ্রমে ভর্ত্তি ক'রে দিক—তোমার-আমার কী আসে যায় ? তাদের বোঝা তারা বুঝবে। পরের চরকায় তুমি তেল দিতে গেলে কেন ?

অনিন্দিতার এমন মূর্ত্তি পরেশ কোনদিন কল্পনাও করে নাই। নির্ব্বাক-কুণ্ঠিতা, গোপনচারিণী। সহসা সে এমন উদ্‌ঘাটিত হইল কেন, কে বুঝিবে ? পরেশ বলিল, —বন্ধুর একটা উপকার করছি মাত্র। নইলে সুধা আমার কে !

কথাটা শুনিয়া অনিন্দিতা খুসি হইতে পারিল না : যেই হোক্, ওদের বিদেয় ক'রে আমাদের সবাইকে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমুতে দাও দিকি। ওরা কাশী যাক্, তোমার কী ! টাকা যেন জল, জ্যাঠামশাইর ত' আর শাসন নেই, যা ইচ্ছে তাই উড়োও। মুটের মাথায় ক'রে সাম্রাজ্য নিয়ে এসেছ। মামা গেল, মাসি গেল, উনি এলেন সম্বন্ধী।

প্রসন্নবাবু হাসিতে লাগিলেন। কহিলেন,—তার চেয়ে ঐ টাকাটা ওদের নারী-কল্যাণসঙ্ঘে চাঁদা দিলে অনুর মুখে আজ চাঁদ উঠ্‌ত।

—নিশ্চয়। দেশের কাজে আর মুঠো খোলে না। এ দিকে মেয়েদের নিয়ে কত ঠাট্টা, অথচ—

কথাটা গলার কাছে আসিয়া কাঠ হইয়া গেল। অনিন্দিতার রাগ দেখিয়া পরেশও অল্প অল্প হাসিতে লাগিল। কহিল,—বেশ ত', কত চাঁদা চাই ! দেব না বলেছি আমি ?

—চাই না।

প্রসন্নবাবু কহিলেন,—যাই বল, মেয়েটি কিন্তু লক্ষ্মী-প্রতিমা। ঠাণ্ডা, মিষ্টি মেয়েটি। আহা, সুখী হোক্।

অনিন্দিতার আর সহিল না : লক্ষ্মী না লক্ষ্মী-প্যাঁচা।

বলিয়া দ্রুতপদে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

রাত্রের খাওয়া-দাওয়া তাড়াতাড়ি সারিয়া নেওয়া হইল। এইবার সুধা বীরেনের অনুগামিনী হইয়া নতুন বাড়িতে গিয়া উঠিবে। পরেশের দেওয়া বেনারসি শাড়ি-খানাতে তাহাকে উড়াইয়া নিতেছে। বধূবেশে মেয়েদের মনে হয় মূর্ত্তিমতী কবিতা। পরেশ সুধার দিকে নির্নিমেষ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। কিন্তু তখনো অনেক কাজ বাকি। সুধার অন্তর্দ্ধানের পর এ ঘর-দোর পৃথিবী-আকাশ কেমন করিয়া সহসা শূন্যময় হইয়া উঠিবে সে-চিন্তায় এখনি উদাস হইলে চলিবে না,—সমস্ত রাত পড়িয়া আছে। সে বারান্দার বাহিরে একবার উঁকি মারিয়া চাহিয়া বলিল,—একটা গাড়ি ডেকে দেব নাকি ?

বীরেন পান চিবানো বন্ধ করিয়া কহিল,—না না পদব্রজে। এইটুকুন ত' পথ। সমস্ত পৃথিবী নেত্র-বিস্ফারিত ক'রে আমাদের দেখুক্, আকাশ অজস্র আশীর্ব্বাদ করুক।

দুয়ারের পাশে অনিন্দিতা দাঁড়াইয়া ছিল। আগাইয়া আসিয়া পরেশকে কহিল,—এত কিন্‌লে, অথচ একটা শাঁক আন্‌লে না। উলু আমি কোনোকালে দিই নি, চেষ্টা করব নাকি? হাস্‌বেন না ত'?

বীরেন কহিল,—দরকার নেই। আজকার দিনে যাঁরা যাঁরা আমাকে ধিক্কার দিচ্ছেন, সেই ধিক্কারই আমার জয়-জয়কার। চল, এগোও।

এত ব্যস্ত হইলে কি চলে? প্রসন্নবাবুকে এখনো প্রণাম করা হয় নাই। অনিন্দিতার হাত ধরিয়া একটু স্নিগ্ধ নীরব বিদায়-অভিনন্দনের অভিনয় করিতে হইবে। পরেশবাবুর সঙ্গে নিভৃতে দুয়েকটি কথা বলিবার ছিল; কিন্তু কী যে বলিবার ছিল তাহা সুধাকে কে বলিয়া দিবে?

প্রসন্নবাবু কহিলেন,—সব ধিক্কার দেখবে একদিন অভ্যর্থনায় পর্য্যবসিত হ'য়ে গেছে। এমন লক্ষ্মী বৌকে দূরে রাখবেন তোমার বাবার সাধ্য কী! সে-লক্ষ্মী সম্পদগৌরবে একদিন আপনিই গিয়ে অবতীর্ণ হবে।

সুধা তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। তিনি তাহার আভূমিআনত মাথার উপরে ধীরে হাত রাখিয়া বলিলেন,—ঘর আলো কর, মা।

অনিন্দিতা ঠোঁট উল্‌টাইল।

অলক্ষ্যে পরেশ কখন বারান্দার এক ধারে সরিয়া গিয়াছে। যেখানটায় আলো কম, সেখানে দাঁড়াইলে আকাশের বিস্তৃততর মুক্তির আভাস মেলে। সুধা হয়ত একটু ইতস্তত করিল, কিন্তু চলিয়া যাইবার আগে একটি কথাও কি তাহার শুনিবার নাই? কখন যে সে সহসা পরেশের কাছে আসিয়া পা স্পর্শ করিবার জন্য নতজানু হইল, সে-ই ভুলিয়া গেছে।

—ও। না, না, আমাকে আবার প্রণাম কী!

বলিল বটে, কিন্তু সরিবার চেষ্টা করিল না। সুধা নীরবে পা স্পর্শ করিয়া দুই চক্ষু ভরিয়া আবার গাঢ় ও গভীর নীরবতা লইয়া কুণ্ঠিতকায়ে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই তরল অন্ধকারে পরেশের স্পষ্ট চোখে পড়িল সুধার সেই বাণীহীন দৃষ্টি সহসা যেন বাঙ্ময় হইয়া উঠিয়াছে। এই ক্ষণিক আকাশটুকু কী যে না প্রকাশ করিয়া ফেলিল বলা কঠিন।

কৃশ শশাঙ্কলেখার মত কপালটিতে হয় ত' এমন একটি বিষাদের সঙ্কেত ছিল যে পরেশ না বলিয়া পারিল না: সময়ের স্রোতে সব আবার সমতল হ'য়ে যায়, সুধা।

ফেনা মরে' গেলেই পানীয়দ্রব্যের সত্যিকারের রঙ ধরা পড়ে, তখনই তার আসল স্বাদ। সে-দিন যখন আসবে তখন আমাকে হয়ত' আর তোমার মনেই থাকবে না।

এ-কথার উত্তর দিতে গিয়া সুধা টের পাইল সকল কথা কান্না হইয়া গলার মধ্যেআটকাইয়া গিয়াছে। সংসারে কথাই ত' আর সব-কিছু প্রকাশ করে না। বোধ হয় তাই ভাবিয়া এমন একটি বিষাদময় ভঙ্গিতে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল যে, নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইবার আর বাকি রহিল না। চকিতে পরেশের হৃদয় একবার সমুদ্র-তরঙ্গের মত উত্তাল হইয়া উঠিল বুঝি, কিন্তু সেই সমুদ্রের তীর কোথায়! সেই দোদুল্যমান মুহূর্ত্তটি এত ক্ষণস্থায়ী যে কী করিলে কী হইতে পারিত তাহা অসমাপ্ত করিয়াও ভাবিয়া লওয়া যায় না—

বীরেন বলিয়া উঠিল: আর দাঁড়িয়ে কেন? আবার চৌকাঠ পেরিয়ে পথে নামতে হ'বে। এবারের পথ ভয়ে নয়, সন্দেহ নয়; প্রখর প্রকাশে, সহজ সত্যের সম্পদে। চল! আশ্রয় ছেড়ে যেতে কান্না আস্‌ছে নাকি?

প্রসন্নবাবু কহিলেন,—সহজ সত্যের পথের মত আশ্রয় আর কোথায় আছে?

—চল, চল, আর দেরি নয়।

সুধা আরেকবার পরেশের মুখের দিকে চাহিল, হয় ত' বা চাহিল না। পায়ে পায়ে অস্ফুট দ্বিধা, তবু বিজয়িনী সম্রাজ্ঞীর বেশে দৃপ্ত পদে তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে। সুধা সত্যই সুমুখ হইতে অপসৃত হইতেছে দেখিয়া পরেশ সচকিত হইয়া কহিল,—আমিও যাই, তোমাদের নূতন বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি। রামদীন ফুল দিয়ে এসেছে ত'?

বীরেন হাসিয়া কহিল,—এ নেহাৎ মন্দ হ'ল না; অধিবাসের রাত্রেই আমাদের ফুলশয্যা।

প্রসন্নবাবু কহিলেন,—ও-সব উৎসব ত' নিতান্ত কৃত্রিম বন্ধু, যেখানে প্রেম সেখানে আর পরিচয়ের অন্ত থাকে না। সেই অপরিচিতির যে উৎসব ইহজীবনে তার আর পরিমাণ নেই।

রোয়াকটুকু পার হইয়া পথে নামিবে, পিছন হইতে অনিন্দিতা অনুনয় করিয়া কহিল,—আমিও সঙ্গে যাব, পরেশ দা।

পরেশ ফিরিয়া দাঁড়াইল: তুমি এখন গিয়ে কী করবে? কাল ত' তুমিই অতিথি-সেবিকা,—কালকেই যাবে একেবারে।

যথেষ্ট। অনিন্দিতার মুখে মেঘ নামিয়া আসিল, যে-মেঘ বর্ষণ জানে না, অথচ আকাশকে ঘোলাটে করিয়া তোলে। তাহার কাছে বরযাত্রিনী হইয়া যাওয়াটাই

বড়ো ছিল না, বড়ো ছিল পরেশের সঙ্গে এই সামান্য পথটুকু পায়ে হাঁটিয়া একলা ফিরিয়া আসা। পরেশের সঙ্গে সে একলা অনেক জায়গায় বেড়াইয়াছে, এবং মনুমেণ্টের উচ্চতা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্ ও তাজের তারতম্য, চৌ-চৌর উপকারিতা বা বাস্-ট্রামের প্রতিযোগিতা লইয়া কম তর্ক করে নাই। কিন্তু আজ নিভৃত শয্যায় শারীরিক অন্তরঙ্গতায় বীরেনের পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া সুধা যখন বিরাজ করিবে, তখন ফিরিয়া আসিবার পথে কথোপকথনটা অন্য পথে ঘুরিয়া যাইতে পারিত হয় ত'। কোনো কথা কেহ না কহিলেও এই নীরবে পাশাপাশি পদচারণা-টুকুও আর আকাশের চোখে অর্থহীন হইত না।

যত দূর চোখ যায়, রাস্তায় উহাদের দেখা যেন আর ফুরাইতে চায় না। পিছন হইতে প্রসন্ন বাবু হাঁকিলেন,—আর দাঁড়িয়ে কেন অনি, এস, এক হাত দেখা-বিন্তি খেলি। আমি নতুন একটা খেলা আবিষ্কার করেছি। তা তোমাকে শেখাই এস।

রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকিয়াই অনিন্দিতা কহিল,—নীচে আমার এখনো যে অনেক কাজ পড়ে' আছে। রামদীনটা ও-বাড়িতে আছে, রান্নাঘরটা সাফ্ করতে হ'বে। ও বোধহয় ওখানেই থাক্‌বে।

—থাক্ গে। কাল রান্নাঘর সাফ্ হ'বে 'খন।

—তা কি হয়? ঘরের লক্ষ্মী এখনো ত' বিদেয় হয় নি।

প্রসন্নবাবু তবু ডাকিলেন,—না না তুমি এস। সে ভারি মজার খেলা, থাকতে তুরুপ্ ত' আছেই থাক্‌তে পাশানোও যাবে।

মধুর করিয়া হাসিয়া অনিন্দিতা বলিল,—তুমি ততক্ষণ পেসান্স্ খেল গে, আমার এই হ'ল ব'লে। ওদের রেখে পরেশদা এখুনি এসে পড়্‌ছেন, একেবারে সদর দিয়ে আমরা যাচ্ছি। তিনজনে খেলা আরো ভালো জম্‌বে। তবে পরেশদা জাগ্‌লে হয়! ঘুমুতে যেতে এম্‌নি তাঁর দেরি হ'য়ে গেল! শেষের কথা দুইটা স্বগত, গম্ভীর। কিন্তু কোথায় পরেশ!

হেলা-ফেলা করিয়া রান্নাঘরে আর কতক্ষণ কাটানো যায়! কিন্তু বিরসমুখে একা-একা সিঁড়ি ভাঙিয়া তাস লইয়া বসিতে হইবে ভাবিলে গায়ে তাহার জ্বর আসে। কিন্তু নীচে বসিয়া আর কতক্ষণ নাম জপ করিবে? এতক্ষণে মৃত আত্মাও বোধ করিয়া সমুখে দাঁড়াইয়া কথা কহিত। পরেশদা কি সেই বাড়িরই আরেক কোঠায় শুইয়া পড়িয়া কান পাতিয়া সুধার নিশ্বাস শুনিতেছেন নাকি?

অনিন্দিতা সদর দরজা খুলিয়া পথের সীমান্ত পর্য্যন্ত ব্যাকুল দৃষ্টি প্রসারিত

করিয়া দিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। সমস্ত পথ তাহারই বিরহী চিত্তের মত খাঁ খাঁ করিতেছে।

পরেশ যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া মনে হইল কী যেন সে হারাইয়া আসিয়াছে। দুয়ারে কড়া-নাড়ার শব্দ শুনিয়া অনিন্দিতাই ছুটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু প্রসন্নবাবু হঠাৎ হাতের তাসগুলি উল্‌টিয়া ফেলিয়া সোজা নামিয়া গেলেন। আরেকটু তৎপর হইতে পারিলে হয় ত' জ্যাঠামশাইকে ডিঙানো যাইত। কিন্তু কড়া-নাড়ার শব্দে তাহার হৃৎপিণ্ড দুলিয়া উঠিয়া স্নায়ুগুলিতে সুরের ঝঙ্কার দিয়া সমস্ত শরীর অবশ আবেশময় হইয়া উঠিবে কে জানিত!

প্রসন্নবাবু কহিলেন,—সব okay?

উদাসীন ভাবে পরেশ কহিল,—সব। যাক্‌, মেয়েটার সুরাহা হ'ল একটা। নিশ্চিন্ত হলুম। বলিয়া গায়ের জামাটা সে খুলিয়া ফেলিল: যা গরম!

ইহাকেই কি নিশ্চিন্ত হওয়া বলে? ঘরের বিছানা ফেলিয়া যে-লোক বারান্দায় ঠাণ্ডা মেঝের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া রেলিঙে পিঠ দিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকে, সংসারে তাহার আর চিন্তার পার আছে নাকি? Okay শুনিয়া প্রসন্নবাবু দাঁত খুলিয়া রাখিয়া আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িয়াছেন এবং শুইতে শুইতেই স্ফুরিত নাসারন্ধ্র হইতে মেঘমন্দ্র ধ্বনিত হইতেছে; অথচ যে-ব্যক্তি খাইবার পর বারান্দায় গুনিয়া গুনিয়া দুই শ বার পদচারণা করিয়া পরিপাক-শক্তি ধারালো করিয়াই শুইয়া পড়ে এবং শুইতে না পারিলেই যাহার মনে হয় রাত্রে পৃথিবী আর ঘুরিয়া যাইবে না, তাহারই চোখে কি না আজ ঘুম নাই? চোখ মেলিয়া এই দৃশ্যও অনিন্দিতাকে দেখিতে হইল? মানুষের পরিবর্ত্তনের মধ্যেও ক্রম-বিবর্ত্তনের একটা অস্পষ্ট আভাস থাকা উচিত, নহিলে এমন আকস্মিক পরিণতি ও উন্মত্ততায় আর প্রভেদ কি?

অনিন্দিতা দূর হইতে প্রখরকণ্ঠে কহিল,—শোবে না?

পরেশ নড়িল না, অনিন্দিতার মুখের দিকে একবার চাহিল না পর্য্যন্ত। খালি কহিল,—ঘরে ভারি বিচ্ছিরি গুমোট।

—জ্যৈষ্ঠ মাসের রাতেও এমন কথা শুনিনি তোমার মুখে। জ্যাঠামশাই প্লুরিসি উপেক্ষা ক'রে ছাতে শুতে গেছেন, তুমি তখনো বিছানা ছাড়নি; মানে ঘুম তোমাকে ছাড়েনি। গুমোটটা কখন থেকে সুরু হ'ল? বেশ, বিছানাটা তা হ'লে বারান্দাতেই পেতে দি।

সেই নির্লিপ্ত কণ্ঠ: দরকার নেই। ঘুম পেলে নিজেই উঠে যাব।

—কেন শরীর খারাপ করেছে? অনিন্দিতা আজ ইচ্ছা করিয়াও কঠোর হইতে

পারিতেছে না। সারা দিন এত খাট্‌লে, হবে না? বেশ ত, তুমি এখানে শোও, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঘুম এসে যাবে।

—না, না, শরীর খারাপ হয়নি ত'। কোথায় শরীর খারাপ!

যেন শরীর খারাপ না হইলে আর মাথায় হাত বুলানো যায় না।

অনিন্দিতা কর্কশ হইতে চেষ্টা করে: তবে সারা রাত জেগে থেকে এমনি ন্যাকামো করবে নাকি?

—বেশ ত,' তুমি শুতে যাও না।

—আর, আমারই যেন সারা গা ঢেলে ঘুম আস্‌ছে!

তবু পরেশ একবার বলিল না: এখানে একটু বোস, সেই অসমাপ্ত গল্পটা পড়িয়া শোনাও, কিম্বা একটা গান-গাহিতে গাহিতে হঠাৎ থামিয়া যাইয়া আমার মুখের দিকে অপলক চোখে চাহিয়া থাক!

রাত্রির তারার মালায় সেই অনুচ্চারিত কথাগুলি দুলিতে থাকে।

হঠাৎ তরলকণ্ঠে অনিন্দিতা প্রশ্ন করিল: ঘুম যখন আসছে না, তাস খেলবে পরেশ দা?

—তাস?

কথাটা পরেশ যেন নতুন শুনিল। কথাটা বাঙলা না গ্রীক?

অনিন্দিতা ফের কহিল,—আমার এস্রাজটা একটু বাজাবো?

—বাবার ঘুমের ব্যাঘাত হবে হয় ত'। পুরো ন বচ্ছর ইন্‌সোমনিয়ায় ভুগেছেন। তখন মেজাজ কি তিরিক্ষি ছিল সে-মূর্ত্তিত আর দেখনি্। ইদানী ঘুমোতে পেরেই না—তুমি চুপচাপ করে ঘুমোও গে না অনি।

মানুষের শরীরে কত সয়? অনিন্দিতা ঝাঁজ দিয়া কহিল,—ভারি যে গুমোট্। একজন মাথায় ঘোম্‌টা টেনে দিয়েছে বলে'ই কি সহসা এমন গুমোট করল পরেশদা?

পরেশ উঠিয়া বসিল, কিন্তু কণ্ঠস্বরকে অনিন্দিতা তীক্ষ্ণ করিতে গিয়া কেন যে বেদনাতুর করিয়া ফেলিয়াছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া সে মূঢ় দৃষ্টিতে অনির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অনিন্দিতা এই নীরবতাও সহিতে পারিল না, কহিল: অন্যের মিলনরাত্রে বারান্দায় বিরহযাপনটা সেকেলে খেলো কবিত্ব। বুঝলে? কী করবে বল? শুধু ফোঁড়ই শুন্‌লে, ভাগ্যে আস্‌কে ত' আর জুট্‌লো না! ছি ছি। সব-কিছুরই একটা শ্রী আছে পরেশ-দা।

এই সঙ্গীহীন মধুর নিস্তব্ধতা হঠাৎ টুকরা টুক্‌রা হইয়া গেল—নিস্তরঙ্গ নদীতে

ঝড় উঠিয়াছে। কথা কয়টা বলিয়াই অনিন্দিতা দরজা দিয়া ভেতরে অপসৃত হইতেছে দেখিয়া পরেশের বুঝি চেতনা হইল। ছুটিয়া অনিন্দিতার আঁচল ধরিতে যাইবে, কিন্তু সে ততক্ষণে ভেতরে গিয়া দরজাটা দুই হাত দিয়া ঠেলিয়া ধরিয়াছে।

পরেশ দরজায় ধীরে একটু চাপ দিয়া বুঝিল বিপক্ষ হইতে বাধা প্রয়োগ করা হইয়াছে। সে-বাধা উত্তীর্ণ হওয়া পরেশের পক্ষে কঠিন ছিল না, অনিন্দিতা বোধ করি তাহারই প্রতীক্ষায় দরজার উপরে হাত দুইটা শিথিল করিয়া আনিয়াছিল; কিন্তু পরেশ অকাতরে কহিল,—দরজায় খিল লাগালে কেন? খোল না। কী সব যা তা ব'লে গেলে শুনি?

খিল অনিন্দিতা লাগায় নাই, তাহা পরেশ প্রথমেই বুঝিয়াছে। তবু তাহার মুখে এই নিরুৎসাহ প্রশ্ন শুনিয়া অনিন্দিতা ভাঙিয়া পড়িল। কহিল,—আবার শুন্‌তে চাও না কি?

—কিন্তু সারা রাত আমি হিমে প'ড়ে থাকবো নাকি? খোল না।

দরজা তেমনিই ভেজানো রহিল, অনিন্দিতা আর একটিও কথা কহিল না। তবুও দরজার একপাশে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হয় ত' আশা ছিল সত্যই দরজাটা বন্ধ কি না পরীক্ষা করিবার জন্য পরেশ কিঞ্চিৎ ঠেলা দিতেই সামান্য ফাঁক দিয়া অনিন্দিতাকে দেখিতে পাইলেই হয় প্রকাশ্য লজ্জার ভিতরে শুইতে আসিবে, নয় গোপন লজ্জায় তাহাকে বারান্দায় ডাকিয়া নিয়া কাছে বসাইয়া গল্প করিবে, অবান্তর গল্প, মরিয়া গেলে মানুষ কোথায় যায়, ভালো লাগা আর ভালোবাসায় সত্যিই কোনো তফাৎ আছে কিনা, যাহাকে পৃথিবীতে হারানো যায় সে-হারানোর মাঝেই তাহার পাওয়ার পরিচয় কতটুকু মামুলি অথচ মধুর! দরজা যে অনিন্দিতা সত্যই বন্ধ করিতে পারে না। সে বিষয়ে পরেশের আর সন্দেহ কী! তাই বুঝি আবার সে বারান্দায় গিয়া বসিল। আকাশবঞ্চিত বন্ধ ঘরে আজ আর সে ফিরিবে না।

অনিন্দিতা নিজের ঘরে আসিয়া আলো নিভাইল বটে, কিন্তু মনকে ঘুম পাড়াইতে পারিল না। ক্ষণকালের জন্য হয় ত' সেও বেদনায় বিশ্রাম নিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু এই বিলাসপরায়ণ অলসতাকে অতিক্রম করিতে সে তাড়াতাড়ি তাহাদের নারী-কল্যাণ-সঙ্ঘের ছাপানো কাগজ-পত্র খাতা-ইস্তাহার নিয়া পড়িল যা হোক বগুড়ায় কোথায় দুর্ভিক্ষ লাগিয়াছে, সেখানে স্বেচ্ছাসেবিকা পাঠাইতে হইবে। এই কি বিশ্রম্ভালাপের সময়? ভ্যাগিস্, হেলা-ফেলা করিয়া সে সময় কাটায় নাই, কতগুলি জরুরি চিঠি লেখা সারা হইল, আগামী রবিবার য়্যালবার্ট হলের মিটিংএ একটা বক্তৃতার খসড়াও সে তৈরি করিয়া ফেলিবে। দুয়ারে কাল-

ভৈরব প্রলয়ের শঙ্খ বাজাইয়াছেন, জনসমুদ্র দুলিয়া উঠিয়াছে ; নির্লিপ্ত হইয়া বসিয়া বসিয়া ঢেউ গুনিবে ভাগ্য গণনায় তাহার জীবনে ইহাই নির্দ্ধারিত হইয়াছিল নাকি ? অনিন্দিতা ঝাঁপ দিবে। যেন কুল সে না পায়, ফেনময় খরস্রোতেই তাহার আশ্রয় মিলুক !

দূরে—কতদূরে একটা ট্রেন চলিয়াছে, রাত্রির নিস্তব্ধতার ঢেউর উপর দিয়া সেই শব্দ আসিয়া অনিন্দিতাকে আঘাত করিল। যাত্রার শব্দ,—সৃষ্টিময় এই বিরতিবিহীন যাত্রার শব্দ চলিয়াছে।

টেবিলের উপর টাইম্‌-পিস্‌ ঘড়িটা এই উদ্ধত উদ্দাম যাত্রার ইঙ্গিত করিতেছে। অনিন্দিতা কান পাতিয়া মুহূর্ত্তমালার পদধ্বনি শুনিতে লাগিল।

বীরেন অস্থিরপদে ঘরের মধ্যে পাইচারি করিতেছিল। সিলিঙ্‌ হইতে ঝোলানো বাল্‌বের আলোতে মেঝের উপর তাহার যে একটা বিসদৃশ ছায়া পড়িতেছে তাহা দেখিয়া সুধা বারে-বারে কাঁপিয়া উঠিতেছে। সেই ছায়াটাই যেন বীরেনের সত্য-কারের প্রতিচ্ছবি !

নূতন খাটের উপর বধূবেশিনী সুধাকে দিব্যি মানাইয়াছিল। ঘোম্‌টার নীচেই ললাটের অংশটুকু মেঘলগ্ন কৃশ শশীলেখাটির মত করুণ, কলঙ্কের মত উজ্জ্বল সিন্দুর-বিন্দু। বসিবার ভঙ্গিতে আত্মসমর্পণের একটি নির্ভুল ইসারা !

সুধা অধীর হইয়া প্রশ্ন করিল,—তুমি শুতে আস্‌বে না ?

বীরেন দাঁড়াইয়া পড়িল : কোথায় শোব ?

—কেন এইখানে।

বীরেন আবার হাঁটিতে সুরু করিয়াছে। মোড় ফিরিয়া কহিল,—কত কিছু ভাব্‌বার এখনো বাকি আছে জান ?

সুধা কহিল,—ভাব্‌বার আর বাকি কী ? তোমার বাবা আমাকে গ্রহণ করবেন না ভেবেছ ? একবার আমাকে নিয়ে যাও তাঁর কাছে, দেখি আমাকে কী ক'রে তিনি তাড়ান্‌ ?

বীরেন হাসিয়া উঠিল : তাড়াতে আবার পরিশ্রম আছে নাকি ? সোজা কানটি ধ'রে বাড়ীর বা'র ক'রে দেবেন।

সুধা স্তব্ধ হইয়া গেল।

আরেক চক্কর ঘুরিয়া আসিয়া বীরেন কর্কশকণ্ঠে কহিল,—তোমাদের কী ! কাঁধে একবার চাপ্‌তে পারলেই পরম নিশ্চিন্ত। ভূতও ছেড়ে যায় শুনেছি যাবার

সময় হয় খোঁড়া কিম্বা কাণা ক'রে রেখে যায়, কিন্তু তোমরা ছাড় ত' না-ই, বরং সমস্ত জীবন পঙ্গু, অকর্ম্মণ্য ক'রে রাখ।

দীপ্ত কণ্ঠে সুধা কহিল,—আমি তোমার তেমন সঙ্গিনী নই। বাবা যদি আশ্রয় না দেন, বেশ আমাদের আশ্রয় আমরাই সৃষ্টি ক'রে নেব—

বিকটস্বরে বীরেন আবার হাসিয়া উঠিল : তুমি আমার সং-গিন্নি। আশ্রয় সৃষ্টি করবে কোথায়? আস্তাকুঁড়ে?

—আত্মপ্রকাশে।

—যাও যাও, সস্তা নভেলি কথাগুলো আর মুখস্ত বোলো না। চুপচাপ শুয়ে পড়।

—আর তুমি? তুমি বুঝি অম্‌নি ভূতের মত ঘুরে বেড়াবে?

ভূতের বেগার খাট্‌ছি, ভূত হ'তে আর বাকি কী?

সুধা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল,—যাও, যাও, তোমার আর অদ্ভুত কথা-গুলো বল্‌তে হবে না। ভালো ছেলেটির মত শুয়ে পড় দিকি। শুয়ে-শুয়ে ভাব্‌বে না হয়।

তবু বীরেনের গাম্ভীর্য্য ঘুচিল না। নিষ্ঠুর হইয়া কহিল,—তোমার বিছানায় আমি শুতে যাব কেন?

ইহার উত্তর ভূ-ভারতে কী হইতে পারে? সুধা চোখে অন্ধকার দেখিল। বীরেন পাশে আসিয়া শুইলেই অনায়াসলব্ধ স্পর্শে তাহার শরীর সোনা হইয়া যাইত না, তবু এই বিছানা তাহারই সঙ্গে ভাগ করিয়া লইবার জন্যই ত' সে অর্দ্ধাঙ্গিনী সাজিয়াছে। তাই সে কহিল,—তবে কোথায় শোবে?

স্পষ্ট উত্তর : মেঝেয়।

—কেন, তুমি কি আমার অস্পৃশ্য নাকি?

সুধা সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল।

বীরেন আবার হাসিল। কহিল,—দাঁড়াও, আমি আসছি। বলিয়াই পাশের অন্ধকার ঘরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সুধা তাহাকে অনুসরণ করিবে না এইখানেই অপেক্ষা করিবে কিছুই বুঝিতে পারিল না।

বীরেনের আর দেখা নাই। একাকী পলাইয়া গেল নাকি?

না, সে ফিরিয়া আসিয়াছে। মুখে-চোখে দারুণ অধৈর্য্য। সুধার পায়ে প্রচণ্ড এক ঠেলা মারিয়া সে কহিল,—শিগ্‌গির ওঠ : আমাদের এক্ষুণি বেরুতে হবে।

ভয়ে সুধার মুখ শুকাইয়া গেল : কোথায়?

—যেখানে হোক্‌, ওঠ। রামদীন দিব্যি নাক ডাকাচ্ছে। কিচ্ছু টের পাবে না।

ভয়ে বীরেনের কাছে সরিয়া আসিয়া সুধা সজল কণ্ঠে কহিল,—কেন কাল্‌কে যে আমাদের বিয়ে।

—দুত্তোর বিয়ে! ও ত' একটা ছেলেখেলা। এততেও যদি বিয়ের কিছু বাকি থাকে তবে রইল তোমার হিন্দুশাস্ত্র। চল, আর দেরি নাই।

দুই চোখে মিনতি নিয়া সুধা কহিল,—কাল্‌কে বিয়েটা চুকে গেলেই ত' আমরা বেরুতে পার্‌ব। কিন্তু, কোথায় আমাকে নিয়ে যাবে?

—না, কাল্‌কে নয়, আজই—এই মুহূর্ত্তে। তুমি যাবে কি না বল।

—কিন্তু পরেশবাবু কী ভাববেন বল ত? তাঁর কাছে লুকিয়ে আমাদের লাভ কী?

বীরেন খেপিয়া উঠিয়াছে: পরেশবাবু! কে তোমার পরেশবাবু?

—কে আবার? কেউ না। তবু বিপদের দিনে তিনিই আমাদের বন্ধু।

—তবে পরেশবাবু না বললে তুমি যাবে না কেন?

—যাওয়া কি উচিত?

—একশো বার উচিত। বীরেন সুধার হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল: উঠে এস। আমার পথই না তোমার পথ, তুমি না আমার সঙ্গিনী? আমি যেখানে নিয়ে যাব, সেইখেনেই তোমাকে যেতে হবে। এখনো বল যাবে কি না।

ভীত রুদ্ধনিশ্বাসে সুধা কহিল,—কোথায় যাবে আগে বল।

—যেখানে দু' চোখ যায়।

—কিন্তু তুমি যদি আমাকে পথের মাঝখানে ফেলে রেখে চলে' যাও?

বীরেন আবার অট্টহাস্য করিয়া উঠিল: আবার পরেশবাবু গিয়ে তোমাকে উদ্ধার করবেন। তোমার ভাবনা কিসের? কাশীতে ত্রিপুরা ভৈরবীর গলি চিনে হেমন্তর মেস্‌ খুঁজে নিতেও দেরী হবে না। তাছাড়া প্রদোষচন্দ্র এখনো হয় ত' কাছা নামিয়ে দিয়ে সন্ন্যাসী সেজে কামিনীকাঞ্চনের লোভে বেরিয়ে পড়েননি। উঠে এস—

এইবার সুধা বুঝিল। সবলে বীরেনের হাত ছাড়াইয়া নিয়া প্রখর দৃপ্তকণ্ঠে কহিল,—না।

বীরেন পিছাইয়া গেল। কহিল,—এই বাড়ি ভাড়া করেছে পরেশ নিজে, খাট-পালঙ কিনেছে নিজের পয়সায়, এই ফুলশয্যাও তারিই। আমি ত' তার প্রক্সি,—প্রতিনিধি মাত্র। এই যদি তোমার মনে' ধরে থাকে তবে উঠে এস,

তোমাকে খোদ তারই কাছে পৌঁছে দিয়ে আসি। সেও আমারই মত বোধহয় অস্থির হ'য়ে পাইচারি করছে।

সুধার মুখে কথা আসিল না, ভয়ে পা দুইটা কাঁপিতেছে।

—যদি সে না নেয় আমিই বা তোমাকে কাঁধে ক'রে নাচতে যাব কেন? তার যদি আপত্তি থাকে, তবে আমিই বা এমন কি রাজা য়্যালফ্রেড্‌ এসেছি যে হাত বাড়িয়ে কলঙ্কিনীকে কোল দিতে যাব?

সুধা কাঁদিয়া ফেলিল।

—আমার সঙ্গে বেরিয়ে গেছ তার কাছে এই যদি তোমার অপরাধ হয়, তবে তার সঙ্গে তুমি ফিরে এসেছ এ ত' আমার কাছেও তার অপরাধ ব'লে গণ্য হ'তে পারে। পারে না? ধর্ম্মজ্ঞান আমারই বা কিছু কম নাকি? যে-মেয়ে স্বচ্ছন্দে ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে ধিঙি সাজ্‌তে পারে সে পৃথিবীতে না পারে কী আমি ত' আজো তা ভেবে পেলাম না।

সুধা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল। না পারিল প্রতিবাদ করিতে, না পারিল কিছু।

বিদ্রূপ করিয়া বীরেন কহিল,—কেঁদে নাও, তবু তাতে বুদ্ধিটা যদি খানিক খোলে। আমি আসছি। বলিয়া বীরেন সেই পাশের অন্ধকার ঘরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এই স্বর্গের আশায়ই সুধা ঘর ছাড়িয়াছিল।—এই তাহার মুক্তি!

কিন্তু কাঁদিয়া কবে কোথায় অন্যায়ের প্রতিকার হইয়াছে। এই অন্যায়ের প্রতিকারই বা কোথায়? অন্তরালহীন অনাবৃত দাম্পত্য-জীবন? আপনাকে নিঃশেষ করিয়া দেউলে হইয়া যাইতে কতক্ষণ? ইহার মধ্যেই ত' সে নিজেকে প্রায় ফুরাইয়া ফেলিয়াছে।

বীরেন ফিরিয়া আসিল,—হাতে তাহার কিসের একটা শিশি।

সুধার মাথায় একটা ঠেলা মারিয়া কহিল,—কাঁদছ যে বড়! মামাবাড়ি ফিরে যাবে? আমার বাবা যদি তোমাকে গ্রহণ করবেন ভাব, তবে তোমার মামাই বা তোমাকে আদর ক'রে কাছে বসিয়ে দুধ-ভাত খাওয়াবেন না কেন? চল না, পৌঁছে দিয়ে আসি।

মুখ হইতে আঁচল সরাইয়া সুধা সহজভাবে প্রশ্ন করিল,—তুমি এ সব কী বলছ শুনি?

—বলছি ভাল কথাই। না-হয় মামী পিঠে ছ্যাঁকা দেবেন' চুলের ঝুঁটিটা ধ'রে মাথাটা মামা দেয়ালে বারকতক ঠুকে দেবেন—তা' দেওয়া ত' উচিতই।

ভদ্রলোকের মান-ইজ্জৎ ত' আর রাখনি। মেরে একটু হাতের সুখ ক'রে না নিলে মনই বা আর সায় দেবে কেন? তা, ক'টি আর দিন বল। আবার সেই যে-কে সে। আমি না হয় একটি পাত্র জুটিয়ে দেব।

—এর পর তুমি আমাকে মামাবাড়ি ফিরে যেতে বলছ? তার চেয়ে আমার গলা টিপে আমাকে মেরে ফেল না কেন?

সুধা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অনর্গল অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

—আহাহা, কাঁদলে কি চলে? শোন। বলিয়া বীরেন সুধার খোঁপা ধরিয়া বিছানার উপর সোজা করিয়া বসাইয়া দিল। কহিল,—সে কথাই ত' বলছি প্রিয়তমে। গলা টিপে মারাটা নিদারুণ বর্ব্বরতা, একালে আমরা তার চেয়ে অনেক ভালো ভালো উপায় বাত্‌লেছি। শিশিতে এই দেখ্‌ছ গুঁড়ো, জিভে একটু ঠেকাতে ঠেকাতেই ওস্‌পার। একটু চাখ্‌বে? তার আগে একটা কাজ করতে হবে কিন্তু—কাগজে স্বহস্তে তোমায় একটু লিখে দিতে হবে যে তুমি স্বেচ্ছায়ই এ-যাত্রায় একাকিনী রওনা হ'লে। তা না হলে আমার বাবা যেমন কড়া লোক, আমাকে আর মুকুট মাথায় দিয়ে বিয়ের সভায় বস্‌তে হবে না। সুন্দর সেজে আছ, এখন মরলে তোমাকে ভারি মানাবে, সুধা।

এই সব কথাগুলি ঠাট্টা না কি—সুধা একেবারে ঘামাইয়া উঠিল। অত্যন্ত মিহিস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—আর তুমি·?

নিদারুণ তাচ্ছিল্যের স্বরে বীরেন কহিল,—সোজা বাড়ি চ'লে যাব।

সুধা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল: আমাকে তুমি মেরে ফেল্‌বে? রামদীন! রামদীন!

বীরেন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল: তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি? রামদীনকে ডেকে কী হবে?

—কী হবে! রামদীন! রামদীন!

—তোমার পরেশবাবু এসে পড়বার আগেই সাবাড় হ'য়ে যেতে পার। কিন্তু হাতচিঠা একটা লিখে না রাখলে আমি মারতেই বা যাব কেন? হঠাৎ সুধাকে বুকের মধ্যে আলিঙ্গন করিয়া বীরেন কহিল,—আমি তোমাকে মেরে ফেল্‌তে পারি এ তোমার বিশ্বাস হয় সুধা? তুমি পাগল, না কী! এস ঘুমুই এস।

বীরেনকে সবেগে ছুঁড়িয়া দিয়া সুধা কহিল,—দূর হও।

ঢোঁক গিলিয়া আঘাতটা বীরেন সাম্‌লাইয়া লইল, ব্যথাতুর উদাস স্বরে কহিল—এই বিষ খেয়ে দু'জনেই আমরা মরব, সুধা। আমাদের জীবনে সুখ নেই, শান্তি নেই—আমাদের কি দেখে বিধাতা মুখ ফিরিয়েছেন। সমাজ বিরূপ, সংসার অসার।

মৃত্যুর দেশে নব কলেবরে আবার আমাদের মিলন হ'বে। এস আমরা মরি—সমাজকে শিক্ষা দিয়ে যাই। এই নাও কাগজ, এই কলম—তুমি লেখ, আমিও লিখ্‌ছি।

সুধা কাগজ-কলম স্পর্শ ক'রল না, কহিল—লেখা শেষ হ'লে?

—দু'জনে এক সঙ্গে বিষ খাব। এক সেকোণ্ডরো কম। সে যে একটা কী চমৎকার অনুভূতি মানুষ হ'য়ে তা কল্পনাও করা যায় না, সুধা। দু'জনে একসঙ্গে আকাশ সাঁতরে কোথায় গিয়ে যে পৌঁছুব—কত দূরে! সেখানে রামদীনও নেই, তার বাবুও নেই।

বীরেন বোধ করি আবার আগাইয়া আসিতেছিল, তাহাকে ফের ঠেলিয়া দিয়া সুধা কহিল,—এক সঙ্গে কেন? তার চেয়ে তুমিই আগে খাও না কেন? আমি দেখি।

—আমি আগে খাব? তারপর তুমি যদি না খাও?

—খাবই না ত'। শুধু শুধু আমি মরতে যাব কেন?

বীরেন ভারি অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। রাগ দমন করিয়া সে প্রশ্ন করিল—আমি মরে গেলেও তুমি মরবে না?

—কোন দুঃখে? তুমি আমার কে?

—আমি মরলে তুমি বিধবা হবে জানো?

—হাতী হ'বে!

—কপালে যে ঘটা ক'রে সিঁদুর মেখেছিলে সেদিন?

—সে ত' বাজারের সস্তা রঙ! উনি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছেন? যাও না ম'রে। মরলে ত' আমি বাঁচি।

—আমি মরলে তুমি বাঁচ?

বীরেন সুধার কাছে সরিয়া আসিল।

সুধা হটিয়া গিয়া কহিল,—তুমি যে মরবে না তা আমি জানি বলেই এতক্ষণে তোমার ভোজবাজি দেখ্‌ছিলাম। লম্পট, মিথ্যাবাদী কোথাকার! যাও এ-বাড়ি ছেড়ে।

—কী, কী বল্‌লে? বলিয়া বীরেন সুধার খোঁপাটা খুলিয়া ফেলিয়া বেণীর গোছাটা শক্ত করিয়া টানিয়া ধরিল: এক ঘুসি মেরে নাকটা চ্যাপটা ক'রে দেব জানো?

—দাও দিকিন্, দাও না এক্ষুনি। হাতের কব্জিতে আমার জোর নেই?

বীরেন সুধার চুল ছাড়িয়া দিয়া গলাটা টিপিয়া ধরিয়া দেয়ালের উপর মাথাটা

পিষিয়া দিতে দিতে কহিল,—গলা টিপে মেরে ফেল্‌তে বলেছিলে না? দেখ্‌বে?

মুহূর্ত্তে সুধার বাহুতে কোথা হইতে অদম্য শক্তি আসিল কে বলিবে? দুঃস্বপ্ন অপসারণ করিয়া মানুষ যেমন জাগে, তেমনি প্রবল উত্তেজনায় বীরেনকে ঠেলিয়া দিয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল: রামদীন! রামদীন!

রামদীন পাশের ঘরেই শুইয়াছিল, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল! এমন চীৎকারে মৃতদেহেরো কানে তালা লাগিত বুঝি। দ্বিধা করিবার সময় থাকে না—রামদীন দরজা খোলা পাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া যাহা দেখিল তাহাতে তাহার চক্ষু চড়ক-গাছ। সুধা তাহার স্ত্রী সোনালিয়াকেও ছাড়াইয়াছে। এ কী মূর্ত্তি!

রামদীনকে দেখিয়া সুধা বলিয়া উঠিল: এই লোকটাকে ঘাড় ধরে বাড়ির বার ক'রে দাও শিগ্‌গির।

বীরেন সাবধান করিয়া দিল: খবরদার। কার সাধ্য আমাকে তাড়ায়।

সুধা কহিল,—আমি তাড়াব। এ ঘর-দোর আমার—এ চাকর আমার।

—তোমার ঘর-দোর?

—একশো বার। বলিয়া সে বিস্ময়াভিভূত রামদীনের দিকে সরিয়া আসিয়া কহিল,—তুমি পরেশবাবুর চাকর না? তা হ'লেই আমার চাকর। আমি বল্‌ছি একে তুমি ঘাড় ধ'রে এক্ষুণি বাড়ীর বার ক'রে দাও,—দাও।

রামদীন হাত কচ্‌লাইয়া ঠোঁট চাটিতে চাটিতে কহিল,—এ যে তোমার সোয়ামি দিদিমণি।

বীরেনের সেই বীভৎস হাসি ঘরের চারিদিকে ফাটিয়া পড়িল। কহিল,—সেই ফ্যাক্টাম ভ্যালেট্‌ সুধা। লোকে যদি আমাদের স্বামী-স্ত্রী ব'লে জানে সেই যথেষ্ট। শত আদা-জল খেয়ে লাগ্‌লেও আদালতের দরজা আর খুল্‌ছে না। পরে রামদীনের কাছে আসিয়া তাহার পিঠে হাত রাখিয়া কহিল,—তুই এখানে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস্‌ কেন? যা, যা ঘুমে চোখ যে তোর বেজায় ঢুলছে। নেশাটা আজ বুঝি জমেনি তেমন? এ আবার এমন কী দেখবার মতন? বাড়ীতে তোর জরুর সঙ্গে দু' এক রাতে এমনি তামাসা হয় না?

রামদীন দন্তরাজি বিকশিত করিয়া বীরেনকে কৃতার্থ করিল। হাত কচ্‌লাইয়া পাশের ঘরে অদৃশ্য হইতেই বীরেন দরজায় খিল আঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—এখন?

—তুমি না যাও, আমিই চল্লুম। বলিয়া বাহিরে যাইবার দরজার দিকে সুধা অগ্রসর হইল।

তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বীরেন কহিল,—কোথায় যাবে?

—যে-দিকে দু'চোখ যায়!

—বেশ ত', আমারই সঙ্গে চল না তা হ'লে। যাবার সময় সঙ্গে চল, ফেরবার সময় একাই ফিরো না হয়।

জোরে হাত কাড়িয়া নিয়া সুধা কহিল,—যাবার সময়ো আমি একাই যেতে পারবো।

ঘৃণ্য কুটিল হাসিতে বীরেনের মুখ কুৎসিত হইয়া উঠিয়াছে: এক হেমন্ত ছাড়া কেউই আর সুধাময়ীকে আশ্রয় দেবে না।

—বেশ, তার কাছেই যাব। বাধা দেবার তুমি কে?

আবার বীরেন সুধাকে বলপূর্ব্বক আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিল: আমি কে? আমি তোমার স্বামী। তুমি আমার সেবায় সদ্য বলিদান! ব্যূহে প্রবেশ করাই সহজ, বেরুনো নয়। সোনার সুযোগ দু'বার খালি আমারই জীবনে এসেছে দেখ্ছি। কল্‌কাতা তোমার কাশীর মত পীঠস্থান নয়। বলিতে বলিতে হঠাৎ সে হাত বাড়াইয়া সুইচ্‌টা অফ্‌ করিয়া দিল।

প্রলয় বন্যার মত অজস্র অন্ধকার সুধাকে নিমেষে গ্রাস করিয়া ফেলিল। মেঝের উপর সে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে, আকাশ যেন প্রকাণ্ড একটা পাথরের মত তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে, দেখিতে দেখিতে বাতাসের স্রোত জমাট বাঁধিয়া গেল,—পৃথিবী একটা তুষারপিণ্ড—সুধা একটা নিরেট মাংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই নয়!

তাহার দুইটা বাহু কাঁধের দুই দিকে বিস্তৃত করিয়া নির্ম্মম শক্তিতে চাপিয়া ধরিয়া বীরেন চুম্বনলালসায় তাহার দেহের উপর নুইয়া পড়িয়াছে। অন্ধকারে সে-মুখ দেখা গেল না বটে, কিন্তু সে-মুখ হেমন্তর মুখ!

সুধার স্বামী!

ঠোঁটটা সুধার মুখের সমীপবর্ত্তী হইতেই দুই পাটি তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়া সুধা তাহা দংশন করিয়া ধরিল। বীরেন চীৎকার করিয়া উঠিল, এবং হাতের মুষ্টি একটু শিথিল করিয়া দিতেই সুধা দুই হাতের চুড়ি দিয়া বীরেনের কপালের উপর সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। বীরেন চুম্বনের স্বাদ বুঝুক, সুধা রক্তের।

মুখে সুধার রক্তের স্বাদ। স্পষ্ট বুঝিল বীরেনের দেহ বেদনায় শ্লথ হইয়া আসিয়াছে। অমনি এক ঝট্‌কায় উঠিয়া পড়িয়া বীরেনকে প্রকৃতিস্থ হইবার অবকাশ না দিয়াই দরজার খিল খুলিয়া পথে নামিয়া পড়িল। এবং পথ যখন একবার

পাইয়াছে তখন আর দাঁড়াইল না, ফিরিয়া দেখিল না, পিছে নিশ্চয়ই কেহ আসিতেছে ভাবিয়া সোজা ছুট দিল।

কোথায় যাইবে জানে না। তবে এইটুকু সে ঠিক জানে পরেশের বাড়িতে নয়। মামাবাড়িতে ত' নয়ই— সে-পথও সে চিনিবে না। যতক্ষণ না পা দুইটা অচল হইয়া পড়ে ততক্ষণ সে ছুটিবে; একটা চলন্ত মোটর দেখিলে তাহার তলায় না হয় ইচ্ছা করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িবে—কিন্তু মরিবেই বা কেন ? কোন্ দুঃখে ?

রাস্তায় একটাও মোটর চলিতেছে না। এই একটা নতুন রাস্তার বাঁক আসিয়াছে। দেখা যাক্।

একবার সুধা ফিরিয়া তাকাইল! কেহই তাহাকে অনুসরণ করিতেছে না— বিস্তীর্ণ আকাশতলে সে একাকিনী তবু সে ছুটিতে লাগিল।

সুধা নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলে বীরেন আলো জ্বালিল। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় দেখিল রাক্ষসী মেয়েটা ঠোঁটের উপর প্রকাণ্ড একটা ঘা করিয়া দিয়াছে। দিক্। তবু সমস্ত জীবনে সে যে পক্ষাঘাত আনে নাই তাই যথেষ্ট।

ফাঁসি কাঠে তুলিয়া নামাইয়া দিয়াছে।

তবু রীতিমত তাহার ভয় করিতে লাগিল। মানুষের দংশনে তাহার সমস্ত রক্ত বিষাক্ত হইয়া যাইবে না ত' ? তাহাকে হাসপাতালে যাইতে হইবে। অন্যত্র রাত্রি-যাপনের জন্য বাবার কাছে আর জবাবদিহি করিতে হইবে না।

অথচ এই ব্যাপারটার কত সহজেই যে সমাধান হইতে পারিত। ফিরিয়া যাইতে বলিলে ফিরিবে না, আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে ; আঁকড়াইয়া ধরিতে গেলে শিকল কাটিয়া উঠাও হইবে! সুধাকে বীরেন চিনিয়াছিল। তাই তাহার এই আয়োজন। কেবল সুধাকে মুক্তি দিতেই।

সে হরিশ মুখার্জ্জি রোড ধরিয়া মাঠের দিকে রওনা হইল। মাঠে নিশ্চয়ই আর সুধার সঙ্গে দেখা হইবে না। পরেশের বাড়ি সে চিনে, চালাক মেয়ে সেখানে গিয়াই নালিশ পেশ করিবে। করুক, পরেশকে সে কেয়ার করে নাকি ? তাহার কাছে আর যে আসিতে চাহিবে না, সুধার চরিত্রের এই দৃপ্ত বলশালিতা দেখিয়া সে মনে মনে সুধাকে অজস্র ধন্যবাদ দিল। পরেশ যদি আধুনিকতার দোহাই পাড়িয়া উদার হইয়া বসে, তাহা হইলেই সোনায় সোহাগা। বিবাহে নিমন্ত্রণ করিলে সে যে নিতান্তই এক শতাব্দী পিছনে পড়িয়া থাকিবে তাহা নয়,—আনারসের চাট্‌নি দিয়া পাঁপরভাজা খাইতে তাহার ভালই লাগিবে! বিবাহে ঘটা করিয়া সে আর ছোয়া উপহার দিতেছে না কিন্তু, কমলিনী সাহিত্য মন্দিরের তুলোর প্যাডে বাঁধানো একখানা রঙচঙে বইই যথেষ্ট।

বাবাকে বলিয়া সে তাহার বিবাহ লিলুয়ার বাগান বাড়িতেই সারিয়া লইবে, কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিবার দরকার নাই। বন্ধু-বরযাত্রী এক শো না হাতী। মাকে উল্টা কথা বুঝাইয়া দিলেই হইবে।

তিনটি মাস পরে এমনি এক রাত্রে সে আর স্থির মাটির উপর নয়, ফেনবুদ্বুদময় তরঙ্গ-আসীন। মাথাটা তাহার ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। সময়-সমুদ্রে ভাসমানা এই পৃথিবী কোটি কোটি যাত্রী লইয়া মৃত্যুর ঝটিকায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে কি না কে বলিবে। রাস্তার উপর বীরেন বসিয়া পড়িল।

নতুন রাস্তাটা কাহারো অভয়-সঙ্কেত বুঝি!

চলিতে চলিতে সুধা কত বার যে আছাড় খাইয়াছে—খোঁড়া পা টা লইয়া সে পাহাড় ডিঙাইতে চায়! রাস্তার কাঁকরে পায়ের তলা দুইটা আর নাই, অত্যধিক শ্রান্তিতে হৃৎপিণ্ডটা পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত বাহিরে আসিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছে, রক্তের চাপে মাথাটা ছিঁড়িয়া পড়িল! দৃষ্টি ঘোলাটে, পথের সে ঠাহর পাইতেছে না। এ যেন রাস্তা নয়, প্রকাণ্ড একটা নদী। না আছে কূল, না আছে ঢেউ। তাহাকে তবু টানিয়া নিয়া চলিয়াছে—

কোথায়!

হঠাৎ সে দেখিতে পাইল কয়েক হাত দূরে কে একটি বিধবা-মেয়ে তাহার আগে আগে চলিয়াছে। এত রাত্রে এই নির্জ্জন রাস্তায় মেয়েটি কোথা হইতে নামিয়া আসিল। পরণে থান্-কাপড়, ঘোমটার তলা দিয়া রাশীকৃত চুল পিঠ বাহিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মেয়েটিকে দেখিয়া সুধা মনে যেন একটু বল পাইল। ইহারই কাছে সে আশ্রয় ভিক্ষা করিবে। পিপাসায় গলাটা তাহার শুকাইয়া আসিল, আর সে চলিতে পারিতেছে না।

সম্মুখবর্ত্তিনী মেয়েটিও দাঁড়াইল। বাড়িতে নিশ্চয়ই কোনো রুগী আছে, সাহস করিয়া নিজেই ডাক্তার ডাকিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে হয় ত'। সুধাকে সঙ্গে নিলে সে অক্লান্ত সেবা করিয়া, দেবতার কাছে প্রার্থনা করিয়া রুগীকে বাঁচাইয়া তুলিবে। ডাক্তারের বাড়িটা খুঁজিয়া পাইতেছে না বুঝি। পথের মাঝখানে অমন করিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল কেন?

তাহার সামনে আগাইয়া আসিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য সুধা প্রাণপণে আবার পা চালাইল। দেখাদেখি মেয়েটিও আবার চলিতে সুরু করিয়াছে।

সুধা ডাকিল,—শুনুন্।

মেয়েটি ফিরিল না।

সুধা আবার ডাকিল,—শুন্‌ছেন ?

মেয়েটি এইবার ঘুরিয়া দাঁড়াইল। মধুর করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি ?

শব্দ শুনিয়া পরেশ বারান্দা হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইল কে একটি মেয়ে তাহাদেরই বাড়ির অদূরে হঠাৎ হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। এতক্ষণ যে তারাটার দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে চক্ষু দুইটাকে সে ক্ষয় করিয়া ফেলিতেছিল সেই তারাই শরীরিণী পরীর বেশে কক্ষচ্যুত হইল নাকি ? কিন্তু এ কেমন বেশ ! পরণে যে তাহার সুধার শাড়ি, গায়ে যে সেই ব্লাউজ—হুবহু। পরেশ বার কতক চোখ দুইটা কচ্‌লাইয়া লইল—তারা দেখিতে-দেখিতে সে পাগল হইয়া গিয়াছে বুঝি। এমন কত দিন দ্বিতীয় বার চোখ খুলিয়া সে প্রথম কল্পনাকে আর খুঁজিয়া পায় নাই। এইবারো মাটির উপর আকাশের তারাকে আর দেখিতে পাইবে না বিশ্বাস করিয়াই মনে মনে হাসিয়া সে চোখ মেলিল। কিন্তু ফুটপাতের কিনারে সত্যই সুধা শুইয়া রহিয়াছে !

বাবাকে জাগাইয়া তুলিবে নাকি ? টর্চ আনিয়া অস্পষ্ট অন্ধকার ঝল্‌সাইয়া দিবে নাকি ? দরকার নাই। হয় ত' একটি দীর্ঘ নিশ্বাসের মত সেই স্বল্পায়ু স্বপ্ন রূঢ় আলোতে লুকাইয়া পড়িবে। বাবার কাছে আর সে মুখ দেখাইতে পারিবে না।

নিজেই সে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিল। সদর দরজা খুলিল,—রাস্তার উপর মূর্ত্তিটা এখনো অটুট আছে। সুধার সেই বধূবেশে, ছায়াময়ী কল্পনামূর্ত্তিতে নয়।

এ কী ! সুধাই ত'।

পরেশ থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল—আকাশের সব ক'টা তারা মিলাইয়া কল্পনায় যে তিলোত্তমা গড়িয়া উঠিয়াছিল এ যে সে-ই। তাড়াতাড়ি নীচু হইয়া সুধাকে সে স্পর্শ করিয়া ডাকিল,—সুধা !

সুধা নড়িল না, সাড়া দিল না, চোখ চাহিল না।

শরীর অসাড়, দৃঢ় ; দাঁতে দাঁত লাগানো, পায়ের পাতা দুইটা হিম, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হইতেছে এমনি একটা ভীত আর্ত্ত শব্দ !

বিস্মিত হইবার সময়টুকুর পর্য্যন্ত অপব্যয় হইল না। পরেশ তাড়াতাড়ি তাহার সংজ্ঞাহীন শিথিল দেহটাকে দুই হাতে বুকের কাছে তুলিয়া লইয়া বাড়ির মধ্যে—একেবারে উপরে চলিয়া আসিল। ডাকিল : বাবা, বাবা, শিগ্‌গির ওঠ—

প্রসন্নবাবু বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন ভিতরের বারান্দাতে পরেশ একটি মেয়েকে কোলে লইয়া বসিয়া আছে ও তাহাকে জাগাইবার নানাপ্রকার অবৈজ্ঞানিক চেষ্টা করিতেছে। মেয়েটির মুখ মলিন, বিবর্ণ !

ঘুমের চোখে ব্যাপারটা তিনি ভালো করিয়া বুঝিলেন না। কিন্তু পরেশের শঙ্কাকুল মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার সমস্ত বিস্ময় উবিয়া গেল।

—কী, কী হ'ল পরেশ ?

—দেখ্‌ছ না, সুধা অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছে ? শিগ্‌গির অনিকে ডাক, ঠাণ্ডা জল আন খানিকটা—শিগ্‌গির।

প্রসন্নবাবু বসিয়া পড়িয়া কহিলেন,—সুধা ? কোথায় পেলে তাকে ?

—ছুটে আস্‌তে আস্‌তে হঠাৎ রাস্তার ওপর হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়্‌ল। তুলে আন্‌তে গিয়ে দাঁতে দাঁত লেগেছে। অনিকে জাগাও, বাবা।

গোলমাল শুনিয়া অনিন্দিতা নিজেই বাহির হইয়া আসিল।

কাতর করুণ কণ্ঠে পরেশ কহিল,—সুধা অজ্ঞান হ'য়ে গেছে, অনি।

সেই স্বরে কতখানি কাকুতি ছিল তাহার হিসাব করিবার আর সময় নাই। পরেশ কহিল,—চৌবাচ্চা থেকে বাল্‌তি ক'রে শিগ্‌গির জল নিয়ে এস। জলের ঝাপ্‌টা দিলে হয় ত' ভালো হ'য়ে যাবে। কিন্তু এমন কেন করছে বাবা ?

প্রসন্নবাবু সুধার হাতের তালু দুইটা গরম করিবার জন্য হাতের চেটোয় ঘষিতে লাগিলেন। কহিলেন,—বীরেন কোথায় গেল ? সে ঘুমুচ্ছে বুঝি ?

সে-প্রশ্নের উত্তর পরেশ কী জানে ? সুধার চিবুকটা তুলিয়া ধরিয়া সে একবার ডাকিল,—সুধা!

সেই প্রশ্নেরই বা উত্তর কোথায় ?

অনিন্দিতা বাল্‌তিতে জল লইয়া আসিল। অঞ্জলি ভরিয়া জল লইয়া প্রসন্নবাবু সুধার চোখে-মুখে সজোরে ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন। অনিন্দিতা ষ্টোভ্‌ জ্বালিয়া গরম-জল করিতে বসিল—পায়ে সেঁক দিবে।

সুধার শরীরটা নড়িয়া উঠিল।

পরেশ নীচু হইয়া ডাকিল,—সুধা!

অজ্ঞানের ঘোরেই সুধা চেঁচাইয়া উঠিল: ঐ, ঐ, ওরা এল, এল আমাকে ধরতে।

—কে, কে সুধা ?

—মা। মা এসেছেন। রাস্তায় তাঁকে দেখ্‌লাম যে—তাঁর অসুখ সেরে গিয়েছে, দেখ্‌তে কেমন সুন্দর হয়েছেন। ঐ, ঐ—

সুধা ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া পরেশের হাঁটুটা জড়াইয়া ধরিল।

পরেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল,—তুমি ওকে কোলে নিয়ে বোস বাবা, আমি পবিত্র-বাবুকে ডেকে আনি।

সুধা আবার ধড়মড় করিয়া উঠিল : পিঠে একরাশ চুল, আমার দিকে চেয়ে হেসে বল্লেন—কি ?

বলিয়া সুধা অস্ফুট করিয়া একটু হাসিল। সে-হাসি দেখিলে ভয় করে।

প্রসন্নবাবু কহিলেন,—তুমি বোস। আমি যাই পবিত্রবাবুকে নিয়ে আসি।

—যত ফি চান, ঘুম থেকে তুলে আন্‌তেই হবে বাবা। তুমি বল্‌লে আর ফেরাতে পারবেন না।

সুধার মুখে সেই বিবর্ণ অর্থশূন্য হাসিটি লাগিয়া আছে। যেন কুটিল বিদ্রূপের হাসি : আমাকে মারছ কেন ? ছাড়, গলাটা ছাড়—দম আট্‌কে আসে যে। হ্যাঁ, বাক্স বাঁধা আমার কখন্ হ'য়ে গেছে। যাই, মা।

অনিন্দিতা কহিল,—বোধ হয় নিশি পেয়েছে, জ্যাঠামশাই।

—বোধ হয়। প্রসন্নবাবু কহিলেন,—ঘুমের মধ্যে কখন্ দরজা খুলে বেরিয়ে পড়েছে। বেচারা বীরেন হয় ত' টেরও পায় নি। আমি বরং বীরেনকেই কেন ডেকে আনি না, পরেশ। সেও ত' ডাক্তার।

পরেশ ধমক দিয়া উঠিল : ছাই ডাক্তার! তার চেয়ে পবিত্রবাবুর বাড়ি কাছে হবে। শিগ্‌গির চ'লে যাও বাবা। একটু সুস্থ হ'লে পরে বীরেনকে খবর দেওয়া যাবে'খন।

কোটটা গায়ে দিতে-দিতে প্রসন্নবাবু বাহির হইয়া পড়িলেন : রামদীনটা পর্য্যন্ত ও-বাড়ী।

প্রসন্নবাবু চলিয়া গেলে পরেশ কহিল,—এ কেমনধারা ঘুম বীরেনের! এমন একটা রাতেও তার ঘুম আসে! আর এমন ঘুম—পাশ থেকে বউ উঠে গেলেও সে টের পায় না।

সবাই ত' আর পরেশের মত রাত জাগিয়া নক্ষত্রলোকের রহস্য খুঁজিয়া বেড়ায় না—এমন একটা ব্যঙ্গোক্তি অনিন্দিতার পক্ষে এখন আর সমীচীন হইবে না। সে কহিল,—অম্‌নি শুতে বোধ হয় ওর অসুবিধা হচ্ছে।

কিসে সুধার আরাম হইবে তাহাতেই পরেশ অস্থির : তবে চট্ ক'রে দুটো বালিশ নিয়ে এস, অনি।

বালিশ আসিল। বালিশে সুধার মাথাটা নামাইতে যাইতে সে আবার চেঁচাইয়া উঠিল। কে ? কী ওটা ? বিষ ? থু! বলিয়া সে জিভ ও দাঁতের সংযোগে বিশ্রী একটা শব্দ করিতে লাগিল।

পরেশের সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গেছে। কহিল,—জলের ঘটিটা এগিয়ে দাও, অনি।

আর শিগ্‌গির বাবার শিয়রের তাক খুঁজে মকরধ্বজ বের ক'রে খানিকটা মেড়ে আন। শরীর কেমন নেতিয়ে পড়েছে দেখ্‌ছ।

খলে করিয়া মকরধ্বজ বাঁটিয়া অনিন্দিতা সুধার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল। কহিল,– খেয়ে ফেল দিকি?

সুধা চোখ চাহিল, নিস্তেজ অর্থহীন চাহনি। কাহার দিকে চাহিয়া আছে ঠিক বুঝা যায় না। হঠাৎ লাল রঙের জল দেখিয়া সে চেঁচাইয়া উঠিল: রক্ত! রক্ত! ও কেন এনেছ? মুখে আমার এখনো রক্ত লেগে আছে। ভারি তেতো। বলিয়া আবার সে মুখ হইতে কি-যেন থুতাইয়া ফেলিতে লাগিল।

অনিন্দিতা ঘন হইয়া সরিয়া আসিয়া স্নিগ্ধ স্বরে কহিল,—খেয়ে ফেল সুধা! হাঁ কর দিকিন লক্ষ্মীটি।

সুধা শ্রান্ত স্বরে কহিল,—কে, মা? পিঠে তোমার এত চুল? আচ্ছা, আরেকটু দাঁড়াও, খোঁপাটা বেঁধে নি। এই হ'ল বলে'।

পরেশ প্রাণপণে জল ছিটাইতে লাগিল, কখনো হাওয়া করিতে থাকিল, কখনো নীচু হইয়া ডাকিল,—সুধা, এই যে আমি, পরেশ।

সুধার মুখে সেই ম্লান বিকৃত হাসি।

অনিন্দিতা কহিল,— পায়ে গরম জলের ফোমেণ্ট করব পরেশদা?

—কী করলে যে ভাল হবে কিছুই আমি বুঝতে পারছি না অনু। কর। তার আগে আমি জোর করে' ওর দাঁত ফাঁক ক'রে ধরি, চামচ্‌ করে' ওষুধটা ঢেলে দাও। আমার টেব্‌লের ওপর চামচ্‌ আছে।

দশ মিনিটের মধ্যে ব্যাগ-হাতে পবিত্রবাবু আসিয়া পড়িলেন। নাড়ি দেখিলেন, হার্ট দেখিলেন; মুখে উৎসাহের সামান্যতম চিহ্ন দেখা দিল না।

তাড়াতাড়ি ব্যাগ হইতে স্ট্রোফেন্‌থিন্‌ ইন্‌ট্রাভেনাস্‌ দিলেন।

কোথায় কী!

প্রসন্নবাবু কহিলেন,—আমি যাই, বীরেনকে ডেকে নিয়ে আসি।

পরেশ কহিল,—কি রকম বুঝ্‌ছেন ডাক্তারবাবু?

পবিত্রবাবু রুগীর আভাহীন পাণ্ডুর মুখের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, —হার্ট কোল্যাপ্‌স্‌ করছে। দেখি এফেক্ট।

সুধা আরেকবার শব্দ করিল—এইবার ম্রিয়মান কণ্ঠস্বরে: যাই, মা। আমার সেই ধুপদানিটা কোথায় রাখ্‌লে? সমস্ত শরীরটা একবার কাঁপিয়া উঠিয়া শান্ত হইল।

ডাক্তার নাড়ি দেখিলেন, হার্ট দেখিলেন—তাহারপর ষ্টেথিস্কোপ্‌টা গলার উপর মালার মত করিয়া ঝুলাইয়া দিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

প্রসন্নবাবু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন,—যাই, বীরেনকে ডেকে নিয়ে আসি।

অনিন্দিতা কহিল,—বুড়ো মানুষ, তুমি আর অত ছুটোছুটি করো না জ্যাঠামশাই—।

সজলচক্ষে পরেশ কহিল,—হ্যাঁ, তুমি যেয়ো না বাবা। বীরেনকে খবর দেবার সময় এখনো ঢের আছে।

—না, না, তা কী হয়? তার জিনিস—সে কি একবার দেখ্‌বে না? ঘরে সিঁদুর ত' কোথাও নেই, আন। মন্মথবাবুর বাড়ির মেয়েদের একবারটি খবর দাওগে। আমি যাই—বেচারা বীরেন! আর ঘুমোয় না বীরেন, উঠে দেখবে এস।

আপনমনে বকিতে-বকিতে প্রসন্নবাবু বাহির হইয়া পড়িলেন। কেহ তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না।

আধঘণ্টা পরে যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন সব ফুরাইয়া গিয়াছে। পবিত্রবাবু বিদায় লইয়াছেন। এক ঘর মেয়ে-পুরুষের মধ্যে পরেশ সুধার দেহটিকে কোলে লইয়া চিত্রার্পিতের মত বসিয়া আছে। অনিন্দিতা সিঁথি ভরিয়া সিঁদুর লেপিয়া দিতেছে। পাশের বাড়ির একটি সধবা বধূ পায়ে আল্‌তা গুলিয়া মাখাইতেছে।

সমস্ত ঘরে গভীর নীরবতা!

প্রসন্নবাবু খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে কহিলেন,—বীরেনকে খুঁজে পেলাম না কোথাও। বোধ হয় পথে-পথে সুধাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

গল্প গ্রন্থ

ডাউন দিল্লি এক্সপ্রেস

রাজপুতানা থেকে ফিরতি-পথে শ্যামল দিল্লিতে নাম্‌লো। বস্তুক্ষণ তখন সকাল হ'য়ে গেছে—বিকেলে আবার কল্‌কাতার ট্রেন, সেই এইট্‌-ডাউন—চল্‌তি ভাষায় যাকে বলে তুফান-মেইল্‌। মাঝখানের এই আট-দশ ঘণ্টা সে করে কী! নয়া-পুরোনো দুই দিল্লিতেই তা'র বন্ধু আছে, সহরে সে গেলে পারে একবার। কিন্তু দিল্লি তা'র চ'ষে চ'ষে দেখা; তা'র রূপ আছে ঢের, কিন্তু রঙ নেই—সে সাদা উদয়পুর নয়, ধূসর চিতোর নয়, লাল জয়পুর নয়, নেহাৎই সে ভারতবর্ষের বহুকেলে একটা রাজধানী। তা ছাড়া, খবরের কাগজে দেখা গেলো, দিল্লিতে লেগেছে দাঙ্গা, ধরপাকড় বিস্তর। তবু, ট্যাক্সি ক'রে নির্ব্বিঘ্নে পৃথ্বীরাজ-রোডে পৌঁছুতে পারলেও সেই সব বন্ধু,—তাদের মুঠো আল্‌গা ক'রে বিকেল-বিকেল বেরিয়ে আসা তা'র অসম্ভব।

হুইলার এর ষ্টল থেকে ছ' পেনি দিয়ে আগাথা ক্রিষ্টির একটা ডিটেক্‌টিভ্‌ উপন্যাস কিনে শ্যামল কয়েক পা এগিয়ে এসে লিফ্‌ট্‌ নিলে। স্যুটকেস্‌ ও হোল্‌ড-অল্‌ নিয়ে কুলি সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেছে। দোতলার উপরেই সেকেণ্ড ক্লাশ ওয়েটিং-রুম—বাড়তি সময়টা সেখানেই কাটিয়ে দে'য়া ছাড়া উপায় নেই। কুলিকে খুসি ক'রে দিয়েই শ্যামল স্যুটকেস্‌ খুলে বেঞ্চির উপর কামাবার সরঞ্জামগুলি নামাতে লাগলো। আয়নাটা তুলে ধরতেই—এঃ, তা'র মুখের চেহারা এ চারদিনে কী হ'য়ে গেছে! তাতে যেন আর একবিন্দু বাঙালিত্ব নেই, যেন একটা রাজপুতানি কাঠিন্য, কেমন একটা আসুরিক তেজস্বিতা। নিজের চেহারা দেখে নিজেই সে ভড়কে গেলো। এ চারদিন খেয়েছে কেবল সে পুরি আর ঢ্যাড়স, ডিঙিয়েছে পাহাড় আর চড়েছে এক্কা—চারদিনেই তা'র সেই তৈলচিক্কণ, নবনীত-কোমল কান্তিতে এসেছে পার্ব্বত্য রুক্ষতা, প্রায় একটা প্রতাপাদিত্যি পৌরুষ। মুখটাকে মানুষের করবার জন্যে ফ্লাস্‌ক্‌ থেকে জল গড়িয়ে ব্রাশ দিয়ে তাড়াতাড়ি সে সাবান ঘষ্‌তে সুরু করলো।

খিদমৎগার স-সেলামে এসে হাজির। নিচু চোখে দাড়ি কামাতে-কামাতে শ্যামল বললে,—গোসলখানায় জল দাও।

ফর্সা তোয়ালে, গেঞ্জি, ধুতি আর সাবান নিয়ে শ্যামল বাথ্‌রুমে গেলো। টবে ভরা টল্‌টলে ঠাণ্ডা জল—প্রায় সাঁতার কাটা যায়, মিঠে-মিঠে, একটু শীত করে। রগড়ে-রগড়ে শ্যামল তা'র গায়ের ধূলিরুক্ষ কাঠিন্যটাকে নরম, নির্ম্মল ক'রে তুললো। তারপর চুল ফিরিয়ে, মুখে '৪৭১১' ঘ'ষে, যখন সে ফুরফুরে-পাতলা ঢিলে ঢালা সিল্কের পাঞ্জাবিটা গায়ে দিলে, তখন তা'র চামড়ায় ও চেহারায় বাঙলা দেশের আভা ফুটেছে: মাটির শ্যামলিমা আর আকাশের প্রসন্নতা।

স্নান ক'রে উঠতেই চন্ ক'রে তা'র খিদে পেয়ে গেলো যাই বলো, পেট পুরে এখন একবার ভাত খেতে হ'বে। জয়পুরে চন্দ্রশেখরের শ্বশুরবাড়ি এসে অপরাধের মধ্যে চারটি সে ভাত খেতে চেয়েছিলো; অতিথি চাউল খাবে শুনে বায়কোষে ক'রে তারা যে একটি অন্নস্তূপ এনে হাজির করলে তাকে কুতবমিনারের পাশে দাঁড় করালে বিশেষ বেমানান হ'তো না—আর তা'র সঙ্গে মাত্র দু'গাছি শাক আর এক বাটি আচার। ভাগ্যিস্. সঙ্গে এক গ্লাস জল ছিলো। জলে পোকা আছে মনে ক'রে সেটাকেও তারা আমিষ ব'লে বর্জ্জন করলেই হয়েছিলো আর-কি!

খিদমৎগার বল্‌লে,—খানা নিয়ে আস্‌বো এখানে?

সুটকেসের ডালা বন্ধ ক'রে চাবি ঘুরোতে ঘুরোতে শ্যামল বল্‌লে,—না, দরকার হ'বে না—নিচেই যাচ্ছি।

ছাড়া জামাটার পকেট থেকে মনি-ব্যাগ, রুমাল, সিগারেটের টিন, দিয়াশলাইর বাক্স ইত্যাদি উদ্ধার ক'রে এ-জামার পকেটে চালান দিলে: আবার ডালা খুলে সেই জামা-কাপড়গুলি পাট ক'রে গুঁজে রাখলো, আবার করলো বন্ধ। কব্জিতে ঘড়ির ব্যাণ্ড পরালো, আবার ফাঁস খুলে চাবি দিলো, কানের কাছে তুলে দেখলো ঠিক টিক্‌টিক্ করছে কি না। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে, লিফ্‌টে ক'রে দেখতে-না-দেখতেই প্ল্যাটফর্ম্মে।

বাঁয়েই টিকিট-ঘর। ভাবলে টিকিটের হাঙ্গামটা এখুনি সেরে রাখি—হাঙ্গামের মধ্যে বার্থ একটা রিজার্ভ ক'রে আসা: দিল্লি থেকে হাওড়ার অর্দ্ধেক রিটার্ণ টিকিটটা তো সঙ্গেই আছে। যাক, যা খিদে পেয়েছে, আগে খেয়ে নেয়া যাক, পরে বার্থ রিজার্ভ করা যাবে 'খন। রিফ্রেশমেণ্ট-রুমের দিকে দু পা এগিয়ে আবার সে ফিরলো। টিকিট-ঘরের জান্‌লার বাইরে একেক ক'রে ভিড় জম্‌ছে,—না, এখুনিই চুকিয়ে ফেলতে হয়। মনিব্যাগের বোতাম খুলে শ্যামল কাটা টিকিটটা ও একটা আধুলি বা'র করলো।

যা ভেবেছিলাম। এইট্ ডাউনে আজকে আর বার্থ মিলবে না, সব বুক্‌ড্। রাত সাড়ে দশটায় মেইন লাইন দিয়ে যে একস্‌প্রেস্‌টা যায়, তাতে হ'তে পারে একটা লোয়ার-বার্থ। এ-গাড়িটা ভীষণ ঠাসা, জায়গা নেই।

দুঃসংবাদ শুনে শ্যামলের খিদে-তেষ্টা সব ম'রে মিইয়ে গেলো।

—কোনোরকম চেষ্টা চরিত্র ক'রে হ'তে পারে না একটা?

—অসম্ভব।

র'য়ে গেছে তা'র সিক্স্‌টিন্ ডাউনে যেতে – মোগলসরাইয়ে পৌঁছুতে সেই প্রায় বিকেল সাড়ে-তিনটে: এই গাড়িতেই যে ক'রে হোক, একটা কামরা বেছে সে উঠে

পড়বে। রাতে ঘুমুতে না পারুক, ব'য়ে গেলো; অন্তত আরেকজনের ঘুমকে সে গোল্লায় পাঠাবে—এ জন্যে মারামারি করতে হয়, সমস্ত দেহে তা'র সতেজ সম্মতি আছে। বার্থের খাস্‌দখলের জন্যে রেলোয়ে কোম্পানি কাউকে সারা রাস্তা গ্যারাণ্টি দেয় নি: নতুন একটা য়্যাড্‌ভেঞ্চারের উৎসাহে ক্ষুধাটা আবার তা'র চাঙ্গা হ'য়ে উঠলো।

হ্যাঁ, মামুলি রাইস্‌-কারি। সরু দাদখানি আর গরম ঝোল। কাঁটা-চামচ লাগবে না, ঝোলে আঙুল ডুবিয়ে গরস পাকিয়ে খেলেই এই খিদের সম্মান করা হ'বে। জামার হাতটা সে কনুই অবধি গুটিয়ে নিলো, আর হ্যাঁ, কোলের ওপর এই তোয়ালেটা বিছিয়ে দিলেই—ব্যস্‌।

ভরা-পেটে সিগারেট খাওয়ার মতো সুখের কিছু আছে কি না কে জানে। শীতের রোদ বলো, চৈত্রের হাওয়া বলো, ভোররাতের ঘুম বলো—এই হাল্কা নীল্‌চে ধোঁয়ার মতো কেউ কিছুই নয়। পরমমধুর আলস্যের একটি গাঢ় আবেশ, স্নায়ুর উপর স্তিমিত একটি কুয়াসা। খাওয়ার পর এই সিগারেট খেতে পারবে ব'লেই তো শ্যামল যা-হোক্‌ ভাত খায়—কতোক্ষণে আঁচিয়ে উঠে সে সিগারেট খেতে পাবে তা'রই উন্মাদনায় খেতে-খেতে সে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। এই সিগারেটটা ছিলো বলেই মানুষ এতো দুঃখে-কষ্টেও বেঁচে আছে: ছোট গল্পের আর্টের মতোই এই সিগারেট।

সিগারেটটা শেষ ক'রে শ্যামল বেরিয়ে এলো। বেরিয়ে আসতেই এক য়্যাংলো-পার্শিয়ান্‌ চেকারের সঙ্গে দেখা। সসম্ভ্রমে বললে,—তুমি আছ কোথায়?

—দোতলায়, ওয়েটিং রুমে। শ্যামল হাসলে: কোনো হোটেল বা বাড়িতে গিয়ে উঠলে কি ষ্টেশনের খানা খাই?

—আজই যাবে?

—পারলে এই মুহূর্ত্তে।

—তুমি বিকেল পর্য্যন্ত উপরেই থাকবে তো?

—কেন?

—এইট্‌-ডাউনের সেকেণ্ড ক্লাশ বার্থ সব রিজার্ভড্‌ হ'য়ে গেলেও—যাই হোক, আমি তোমার জন্যে চেষ্টা ক'রে দেখবো।

শ্যামল খুসি হ'য়ে বল্‌লে,—কী ক'রে?

—মাঝে-মাঝে শেষ পর্য্যন্ত সব প্যাসেঞ্জাররা এসে পৌঁছোয় না। দু' একটা খালি মিলে যেতে পারে।

—না মিল্‌লে?

—আরো দুয়েকজন জুটে গেলে একটা ফার্স্টক্লাশকে কন্‌ভার্ট করার কথা হচ্ছে। তুমি প্রস্তুত থেকো।

—Sure. সব সময় খাড়া থাকবো। আমাকে তা হ'লে দয়া ক'রে ঐ ফার্স্ট ক্লাশটাতেই ঢুকিয়ে দিয়ো, সাহেব। জীবনে কখনো চড়বার সুবিধে হ'বে কি না কে জানে।

মনে যখন ফের ফুর্তির হাওয়া বইছে, তখন আরেকটা সিগারেট ধরাতে হয়।

সময়টা তখন পুজোর পরে পশ্চিমের বাতাসে শীতের আমেজ এসে গেছে। গায়ের উপর একটা চাদর টেনে দিয়ে শ্যামল ইজি-চেয়ারে গা ঢেলে দিলে। বারোটা প্রায় বাজে, চারিদিকে লোহা-লক্কড, চাকা-চক্করের গোলমাল,—এদিকে টাঙা-ট্যাক্সি, ওদিকে কুলি-প্যাসেঞ্জার, দূর থেকে রৌদ্র-ঝলমল দিল্লির অস্পষ্ট আভাস—স্নান, আহার, বিশ্রাম ও সিগারেটের ধোঁয়ায় মিলিয়ে সবটা এখন আনকোরা একটা স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। এতো দূর দীর্ঘ পথের মালিন্যের আর গ্লানি নেই, সে যেন তাদের বাড়ির বৈঠকখানায় শুয়ে ছুটির দিনে খবরের কাগজ পড়ছে, শরীরে-মনে এমনি একটা তা'র নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গি। কাটা-কাটা সময় হ'লে সে টাইম্-টেবল্ পড়তো, কিন্তু এখন টানা, ঢালা সময় ব'লে খুলতে হ'লো আগাথা-ক্রিষ্টি।

এবং সূক্ষ্ম চোখে ডিটেকটিভের কার্যকলাপ অনুধাবন করতে-করতে তা'র চোখে ঢুল এলো, আগাথা-ক্রিষ্টি চেয়ারের হাতলের উপর মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লেন।

গায়ে ঠেলা খেয়ে ধড়ফড়িয়ে উঠতেই দেখা গেলো সামনে সেই য়্যাংলো-পার্শিয়ান্ চেকার দাঁড়িয়ে।

—ওঠো, তোমার বার্থ পাওয়া গেছে।

—পাওয়া গেছে? ফার্স্ট-ক্লাশে তো?

—তা'র দরকার হ'লো না। সেকেণ্ডেই একটা আপার-বার্থ। ওঠো, আর দেরি নেই, গাড়ি কতোক্ষণ ইন্ হ'য়ে গেছে।

—বলো কী! ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলো সাড়ে চারটে প্রায় বাজে: চারটে পঁয়ত্রিশে ট্রেন ছাড়বে। শ্যামল গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো: কুলি, কুলি।

—হুজুর।

সেই আগের কুলিই। কখন থেকে সে তা'র ঘুম ভাঙবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

—হ্যাঁ, চলো ঝটপট্। হ্যাঁ, দাঁড়াও—এই যে।

সবই হ'লো—খিদমৎগারকে ভারি-রকম বক্‌শিস করা পর্যন্ত, কেবল এক পেয়ালা চা খেয়ে যাবারই সময় হ'লো না।

—না, না, ঐ দিকে নয়। চেকার তাকে বাধা দিলে।

—এইটি ডাউন তো ঐ প্ল্যাটফর্মেই দাঁড়ায়।

—তোমার সুবিধের জন্যে আজকে একেবারে এইধারে এসেই দাঁড়িয়েছে। চেকার হাসলে: চলো, তোমাকে একেবারে গাড়িতে বসিয়ে দিয়ে আসি।

—উঃ, তুমি কী ভালো লোক! শ্যামল বল্‌লে,—হঠাৎ আমার জন্য বার্থ জোগাড় করলে!

—শেষ পর্যন্ত দু'-একটা মিলে যায় প্রায়ই। আজো একটা এমনি ফস্‌কে গেছে। খবর দেয়াই তো আমার কাজ। এই যে তোমার কামরা, উঠে পড়ো। এই ছাড়লো ব'লে:

দরজার হাতল ঘুরিয়ে গাড়িতে উঠে প'ড়ে শ্যামল প্রথমটা ভেব্‌ড়ে গেলো। এটা একটা ট্রেনের কামরা না বিয়ে-বাড়ির ভাঁড়ার ঘর—কিছু সে গোড়ায় ঠাহর করতে পারলো না। মালেপত্রে জিনিসে-আসবাবে গাড়িটার আগাপাস্তলা একেবারে ঠাসা: এমন-কি তারো বার্থটায় অনেক সব খুচরো জিনিস উঠেছে। ন্যাকড়ায়-মোড়া কি-একটা ভারি পদার্থ সে নিজের হাতেই নামাতে যাচ্ছিলো, ওপার থেকে এক ভদ্রলোক হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলেন: কী করেন মশাই, এটায় ঘি যে—

—ও, তাই নাকি? শ্যামল হেসে বল্‌লে,—আর এটায় বুঝি কাসুন্দি? দয়া ক'রে সব নামিয়ে রাখুন—নইলে ঘিয়ে-কাসুন্দিতে একাকার হ'য়ে যাবে।

—একাকার হ'য়ে যাবে কী মশাই? ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ মেজাজ দেখাচ্ছেন মনে হ'লো।

গরম কী-একটা কথা মুখে উঠছিলো ফুটে, কোথায় চোখ পড়তেই সে-কথা শ্যামল ঢোক গিলে পিষে ফেল্‌লে: না, এই বলছিলাম কী—এটায় আমার বিছানা পাততে হ'বে কি না—আমার বার্থটা তো একটা মিট্‌-সেইফ্‌ নয়।

—তবে এতোক্ষণ আসেন নি কেন?

—তবে গাড়িই বা এতোক্ষণ ছাড়ে নি কেন? মুখে কৃত্রিম হাসি এনে শ্যামল বললে—আমাকে আসতে না দেখে তক্ষুনি-তক্ষুনি তো হাহাকার ক'রে গাড়িটার ছেড়ে দে'য়া উচিত ছিলো। কিন্তু—আবার সে জিনিসগুলিতে হাত দিতে যাচ্ছিলো, এবার যিনি চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি একজন মহিলা। বোধহয় ভদ্রলোকের স্ত্রী, সংস্কৃত ক'রে বললে—অর্দ্ধাঙ্গিনী।

মহিলা-শব্দটার মধ্যে যতোটা আভিজাত্য আছে তাঁর আকৃতিতে ত'ার

এতোটুকুও ত্রুটি হয় নি। শ্যামলকে উঠতে দেখেই তাঁর নাকের ডগায় ও ঠোঁটের যে-সব সূক্ষ্ম রেখা ফুটেছিলো, বিরক্তিতে এবার তা'রা গভীরতরো হ'তে লাগলো। তিনি হঠাৎ চাপা গলায় খাঁখ্‌রে উঠলেন : সব ফেলে-ফুলে দেবে, কুলিটাকে বলো না।

—এই কুলি! ভদ্রলোক সগর্জ্জনে হুকুম করলেন ; ধীরেসে মাল উতরাও।

বিনয়ে প্রায় গ'লে গিয়ে শ্যামল বল্‌লে,—কুলিটা আমার।

—তবে সরুন। ভদ্রলোক পা তুলে আমিরি ক'রে ঠেসান্ দিয়ে বসেছিলেন, খালি পায়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন : আমার জিনিসে হাত দেবার কোনো অধিকার নেই আপনার।

—আহাহা, আপনি কষ্ট করতে যাবেন কেন? হ'লোই বা আপনার জিনিস, জায়গাটা তো আমার। আইন-অনুসারে অধিকারটা তো আমারই আগে আসে। ব'লে শ্যামল কুলির সঙ্গে ধরাধরি ক'রে একেক ক'রে সযত্নে জিনিসগুলি নামিয়ে রাখলো।

গার্ড সবুজ নিশান উড়িয়েছে, দিয়েছে লম্বা সিটি। পা-দানির থেকে নেমে প'ড়ে কুলি দীর্ঘ সেলাম বাজিয়ে বললে,—বাবু!

Sure. মনিব্যাগ হাট্‌কে শ্যামল একটা আধুলি বার করলে : এই নে। চার আনা—আমার মাল আনবার জন্যে, দু' আনা—ঠিক মনে ক'রে ওপরে যে গিয়েছিলি তার বাবদ, আর বাকি দু' আনা—আমার জায়গা থেকে ঐ জঞ্জালগুলো পরিষ্কার ক'রে দিয়েছিস ব'লে। বুঝলি?

—সেলাম বাবু।

—সেলাম। আবার যদি কোনোদিন এ পাপ জায়গায় আসি, তোর নম্বর আমি মনে রাখবো।

গাড়ি তখন চলতে সুরু করেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই স্পষ্ট ঠাহর হ'লো দিনের আলো আর নেই : হাওয়ার ফলায় দিয়েছে ধার, ফাঁকা মাঠে আসন্ন সন্ধ্যার ঘন কমনীয়তা।

কিন্তু তা তো হ'লো, এক পেয়ালা চা না হ'লে কী ক'রে চলে? রিফ্রেসমেন্ট-রুম্ সেই গাজিয়াবাদ জংশনে—যদিও পরের ষ্টেশনেই, কিন্তু মাত্র আট মিনিটে চা কেবল সাবাড়ই করা যাবে, খাওয়া যাবে না। যাক্ গে, তা'র দেরি আছে, দরজা থেকে এখন মুখ ফিরিয়ে ভিতরে তাকানো যাক্।

তার বার্থের নিচেটায় সেই মহিলার জায়গা, ওপারেরটায় তাঁদের বছর বারো-তেরো বয়সের রোগা কাহিল একটি ছেলের, ওপারের উপরেরটাতে ভদ্রলোকই

বোধকরি যথাকালে অধিরোহণ করবেন—সম্প্রতি ছেলের জায়গায় মৌরসি করে একটু বসেছেন—আর মাঝের লোয়ার বার্থটাতে তাঁদেরই একটি কুমারী মেয়ে এলো আঁচল ও ফাঁস্‌ খোঁপায় তার আধুনিকতার প্রাচীন বিজ্ঞাপন দিতে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে। চেহারায় আধুনিকতার একটা প্রাখর্য্য আন্‌বার চেষ্টা করলেও আসলে সৌন্দর্য্যে সে পুরাকালের, অর্থাৎ চিরকালের। ছিপছিপে দীর্ঘ দেহটি যেন একটি লীলার নিঃশব্দ নির্ঝরিণী : শাড়ির আবেষ্টনে তাতে যা রেখা ফুটেছে তা ওয়াটার-কালারএ তুলির হাল্কা টানের চেয়েও নরম ম্যাট্রিকের গেজেটের শুক্‌নো, শূন্য পৃষ্ঠার মতো শ্যামল মেয়েটির দিকে চেয়ে রইলো, কেননা গায়ে তার বয়েসের কথা এতোটুকুও লেখা নেই। সে সতেরো থেকে তেইশের মধ্যে—যা কিছু ভাবা যেতে পারে, কিন্তু পাঁচশের কম হলেই ভালো : বয়েসে তা'র বড়ো হ'য়ে কোনো মেয়ে কুমারী আছে এ-কথা ভাবতে তা'র নিজেরই কেমন খুঁৎ-খুঁৎ করে।

ভদ্রলোক মেয়েটিকে সম্বোধন ক'রে বল্‌লেন : কুঁজো ক'রে গোব্‌রা জল দিয়ে গেছে, রেণু?

রেণু ছুরি দিয়ে আপেল ছাড়াতে-ছাড়াতে বল্‌লে,—হ্যাঁ।

এবার মহিলাকে সম্বোধন ক'রে : তবে আর-কি, চায়ের জল চাপিয়ে দাও এবার।

চায়ের নাম শুনে শ্যামলের প্রাণটা আন্‌চান্‌ ক'রে উঠলো। ভদ্রলোকের সামনে এসে সবিনয়ে বল্‌লে,—দয়া ক'রে একটু স'রে বসবেন? আমিও একটু বস্‌তাম।

ভদ্রলোক প্রায় খাপ্পা হ'য়ে বল্‌লেন,—আপনার জায়গাতে গিয়েই বসুন না।

—কিন্তু ওখানে তো ঘাড় উঁচিয়ে বসা যায় না, বড়ো জোর পা ছড়িয়ে শোয়া যায়।

—তবে শুয়েই পড়ুন গিয়ে, কে বারণ করছে?

—আমার বিবেক। পাঁচ আঙুল মুড়ে ডান হাতের মুঠোটা দৃঢ় ক'রে স্মিতমুখে শ্যামল বল্‌লে,—চেহারাটা দেখেই তো বুঝতে পাচ্ছেন আমি আর নেহাৎ কচি খোকাটি নই যে সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই ঘুমিয়ে পড়বো। তা ছাড়া এক পেয়ালা চা না খেলে আমি কখ্‌নো ঘুমুতে যেতে পারি না। একটু পাশ দিন্‌ না দয়া ক'রে।

ভদ্রলোক তখন নিঃশব্দে গাঁইগুঁই করছেন, শ্যামল কণ্ঠস্বরকে তরলতরো ক'রে বল্‌লে,—জানেন, আমাকে জায়গা ছেড়ে দিতে আপনি বাধ্য—রাত দশটা পর্য্যন্ত নিচে বস্‌বার আমার এক্‌তিয়ার আছে, আমি হয়তো জোর পর্য্যন্ত করতে পারি। আপনার সঙ্গে এঁটে না উঠলে ওদিকের বেঞ্চিতে গিয়ে বস্‌তেও আমার বাধা নেই। ব'লে মেয়েদের দিকে সে আঙুল দেখালো।

কায়ক্লেশে ভদ্রলোক পিঠটা খানিক সরালেন যা-হোক্।

মহিলাটি (স্ত্রীর নাম ধ'রে ডাকবার রেওয়াজ ভদ্রলোকদের সে-যুগে ছিলো না ব'লে তাঁর নাম পাওয়া গেল না) মুখখানি তেমনি পাঁচ ক'রে আছেন, কিন্তু কথা কইলো রেণু, বেশ একটু ঝঙ্কার দিয়ে : তখনই বলেছিলুম বাবা, পুরো গাড়িটাই রিজার্ভ করো।

—সর্ব্বনাশ! এক লাফে শ্যামল উঠে পড়লো : তা হ'লে যে আজ আর আমার যাওয়াই হ'তো না। না, না, আপনারা বসুন, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে দিল্লির অন্ধকারের শোভা দেখি।

ভদ্রলোক পিঠটাকে ফের বিস্ফারিত ক'রে স্ত্রীকে লক্ষ্য ক'রে বললেন : তবে আর-কি, ষ্টোভটা ধরিয়ে প্যানে জল চাপিয়ে দাও।

গাড়ির মধ্যেই একটা অগ্নিকাণ্ড হ'বে নাকি! শ্যামল ব্যাপারটা আগাগোড়া কিছু বুঝলো না।

মহিলা ছোট বঁটি পেতে নাস্‌পাতি কাটছেন। আঁচল সামলে রেণুই গেলো ষ্টোভ ধরাতে।

—সর্ব্বনাশ! শ্যামল আবার চম্‌কে উঠ্‌লো : Wait a tick. ভদ্রলোকের দিকে এক পা এগিয়ে এসে মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বল্‌লে,—ওঁকে সরে যেতে বলুন, ষ্টোভটা বরং আমিই ধরিয়ে দি।

ভদ্রলোক মুখ গোম্‌রা ক'রে বল্‌লেন,—Mind your own business.

তখন স্পিরিটের উপর দিয়াশলাইর জলন্ত কাঠি পড়েছে, শ্যামল দু'হাতে তাড়াতাড়ি জানলাগুলি টপাটপ্ তুলে দিতে লাগলো।

ছেলেটি ভয়ে আঁৎকে উঠলো : ও কী?

—দেখছ না কী দমকা হাওয়া, ষ্টোভ্ তা হ'লে ধরবে কী ক'রে? আর গলায়-বুকে যে এতো সব মাফ্‌লার জড়িয়েছ, তোমার এতো হাওয়া খাওয়া কি ঠিক হ'বে?

—কিন্তু অন্ধকার হ'য়ে গেলো যে। ছেলেটি তার বাবার মুখের দিকে চেয়ে এর একটা কিছু প্রতিবিধানের ইসারা খুঁজছিলো।

অভয় দেবার মতো ক'রে শ্যামল বললে—কতোক্ষণ আর! ষ্টোভটা ধ'রে গেলেই ব্যস্। বিকেলের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ব'সে চা খেতেই মজা।

—থাক্, ঢের হয়েছে, আমাদের জন্য আপনাকে আর কষ্ট করতে হ'বে না। ভদ্রলোক তাঁর বিস্ফারিত, রোমশ নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়ে বিকট একটি শব্দ করলেন।

—না, না, হাত কচ্‌লে শরীরটাকে ভেঙে-বাঁকিয়ে শ্যামল হেসে বললে,—আমার আর কী কষ্ট হচ্ছে বলুন। কষ্ট তো হচ্ছে এঁদের। এ সব ষ্টোভ-ফোভ ধরানো কি এদের কাজ? কই একটু আপনারা হাত পা ছড়িয়ে ব'সে আরাম করতে-করতে যাবেন, না, এই বেগার খাটনি। আমাকে বল্‌লেই হতো—দু' মিনিট। আমরা মেয়েদের রান্নার যতোই কেননা প্রশংসা করি, বাবুর্চিদের কাছে তাঁরা কেউ লাগেন না। মেয়েদের দিয়ে রাঁধাতে হ'লে হোটেলগুলি এক রাত্তিরেই ফেল্‌।

ভদ্রলোক অনেক কষ্টে ধৈর্য্য ধ'রে ছিলেন, আবার তাঁর নাসারন্ধ্র স্ফীততরো হ'তে লাগলো।

ষ্টোভে পাম্প্‌ করতে-করতে রেণু চাপা গলায় বল্‌লে,—তুমি কিছু বল্‌তে যেয়ো না, বাবা, বলুক যা খুসি।

—আর দেখুন। কতোক্ষণ পরে শ্যামল আবার কথা ক'য়ে উঠ্‌লো: চায়ের সঙ্গে ফলের টুক্‌রোগুলি কি স্যুট করবে?

—তা আমাদের খুসি। আমরা যা কেন না খাই—তাতে আপনার কী? ভদ্রলোক আর নিজেকে চেপে রাখতে পারলেন না।

মুখ গম্ভীর ক'রে শ্যামল বল্‌লে,—তা তো বটেই। কথায় বলে আপ্‌রুচি খানা। যাক্‌, চায়ের সঙ্গে আমার কিন্তু ও-সব ভিজে জিনিস পছন্দ হয় না। আপনাদের খুসি মতো আপনারা খাবেন বৈকি। তা তো বটেই।

তবু এতো ক'রেও শ্যামল এক পেয়ালা চা পেলো না। ট্রে-তে ক'রে চার কাপ চা সাজিয়ে বাঙালি ভদ্রলোকে সপরিবারে পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগলেন—সঙ্গে চললো তাজা আপেল আর নাস্‌পাতির টুক্‌রো, তুলোর বিছানায় টস্‌টসে আঙুর, জ্যাকবের ক্রিম-ক্র্যাকার, বোতলের ছিপি খুলে মুড়মুড়ে ডালমুট।

প্রথমটা শ্যামল 'গোল্ড্‌ রাশ্‌' এ চার্লির মতো একখানা মুখ ক'রে রইলো; পরে ভাবলে কিছু একটা প্রতিশোধ নেয়া যাক্‌। জান্‌লাগুলো ঝপাঝপ্‌ নামিয়ে দিলে, বললে,—বাবাঃ, কী গরম! আর অমনি পকেট থেকে একটা সিগারেট বা'র ক'রে ধরিয়ে বললে,—বাবাঃ, কী ঠাণ্ডা!

ভদ্রলোক কটুস্বরে বললেন,—মেয়েদের সামনে আপনি স্মোক করছেন?

সিগারেটে দীর্ঘ এক টান্‌ মেরে শ্যামল বল্‌লে—উপায় কী তা ছাড়া! মেয়েরা যদি আমার সামনে ব'সে চা খেতে পারেন, তাঁদের সামনে আমায় সামান্য একটা সিগারেট খেতে দোষ কী। ঠাণ্ডায় আমারো তো একটা প্রতিষেধক চাই।

—কিন্তু, জান্‌লা খোলবার আপনার কী রাইট্‌ আছে?

—জান্‌লা তোলবারো তখন যে রাইট্‌ ছিলো।

—জান্‌লা খোলা বা বন্ধ করা—তা যাঁরা লোয়ার বার্থে আছেন তাঁদের মর্জি।

—তবে, বেশ, বন্ধ করুন দয়া ক'রে। ব'লে শ্যামল মহিলার বিছানার উপর জুতোশুদ্ধ একখানা পা রেখে চোখের পলক পড়তে না পড়তে সিটের সঙ্গে ঝোলানো শেকল ধ'রে এক লাফে উপরে উঠে পড়লো।

ভদ্রলোক তেড়ে এলেন: বিছানা মাড়িয়ে দিলেন যে বড়ো?

শ্যামল তখন নিজের বিছানা পাতবার উদ্যোগ করছে, হাসিমুখে বললে,—একটা পা কোথাও না রেখে তো হনুমানের মতো শূন্যে লাফ মেরে টঙে উঠতে পারি না।

—কিন্তু জুতো খুলে লাফাতে কী হয়েছিলো?

—তা হ'লে জুতো-জোড়া আপনি নির্বিঘ্নে উপরে তুলে দিতেন? অতোটা তখনো ভাবি নি।

রেণু ঝাঁজালো গলায় তার বাপকে শাসন করলে: তুমি যা'র-তা'র সঙ্গে মিছিমিছি তর্ক করতে যেয়ো না, বাবা। এসো, তোমার চা জুড়িয়ে গেলো।

ভদ্রলোক তাঁর জায়গায় গিয়ে বসলেন, কাপএ মুখ ঢেকে বললেন,—অভদ্র কোথাকার।

—হ্যাঁ, উপর থেকে প্রতিধ্বনি এলো: সময়মতো চা না পেলে ভদ্রলোকের মাঝে-মাঝে অভদ্র হওয়াই উচিত, কিন্তু—থাক্, গাজিয়াবাদ ঐ এসে গেলো বুঝি। দয়া করে' নামতে দেবেন একটিবার?

মহিলাটি তাঁর জায়গার কথা ভেবে মুখ ভারি করে' খাটো গলায় বললেন,—এ যে দেখছি ভীষণ মুস্কিলে পড়া গেলো।

ভদ্রলোক গজ্‌গজ করে' উঠলেন: আপনি কি বারেবারেই এমনি ওঠা-নামা করবেন নাকি?

—বা, শ্যামল বললে,—দরকার হ'লে কী করতে পারি বলুন?

—এর মধ্যে আবার আপনার কী দরকার পড়লো?

—এখানে চা পাওয়া যায় কি না দেখতাম। রেস্টোর‍্যাণ্ট-কারএ অন্তত অর্ডার একটা দেয়া যেতো।

রেণু যেন তা'র বাপের হয়ে বললে,—সে-সব একেবারে সেরে নিয়ে ওপরে উঠলেই হ'তো।

পিঠটা এবার শ্যামল এলিয়ে দিলো, বললে,—হ্যাঁ, সে একটা কথা বটে। আচ্ছা, ধরা যাক্, চা খাওয়া আমার হ'য়ে গেছে। ধরা যাক্, রাত বেজে গেছে

দশটা—তাই আমাকে ওপরতলায় নিতে হয়েছে নির্ব্বাসন। সত্যের তো আর বাইরে কোনো অস্তিত্ব নেই, সব মনে,—যেমন করে' তুমি ভাবো।

ভদ্রলোক হুমকি দিয়ে উঠলেন স্ত্রীকে লক্ষ্য করে' : তোমার ও-পাশটায় শোয়া হ'বে না দেখছি। আমিই যাচ্ছি ও-দিকে। রমণীবাবু এসে গেলেই কিন্তু এ হাঙ্গামায় পড়তে হ'তো না—পুরো কামরাটাই তখন রিজার্ভ করা যেতো। শেষকালে উনি বিগড়ে গেলেন। কোনো মতিস্থির নেই। তুমি উঠে এসো বলছি।'

ভদ্রমহিলা সত্যি-সত্যিই বিছানা গুটোবার উদ্যোগ করছেন দেখে শ্যামল ব্যস্ত হ'য়ে বললে,—না, না, নামবো না আর--সেই একেবারে ভোরবেলা। এই চুপ করলাম। যাক্, নেমেই বা কী হ'বে!

পাশের থার্ড-ক্লাশ থেকে গোবরা এসে হাজির—আট মিনিটেই চায়ের বাসন-কোসন ধুয়ে সে ফিটফাট করে' দিয়ে গেলো। ফের জল ভরে' দিলো কুঁজোয়, এটা-ওটা ফরমাজ খাটলে।

শ্যামল বলে' উঠলো : খাসা চাকর।

খানিক পরে গাড়ি ছাড়লে পর বল্‌লে,—এর পর গাড়ি কোথায় দাঁড়াবে বলতে পারেন?

আরো পরে জিগগেস করলে : আপনারা কলকাতায়ই যাচ্ছেন বুঝি?

কিন্তু কোনো প্রশ্নেরই তা'র উত্তর নেই। সকলের মুখ পাথরে উৎকীর্ণ বুদ্ধের মুখের মতো নির্ব্বাপিত।

মুখোমুখি দু'টো বার্থে কোনাকুনি হ'য়ে চারজনে বসেছেন; ভদ্রলোকের হাতে নতুন এক জোড়া তাস। বার্থ দু'টোর ব্যবধানটা একটা মোটা কম্বল পেতে ভরাট করা হয়েছে।

শ্যামল ঝুঁকে পড়ে' জিগগেস করলে : কী খেলছ তোমরা, খোকা? ডিক্‌লেয়ার? না, আয়নামোহর?

ছেলেটি গদগদ হ'য়ে বল্‌লে,—ব্রিজ্‌।

রেণু আমনি তা'র হাতে একটা চিম্‌টি কেটে বল্‌লে,—খবরদার টুকু, বাজে লোকের সঙ্গে কথা কইতে পাবি না।

শ্যামল বল্‌লে,—তোমার ডাক-নামটি তো খাসা টুকু, কতোটুকু ব্রিজ তুমি জানো শুনি?

দিদির শাসন ভুলে গিয়ে টুকু গর্জ্জন ক'রে উঠলো : আপনার চেয়ে ভালো।

এবার তা'র মা তা'কে তেড়ে এলেন : ফের কথা কইছিস্‌?

শ্যামল বল্‌লে,—কথা কয়ো না, টুকু। কম্পিটিশানে সামান্য একটু মাথা

চুলকানো পর্যন্ত বারণ। আহাহা, ওটা কী করছ, টুকু? চিরিতন লিড্ দাও, সাহেব পেড়ে খেল। ভয় কী!

টুকু সত্যি-সত্যিই চিরিতনের সাহেব খেললে।

রেণু প্রবল কণ্ঠে ধম্‌কে উঠলো: তুই নিজের মতো খেলতে পারিস না?

—বা, টুকু প্রতিবাদ করলে: সাহেব ছাড়া কী খেলতে পারি আমি? বাবার যখন নো-ট্রাম্প্‌স্। আমার হাতে কী তাস আছে তুমি জানো?

—নিশ্চয়। শ্যামল বল্‌লে,—তারপর ছোট্ট ঐ তিরি খানা ছেড়ে দাও দিকিন্ এবার।

হাতের তাস মুড়ে ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন: আপনি চুপ করবেন কিনা বলুন।

—নিশ্চয় করবো। শ্যামল কম্বলের তলায় মুখ লুকোলো।

টুকুকে কান্নিক মেরে ঘুরে বসিয়ে দিয়ে রেণু বল্‌লে,—হাতেয় তাস যেন তোর কেউ দেখতে পায় না।

গাড়ি ছুটে চলেছে, খুজব্‌া পার হ'য়ে গেলো।

টুকু আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে বল্‌লে—চারটের খেলা গেছে। লেখ!

—নিশ্চয়, শ্যামল মুখ তুললে: জিতবে না? আলবাৎ জিতবে। কে দেখিয়ে দিয়েছে?

—ছাই দেখিয়ে দিয়েছেন। টুকু আত্মশ্লাঘার এই অপমান কিছুতেই সইলো না: আসুন না নেমে, খেলুন না একহাত—ডাউনে আপনাকে তলিয়ে না দিয়েছি তো কী!

অগ্নি, নৈঋত ও ঈশাণ কোণ থেকে তিনটা বজ্র এক সঙ্গে ত'ার মাথার উপর আছড়ে পড়লো: টুকু, ফের!

টুকু একেবারে টুক্‌রো-টুক্‌রো হ'য়ে গেলো।

সজোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্যামল বল্‌লে,—টুকু, আমরা সতৃষ্ণ নয়নে তোমাদের generationএর দিকেই তাকিয়ে আছি। তোমাদের আতিথ্যের, তোমাদের উদারতার।

এবার রেণু তা'র বিরক্তি-আরক্ত দুই চক্ষু শ্যামলের মুখের উপর নিক্ষেপ করলে। তীক্ষ্ণ ভ্রূভঙ্গিতে সে-দৃষ্টি ছুরির ফলার মতো ধারালো: বাঁকানো ভুরুতে সমস্ত মুখে এসেছে একটা নির্দ্দয় কাঠিন্য: নাকের পাশ দুটো একটু ফুলো, রাগে ঠোঁট দুটো বা একটু কাঁপছে। কাঁধের উপর দিয়ে আঁচলটা সে এত জোরে তুলে দিলে যে ওটার ডগায় চাবি বাঁধা থাকলে ঠিক তার কপালে এসে লাগতো।

না, মেয়েটির এই সঙ্কেত সে মনে-মনে গ্রহণ করলে। বার্থের উপর পাশ ফিরতে ফিরতে বললে.—নাঃ, আমার একেবারে কাণ্ডজ্ঞান নেই। এইবার ঠিক চুপ করলাম। Sure.

চুপ ক'রে রইলো বটে, কিন্তু আগাথা-ক্রিষ্টিতে মন বসলো না। তা'র চেয়ে, যাই বলো, রেণুকে দেখতে অনেক ভালো। উপরে উঠে প্রকৃতির শোভা দেখা যাচ্ছে না ব'লে তা'র আপশোষ নেই, বলতে গেলে প্রকৃতির চেয়ে মানুষ অনেক সুন্দর, এবং আষাঢ়ে যখন নতুন মেঘ নামে তখনকার আকাশের চেহারার চেয়ে মানুষের এই ভ্রূকুটিকুটিল অভিমানম্লান থম্‌থমে মুখখানি কম অপরূপ নয়। এতোদিনের এই দূর প্রবাসের পথে সে অনেক পাহাড় দেখেছে, মরুভূমি দেখেছে, মন্দির দেখেছে—কিন্তু চোখ ভ'রে এতো সৌন্দর্য্য সে কোনোদিন এক জায়গায় এমন স্তূপীকৃত হ'তে দেখিনি। প্রকৃতির প্রাচুর্য্যে এতো সে অভিভূত হ'য়ে ছিলো যে তা'র একটা অনুরূপ শরীরী প্রকাশের কথা এতোদিন সে ভুলেই গেছলো হয়তো। আর টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে দুয়েকটা বিদেশী মেয়েই বা না-কোন সে দেখেছে : কিন্তু বাঙালী মেয়ের মতো কেউ তারা সুন্দরী নয়, অন্তত রেণুর মতো নয়। রেণু প্রকৃতির একটা স্বাদালু কক্‌টেইল্‌ : কপালে তার মরুভূমির রুক্ষতা, চোখে পাড়াগাঁয়ের আকাশময় কালো মেঘের মাধুর্য্য, চুল খুললে নিশ্চয়ই অরণ্যের শিথিল ফিস্‌ফিসানি শোনা যাবে, দু'টি আনগ্ন বাহুতে যেন বিদ্যুতের দীপ্তি ঠিকরে পড়ছে। মেয়েটি এতো অনির্ব্বচনীয় যেন ব্লেইকের কবিতা : কঠিন বাস্তবতার নিরিখে তাকে পরিমাপ করা যাবে না। চুপ ক'রে শুয়ে-শুয়ে শ্যামল এই প্রকৃতি দেখতে লাগ্‌লো, শুনতে লাগলো এই কবিতার গুন্‌গুনানি।

গাড়ি এসে দাঁড়ালো তারপর আলিগড়ে।

তাস তুলে রেখে ভদ্রলোক বল্‌লেন—এবার খাবার-দাবার বন্দোবস্ত করো।

গাড়ি থামতেই গোবরা এসে দর্শন দিয়েছে : নানারকম খেজমৎ খাটতে সে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো।

খাবার-দাবার তা'কে বলে না, অভিধানের প্রতি কোনো সম্মান দেখাতে হ'লে বলতে হয় তা'কে, ভোজ আর ভোজন। সে এক এলাহি কাণ্ড। লম্বাটে প্রকাণ্ড একটা টিনের বাক্সের মধ্যে ভাতে-ডালে, ভাজায়-ডাল্‌নায়, মাছে-মাংসে একেবারে একটা পর্ব্বতপ্রমাণ। তবুও এতে তৃপ্তি নেই। ভদ্রলোক বললেন : চপ ক'খানা ভেজে ফেল, রেণু।

সারা গায়ে শাড়ি মস্‌মসিয়ে রেণু উঠে পড়লো ; বললে,—সেই ঝুড়িটার মধ্যে ডিম ছিলো, মা—আর বিস্কুটের গুঁড়ো ?

মহিলাটি এক ঝাঁক ঝক্‌ঝকে প্লেট বা'র করলেন। বিছানার উপর খবরের কাগজ, অয়েলক্লথ বিছিয়ে প্লেটের উপর ছোট-ছোট হাতায় ভাত বাড়তে লাগলেন। চপ বাড়ি থেকে গ'ড়ে আনা হয়েছে—এখন কেবল টাটকা ভেজে দেয়া। রেণু ষ্টোভ ধরিয়ে কড়ায় ঘি চাপিয়ে দিয়েছে, আর ডিম ঘেঁটে ক্র্যামের সঙ্গে চপ মাখিয়ে ছ্যাঁৎ ক'রে তা'তে দিচ্ছে ছেড়ে। তারপর মুঠিটি গোল করে' ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে তা'র খুন্তি-নাড়ার ঢংটি কী চমৎকার! চপের গড়নটির মতোই নিটোল।

ভদ্রলোকের তর সইছে না, তিনি কখন থেকেই গরস পাকাতে সুরু করেছেন। সিক্ত জিহ্বায় কথা তাঁর কেমন ভারি হ'য়ে উঠেছে: দে রেণু, একখানা পাতে দে চট্ করে',—চেখে দেখি।

শ্যামল আর সম্বরণ করতে পারলে না, গলা খাঁখরে বললে: রেষ্টোর্‍্যাণ্ট-কারএ ফার্ষ্ট-সিটিং কিন্তু হাত্রাস-জংশনে। আপনারা খুব আর্লি-ইটার মনে হচ্ছে।

কারো মুখে আর কোনো কথা নেই—শ্যামলের উপস্থিতি আবার হঠাৎ প্রখর হ'য়ে উঠলো। রেণু একখানা করে' চপ ভেজে আনছে, আর ভদ্রলোক গোগ্রাসে তা সাবাড় করেছেন। তাঁর সঙ্গে দৌড়ে রেণু পেরে উঠছে না। ছেলেটির গুরুপাক খাওয়া বারণ, তাই চপ খাওয়ার রসালো শব্দ কেবল ভদ্রলোকেরই মুখগহ্বর থেকে নির্গত হচ্ছে। মহিলাটি মেয়ের জন্যে বসে' আছেন—রেণু ছুটি পেলে তবে তাঁদের পালা।

অন্ধকারে ঝড় তুলে ট্রেন ছুটে চলেছে—আগে-পাছে সুবিস্তীর্ণ নিস্তব্ধতা, মাঝখানে শুধু ক্ষণকালের কলঝঙ্কার। লাইনের উপর চাকার এই অবিশ্রান্ত ঘূর্ণ্যমানতার মধ্যেও রেণুর হাতের চুড়ির হালকা আওয়াজটি কানে ঠিক ধরা যায়। কালো মোজা ঢুকিয়ে যে তা'র খোঁপা ফাঁপানো হয় নি, মুখের লাবণ্যে যে কোনো-কিছুর মেকি এনামেল নেই, তাতে শ্যামল নিঃসন্দেহ—মুখে তা'র যে-মনের ছায়া পড়েছে সে মন-ও তো শ্যামলের কাঁচা-মিঠে আমের মতোই কাঁচা ও মিঠে মনে হচ্ছিলো, তবে সে-ই বা কেন তাকে এই ভোজনপাত্রের দিকে এতোটুকু ইসারা করছে না?

কিছুর মধ্যে কিছু না, শ্যামল হঠাৎ খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো।

হাসবার যে কারণ কেউ কিছু ঠাহর করতে পারলো না। সবাই ভাবলে কোথায় যেন কী-একটা নিদারুণ রকমের হাস্যাস্পদ ভুল হ'য়ে গেছে। হাসির ধাক্কায় সব চেয়ে বেশি ঘায়েল হ'লো রেণু: তার' বেশ-বাসে কোথাও বিভ্রান্তি, না ব্যবহারে কোথাও মূর্খতা—কী যে হঠাৎ প্রকট হ'য়ে পড়লো ধারে-পারে, তাই সে সন্ত্রস্ত হ'য়ে লাগলো খুঁজতে। কিন্তু না, সব তো যেখানকার যা সেখানেই

আছে, কোথাও কিছু হাসবার মতো ভুলচুক হয়েছে ব'লে তো মনে হয় না।

খানিকবাদে শ্যামল আবার হো-হো-হো ক'রে হেসে উঠলো।

ভদ্রলোক ভাবলেন এ এক নতুন ধরণের monomaniac বোধ হয়, রাত বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে আপন মনে হেসে উঠবারই এর ব্যায়াম। চিন্তিতমুখে ভদ্রলোক জিগগেস করলেন : অমন হাসছেন কেন ?

—আমার একটা গল্প মনে পড়ে' যাচ্ছে। হা-হা-হা।

—কী গল্প ?

—সেই পিরেলি বামুনের গল্প।

—সে আবার কী ?

—শোনেন নি সে-কথা ? ও! ব'লে কনুই দুটো বালিশে চেপে শ্যামল উপুড় হ'লো। তাকিয়ে দেখলে গল্প শোনবার কৌতুহলে সবারই চোখ তা'র মুখে এসে পড়েছে। বললে : শুনুন।

—সেই কোন্ এক নবাবের দরবারে, শ্যামল ঢোক গিলে ফের বলতে লাগলো : এক শাস্ত্রজ্ঞ সৎব্রাহ্মণ ছিলো—মস্ত বড়ো সভাসদ। একদিন তিনি নবাবের দেওয়ানি ই-খাসে ব'সে আছেন, পাশে গো-মাংসের গরম-গরম রান্না হচ্ছে। গন্ধে তাঁর প্রায় নেশা হ'বার জোগাড়। আর থাকতে না পেরে ব্রাহ্মণঠাকুর নবাবকে জিগগেস করলেন : জাঁহাপনা, ওটা কিসের গন্ধ ? নবাব হেসে বললেন : গরু। আর যায় কোথা! সবাই অমনি ব্রাহ্মণকে ছেঁকে ধরলো : আপনার জাত গেছে, বামুন ঠাকুর ; আপনিই বলেছেন আপনাদের শাস্ত্রে আছে 'ঘ্রাণেন অৰ্দ্ধভোজনং'। হা-হা-হা, হো-হো-হো—

ভদ্রলোক চ'টে বল্‌লেন,—ওতে অতো হাসবার কী হয়েছে ?

—বা, হাস্‌বার নেই ? আগের দিনে মাত্র গন্ধ শুঁকেই লোকের জাত যেতো, এখন যা'র-তা'র হাতের রান্না জোর ক'রে খাইয়ে দিলেও আমাদের জাত যায় না। এটা হাস্‌বার কথা নয় ? কারুর রান্না জোর ক'রে খেলেও আমাদের জাত যায় না, এটা হাসবার কথা নয় ? বলেন কী ?

এ পাগলের সঙ্গে প্রলাপের ভাষায় কথাবার্ত্তা চালানো অসম্ভব ও অস্বাস্থ্যকর মনে ক'রে ভদ্রলোক ফের তাঁর খাবারের প্লেটে মুখনিবেশ করলেন। গল্প শুনে কেউ বিশেষ রসগ্রহণ করতে পেরেছে ব'লে মনে হ'লো না—যে যার কাজে অনায়াসে লিপ্ত হয়ে গেলো।

দুত্তোর! এতো বড়ো মোটা ইঙ্গিতটাও যারা বুঝতে পারে না তাদের পরকাল

সম্বন্ধে শ্যামল সবিশেষ সন্দিহান হ'য়ে উঠলো। দেহের ক্ষুধা যখন মিটছে না, তখন আত্মার ক্ষুধা দূর করা ছাড়া আর উপায় কী! দেহের ক্ষুধা মেটাতে পারতো রেণুর হাতের ঐ চপ, আত্মার ক্ষুধা মেটাতে পারে সে নিজে। অগত্যা, রেণুর অশরীরী উপস্থিতি দিয়ে আত্মার নির্জ্জন শূন্যতা ভরিয়ে তুলতে হ'লো। আজমীঢ়ে যাবার পথে ট্রেনের দু'ধারে সেই যে সে অগণন পাহাড় দেখে এসেছিলো—শ্রেণীর পর শ্রেণী, ঢেউয়ের পর ঢেউ—আর তার উপরে সেই চাঁদ উঠেছে,—সেই অরণ্যশ্যামল জ্যোৎস্না-ম্লান নিশুতি দেশের স্বপ্ন রেণুর সর্ব্বাঙ্গে আছে মিশে। সে যে নিপুণা একজন পাচিকামাত্র, এ কথা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।

হঠাৎ, কিছুর মধ্যে কিছু না, সেই শ্যামল ম্লান অরণ্য সূর্য্যাস্ত রশ্মিরেখায় লাল, লেলিহান হ'য়ে উঠলো, রেণুর শাড়িতে লেগেছে আগুন। পাৎলা শাড়ির উপর দিয়ে শতমুখে বিস্তার করলো তা'র শিখা। হওয়ার ঝাপটায় চোখের পলকের মধ্যে সে-আগুন শাড়ির ভাঁজে-ভাঁজে পড়লো ছড়িয়ে।

শ্যামল সেই গায়ে কখন কম্বল মুড়ি দিয়ে প'ড়ে ছিলো,—রেণুর চেঁচিয়ে উঠবার আগে, ভদ্রলোকদের অবহিত হ'বার অবকাশ পর্য্যন্ত না দিয়ে—কম্বলশুদ্ধ সে পড়লো নিচে লাফিয়ে। তা'র লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই গাড়িময় তুমুল চিৎকার সুরু হ'য়ে গেছে। সে চীৎকার রেণুর এই জ্বলন্ত দৃশ্য দেখে, শ্যামলের এই অসতর্ক, অতর্কিত আক্রমণে নয়।

আক্রমণ অতর্কিত বলছি, শ্যামল সেই কম্বল দিয়ে পুরু ক'রে রেণুকে জাপটে ধরেছে। লজ্জা, সম্ভ্রম, অপরিচয় ইত্যাদি ঠুন্‌কো ভদ্র উপসর্গের কথা ভেবে নিজেকে আর সে ধ'রে রাখতে পারলো না। 'বিপদি নিয়মো নাস্তি।' এ-ক্ষেত্রে রেণুর শরীরটাকে আগে রক্ষা ক'রে তবে তা'র অন্যান্য সৌখিনতা।

শ্যামল এমন ক্ষিপ্র হাতে আগুন নেভাতে লাগ্‌লো যেন সে কতোকাল না-জানি ফায়ার-ব্রিগেডে কাজ করেছে। উপরের বার্থে গা-এলিয়ে-দেয়া আর সে পেলব ফুল-বাবুটি নয়, একেবারে একটা আদা-ছোলা-খাওয়া পালোয়ান। রেণুকে সে দরজার ধার থেকে বার্থের প্যাসেজের মধ্যে আনলো টেনে, সারা গায়ে-পিঠে থাবড়া মেরে-মেরে আগুন সে প্রায় তখন নিভিয়ে এনেছে!

ভদ্রলোক হতভম্বের মতো মুখ-চোখ ক'রে বসেছিলেন, হঠাৎ ক্ষিপ্তের মতো লাফিয়ে উঠলেন য়্যালার্ম-চেইন টান্‌তে।

তাঁর মুখের উপর প্রবল কণ্ঠে শ্যামল ধম্‌কে উঠলো: ক্রিমিন্যাল মশাই, ক্রিমিন্যাল। গাড়ির মধ্যে ব'সে আগুন জ্বালিয়ে রান্না করছেন—জান্‌লে যে রেল-

কোম্পানি তক্ষুনি আপনার নামে কেইস্ করবে। পঞ্চাশ টাকা জরিমানা তো দেবেনই, উল্‌টে আবার ক্রিমিন্যাল প্রসিকিউশান্।

ভদ্রলোকের উত্তোলিত হাত আস্তে-আস্তে নেমে এলো।

—হাঁ ক'রে রয়েছেন কী দাঁড়িয়ে? চাবি ঘুরিয়ে ষ্টোভটা নিবিয়ে দিন্—শিগ্‌গির। জান্‌লাটা খুলে রাখতে গেছলেন কেন—কী হাওয়া রে বাবা!

মহিলাটিও এতোক্ষণ ভ্যাব্যাচাকা মেরে গিয়েছিলেন, কিন্তু এই বিপদের সামনে তাঁর বপুটিকে আর আলস্যে প্রশ্রয় দিতে পারলেন না! উঠে প'ড়ে ষ্টোভ নেভালেন, স্পিরিটের বোতলটা ছিলো কাছে—দিলেন সেটাকে বেঞ্চির তলায় ঠেলে, মেঝের উপর স্পিরিট ছিটিয়ে পড়তে যেখানে-যেখানে আগুন তার বিহ্বল নীল জিহ্বা মেলেছিলো, সেখানে-সেখানে দু'পায়ে মারতে লাগলেন লাথি।

আর ভদ্রলোক আজ্ঞাবহনের উৎসাহে কাঠেরই জান্‌লাটা দিলেন তুলে; ব্র্যাকেটের হুকে ঝুলছিলো তাঁর ওভার-কোট আর টুপি, সে দুটোকে নিলেন তিনি তাড়াতাড়ি বুকের মধ্যে গুটিয়ে।

আর রেণু!—রেণু এখনো শ্যামলের বাহুর মধ্যে মোটা কম্বলের আশ্রয়ে। কাঁটা খুলে তার খোঁপা পড়েছে ভেঙে, ভয়ে তার মুখে এসেছে বিবর্ণ পাণ্ডুরতা, ঠোঁট দু'টি শুক্‌নো ফ্যাকাসে, চোখে মিনতির সঙ্গে লজ্জা—শরীরে নেই আর এতোটুকু বশ—যেন এলিয়ে-পড়া লতা, নিজেকে নিজের বহন করবার নেই এতোটুকু জোর।

দেখতে-দেখতে ঘর আবার ঠাণ্ডা হ'য়ে এসেছে,—রেণুর শাড়িতে বা শরীরে নেই আর এককণা শিখা, চারদিকের ত্রস্ত, ব্যস্ত ভাবটা এতোক্ষণে নরম পড়েছে। শ্যামল বুঝতে পারলো, তা'র উপর ভদ্রলোক ও মহিলার সম্মিলিত দৃষ্টির উত্তাপে বুঝতে পারলো, এ-অবস্থায় যে-টুকু সময় তাকে দেয়া যেতে পারতো তার অতিরিক্ত সময় সে রেণুকে রেখেছে বন্দী: ঐ দু'জোড়া চোখের চোখা খোঁচা খেয়ে শ্যামল কিঞ্চিৎ নার্ভাস্ হ'য়ে পড়লো। তাড়াতাড়ি আরো দুয়েকটা মেকি চড়-চাপড় দিয়ে রেণুকে সে দিলো ছেড়ে। জোর ক'রে ছেড়ে না দেয়া পর্য্যন্ত রেণুর যেন আর হুঁস্ হ'তে নেই।

দেখা গেলো আগুনে শাড়ির আঁচলের দিকটাই যা শুধু গেছে, শরীরের উপরে তার কোনো আঁচ পড়ে নি। যদি কিছু-বা প'ড়ে থাকে, তা আগুনের নয়।

সেটা বোঝা গেলো যখন আগুন গেছে সর্ব্বাঙ্গীণ নি'ভে। রেণুর শরীরে তখন লজ্জার রক্তিমা,—লজ্জা, অপরিচিত পুরুষের কাছে অপ্রতিরোধ্য বশ্যতার লজ্জা; রক্তিমা,—সেই পরিপূর্ণ স্পর্শের উত্তরে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদের সুগোপন দীপ্তি।

ভদ্রলোক সবেগে সহসা শ্যামলের দু'হাত চেপে ধরলেন: তোমাকে অনেক

ধন্যবাদ। আর এক মুহূর্ত্ত দেরি করলে হয়তো কী ভীষণ কাণ্ড হ'য়ে যেতো! তোমার প্রেজেন্স্ অফ্ মাইণ্ডকে প্রশংসা করতে হয়।

—তা তো হয়, শ্যামল রুমাল দিয়ে হাতের তালু দুটো ঘস্‌তে-ঘস্‌তে বললে,—কিন্তু ওপরে থেকে সেই যে নামবো না ব'লে আপনারা সরাসরি আমাকে ফতোয়া দিয়েছিলেন, তা মান্‌তে গেলেই হয়েছিলো আর-কী।

ভদ্রমহিলা পরিণাম চিন্তা ক'রে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লেন: উঃ! আমরা তো কেউ দেখতেই পাইনি, উনি ভাগ্যিস বুদ্ধি ক'রে নেমে এসেছিলেন ঝট্ ক'রে। তারপর রেণুকে উঠলেন শাসিয়ে: একেবারে কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। এতো বড়ো হ'লো, এখনো আঁচল সামলাতে শিখলো না।

শ্যামল বল্‌লে,—তখনই বলেছিলাম এ-সব ষ্টোভ-ফোভ্ ধরানো কী মেয়েদের কাজ?

ভদ্রলোক হঠাৎ তার পিঠ চাপড়ে দিলেন: তোমাকে তারিফ না ক'রে পারছি না, বাবা। Bravo.

শ্যামল তা'র হাল্‌কা একটি হাসিতে সম্মতিসূচক সঙ্কেত করলে। তা'র মনে তখন এই চিন্তাই প্রবল হ'য়ে উঠলো যে সংসারে আসলে ভালো-মন্দ ব'লে কাজের কোনো আলাদা ভাগ করা নেই: যা তুমি তা'র নাম দাও, তাই হ'বে কাজের বিশেষণ। ইচ্ছে করলে তা'র এই আগুন নেভানোর কাজকে তুমি নাম দিতে পারো law of gravitation, ইচ্ছে করলে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। উপযুক্ত নামকরণের উপরেই কাজের ভালো-মন্দ নিরূপিত হচ্ছে। অগ্নিদেবতাকে নমস্কার!

—বোসো বাবা, বোসো।

—বস্‌বো তো, শ্যামল ইতস্ততো করতে লাগলো: এঁটো-কাঁটা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যে একাকার ক'রে রেখেছেন। এই নিয়েও আপনার নামে নালিশ করা যেতো। এই নিয়ে চার দফা।

ভদ্রলোক হাস্‌তে-হাস্‌তে এক পাশে তা'র জায়গা ক'রে দিলেন। বল্‌লেন,—কি-কি?

গ্যাট হ'য়ে ব'সে শ্যামল বল্‌লে,—এক, গাড়িতে আগুন করেছিলেন; দুই, আমাকে নিচের বার্থে দশটা পর্য্যন্ত আইনত বসবার অধিকার দেন্ নি; তিন, এই বিচ্ছিরি এঁটো-কাঁটা; চার,—হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে রেণুকে সে সম্বোধন করলে: হাতে-পায়ে কোথাও আপনার ঝল্‌সে যায় নি তো?

রেণুর হ'য়ে উত্তর দিলেন মহিলা: না। তুই শাড়িটা বদ্‌লে আয়, রেণু। যে-বিপদ আজ কাটলো—

—বিপদ ব'লে বিপদ। ভদ্রলোক সপ্রশংস চোখে শ্যামলের দিকে চেয়ে বল্লেন : ব'সে যাও বাবা, তুমিও আমাদের সঙ্গে ব'সে যাও, আর তো তোমাকে পর ভাবতে পারবো না। নে, চট্ ক'রে আয়, রেণু—ঢের হয়েছে, রাশীভূত ভাজা চপের দিকে চেয়ে তিনি বল্লেন,—এতে ঢের হ'য়ে যাবে। তুমিই ততোক্ষণ এঁকে ভাত বেড়ে দাও না।

মহিলা ব্যস্ত হ'য়ে উঠছিলেন, শ্যামল বাধা দিয়ে বললে,—হ'বে খন। পর যখন আর রইলামই না, তখন আর সর্ব্বনাস কেন? একেবারে নাম ধ'রে ডাকলেই তো হয়।

ভদ্রলোক জিগ্গেস করলেন : তোমার নাম?

—শ্যামলকৃষ্ণ—হঠাৎ থেমে গিয়ে উলটে সে-ই ফের প্রশ্ন ক'রে বস্লো : আপনার নাম কী জান্তে পারি?

—বা, জান্বে বৈ কি। আমার নাম অতুলানন্দ বসু, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টে কাজ করি, দিল্লি-সিমলে—হ্যাঁ, তোমার নাম তো পুরো জান্তে পারলুম না।

মুখ গম্ভীর ক'রে শ্যামল বল্লে,—শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ।

—ঘোষ? ভদ্রলোক কতকটা যেন অবাক হ'য়ে গেলেন : তবে বার্থের টিকিটে দেখছিলুম S. K. Ganguli?

শ্যামল যেন হঠাৎ ম্লান হ'য়ে গেলো। মুখের সলজ্জতাটুকু তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বল্লে,—বুকিং-অফিসে ওদের কাছে মাত্র নামের ইনিসিয়েলস্ দিয়ে এসেছিলাম—S. K. G. ওরা ইচ্ছে মতো G-র জায়গায় গাঙ্গুলি বসিয়েছে। তা ওতে আমার আপত্তি নেই।

—বা, কায়স্থের ছেলে শুধু-শুধু বামুন হ'তে যাবে কেন?

—কী আসে যায়? বামুনের ছেলে হ'য়ে কায়স্থ ব'নে যেতেও আমার আপত্তি নেই। দরকার হ'লে বৈদ্যও হ'তে পারবো—G তখন গুপ্ত হ'য়ে যাবে। যাই বলুন আমার পদবীটা খুব elastic—কোথাও আট্কায় না। জাতিভেদ আমি মানি না কিনা, তাই।

গাড়ি এসে সেই মুহূর্ত্তে হাত্রাস-জংশনে দাঁড়ালো। রেণুও অমনি শাড়ি বদ্লে বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে। কথার মোড় গেলো তাই ঘুরে।

ভদ্রলোক যেন মরীয়া হ'য়ে উঠলেন : হ্যাঁ, এই যে রেণু। চট ক'রে ভাত বেড়ে দাও শ্যামলবাবুর। তার পর গিন্নির দিকে মুখ ফিরিয়ে : তোমার সেই আচারের শিশিটা বা'র করো না গো।

শ্যামল নিজেই জায়গা ক'রে কা'র-না-কা'র বিছানার উপর ব'সে পড়লো। স্নিগ্ধ, কুশলী হাতে রেণুই পরিবেষণ করলে। তারপর, পাওয়ামাত্রই চপ একখানা

আস্ত মুখে পু'রে দিয়ে শ্যামল শব্দ ক'রে চিবোতে-চিবোতে বল্‌লে,—আমার নালিশের এই ছিলো চারের দফা। অথচ মজা এই, এই চারের নম্বরের নালিশের জন্যই যা আমি এখন ড্যামেজ্ পাচ্ছি।

তার পর নিষ্পেষিত চপটা গলাধঃকরণ ক'রে গলায় সে আরো খানিকটা জোর পেলো: সারা রাত পাকস্থলীটা কেবল মোচড়ই খাবে ভেবেছিলাম, কিন্তু অন্নদাতা কোথায় যে কা'র খাবার মেপে রাখেন বোঝা দায়। আর এ আপনার ভদ্রতা ক'রে একটু ভাগ দেয়া নয়, দস্তুরমতো নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো। ঈশ্বর সদয় হ'লে কী না হ'তে পারে? ট্রেনের কামরার মধ্যে জ্বল্‌তে পারে ষ্টোভ, ধরতে পারে আগুন। ব'লে নিজেই সে নিজের খুসিতে হেসে উঠলো।

কিন্তু ভদ্রলোকরা লজ্জায় একেবারে নেতিয়ে পড়েছেন। আবহাওয়াটা হঠাৎ যেন কেমন ফিকে হ'য়ে পড়লো।

অন্য কথা পাড়া দরকার: এই যে টুকু, আমাকে অপোনেণ্ট্ ক'রে খেলবে নাকি এক হাত?

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন: এইবার ও ঘুমোবে। রাত-জাগা ওর মোটেই সয় না। আপনাকে আর দু'খানা চপ দেবে? লজ্জা কী।

—আমার আবার লজ্জা! পেটে খিদে রেখে মুখে লাজ যদিই করবো, তবে আর পিরেলি বামুনের গল্প পাড়বো কেন? হ্যাঁ,—মহিলার দিকে চেয়ে: আপনারাও ব'সে পড়ুন না কেন? না, না, আমার আর লাগবে না, খেতে বেশি ভালোবাসি মানে বেশি খেতে ভালোবাসি না। হ্যাঁ, আপনারাও ব'সে যান্। লজ্জা কী! আমি হঠাৎ এমন খেতে না বস্‌লে তো আপনারা স্বচ্ছন্দে কখন সুরু ক'রে দিতেন, আর নেহাৎ খেতে ব'সে এমন-কি আপরাধ করেছি যে আমার সাম্‌নে আপনাদের খাওয়া চল্‌বে না।

মহিলা বল্‌লেন,—আপনাদের আগে হোক্।

—বেশ, তাই। শ্যামল বড়ো-বড়ো গ্রাস তুল্‌তে লাগ্‌লো: আমার এই হ'য়ে গেলো ব'লে। বেশ, তবে আমিই আপনাদের পরিবেষণ করবো, অতিথি-সৎকার করতে গিয়ে যে নিজেদের শেষকালে বঞ্চিত করবেন এ বাড়াবাড়ি কক্‌খনো সইবো না। আর আত্মানং বিদ্ধি নয়, আজকালকার সভ্যতা হচ্ছে আত্মানং ভক্ষয়।

প্রস্তাবটা ভদ্রলোকের ততোটা মনঃপূত হ'লো না; বল্‌লেন—ব'সে যাও না তোমরাও।

রেণু আর তা'র মা শ্যামলের দিক পিছন ক'রে ব'সে মুখব্যাদান করতে লাগ্‌লেন।

ট্রেন তখন টুণ্ডলার দিকে এগিয়ে চলেছে। খাওয়া-দাওয়ার পাট দেখতে-দেখতে চু'কে গেলো। আবার সব সিজিল-মিছিল। রান্না-ঘর নয়, ট্রেনের কামরা।

শ্যামল টুকুর বার্থে উঠে এলো, মেয়েরা ওধারেরটায় গিয়ে বস্‌লেন। মাঝখানে বস্‌লে কী হ'বে, কথায়-বার্তায় রেণুর আর কোনো নাগাল পাওয়ার জো নেই। ওপারে মুখ ফিরিয়ে দু'-একটা খুচরো অবান্তর প্রশ্ন জিগ্‌গেস করতে গেলে গায়ে প'ড়ে মহিলাই উত্তর দিয়ে বসেন—আর এমন সব কাটা-কাটা উত্তর যা'র আর সহজে জের টানা যায় না।

ভদ্রলোক বল্‌লেন,—কদ্দুর যাচ্ছো? কল্‌কাতা?

—না, তা হ'লে তো ভালো হ'তো। যাচ্ছি মোগলসরাই।

—মোগলসরাই? সেখানে কী?

—সেখান থেকে কাশী যাবো।

—কাশী? ও! সেইখেনেই তুমি থাকো বুঝি?

—না, থাকি না, কিন্তু যেতে-আস্‌তে পথে মোগলসরাই পড়লে কাশী একবার আমি নামবোই।

—কেন, সেখানে কেউ আত্মীয়-স্বজন আছে বুঝি তোমার?

—কেউ না। কাশী আমার এমনই খুব ভালো লাগে। শ্যামল পকেট থেকে সিগারেট বা'র করতে যাচ্ছিলো, থেমে প'ড়ে বল্‌লে,—না, খাবো না। কাশী ভালো লাগে মানে ওর গঙ্গা, ওর colour—

মাঝ-পথে লোকটা নেমে যাবে শুনে ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ স্বস্তি বোধ করছিলেন হয়তো, জিগগেস করলেন: কী তুমি করো?

—এইবারই মুস্কিল। পদবীর মতো আমার প্রফেশানটাও ইলেস্‌টিক্‌ নয়। কিছুই করি না। প্রশ্নের তীরক্ষেপ থেকে নিস্তার পাবার জন্যে রসনায় শ্যামল এবার উলটো প্রশ্ন যোজনা করলো: আপনারা কল্‌কাতায় বেড়াতে যাচ্ছেন বুঝি? ছুটিতে? কদ্দিন থাকবেন?

মহিলা হঠাৎ তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ ক'রে উঠ্‌লেন; স্বামীকে লক্ষ্য ক'রে বললেন,—পেটপুজো তো হয়েছে, এইবার শুয়ে পড়ো।

— হ্যাঁ, শ্যামলবাবু, আর কি, এইবার শুয়ে পড়তে হয়।

শ্যামল ক্ষীণ প্রতিবাদ করলো: এখুনি কী? মোটে আটটা এটোয়া আসুক আগে, তখন রিটায়ার করা যাবে।

ভদ্রলোক বললেন,—ট্রেনে একদম রাত জাগতে পারি না কি না, তায় পেটে ভাত পড়তে না-পড়তেই চোখে ঢুল আসলে থাকে।

—তাই আস্থক। তাড়িয়ে যখন দিলেন, আমার তবে একটা লাফ দিতে হয়। শ্যামল উঠে দাঁড়ালো।

সিকোয়াবাদ পেরিয়ে যেতেই যে-যা'র বার্থে টান্‌ হ'য়ে পড়েছে। ভদ্রলোক টেনে-হিঁচড়ে অনেক কষ্টে শরীরটাকে উপরে তুলতে পেরেছেন। তা'র নিচের বার্থে রেণু, মাঝেরটায় টুকু, আর এ-ধারে শ্যামলের নিচেকার বার্থে মহিলা। মুখ ঘুরিয়ে শুলে রেণুকে দেখা যায়—আর কিছু না, তা'র মাথার খোঁপাটা মাত্র। অনেক কসরৎ ক'রে পরে সে এই ভঙ্গিটাতে যেন বিশ্রাম পেয়েছে। সারা গা আগাগোড়া কম্বলে ঢাকা, হাত দু'টি পর্য্যন্ত লুকোনো, চেষ্টা ক'রে যেন সে নিজেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন ক'রে রেখেছে। আর শুতে-শুতেই বুঝি সে ঘুমে ঠাণ্ডা হ'য়ে এলো। সারা রাত আর সে এদিকে কাৎ হ'বে না—তা'র মা'র খাড়া চোখ যেন তাকে পাহারা দিচ্ছে।

শ্যামল বল্‌লে,,—আর কি? সবাই যখন ঘুমুচ্ছি, তখন আলো নিবিয়ে দিই কী বলুন?

প্রখরকণ্ঠে মহিলা আপত্তি করে' উঠলেন: না, না, আলো নেবাতে বারণ করে' দাও। আলো জ্বালা না থাকলে আমার ঘুম আসে না।

ভদ্রলোক বল্‌লেন,—থাক্‌ না আলো। পোকা উড়তে স্থরু করে নি তো?

—থাক্‌। শ্যামল চোখ বুজে মনের ভিতরটা অন্ধকার করতে চাইলো।

আবার তার সঙ্গে সমস্ত সান্নিধ্য গেলো ঘুচে'—পরিচয়ের স্থতো গেলো আলগা হ'য়ে। খেতে চেয়েছিলো, খেতে পেয়েছে—আর-কী!

সে হঠাৎ কামরার শূন্যতাকে সম্ভাষণ করলে: আপনারা সবাই এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?

ভদ্রলোক তাঁর নাকের সাহায্যে একটা দীর্ঘ আপত্তিকর শব্দ করে' উঠলেন।

শ্যামল বল্‌লে—আপনারা কী ভাগ্যবান্‌। শুলেন আর চুপ করে' গেলেন। আমি শুধু তো বক্‌তে থাকি, চুপ করি তো উঠে বসি।

ভদ্রলোক না কথা কয়ে' থাকতে পারলেন না: তবে উঠে বসে' কিছু একটা পড়লেই হয়।

মহিলাটি প্রতিবাদ করে' উঠলেন: না, না, উঠে বসবেন কোথায়? রাত হয়েছে, এখন শুয়ে থাকাই তো উচিত।

—তবে কেউ আপনারা এখনো ঘুমুননি বলুন? শ্যামল হেসে উঠলো: ন'টা মোটে বাজলো, এর মধ্যে কারু ঘুম আসে? টুকু, ঘুমিয়ে পড়েছ? আর, কী-বলে—

ভদ্রলোক খাটো গলায় ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করতে-করতে বল্‌লেন,—মোগলসরাই কতোক্ষণে যে আসবে।

কথাটা ঠিক শ্যামলের কানে পৌঁচেছে। টুপ করে' সে বল্‌লে—সেই ভোরে, রেলোয়ে পাঁচটা সাতান্ন। ভীষণ ভোর, ঠিকমতো জাগতে পারি কি না ভয় হচ্ছে। জাগতে না পারলে শেষকালে কল্‌কাতায় আপনাদেরই ওখানে গিয়ে উঠতে হ'বে আর-কি।

—না, না, কোন ভয় নেই, ঠিক তোমাকে জাগিয়ে দেবো দেখো। ভদ্রলোকের গলায় মিনতি ঝরতে লাগলো: এবার দয়া করে' ঘুমোও। আমাদের চোখের পাতা দুটো এক করতে দাও—আমাদের অনেক উপকার করেছ, আরো একটা না-হয় করলে।

শ্যামল অপ্রতিভ হ'য়ে গেলো: আচ্ছা, আচ্ছা, তা আর বলতে! মোগলসরাইয়ে দয়া করে' আমারো একটা উপকার করবেন যেন। ভুলবেন না।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। একশো বার। ভদ্রলোক 'র‍্যাগ্‌'টা মাথা পর্য্যন্ত টেনে আন্‌লেন।

এটোয়া পার হ'য়ে গেলো, গাড়ি ছুটেছে এবার কানপুরের দিকে। দু'ঘণ্টারো উপরে, কিন্তু শ্যামলের চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই। ঈশ্বর নির্দ্দয় হ'লে কী না হতে পারে! সারা রাত শিয়রের কাছে বাতি জ্বলে, নিচের জানলা থাকে বন্ধ, কানের কাছে গুন্‌গুন্ ক'রে মশা ঘোরে, আর কা'র মুখ দেখতে গিয়ে দেখতে হয় কেবল একটা গম্ভীর খোঁপা।

কানপুর সেণ্ট্রাল্—ভাঙা তন্দ্রার ফাঁকে ফতেপুর থেকে পর্য্যন্ত সে গাড়ি ছাড়তে দেখেছে। তারপর ঘুম এসেছে বিস্মৃতের মতো গাঢ় হ'য়ে—গাড়ির গতিবিধি আর তা'র কিছু মনে নেই।

ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে সে স্বপ্নই দেখছিলো হয়তো, ঘুমের গভীরতায় তা'র রঙ যেন চেতনার উপরতলায় ভেসে উঠতে পারছিলো না। কতোক্ষণ কেটে গেছে কে জানে, কোন্ অতলে সে তলিয়ে যেতো না-জানি' তা'র মাথার উপর কে যেন একখানা শিথিল হাত রেখেছে। সে-ও বোধহয় স্বপ্নেরই একটা ঢেউ। কিন্তু সেই হাত তা'র মাথায় মারতে লাগ্‌লো মৃদু-মৃদু ঠেলা। স্বপ্নের সমুদ্রের উপর জেগে উঠলো হঠাৎ চেতনার চর।

—মোগলসরাই এই এসে যাবে। উঠুন, আর দেরি নেই। নামবেন না? হাত সরিয়ে নিয়ে রেণু জিগ্‌গেস করলে। প্রভাতের প্রথম আভাসটির মতো কণ্ঠস্বরটি তা'র ভীরু, ম্লান, অস্পষ্ট।

শ্যামল চোখ কচ্‌লে চেয়ে দেখ্‌লো—মোগলসরাই কি না নয়, সত্যি-সত্যি স্বপ্নের সেই রেণু কিনা, গত-রাতের সেই রেণু। তা'র স্বপ্নের কুয়াসা এখনো হয় তো চোখে আছে লেগে, কিম্বা সেই রাত এখনো পোহায় নি। আশ্চর্য্য, রাতের সেই রেণু; অথচ রাত্রের সেই রেণুর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। নতুন ভোরের আলোয় তাকে যেন এখন একটু ছোট দেখাচ্ছে, গা-ময় শাড়িটি ঘুমে অগোছালো —এখানে স্তূপীভূত হ'য়ে ওখানে স্বল্প হ'য়ে এসেছে, কপালের কাছে চূর্ণ চুলগুলিতে মুখখানি এখন একেবারে ছেলেমানুষের মতো। সারা রাত যে সে ঘুমুতে পারে নি তা'র জন্যে মুখে একটি কমনীয় কর্কশতা, কখন মোগলসরাই কাছে এসে গেলে শ্যামলকে জাগিয়ে দিতে হ'বে হয়তো-বা তা'রি একটি গোপন ঔৎসুক্য। ভোরের প্রথম ধূসর দিগন্তরেখাটির মতো সে যেন কেমন কুণ্ঠিত।

—ও! হ্যাঁ, মোগলসরাই এসে গেলো? শ্যামল ফিস্‌-ফিস্‌ ক'রে যেন আপন মনে ব'লে উঠলো।

—এখনো আসেনি, এইবার—এর পরের ষ্টেশনেই মোগলসরাই। সিল্কের শাড়ির মতো পাৎলা, স্বচ্ছ অন্ধকারে রেণুর কণ্ঠস্বর মনে হ'লো তা'র শরীরেরই যেন উচ্চারিত সূক্ষ্ম একটি রেখা।

শ্যামল নিঃশব্দে, আস্তে-আস্তে বার্থের উপর মাথা নামিয়ে উঠে বস্‌লো। বললে, —কী ক'রে তুমি জান্‌লে যে এর পরেই মোগলসরাই?

রেণু অসঙ্কোচে বললে,—লোকে ঘুমিয়ে থাকলে কী ক'রে আর জান্‌বে বলুন?

—বা, সারা রাত তুমি ঘুমোওনি নাকি? গলা খাটো ক'রে প্রায় কানে-কানে কথা বলার মতো ক'রে শ্যামল জিগগেস করলে।

চোখের পাতা নামিয়ে রেণু জবাব দিলো: ঘুম না এলে তো আর চোখ দুটোকে মারতে পারি না।

—তবে কী করলে? অন্ধকারে ব'সে-ব'সে ইউ-পি'র দৃশ্য দেখলে বুঝি? কই দেখতে পেলুম না তো।

রেণু সামান্য একটু হাসলো: প্রকৃতির চাইতে টাইম্‌-টেব্‌ল অনেক ইণ্টারেষ্টিঙ্‌ রিডিঙ্‌।

ইংরিজি শুনেই শ্যামলের শাদা চোখে প্রথম ঠাহর হ'লো এটা আর স্বপ্ন নয়। গাড়িতে এখনো আলো থাকলে কী হ'বে, দস্তুরমতো ভোরের আমেজ দিয়েছে। প্রেত বলো আর প্রেতিনীই বলো, মোরগ ডাকতে-না-ডাকতেই সে পিট্‌টান দেবে, ভোরের আলোর কাছে তা'র মুখোস যাবে মিলিয়ে।

এখন চারদিকে ঘন কুয়াসা, শীতের হাওয়া দিয়েছে উত্তুরে, তা'র ভিতর থেকে

পাওয়া যাচ্ছে ভোরের ক্ষীণ চক্ষুরুন্মীলনের আভাস। ব্যস্ত জীবনযাপন করবার কোনো ফাঁকে এমন একটি পরিচ্ছন্ন, নির্মল মুহূর্ত তা'র চোখে উঁকি মারে নি। চোখ মেলেছে কী, অমনি খট্‌খটে রোদ, রুক্ষ নির্লজ্জ স্পষ্টতা। আজকের এ-সময়টি যেন কোনো পরিচিত, প্রত্যক্ষ পৃথিবীর নয়, সে যেন এক ঘুম পরে আরেকটা কোন্ গ্রহে নতুনতরো পরিবেশের মধ্যে এসে পড়েছে। সে-দেশের নতুন রকম ভাষা, নতুন রকম রঙ্, নতুন রকম সব কিছু।

এখন যেন গলা নামিয়ে চুপি-চুপি কথা বলবার সময়, কোনোরকম তাড়াহুড়ো এখন মানাবে না। এখানে গাড়িটা আসলে একটা বিস্ময় বিরাট ঘূর্ণ্যমানতার লৌকিক রূপকমাত্র। আসলে এসে পড়েছে সে তা'র অর্দ্ধসুপ্ত অবচেতনার রাজ্যে যেখানে সমস্ত-কিছু রহস্যে মধুর, অপরিচয়ে প্রচ্ছন্ন, অস্পষ্টতায় অসীম।

শ্যামল তাই কণামাত্র ব্যস্ততা না দেখিয়ে, অতি-নিঃশব্দে, উপরের বার্থ থেকে নেমে এলো, পা টিপে-টিপে চোরের মতো। ওঠবার সময় যে-পরিমাণ লাফ-ঝাঁপ দেখিয়েছিলো এখন দেখাতে হ'লো তারো চেয়ে বেশি কৌশল, কেননা কারুর ঘুম চটিয়ে দেয়ার চাইতে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা ঢের বেশি কঠিন কাজ। গাড়ির চারদিকে সে একবার চেয়ে দেখলে—আর সবাই তখনো ঘুমে বিভোর, ঘুমে প্রায় কাদা বলা যেতে পারে। ঘুমে আর-সবাইর মুখ শুষে-চুপ্‌সে কদাকার হ'য়ে আছে—ঘুমোলে যে মানুষকে কী পাশবিক কুৎসিত দেখায়, আর কখনো-কখনো ভালো ক'রে চোখ ভ'রে ঘুমোতে না পারলে যে কী অপরূপ সুন্দর লাগে, শ্যামল এই প্রথম বুঝতে পারলো। এ এমন একটা সময় যে পরিচিত পৃথিবীর কোনো নিয়ম-কানুনই আর খাটছে না।

শ্যামল নিচে নেমে আসতেই রেণুও বোধকরি তা'র পায়ের নিচে হঠাৎ শুকনো মাটি পেলো—গেলো অমনি সে প্রায় দু' হাত দূরে স'রে। অমনি তার জ্ঞান হ'লো তার মাথার চুল পড়েছে গালে-গলায় গুঁড়ো হ'য়ে। চোখে তা'র ধন্যবাদের ভাষা। সারা শরীরে গাঢ় ক'রে এক পোঁচ লজ্জা বুলিয়ে চেহারাটাকে সে কোনোরকমে ভদ্র করতে চাইলো।

শ্যামল ম্লান হেসে খাটো গলায় অতি-পরিচিতের মতো অন্তরঙ্গ স্বরে বল্‌লে,—আমাকে ঠিক সময়ে যে জাগিয়ে দিলে তা'র জন্যে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। ওভার কেরেড্ হ'লেই হয়েছিলো আর কি! তারপর বৃহৎ একটা ঢোঁক গিলে সে বল্‌লে,—তোমাকে তুমি বল্‌লাম বলে' কিছু মনে করো না যেন। ভাব হ'য়ে যাবার পর তোমার বাবাও আমাকে তুমি বলেছেন। অলক্ষিতে সে এক পা সামনে এগিয়ে এলো হয়তো: তা ছাড়া—তা ছাড়া এমন একটা সময়ে আমরা এসে পড়েছি,

কথাটা কী করে' শেষ করবে বুঝতে না পেরে তাড়াতাড়ি সে বলে' ফেল্লে : যা আমাদের জীবনে কোনোকালে আর আসবে না।

চিবুকের পাশে ছোট টোল ফেলে রেণু একটু হাসলে। বল্‌লে,—আপনার জিনিস-পত্র বাঁধ্‌তে সুরু করে' দিন এবার।

—এতো ব্যস্ত কী। বিষণ্ণ গলায় শ্যামল বল্‌লে,—নামতে তো আমাকে একসময় হ'বেই। তারপর মুখে আবার কোত্থেকে সে হাসি আন্‌লো, যা তা'র স্বাভাবিক দীপ্তি, সহজ প্রসন্নতা : Rather, আমাকে নামিয়ে তো তোমরা দেবেই। ওভার-কেরেড্‌ হ'তে দেবে না বলে'ই তো ঘুমন্ত লোকের ওপর এমন অযথা অত্যাচার করলে।

হাওয়ার বিরুদ্ধে আঁচলটাকে আট্‌কে রেখে রেণু বল্‌লে,—এই দেখুন, গাড়ি কেমন স্লো হ'য়ে এসেছে, এই ষ্টেশনে থামলো বলে'।

—তাই যদি জান্‌তে, তবে আরো আগে জাগিয়ে দাও নি কেন?

—আপনার ঘুমের ব্যাঘাত করে' কী লাভ হ'তো?

—এখন এই জাগরণের ব্যাঘাত করে'ই যেন তোমার খুব লাভ হচ্ছে, না? শ্যামল জোর-গলায় বল্‌লে—আমার ঘুম না এলে আমি তো কক্‌খনো একা জেগে থাকতে পারতুম না। নিশ্চয়ই কাউকে ঠেলে তুলতুম।

রেণু হেসে বল্‌লে,—টুকুকে জাগাবার কথা একবার আমার মনে হয়েছিলো—দু'জনে খানিকটা পেটাপেটি খেলা যেতো।

—সর্ব্বনাশ! ওর যে অসুখ, ওকে জাগাতে কী!

—সেই জন্যেই তো জাগালুম না। তা ছাড়া, একটু স্তব্ধ হ'তেই রেণুর একটি নিশ্বাস শোনা গেলো : তা ছাড়া ঘুম না এলেও মাঝে-মাঝে চোখ বুজে শুয়ে থাকতে বেশ ভালো লাগে।

—হ'বে, শ্যামল গম্ভীর মুখ করে' বল্‌লে,—মেয়েদের কথা আলাদা। তারা জেগে, অথচ চোখ বুজে'ই পড়ে' আছে দেখছি।

খানিকটা টিকোতে-টিকোতে ততোক্ষণে ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছে।

দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে রেণু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠ্‌লো : দেখুন এসে—স্পষ্ট মোগলসরাই। আমার এতোটুকু ভুল হয় নি।

—দাঁড়াও স্ফূর্ত্তিতে এতো উছ্‌লে উঠো না। শ্যামল নিচে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই কষ্টে সৃষ্টে হোল্‌ড-অল্‌টা বাঁধ্‌তে লাগ্‌লো : এই শীতে হি-হি করে' কাঁপ্‌তে-কাঁপ্‌তে আমি নেমে যাবো, তোমার স্ফূর্ত্তি তো হ'বেই। এদিকে চেঁচামেচিতে তোমার বাবা-মা'র যে ঘুমের ব্যাঘাত হতে পারে সে-কথাটা ভেবে দেখেছ?

—বা, রেণুর গলা অভিমানে যেন একটু ভারি হ'য়ে এলো : আপনিই তো বলেছিলেন মোগলসরাই এলে আপনাকে নামিয়ে দিতে। আপনি কাশী যাবেন।

—হ্যাঁ, যখন একবার কথা দিয়েছি তখন আর তা ফিরিয়ে নিই কী ক'রে? শ্যামল ক'ষে' ষ্ট্র্যাপ্ বাঁধতে লাগলো : কাশী আমাকে যেতেই হ'বে—আজই, এই মুহূর্ত্তে। আমাকে কাশীর বিশ্বেশ্বর যে মাথার বিব্যি দিয়ে দিয়েছেন।

রেণু হেসে বললে,—বা, আপনিই তো ওভার-কেরেড হ'লেন না ব'লে আমাকে ধন্যবাদ দিলেন খানিক আগে।

—তোমাকে ধন্যবাদ দেবার জন্য অমন একটা কারণ খুঁজতে হয় নাকি? ষ্ট্র্যাপ পরানো শেষ ক'রে গা-ঝাড়া দিয়ে শ্যামল বললে,—একটু সরো, হোল্ড্-অল্টা নামিয়ে রাখি।

রেণু দরজা ছেড়ে স'রে দাঁড়ালো; বললে,—তবে কাশীই যাবেন ঠিক?

না-গিয়ে আর কী করি বলো? নিঃশব্দে হোলড্-অল্টা এক হাতে নামিয়ে আনতে-আনতে শ্যামল বললে,—এতো কষ্ট ক'রে তুমি যখন জাগিয়ে দিলে, তোমার সম্মানটা তো অন্তত রাখতে হয়। যাই আর না-যাই, এইখানে এই মোগলসরাইয়েই আমাকে নামতে হ'বে। হোল্ড্-অল্টা সে মেঝের উপরে নামিয়ে আন্লো : পুরুষমানুষের কথার এমনিই কঠোর দাম।

রেণু হেসে বললে,—জিনিস নামাবার উৎসাহ দেখে তো মনে হচ্ছে কথার চেয়ে কাজের দামই আপনার বেশি। কাশীতে কোনো কাজ আছে নিশ্চয়ই।

হঠাৎ গাড়ির মধ্যে কিসের একটা শব্দ হ'তেই দু'জনে এক নিমেষে বোবা হ'য়ে গেলো। চমকে চেয়ে দেখলো, কিছু নয়, ঘুমের সুখে ভদ্রলোক হঠাৎ একবার নাক ডাকিয়ে উঠেছেন।

দু' জনের গলা তাই আবার খাদে এলো নেমে। চাপা গলায়, যেন কী গুপ্ত মন্ত্রণা চলছে এমনি সুরে রেণু জিগ্গেস করলে : কাশী যাবার এখন ট্রেন আছে?

—কতো! কথার থেকে শ্যামল ব্যক্তিকে একটু বিচ্ছিন্ন ক'রে নিলো : প্ল্যাটফর্মে খানিক ওয়েইট্ করলেই মিলে যাবে একটা। গাড়ি আসতে বিশেষ দেরি করলে সটান্ একটা বাস্ নেব আর কি।

—বাস্ও আছে নাকি? কাশী এখান থেকে কদ্দূর? দু' হাত তুলে খোঁপায় আলগা কাঁটাগুলি আরেকবার গুঁজতে-গুঁজতে রেণু জিগগেস করলে।

কদ্দূর আর! দশ-এগারো মাইল মোটে। মাঝখানে একটা ষ্টেশন পড়ে—কাশী,

তারপরেই বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট। সেখানে নামলেই সুবিধে। এক নিশ্বাসে শ্যামল অনেক অনাবশ্যক কথা ব'লে ফেললো। তারপর, তুমি কোনদিন কাশী যাওনি বুঝি।

রেণু মুচকে হেসে বললে,—না। কাশী জায়গা কেমন?

—আগে তো ভালোই মনে হ'তো, এবার কি-রকম লাগে, বলতে পারি না। চোখের দৃষ্টি তরল ক'রে শ্যামল জিগ্‌গেস করলে: কাশী দেখতে তোমার ইচ্ছে করে না? এমন তীর্থস্থান, এমন গঙ্গা—কাশীতে তোমার কেউ আত্মীয় নেই?

—আছেন না? পিসিমাই তো আছেন। বাবাকে এবার কতো যেতে লিখ্‌লেন তাঁর ওখানে জায়গা হ'বে না ব'লে বাবা গা-ই করলেন না একদম।

—বা, তোমার একলার জায়গা হ'তে বাধা কী! তোমার পিসিমা থাকেন কোথায়?

—সেই গোধুলিয়া না কী-এক জায়গা আছে। রেণু চঞ্চল হ'য়ে উঠলো: নম্বর-ফম্বর আমি কিছু জানিনে।

—তা আমি ঠিক খুঁজে বা'র করতে পারবো দেখো। কাশী আমার মুখস্থ! চোখে দুষ্টুমির হাসি এনে শ্যামল বললে,—আজ সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই তিনি যদি তোমাকে দেখতে পান, তবে কী খুসিটাই হ'ন বলো তো?

—তা তো হ'ন, রেণুও দুষ্টুমির প্রতিদান দিতে জানে: কিন্তু আপনার একটা কুলি ডাকতে হ'বে না?

হঠাৎ তা'র হাতে একটা আঙুলের ঠোকর দিয়ে শ্যামল বললে,—চুপ।

শ্যামলের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে রেণু দেখলে তা'র মা ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরছেন। নির্ব্বিঘ্নে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেলে শ্যামল আস্তে বললে—না কুলি দিয়ে কী হ'বে? একটা স্যুটকেইস্ আর হোল্‌ড্-অল। কুলি-ফুলি ডাকতে গেলেই গোলমালে এঁদের ঘুম ভেঙে যাবে।

এবার স্যুটকেইস্‌টা নামাতে হয়।

শ্যামল এবার হঠাৎ বেঁকে বসলো। ফিস্‌ফিসিয়ে বললে,—বেমোড়ে ওটা নামাতে গিয়ে একটা আঙুল কেমন চি'পে গেলো, তুমি ও-পাশ থেকে একটু ধরো তো।

পরিষ্কার দাঁতে ঝক্‌ঝক্ হাসি হেসে রেণু বললে,—আমার গায়ে কি ততো জোর আছে?

—জোর নয়, একটা Support, স্যুটকেইসটা বেজায় ভারি, একা পারবো

ব'লে মনে হচ্ছে না। এসো, এখানে থেকে একা নামানো বড়ো অসুবিধে। দেখো, সাবধান।

রেণু হাত তুললো; বল্‌লে,—জোর খাটাতে আমার সব-সময়েই কেমন বিচ্ছিরি লাগে।

—পাগল! জোর না খাটালে এই সংসারে জায়গা পাবে কোথায়? বাঃ, তুমি তো দেখি প্রায় গ্রীক য়্যাটালাণ্টা।

মেঝের উপরে বাক্সটা রেণু ছেড়ে দিতেই শ্যামল জিভ কাটলো: এই, আস্তে। এখুনি ওঁরা জেগে যাবেন যে। চুপ—তোমার বাবা হাই তুলছেন। নাঃ, যাক্।

উদ্বিগ্ন চোখে রেণু জিগ্‌গেস করলে,—গাড়ি, এখানে কতোক্ষণ দাঁড়ায়?

—কতোক্ষণ আর! তুমি আর দাঁড়াতে দিলে কই? তা'র মুখের দিকে চেয়ে পরিপূর্ণ চোখে শ্যামল বল্‌লে,—ঈশ্বরের কৃপণতার কি অন্ত আছে?

—আপনার ঘড়ি কী বলছে? ছাড়তে আর কতোক্ষণ বাকি?

—ঘড়ি বলছে অন্য কথা। ঘড়ি বলছে, যতোক্ষণ সূর্য্য আছে, ধান কেটে নাও। শ্যামল হেসে ফেল্‌লে: তারপর তো সেই অন্ধকার—যে-অন্ধকার আমি কাল রাত্তিরে পেরিয়ে এলাম। জীবনে আর তো তোমার সঙ্গে কোনোদিন দেখা হ'বে না, তাই যাবার আগে আরো খানিকটা সময় গাফিলি করতে ইচ্ছে হচ্ছে। ছাড়বার আগে ষ্টেশনেই তো ঘণ্টা দেবে—আমি মালপত্র নিয়ে ঠিক নেমে যেতে পারবো।

লজ্জিত হ'য়ে রেণু বল্‌লে,—আমি সে-কথা বলছিলাম না। শেষ মুহূর্ত্তে নামতে গেলে যদি কিছু একটা হয়! সঙ্গে আবার কুলি নেই। ঐ একটা যাচ্ছে। হাতের ইসারায় ওকে ডাকবো?

হাতল ঘুরিয়ে দরজাটা খুলে ভিতরের দিকে টানতে-টানতে শ্যামল বল্‌লে,—কুলির তো আর আমার মতো গাফিলি করতে ইচ্ছে হ'বে না। কুলি ডাকলেই তো তা'র পিছু-পিছু ধাওয়া করতে হ'বে। সমস্ত সময়টাই তখন মাটি। ব'লে প্ল্যাটফর্মে নামবার জন্যে সে সিঁড়ির কাছে আস্তে এগিয়ে এলো।

রেণু ধরা গলায়, ম্লান মুখে বল্‌লে,—বা, এখুনি নামছেন কী? এখনো মিনিট তিনেক সময় আছে। ঘণ্টা দেয়নি এখনো!

শ্যামল রেণুর দিকে তখন পিঠ ক'রে দাঁড়িয়েছে। মুখ না ঘুরিয়েই ভারি গলায় বল্‌লে,—না, শেষ মুহূর্ত্তে নামতে গেলে যদি কিছু একটা হয়?

রেণু এলো আরো একটু এগিয়ে। হাসিমুখে, হাল্কা সুরে বললে,—না কিছু

হ'বে না। আমি ওপর থেকে মোটঘাট ঠিক নামিয়ে দিতে পারবো। আপনিই তো আমাকে সেই গ্রীক দেশের লাঠি লণ্ঠন না কী ব'লে সার্টিফিকেট দিলেন।

শ্যামল এক পা প্ল্যাটফর্মের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে,—কী দরকার! জীবনে যখন আর আমাদের দেখা হ'বে না।

—ওটা কিন্তু আমার কথা নয়। রেণু বললে,—কিন্তু জীবনসম্বন্ধে আপনি কি একজন অথরিটি? তারপর আবার হাল্কা সুরে, হাসিমুখে, চোখের পাতার উপর থেকে বিচ্ছিন্ন চুলের দুটো গুচ্ছ সরাতে-সরাতে: তাতে কী, নাই বা হোলো, দেখা না-ই বা হোলো কোনো দিন! তারপর আঁচলে শরীরটাকে সঙ্কীর্ণ ক'রে বললে,—উঃ, ভীষণ শীত করছে ভোর বেলাটা! আপনার কম্বলটা পর্য্যন্ত হোল্ড্-অল্এ পুরে রেখেছেন। গায়ে মোটে পাৎলা একটা সিল্ক। এই শীত সইছেন কী ক'রে?

—হ্যাঁ, চর্ম্মচক্ষুতে গায়ের চামড়াই তো খালি তোমরা দেখ। শ্যামল সিঁড়ির উপরেই আবার তা'র দিকে ঘুরে দাঁড়ালো: আর কিছু দেখবার কি তোমাদের চোখ আছে?

—তা তো নেই, কিন্তু মোগলসরাইয়ে নিশ্চয় ভালো রিফ্রেসমেণ্ট-রুম আছে। পরিষ্কার দাঁতে ঝক্ঝকে হাসি হেসে রেণু বললে,—কাশীর ট্রেন ছাড়তে দেরি দেখলে চা-ফা খেয়ে নেবেন যেন। এখন চা কী চমৎকার!

—তোমরা তো এখুনি দোকান সাজিয়ে ব'সে যাবে, না? আমি এবার সঙ্গে থাকলে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হতুম না। তুমি অন্তত করুণা করতে।

—আমাদের সঙ্গে কিছু কচুর মুড়কি ছিলো, রেণু সামান্য চঞ্চল হ'য়ে বললে,—যদি কিছু না মনে করেন, আপনাকে দেবো এক কৌটো? চায়ের সঙ্গে ফাইন লাগবে দেখবেন।

—সর্ব্বনাশ, গার্ড-সাহেব ঐ হুইস্ল্ দিচ্ছেন। ব'লে ক্ষিপ্র পায়ে শ্যামল পড়লো নেমে: দাও, দাও, ঠেলে দাও ও-দুটো, কুইক্।

তা'কে অমন একটা কসরৎ করতে দেখে না-ব'লে-ক'য়ে একটা কুলি ছুটে এলো। আর হাঙ্গামা নেই।

নিচু হ'য়ে মাল এগিয়ে দিতে রেণুর খোঁপা গিয়েছিলো ভেঙে, গায়ের আঁচল পড়েছিলো মেঝের উপর লুটিয়ে। নিশ্বাস হয়েছিলো ঘন, মুখে পরিশ্রমের সব্রীড় রক্তিমা: ব্যস্ত হ'য়ে সোজা দাঁড়িয়ে দুই হাতে সে খোঁপা ও আঁচল পাট করতে লাগলো। চেয়ে দেখলো শ্যামল আর তা'র সঙ্গে সমতল জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই।

হঠাৎ তাঁর বার্থে ভদ্রলোক গা ভেঙে গলা ছেড়ে ডেকে উঠলেন: কই হে মোগলসরাই-যানে-ওয়ালা! নেমে পড়ো চট্পট্। ভোর হ'য়ে গেলো যে। তারপর

চোখ কচ্‌লে তিনি প্রায় ধড়মড় ক'রে উঠে বসতে গেলেন, মুখ দিয়ে বিস্মিত কাতরোক্তির মতো একটা শব্দ বেরিয়ে এলো।

গার্ড-সাহেব সবুজ নিশান তুলিয়েছেন। এঞ্জিনটা অন্তর্বাষ্পে ফুঁসে উঠেছে।

শ্যামল হঠাৎ দরজার কাছে ঘেঁসে এলো। খোলা দরজা দিয়ে সহাস্যমুখে রেণুর দিকে হঠাৎ তা'র ডা'ন হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে অস্ফুট গলায় বল্‌লে,—জীবনে আর যখন আমাদের দেখা হ'বে না—

প্রসারিত হাত যেন নিয়ে এলো বন্ধুতার সঙ্কেত। ওদিকে বাবা উঠেছেন জেগে, রাজ্যের লজ্জা যেন তা'কে গ্রাস ক'রে বসেছে। এক মুহূর্ত্ত আরো হয়তো সে দ্বিধা করতো; কিন্তু গাড়িতে হঠাৎ টান পড়তেই রেণু আচম্‌কা শ্যামলের সেই প্রসারিত হাত মুঠো ক'রে ধ'রে ফেললো।

একটি মাত্র মুহূর্ত্ত। সময়ের সমুদ্রে কোথা থেকে একটি দ্বীপ উঠলো ভেসে।

শ্যামল রেণুকে নিচে আকর্ষণ করছে, না, রেণুই বলছে শ্যামলকে উপরে উঠে আসতে ঠিক বোঝা গেলো না।

তার পর গাড়িতে একটু বেগ দিতেই হাতের ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেলো।

শ্যামল চেয়ে দেখলো খোলা দরজাটা না ঠেলে দিয়েই রেণু বাইরের শূন্যতার দিকে চেয়ে আছে। পেছন থেকে তা'র বাবা কোনো আপত্তি করছেন কি না সে-দিকে তা'র বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই। তা'র উদাস দুই চক্ষুতে যেন সেই প্রশ্ন : জীবনে যখন আর আমাদের কোনোদিন দেখা-ই হ'বে না—

শ্যামল হঠাৎ অনুভব করলো তা'র দেহ-মনের সমস্ত বাঁধন যেন আল্‌গা হ'য়ে যাচ্ছে। পায়ের তলায় তা'র মাটির যেটুকু সঙ্কীর্ণ আশ্রয়, তা যাচ্ছে সরে', তা'র প্রতি কারো যেন কোনো সহানুভূতি নেই।

ট্রেন তখনো প্ল্যাটফর্ম ছাড়ায়নি, শ্যামল হঠাৎ ছুট দিলে প্ল্যাটফর্ম ধরে', উর্দ্ধশ্বাসে। কামরার জাগ্রত যাত্রীরা সবাই হৈ-হৈ করে' উঠলো, কেউ ভাবলে ট্রেন ধরতে তা'র দেরি হ'য়ে গেছে বুঝি, তা'কে টেনে তোলবার জন্যে কেউ বাড়িয়ে দিলো হাত; কেউ ব্যাকুল হ'য়ে জিগগেস করলে : কী ফেলে গেছেন মশাই? হ'লো কী?

কোনোদিকে লক্ষ্য না ক'রে শ্যামল সোজা ছুটে চল্‌লো। খালি একবার চেয়ে দেখলো রেণুও তখনো দরজা ছাড়ে নি। তা'র সেই আঁচল উড়ছে, দরজার উপরে তা'র একখানি সেই সুগোল, নিটোল হাত তেমনি রয়েছে এলিয়ে।

প্রায় ধ'রে ফেল্‌লো সে রেণুদের কামরা।

—শিগগির, শিগগির। কল্‌কাতায় তোমার ঠিকানা কি, শিগগির বলো। আমি কী ইডিয়ট্‌! এতোক্ষণে এই আসল কথাটাই জানা হয় নি। গাড়ির সঙ্গে প্ল্যাটফর্ম ধ'রে ছুটতে-ছুটতে শ্যামল চেঁচাতে সুরু করেছে: ভীষণ হাওয়া। জোরে বলো, আরো জোরে! আমি কালকের ট্রেনেই কল্‌কাতা ফিরবো যে। কতো নম্বর বল্‌লে? চেঁচিয়ে বলো, শুনতে পাচ্ছি না। সতেরোর এক? কী, সাতাশো-এ? আর রাস্তা? রাস্তা? রাস্তার নাম?

—•—

তুমি আর আমি

এক

ন্যাকড়ার ফালি ছিঁড়ে পায়ের উপর রেখে, তারপর দু'পাশ দিয়ে হাতের তালু দু'টো চালিয়ে পিসিমা সল্‌তে পাকাচ্ছিলেন। বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি, মাথার চুলগুলি ছোট-ছোট ক'রে ছাঁটা, ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার দাঁত, সব অটুট, নিটোল নিরেট বাঁশের মতো আঁটসাট বাঁধুনি। সারা গা বেয়ে খুসি তাঁর এখনো উপচে পড়ছে।

সিতাংশু তাঁকে বল্‌তো : আচ্ছা পিসিমা, তুমি যখন বিধবা হয়েছিলে, তখন তোমার বয়েস কতো?

পিসিমা হেসে বল্‌তেন : আজকালকার মেয়েরা যে-বয়সে স্কিপ করে। এগারোয় সবে পা দিয়েছি হয়তো। দেখতে-দেখতে দিন-কাল কি-রকম বদলে গেছে। আজকালকার মেয়েরা একা-একা হ্যাণ্ডেল্ ধ'রে ট্রামের ওপর লাফিয়ে ওঠে।

সিতাংশু জিগ্‌গেস করতো : পিসেমশাইকে তোমার মনে পড়ে?

নিচের ঠোঁট উল্‌টিয়ে পিসিমা বল্‌তেন : ছাই।

তারপর কি ভেবে হেসে গড়িয়ে পড়তেন : তখন কি বোকাই যে ছিলাম। একেবারে আস্ত একটি কাঠ।

—কি রকম?

—বিয়ের রাতে—বাসর তখন উঠে গেছে—দু'জনে মুখোমুখি শুয়েছি। তোর পিসেমশাই আমার থুৎনিটা ধ'রে জিগগেস করলেন : হ্যাঁ খুকি, তোমার নাম কি? ঘেন্নায় ঘাড় ফিরিয়ে মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে বল্‌লাম : আ মর। বিয়ের রাতে বৌর সঙ্গে সোয়ামি আবার কথা কয় নাকি?

বলে' হাসতে-হাসতে তিনিই পড়তেন ভেঙে। তারপর হাসি থামলে চোখের জল মুছে : বেচারাকে সারা রাত একটি কথাও বলতে দিলাম না।

সিতাংশু বলতো : পিসেমশাইর জন্যে তোমার কষ্ট হয় না?

—কষ্ট? কষ্ট হ'বে কোন্ দুঃখে? খাওয়ালো না, পরালো না,—গরিব বাপ-মা দু'-হাতে দু'-গাছ শাঁখা দিয়েছিলো, তা-ও কিনা নিয়ে গেলো। ওঁর জন্যে আবার কষ্ট হ'বে! এই দিব্যি আছি।

পূজো-আচ্চা, ব্রত-স্বস্ত্যয়ন, গয়া-কাশী—এই খালি লেগে আছে। বলেন : এ-সংসারেই বা মন আমার টিঁকবে কেন? তিন বছর বিয়ে হ'লো, এখনো বৌর কোল জুড়ে একটি চাঁদ উঠলো না। এ যে তোদের কী ফ্যাসান হয়েছে—একটি ছেলে হ'লেই যেন ঘর-সংসার রসাতলে গেলো।

ঘরের ভিতর থেকে স্বভা বলে : তোমার পুজোর ঘরেই তো অনেক পুতুল আছে।

—সে সব পুতুল যে সাড়া দেয় না, পোড়ারমুখি।

—সাড়া যেমন দেয় না, উৎপাতও করে না। বোবার মতো চুপ ক'রে ব'সে থেকে নেহাৎই তোমাকে পুজো করতে দেয়। ব'লে হাসতে-হাসতে স্বভা বারান্দায় বেরিয়ে আসে।

স্বভাকে এবার আমরা দেখতে পেলাম।

দীর্ঘাঙ্গী, পাতলা, ছিপছিপে মেয়েটি। গায়ের রঙ, হ্যাঁ, কালোই বলা যায়, কিন্তু পাথরের মতো ঠাণ্ডা ও মেঘের মতো নরম সেই কালো রঙ। চিবুকটি ছোট ও দৃঢ়, নাকটি ডাঁটালো ও তীক্ষ্ণ, আর চোখ দু'টি যেমন গভীর, তেমনি বিশাল। হাতের যেমন ডৌল, পায়ের তেমনি লীলা। দেহের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে উজ্জ্বল একটি ক্ষিপ্রতা ভারি সুন্দর খাপ খেয়েছে। তার গায়ের রঙ, হ্যাঁ, কালো না হ'লে সত্যি তাকে মানাতো না।

আর হাসি তার কথায়-কথায়, কারণে অকারণে। সে-হাসি সশব্দ, প্রাণবন্ত। যখন সে ঘুমোয়, তখনো তার ঠোঁটের উপর—ফুর্‌ফুরে, তুলতুলে, টসটসে ঠোঁটের উপর—একটি ছোট্ট হাসি ঘুমিয়ে থাকে।

আর সে যখন জেগে থাকে, তখন খালি দেখি তার চঞ্চল ও সুদূরসন্ধিৎসু দু'টি চোখ—চোখে মদিরা ও মোহ, আঘাত ও অভয়, কাঠিন্য ও করুণা।

আগে তার নাম ছিলো শুভা।

কিন্তু সিতাংশু বলে : আমি কল্যাণের চেয়ে দীপ্তি পছন্দ করি।

স্বভা হেসে উত্তর দেয় : আমি শৈত্যের চেয়ে পছন্দ করি শুভ্রতা।

অতএব শীতাংশুও সিতাংশু হ'য়ে ওঠে।

কিন্তু যে-কথা বলছিলাম—

তারো আগে কিছু বলা দরকার :

মানে, বাড়িটা যে দোতলা, উপরে তিনখানা ঘর এক-লাইনে ; একখানা শোবার, একখানা ব'সে পড়া-শোনা করবার, সব চেয়ে ছোট বাকি আরেকখানা কাপড় ছাড়বার বা শুদ্ধ ক'রে ড্রেস্ করবার,—তিনখানা ঘর ছুঁয়ে টানা, বন্ধ একটি বারান্দা - খোলা দক্ষিণের দিকে প্রকাণ্ড তিনটে জানলা ; নিচেও তেমনি তিনখানি ঘর—রাস্তার দিকে নামমাত্র একটি বৈঠকখানা, সিতাংশু সকালে সেখানে খবরের কাগজ পড়ে, চা খায়, বিকেলে বন্ধুদের নিয়ে খেলে তাস, মাঝেরটা ভাঁড়ার, এ-পাশেরটা পিসিমার শোবার, পুজো করবার, তরকারি কুটবার।

এ আর বিশেষ আশ্চর্য্য কি ! মামুলি, ছোট একটি সংসার।

কিন্তু আশ্চর্য্যের হচ্ছে দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছোট এক-টুক্‌রো মাটির উঠোন—কাঁচা, নরম মাটির। এঃধারের কল-চৌবাচ্চাটা বে-আব্রু, তারই কাছে বাঁকানো ডাল-পালা-মেলা একটা পেয়ারা গাছ, কতো দিন থেকে রঙ-ওঠা একটা ঘুড়ি তাতে আটকে আছে। উঠোন থেকে ঘরে ওঠবার রোয়াকটুকুর গায়ে দু'টি পাতাবাহারের গাছ, হলদে স্বর্ণলতায় আচ্ছন্ন। পিসিমা বলেন : মাটিতে পা রেখে গা জুড়োলো, বাবা।

মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে উঠোনের একধারে তিনি বেগুন লাগান—ধনে-শাক আর পালং-শাক ; মাঁচা বেঁধে পুঁইর ডগা লতিয়ে দেন আর ধুঁধুলের ; শীতের দিনে গাঁদার চারা পোঁতেন। দূর গ্রাম্য জীবনের আবছা একটুখানি আমেজ পাওয়া যায়।

এই উঠোনটুকুতেই চেয়ার পেড়ে এনে সিতাংশু আর সুভা বিকেল বেলা চা খায়, গ্রীষ্মের রাতে ছাদে না গিয়ে এইখানেই পাটি বিছিয়ে তারা গল্প করে।

সে-সব গল্প নিতান্তই আমাকে-তোমাকে নিয়ে।

তারপর, ও-ধারে যে পাল্লা-খাটানো বন্ধ একটা কলতলা আছে ও আমিষ-নিরিমিষ দু'টো রান্নাঘর,—দরকার হ'লে সিঁড়ির তলায়ো যে চাকর-বাকরের জায়গা করা যেতে পারে, আপাততো সেখানে ঘুঁটের পাহাড়,—বাইরের কল খুললে যে ভিতরের কলে জল আসে না ও তাই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে যে মাঝে-মাঝে ঝগড়া বাধে—এ সব না বললেও বিশেষ ক্ষতি নেই।

আর সিতাংশু যে সহরের কোনো কলেজে প্রফেসারি করে, সে-খবর তো আমরা যথাস্থানেই শুনতে পেতাম। বয়েস যে তার উনত্রিশ-ত্রিশের বেশি নয়, সুভাকে দেখে তা-ও আমরা আঁচ করেছি। মাইনে কতো পায় দয়া ক'রে তা আর বলতে হ'বে না। বেনামিতে তার নোট ছাপবার খবর আমরা পেয়েছি ; আই-এর ছাত্র-ছাত্রীদের সে ইংরিজির কাগজ দেখে ও পারতপক্ষে গোপনে মেয়েদেরই একটু বেশী নম্বর সে দিয়ে থাকে। তাতে কী বা এমন যায়-আসে।

কিন্তু ব্যাপার তা নয়।

হ্যাঁ, যা বল্‌ছিলাম।

দোতলার বন্ধ বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে' পিসিমা সল্‌তে পাকাচ্ছেন। আর নিজের মনেই বলছেন : জিনিসগুলো আর এলো না।

সুভা খানিকক্ষণ আগে জেগেছে। মানে, খেয়ে-দেয়ে দুপুরে সে একটু ঘুমোয়। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলো আজ অনেক আগেই উঠে পড়েছে, এখন মোটে

আড়াইটে। আজ শুক্রবার—সিতাংশুর চারটে পঁয়তাল্লিশ পর্য্যন্ত ক্লাশ। অনায়াসে আরো খানিকটা ঘুমিয়ে নেয়া যেতো। কিন্তু কি জানি কেন কিছুতেই গা-ঢালা ঘুম এলো না। আশ্চর্য্য।

সুভা ছাদে উঠে শুকোতে-দেয়া কাপড়গুলি পেড়ে প্রথম শোবার ঘরের খাটের উপর জড়ো করলে। পরে বাঁ-হাতের আঙুল ক'টি লতিয়ে-লতিয়ে কাপড় কুচোতে লাগলো।

সামান্য আতপ-চিঁড়ে ও কুল-চুরের জন্যে তিন দিন থেকে পিসিমা কেন যে এমনি অস্বস্তি প্রকাশ করছেন বোঝা কঠিন।

পিসিমা বললেন,—দেখতে সামান্য বলে'ই সামান্য নয়, বৌমা। গরিব ননদ—এর চেয়ে বেশি আর কিছু দিতে পারেন নি। সঙ্গতি পেলেই মায়ের পেটের ভাইয়ের বোয়ের জন্যে কিছু-না-কিছু তাঁর পাঠানো চাই।

সুভা দরজার সামনে এসে বললে,—কিন্তু যার সঙ্গে পাঠিয়েছেন, সে নিশ্চয়ই তা দিয়ে দিব্যি জলযোগ করেছে। চিঠি এসেছে তশু´, অথচ জিনিস নিয়ে লোক এখনো পৌঁছুলো না। কা'র সঙ্গে পাঠিয়েছে?

অমনি বাইরের দরজায় কড়া ন'ড়ে উঠলো।

পিসিমা চট্ ক'রে দাঁড়িয়ে পড়লেন: বলতে-বলতেই এসে পড়লো বুঝি। বাঁচবে বহুদিন।

কিন্তু জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখা গেলো মাথায় একটা ডালা ও তার উপর এক বস্তা পুরোনো কাপড় চাপিয়ে বাসনউলি সুর ক'রে প্রশ্ন করছে: বাসন নেবে গো? তোমার সেই পেতলের গামলা এনেছিলাম।

পিসিমা বললেন,—না বাছা, আজ নয়।

জলের বাটি ও ছেঁড়া ন্যাকড়ার ফালি নিয়ে পিসিমা ফের বসলেন বটে, অমনি আবার কড়া ন'ড়ে উঠলো।

এবার চাকর। পোষ্টাপিস থেকে দেশে মনি-অর্ডার ক'রে ফিরছে।

—না, দু' দণ্ড নিরিবিলিতে বসবার জো নেই। মাল-মশলা নিয়ে পিসিমা নিচে নেমে গেলেন। কাজের তাঁর কি বিরাম আছে? কুলোয় ক'রে তক্ষুনি লেগেছেন আবার খইয়ের ধান বাছতে।

সুভা ঘুরে-ঘুরে ঘর ঝাঁট দিলে, আলনা গুছোলো, টেব্‌ল্ পরিষ্কার করলো। এবার পরিপাটি ক'রে দু'-দু'টো বিছানা পাতছে।

পিসিমা বাইরের উঠোনে কা'র সঙ্গে যেন কথা কইছেন।

জিনিস নিয়ে সেই লোক এতোক্ষণে এলো বুঝি। নিশ্চয়।

উঁকি মেরে দেখবার জন্যে সুভা বারান্দার জানালায় এসে দাঁড়ালো। পিসিমারা ততোক্ষণে ভিতরে চ'লে এসেছে।

আগে কি কথা হয়েছে সুভা শুনতে পায় নি। কিন্তু এখন সিঁড়ি দিয়ে দু' ধাপ নিচে নেমে না-আসা তার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠলো।

পিসিমা বলছেন: তোমাকে সেই কতোটুকু দেখেছি। কী করো আজকাল?

—আর কেন বলেন? ওকালতি।

—কোথায়?

—এই আলিপুরে নাম একটা লিখিয়ে রেখেছি মাত্র।

—কেমন হচ্ছে?

—চেহারা দেখে চট্ ক'রে কিছু বুঝতে পারবেন না। কিন্তু গেলো-মাসের ট্র্যাম-ভাড়াটাও উঠে আসে নি।

সুভা আরো এক ধাপ নামলো।

পিসিমা বল্লেন,—তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এসো, ওপরে এসো।

—না, আমি এখন যাই।

এতো বড়ো সম্ভ্রান্ত উকিল হ'য়ে জিনিসগুলি নিজে ব'য়ে না আনলেই তো সে পারতো। তারপর বাইরে যা রোদ।

সুকুমার চলে'ই হয়তো যেতো। তা হ'লে এ গল্পও আর লিখতে হ'তো না।

কিন্তু পিসিমা বললেন,—সে কী কথা! চা খেয়ে যাও।

—এই মাত্র খেয়ে আসছি।

আরো এক ধাপ। কিন্তু নামতে হ'লে এতো কুণ্ঠিত হ'য়ে নামবার কী হয়েছে! সাড়িটা বদলানো উচিত ছিলো না? গৃহস্থের বৌ,—ঘরের মধ্যে কে কবে সেজে-গুজে বিবি হ'য়ে ব'সে থাকে? কিসের ভয়?

—না, না, তুমি বোসো। রোদ্দুরে মুখ তোমার শুকিয়ে গেছে একেবারে। বাড়ি চিনতে খুব ঘুরতে হয়েছিলো নাকি? ব'লে পিসিমা ডাকলেন: বৌমা।

দুই

বৌমাকে ডাকবার কোনো দরকার ছিল না। গল্প আমাদের আগেই সুরু হ'য়ে গেছে।

সুভা তর্‌তর্ ক'রে নেমে এলো। এবং কিছুই যেন হয় নি, হ'তে পারে না,

এমনি সহজ হ'বার চেষ্টায়—সুকুমারকে, না পাশের দেয়ালকে ঠিক বোঝা গেলো না—জিগগেস করলে : তুমি নাকি ? ওপর থেকে আমি ঠিক আওয়াজ পেয়েছি কিন্তু।

পিসিমা বললেন,—সুকুমারকে তুমি আগেই চিনতে বুঝি ?

—চিনতাম না ? রাজবল্লভ স্ট্রীটএ আমার বাপের বাড়ির পাশেই যে ওঁরা থাকতেন, ছেলেবেলা থেকে চেনাশুনো। তোমরা কি এখনো সেই সতেরো নম্বরেই আছো নাকি ?

এক নিমেষের জন্যে। সুকুমার প্রায় সামলে উঠেছে। কিন্তু সুভার মুখের দিকে সহজে সে তাকাতে পারছে না। মেঝের উপর চোখ রেখে নির্লিপ্তের মতো বল্‌লে,—না। সে-বাড়ি কবে বদলেছি।

—আমার দাদারাও এখন দেশ ছেড়ে কাছেই রিচি রোডে উঠে এসেছেন। এখন কোথায় আছো ?

একটু হেসে সুকুমার বল্‌লে,—এই এখানে-সেখানে—

পিসিমা বল্‌লেন,—চা না খেয়েই পালাচ্ছিলো। ওকে ওপরে নিয়ে যাও, বৌমা। জলুয়াকে বলো না-হয় উনুনে আগুন দিক্।

সুভা বললে,—ওপরে তো ষ্টোভই আছে। চা আমি দু' মিনিটে ক'রে দিচ্ছি।

তারপর যন্ত্রচালিতের মতো সুকুমারকে বললে,—এসো।

সুকুমার পিসিমার ঘরে তক্তপোষের উপর সেই যে চেপে বসেছে, আর তার ওঠবার নাম নেই। এখান থেকে ছুটে পালাতে পারলেই সে বাঁচে। কিন্তু এ বাড়ির বাইরে সম্প্রতি কোথায় যে তার যাবার জায়গা থাকতে পারে সহসা সে ভেবে পেলো না।

সুভা হেসে বল্‌লে,—এসো ওপরে। ওপরে কেউ নেই।

সুকুমার মুখ তুলে চাইতেই সুভা লুকিয়ে একটু লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লে,—মানে মেয়েছেলে বলতে বাড়িতে একমাত্র আমিই। অপরিচিত তোমাকে দেখে কারুর সন্ত্রস্ত হ'বার কারণ নেই। এসো।

সুকুমার রুমাল দিয়ে সমানে ঘাড়ের ঘাম মুছ্‌ছে।

সুভা বল্‌লে,—ভারি গরম পড়েছে ক'দিন থেকে।

—হ্যাঁ, এ ঘরটা তো আরো গুমোট। পিসিমা জিনিসগুলির বাঁধন আলগা করছেন : ওপরেই যাও।

অগত্যা উপরেই যেতে হ'বে। সামনেই সিঁড়ি। অনেকগুলি ধাপ উঁচুতে উঠে গিয়ে সুভা স্মিতমুখে বলছে : এই যে এ-দিকে।

সুকুমারকে সুভা একেবারে শোবার ঘরে নিয়ে এলো। চেয়ার একটা এগিয়ে দিয়ে বললে,—বোসো। জানালাটা খুলে দি। একটা পাখা দেবো? ব'লে সে মশারির চাল হাতড়াতে লাগলো।

শুকনো গলায় সুকুমার বললে,—না, দরকার নেই।

সুকুমারের চোখে সুভাদের এই শোবার ঘরটি আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। ঘরটি বেশ বড়োই। দু'-ধারে দু'খানি খাট পাতা—নিচু, ছোট খাট : একজনের মতো ক'রে বিছানা—নরম, তক্‌তকে বিছানা। বালিসগুলো যেন রাশীভূত সাবানের ফেনার মতো ফু'লে আছে। মাঝে একটি টিপাই,—সিল্কের ঢাকনি : তার উপরে ফুলদানি একটা পেতলের, সম্প্রতি তা'তে ফুল নেই। টিপাইয়ের উপরেই ষ্ট্যাণ্ডে কা'র একটি ফোটো—কিন্তু সুকুমার তা দেখতে পাচ্ছে না ব'লে আমরাও পাচ্ছি না।

দেয়ালের দিকে যে একটা আল্‌না, তার গা ঘেঁসে পর-পর তিনটে স্যুটকেস ও উত্তরের জানলা বাঁচিয়ে প্রকাণ্ড একটা আলমারি—দরজার একটা পাল্লায় পুরু কাচ—এ-সব চোখে পড়ে বটে, কিন্তু এ-সব দেখবার মতো কিছু নয়।

আর, সুভার চোখে সুকুমারকেও আমরা দেখতে পেলাম।

আগের চেয়ে একটু শুকিয়েছে মনে হয়। কিন্তু দিব্যি তেজালো বলতে হ'বে। চেহারায় ও জামা-কাপড়ে সেই আভিজাত্য ও সুরুচি এতোটুকু কমে নি। কপালটা অনেকখানি, ঠোঁট দু'টো চাপা, চোখের দৃষ্টিটা তেমনি ধারালো, চামড়া ফু'ড়ে যেন একেবারে হাড়ে এসে বেঁধে। তবু কোথায় কি-একটা পরিবর্ত্তন সুভা লক্ষ্য করছে। গোঁফ? গোঁফ তো বরাবরই সে কামাতো। গাম্ভীর্য্য? এতো দিন পরে এমন অবস্থায় দেখা হ'লে কে কবে না একটু গম্ভীর হয়!

পাখা নিয়ে সুকুমারের গায়ে অল্প-অল্প হাওয়া করতে-করতে একটু হেসে সুভা বললে,···কেমন আছো?

সুকুমারের মুখেও সেই মরা হাসি : মন্দ কি।

আবার চুপচাপ।

হ্যাঁ, টিপাইয়ের উপরে ছোট একটি টাইম-পিস ধুক-ধুক করছে।

এবার সুকুমার বললে,—তুমি কেমন আছো?

সুভা হেসে বললে,—দেখতেই পাচ্ছ।

হ্যাঁ, আমরাও দেখতে পাচ্ছি। সুভার কোথাও এতোটুকু দুঃখ নেই।

ঘরের চারিদিকে তার চিত্তের পূর্ণতা উৎসারিত হ'য়ে পড়েছে। মুখে গভীর প্রসন্নতা।

সুকুমার হঠাৎ অস্থির হ'য়ে উঠলো। বললে,—আমার অনেক কাজ ছিলো। উঠি।

—এতো কাজের মানুষ হ'লে কবে থেকে? প্র্যাক্‌টিস তো করই না শুনলাম। এককালে কবিতা লিখতে, তা-ও তো কই ছেড়ে দিয়েছ।

সুকুমার ঠিক দীর্ঘশ্বাস ফেললো কিনা বোঝা গেলো না: আর কবিতা!

—তার চেয়ে স্থূলতরো কিছু উপাদেয়, না? বিয়ে করো নি?

—না।

—করবে না?

—তোমার মতো প্রতিজ্ঞা ক'রে তো লাভ নেই।

—তার মানে যে-কোনোদিন যে-কাউকে বিয়ে ক'রে ফেলতে পারো। আমাদের নেমন্তন্ন করতে ভুলো না যেন। আমার বিয়েতে—এতো ক'রে লিখলাম, তবু এলে না। তোমার বিয়েতে কিন্তু আমরা ঠিক যাবো। অনেক দিন একটা নেমন্তন্ন খাইনি পেট ভ'রে।

অসহ্য। এই ঘর-দোর, বিছানা-বালিস—সব চেয়ে এই অত্যুগ্র পরিচ্ছন্নতা, সুভার রুক্ষ সিঁথিতে সুস্পষ্ট সিঁদুর, মাথায় ঘোমটা—সব চেয়ে তার এই সহজ ও নিতান্ত নির্ভয় ভঙ্গি—সুকুমারকে কশাঘাত করতে লাগলো। কান দু'টো জ্বালা ক'রে উঠেছে, চোখ মেলে আর তাকানো যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে প'ড়ে সে বললে,—আর বসতে পাচ্ছি না। এখুনি যেতে হ'বে।

—খাওয়ানোর নাম শুনে ভয় পাচ্ছ নাকি? বেশ, বোসো; খেতে তো আর ভয় নেই। আমি ছাড়লেও পিসিমা তোমাকে ছাড়বেন না। ক্লান্ত বোধ করলে শুয়েও পড়তে পারো স্বচ্ছন্দে। বিছানা পাতা-ই আছে। আমি ততোক্ষণে ষ্টোভটা ধরাই।

অসম্ভব। সুকুমারকে আবার বসতে হ'লো।

দরজার বাইরে বারান্দায় ব'সে সুভা ষ্টোভ ধরাচ্ছে। ক্রমে-ক্রমে আর-সব জিনিস-পত্রও জড়ো হ'তে লাগলো।

হ্যাঁ, এক পেয়ালা চা খেয়ে যেতে কী হয়েছে। নিতান্ত এক পেয়ালা চা।

সুভা চোখ নামিয়ে বললে,—আমার ওপর এখনো তোমার রাগ আছে নাকি?

সুকুমার বললে,—কোন অর্থে?

এবার স্বভা চোখ তুলতে পেরেছে—সে-চোখে হাসি টল্‌টল্‌ করছে : চল্‌তি-অর্থে।

—কোন অর্থে-ই কিছু নেই।

—তবে এসেই অমনি পালাতে চাও কেন?

—তবে কিসের জন্তে আর আসবো?

আবার চুপচাপ।

কিছুতেই স্বভা দমে না : তোমার এখন ঠিকানা কি?

—দরকার?

—বা, দরকার হ'তে পারে না?

—না।

—যদি কোনোদিন চিঠি লিখতে হয়? ব'লে ঘাড় বাঁকিয়ে স্বভা কেমন ক'রে একটু হাসলো।

সঙ্কেতটি তেমনি নির্ভুল। তবু স্বকুমার অবিচল : জবাব যখন পাবেই না, তখন চিঠি লিখে লাভ নেই।

—জবাব পাবো না, কি ক'রে তুমি বুঝলে? আর, জবাব না পেলে বুঝি চিঠি লিখতে নেই? কী বুদ্ধি!

স্বকুমারের সমস্ত গা জ'লে উঠলো। প্রায় ধম্‌কে বললে,—চা দিতে হয়, তো শিগ্‌গির দাও।

আঁচলটা জড়ো ক'রে প্যানএর হাতলটা ধ'রে নামিয়ে স্মিতমুখে স্বভা বললে,—এই হ'লো। ব'সে একটু গল্প ক'রে যেতে তোমার কী এমন রাজ্য-পতন হ'বে। কতো দিন পরে দেখা বলো তো।

—আমাদের কখনো এর আগে দেখা হয়েছিলো নাকি?

—হয় নি? তাই তো অপরিচিতা ভদ্রমহিলার সঙ্গে অমনি মুখ গোমরা ক'রে কথা কইছ? বোসো চুপ ক'রে। উঠতে চাইবে তো চামচ ক'রে গরম জল ছিটিয়ে দেবো কিন্তু। ব'লে স্বভা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো।

আরো কিছুক্ষণ।

স্বভা চামচ দিয়ে লালচে জলটা নাড়তে-নাড়তে বললে,—চুপ ক'রে বসা অর্থ চুপ ক'রে বসা নয়, বুদ্ধিমান। গল্প করো। মাঝে-মাঝে আসতে পারো না দেখা করতে? টেবি এখন কোথায়? ছেলেপিলে হ'লো কিছু? কতোদিন ছুঁড়িকে দেখি নি। কলকাতায় আসে না? শিগগির এলে এবার খবর দিয়ো, লক্ষীটি। কানে গেলো কথাটা?

এখান থেকে পালাতে পারলে সুকুমার বাঁচে। ঐ সেই বসবার ভঙ্গি, কথা কয়টি শেষ ক'রে সেই অসংলগ্ন হাসি, সেই কাছে আসবো ব'লে দূরে থাকবার ইসারা।

আজো তার মনে হ'লো, আশ্চর্য্য, অনায়াসে সে সুভার হাত দু'খানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে আনতে পারে, তেমনি পাশ ঘেসে ব'সে, একেবারে মুখোমুখি হ'য়ে গল্প করতে পারে, আগের মতন অভিমান ক'রে অভিমান কাটিয়ে ওঠবার জন্যে প্রতীক্ষা করতে পারে। একেবারে অনায়াসে, এতোটুকু দ্বিধা না ক'রে।

কিন্তু মাত্র এতোটুকুই।

সুকুমার অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠলো: নাও, সারো শিগ্‌গির ক'রে। লাইট চা-ই আমি খাই।

চা টা পেয়ালায় ঢালতে-ঢালতে সুভা বল্‌লে,—রোসো গো রোসো, দিচ্ছি।

হাত বাড়াবে ভেবেছিলো, তার আগেই সুভা টিপাইটা সুকুমারের সামনে টেনে এনে তার উপর চা রাখলে। বল্‌লে,—কিছুক্ষণ আরো বসিয়ে রাখতে পারলাম যা-হোক্। ততক্ষণে দু'টো অম্‌লেট্ ভেজে ফেলি।

পেয়ালাটা মুখ থেকে নামিয়ে সুকুমার বল্‌লে,—সর্ব্বনাশ। তা হ'লে সত্যিই চ'লে যাবো, সুভা।

সুভার দুই চোখ কৌতুকে প্রখর হ'য়ে উঠলো: আমার নাম ধ'রে ডাকলে যে। দাঁড়াও, খেয়েই যেতে হ'বে তোমাকে। এর আগে আমাদের আর কোনোদিন দেখা হয় নি, না?

বলে'ই আবার তার ঝিক্‌মিক্ হাসি।

অলক্ষিতে কখন সুভার নামটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। সুভার কথা শুনে তবে খেয়াল হ'লো। তবু প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে দাবিয়ে রেখে সুকুমার বল্‌লে,—আমি যদি চ'লে যাই, তুমি আমাকে ধ'রে রাখতে পারো নাকি?

সুভার মুখের দীপ্তি আর কিছুতেই অস্ত যায় না: অনায়াসে পারি।

চায়ের কাপটা না ফুরোতেই টিপাইয়ের উপরে নামিয়ে রেখে সুকুমার পিঠ টান ক'রে বসলো: কিসের জোরে পারো শুনি?

—নিতান্তই গায়ের জোরে। তুমি পারবে নাকি আমার সঙ্গে? কি রকম চোয়াড়ে হাত দেখেছ? ব'লে সুভা তার অনাবৃত ডান হাতখানি মুঠি চেপে শক্ত ক'রে মেলে ধরলো: পাঞ্জা লড়বে?

হোপলেস্। সুকুমার বল্‌লে,—আমাকে যে একা-একা ওপরে নিয়ে এলে—তোমার ভয় করে না?

—ভয়? সুভা বিস্ময়ে দুই চোখ বড়ো ক'রে বললে,—ভয় করবে কেন?

ঢোঁক গিলে সুকুমার বললে,—যদি সিতা- তোমার স্বামী—সুভা খিলখিল্ ক'রে হেসে উঠলো: হ্যাঁ, আমার স্বামী—সিতাংশুবাবু, বলো—

এক মুহূর্ত্ত সুকুমারের কোনো কথা এলো না। ফের ঢোঁক গিলে সে বললে,—যদি তিনি এখন এসে পড়েন?

হাসির আরেকটা ঢেউয়ে সুভা উছলে পড়লো: ভালোই হয়। দু'বার ক'রে আমার আর তা হ'লে চা করতে হয় না।

সুকুমার তাড়াতাড়ি চেয়ারটা পিছনে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। এখানে আর কতোক্ষণ থাকলে তার দম বন্ধ হ'য়ে আসবে। বললে,—আমাকে মাপ করো. আর বসতে পারবো না।

তারপর সিঁড়ির কাছে চ'লে এসে ঘাড় ফিরিয়ে সুকুমার ফের বললে,—কৈ, ধ'রে রাখতে তো পারলে না দেখছি।

সুভা নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে তেমনি অমলেট্ ভাজছে। মুখ না তুলে চামচটা নাড়তে-নাড়তে বললে,—আমার চেয়ে তোমার যে দেখছি বেশি ভয়।

সুকুমার থমকে দাঁড়ালো: ভয়? কা'কে?

—আর কা'কে! সিতাংশুবাবুকে। তারপর সুভা তার চোখ দু'টি দুষ্টুমিতে তীক্ষ্ণ ক'রে বললে,—ভয় নেই, তিনি বাঘ নন্। ফিরতে তাঁর এখনো ঢের দেরি। ঘণ্টাখানেক তুমি স্বচ্ছন্দে গল্প ক'রে যেতে পারো।

সুকুমার পা বাড়াতে যাচ্ছিলো। কঠিন হ'য়ে বললে,—পাঁচ বছর ধ'রে তো অনেক গল্পই করেছিলাম। আবার গল্প কি!

চোখ নামিয়ে সুভা বললে,—তা হ'লে যাও।

সুকুমার তাড়াতাড়ি মেঝের উপর সুভার মুখোমুখি ব'সে পড়লো। সুভা ফেললো হেসে। বললে,—কি, তোমায় ধ'রে রাখতে পারি না?

সুকুমার বললে, - পারো বলে'ই তো মনে হ'তো। দাও, যথেষ্ট ভাজা হয়েছে। ব'লে অমলেট্-এর উদ্দেশে হাত বাড়ালো।

অলক্ষিতে সে-হাত এসে লাগলো সুভার বাহুর উপর, কালো পাথরের মতো স্নিগ্ধ ও ঠাণ্ডা বাহুর উপর।

সুভা বললে,—দাঁড়াও, দিচ্ছি।

অমলেট্-এর খানিকটা ছিঁড়ে চিবুতে চিবুতে ভয়া-মুখে সুকুমার বললে,—তুমি কিছু খেলে না? নাও না খানিকটা।

মুখ সরিয়ে নিয়ে সুভা বল্‌লে,—আমি এখন কিছু খাবো না। উনি কলেজ থেকে ফিরলে তবে আমরা একসঙ্গে চা খাই।

সুকুমার হাত গুটিয়ে আনলো। ক্ষণকালের জন্য সে বুঝি এতো দিনের গভীর বিচ্ছেদের সমুদ্র এক নিশ্বাসে পার হ'য়ে গিয়েছিলো। রাজবল্লভ ষ্ট্রীটের ষোলো নম্বর বাড়ির দোতলার বারান্দায় যেন সেই পরিচিত দুপুরের রোদ এসে পড়েছে। দু'জনকে বেষ্টন ক'রে বিরাজ করছে সেই চেনা স্তব্ধতাটি।

ঝট্‌ ক'রে সুকুমার উঠে পড়লো। বল্‌লে,—তোমার সব কথাই রাখলাম যা-হোক্‌। ডিম পর্য্যন্ত খেয়ে গেলাম।

সুভা হেসে বল্‌লে,—ঘোড়ার ডিম! কিন্তু গল্প তো করলে না।

সে তো শুধু গল্পই! শেষকালে সিতাংশুবাবু যদি এসে পড়েন?

—আসবেন।

—তোমাকে তো একটা জবাবদিহি দিতে হ'বে। তোমাকে বিপদে ফেলে লাভ কী!

সুভাও ততোক্ষণে উঠেছে। হাত তুলে চুলটা ঠিক ক'রে নিয়ে বল্‌লে,—খুব উদার দেখছি যে। ধন্যবাদ।

—নিশ্চয়ই উদার। সুকুমার দু'ধাপ নেমে আবার ফিরে দাঁড়ালো: আমি ইচ্ছে করলে তোমার কতো ক্ষতি করতে পারতাম। আমি বিদ্রোহ করলে তোমাকে আর এই সিংহাসনে ব'সে রাজত্ব করতে হ'তো না।

তরল হাসির জলে সুভার কালো কুচ্‌কুচে দু'টি চোখের তারা সাঁতার দিচ্ছে। এবার সে অনর্গল হেসে উঠলো: সত্যি নাকি? বিদ্রোহ ক'রে চ'লে যাচ্ছ কেন তবে? দাঁড়াও না একটু।

সুকুমার দাঁড়ালো। সুভার অনুরোধে নয় অবিশ্যি। এক থালা খাবার ও জলের গ্লাস হাতে ক'রে পিসিমা সিঁড়ির মাঝপথে তাকে আটকে ফেলেছেন।

—না, না, এ আবার এমন কী জিনিস!

সুকুমার বল্‌ছে: বা, এইমাত্র আমি চা-ফা একগাদা কি-সব খেয়ে এলাম যে।

রেলিঙে দু' হাতের ভর রেখে—আঁকাবাঁকা দু'চারগাছি চুল ঘোমটার ফাঁক দিয়ে নেমে এসেছে—সুভা ঝুঁকে প'ড়ে বল্‌লে,—কিচ্ছু না পিসিমা, একটি অমলেট, তারো আধখানা। ধ'রে নিয়ে এসো ওপরে।

সুকুমারকে আবার উপরে আসতে হ'লো।

সুভা হেসে উঠলো: কী মজা। ভালো ছেলের মতো চুপটি ক'রে ব'সে গে'ল এবার।

সুকুমার অসহায় মুখ ক'রে বললে,—অসুখ করলে কে দায়ী হ'বে?

পিসিমা টিপাইয়ের উপর ডিস্‌টা রেখে চেয়ারটা টেনে দিয়ে বললেন,—তারি তো হু'টো মিষ্টি, তায় অসুখ করবে না হাতি! অসুখ করলে বৌ সেবা করবে। বৌ আছে কি করতে?

সুভা চোখ নাচিয়ে বললে,—বিয়ে করেছে নাকি?

পিসিমা চোখ বড়ো ক'রে বললেন,—বিয়ে করো নি এখনো? বলে কি! তা হ'লে—পিসিমা মনে-মনে বোধহয় পাত্রী নির্ব্বাচন করতে লাগলেন।

সুভা হেসে বললে,—কলেজে পড়বার সময় পাড়ার এক মেয়েকে নাকি উনি মনে ধ'রে গিয়েছিলো। সে-মেয়ের অন্য জায়গায় বিয়ে হ'য়ে যেতেই উনি প্রতিজ্ঞা করেছেন বিয়ে করবেন না।

পিসিমাও হেসে উঠলেন: দূর পাগল।

কিন্তু ধারে-কাছে কোথাও সুভা নেই। বলে'ই সে পালিয়েছে।

অগত্যা খাবারগুলো একে একে উদরস্থ করা ছাড়া উপায় কী!

পিসিমা নানাপ্রকার জরুরি সংবাদ সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন। এখন আর সুভার উপস্থিত থাকবার দরকার নেই। অতিথি-সৎকারে ত্রুটি না হ'লেই হ'লো। ঘরের কাজ-কর্ম্ম এখনো তার কিছু বাকি আছে।

অশুচি গ্লানির মতো যার স্মৃতি পর্য্যন্ত সে মন থেকে মুছে দিয়েছে, ভাগ্যের এমনি চমৎকার পরিহাস তারই ছায়ায় এসে কিনা তাকে বিশ্রাম নিতে হ'লো। শুধু তাই নয়, হাত পেতে খাবার খেতে হ'লো, মৌখিক আলাপে সৌজন্যের এতোটুকু অভাব হ'লো না, উল্টে তাকেই কিনা শ্লেষ! অথচ কিছুই তার করবার নেই। একটা কঠিন কথাও মুখ দিয়ে বেরুলো না। হু'বার নামবার চেষ্টা ক'রে হু'বারেই সে ফিরে এলো, এবং হু'বারই কিনা খেতে!

জলের গ্লাসে তখুনি চুমুক দিয়ে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে সুকুমার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লো। আর সে বসছে না।

পিসিমা বললেন,—দাঁড়াও। বৌমা, সুকুমারকে পান দিয়ে যাও।

সুভা এতোক্ষণ তা হ'লে তার জন্যে পান সাজছিলো!

ডাক শুনে পাশের ঘর থেকে সুভা বেরিয়ে এলো—বাঁ হাতের মুঠিতে চুলের গোছা ধরা, ডান হাতের চিরুনিটা চুলের মধ্যেই আট্‌কানো। সিতাংশুর বাড়ি ফেরবার সময় হ'লো। ঘর-দোরের সঙ্গে ঘরণীটিও ফিট্‌ফাট হ'য়ে না থাকলে তার রোচে না। তা ছাড়া কোন দিন তার বেড়াতে বেরুবার খেয়াল হ'বে বলা কঠিন। তাই আগে থাকতেই একটু এগিয়ে থাকা ভালো।

চুলের গোছা ছেড়ে দিয়ে ঘোমটাটা মাথার উপর গুছোতে গুছোতে সুভা বললে,—তুমি আজকাল পান খাও নাকি ?

—না।

সুকুমার আর দাঁড়াচ্ছে না।

সিঁড়ি দিয়ে নামতেই বাঁ দিকে একটা জানলা। সেই জানলা দিয়ে ঘরের দিকে আরেকবার—শেষবার, হ্যাঁ, শেষবারই তো—না-তাকিয়ে সে পারলে না। দেয়ালের দুই প্রান্ত ঘেঁসে দু'খানি খাট, তাতে পরিপাটি ক'রে আলাদা বিছানা পাতা। মাঝখানে একটা টিপাই সেই ব্যবধান যেন সঙ্কীর্ণ ক'রে এনেছে। টিপাইয়ের উপর পেতলের একটা ফুলদানি, ষ্ট্যাণ্ডে ফ্রেমে-আটকানো কা'র একখানি ফোটো—তার যে নয় তা সে জানে।

একখানা নয়, পাশাপাশি দু'খানি ফোটো। একখানি তো সুভার স্পষ্ট বোঝা যাছে। অন্যটা যে কা'র তাকে তা আমাদের ব'লে দিতে হ'বে না।

কথার পিঠে পিসিমা বললেন,—কিন্তু কিছু মশলা—

—হ্যাঁ, যাই। ব'লে সুভা পিঠময় চুল ছড়িয়ে দিয়ে ছুটে নিচে নেমে গেলো। বললে,—দাঁড়াও, মশ্‌লা নিয়ে যাও। তোমাকে যে ধ'রে রাখতে পারা যাবে না তা জানি।

সুকুমার আরেকবার ফিরে দাঁড়ালো।

সুভা এবার আর তার ঘোমটাটা মাথায় তুলে দিতে ব্যস্ত হ'লো না। বরং, সাহস ক'রে এতো কাছে এসে দাঁড়ালো যে সুকুমারেরই বুক কেঁপে উঠলো।

সুকুমার শুধু বললে—না, মশ্‌লা লাগবে না।

—সে আমাকে ব'লে দিতে হ'বে না, বুদ্ধিমান। অতিথি বিদায় নেবার সময় তাকে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে হয়। কোনো ভদ্রতারই ধার ধারো না আজকাল।

তারপর হেসে: কিন্তু কী মজাই আজ হ'লো বলো তো। আমার মুখ দেখবে না ব'লে সেই যে ঢাক পিটিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলে তা গেলো চুরমার হ'য়ে। তবে আর কি! মাঝে-মাঝে এসো এবার।

সুকুমার বললে,—অতিথিকে বিদায় দেবার সময় তাকে মাঝে-মাঝে আসতেও বলতে হয় নাকি ?

—হয় বৈ কি।

—কিন্তু এতো মুক্তহস্ত হ'লে দেউলে হ'য়ে যেতে কতোক্ষণ!

সুকুমার বাইরের বসবার ঘর পেরিয়ে রোয়াকে এসে দাঁড়িয়েছে।

সুভা হাসিমুখে অথচ গম্ভীর গলায় বললে,—আমাকে তুমি এতোই কাঁচা ব্যবসাদার ঠাওরালে নাকি? সে-ভয় তোমার না করলেও চলবে।

সুকুমার উঠোনে নেমেছে। বললে,—ভয়ই কি ঠিক, না করুণা?

—তবে করুণা ক'রে মাঝে-মাঝে এলেই তো পারো।

—দরকার নেই।

—পৃথিবীতে সব জিনিসই কি দরকার মেপে করতে হয় নাকি?

রাস্তায় পা ফেলবার আগে সুকুমার বললে,—তোমার কাছ থেকে অন্তত এইটুকু তো আমি শিখেছি।

সেই যে সুকুমার গেলো আর একবারো পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো না। রোয়াকের ধারে দেয়াল ধ'রে সুভা তাকে দেখছে কিনা সেটুকু দেখতে পর্য্যন্ত না।

তিন

বারান্দায় পাইচারি করতে-করতে সুভা চুল-বাঁধা সাঙ্গ করলে। চাকর ততোক্ষণে উনুনে আগুন দিয়েছে।

চুল বেঁধে সাবান বা'র ক'রে সুভা কলতলায় নেমে গেলো গা ধুতে। মাথাটা বাঁচিয়ে দস্তুরমতো সে স্নান করলো। যা গরম পড়েছে আজ।

স্নান ক'রে চ'লে এলো উপরে। বৃষ্টি প'ড়ে মাঠের যেমন শোভা হয়, তেমনি গা ভ'রে তার স্নিগ্ধতা। আলমারি খুলে সে একখানি নীল সিল্কের সাড়ি বা'র করলে। সাড়িটা পরতে দেখে যদি ওঁর বেড়াতে নিয়ে যাবার লোভ হয়। একটু কোথাও দূরে যেতে ইচ্ছে করে। আর কোথাও না হোক্, রিচি-রোডেই না-হয় যাবে, তার দাদাদের বাড়িতে। মীনাটাও তো অনায়াসে চ'লে আসতে পারে। আর, উনিই বা এতোক্ষণ ফিরছেন না কেন? সাড়ে পাঁচটা বাজে।

যদি না ই বেরুনো হয়, এই সাড়ি তবু সে ছাড়বে না। এ দেহসজ্জা একান্ত ক'রে তার স্বামীর জন্যে। এ-সাড়িটি পরে'ই সে আজ স্বামীর জন্যে। চা করবে, উঠোনে ব'সে গল্প করবে—কি না-জানি গল্প করবে আজ—এবং এ-সাড়িটি পরে'ই সে আজ স্বামীর পাশে শোবে, যাই তিনি বলুন।

সিতাংশু তাকে কতোদিন বলেছে: দামি সাড়িগুলি বুঝি তোমার বাইরের লোকের মনোরঞ্জন করতে। ফাউন্টেন-পেন্এর কালি যেমন দেখতে নীল, শুকোলে

কালো, তেমনি পাঁচ জনের কাছে তুমি রহস্তময়ী, আর আমারই কাছে নিতান্ত ডাল-ভাত।

অবুঝ ছেলের আবদারের মতোই সুভা স্বামীর এ খেয়াল-পনাকে প্রশ্রয় দেয়নি। বলতো: সমুদ্রের ঢেউ দেখে তুমি কী করবে? তুমি নেবে মণি-মাণিক্য।

এবং, তার উত্তরে, আবরণটা যে কতো বড়ো আর্ট, তাতে যে কী সুদূরব্যাপক সুন্দর ইসারা—সিতাংশু ঘরের মধ্যেও প্রোফেসার হ'য়ে উঠতো।

কিন্তু স্বামীকে তার এখুনি পাওয়া দরকার। খবরটা তাঁকে না জানানো পর্য্যন্ত তার স্বস্তি নেই।

সুভা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চিরুনির ডগায় ক'রে সিঁথিতে সিঁদুর আঁকলে; সিঁদুরের কৌটোয় ডান হাতের ক'ড়ে আঙুলটা ডুবিয়ে কপালে ছাপ তুললে। নিজের রূপ দেখে নিজেই সে বিভোর। সাঁওতালি ঝুমকো দু'টো কানে এবার দুলিয়ে দেবে নাকি?

পাশের ঘর থেকে সিতাংশু চেঁচিয়ে উঠেছে: আমার প্রুফ গেলো কোথায়? কলেজ যাবার সময় এটার ওপর রেখে গেলাম—কোন জিনিস কোথায় যে রাখে তার ঠিক নেই।

আশ্চর্য্য, কখন সিতাংশু এসে গেছে—সিঁড়িতে তার জুতোর আওয়াজ পর্য্যন্ত কানে যায় নি। এতো কী নিয়ে সে ব্যস্ত ছিলো? মনে-মনে সে অন্য কোনো শব্দ শুনছিলো নাকি? সিতাংশু সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠেই তো তাকে এমন বেশে দেখতে পেলো না।

আঁচলটা না সামলেই সুভা ছুটে এলো।

সিতাংশু বললে,—তখন যে একতাড়া প্রুফ রেখে গিয়েছিলাম, কী করলে সেগুলো? জিনিস-পত্র গুছিয়ে রাখতে পারো না, করো কী সমস্ত দিন?

সুভা বিস্মিত হ'য়ে বললে,—সেই এক বাণ্ডিল ছেঁড়া কাগজ?

—হ্যাঁ, কোথায়?

অপ্রতিভ হ'য়ে সুভা বললে,—বাঃ, আমি কী জানি! আমি ভাবলাম বুঝি কোনো কাজে লাগবে না। ছিঁড়ে-ছুঁড়ে ঝাঁট দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছি।

—বলো কী! ওগুলো যে আমার বইয়ের প্রুফ—অর্ডার-প্রুফ। আমাকে যে এখুনি গিয়ে প্রেসে পৌঁছে দিতে হ'বে। এটুকু তুমি দেখতে পারো না তো আছো কী করতে?

সুভাও মুখ-চোখ যথাসাধ্য কঠিন ক'রে বললে,—এতোই যখন জরুরি, তখন

নিজে যত্ন ক'রে রাখতে পারো না? আমার কী দোষ! হাওয়ায় মেঝের ওপর উড়তে দেখে জানলা দিয়ে ফেলে দিলাম।

—কোন জানলা দিয়ে ফেলে দিয়েছ?

—মনে নেই।

সিতাংশু এবারে বিছানা-বালিস ওলোট-পালোট ক'রে, জিনিস-পত্র ছত্রকুট ক'রে বিষম এক কাণ্ড বাধালে দেখছি। নিতান্ত আখ্‌খুটে ছেলের মতো সে চেঁচাতে সুরু করেছে: কোন জিনিসটা আমার দরকারি এটুকুই যদি না বুঝতে পারবে, তবে এতো রাজ্যের মেয়ে থাকতে তোমাকেই বা বিয়ে করলুম কেন? এটুকু যদি না তোমার দৃষ্টি থাকে, তবে ও-দুটো ড্যাবডেবে চোখ নিয়ে জন্মেছিলে কেন? ব'লে অসহায়ের মতো হাত-পা ছুঁড়ে সে পিসিমাকেই ডাকতে লেগে গেলো যা-হোক্।

সুভা বললে,—থামো। ঢের হয়েছে। এই নাও তোমার প্রুফ। ব'লে তোষকের তলা থেকে খবরের কাগজের প্যাকেটে সযত্নে মোড়া একতাড়া প্রুফ সে বা'র ক'রে দিলো। এবং বা'র করে'ই তা'র উচ্ছ্বসিত হাসি। অভিমানে মুখ ভার ক'রে থাকাই তার উচিত ছিলো, কিন্তু দুপুরে ঐ একটা কাণ্ড ঘ'টে যাবার পর তার আজ আর গম্ভীর হ'বার জো নেই।

সিতাংশু বললে,—এতোক্ষণ একটু পরিহাস করছিলে বুঝি?

—তোমারো দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করছিলাম। ড্যাবডেবে চোখ দিয়ে আমি না-হয় তোমার প্রুফ দেখতে পাই নি, কিন্তু তোমার ঐ মাইনাস-সিক্স্‌ চশমা দিয়েই বা তুমি কোন দরকারি জিনিসটা দেখলে শুনি? এতোক্ষণ ধ'রে এতো সুন্দর ক'রে যে সাজলাম, মশায়ের একটু চোখে পড়েছে? রাগ খালি তোমারই হ'তে আছে, না?

সিতাংশুর বুদ্ধিশুদ্ধ এতোক্ষণে শানালো যা-হোক্। তাড়াতাড়ি সুভাকে সে দু' হাত ভ'রে জড়িয়ে ধরলো: চমৎকার সেজেছ তো। এতোক্ষণ কেন দেখি নি? তারপর এক হাতে সুভার চিবুকটি তুলে: চা তৈরি?

—হচ্ছে। তার আগে অন্য জিনিস তৈরি ছিলো।

প্রোফেসার-মানুষ, খোলাখুলি না ব'লে দিলে সহজে কিছু বুঝতে পারে না। বললে—কি?

সুভা চোখ নাচিয়ে বললে,—এটুকুই যদি বুঝতে না পারবে, তবে এতো রাজ্যের কুষ্মাণ্ড থাকতে তোমাকেই বা বিয়ে করলুম কেন? বলে'ই সিতাংশুকে অণুমাত্র অগ্রসর হ'বার সুযোগ না দিয়েই—ছুট।

এবং এক ছুটে একেবারে নিচে। রান্নাঘরে।

ফিনফিনে পাতলা সিল্কের নীল ঢেউ শূন্য ঘর জুড়ে তখনো ঝিল্‌মিল্ করছে।

বারান্দার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সিতাংশু বললে,—খাবার-দাবার কিছু করতে হ'বে না। শুধু এক কাপ চা নিয়ে এসো। আমাকে এখুনি আবার বেরুতে হ'বে। মাথায় দু' ঘটি জল ঢেলে আসছি—বোতামের সেট্‌টা বা'র ক'রে রেখো।

সুভা দ্বিতীয়বার অম্‌লেট্ ভাজতে বসলো। হ্যাঁ, অমলেটই সে ভাজবে।

চা নিয়ে সে হাজির। সিতাংশু আলমারির কাচের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। টিপাইয়ের উপর ডিস ও কাপ রেখে সুভা বললে,—আমিও যে তোমার সঙ্গে বেরুবো।

—আজ নয়। আমার ঢের কাজ।

—আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুনোটা বুঝি কাজ নয়?

—আজ হ'য়ে উঠবে না। প্রথম যেতে হ'বে প্রেসে—প্রেস এতোক্ষণে নিশ্চয়ই বন্ধ হ'য়ে গেছে—অগত্যা বইয়ের দোকানে। সেখান থেকে—

—সেখান থেকে!

সেখান থেকে একটা ভালো টিউসানির অফার এসেছে। সপ্তাহে তিন দিন—দেড়শো টাকা। যদি পাই।

—কিন্তু আমি এতো ক'রে সাজলাম!

—দেখি, দেখি কেমন সেজেছ। ব'লে সিতাংশু সুভার দু'হাত ধ'রে কাছে টেনে আনলো।

সুভা মুখ সরিয়ে নেবার চেষ্টা ক'রে বললে,—চা তোমার জুড়িয়ে গেলো।

—যাক্। চা'র চেয়েও ভালো elixir আছে। পরে সুভার চুলে হাত বুলুতে-বুলুতে: আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ফিরে আসছি। যদি টিউসানিটা পাই—তুমি সাড়িটা ছেড়ো না কিন্তু। এসে ছাদে গিয়ে দু'জনে খুব গল্প করবো, কেমন? এসো, অম্‌লেটটা তুমি আধখানা খাও। হ্যাঁ, হাঁ করো বলছি।

সিতাংশু খানিকটা ছিঁড়ে সুভাকে খাইয়ে দিলে। ফের বললে,—মন খারাপ করবে না তো?

—না। এক ঘণ্টার মধ্যে ফেরা চাই কিন্তু।

রাগ সুভা করবে না, অন্তত আজকে নয়। কিন্তু কথাটা সে পাড়বে কখন? বাইরে বেরুবার জন্যে সিতাংশু এখন ভীষণ ব্যস্ত,—সে কথা তো একনিশ্বাসে ব'লে গেলেই ফুরিয়ে যাবে না। সে কথার আগে ও পরে দুইটি বিস্তৃত অবসর চাই।

টিউশানি পাবার মতো খাপছাড়া একটা সংবাদ তো তা নয়। তার জন্যে চাই একটি অনুকূল আবহাওয়া।

সুভা বললে,—ফিরে এসে ছাদে গিয়ে কিন্তু অনেকক্ষণ বসতে হ'বে। তখন যে আবার একজামিনের কাগজ দেখতে হ'বে ব'লে তাড়াতাড়ি নেমে এসে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে বসবে তা হ'বে না।

—না, না, অনেকক্ষণ বসবো।

কথাটা তা হ'লে সে সেখানেই বলবে। কিন্তু খোলা ছাদ, আকাশ যেখানে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হ'য়ে এসেছে, যেখান থেকে অগণন তারা চোখে পড়ে—সেখানে কথাটা না-জানি কেমন শোনাবে। ভাবতে গিয়ে সুভার বুক কেঁপে উঠলো।

জুতো মস-মস করতে-করতে সিতাংশু গেলো বেরিয়ে। সুভা দোর-গোড়া পর্য্যন্ত তাকে এগিয়ে দিলে। বললে,—এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসা চাই, মনে থাকে যেন।

রাস্তায় নেমে হাসিমুখে সিতাংশু বললে,—দেড় ঘণ্টা।

—আচ্ছা, দেড় ঘণ্টা। ঠিক!

সিতাংশুও অবিশ্যি পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো না। সে জানে সুভা নিশ্চয়ই রোয়াকের দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। এমনি রোজই সে দাঁড়ায়।

কিন্তু এখন সে কী করবে?

পিসিমা তাঁর ঘরে ব'সে রাতের কুটনো কুটছেন। অগত্যা সুভা তাঁরই কাছে এসে বসলো। চাকর ও ঠাকুর সম্বন্ধে আবশ্যক দু'টো নিন্দা ক'রে পিসিমা শেষকালে বললেন, বলতে তাঁকে এক সময় হ'তোই: সুকুমারের সঙ্গে আমার ভাগ্নি প্রমীলার সম্বন্ধ করলে কেমন হয়?

সুভা স্বচ্ছন্দে ঘাড় হেলালো: বেশ হয়।

—তুমি প্রমীলাকে দেখেছ?

লজ্জিত হ'য়ে সুভা বললে,—না।

—তোমাদের মতো ফুটফাট অতো ইংরিজি শেখেনি, বৌমা,—আর ইংরিজি শিখলেই বা কী, সেই তোমাকেও তো হাঁড়ি ঠেলতে হয়, স্বামি-সেবা করতে হয়, ঈশ্বর করুন একটা কিছু হ'লে তোমাকেই তো দেখতে-শুনতে হ'বে। বি-এ এম-এ পাশ করলেও এই তো মেয়েদের সত্যিকারের কাজ - কী বলো?

—নিশ্চয়। এ-বিষয়ে কোনো মেয়ের কিছুমাত্র সন্দেহ আছে নাকি?

পিসিমা বললেন,—প্রমীলার গায়ের রঙ তোমার চেয়ে কিছু ফর্সাই হ'বে হয়তো—

সুভা হেসে বললে,—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই।

—তা ছাড়া যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি একগোছ চুল। নেমন্তন্ন-বাড়ির রান্না সে একাই নামিয়ে দিতে পারে। ওরা টাকা নেবে নাকি ?

—তা আমি কী ক'রে বলবো ?

—বা, এতোদিনের জানাশুনো, বরাবর পাশাপাশি এক রাস্তায় ছিলে, জানো তো হালচাল, কি রকম মনে হয় ? ঘরের অবস্থা কেমন ?

সুভা ঢোঁক গিলে বললে,—অবস্থা ওদের কোনো কালেই ভালো নয়। বাপ তো প্যারালিসিসএ বিছানায় শোয়া, মা নেই। সুকুমার কতো কষ্টে মানুষ হয়েছে। তা-ও কোনো চাকরি না নিয়ে বসলো কিনা উকিল হ'য়ে।

পিসিমা বললেন,—সে আমি কিছু-কিছু তার মুখেই আজ শুনেছি। নিলে কতো টাকা নেবে ?

—কী ক'রে বলি বলুন। একদম বিয়েই করবে না বলে।

—ও-কথা কোন ছেলেটা না বলে আজকাল ? কিন্তু ছেলেটি কেমন ?

—খুব ভালো। এমন ছেলে হয় না। কথাটা ব'লে ফেলে সুভা থমকে গিয়ে ফের শোধরালো: আমার সঙ্গে অনেকদিন অবিশ্যি দেখা হয় নি। তিন বছর বাদে এই প্রথম দেখলাম। কিছু বদ্‌লেছে ব'লে তো মনে হ'লো না।

কিন্তু এইখানে সে এই সব কথাই বলতে বসেছে নাকি ? সুভা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো। ঘড়িতে এখন ক'টা বেজেছে দেখে রাখতে হ'বে। দেড় ঘণ্টা।

পিসিমা জিগ্‌গেস করলেন: তারা এখন কোন্ ঠিকানায় আছে ব'লে গেলো ?

—না তো।।

—জেনে রাখো নি ?

সুভা মনে-মনে হাসলো, বল্‌লে,—জিগগেস করেছিলাম, কিন্তু বল্‌লে না।

পিসিমা বল্‌লেন,—নিজের গরজে তো আর জিগগেস করো নি। ওহো, আমারই ভুল হ'য়ে গেছে। আর সে আসবে না নাকি এদিকে ?

আর যে সে আসবে না এ-কথা সুভা ভালো করে'ই জানে। আজো সে আসতো না। নিতান্ত দৈবাৎ এসে পড়েছিলো।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে যেতে-যেতে সুভা বল্‌লে,—আর এখানে আসবার তার কী দরকার!

—বা, চেনাশুনো আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ি বুঝি মাঝে-মাঝে আসতে নেই ? তাকে আরেক দিন আসতে বললেই তো পারতে। ঠিকানাটা এখন কি ক'রে পাই ?

যে-কথা সে মনের মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়, তাই নিয়ে তাকে কিনা সবিস্তারে আলোচনা করতে হচ্ছে।

পিসিমা বল্লেন—সেজেগুজে রইলে, বেরুলে না?

সুভা তখন উপরে উঠে গেছে; চেঁচিয়ে বল্লে,—উনি ফিরে এলে তবে বেরুবো।

ঘর জুড়ে যে অটল নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিলো তা হঠাৎ কথা ক'য়ে উঠলো। কী যে সুভা এখন করবে, কী করলে যে তাকে মানায়, কিছুই তার মাথায় এলো না। উপরের বারান্দার জানলায় সে দাঁড়ালো। সামনেই ল্যান্স্‌ডাউন রোড, পাশেই মার্কেট। টুক্‌রো-টুক্‌রো কোলাহল, অচেনা যতো মুখ। কিন্তু বেশিক্ষণ অমনি দাঁড়িয়ে থাকতে তার ভালো লাগলো না। কা'র জানি সে প্রতীক্ষা করছে—দাঁড়াবার ভাবখানা যেন তাই। সিতাংশুর ফিরতে এখনো ঢের দেরি। এখুনি তার জন্যে জানলায় দাঁড়াবার দরকার নেই। বা, জানলায় এমন চমৎকার হাওয়া—সারা দিনের গুমোটের পর একটুখানি দাঁড়াতে দোষ কী!

সুভা শোবার ঘরে চ'লে এলো। ঘরের আবহাওয়াটা অত্যন্ত গাঢ়, তাতে সন্ধ্যার অন্ধকার জমছে। দেয়াল-মেঝে, ঘর-বাড়ি অতিমাত্রায় নিস্তব্ধ সমস্ত শূন্যতা পরিব্যাপ্ত ক'রে কা'র একটি উপস্থিতি।

ছাদে গেলে কেমন হয়? না, উনি ফিরুন।

কাল সে এই সময় কী করেছিলো? কাল, রোববার, উনি বাড়ি ছিলেন, কতোক্ষণ পর বন্ধুরা আড্ডা দিতে এলে নিচে নেমে গেলেন তাস খেলতে। রান্নাঘরে সুভার তখন কতো কাজ—চা করা, নিম্‌কি ভাজা, পরিপাটি ক'রে প্লেট সাজানো। আজ তার হাতে কিনা কোনই কাজ নেই।

পর্শু—পর্শু সে কী করেছিলো? পর্শু তারা দু'জনে গিয়েছিলো ম্যাডক্স-স্কোয়ারে—সেখান থেকে দাদাদের বাড়ি— রিচি-রোডে। মীনার সঙ্গে দেখা হ'লো, মীনা গান গাইলে।

তার আগের দিন এমন সময়? সিতাংশু ছিলো খাটের উপর শুয়ে, আর তার পাশে ব'সে সুভা বাজাচ্ছিলো সেতার।

তার আগের দিন যে কী করেছিলো ঠিক মনে নেই। সিতাংশু যে-দিন এমন সময় বেরিয়ে যায়, তখন সে কী করে? সাধারণতো কী করে? করবার মতো কাজের অভাব এর আগে সে কোনোদিন অনুভব করেছে নাকি? কী আবার করে—সন্ধ্যা দেয়, বই পড়ে, ঠাকুরকে দুয়েকটা রান্না দেখিয়ে দেয়—কিছুই হয়তো করে না।

আজো সে সন্ধ্যা দিলো, ঠাকুরকে রান্না বুঝিয়ে দিলো, টেব্‌লের কাছে একটা বই নিয়েও বসলো—কিন্তু কিছুই আজ তার করবার নেই।

খাটের উপর ব'সে সেতারটা বাজাবে নাকি? সে বাজনা তার কে শুনবে? কা'কে শোনাবে?

বা, নিজের জন্যে সে বাজাতে পারে না? নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে?

কিন্তু, কি তার ভাবনা, যা ভোলবার জন্যে তাকে সেতার নিয়ে বসতে হ'বে? কী তার দুঃখ সেতারের সুরে যার সান্ত্বনা? আর, সেতার নিয়ে বসলেই মনকে ব্যাপৃত রাখা যায় নাকি?

কথাটা তখন সুভা সিতাংশুকে ব'লে ফেললেই পারতো। ব'লে ফেললেই সে মুক্তি পেতো। এখন যতোই সময় যাচ্ছে ততোই যেন কথাটার অর্থ গভীর হ'য়ে উঠছে।

এখনো তাঁর ফেরবার নাম নেই। আটটা গেলো বেজে।

নিচে গিয়ে পিসিমার সঙ্গে গল্প করতে বসলে এক ফাঁকে সে-কথা উঠবেই। না, পরীক্ষার ছাত্রীর মতো কোমরে কাপড় বেঁধে পড়বেই সে এই বইয়ের কয়েকটা পৃষ্ঠা। যতোক্ষণ না সিতাংশু ফেরে।

সিতাংশু যখন ফিরলো, উপরে উঠে এসে দেখে, ঘর অন্ধকার, তার খাটের উপর সুভা আছে শুয়ে। যেন রাত্রির আকাশে সুনীল অন্ধকার। ব'সে থেকে-থেকে অবশেষে ঘুমিয়েই পড়েছে হয়তো। কিম্বা তাকে বেড়াতে নিয়ে যায় নি ব'লে রাগ করেছে। তাদের এতটুও ঝগড়া হয় না ব'লে সুভা মাঝে-মাঝে অভিযোগ করে। তাই, এই বুঝি তার রণসজ্জা!

টপ্ ক'রে সুইচ্ টেনে সিতাংশু আলো জ্বালালো।

আর অমনি সুভা দিলো ফিক্ ক'রে হেসে।

কোথায় বা ঝগড়া, কোথায় বা কী! কাঁধের চাদরটা খুলে রেখে সিতাংশু সুভার পাশে এসে বসলো।

কথাটা সে এইবার পাড়বে নাকি?

সুভা বল্‌লে,—এতো রাত ক'রে ফের আর একা-একা আমার ভীষণ ভয় করে।

ভয় কোথায়—চোখ ভ'রে তার সুন্দর হাসি, সে-হাসি সমস্ত দেহে ঝর্ণার জলের মতো ঝির্-ঝির্ ক'রে বইতে লেগেছে।

ভয়ের কথা ব'লে এখনই সে-কথা বলা খাপ খাবে না। কথাটায় অনাবশ্যক গাম্ভীর্য্য আসবে। অজস্র হাসির স্রোতে সে-কথাটা সামান্য একটা কুটোর মতো সে

ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। কিম্বা অসংখ্য ঘরোয়া কথার ফাঁকে সে-কথাটা সে ভিড়ের মধ্যে বিনা-টিকিটের প্যাসেঞ্জারের মতো টুপ্ ক'রে চালিয়ে দেবে যা-হোক্।

শোয়া ছেড়ে সুভা চট্ ক'রে উঠে বসলো। কাঁটাগুলি খোঁপার মধ্যে গুঁজতে-গুঁজতে বল্‌লে, চলো। ছাদে যাবে না?

সিতাংশু একটা চেয়ারে ব'সে পড়েছে, ক্লান্তিতে শরীরটা ছেড়ে দিয়ে বল্‌লে—টিউসানিটা হ'লো না, মোটে পঞ্চাশ টাকা দিতে চায়।

—বাঁচলাম। বিকেল-বিকেল টিউসানি করতে গেলেই আমার হয়েছিলো আর-কি। আমার জন্যে তোমার একটুও ভাবনা নেই।

এইবারে কথাটা সে পাড়তে পারে। কিন্তু ভাবনা নেই বলবার পর ও-কথা তুললে হয়তো অকারণে তাঁকে ভাবিয়ে তোলা হ'বে।

সিতাংশু বল্‌লে,—রান্না হয়েছে? ঠাকুরকে ডেকে একবার জিগ্‌গেস করো না। দারুণ খিদে পেয়েছে।

—চলো, কখন হ'য়ে গেছে। ঠাকুরটা ঘুমিয়েছে নিশ্চয়ই। রাত কত হয়েছে খেয়াল আছে কিছু?

ঘড়ির দিকে চেয়ে সিতাংশু এক ঝটকায় উঠে পড়লো: চলো, চলো, আর দেরি নয়। আলো নিবিয়ে এসো শিগ্‌গির। আরেকবার চান ক'রে নিলে হ'তো। তাড়াতাড়ি স্যাণ্ডেল খুঁজে সিতাংশু তাড়াতাড়ি নেমে গেলো।

অতএব ছাদে যাওয়া আজ আর হ'লো না।

না হোক্, খেতে বসে'ই কথাটা সে বলবে। এবং আশা করি অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মতো সে-কথাটাও চিবিয়ে হজম ক'রে ফেলতে তার দেরি হ'বে না।

কিন্তু মাছের তরকারিটা মুখে দিয়েই সিতাংশু নিদারুণ কণ্ঠে ঠাকুরকে ধম্‌কে উঠলো: বাজারের সমস্ত মিষ্টি এনে ঢেলেছ বুঝি এর মধ্যে? মুখে দেয় কা'র সাধ্য? ব'লে মুখের গ্রাসটা সে থুতিয়ে ফেলতে লাগলো। তারপর সুভাকে লক্ষ্য ক'রে বললে,—গর্দ্দবটাকে একটু দেখিয়ে দিতে পারো না? কী করো সমস্তক্ষণ?

সুভা হেসে বললে,—আমি তো দিব্যি খেতে পাচ্ছি। চমৎকার হয়েছে! আর একটু দাও দিকি, ঠাকুর।

বাবু তাকে গাল দিলেও গিন্নির কথায় ঠাকুর বিশেষ খুসি হ'য়ে উঠলো। সুভাকে অগত্যা বাধ্য হ'য়ে বলতে হ'লো: তোমাদের জন্যে থাকবে তো? দেখো।

কিন্তু উনি অমন চ'টে থাকলে কথাটা এখানেই বা কী ক'রে পাড়া যায়?

তখনই সে বলবে—রাত যখন অনেক গভীর। সামীপ্যে মুহূর্তগুলি যখন মদির, মন্থর। যখন সে-কথার কোনো আলাদা অর্থ থাকবে না।

পান নিয়ে সিতাংশু উপরে উঠে গেলো, সুভা বসলো একটু পিসিমার খাওয়ার কাছে, ফরমাজ-মতো এটা-ওটা এগিয়ে দিলে।

পিসিমাকে শুইয়ে উপরে এসে দেখে সিতাংশু তার খাটে ঘুমোবার উদ্যোগ করছে। সুভা কাচের গ্লাশে ক'রে জল গড়িয়ে খেলো, দাঁত দিয়ে ভাঙলো দু'টো লবঙ্গ। তারপর নির্ব্বিঘ্নে দরজা সে বন্ধ করলে।

আমরা এ-ঘর থেকে স্বচ্ছন্দে এখন চ'লে যেতে পারি, কিন্তু সুভার মুখে কথাটা শুনে যাবার জন্যেই যা আমাদের একটু দেরি হচ্ছে।

আরো খানিকক্ষণ কাটে—রাতই খালি গভীর হয়। সঙ্গে-সঙ্গে সুভার মনে কথার অর্থ টাও ততোধিক গভীর হ'তে থাকে।

কিন্তু কতোক্ষণ আর প্রতীক্ষা করা যায়?

সিতাংশুর গায়ে আস্তে একটা ঠেলা দিয়ে সুভা ডাকলে: শুনছ?

অস্ফুট উত্তর হ'লো: উঁ।

সিতাংশু ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিন্তু, তবে—স্বামীকে তা জানিয়েই বা কী দরকার? অন্ধকারে সুভা কূল দেখতে পেলো। সিতাংশু তা না জানলে কী যায়-আসে, তাদের জীবনে কোথায় কী ক্ষতি হ'বে তাতে! কালকেই তো আবার সেই ভোর, সেই সংসার।

সুভা গভীর তৃপ্তিতে নিশ্বাস ছাড়লো।

সুকুমার তো কোনোদিন আর এ-বাড়িতে আসবে না।

চার

কিন্তু, আশ্চর্য্য, পরের দিনই সুকুমার এসে হাজির।

আজকে, দুপুরের প্রখর নির্জ্জনতায় নয়, বিকেলের ধার ঘেঁসে। কোর্ট থেকে সটান।

সোজা উপরে না উঠে সুকুমার বাইরের ঘরে একটা চেয়ার নিয়ে বসলো। ধরালো একটা সিগ্‌রেট। রিভলভিং সেল্‌ফ্‌ থেকে টেনে নিলো একটা বই।

নিচে, এ-পাশে ও-পাশে সুভার গলা শোনা যাচ্ছে। কর্ত্রীত্বে ভারিক্কি গলা, তৃপ্তিতে নিটোল। এ-গলার নিটোলতায় টের পাওয়া যাচ্ছে তার জীবনের মসৃণতা। তার দিন-রাত্রির নরম একঘেয়েমি।

হালকা, নীলচে ধোঁয়ায় ঘরের শূন্যতা যেন উ'ড়ে উ'ড়ে যাচ্ছে। ঘন হ'য়ে উঠছে কা'র উপস্থিতি।

সুভা এ-ঘরে চ'লে এলো - আসতে তাকে এক সময়ে হ'তোই—উপরের কাজ-কর্ম সেরে নিচে নেমে এ ঘরটাও তাকে একটু গুছিয়ে দিতে হয়। কিন্তু সেই জন্যে, অভ্যস্ত একটা কর্ত্তব্য পালন করতে সে এলো, অন্তত আজ সে এলো—এ-কথা ভাবা ঠিক হ'বে না। তাকে আসতে হ'লো, একসময়ে আসতে তাকে হ'তোই।

কিন্তু এতোটা সে আশা করে নি।

—এ কী, তুমি কখন এলে?

—এই খানিকক্ষণ।

না, এতোটা সুভা আশা করেনি। তার একটা প্রখর ছন্দবোধ ছিলো, এমন আকস্মিক যে আবার সুর কেটে যেতে পারে তার জন্যে সে প্রস্তুত ছিলো না।

একটু থিতিয়ে, মুখে হাসি আনবার চেষ্টা ক'রে সুভা বললে,—আজ আবার এ-বাড়িতে কিছু পৌঁছে দেবার কাজ পড়লো নাকি?

সুভা বিকেলের চুল বাঁধা সাঙ্গ ক'রে এসেছে। চুলগুলি গুচ্ছ-গুচ্ছ আলস্যে পিঠের উপর ছড়িয়ে নেই ব'লে মুখে যেন আজ সেই সবুজ ছায়া পড়ে নি। খোঁপাটা আজ উদ্ধত ব'লে মুখেও এসেছে একটি তামাটে রুক্ষতা। কালকেই, সদ্য ঘুম থেকে উঠে এসেছিলো ব'লে,—দুপুরবেলাকার ঘুম, ভরা পেটে একটি সিগরেটের মতো মিঠে, একটি সনেটের মতো ক্ষীণায়ু—তার ভঙ্গিতে ছিলো নরম একটু জড়িমা, রূপোলি রেখায় ছিলো ভঙ্গুর একটি ক্লান্তি। আজকে ঘড়ির কাঁটা অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। এলানো আঁচলে আর সেই অজস্রতা নেই। ভঙ্গিটা তার আজ বড়ো বেশি রূঢ়, সম্বৃত, রেখায় আজ বড়ো বেশি স্পষ্টতা। তার আসাটা ঠিক আজ উদয় বলতে পারো না, একটা উদ্ঘাটন।

সেই মুহূর্ত্ত গেছে ম'রে। দুপুরবেলাকার ঘুম দিয়ে সে তৈরি।

কিন্তু তার জন্যে সুকুমারের কিছু এসে যায় না।

শুকনো একটা ঢোঁক গিলে, মুখে হাসি আনবার চেষ্টা ক'রে, সুকুমার কথাটার একটা প্রাঞ্জল উত্তর দিলে : না। নিজেই চ'লে এলাম।

সুভার চোখে আর নেই সেই ঘুমের ফিকে কুয়াসা, ঠোঁটের ধারালো রেখায় নেই সেই তরল বিধুরতা। দূরত্বটা অসম্ভবরকম উচ্চারিত রেখে সে বললে,—কিন্তু কালকের পর আজকেই আবার চ'লে এলে?

—এলাম। তুমিই তো মাঝে-মাঝে আসতে ব'লে দিয়েছ।

সুকুমার-ও আজ বিকেল বেলার সুকুমার, কোর্ট-ফেরৎ সুকুমার। পোষাকটা

তার আজ বেশিরকম প্রকাশিত। সে-পোষাকে তাকে যেন বন্য, প্রায় পাশবিক দেখাচ্ছে। গলার টাইটা যেন বড়ো কঠিন, পেণ্টুলানের নির্ভাজ ক্রিজ্‌টা যেন বড়ো তীক্ষ্ণ। সমস্ত ভঙ্গিটাতে একটা দুঃস্পৃশ নিষ্ঠুরতা।

সঙ্কোচে সুভার গলার স্বর যেন বেমে উঠলো। মরন্ত হাসিতে মুখ বিবর্ণ ক'রে বললে,—কিন্তু এই বুঝি তোমার মাঝে-মাঝে আসা?

সুকুমার বল্‌লে, খট্‌খটে নির্জলা গলায় বল্‌লে,—আমার সেই অবকাশগুলি কে পরিমাপ করবে? তুমি না আমি? তোমার কাছে যা হয়তো মনে হচ্ছে অত্যন্ত কুৎসিত ত্বরা, আমার কাছে তা মনে হ'তে পারে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ। সময় কারো সমান কাটে না। আর, এ-ক্ষেত্রে, আমাকেই যখন আসতে হ'বে, তখন, সময়ের বিচারটা আমার হাতে ছেড়ে দেয়াই কি উচিত হ'বে না?

সুভার গলাটা ঈষৎ তেতেছে: তোমাকে আবার আসতেই হ'বে, এমন কোনো কথা আছে নাকি?

—অবিশ্যি রিট্‌ন্ কিছু নেই। সুকুমার আলগোছে একটু হাসলো: তা ঠিক। তোমার মুখের কথার আবার একটা দাম কী?

—তা, এসেছ,—বেশ, বোসো। সুভা যাবার জন্যে হাওয়ায় একটা ঢেউ তুল্‌লে।

—বা, আমি বসবার জন্যেই এসেছি নাকি?

—তবে কী জন্যে এসেছ?

—বা, তোমার সঙ্গে ব'সে-ব'সে গল্প করবো, চা খাবো,—তোমার সঙ্গে কালকে তো এক লাইনো গল্প করা হ'লো না। সমস্তটা সময় তোমারই মতো এমনি চ'লে যাবার জন্যে ছটফট করলাম।

—কিন্তু, অনুনয়ে সুভার দুই চোখ ম্লান হ'য়ে এসেছে: আমার এখন সময় নেই। আমার ঢের কাজ।

—কাল আমারো তাই মনে হয়েছিলো। আসলে ভেবে দেখলে, সুকুমার আবার হাসলো: কাজ অনায়াসে ব'সে থাকতে পারে, আমরাই পারি না—কাজ করার চাইতেও আমাদের এতো কাজ। বোসো।

—না, ওঁর আসবার সময় হ'লো, ওঁর খাবার এখনো কিছু তৈরি করা হয় নি।

—বেশ তো, উনি এলেই সেটা একসঙ্গে হ'বে। আমি যখন নেহাৎ এসেই পড়েছি, তখন ওটার থেকে আমাকেও তো আর বাদ দিতে পারবে না। সুকুমার টেবলটার ও-পাশে একটা চেয়ার টেনে আনলো: বোসো না। কোর্ট থেকে এসে আমি যদি চায়ের জন্যে অপেক্ষা করতে পারি, সিতাংশুবাবুও পারবেন।

অগত্যা সুভাকে বসতে হ'লো। বাঁকাচোরা দুর্বল ক'টি রেখায়; শীর্ণ, সঙ্কীর্ণ, সঙ্কোচে।

সুকুমার ভরাট গলায় বললে,—তোমার বাড়ি, তোমার ঘর, তোমার এতো ভয় কেন?

—ভয়? ততোক্ষণে টেব্‌লের উপর পাশাপাশি দুই কনুই রেখে দুই পরস্পরবদ্ধ মুঠোর উপর সুভা তার চিবুকটি নিস্তেজ ক'রে নামিয়ে এনেছে: আমার আবার ভয় কিসের?

—হ্যাঁ, তোমার কেন ভয় করতে যাবে?

চুপচাপ।

তার ফ্যাকাসে মুখের দিকে চেয়ে সুকুমার বললে,—এ কী, তুমি চুপ ক'রে রইলে কেন? কাল তো তোমার কতো গল্প করবার ছিলো।

ভুরু দু'টি কুটিল করে' সুভা বললে,—কাল ছিলো ব'লে আজো থাকতে হ'বে?

—তা ঠিক। সেটা ভেবে দেখি নি। সুকুমার এবার স্পষ্ট হাসলো: গল্প থাক্, এমনি কথা কও। অনর্থক কথা। চুপ ক'রে থেকো না।

—কিন্তু কী কথা বা কইবো?

—কাল আমারো তাই মনে হয়েছিলো। তবু চুপ ক'রে থেকো না। আমরা এখন শুধু কথাই কইতে পারি, চুপ ক'রে থাকতে পারি না। চুপ ক'রে থাকবার দিন আমাদের চ'লে গেছে।

আবার চুপচাপ। জানলার সার্সিতে পিছলে বিকেলের বিষণ্ণ খানিকটা রোদ এসে পড়েছে সুভার পায়ের পাৎলা পাতায়, সাড়ির লতানো পাড়ে, গালের নরম আধখানায়।

হ্যাঁ, কথা চাই। কথার রূপোলি জল, কথার ঝিরঝিরে হাওয়া।

ঠোঁট দু'টি রহস্যে বঙ্কিম ক'রে সুভা বললে,—একেবারে আসছিলে না তো আসছিলে না, আর একবার যখন এলে—

—তো এলাম-ই। সুকুমার হেসে উঠলো: ভেবে দেখলাম সুভা, কিছুতেই কিছু এসে যায় না—আসি আর না-আসি, ব'সে থাকি আর চ'লে যাই।

—তবে—

—তবে, কেন নেহাৎ এলাম এই বলতে চাও তো? মনে হ'লো, সুকুমার একটা সিগরেট ধরালো: তোমাকে দেখা যেন আমার এখনো একেবারে ফুরিয়ে যায় নি। নইলে, ভাবতে পারো, কাল কখনো ভাবতে পারতাম তোমাকে আবার

এই নতুন মূর্তিতে দেখতো পাবো? মানুষ মানুষকে একবার ভালোবাসলে তার চেহারায় ও চেতনায় কতো রকম যে অদল-বদল হ'তে থাকে, তার ঠিক নেই।

—বা, আমার আবার কী পরিবর্ত্তন দেখলে? কাছে ব'সে তোমার সঙ্গে তো দিব্যি গল্প ক'রে চলেছি।

কিন্তু সত্যি তোমার গল্প করবার সময় নেই। সুকুমার উঠে দাঁড়ালো : তোমার এখন অনেক কাজ। আমি এবার চলি।

—না, না, সে কী কথা? সমস্ত শরীরে লঘু একটি মুক্তি অনুভব ক'রে সুভাও উঠে দাঁড়ালো : আরেকটু বোসো, চা খেয়ে যাও। তুমি ব'সে থাকো বা চ'লে যাও, কিছুই যখন এসে যায় না, তখন আরেকটু না-হয় বসে'ই গেলে। তোমার-আমার কিছুই তাতে ক্ষতি নেই।

এবং তারপর সত্যি-সত্যিই সুকুমার ফের ব'সে পড়লো। সুভার মুখের উপর যেন কে জোরে চাবুক মারলে।

—হ্যাঁ, বসে'ই যাই, যখন বললে। ট্রেনটা আরো কতোদূর যাক্, পরে এক সময় আরেকটা ষ্টেশনে নেমে পড়লেই হ'বে।

—ট্রেন? ট্রেন কোথায়?

তার মূঢ়, স্তব্ধ মুখের দিকে চেয়ে সুকুমার হাসলো : এই, তোমার এই বাড়ি। এখানে বসতেই তো শুধু পাওয়া যায়, জায়গা পাওয়া যায় না। তারপর একটা ষ্টেশন দেখে জিনিস-পত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়তে হয়।

—ষ্টেশন? সুভার বাঁকানো ভুরুতে ধারালো কৌতূহল।

—পথে অনেক ষ্টেশন পড়ে যে। কখনো তোমার হাসি, কখনো তোমার ঔদাসীন্য।

—সঙ্গে আবার তোমার মাল-পত্রও আছে নাকি?

—নেই? সঙ্গে আমার এই রিক্ততা। এর ভার তো আর কিছু কম নয়। সুকুমার গলা ছেড়ে হেসে উঠলো।

সেই টুকরো-টুকরো হাসি জ'মে-জ'মে নিটোল হ'য়ে উঠলো একটি স্তব্ধতায়।

সুভার একটি নিশ্বাস শোনা গেলো : তবু যা-হোক্ তো তুমি চলেছ। আর আমি পড়েছি থেমে।

সুকুমার তার দুই চোখ কানায়-কানায় ভ'রে তাকালো সুভার পর্য্যাপ্ত, ঘনীভূত তনিমার দিকে; বললে,—তোমাকে কিন্তু তাই খুব ভালো মানিয়েছে।

সুভা শুধোলো : কি?

—তোমার এই থেমে থাকা, গা ভ'রে তোমার এই স্তব্ধতার উচ্ছলতা।

এই নিটোল, কঠিন গাম্ভীর্য্য। চমৎকার মানিয়েছে তোমাকে। সুখই তোমাদের মানায়, সৌন্দর্য্য নয়।

সুভা বললে—তুমিও তবে এমনি সুখী হ'লেই পারো। কে ধ'রে রেখেছে?

—যদিও সুখ পুরুষদের মানায় না। তবু সেই একটা রোমাঞ্চই বা জীবন থেকে বাদ দিই কেন? সুকুমার উঠে পড়বার জন্যে আবার একটা দুর্ব্বল চেষ্টা করলে: আমরা তো সমষ্টিকৃত একটা জীবন পাই নি, বিচ্ছিন্ন কতোগুলি মুহূর্ত্ত পেয়েছি। দুয়েকটা রঙিন, দুয়েকটা ম্লান। মন্দ কী! আমি-ও না হয় বিয়ে করলাম, সুভা। তোমাকে দেখে আমার কেবল তারই লোভ হচ্ছে।

সুভা আবার যেন সারা গায়ে হাল্কা হ'য়ে গেলো। খুসিতে ঝিক্‌মিকিয়ে উঠলো: করবে, সত্যি বিয়ে করবে?

—ভাবছি। কিন্তু তোমার সুবিধের জন্যে নয়। সুকুমার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো: বিয়ে করলেই আমার টিকে নেয়া হ'য়ে যাবে, আমার ছোঁয়াচ থেকে তুমি থাকবে ইম্যিউন্, তা ভেবো না। করলে নিজের সুবিধের জন্যেই করবো। সুখের চেয়ে সুবিধেতেই আমাদের ভালো হাত খেলে। সুকুমার এলো এক পা এগিয়ে: তোমার হাতে ভালো মেয়ে আছে?

আঁচলের ডগাটুকু আঙুলে জড়াতে-জড়াতে সুভা বললে,—কী রকম মেয়ে তুমি চাও?

—তোমার কী মনে হয়?

—বা, তুমি বিয়ে করবে, তোমার পছন্দ, আমি তার কী জানি।

—ঠিকই তো, তুমি তার কী জানবে? সুকুমার লঘু গলায় বললে,—ধরো এই তোমার মতো। না, না, অমন চমকে উঠো না। মানে, তোমার মতো সহজে যে সুখী হ'তে পারে, তোমার মতো স্বামীকে যে ভক্তি করে, ভয়মূলক ভক্তি—মানে, বুঝলে না, এই বন্ধু-বান্ধব এলে এক পেয়ালা চায়ের ওপর দিয়েই অল্প-খরচে যে ভদ্রতাটা সেরে নিতে পারে—

সুভা উছলে উঠলো: আছে।

—কোথায়?

—বোসো। পিসিমাকে ডেকে আনি। তাঁর শ্বশুর-বাড়ির সম্পর্কের কোন এক ভাগ্নি আছেন, তার জন্যে তাঁর এক পাত্র চাই। স্বচক্ষে দেখিনি, কিন্তু শুনেছি মেয়েটি খুব ভালো।

—এবার সত্যি তুমি আমাকে তাড়ালে, সুভা। সুকুমার সোজা উঠে দাঁড়ালো: এবার নামতে হয়।

সহাস্য দুষ্টু মুখে স্বভা জিগগেস করলে : এটা তোমার কোন ষ্টেশন ?

—তোমার উদার ঔদাসীন্য। প্রেমের ব্যাপারে, সুকুমারকেও দেখাদেখি হাসতে হ'লো : বিস্মৃতির চাইতে এই ঔদাসীন্যটাই মর্মান্তিক। না, আমি যাই।

তাকে যাবার জন্যে অলক্ষ্যে একটু জায়গা ছেড়ে দিয়ে স্বভা বললে,—এক পেয়ালা চা-ও খেয়ে যাবে না ?

—কী হ'বে ? সুকুমার টুপি পরলে : তাড়িয়ে দিলে লোকে আর কী করতে পারে বলো ?

সত্যি সে চলে যাচ্ছে দেখে স্বভার মুখ নির্মেঘ তরলতায় ভ'রে স্নিগ্ধ হ'য়ে এলো : বা, তুমিই তো বিয়ে করতে চাইলে, বললে মেয়ে খুঁজে দিতে। আমি তোমাকে তাড়ালুম কোথায় ? বেশ তো, না-ই বা করলে বিয়ে। তুমি তো আর মেয়ে নও যে তোমার উপর জোর চলবে।

উদ্যত গতি সংযত ক'রে সুকুমার ঘুরে দাঁড়ালো, ঘন হ'য়ে দাঁড়ালো। বললে—তা হ'লে সত্যি তুমি আমাকে চ'লে যেতে বলছ না। তা হ'লে আরো একটুখানি ব'সে গেলেই তো পারি। চেয়ে দেখলো স্বভার মুখ, সেই নির্মেঘ তরল মুখ, গাম্ভীর্যে কেমন কালো হ'য়ে এসেছে। টুপিটা নামিয়ে চেয়ারে ফের ফিরে যেতে-যেতে বললে,— আমি থাকবো ব'লে তোমার মুখের এই যে ভয়, আমি চ'লে যাবো ব'লে তোমার সেই পুরোনো কাতরতার মতোই সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু সুখই তোমাদের মানায়, সৌন্দর্য্য নয়।

সুকুমার বসলো। স্বভা উঠলো চঞ্চল হ'য়ে। গায়ের সমস্ত রেখায় কণ্টকিত হ'য়ে সে বললে,—বোসো। আমার এখন অনেক কাজ। দেখি চাকরটা উনুন ধরালো কি না।

ব'লে এমন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে সে মুছে গেলো, নিবে গেলো, ম'রে গেলো, যেন কোনোকালে এই স্তব্ধতার ঘুম ভাঙবে না।

তাকে সে ব'সে থাকতেই ব'লে গেলো বটে।

স্তব্ধতার অন্ধকারে আরো খানিকক্ষণ সে নিশ্বাস নিতো হয়তো, কিন্তু দরজার কাছে কা'র জুতোর শব্দ। সুকুমার মুখ তুললো। ভদ্রলোককে চেনা লাগছে। কোনো এক সময় ট্রেনে একসঙ্গে ট্র্যাভেল্ করেছে ব'লে মনে হচ্ছে।

অন্ধ ট্রেন কোথায় না-জানি নিরুদ্দেশ হ'য়ে ছুটে চলেছে।

চাদরটা বাঁ-কাঁধের উপর আলগোছে তুলে দিতে-দিতে সিতাংশু এলো এগিয়ে। সৌজন্যে সুকান্ত তার চেহারা। একটু বিস্মিত হ'য়ে সে বললে,—আপনি ? আপনি কোত্থেকে ?

সুকুমার উঠে দাঁড়ালো : হ্যাঁ, আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে।

—বা, প্রিলিমিনারি ল-ক্লাসে। ইভ্‌নিঙ পি-সেক্‌সান। মনে নেই? সিতাংশু বল্‌লে,—সেই মুট্‌-কোর্ট।

—হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে।

—বসুন, বসুন, কতোদিন পর দেখা বলুন তো? মুখোমুখি দু' জনে বসলো : ওকালতি করছেন বুঝি আজকাল? আমার মশাই, আইন সহ্য হ'লো না, প্রতীক্ষা করাটাই আমার ধাত নয়। চাকরি একটা হাতে পেতেই ও-সব ছেড়ে দিলুম। আপনাদের অসীম দুরাশা, আপনাদেরই হ'বে।

সুকুমার নীরবে একটু হাসলো।

—না, না, বার্ যতোই ক্রাউডেড হোক না কেন, এই আপনাদেরই ভেতর থেকে আসবে আবার রাসবিহারী। জায়গা না ছেড়ে দিয়ে উপায় কী। ভবিষ্যৎ ছেড়ে সিতাংশু এবার বর্ত্তমানে চ'লে এলো, প্রত্যক্ষ বাস্তব বর্ত্তমানে : তারপর, আমার সঙ্গে কোনো কাজ ছিলো?

সুকুমার নির্লিপ্ত গলায় বল্‌লে,—না, সুভার কাছে এসেছিলাম।

—সুভার কাছে? তাকে আপনি চেনেন নাকি?

—চিনি না?

—কোনো আত্মীয়তা?

—আত্মীয়তা না থাকলে চেনা হ'তে পারে না?

—বা, নিশ্চয়ই পারে, একশো বার পারে। সিতাংশু চারদিকে চাইতে লাগলো : কিন্তু সুভা গেলো কোথায়? তাকে খবর দিয়েছেন?

—হ্যাঁ, খানিকক্ষণ তো এখানেই ছিলো।

—খানিকক্ষণ ছিলো, এখন গেলো কোথায়?

সুকুমার হাসলো : তার নাকি এখন অনেক কাজ। ব'সে গল্প করবার তার সময় নেই।

—সময় নেই? সিতাংশু ব্যস্ত হ'য়ে উঠে পড়লো : অতিথিকে নিচে একলা বসিয়ে রেখে দিব্যি সে স'রে পড়েছে? চমৎকার শিক্ষা তো তার। আসুন, আসুন আমার সঙ্গে।

সুকুমার থতিয়ে বল্‌লে,—কোথায়?

—কোথায় আবার! ওপরে।

—না, না, সুকুমার যেন এতো অবারিত আতিথেয়তা সহ্য করতে পারছিলো না : আমি এবার যাই।

—আপনারো কাজ আছে বুঝি? প্রশান্ত বন্ধুতায় সিতাংশু এবার তার হাত ধরলো: আপনি তো শুধু সুভার একার বন্ধু নন্। সে ছাড়লেও আমি আপনাকে ছাড়তে পাচ্ছি না। চলুন।

সামান্য বাধা দিয়ে সুকুমার বললে,—বেশ তো, এইখেনেই তো বেশ আছি। আর ওপরে গিয়ে কী হ'বে?

সিতাংশু আবার তাকে আকর্ষণ করলো: না, না, তা হয় না। আমার একার সঙ্গে চেনা হ'লে হয়তো এইখেনেই আপনাকে জায়গা দিতুম, কিন্তু বৈঠকখানা ছেড়ে স্বয়ং অন্তঃপুরের সঙ্গে যখন আপনার আলাপ, তখন এইখেনে আপনাকে বসিয়ে রাখাটাই অভদ্রতা হ'বে।

—কিন্তু সত্যি আমার কাজ ছিলো।

—কাজ ছিলো তো আগে চ'লে যান নি কেন? না, তা কিছুতেই হ'বে না। আমি যখন একবার ধ'রে ফেলেছি, তখন আমার মুঠো ছেড়ে আপনাকে পালাতে দেবো না।

শৃঙ্খলিত একটা নিরীহ পশুর মতো সুকুমার সিতাংশুর সঙ্গে সিঁড়ি ধ'রে-ধ'রে শরীরের বোঝাটাকে বহন ক'রে নিয়ে চললো।

উঠছে, আর সিতাংশু ডাকছে: সুভা! সুভা!

কোনো শব্দ নেই।

আবার ডাক। সেই ডাকে উন্মুক্ত প্রান্তরের হাওয়া, সেই ডাকে সমুদ্রের উদারতা।

সুকুমারের যেন সহ্য হচ্ছিলো না। বললে,—আমার জন্যে বোধহয় চা করছে।

—চা করছে! কেন, কাছে বসে'ই তো করতে পারতো অনায়াসে। তাই ব'লে এমনি পালিয়ে যাবার কী হয়েছিলো!

বেরিয়ে এলেন পিসিমা। মাথার উপর আঁচলটা ক্ষিপ্র হাতে গুছোতে-গুছোতে হাসিমুখে বললেন,—ও মা! তুমি কখন এলে? কী আশ্চর্য্য!

—এ কী, পিসিমাও একে চেনো নাকি?

—বা, চিনি না, সেই কতোটুকু ছোট বেলা থেকে ওকে দেখেছি। ওর ঠিকানাটার জন্যে কতোদিন থেকে—

তাঁর মুখের উপর সিতাংশু গর্জে উঠলো: থাক্। ভদ্রলোক একা নিচে ব'সে আছেন, আর ওপরে তুমি তাঁর ঠিকানা খুঁজছ। আশ্চর্য্যই বটে। সুভা, সুভা গেলো কোথায়?

সিতাংশুর সঙ্গে সুকুমার চ'লে এলো তার শোবার ঘরে। এর চেয়ে আশ্চর্য্য আর কী হ'তে পারে পৃথিবীতে? চ'লে যাবার জন্যে সামান্য সে একটা ভঙ্গি পর্য্যন্ত করতে পারলে না। দিব্যি ভদ্রলোকের মতো শিষ্ট, কুণ্ঠিত হ'য়ে চেয়ারে এসে বসলো।

পাঁচ

সিতাংশুর সেই শোবার ঘর। পরিচ্ছন্নতায় মেঝেটা ঝক্‌ঝক্ করছে, দেয়ালগুলো ভীষণতরো সাদা। নিচু খাটে পরিপাটি বিছানা হু'টো নিটোল শুভ্রতায় ফু'লে ফেঁপে ফেনিয়ে রয়েছে। সমস্ত ঘরের সুষুপ্ত আবহাওয়ায় এই শুভ্রতার সুতীব্র গন্ধ। নিজেকে সুকুমারের কেমন যেন অসহায়, অবসন্ন বোধ হ'তে লাগলো।

সিতাংশু ব্যস্ত হ'য়ে বললে,—দাঁড়ান, সুভাকে ডেকে নিয়ে আসি!

সুভা নিজে থেকে এসেই হাজির।

—বা, তুমি এতোক্ষণ ছিলে কোথায়? ভদ্রলোককে নিচে বসিয়ে রেখে তুমি দিব্যি এসে ওপরে গা-ঢাকা দিয়েছ। চা, চা ক'রে দাও শিগ্‌গির। র‍্যাকের উপর সিতাংশু চাদর খুলে রাখলো: ভদ্রলোক বলছিলেন তুমি নাকি তাঁর জন্যে চা করতে গেছ। এতোটুকু কাণ্ডজ্ঞান তোমার নেই?

সুভার দিকে চেয়ে চা করবার কথাটা এখন আর ভাবা যাচ্ছে না বটে। এরি মধ্যে সে ঘুমে-ম্লান সাড়িটি ছেড়ে প্রতীক্ষায়-প্রখর আরেকটা সাদা সাড়ি পরেছে। এর আগে শরীরে তার একটা বিষণ্ণ শৈথিল্য ছিলো, মুখে ছিলো নরম পাণ্ডুরতা। এখন নতুন সাড়ির চমকে শরীরে একটা দ্যুতিমান মসৃণতা এসেছে। মুখ এখন গোল হ'য়ে উঠেছে নিশ্চিন্ত তৃপ্তিতে, তার দিকে সত্যি আর এখন তাকানো যায় না।

মাঝ-নদীর নৌকো পাড়ে এসে নোঙর নিয়েছে। সুর পেয়েছে এতোক্ষণে একটা কথা।

সে এখন এতো বেশি সম্পূর্ণ, এতো বেশি ছন্দোবদ্ধ যে মনে হয় সে নিঃশেষে গেছে ফুরিয়ে। এই ফুরিয়ে যাওয়াটাই যেন তার ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বাঙ্গে তা অহঙ্কারে উঠেছে স্ফীত হ'য়ে। এতোক্ষণে যেন সে খুলেছে, পরিমিত পটভূমি পেলে ছবি যেমন খোলে। রঙে-রেখায় সে এখন শাণিত, নিষ্ঠুর। আনন্দ যেন সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে কঠিন একটা বর্ম্মের মতো। আর কোনো ইঙ্গিত নয়, রূঢ়, উলঙ্গ একটা সত্যভাষণ।

দেখা তাকে সত্যিই সুকুমারের শেষ হয় নি।

স্বামীর তিরস্কারটি সুভা যেন মনে-মনে আস্বাদ করলো। হালকা, রূপোলি গলায় বললে,—বা, ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁর সামনে একটু ভদ্র হ'য়ে বেরুতে হয় তো?

সুকুমার না ব'লে থাকতে পারলো না: কিন্তু ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ সারবার সময় তো তোমার সে-কথা মনে হয় নি। তখন তো এমনিতেই—

মিনতিতে চোখ দু'টি একটু করুণ ক'রে সুভা সিতাংশুর দিকে তাকালো। যেন খুঁজলো আশ্রয়।

সিতাংশু বললে—ভদ্রলোক এখানে আমাকে বলা হচ্ছে। এ হচ্ছে ওঁর পতি-প্রীতির বৈকালিক পরিচয়। অন্যের কাছে এমনিতে উনি সাধারণ হ'তে পারলেও, আমার কাছে—

চোখ দিয়ে সুভা সিতাংশুকে একটা চিম্‌টি কাটলো। লজ্জায় সুকুমারের মর্ম্মান্তমূল পর্য্যন্ত টন্‌টন্ ক'রে উঠলো। তবু কিনা সে এখনো হাত পা গুটিয়ে এই ভদ্রতার ফাঁদের মধ্যে চুপচাপ ব'সে আছে।

সিতাংশু উঠলো প্রায় ভদ্রতায় বর্ব্বর হ'য়ে: কিন্তু অতিথি এসে ঠায় ব'সে আছেন, আর তুমি তাঁর কিছুই সম্বর্দ্ধনা করছ না। পুরাকালে—

নির্বাধ মুক্তিতে সুভা তরঙ্গিম হ'য়ে উঠলো। হেসে বললে,—আমার অতিথি আমিই তার সৎকারের ব্যবস্থা করতে পারবো। তোমার কিছু বলতে হ'বে না। তারপর সুকুমারের দিকে সে তার একটি দৃষ্টি পাঠালে—খুসিতে ধারালো, পিছল, তির্য্যক একটি দৃষ্টি: তুমি আরেকটু বোসো দয়া ক'রে। আলাপ করবার জন্যে তোমাকে লোক দিয়ে গেলুম।

গতির ঢেউয়ে চারপাশের খানিকটা হাওয়া উথ্‌লে দিয়ে সুভা গেলো হাওয়ায় মিলিয়ে।

ভদ্রতাটা এমন নিদারুণ সংক্রামক, সুকুমার নির্লজ্জের মতো নিস্তেজ হ'য়ে ব'সে রইলো। নির্লজ্জের মতো বললে,—না, আমি এবার উঠি, কোর্ট থেকে এখনো বাড়ি যাই নি।

সিতাংশু মরিয়ার মতো বললে,—পাগল হয়েছেন? বাড়ি যাননি, ধরুন না এই আপনার বাড়ি; আমার সতীর্থ, সুভার বন্ধু, পিসিমার চেনা—মুখের কথায়ই তো আপনাকে আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। কারুর সঙ্গেই আপনি এখনো মন খুলে আলাপ কর্‌তে পারলেন না। চলুন, ঘরেতে বড্ড গরম, বারান্দায় গিয়ে বসি।

বারান্দায় বেরিয়ে আস্‌তে-আসতে স্থকুমার বললে,—না, এখনো এই কোর্টের পোষাকটা প'রে আছি।

—বেশ তো, জিন্‌-লাগাম খুলে ফেলুন না। আমার ধুতি-পাঞ্জাবি দিচ্ছি, be up-to-date. সিতাংশু জোরে হেসে উঠলো: আপনিও স্থভার মতো ভদ্র হ'য়ে যান।

আজকে আবার কেন যে স্থকুমার এসেছিলো,—অপ্রতিবাদে আবার তাকে বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসতে হ'লো।

সিতাংশু ডাকলো: পিসিমা।

টুকরো একটা কাগজ ও পেন্সিল খুঁজে আনতেই যা পিসিমার দেরি হচ্ছিলো।

—বলো দিকি তো তোমার ঠিকানাটা, এবার পষ্ট ক'রে লিখে রাখি।

সিতাংশু জিগ্‌গেস করলে: ওর ঠিকানা দিয়ে তোমার কী হ'বে?

পেন্সিলটা পাঁচটি সম্মিলিত আঙুলে আঁট ক'রে চেপে ধ'রে পিসিমা বল্‌লেন,—দরকার আছে।

—কী দরকার?

পিসিমা গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লেন,—আছে। সবতাতে তুই কেন সর্দারি করতে আসিস্‌?

সিতাংশু হেসে উঠলো: বা, আজকালকার দিনে তুমি একজনের ঠিকানা আদায় ক'রে নেবে, অথচ তার একটা জবাবদিহি দেবে না? ইচ্ছে করলে উনি তোমাকে একটা ভুল ঠিকানা দিয়ে যেতে পারেন জানো?

—কেন, ওর ভালোর জন্যেই তো চাচ্ছি।

—ভালোর জন্যে? কেমনধারা ভালো সেটা?

—হ্যাঁ, ওর একটা বিয়ের সম্বন্ধ করবো।

—বিয়ের সম্বন্ধ করবে? সিতাংশু চম্‌কে উঠলো: কেন আপনি এখনো বিয়ে করেন নি নাকি?

স্থকুমারের হ'য়ে পিসিমাই উত্তর দিলেন: না। এমন উপযুক্ত, স্থন্দর ছেলে—কোথাকার কোন এক মেয়ের জন্যে নাকি··· কী যে তোদের আজকালকার ফ্যাসান্‌!

সিতাংশু উৎসাহিত হ'য়ে উঠলো: বলো, বলো, খুলে বলো, পিসিমা। এ তো দেখি দিনে-দুপুরে আনকোরা একটা উপন্যাসের মতো লাগছে।

—কে জানে বাপু তোদের যতো আজগুবি মাথা-ব্যথা। পিসিমা মুখ বেঁকিয়ে

বললেন,—মেয়ে একটাকে এককালে চোখে লেগেছিলো বলে'ই চিরকাল সেই চোখ বুজে থাকতে হ'বে এমন সৃষ্টিছাড়া কথা তো কখনো শুনিনি বাপু। সেই মেয়ে যখন আর মেয়ে রইলো না, তখন তার জন্যে—

—কেন, সেই মেয়ের কী হ'লো? মেয়ে রইলো না মানে? সিতাংশু সুকুমারের দিকে চেয়ে ঠাট্টার সুরে বললে,—এভল্যুশান্‌এ পুরুষ হ'য়ে গেলো নাকি?

—বা, পিসিমা বললেন—সেই মেয়ের পরে অন্য জায়গায় বিয়ে হ'য়ে গেলো না?

—সত্যি, সিতাংশু হেসে উঠলো: তবে সে আর মেয়ে রইলো কোথায়? বলো কী, সে মেয়ে দিব্যি বিয়ে করতে পারলো, আর জলজ্যান্ত পুরুষ হ'য়ে তিনি বিয়ে করতে পারছেন না? নিশ্চয়, নিশ্চয়, একশোবার ঠিকানা নেবে।

পিসিমা এগিয়ে এলেন: হ্যাঁ, বলো, যত্ন ক'রে লিখে না রাখলে হ'বে না। কোথায় কবে আবার মিলিয়ে যাও তার ঠিক কী!

সুকুমারকে ঠিকানাটাও দিতে হ'লো অবিশ্যি।

সিতাংশু বললে,—তুমি এতো কথা জানলে কোত্থেকে, পিসিমা?

—বা, সুভার কাছ থেকেই তো শুনেছি।

—সুভার কাছ থেকে শুনেছ? সিতাংশু চেয়ারে পিঠটাকে নামিয়ে আনলো: যতো ইন্‌টারেষ্টিঙ্‌ কথা ও কেবল তোমাকে বলে। আমার বেলায় কেবল চাল-ডালের হিসেব।

পিসিমা এবার সুকুমারকে লক্ষ্য করলেন: চিঠি তোমার বাবাকেই লিখতে হ'বে, কী বলো?

—বাবাকে লিখতে হ'বে, মানে? সিতাংশু বসলো আবার খাড়া হ'য়ে: বিয়ে করবেন উনি, তার মাঝে ওঁর বাবা আসছেন কোত্থেকে? য্যাদ্দিন ধ'রে যে উনি বিয়ে করেন নি, তাতে ওঁর বাবা কী করতে পারলেন জিগ্‌গেস করি?

—রাখ্‌, তোদের বিলিতি কেতায় ঝালাপালা হ'য়ে গেলুম।

দস্তুরমতো ভদ্রলোকের মতো বিয়ে—

সুকুমার আপাদমস্তক ঘেমে উঠলো, ঢোঁক গিলে বললে,—হ্যাঁ, বাবাকেই লিখবেন।

—উত্তর দেবেন অবিশ্যি উনি নিজে। জমাট আবহাওয়াটাকে একমুহূর্তে তরল ক'রে দিয়ে সিতাংশু বললে,—কিন্তু কা'র সঙ্গে সম্বন্ধ করবে শুনি? তোমার মেয়ে কোথায়?

—কেন, প্রমীলা।

—প্রমীলা ? এক ফুঁয়ে এক-চিম্‌টি পেঁজা তুলোর মতো সমস্ত আবহাওয়াটা সিতাংশু উড়িয়ে দিলো।

—কেন, প্রমীলা এমন কী অপছন্দের মেয়ে জিগ্‌গেস করি ? চাপা রাগে পিসিমার মুখ-চোখ গুমোট হ'য়ে উঠলো : দিব্যি লক্ষ্মী-শ্রী চেহারা। রান্না বলো, ঘরের কাজকর্ম্ম বলো, সব দিকে চৌকস। তোদের গুণধরীদের মতো বিছানায় লম্বা হ'য়ে কেবল নবেল পড়তে শেখেনি।

সিতাংশু হাসিমুখে বল্‌লে, গুণধরীদের একজন এই আসছেন।

সিঁড়ির দিকে সুকুমারের চোখ পড়লো। হাতে জলখাবারের বিরাট একটা থালা নিয়ে সুভা আগে উঠে আসছে, পেছনে ট্রে-তে ক'রে তৈরি চায়ের বাটি সাজিয়ে চাকর।

পিসিমা অন্যত্র অন্তর্ধান করবার মুখে ব'লে গেলেন : বেশ তো, প্রমীলাকে স্বচক্ষে দেখানোই যাবে না-হয়। আমি কালকেই চিঠি লিখে দেবো ওকে এখানে পাঠিয়ে দিতে। দেখি কেমন তুমি পছন্দ না ক'রে পারো।

ঘরের ভিতর থেকে সুভা ছোট একটা টিপাই নিয়ে এলো। খাবারের থালা ও চায়ের বাটি দু'টো পর-পর সাজিয়ে রেখে ভরা গলায় বল্‌লে,—নাও, মুখে তোলো।

সুকুমার আরেকবার চোখ দিয়ে সুভার সর্ব্বাঙ্গ পরিপ্লুত, আচ্ছন্ন ক'রে ধরলো। সুখে শীতল, আরামে রমণীয়, সেই নিশ্চেতন নীহারপুঞ্জে সে এতোটুকু আশ্রয় খুঁজে পেলো না। স্তব্ধতায় এতো কঠিন যে-কোথাও একটা আঁচড় টানবার জায়গা নেই। মাটির কতো গভীরে যে সে শিকড় মেলে দিয়েছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তার এই বিহ্বল শ্যামলতায়। বহুধনিকা নগরীর মতো সে এখন ঐশ্বর্য্যে সমারূঢ়া।

ঘরে যেন আগুন লেগেছে এমনি ব্যস্ততায় সুকুমার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে : না, না, এতো সব খাবার আমার সময় নেই। অসম্ভব।

সিতাংশু বাধা দিয়ে বল্‌লে,—তা কি হয় ? অন্তত চা-টা—

সুভা হাল্‌কা ঠোঁটে একটু টিপ্পনি কাটলে : খেতে আবার তুমি অরাজি কবে ? আগে তো—

হ্যাঁ, চা-য়ে একটু চুমুক দেয়া যেতে পারে, নইলে নিতান্তই অভদ্রতা হয়। থালাটা সিতাংশুর দিকে ঠেলে দিয়ে সুকুমার বল্‌লে,—আপনি ?

জোড় হাত ক'রে সিতাংশু বিনয়ে বিগলিত গলায় বল্‌লে,—মাপ করুন। দেখছেন না কি-রকম ফ্রেইল্ চেহারা, ও-সব বাজারের জিনিস আমার সহ্য হয় না। আপনারা হচ্ছেন যুবক-বাঙলার লোক—আপনাদের কথা আলাদা।

এতোক্ষণ সুকুমার এটা লক্ষ্য করে নি। সুভার হাতে যে অনেক পয়সা আছে,

আছে যে অপব্যয় করবার প্রভুত্বহীন অধিকার, তা আজ প্রমাণিত না করতে পারলে তার শান্তি নেই।

কাল এমনটি ছিলো না। কাল আয়োজন ছিলো অল্প, অবকাশ ছিলো অগাধ। কাল ব্যয়ের থেকে সঞ্চয়ের দিকে তার দৃষ্টি ছিলো গভীরতরো। কাল সে কাছে ব'সে নিজ হাতে অম্‌লেট ভেজে দিয়েছে—কাল তার চারপাশে ছিলো সে বিস্তৃত, অফুরন্ত। আজ সে কেমন শীর্ণ, সঙ্কীর্ণ হ'য়ে এসেছে। আজ আর সেই বিশ্রাম নয়, পলায়মান ক্ষিপ্রতা।

একটু সে কিছু মুখে দিলো কি না দিলো।

সিতাংশু সুভাকে বললে, বা, ভদ্রলোক তোমার কাছে এসেছেন, আর তুমি না বল্‌লে কোনো কথা, না বসলে একটু কাছে। তোমার কেবল কাজ আর কাজ। কাজের মধ্যে জানো তো শুধু এই সাজ করতে।

সুকুমার এতোক্ষণে বল্‌বার গলা পেলো, সুভার হাসির প্রচ্ছন্ন নিষ্ঠুরতা মুহূর্তে তার স্নায়ুগুলিকে বেঁধে দিলো উঁচু সুরে। বল্‌লে,—কথা আমাদের কালকেই সব হ'য়ে গেছে।

—কাল? কালকে আপনি এসেছিলেন নাকি? বিস্ময়ে সিতাংশুও উঠে দাঁড়ালো: কই, আমাকে তো কিছু বলে নি সুভা।

এতো বড়ো আঘাতটাও সুভা তার নির্মল, অপর্যাপ্ত হাসিতে দ্রবীভূত ক'রে দিলো। বল্‌লে,—কখন আর তুমি বল্‌বার সময় দিলে? করলে ঝগড়া, খেলে ভাত, তার পর দিলে লম্বা ঘুম।

—কিন্তু দিনের বেলা?

—দিনের বেলা! সুভা সাড়ির ভাঁজে-ভাঁজে খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠলো: এ আবার কী এমন একটা জরুরি কথা যে দিনের বেলা মনে ক'রে রেখে তোমাকে বলতে হ'বে?

অসম্ভব।

সিতাংশু ভদ্রতায় আবার অবারিত হ'য়ে উঠলো: ভালোই হ'লো। কাল যখন এসেছিলেন, তখন আগামী কাল-ও আসবেন আশা করা যায়। এবার অন্তত আমার খাতিরে, কী বলেন? ভদ্রলোককে পান এনে দাও, সুভা।

সুভা বল্‌লে,—কী কেবল ভদ্রলোক-ভদ্রলোক বলছ? ভদ্রলোকের নাম জানো না? তোমার কী অদ্ভুত স্মরণশক্তি! অথচ নাকি একসঙ্গে কিছুকাল পড়েছিলে।

লজ্জিত হ'য়ে—সুভার কাছে স্বয়ং সিতাংশু পর্যন্ত অসহায়—মাথা চুলকে সিতাংশু বল্‌লে,—হ্যাঁ, তা, নামটা ঠিক মনে পড়ছে না বটে।

—সুকুমার।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এতোক্ষণে মনে পড়েছে বটে—

ততোক্ষণ সুভা আর সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। নামটা উচ্চারণ করে'ই তাকে হাওয়ায় হারিয়ে যাবার জন্যে অনেকটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে সে পাশের ঘরে অদৃশ্য হয়েছে।

সুকুমার তখন নামবার মুখে। হঠাৎ পিছন থেকে সুভা এসে বললে,—এই নাও, পান নাও।

পাংশু মুখে সুকুমার একটু হাসলো: তোমার স্মরণশক্তিকেও বিশেষ প্রশংসা করতে পারছি না। আমি কি পান খাই? কাল খেয়েছি?

—কাল না খেলে আজো খেতে হ'বে না এমন কোনো কথা আছে নাকি? সুভা গলা নামিয়ে বললে,—আজ এসেছ ব'লে কাল-ও আবার তুমি আসবে এমনো তো কোনো কথা নেই। নাও। সুভা আস্তে অল্প একটু হাত বাড়িয়ে দিলো।

একটা পান-ও তাকে নিতে হ'লো অবিশ্যি।

অথচ এখনো সে নিচে নামতে পারলো না।

নামতেই হয়তো যাচ্ছিলো, হঠাৎ সিঁড়ি বেয়ে উচ্ছ্রিয়মান কা'র কলকণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গতিমান পদশব্দ উঠলো ধ্বনিত হ'য়ে: দিদি আছো ভাই? কী মজাই যে আজ হ'লো—ভীষণ কাণ্ড—

সিতাংশু উঠলো আতঙ্কের ভাণ ক'রে: স'রে আসুন, চেয়ারটায় চেপে বসুন, সুকুমারবাবু। মীনা, মীনা আসছে—ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প!

ছয়

সুকুমার সত্যিই স'রে এসে চেয়ারে চেপে বসলো।

কী জানি সে একটা অতিকায় কিছু ভয় করেছিলো, চেয়ে দেখলো সিঁড়ি দিয়ে একটি মেয়ে দ্রুত পায়ে উপরে উঠে আসছে।

উঠে এলো না-ব'লে উড়ে এলো বললে মেয়েটিকে বোঝা যাবে। তার শরীরে কোথাও হাড় আছে ব'লে মনে হয় না, কেবল কতোগুলি বাঁকাচোরা হালকা রেখা, রেখার তরল জল-ধারা। যেন হাওয়ায় ওড়ানো ফিনফিনে খানিকটা সিল্ক। গতির দ্যুতিতে সেই রেখাগুলি ভেঙে পড়েছে। অথচ অপূর্যমান দেহটি অপক্ক একটি পিচের মতো আঁট। তার আবির্ভাবের মধ্যে সব চেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে তার এই

প্রতিমা, এই তার শিহরায়মান শারীরতা। নইলে নাকে-মুখে চোখে কোথায় যেন সে ভীষণ বেমানান। এই অস্পষ্ট, স্পর্শ-অসহ বেমানানত্বটুকুই তার বৈশিষ্ট্য।

অপরিচিত ভদ্রলোক দেখেও মীনার উৎসাহে ভাটা পড়লো না। সারা গায়ে সিল্কের একটা এলোমেলো ঝড় তুলে সে বললে,—বাসএ আজ যে একটা ভীষণ কাণ্ড হ'লো, জামাইবাবু—

সিতাংশু ত্রস্ত হ'য়ে বললে,—কোনো য়্যাক্সিডেন্ট ?

—তার চেয়েও রোমহর্ষক। বসবার একটা চেয়ার দাও, দিদি। বা, আমার চা কই ?

সুভা পাশের ঘর থেকে আরেকটা চেয়ার এনে দিলো। বললে—হচ্ছে। আগে তোর গল্পটা শুনি।

—সে ভীষণ থ্রীলিঙ। মীনা তখনো নরম হ'য়ে চেয়ারে বসতে পারছে না : কলেজ থেকে ফিরছিলুম বাসএ। আমার সিট্‌টাতে একা আমি—ড্যালহৌসি স্কোয়ার পর্য্যন্ত। অফিস ছুটি হ'য়ে গেছে, দেখতে দেখতে বাস উপরে-নিচে ভর্ত্তি হ'য়ে গেলো। মানে, সব সিট্, শুধু আমারটা ছাড়া। ভদ্রলোকেরা সমানে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন, অথচ সাহস ক'রে আমার পাশে বসতে পাচ্ছেন না—আমাদের দেশের পুরুষরা কী demoralised যে হ'য়ে গেছে—

—এই য়্যাক্সিডেন্ট ? সুভা হেসে উঠলো।

—কী ক'রে বসবে ? সিতাংশু বললে,—তোমারটা যে লেডিজ সিট।

—ককৃখনো না। আমি ইচ্ছে ক'রে ঐ সিটটা ছেড়ে দিয়ে বসি। মীনা যেন অপমানিত বোধ করছে এমনি ঝাঁজালো গলায় বললে,—পুরুষের সঙ্গে দাঁড়িয়ে সমান স্বাধীনতা নেবো, অথচ সমান দায়িত্ব নেবো না, এই চরিত্রহীনতাটা আমার কাছে অসহ্য। মেয়েদের ব'লে আলাদা ক'রে কোনো একটা করুণা নেয়া যে কী মর্ম্মান্তিক অপমান—থাক্, তারপর শোনো।

সুভা বললে,—তারপর একজন সাহসী পুরুষ তোর পাশে ব'সে পড়লো।

—সাহসী না হাতি। অবলাদের চাইতেও দুর্ব্বল। মীনা নিস্তেজ হ'য়ে এতোক্ষণে বসতে পারলো চেয়ারে : তোমায় বলবো কি দিদি, বয়সে জামাইবাবুদের চাইতেও বড়ো হ'বেন, একটি ভদ্রলোক নিতান্ত অপরাধীর মতো জড়োসড়ো হ'য়ে আমার পাশে ব'সে পড়লেন। তাঁর সৎসাহসের জন্যে মনে-মনে তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ দিচ্ছিলুম, হঠাৎ শুনতে পেলুম সারা বাসময় চাপা একটা গুঞ্জন উঠেছে।

—গুঞ্জন ? গুঞ্জন আবার কিসের ?

—প্রথমটা বুঝতে পারিনি। পরে দেখলুম সেই অস্ফুট গুঞ্জনটা কুৎসিত একটা

প্রতিবাদের চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন ভদ্রলোকের মুখের ওপর স্পষ্ট ব'লে বসলো: 'আপনি মশাই ভদ্রমেয়ের সম্মান রাখতে শেখেন নি? আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি, আর আপনি বেমক্কা ওঁর পাশে ব'সে পড়লেন?' সবাই, যারা-যারা ব'সে ছিলো, অমনি ধুয়ো ধরলো: 'তুলে দিন মশাই, এ কী বেয়াদবি?'

কথাটা কি মীনা শেষ করতে পারে, হাসির ঘায়ে প্রত্যেকটি কথা তার ছিটকে পড়ছে।

—আর ভদ্রলোক কী করলেন? সিতাংশু জিগ্‌গেস করলে।

—সে আরো মজার। ভেজা বেড়ালটির মতো ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। সত্যি-সত্যি উঠে দাঁড়ালেন, দিদি।

—আর তুই?

—আমি খপ্‌ ক'রে তাঁর হাত ধ'রে ফেল্‌লুম।

—হাত ধ'রে ফেল্‌লি? বলিস কী?

—ও, তাকে প্রায় হাত ধরাই বলে। ভদ্রলোককে বল্‌লুম,—'এখানে দু'জনের মতো বসবার ঢের জায়গা আছে, আপনি স্বচ্ছন্দে বসুন। আপনি বসলে আমার গায়ে ফোস্কা পড়বে না।'

—বল্‌লি তুই? তারপর? ভদ্রলোক বসলেন?

—বসলেন মানে? বসতে বাধ্য হ'লেন। সেই অপমান তো ভদ্রলোককে করা নয়, করা সমস্ত মেয়েদের অবলাপনাকে। পয়সা খরচ ক'রে সেই অপমান আমি গা পেতে নিতে পারি না।

—হ'লো। তারপর?

—তারপর আর কী! সমস্ত বাস্‌ চুপ। কেবল এঞ্জিনের শব্দ।

সিতাংশু প্রকাণ্ড একটা নিশ্বাস ছেড়ে দার্শনিকের মতো একটা নির্লিপ্ত উক্তি করলে: পৃথিবীটা কী বেগেই যে চলেছে।

মীনাও অনুরূপ একটা ঠেকা দিলো: চলেছিই তো বেগে। এই বেগই তো আধুনিক যুগের পরম আবিষ্কার।

সিতাংশু কথাটাকে আরো টেনে নিয়ে এলো: চলেছি এমনি একটা বেগবান অন্ধ বাস্‌ এ চেপে। কোথায় গিয়ে যে ঠেকবো তার কোনো দিক খুঁজে পাচ্ছি না।

মীনার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎস্ফুরিত হ'য়ে উঠলো: চমৎকার নয় এই গতির অন্ধতা? আমরা তো জীবন নামক কোনো একটা বিচরণের বিস্তৃত জায়গা পাইনি, আমরা পেয়েছি মৃত্যুর সমুদ্রে আয়ুর কয়েকটা বুদ্‌বুদ। তাই দুই হাতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে উড়িয়ে দিয়ে যাই। শেষকালে দেউলে তো একদিন হ'বোই। কী বলো, দিদি?

—হ্যাঁ, সিতাংশু গাঢ় গলায় বললে—পৃথিবীময় এসেছে এই একটা তামসিক অন্ধতা। মানুষের যে কী পরিণতি হ'বে—

সুভা বাধা দিয়ে বললে,—বাবা:, তুমি কী ভীষণ মাষ্টার! কোন কথা থেকে কোন কথায় চ'লে এলে।

হাসিমুখে সুকুমার এতোক্ষণে কথা কইলো: পৃথিবীতে মানুষ আর বেশি দিন নেই।

—হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। সুভা এগিয়ে এলো: এ হচ্ছে আমার ছোট বোন মীনা, স্কটিশে থার্ড-ইয়ারে পড়ছে, আর ইনি সুকুমার মিত্র, আমাদের বন্ধু, আলিপুরের উকিল।

সুকুমার আবার, এবার বিশেষ ক'রে, সুভার সঙ্গে মিলিয়ে মীনাকে দেখলে। সুভা হচ্ছে পঠিত একটা রোমান্স, আর মীনা হচ্ছে সদ্যলিখিত একটা উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। দেখলে সুভার সেই মৃত অতীতের একটি জীবন্ত প্রতিরূপ, মধ্যাহ্ন-গগনবিহরণের পিছনে সেই অস্পষ্ট উষাভাস। সেই হারানো ক'টি মুহূর্ত্ত যেন মীনার চোখে এসে বাসা নিয়েছে, তার চারপাশে সেই হারানো দিনের ছায়া করা। সুভা যেমন ছিলো এ যেন তেমনি। তেমনি কেমন এলোমেলো, তেমনি কেমন বেমানান।

চেয়ারটা মুখোমুখি ঘুরিয়ে এনে মীনা বললে, নরম হাসিমুখে বললে,—পৃথিবীতে মানুষ থাকবে না কী বলছেন?

সুকুমার যেন এতোক্ষণ একটা বন্ধ ঘরে আটক প'ড়ে ছিলো, এবার বেরিয়ে এলো খোলা হাওয়ায়। গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বললে,—মানুষ থাকবে না মানে তার চেয়ে আর কোনো বৃহত্তর সৃষ্টির জন্যে পৃথিবীতে সে জায়গা ছেড়ে দেবে।

—আর সে যাবে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে? ভীত, মুগ্ধ গলায় মীনা বললে—সে কী ভয়ানক কথা!

—পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব কতোদিনের? সুকুমার দরাজ গলায় বললে,—কথাটাকে সৃষ্টি বলবো না, আবির্ভাব বলবো। কেননা—

—বুঝেছি, মীনা বললে,—বিবর্ত্তনের বহু পরিচ্ছেদ পেরিয়ে তবে আমাদের আসা।

—হ্যাঁ, ঈশ্বর আলাদা ক'রে কিছু আমাদের সৃষ্টি করেন নি। গলায় এবার সুকুমার বেশ স্ফূর্ত্তি পাচ্ছে। কারণ এই আলোচনা থেকে নিজেকে সে সম্পূর্ণ সরিয়ে আনতে পারলো: আমরা ঠিক আসিনি, আমরা হ'য়ে উঠেছি। আদিমতম একটা

অণু থেকে এই বিস্ময়কর রূপান্তর। আমরা তো পৃথিবীতে একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা। স্রোতের একটা প্রচণ্ড অভিঘাত মাত্র। কিন্তু স্রোত কি এইখেনেই শেষ হ'বে ভেবেছেন?

—তবে কোথায় নিয়ে যাবে মনে করেন?

—কে জানে হয়তো ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবো। সুকুমার বসবার ভঙ্গিটা ঋজু, বলোজ্জ্বল ক'রে তুললো: যেমন সরীসৃপ-যুগের বহু অতিকায় প্রাণী ভূপৃষ্ঠ থেকে লোপ পেয়ে গেছে। হয়তো বা থাকবো অন্য কোনো নবীনতর, বলবত্তর প্রাণের কাছে পদানত, যেমন এখন আমাদের কাছে পোকা-মাকড়, কেঁচো-শামুক। বা অলক্ষিতে রূপান্তরিত হ'য়ে উঠবো আর কোনো অপরিচেয়, অমেয় মহাশক্তিতে, যেমন Eohippus রূপান্তরিত হ'য়ে উঠেছে ঘোড়ায়। আমাদের সেই amphibian পূর্ব্বপুরুষদের শাখা-প্রশাখা ধ'রে আমরা তো কিছু কম পথ অতিক্রম ক'রে আসিনি। কিন্তু আমাদের এই বর্ত্তমান রূপ-পরিগ্রহ কতোদিনের?

কথাটা মীনার মুখে লেগে তক্ষুনি ফের ফিরে এলো: কতোদিনের?

—পৃথিবীর বয়েস যদি ধরা যায় দু' হাজার মিলিয়ন্ বছর, মানুষের বয়েস দশ মিলিয়ন্ বছরও হয়তো নয়। তা-ও সেই গুহাচারী প্রাগৈতিহাসিক মানুষ। আমরা, সভ্য মানুষ বলতে যাদের বুঝি, আমাদের মঞ্চাবতরণ মাত্র এই দশ হাজার বছরের। সমগ্র পৃথিবীর বয়সের অনুপাতে আমাদের বয়েসটা একবার ভাবুন—আমরা জীবধাত্রী বসুন্ধরার সদ্যতন কোলের ছেলে। এইখানেই আমাদের শেষ নয়। সুকুমার যেন চেয়ারে শিকড় গজালো মনে হচ্ছে: আমাদের আবির্ভাবের পেছনে যেমন দুর্নিরীক্ষ্য, প্রকাণ্ড একটা অতীত আছে, তেমনি আছে ভয়াবহ, বিশাল একটা ভবিষ্যৎ। সৃষ্টির প্রবাহে এমন যাকে উত্তুঙ্গ একটা ঢেউ ব'লে মনে করছি, আরো দু'শো মিলিয়ন্ বছর পরে হয়তো তাই হ'বে একটা বুদ্বুদ। আমরা মানুষ আর থাকবো না।

সুভা সামান্য একটু চিম্‌টি কাটলে: কী বাবা সব প্রাণহীন কথা! মনে-মনে কয়েকটা পুঁথি ঘাঁটতে পারলেই তুমি বাঁচো।

—হ্যাঁ, সুকুমার তেমনি প্রাণহীন গলায়ই বললে,—জীবন নিয়ে কথা বলতে কেমন ভয় করে।

—যাই, মীনার জন্যে চা ক'রে নিয়ে আসি। তাড়াতাড়ি বারান্দার আলোটা জেলে দিয়ে সুকুমারের সেই অন্ধকার কথাটাকে সে চাপা দিলে। তার রাশীভূত স্তব্ধতায় নিয়ে এলো সে আকস্মিক গতির উচ্ছলতা। সিঁড়ি দিয়ে স্রোতের মতো নামতে-নামতে বললে: অনেক নতুন কথা শিখতে পাবি, মীনা।

সিতাংশুও স্মিতমুখে উঠে দাঁড়ালো: আমিও এই ফাঁকে হাত-মুখটা ধুয়ে আসি।

কিন্তু সুকুমার কিনা তখনো ব'সে আছে। সেই তার কোর্টের পোষাকে।

মীনা চট্ ক'রে আগের কথার সুতো ধরলো: কিন্তু আপনার জীবধাত্রী বসুন্ধরাই বা কতোদিন আছেন শুনি? ওদিকে শুনছি তো কাশ্যপের সূর্য্যঠাকুর আসছেন জুড়িয়ে।

—আসুক। তার এখনো অনেক দেরি, গণনায় এখনো তা কুলিয়ে ওঠা যাচ্ছে না। ততোদিনের পৃথিবীর ইতিহাসের পৃষ্ঠা আরো অনেক বেড়ে যাবে।

সাহস পেয়ে মীনা স্বচ্ছন্দ গলায় বললে,—পৃথিবীই যদি একদিন জমে' একটা মরা চাঁদ হ'য়ে ওঠে, তবে মানুষও না হয় যাবে। তার জন্যে দুঃখ কী।

—কিন্তু পৃথিবী যে ঠাণ্ডা হ'য়ে জ'মে যাবে তার বা নিশ্চয়তা কোথায়? সূর্য্য না থাকলেই যে সেদিন পৃথিবীতে তাপ থাকবে না দুঃসাহসী বিজ্ঞান তা মানতে চায় না। Radio-activity থেকে তাপ হ'তে পারবে, shrinkage বা সঙ্কোচন থেকে, শোনা যাচ্ছে পদার্থ বা matter এর সত্যিকারের আকারান্তর থেকে। পৃথিবীতে ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাবনা এখনো অপরাহত।

মীনা হেসে উঠলো, পাথরের ছোট-ছোট কুচির উপর দিয়ে ঝিরঝির্ ক'রে ব'য়ে গেলো রূপোলি জলের ধারা; আপনি এ-কথা প্রমাণ করবেনই যে পৃথিবীতে মানুষ একদিন নির্ব্বংশ হ'বে। আমাদের এতো সব আশা ও ভালোবাসার জন্যে কোনো প্রতিনিধি আমরা রেখে যাবো না? এ কখনো ভাবা যায়? এতো কীর্ত্তি, এতো কবিতা?

—হয়তো সেই দিন, সুকুমারের গলা ঈষৎ কেঁপে উঠলো: মানুষতরো নতুন সেই জীব ভাষার চেয়ে, অস্ত্রের চেয়ে, ভালোবাসার চেয়ে আরো অনেক বড়ো রোমাঞ্চ উদ্ভাবন করবে। সেই দিন হয়তো ভাষায় থাকবে না এই অপ্রকাশিতের বেদনা, অস্ত্রে থাকবে না এই আত্মঘাতের ব্যর্থতা।

একটা নিশ্বাস ফেলে কথাটাকে সে একটা সম্পূর্ণতা দিয়েছিলো, কিন্তু ভয়ে-ভয়ে, চোখের উপর কুণ্ঠার একটা গাঢ় কুয়াসা এনে মীনা জিগ্গেস করলে: আরো ভালোবাসা?

সুকুমার গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো: সেই দিন থাকবে না এই ব্যাধি।

—বাবা:, সে তবে কী দুর্ভিক্ষের দেশ বলুন। মীনা আঙুল দিয়ে কপালের কাছেকার চুলের কয়েকটি আঁকা-বাঁকা রেখাকে লতিয়ে-লতিয়ে কোঁকড়াতে লাগলো: আমাদের এখনকার এই পৃথিবীই তবে অনেক ভালো।

তারপরে, অকস্মাৎ, আর কোনো কথা নেই!

সুকুমার চেয়ে দেখলো বাইরে অন্ধকার ক'রে এসেছে। তার অতীতের মতো ঠাণ্ডা অন্ধকার। সেই অন্ধকার পড়েছে মীনার মুখে, তার বসবার বিশ্রান্ত স্তিমিত রেখায়, তার এই নরম নীরবতায়, সে যেন আর তার এই বিচ্ছিন্ন বর্ত্তমানের বাস্তবতায় বাস করছে না, সে যেন সেই কোন ভোরবেলাকার সুর আজকের সন্ধ্যার স্তব্ধতায় টেনে নিয়ে এসেছে।

এর পরে কথা আর কিছু থাকতে পারে না।

সুভা চা নিয়ে এলো, সিতাংশু এলো হাত-মুখ ধুয়ে।

যেন কেউ কাউকে চেনে না। যেন নিচে থেকে তারা ভয় পেয়ে এসেছে।

সুকুমার এবার নির্ভুল উঠে দাঁড়ালো। বললে,—এবার যেতে হয়।

—এতোক্ষণে মনে পড়লো বুঝি? সুভা হেসে উঠলো, বললে,—মাঝে-মাঝে এসো কিন্তু।

সিতাংশুরও একটা কিছু বলা উচিত: কালকেই আসবেন না! এবার তো আমারো সঙ্গে আলাপ হ'য়ে গেলো।

—হ্যাঁ কাল, কালকে আমাদের ছুটি। এবার মীনা বললে,—কাল না-হয় বায়োলজি সম্বন্ধে আরো বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

সুকুমার আর একটিও কথা বললে না। নিচে নেমে গেলো। দরজার কাছে পিসিমা।

—তোমাকে বলছি সুকুমার, প্রমীলাকে তুমি একবার নিজের চোখে দেখ। বিয়ে ক'রে সুখী যদি হ'তে চাও তো অমন মেয়ে তুমি পাবে না।

—বেশ দেখাবেন। পিসিমার কথাটাকে ধাক্কা মেরে সুকুমার সোজা বেরিয়ে গেলো।

না, পদক্ষেপগুলি আজ মন্থর করবার কারণ নেই, আজ কেউ তাকে দাঁড়িয়ে দিতে আসে নি।

সাত

যা কোনোদিন হয় নি, মীনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে সিতাংশু সরাসরি রান্নাঘরে গিয়ে একা খেতে বসলো। সুভা ততোক্ষণ একটা মাসিকপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলো ব'লে ব্যাপারটা টের পায় নি।

সিতাংশু যখন কলতলায় আঁচাচ্ছে ও ঠাকুরকে একদফা তুলে দেবার জন্য

দেখাচ্ছে, তখন সুভা নিচে নামলো। সিতাংশু তখন পিসিমার ঘরে গিয়ে সাংসারিক গল্প জুড়ে দিয়েছে।

ছোট সংসারের পক্ষে রাত কম হয় নি। একা সুভাও বসলো ভাতের থালা নিয়ে। তারপর পিসিমার ঘরে যখন সে এলো, সিতাংশু ততোক্ষণ চ'লে গেছে উপরে।

সুভা সেখানে খুঁটিনাটি কাজ নিয়ে অনেকক্ষণ গাফিলি করলো। চ'লে যেতে দিলো অনেকটা সময়, অনেকখানি রাত। সময়ের জলে সময়ের দাগ সে ফিকে ক'রে আনলো। এবার সে উঠতে পারে, এতোক্ষণ সিতাংশু নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

উপরে-নিচে একটাও আর কথা বলবার লোক নেই। বাধ্য হ'য়েই সুভাকে চুপ ক'রে থাকতে হচ্ছে। এই স্তব্ধতাটা যেন তার একটা শাস্তি, একটা বোঝা।

সিতাংশু ঘুমোয় নি। অথচ কোনো কাজও সে এখন করছে না। চেয়ারে ব'সে খাটের উপর পা তুলে দিয়ে সামনের দেয়ালের শুভ্রতার দিকে সে চেয়ে আছে।

সমস্ত আবহাওয়াটা কেমন স্তিমিত, অস্ফুট।

সুভা বললে,—তুমি এবার ঘুমুবে নাকি?

—হ্যাঁ, আর কী কাজ!

অথচ সিতাংশু এক ইঞ্চি নড়লো না।

কুঁজো থেকে কাচের গ্লাশে ক'রে জল গড়িয়ে এনে সুভা বললে,—এই তোমার জল।

—রাখো।

সুভার হাতের কাছে আর যদি কিছু কাজ থাকতো। কথা বলবার লোক না হোক, ছোট একরত্তি একটা শিশু। এই অনড় স্তব্ধতার বদলে হালকা খানিকটা অবকাশ।

মাসিকপত্রটা হাতে নিয়ে সুভা এগিয়ে এলো। বললে,—কালকে এই কাগজটা এসেছিলো।

—কাল? সিতাংশু চমকাবার অবিশ্যি ভাণ করলো না: তুমি তো কোনো কথাই আমাকে বলো না আজকাল।

—কোত্থেকে একটা বাজে ম্যাগাজিন এসেছে তা-ও তোমাকে মনে ক'রে রেখে বলতে হ'বে?

—না, দরকার নেই। আমিই একসময়ে ঠিক দেখতে পেতুম।

সুভা বোবা হ'য়ে গেলো।

এখন আবার কী কথা পাড়া যায়!

সুভা পাশের ঘর থেকে সাড়িটা বদ্‌লে এলো। প্রখরতা ছেড়ে রাতের আটপৌরে সাড়িতে শরীরে নিয়ে এলো অন্ধকারের স্নিগ্ধতা। বিচ্ছেদের ইসারার উপর নিয়ে এলো অন্তরঙ্গতার রঙ্গিমা। যখন সে এলো, নতুন ক'রে পার্ট সে তৈরি ক'রে এসেছে।

বললে,—তোমার ছুটি তো এই এসে পড়লো ব'লে। চলো আমরা কোথাও যাই।

—কোথায়?

—এই একটু দূরে। যেখানে তুমি বলবে। একটা নাম করো না কিছু।

—সেখানে গিয়ে কী হ'বে?

—বা, বেড়াতে গেলে কী আবার হয়? শরীর-মন সারে। কতোদিন পর কলকাতাটা কেমন ভারি একঘেয়ে লাগে।

—আবার কতোদিন পর সেই একঘেয়েমিতেই তো ফিরে আসতে হ'বে। উপায় কী বলো?

অসহ্য।

সুভা খাটের উপর ব'সে পড়লো। মরিয়ার মতো বললে,—তোমাকে একটা কথা বলি।

—বলো

—সুকুমারবাবুর সঙ্গে মীনার বিয়ে দিলে কেমন হয়?

—কা'র? সিতাংশু যেন এতোখানি প্রস্তুত ছিলো না।

অতিরিক্ত স্পষ্টতার সঙ্গে সুভা উচ্চারণ করলে: মীনার।

সিতাংশু একবার হাসবার চেষ্টা করলো: তোমার কথা তারা শুনবে কেন?

সুভা ব্যাপারটা যেন তলিয়ে কিছু বুঝতে পারলো না: না-শোনবারই বা কী কারণ আছে?

—সুকুমারবাবু শুনতে পারেন, কিন্তু মীনা শুনবে কেন?

যেন মীনার উপরেই তার বেশি জোর এমনি একটা স্বচ্ছন্দ ভাব দেখিয়ে সুভা বললে,—আমি বললে মীনা নিশ্চয়ই শুনবে। দাদারা তো কতোদিন থেকে ওর বিয়ের চেষ্টা দেখছেন। মনের মতন পাত্র পাচ্ছেন না ব'লে।

—সুকুমারবাবু মনের মতন পাত্র?

—মন্দ কী। অতি উৎসাহে সুভা অনেকটা আলগা দিয়ে ফেললো: তখন

না-হয় অবস্থা বিশেষ ভালো ছিলো না। এখন তো দস্তুরমতো রোজগারের পথে।

—তখন, তখন কোন সময়টা?

সুভা আর দমবে না। সিতাংশুকে যে সে একটা কথার ধারাবাহিকতায় নিয়ে আসতে পেরেছে এ-ই যথেষ্ট। সুভা কথাটার পাশ কাটালো: এই ধরো বছর তিনেক আগে। তখন তো সে সামান্য এক ছাত্র।

—আর এখনই সে পাত্র হ'য়ে উঠেছে। সিতাংশু এবার শোবার আয়োজন করতে লাগলো: তোমার মতে সে মন্দ পাত্র না হ'লেও মীনারো মতে যে—

—কেন, মীনা এমন কী একটা ভূত-প্রেত-দানব চায়?

—তা হয়তো চায় না, কিন্তু—কথাটা সিতাংশু শেষ করলো না। বিছানায় শুয়ে পড়লো।

—কিন্তু কী? সুভা অস্থির হ'য়ে উঠেছে।

—কিন্তু, বাস্‌এ চ'ড়ে ভদ্রলোকদের হাত ধ'রে যেমন ক'রে সে পাশে বসাচ্ছে তাতে মনে হয় তার মনের পাশটাতেও আর জায়গা নেই।

সুভার সারা গায়ে মুক্তির হাওয়া দিলো: ও, এই কথা? তা বিয়ের আগে মেয়েদের মনে কোন্ না একটু আঁচড় পড়ে?

—পড়ে নাকি?

—বা, শরীরের ওপর দিয়ে সময়ের স্রোতটাও তো একটু হিসেব করতে হয়। কথার হাওয়ায় মনের গুমোট সুভা আস্তে-আস্তে কাটিয়ে উঠছে: তা, সেগুলি মাত্র আঁচড়ই, ঘা নয়।

—মীনার বেলায় তা তুমি কী ক'রে বলতে পারো?

—বা, আমি তাকে তন্নতে-তন্নতে চিনি যে। তেমন কিছু হ'লে কথাটা বলতুম নাকি?

—ও! সে-ও তা হ'লে তোমারই মতো?

—কা'র মতো জানি না, কিন্তু ওদের বিয়ে হ'লে বেশ হয়। তুমি কী বলো?

—আমি কী বলবো? সিতাংশু পাশ ফিরলো: আমি ভাবছি আগাগোড়া কেমন গণে-গোত্রে মিলে যায়। কেমন অনায়াসে, কোথাও এতোটুকু চিড় না খেয়ে।

—হ্যাঁ, সুভা নির্ভীক: সেই তো মীনার সৌভাগ্য।

—তুমি তো খালি তোমাদের দিকের সৌভাগ্যটাই দেখবে। সিতাংশু বোবা গলায় বললে: আলোটা এবার নেভাও।

—তা নেভাচ্ছি।

সত্যি-সত্যি সুভা আলো নিভিয়ে দিলো।

সেই অন্ধকারে সিতাংশু বললে,—মীনার বিয়েতে তোমার এতো উৎসাহ কেন? তুমি কেন আজকেই হঠাৎ এতো ব্যস্ত হ'য়ে উঠলে?

সুভা একেবারে চুপ। সত্যি, কথাটা সে বড্ড তাড়াতাড়ি পেড়ে ফেলেছে। ঘর-দোর অন্ধকার হ'য়ে উঠতেই তা যেন সে স্পষ্ট অনুভব করতে পারলো।

এ ছাড়া আর কোনো কথা কি সে বলতে পারতো না?

সিতাংশু বললে,—মীনার জন্যে তোমাকে তো এর আগে কোনোদিন মাথা ঘামাতে দেখিনি।

সুভা অসহায়ের মতো বললে,—বা, এতোখানি বয়েস হ'লো, ওর বিয়ে দিতে হ'বে না?

—তা হয়তো হ'বে। কিন্তু সুকুমারের সঙ্গেই কেন?

—কেন আবার কী। বাঙলা-দেশে এমন পাত্র—

সেটা বুঝি এতোদিন পরে ঠাহর করলে? সিতাংশু হঠাৎ ছট্‌ফট্‌ ক'রে উঠলো: আলো নিভিয়েছ?

ওপারের খাট থেকে সুভা বললে,- কখন।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে সিতাংশু সাদা গলায় বললে,— পাত্র না হয় বাছলে, মীনা-ও না হয় রাজি হ'লো—

সুভা অন্ধকারে ঝল্‌মল্‌ ক'রে উঠলো: তবে আবার কী?

—কিন্তু সুকুমার রাজি হ'বে কেন?

—বা, রাজি না হ'বার কী আছে? আমি বললে—

—হ্যাঁ, তুমি বললে অবিশ্যি আলাদা কথা। তুমি বললে কোন দিনই সে রাজি হ'য়ে যেতো। সব তোমার বল্‌বার জন্যেই তো অপেক্ষা করছিলো।

তার ও-পারের বিছানায় মুখ ঢেকে সুভা, নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে উঠলো।

—সব, সব মানলুম, সুভা, সিতাংশু যেন তাকে প্রহার করলে: কিন্তু আমাকে এতো সব বলবার কী হয়েছে? আমি কোনো পক্ষের লোক নই। আমি কাউকেও তত্ত্বতে-তত্ত্বতে চিনি না। আমি এর কী বুঝবো? কী, ঘুমিয়েছ? এরি মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে?

সুভা অন্ধকারে নিজেকে মুছে ফেলতে পারলে বাঁচতো।

—এই বিয়েতে তুমি যদি সুখী হও, তোমার সঙ্গে আমি-ও না-হয় চেষ্টা ক'রে দেখবো।

তার চেয়ে আর কোনো বর্ব্বর, নৃশংস আচরণ কি সিতাংশু করতে পারতো না ?

—তোমার সুখের কাছে মীনার সুখের আবার দাম কী। তার পক্ষে এমন পাত্র তো হ'তেই পারে না বাঙলা দেশে। ও-কথা তো ex cathedra এক তুমিই বল্‌তে পারো।

কথা, একটি কথাও কি সুভার মুখে ফুটবে না ?

—হ্যাঁ, তোমার নিশ্চিন্ত হওয়া নিয়েই তো কথা। কী, ঘুমিয়ে পড়লে ?

আট

সুভার একেবারে একটা চিঠি লিখবার দরকার ছিলো না। এমনিতেই সে যেতো।

যেতো, এখন না-যাবার আর কী মানে থাকতে পারে ? কথা বল্‌বার সে লোক খুঁজে পেয়েছে, কথার অন্তরালে পেয়েছে যে নীরবতার আবহাওয়া। এক জনের দিকে পিঠ ক'রে দাঁড়াতে পারছে ব'লে আরেক জনের কাছে খুলে দিতে পেরেছে মুখ। খুব একটা মত্ততার পর পেয়েছে যেন সে তার পরিচিত দৈনিকতা, দ্যুতিমান ছন্দচ্যুতির পর গদ্যের একটা প্রাঞ্জল পরিমিতি। ফিরে পেয়েছে আপনাকে। নিজের নিথর পারিপার্শ্বিকতাকে।

হ্যাঁ, এমনিতেই সে যেতো। আবার যাবার জন্যে ক'দিন থেকে মনে তার হাওয়া দিয়েছে।

তবু সুভার চিঠি এলো। সে যেন অতি অবশ্য একবার আসে। তার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

এবার আর সময় মেপে যাবার দরকার নেই। সময়টা কাটিয়ে ওঠবার জন্যে দু' জনেই সমান নিশ্চিন্ততায় অপেক্ষা করতে পারবে। সুভা, কতোক্ষণে সিতাংশু আসে : সুকুমার, কতোক্ষণে আসবে মীনা। তাল কাটাবার আর নেই ভয়।

তবু তার সঙ্গে সুভার যে কী দরকার থাকতে পারে সুকুমার সাত-পাঁচ কিছু ভেবেই পেলো না।

সোজা সে উপরে উঠে গেলো। অপরাহ্ণিক নির্জ্জনতাটা আজ তার ঘুম-স্তিমিত নারীলাবণ্যের মতোই মধুর লাগছে।

বারান্দাতেই এক প্রান্তে সুভা একটা উইকার্‌-এর ইজিচেয়ারে আধখানা ব'সে। কোলের উপর একটা বই ধরা। আজ তার রেখাগুলি উচ্চকিত নয়, বিশ্রামে বঙ্কিম, প্রতীক্ষায় প্রশান্ত। আঁচলে-চুলে পুঞ্জ-পুঞ্জ আলস্যের মেঘ নেমে এসেছে।

—এই যে, তুমি এসেছ। সুভা শরীরে একটা চমকের বিদ্যুৎ হানলো। রেখাগুলো গেলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে চূর্ণ-চূর্ণ হ'য়ে।

সামনেই আরেকখানা চেয়ার তৈরি? সুকুমার এগিয়ে আসতে-আসতে হেসে বললে,—তুমি ডাকলে না এসে কি পারি? কী কাজ? শেষকালে একটা দস্তুরমতো চিঠি লিখে ফেললে। পিসিমাকে ঠিকানা দিয়ে যাওয়াটা আমার ব্যর্থ হয় নি দেখছি।

সুকুমারের মুখে কথা আজ আর ধরছে না। তার ভঙ্গিতে আজ না আছে ভয়, না-বা ঔদ্ধত্য, যেন তার স্বাভাবিক অনুপাতে সে সম্পূর্ণ, স্বতঃস্ফূর্ত।

—বোসো। সুভাও তার শরীরে বীতবর্ষণ আকাশের নির্মল প্রসন্নতা আনলে।

—আমার সঙ্গে তোমার যে আর কী দরকার হ'তে পারে আমি ভেবে কিছু কিনারা করতে পারছি না।

—না, বেশিক্ষণ তোমাকে ভাবাবো না। সুভা চেয়ারের পিঠে ফের ঢ'লে প'ড়ে তার শরীরে লাস্যের একটা নরম ঢেউ তুললো: তুমি সেদিন বলছিলে না মনের মতো পাত্রী পেলে বিয়ে করতে পারো,—করবে?

—মনের মতো পাত্রী বলি নি তো, সুকুমার হেসে উঠলো: তোমার মতো বলেছিলুম।

—ও সে একই কথা হ'লো? করবে? এবার সুভার প্রশ্নটা যেন ততো তরল নয়।

সুকুমার ধাঁধিয়ে গেলো। থতিয়ে বললে,—পিসিমা বেচারি প্রমীলাকে এতোটা পথ ধাওয়া ক'রে নিয়ে এসেছেন নাকি? সেদিন রাগের মাথায় কী-একটা ব'লে ফেললুম।

গাঢ়তরো গলায় সুভা বল্‌লে,—না প্রমীলা নয়।

—তবে কে?

—আমার মতো পাত্রী। আস্তে চোখের পাতা দু'টো তুলে ততোধিক আস্তে সুভা বল্‌লে: মীনা।

কথাটা যেন সুকুমার তার মুখের উপর মদির একটা স্পর্শের মতো অনুভব করলে। বল্‌লে,—তুমি আমাকে ঠাট্টা করতে ডেকে এনেছ নাকি?

—হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে পাকাপাকি একটা ঠাট্টার সম্পর্কই পাতাতে চাই। মন্দ কী, সুভা সারা শরীরে খুসির একটা অস্ফুট মর্ম্মর তুলে বল্‌লে,—মীনাকে তো তুমি দেখেছ। প্রায় আমারই মতো, আমারো চেয়ে সুন্দর।

—তুমি এ-সব কী বলছ, সুভা? সুকুমার ছট্‌ফট্‌ ক'রে উঠলো।

—বা, এর চেয়ে আর কী স্পষ্ট ক'রে বলা যায়? প্রেম নয়, প্রতীক্ষা নয়, প্রহসন নয়, সুভা হাসতে লাগলো: দস্তুরমতো বিয়ে। সাদা, সত্য কথা।

সুকুমার আমতা-আমতা ক'রে বল্‌লে,—আমি বিয়ে করবো কী?

—বল্‌ছিলে যে-বিয়ে করতে চাও। বল্‌ছিলে যে বিয়ে না করার কোনো মানে হয় না।

—কিন্তু তাই ব'লে মীনার সঙ্গে—

—কেন, মীনা এমন-কি খারাপ দেখতে?

সুকুমার ঘেমে উঠলো: বা, সে-কথা কে বলছে?

—আর শুনতেও এমন কিছু সে খারাপ নয়। থার্ড-ইয়ারে পড়ছে। আর বিদ্যা তার যতোটুকুই থাক্, তার জীবনে এনেছে একটা মুক্তির হাওয়া—তুমি তো দেখলে।

—কিন্তু আমাকে, আমাকে সে - কথাটা সুকুমার শেষ করতে পারলো না।

—হ্যাঁ, তোমাকে সে বিয়ে করতে রাজি হ'বে কি না এই সন্দেহ করছ তো? চোখ দুটি আয়ত ও অনিমেষ ক'রে সুভা তার দিকে তাকালো: সন্দেহ করবার কিছু কারণ নেই। আমরা বললে, মানে, আমি বললে ও স্বচ্ছন্দে তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে। দাদাদের আমি বলেওছি, তাঁরা এককথায় রাজি আছেন। তোমার বন্ধু সিতাংশুবাবু তো আনন্দে নৃত্য সুরু করেছেন দেখছি। আমার অনুমোদনের দাম আছে। আমি বললে কারুর সাধ্যি নেই সে-কথা ফেলতে পারে।

সুকুমার কোনো কথা না ব'লে সুভার দিকে তাকালো, একটু-বা ভয়ে-ভয়ে। তাকে আজ যেন কেমন ভারি ক্লান্তি দেখাচ্ছে। তার চারপাশের পৃথিবীর সঙ্গে আজ যেন তার কোনো মিল পাওয়া যাচ্ছে না। তার চুল অতো ঘন হ'য়েও কেমন অনুজ্জ্বল, তার ভুরু দু'টি ইঙ্গিতে অতো প্রখর হ'য়েও কেমন যেন করুণ। তার ঠোঁটের প্রান্তে সূক্ষ্ম একটি ট্র্যাজিক্যাল রেখা কেমন আলগোছে ফুটে আছে। তার সমস্ত বিস্রস্ত ভঙ্গিতে কেমন একটা অসহায় স্তব্ধতা।

সুভা বলতে লাগলো: ওকে তুমি এর আগে কখনো দেখ নি। আমার সঙ্গে তোমার যখন চেনা হয়, ও তখন কাকার কাছে, সিঙ্গাপুরে। কাকা মারা যাবার পর সে-সব ব্যবসা আমাদের ফেল প'ড়ে গেলো—ওকেও আসতে হ'লো ফিরে, কলকাতায়। ভারি ভালো মেয়ে ও, আমি আর কী বলবো, সুভার ঠোঁটের সেই রেখাটি আরো একটু প্রসারিত হ'লো: তুমি নিজেই বুঝতে পারবে।

সুকুমার অস্থির হ'য়ে বললে,—কিন্তু আমাকে তো তুমি জানো, সুভা।

—জানি ব'লেই তো এতো নির্ভয়ে তোমাকে মনোনীত করছি। তার মাথার

নিচে একটি বাহু রেখে সুভা বিশ্রামে আরো একটু প্রসারিত হ'লো : তোমাকে জানি, সেইটেই তো আমার বড়ো জোর।

—কিন্তু, সুকুমার বলবার কিছু ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না : কিন্তু, আমি -আমার মাঝে তুমি কী যোগ্যতা পেলে ?

হাসতে গিয়ে সুভার মুখ কেমন শীর্ণ, রোগাটে দেখালো : আমি জানি তুমি কতো ভালো, কতো মহৎ। জানি তুমি কী সুগভীর ভালোবাসতে পারো। সুভা হঠাৎ সেই এলানো, ক্লান্ত ভঙ্গি ছেড়ে খাড়া হ'য়ে উঠে বসলো, কথায় আনলো আকস্মিক তীক্ষ্ণতা : মনে করো না শুধু মীনার জন্যেই তোমাকে ভাবছি, তোমারো জন্যে ভাবছি শুধু এই মীনাকেই।

—আমার উপর তোমার অসীম করুণা, সুভা।

—বিশ্বাস করো, সুভা জোর গলায় বললে,—মেয়েদের সহানুভূতির মধ্যে কোনো করুণার খাদ থাকে না। বিশ্বাস করো, ভঙ্গিটাকে সুভা ঋজু করলো : ওকে বিয়ে ক'রে সত্যি তুমি সুখী হ'তে পারবে, ওকে তোমার হাতে দিতে পারলেই আমি, আমরা নিশ্চিন্ত হ'তে পারবো। ও যেমন ভালো, তেমনি সুন্দর। তা ছাড়া—

—তা ছাড়া। সুকুমার কথাটা ধরিয়ে দিলো।

—তা ছাড়া ওর মাঝে আমার জীবনের সেই হারানো দিন-রাত্রিগুলি অলিখিত হ'য়ে আছে। সুভার নোয়ানো চোখের পাতা তার গালের উপর ম্লান একটু ছায়া ফেললো : সেই সব স্তম্ভিত মুহূর্ত্ত। ভাঙা-ভাঙা স্বপ্ন, সেই দুর্ব্বল সব আশা। তুমি ওকে নাও, আমি আবার বেঁচে উঠি।

সুকুমার চিত্রার্পিতের মতো ব'সে রইলো।

সুভা আবার বললে,—জানো, কোনো কিছুরই শেষ নেই, কেবল সুরু, কেবল এগিয়ে চলা। সমস্ত সমাপ্তি আবার কখন সেই আরম্ভেই ফিরে আসে। আমাদের চলতে তো হ'বে—

সিঁড়িতে হ'লো কা'র জুতোর শব্দ। সিতাংশু আসছে।

মুহূর্ত্তে সমস্ত কুয়াসা উ'ড়ে গেলো, গ'লে গেলো সুভার সমস্ত জড়িমা। চেয়ার থেকে এক ঝটকায় সে উঠে দাঁড়িয়েছে। নির্ঝরধারায় তার গা থেকে খুসির রূপোলি রেখাগুলি ঝ'রে পড়তে লাগলো।

—জানো, সুকুমারবাবুর প্রায় মত করিয়ে ফেলেছি। খুসিতে সে ছলছলিয়ে উঠেছে : প্রথম দর্শনেই মীনাকে ওঁর ভালো লেগে গেছে।

—না, না, আমি তেমন কোনো কথা দিই নি। সুকুমার প্রতিবাদ করতে উঠে দাঁড়ালো : আমি দিন কয়েক ভেবে তবে জানাবো বলেছি।

—ও একই কথা হ'লো। স্বভা শরতের শুভ্রীভূত মেঘের মতো শরীরে একটা হিল্লোলিত লঘিমা এনে বললে,—দু' দিন আগে আর পরে। তোমরা বোসো, আমি চায়ের জোগাড় দেখি।

সিতাংশু অধ্যাপকি গলায় বললে,—হ্যাঁ, ভেবে-চিন্তে ধীরে-সুস্থে মত দেওয়াই ভালো। এ প্রেম নয় যে দু'টো-চারটে এলে-গেলে কিছু এসে যায় না, এ দস্তুরমতো বিয়ে। এরি পুঁজিতে বাকি জীবন নিয়ে ব্যবসা করতে হ'বে।

—হ্যাঁ, সুকুমারও সায় দিলো: প্রেম হচ্ছে ব্যাঙ্কের খুচরো টাকা, আর বিয়ে হচ্ছে লাইফ-ইনসিয়োরের পলিসি।

তারপর দুই বন্ধুতে চললো আরো সব টপিক্যাল কথা-বার্ত্তা। সেই সব শোনার চাইতে স্বভার স্তব্ধতা শুনতেই আমাদের বেশি কৌতূহল।

লাখো-লাখো কাজে উপরে নীচে স্বভা ছিটিয়ে পড়ছে। এতোক্ষণ যে সে কী ক'রে ব'সে ছিলো কে বলবে। তাকে দেখে এখন তা বিশ্বাস করতে পর্য্যন্ত ভয় করে। যার এতো কাজ সে একটা মুহূর্ত্ত বা কী ক'রে অবহেলা করতে পারে? তাড়া দিয়ে চাকরকে পাঠালো বাজারে, নিজেই কয়লা ভেঙে উনুন ধরালো। ঝনঝনিয়ে ভাঙলো দু'টো চায়ের বাটি, নিজের মনে নিজেই উঠলো হেসে। 'এই যা, চিনি নেই, তোকে আবার বাজারে যেতে হ'বে, জলুয়া। এই তো এক পা বাজার।' পিরিচে চামচ বাজিয়ে নিজেই সে উঠলো একটু গুনগুন ক'রে। এবং সব সুকুমারকে শুনিয়ে, তার চোখের উপর। নিজের মাঝে নিজে যেন সে আর আঁটছে না। সেই বিস্ফারিত আঁচলটা সে এখন সঙ্কীর্ণ ক'রে গায়ের উপর লেপটে নিয়েছে।

এলো টিপাই, এলো চেয়ার, ট্রে-তে ক'রে চা এলো তৈরি হ'য়ে। বাজার থেকে মিষ্টি আর নিজের হাতে করা স্বভার লুচি আর বেগুনি।

সুকুমার আজ একেবারে তার পর নয়, তাই লুচি আর বেগুনি। একেবারে আপনারো নয়, তাই বাজারের খাবার।

কপালে-চিবুকে কণা-কণা ঘাম, শ্রমে-ম্লান মুখে স্বভার আনন্দ চঞ্চল দীপ্তি দিচ্ছে —তার দিকে চেয়ে সুকুমারের মনে বিরোধী ভাব আনাগোনা করতে লাগলো। স্পষ্ট তাদের নাম নেই, করুণা বলতে পারো, রাগ বলতে পারো, অভিমান বলতে পারো—আবার কোনোটাই বলতে পারো না।

করুণা হচ্ছিলো অনুরোধটা তার রাখে, তাকে সে অবারিত মুক্তি দেয়। রাগ হচ্ছিলো অনুরোধটা তার না রাখে, দেয় তার সমস্ত স্বপ্ন ভস্মসাৎ ক'রে। অভিমান হচ্ছিলো এমন অনুরোধ সে আদৌ করছে কেন?

সমস্ত যাচ্ছিলো তালগোল পাকিয়ে।

এমন সময়, কে আর সেখানে আসতে পারে, স্বয়ং মীনা। লীলায় পিছল একটা সাপের মতো সুন্দর।

—এই যে আপনি এসেছেন। মীনা সুকুমারকে সুপুষ্ট হাতে একটি নমস্কার করলো: আমি রোজ অন্নের জন্যে এসে চা-টা মিস করি।

—বোস। ক'রে আনছি। সুভা সিঁড়ি দিয়ে তর্‌-তর্‌ ক'রে নেমে গেলো।

ঝকঝকে দাঁতে মসৃণ হেসে মীনা বললে,—বায়োলজি নিয়ে আপনার সঙ্গে আরো আমার আলোচনা করবার আছে।

সিতাংশু বাধা দিয়ে হেসে বললে,—আর বায়োলজি নয়, এবার জীবন নিয়ে আলোচনা করো, মীনা।

মীনা ইসারাটা বুঝতে না পেরে বল্‌লে,—দুইই সমান ইন্‌টারেষ্টিঙ আমার কাছে। সরল, অগাধ দু'টি চোখ তুলে সে বল্‌লে,—আমার এই জীবন থেকে, কী ক'রে আমি এ জীবন পেলাম তাই আমার কাছে বেশি আশ্চর্য্য লাগে।

সুকুমার আজকে আর কিছুতেই কথা জমাতে পারলো না। সমস্ত কথা তার দুই চোখের বিস্তৃত আলস্যে যেন মদির হ'য়ে উঠেছে।

মীনাকে সে দেখতে লাগলো, গা ভ'রে দেখতে লাগলো। মীনার কুটিলপক্ষ্ম দু'টি চোখে সেই রহস্যময় ধূসরিমা। তার সারা শরীরে ঝল্‌ছে সেই চঞ্চলতার চাকচিক্য। তার দেহের ঈষৎ গুচ্ছীকৃত অভিনম্রতায় সে তেমনি একটু ক্লান্ত হ'য়ে উঠছে।

একসময়ে সুকুমার হঠাৎ লক্ষ্য ক'রে দেখলো সিতাংশু সেখানে আর দাঁড়িয়ে নেই। তাদের দুয়ের মাঝখানে কতোগুলি নীরবতা এসে চুপি-চুপি ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে।

নীরবতাগুলি যেন সুভার সেই অলিখিত কবিতার কথা।

সুভা চা নিয়ে এসে দু'জনকে সেই ভার থেকে মুক্তি দিলে। নিজেও সে আজ একমুঠো ধোঁয়ার মতো হাল্‌কা হ'য়ে গেছে। তার বিসর্পিত সাড়িতে এসেছে খুসির শৈথিল্য, স্খলিত চুলে খুসির আলুলতা। হৈমন্তিক ক্ষেতে যেন শ্যামলতার ঢেউ। এই মুক্তি, এই লঘুতা যেন তার নতুন নির্ম্মিতি। তাকে আবার যেন চেনা যায় না, ছোঁয়া যায় না, দেখতে গেলে দুই চোখ যেন আবার ক্লান্তিতে ভ'রে ওঠে।

ঘাসের উপর চমকিত সাপের মতো মীনা ঝল্‌মল্‌ ক'রে উঠলো: বাবা:, চা করতে যে দিদি তোমার দু' ঘণ্টা লাগে।

সুভা চিবুকে ও গলায় একটি হালকা ঢং এনে বললে,—আমি তো ভাবলুম বায়োলজি নিয়ে আলোচনা করতে-করতে চায়ের কথা তুই ভুলেই গেছিস্‌।

চায়ের বাটি হাতে ক'রে মীনা উঠে দাঁড়ালো : তুমি আজ আমাদের বাড়ি যাবে বলেছিলে না, দিদি ? চলো।

— কী ক'রে যাই ? দেখছিস না ঘরে আমার অতিথি ব'সে।

—বেশ তো, অতিথিকেও নিয়ে চলো না। অপ্রতিভতাটা তাড়াতাড়ি এড়াবার জন্যে মীনা সুকুমারকেই এবার সরাসরি সম্বোধন করলে : আপনিও চলুন না। এই কাছেই রিচি-রোড।

সুকুমার ব্যস্ততার ভাণ ক'রে বললে—না, না, আমার কাজ আছে।

—তোমার আবার কী কাজ ! সুভা এগিয়ে এলো : বিকেল বেলা আড্ডা দেয়া ছাড়া ভদ্রলোকের আর কী কাজ থাকতে পারে ? চলো।

মীনা অমনি সাহস পেয়ে ব'লে উঠলো : চলুন না, মন্দ কী, বিকেলের খানিকটা খাপছাড়া সময় দিব্যি কাটিয়ে দেয়া যাবে। কথা, কথা বলার মতো সুখ আছে কিছু ?

সুকুমার তবু গাঁইগুঁই করতে লাগলো।

চায়ে চুমুক দিতে-দিতে মীনা তখন দূরে একটু স'রে গেছে, সুভা হঠাৎ সুকুমারের কাছে এসে বললে,—চলো।

—আমি সেখানে গিয়ে কী করবো ?

—মীনাকে আরো কাছে থেকে দেখবে।

—সে তো এখানেই দেখতে পেলাম।

—না, তার প্রাত্যহিক পটভূমিতে তার প্রক্ষিপ্ত মূর্তিটা তোমাকে দেখানো চাই। চলো।

—তুমিও যাবে তো ?

—আমি আজ না-ই বা গেলাম। আমি সেখানে গিয়ে করবো কী ?

—বা, তুমিই তো তার পটভূমি।

মীনা আবার কাছে এসে পড়েছে। সুভা গলার গাঢ়তাকে হাসির জলধারায় তরল ক'রে আনলো : আমার দাদারা ভারি মিশুক, তোমাকে একটুও bored হ'তে হ'বে না দেখো।

হাসিতে ভুরু দু'টি ধারালো ক'রে মীনা বললে—তা সঙ্গে দিদিই তো যাচ্ছে, আপনার ভয় কী।

এরপর আর না বলা চলে না। সুকুমার কপালের চুলে একবার হাত বুলিয়ে বললে,—কেন, আপনার দিদি না হ'লে আর আমি এক পা যেতে পারি না ?

দেখা যাক না কতোদূর যাওয়া যায়।

সিতাংশু ততোক্ষণে হাত-মুখ ধুয়ে উপরে উঠে এসেছে। মীনা প্রজাপতির রঙচঙে পাখার মতো ফুর্‌ফুরিয়ে উঠলো : আপনিও যাচ্ছেন তো জামাইবাবু?

সিতাংশু ভেবড়ে গেলো : কোথায় ?

—যেখানে দিদি যাচ্ছেন, সুকুমারবাবু যাচ্ছেন—নিশ্চয়ই জাহান্নমে নয়, আমাদের বাড়ি।

সিতাংশু লুকিয়ে সুভা ও সুকুমারের মুখের দিকে একবার চোখ ফেললো। গম্ভীর গলায় বললে,—না। আমার কাজ আছে।

—আপনারো কাজ ? মীনা উঠলো খিল খিলিয়ে হেসে।

সিতাংশুর গলা আরো খাদে নেমে এসেছে : হ্যাঁ, আমাকে একবার পাবলিসারের কাছে যেতে হ'বে, যা সব ইন্‌ফারনেল রেট্‌ দিচ্ছে—সিতাংশু তার শোয়ার ঘরে চ'লে গেলো।

মীনা সুভার কাঁধের উপর ঝুঁকে প'ড়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বললে, যাও, এবার জামাইবাবুকেও রাজি করাও গে যাও। তুমি তো লোক পটাতে ওস্তাদ।

ঘরের মধ্যে সিতাংশুর নির্জ্জীব চ'লে যাওয়ার দিকে শেষ ভ্রূকুটি ক'রে সুভা বল্‌লে,—যে যাবে না তাকে আমি জোর ক'রে নিয়ে যাবো কী ক'রে ?

চোখ ফিরিয়ে আনতেই হঠাৎ সুকুমারের সঙ্গে তার চোখোচোখি হ'য়ে গেলো।

সুকুমার হেসে বললে,—এবার বলো, তুমিও আর যাবে না। প্রাত্যহিক পটভূমিতে—

—না। যাবো বৈ কি। সুভাও ঢুকে পড়লো শোবার ঘরে। বারান্দা থেকে মীনা ব'লে দিলো : হ্যাঁ যদি পারো ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে চলো। জোর খাটাবার ঐ তো তোমার জায়গা।

সুভা ঘরের মধ্যে গিয়ে একটিও কথা বললো না। এক কোণে দাঁড়িয়ে সিতাংশু তার কোঁচায় চুনট দিচ্ছে, আরেক কোণে দাঁড়িয়ে সুভা কপালে তুলছে সিঁদুরের টিপ।

ঘরের মধ্যেকার নীরবতা বারান্দায়ো উঠেছে গুমোট হ'য়ে।

সাজ ক'রে সুভাই সিতাংশুর আগে বেরিয়ে এলো। সাদাসিধে সাড়িতে তার এখন নিরাভ নির্লিপ্ততা, শুভ্র একটি শব্দহীনতার মতো শরীরে তা ছড়িয়ে আছে। তার চারপাশের নীরবতায় সে যেন এখন বেশি স্পষ্ট, বেশি সমাহিত। তাকে বোঝা যায়, কিন্তু আর যেন চেনা যায় না।

ম্লান হেসে সুভা বল্‌লে,—চলো।

এক মিনিটেই তারা রাস্তায়—তিনজনে। সুভা ওদের দু'জনকে আগে যাবার জন্যে পথ ছেড়ে দিলো। পাশাপাশি দু'জনে তারা কথা বলতে-বলতে এগিয়ে চলেছে—বায়োলজি নিয়ে নয়, ঘনায়মান সন্ধ্যায় খোলা রাস্তায় দুই অপরিচিত বন্ধু যা সব অদরকারি কথা বলতে পারে। কথা সুভা কিছু শুনতে পাচ্ছে না, তার পক্ষে এখন এই নীরবতাই তার যথেষ্ট।

তার কেবলই মনে হ'তে লাগলো সে ভারি একা। আজকের জন্যে, এই ক'টি বিষণ্ণ মুহূর্তের জন্যে। হয়তো বা বহুদূর ভবিষ্যতের জন্যে।

নয়

কিন্তু বাড়িতে পা দিয়েই সেই নীরবতা সুভা গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলো। সূর্য্যালোকে নিষ্কাশিত অসির মতো অন্ধকারে তার শরীর উঠলো ঝলমল ক'রে।

নিচেটা অন্ধকার। তার অতীতের মতো অন্ধকার। অন্ধকারে সুভা গাঢ় একটি নিশ্বাস ফেললে।

না, তাকে হাসতে হ'বে, জোরে কথা কইতে হ'বে, শরীরে নিয়ে আসতে হ'বে বিদ্যুদ্বান গতির তীক্ষ্ণতা। এখন তার থামবার সময় নেই, ভাবার সময় নেই। আলোর আলোড়নে সমস্ত অন্ধকার অনাবৃত ক'রে দিতে হ'বে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই বাঁয়ে পিসিমার ঘর। পিসিমা অন্ধকারে ব'সে মালা জপছেন।

—কে, বৌমা?

হ্যাঁ, তার দাঁড়াবার সময় নেই। তার শোবার ঘরে আলো জ্বলছে।

—সুকুমার কখন গেলো, আমি টেরও পেলুম না।

তা কি সুভাই টের পেয়েছে?

ভোরের প্রথম উদ্ভাসনের মতো সুভা ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। এতো অজস্র তার মুক্তির শুভ্রতা।

দেয়ালের কাছে বালিস উঁচু ক'রে দিয়ে সিতাংশু আধখানা ব'সে আছে। কোলের উপর সকাল-বেলাকার বাসি খবরের কাগজ। চোখ তার সেখান থেকে অনেক দূরে।

—এ কী, এরি মধ্যে ফিরে এলে যে? সিতাংশু যেন চমকে উঠলো।

—হ্যাঁ, সুভা কথায় ও ভঙ্গিতে যেন আর সেই কম্পান্বিত দীপ্তি আনতে

পারলো না। দেখলো ঘরের আবহাওয়া কেমন ঠাণ্ডা হ'য়ে এসেছে। সিতাংশুর বসবার ভঙ্গিতে কেমন একটা অবসাদের অপরিচ্ছন্নতা! এই দ্যুতিমান মুহূর্তে সিতাংশুর অসাময়িক উপস্থিতিটা কেমন যেন শ্রান্তিকর।

—হ্যাঁ, সুভাকে অবকাশের আকাশ থেকে প্রকাশের খরতর সঙ্কীর্ণ সীমার মাঝে নেমে আসতে হ'লো: কিন্তু তুমি কখন এলে?

—আমি আজ আর বেরুলাম না।

—বেরোলে না মানে? তোমার না কতো কাজ!

সিতাংশু হাসলো: কাজ আবার কখন এক নিমেষে ফুরিয়ে গেলো।

—না বেরিয়ে ভালোই করেছ। সুভা হাসিতে আবার হালকা হ'বার চেষ্টা করলো: এখন মোটে সাড়ে-সাতটা। চলো আমরা কোথাও বেড়িয়ে আসি। উটরাম ঘাটে চলো। না, না, সেখানটা বড্ড ফাঁকা, তায় নদীর জলে কেমন ঘুম পায়। তার চেয়ে চলো খেয়ে-দেয়ে সাড়ে-ন'টায় কোনো সিনেমায়—

ঠোঁটের উপর হাসিটি আরো প্রসারিত ক'রে সিতাংশু বললে,—সেখানেও তো আমাদের চুপ ক'রে ব'সে থাকতে হ'বে—অন্ধকারে। এই তো বেশ আছি।

—বেশ, সুভা এলানো আঁচলে খুসির একটা দমকা হাওয়া হানলে: আমি তবে খানিকক্ষণ সেতার বাজাই। কেমন? কী বলো? শুনবে? কতোদিন তুমি আমার একটা বাজনা শোনো নি।

—তার চেয়ে ও বাড়ির গল্প বলো। সিতাংশু ভঙ্গিটাকে আরো খানিকটা ভাঙলো: এতো শিগ্‌গির চ'লে এলে কেন? কা'র সঙ্গে এলে?

—কা'র সঙ্গে আবার আসবো? এইটুকুন তো রাস্তা—একা চ'লে আসতে পারি না?

—না, তা পারো বৈকি। সুকুমারবাবু কোথায়?

আশ্চর্য্য, সুভা আর কিছুতেই হাসতে পারছে না।

সুভা বাঁ ঠোঁটের কোণ ঈষৎ কুঁচকোলো: কোথায় আবার! ও-বাড়ি।

—ও-বাড়ি! এখনো ও-বাড়ি ব'সে?

—বসবে না? এরি মধ্যে দারুণ জমিয়ে ফেলেছে যে।

—বলো কী? সিতাংশু ভঙ্গিটা ধারালো ক'রে উঠে বসলো: কা'র সঙ্গে এতো জমালো?

—দাদাদের সঙ্গে। গান্ধি, পণ্ডিচেরি, আধুনিক সাহিত্য—কিছুই আর বাদ রাখছে না।

—আরে, বোসো, বোসো। সিতাংশু হাত বাড়িয়ে সুভাকে কাছে টেনে আনলো : ভারি প্র্যাকটিক্যাল তো। তারপর ?

দেয়ালের দিকে চেয়ে সুভা শূন্য গলায় বললে,—তারপর আবার কী ?

অথচ এই জায়গায় তার কেমন উঁচু পর্দায় হেসে ওঠা উচিত ছিলো।

—মীনা, মীনা কী করছে ?

—এতোক্ষণ আমার সঙ্গেই ছিলো, আমি যখন আসি তখন সে হার্মোনিয়ামে গান ধরেছে।

—বলো কী ? সিতাংশু তার শিথিল একখানি হাত কোলের উপর টেনে আনলো : তার গানের মধ্যে থেকে তুমি পালিয়ে এলে ? গানটা তাকে শেষ করতেও দিলে না ?

—তার গান আমি আর কোনোদিন শুনিনি কিনা।

—বা, সুকুমারবাবুকে শোনানো গান তো আর শোনোনি।

—যে শোনবার সে শুনুক গে ব'সে-ব'সে। সুভা হাতটা টেনে আনতে গিয়ে আরো গভীর ক'রে যেন ঢেলে দিলো : আমার তো খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই।

সিতাংশু জোরে হেসে উঠলো : বা, তোমার আবার কী কাজ ?

—আমার যা কাজ ছিলো তা তো হ'য়ে গেলো।

—কী ?

—ওঁকে ও-বাড়ি ভিড়িয়ে দিয়ে এলুম। সুভা সারা শরীরে হালকা হ'বার একটা ক্লেশকর চেষ্টা করলো : দাদারা জানেন, মীনা জানে, ও-ও জানে। এবার ওদের মাঝে দর-দস্তুর, বোঝা-পড়া। আমি সেখানে থেকে করবো কী ? গান শুনে তো আমার পেট ভরবে না।

সুভা আরেকবার উঠবার চেষ্টা করলো, কিন্তু আলস্যে আরো যেন গেলো ডুবে : এদিকে আমার সংসার প'ড়ে আছে, আর আমি ব'সে-ব'সে গান শুনি ! তোমার কী সব আব্দার !

সিতাংশু ব্যস্ত হ'য়ে জিগ্‌গেস করলে : সুকুমারবাবুকে বলেছিলে ? কী বললেন ?

—বলার তো কিছু দরকার নেই। কথাটাকে সুভা কিছুতেই ব্যক্তিবিরহিত করতে পারলো না : এমন মেয়ে বিয়ে করতে পারা তার ভাগ্যের কথা।

—তা তো বটেই। কিন্তু বিয়ে করবেনই এমন কোনো কথা দিয়েছেন ?

—কথা না দিলে ব'সে-ব'সে গদ্গদ হ'য়ে একটার পর একটা সে গান শোনে কী ব'লে ? সুভা যেন ঝাঁজিয়ে উঠলো।

—তা তো বটেই। সিতাংশু জিগ্‌গেস করলে : আর মীনা ? মীনার কী মত ?

—অভিভাবকের বিরুদ্ধে তার কোনো মত নেই।

—হ্যাঁ, সে যে তোমারই বোন। বাঙলা-দেশেরই তো মেয়ে।

—তাকে আমি বলাতে সে বললে, 'যদি তুমি ব'লো'—সুভার গলা কেঁপে উঠলো।

—'তুমি যদি বলো?' সে কী কথা?

—তার মানে তুমি বুঝতে পারছ না? তার মানে, তার নিজেরই খুব ভালো লেগে গেছে। কেনই বা লাগবে না? হঠাৎ হেসে উঠতে গিয়ে আওয়াজটা কেমন করুণ শোনালো: প্রথমতো,—অতো কথাই বা কেন? বিয়ে তো তাকে করতেই হ'বে, আর যেখানে অভিভাবকের সম্মতির একটা অবারিত প্রশ্রয় আছে—সুভা এবার জোর ক'রে উঠে পড়লো: আর শেষ পর্য্যন্ত সবই যখন একটা অভ্যেস!

—আর তোমার দাদারা?

—দাদাদের কথা আর কিছু বোলো না।

—কেন, তাঁরা সুকুমারকে আগে থেকে চিনতেন না?

—না, কী ক'রে চিনবেন? সুভা আবার ঘন হ'য়ে বসলো: তখন দাদারা কোথায়? বড়-দা দেশে বিষয় দেখছেন, মেজ-দা চাকরিতে সিলেটে। তখন বাবার আধিপত্য। বাবা মারা যাবার পর—

—বুঝলাম। সিতাংশু বাধা দিলো: তখন, তখন কোন সময়টাকে বলছ?

সুভা কথাটার পাশ কেটে গেলো: যখন দাদারা কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন না আর কী?

—যাক্। সিতাংশু হাল ছেড়ে দিলেও নৌকোটা ডুবতে দিলো না: দাদারা কী বললেন?

—কী আর বলবেন! সুভা রুক্ষ গলায় বললে,—হাতের কাছে পাত্র একটা তাঁদের পেলেই হ'লো। ফুর্ত্তিতে একেবারে ফতুর হ'বার জোগাড়। দুনিয়ায় আর যেন তাঁদের কিছু দেখবার নেই। কী যে কাণ্ড! তুমি যদি একবার দেখতে।

—বা, তাঁদের কী দোষ! সিতাংশুর দীর্ঘ একটি দৃষ্টিরেখা সুভাকে যেন বিদ্ধ করলো: তুমিই তো তাঁদেরকে পাত্র বেছে দিলে। তুমিই তো বললে দুনিয়ায় এমন পাত্র আর হ'তে নেই। তুমিই তো—

—হ্যাঁ, সুভা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো, ক্লান্ত গলায় বললে: আমার আর কী! আমি আমার কাজ সেরে দিয়েছি। আমি আর এর মধ্যে নেই। পাত্র দেখে দিতে বলেছিলো—ব্যস্। এখন তাঁরা বুঝবেন। আমার কী! মীনার ভালো লেগেছে, মীনা বুঝবে।

সুভা জানলার কাছে স'রে এলো। বাইরে হঠাৎ অন্ধকার আকাশ দেখে সে স্পষ্ট অনুভব করলে তার চার পাশে এখন নিঃশব্দতার অন্ধকার।

সুভা ছট্‌ফট্‌ ক'রে উঠলো। চেয়ে দেখলো সিতাংশু ঘরে নেই, বারান্দায় কখন আলগোছে উঠে গেছে। পরিচিতি ঘর-দোর, বিছানা-বালিস—সমস্ত কিছু তার কাছে মনে হ'তে লাগলো অশরীরী, ঘরের সমস্ত স্পর্শ-সুরভিত হাওয়া যেন শ্বাস রোধ ক'রে আছে। মনে হ'লো সমস্ত কিছু থেকে সে যেন বিচ্ছিন্ন, ছন্দচ্যুত, অবাস্তব। নিঃশব্দতার নিস্তরঙ্গ মধ্যসমুদ্রে সে একা, একেবারে একা। তার জন্যে পার নেই, পরিধি নেই। যতোদূর চোখ যায় ততোদূর কেবল গভীর, গভীর নিঃশব্দতা।

স্খলিত, দ্রুত পায়ে সুভা বারান্দায় ছুটে এলো। সর্বাঙ্গে নিয়ে এলো চঞ্চলতার তরল লঘিমা। ব্যাকুলতার একটি আলুলায়িত শ্রী। গুমোটের পর শরীরে হাওয়া উঠলো ঝির্‌ঝির্‌ ক'রে।

বারান্দার আলোটা জ্বেলেই সুভা তরল গলায় হেসে উঠলো। পিছন থেকে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধ'রে বললে,—এ কী, তুমি এখানে এসে বসলে যে। খেতে যাবে না?

সিতাংশু চোখ উঁচু করলো। দেখলো হাসিতে সুভার মুখ কাঁপছে, হাসিতে চোখ উঠেছে ভিজে। সারা গায়ে হাসির ছোট-ছোট ঢেউ ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে, চুলে হাসি উঠেছে বনের বাতাসের মতো ফিস্‌ফিসিয়ে।

সিতাংশুর ভারি মায়া করতে লাগলো। হাতলের উপর তাকে বসবার জায়গা ক'রে দিয়ে সে বললে—এখনো খিদে পায় নি।

—না, না, তুমি চলো। সুভা স্বামীর পাশে ব'সে পড়লো: তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যাবে চলো।

—আজ এতো শিগ্‌গির ঘুমোবো?

—না, না, ঘুমোবো কি আর সত্যি? সুভা চঞ্চল হ'য়ে উঠলো: দু'জনে গল্প করবো শুয়ে-শুয়ে।

সিতাংশু ধারালো ঠোঁটে হেসে বল্‌লে,—গল্পগুলি এখানে শেষ ক'রেও তো আমরা ঘুমোতে যেতে পারি। আরেকটু বোসো না।

—না, না, তুমি চলো বল্‌ছি শিগগির। সুভা সিতাংশুর হাত ধ'রে টানাটানি করতে লাগলো: রাত নেহাৎ কম হয় নি। ঠাকুর-চাকর মৌরসি ঘুম মারছে। খিদেয় আমি প্রায় মারা গেলুম—ও-বাড়িতে এক পেয়ালা চা পর্য্যন্ত আমি ছুঁইনি। চলো বলছি। আমার জন্যে তোমার একটু মায়া হয় না?

সিতাংশু উঠতে-উঠতে বললে,—ও বাড়ি থেকে খেয়ে এলেই তো পারতে অনায়াসে।

সুভার আজ হয়েছে কী,—থেকে-থেকে কেবল ও বাড়ির কথা উঁকি মারছে। হঠাৎ সে ঝল্‌সে উঠলো: আমার তো আর এ-বাড়িতে খাওয়া জুটছে না—

সিতাংশু হেসে উঠলো: তুমি এমন ভাবে কথা বলছ যেন ও-বাড়ির সঙ্গে তোমার আর কোনোই সম্পর্ক নেই।

—বল্‌তে গেলে, নেই-ই তো। মুক্তিতে সুভা যেন হঠাৎ বিস্ফারিত হ'য়ে উঠলো: আমার দুই হাত এখন সম্পূর্ণ ধোয়া, পরিচ্ছন্ন। আমার দুই হাতে আমার এই নতুন সংসার—আমার নিজের সৃষ্টি। তোমার অমন দাঁত বা'র ক'রে হাসতে হ'বে না তো। পা চালিয়ে চলো দিকি নিচে।

নিচে নেমে এসে সুভাকে আর এখন পায় কে। এখানে-ওখানে সব জায়গায় সে জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঠাকুরকে দিচ্ছে ধমক, চাকরকে করছে ফরমাজ। গয়লানিকে সে বরখাস্ত ক'রে দেবে যদি কাল থেকে সে দোর-গোড়ায় গরু নিয়ে না আসে। ঠাকুর যে এক বেলাতেই এক পো তেল লাগাবে তা চলবে না, শিশি ক'রে এবার থেকে সে মেপে-মেপে দেবে। তাদের বিয়ের বাটিটা যে চাকর এমন অসাবধানে ভেঙে ফেললো, তার দাম ওর মাইনে থেকে না কেটেছি তো কী।

খেতে বসে'ও আবার সেই কথা। সুভার কোনো হাত নেই।

—আর দেখ, আমি ভাবছি দুপুরগুলো এমনি ঘুমিয়ে আর অপব্যয় করবো না। পাড়ায় অন্তঃপুরিকাদের জন্যে একটা কী প্রতিষ্ঠান হয়েছে, তার মধ্যে ঢুকে পড়ি। কী বলো? তবু খানিকটা সময়—

পাশের হাতের তাস দেখবার জন্যে যেমন ক'রে তাকায়, তেমনি চোরা চোখে সিতাংশু বল্‌লে,—দুপুরবেলাকে আর ভয় কী! সুকুমার তো এখন থেকে আর এ-বাড়িতে আসবে না। তার 'ভেন্যু' যে এবার বদ্‌লে গেছে।

—আহা, তাকে যেন আমার কতো ভয়। সুভা রাগে অসহায় বোধ ক'রে বল্‌লে,—এবার এলে সোজা আমি তার মুখের উপর দরজা বন্ধ ক'রে দেবো। তোমার বন্ধুই হোক্, আর যে-ই হোক্।

সিতাংশু হেসে বল্‌লে,—ঐ তো তাকে ভয় করছ।

—ভয় না হাতি! সুভা থালার থেকে হাত গুটিয়ে নিলো: তোমার খাওয়া হয়েছে তো ব'সে আছো কী করতে? চলো ওপরে, আমার ঘুম পায় না বুঝি? না-ঘুমিয়ে এঁটো হাতে তোমার সঙ্গে রাজ্যের বাজে গল্প করি ব'সে-ব'সে।

পিসিমার খাওয়ার কাছে বসবার আজ তার সময় নেই। তার শয্যা তাকে

ডাকছে। সেই তার আশ্রয়, তার দুর্গ, তার মুক্তি। পর্ব্বতের গুহার মতো নিরাপদ, আকাশের অনাবরণের মতো অবারিত।

সিতাংশু বল্‌লে,—আলোটা নিভিয়ে দাও।

সুভা স্বামীর সান্নিধ্যের তাপমণ্ডলে স'রে এসে পরিপূর্ণ গলায় বললে,—না, না, এখুনি নেভাবো কী!

তার চুলে হাত বুলোতে-বুলোতে সিতাংশু স্নিগ্ধ গলায় বললে,—বল্‌ছিলে না, তোমার খুব ঘুম পেয়েছে।

—জেগে-জেগে এই তো আমার চমৎকার ঘুম। সুভা করুণ দুটি ঠোঁটে অল্প একটু হেসে উঠলো: ঘুমিয়ে পড়লে তো ঘুমের আর কোনোই স্বাদ পেলুম না।

ঘরে, বিছানায় স্তব্ধতা উঠলো রাশীভূত হ'য়ে। আলোকিত স্তব্ধতা।

সিতাংশু সুভার ভুরু দু'টিতে আঙুল বুলোতে-বুলোতে বললে,—তুমি কতো গল্প করবে বলছিলে না?

—এই তো চমৎকার গল্প। হাসিতে সুভার দুই চোখের অতল গভীরতা যেন উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো: কতোগুলি কথা বললেই বুঝি গল্প করা হয়! গল্প করলেই তো গল্প গেলো মাটি হ'য়ে।

সময়—সময়কে সুভা অনেকটা বশে এনে ফেলেছে। তার স্তব্ধতাকে নিয়ে এসেছে স্পর্শের পূর্ণতায়। তার ক্লান্তিকে নিয়ে এসেছে শিথিল একটি সমর্পণের তৃপ্তিতে।

কিন্তু সিতাংশুই একসময় আলো নিভিয়ে ঘর অন্ধকার ক'রে দিলো।

অন্ধকারের প্রথম প্লাবনে সুভা মজ্জমান, নিরাশ্রয় শিশুর মতো শরীরের সমস্ত তন্তুতে হঠাৎ নিঃশব্দে হাহাকার ক'রে উঠলো। যেন দৈত্যাকার বিশাল সেই অন্ধকার তার বিপুলতার ভারে তার সমস্ত আকাশ ঢেকে ফেলেছে। নিঃসহায়, নিঃস্ব দুই হাত মেলে সে পার খুঁজতে গেলো, খুঁজতে লাগলো তার সেই জীবনের তাপমণ্ডল।

সিতাংশুকে কাছে পেয়ে সে নিশ্বাস ফেললো। তার আকাশময় বিশাল আশ্রয়। তার প্রাকারবেষ্টিত দৃঢ়কায় দুর্গ।

স্বামীর স্পর্শস্ফার বুকের মাঝে মুখ ঢেকে সুভা উদ্বেল গলায় বললে,—এতো বড়ো অন্ধকারে শুধু তুমি আর আমি। আমাদের ছাড়া আর এখানে কেউ নেই কেউ নেই।

নিরাভ দিগন্তে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেছে, হলদে, বিষণ্ণ। তার একটি ক্লান্ত রেখা এসে বিছানার একপাশে শুয়ে পড়লো। উঠে জানলাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এলে হয়। তার চেয়ে, সুভা নিজেই রইলো চোখ বুজে।

দশ

অতীত থেকে পালাতে হ'বে শুধু বর্ত্তমানে বেঁচে। যাতে আমরা রোমাঞ্চিত হই, শুধু তাইতেই আমরা বাঁচি।

মীনার কথাগুলি এখনো সুকুমারের কানে বাজছে: আমরা তো জীবন পাইনি, পেয়েছি ক'টি খণ্ড-খণ্ড বিচ্ছিন্ন মুহূর্ত্ত। দ্যুতিমান, আগ্নেয় মুহূর্ত্ত। আমাদের বাঁচা শুধু সেই ক্ষণকালিক স্পন্দমানতায়।

এ যেন তারই কথার প্রতিধ্বনি।

সুকুমার মন ঠিক ক'রে ফেললো। মুহূর্ত্তে ঠিক ক'রে ফেললো। মন ঠিক করবার জন্যে যেটুকু সময় চেয়েছিলো তারো অনেক আগে।

মীনার মাঝে তার সেই অপসৃত অতীতকাল আবার যেন চিত্রীয়মান হ'য়ে উঠেছে। তন্বঙ্গী, মধ্যমিকা—তার দীপ্যমান শরীরে চলেছে চঞ্চলতার চক্রবাত—মীনা যেন সুভার সেই অতীত দিনের একটি অলিখিত পৃষ্ঠা। তার চারদিকে যেন সেই অতীত রাত্রির ধূমল ধূসরিমা।

সেই ক'টি রোমাঞ্চিত মুহূর্ত্ত আবার তার জীবনে ফিরে এসেছে। সুকুমার এবার আর তাদের হারাতে দেবে না।

বলতে কি, মীনাকে তার ভালো লেগেছে। তার শরীরে সেই একটি গতির ধাবমান শিখা, সেই একটি শীতল নিরবদ্য নির্ম্মলতা—একদিন সুভার যা ছিলো। সেই আপাতচঞ্চলতার অন্তরালে একটি আকস্মিক গাম্ভীর্য্য—যা সুভার একদিন ছিলো। সুষমার সেই একটি বিসর্পিণী লীলা—একদিন একান্ত ক'রে ছিলো যা সুভার।

পটভূমির বিশেষ পরিমিতিতে যেমন ছবি খোলে, তেমনি সুভার সেই তিরোধানের শূন্যতায় এই তার নতুনতরো আবির্ভাব হঠাৎ জ্যোতিষ্মান হ'য়ে উঠেছে।

সেই সেদিনের সুভা। সেই ঈষৎ কম্পমান চোখের পাতায় গালের উপর তরল একটু ছায়া পড়ে। সেই দু'টি অগাধ চোখে সস্পৃহ তন্ময়তা। ভুরু দু'টিতে সেই বাঁকানো রহস্য। দু'টি সেবমান হাতে অজস্র মুক্তি। চুল খুলে দিলে সেইদিনের অস্ফুট গুঞ্জন শোনা যায়। চলার চমকে সারা গায়ে সেই পলায়মান দীপ্তির ঢেউ জাগে। বাহুর ডৌলটি তেমনি বিহ্বল, চিবুকের চারুতাটি তেমনি মসৃণ, কটি থেকে দু'টি পায়ের রেখা তেমনি কোমল বঙ্কিমায় নেমে এসেছে।

আঁচলে ক'রে নিয়ে এসেছে সে সেই ক'টি সোনার মুহূর্ত্ত। সেই একটি আধো-পরিচয়ের ছায়াঘন আলস্য, সেই একটি আধো-অস্ফুট স্তব্ধতার রমণীয় মুখরতা।

সেই দিন সে কোথায় ছিলো? সেই দিন সে কেন এমন মূর্ত্তিতে আসেনি —এতো সহজ হ'য়ে, এই নির্ব্ব্যবধান সান্নিধ্যের উত্তপ্ততায়! সেই দিনও তাকে সুকুমারের চিনতে দেরি হ'তো না।

হ্যাঁ এক নিমেষে সুকুমার মন ঠিক ক'রে ফেললো। আর প্রেম নয়, এবার প্রাপ্তির পরিব্যাপ্তি। প্রতীক্ষা করবার আর তার স্নায়ু নেই। আর সাধনা নয়, এবার শুধু সমর্পণের পূর্ণতা। আর নয় সঙ্কেতময় কবিতা, একটা ঘটনাবহুল, পরিস্ফীত উপন্যাস। একটা দীর্ঘাকৃত সমাপ্তি।

সুকুমার চেয়ার ছেড়ে উঠে রাস্তার দিকের জানলাটা খুলে দিলো। জানলা খোলার শব্দে ওপারের বারান্দা থেকে একটা পায়রা উঠলো ক্লান্ত কূজন ক'রে। সবুজ একটি তারা তার চোখের উপর চুপ ক'রে জেগে রইলো। তার টবের কলাবতীর দীর্ঘ একটা পাতা হাওয়ায় একটু কাঁপছে।

অন্ধকার, স্তব্ধ রাত্রি তার চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত ক'রে ধরলো তার জীবনের অপরিমেয় বৃহত্ত্ব। অতীত থেকে পালাতে হ'বে শুধু বর্ত্তমানে বেঁচে। এবং তাতেই আমরা বাঁচি যাতে আমরা রোমাঞ্চিত হই।

নিজের জীবনের মাপে সুখ কখনো তৈরি ক'রে নেয়া যায় না, যা হাতে এসে পড়ে তাই আমাদের পাথেয়।

মন ঠিক করতে সুকুমারের দেরি হ'লো না, কেননা কথাটা মীনার শ্রুতিগত হ'তেই সে-ও অলক্ষ্যে প্রতিধ্বনিমান হ'য়ে উঠেছে। তার চলার উপর নিয়ে এসেছে একটি মদির মন্থরতা, কথার উপর একটি সঙ্কেতসঙ্কুল সঙ্ক্ষিপ্ততা। সেইখানেও সুভার সঙ্গে তার আশ্চর্য্য মিল। সেদিন কথাটা দু'জনের মাঝে ইঙ্গিতে এমনি উচ্চারিত হ'য়ে উঠলে সুভাও এমনি লজ্জায় চোখ দু'টি বিলোল ক'রে তুলতো, তার সান্নিধ্যের উজ্জ্বলতা ছেড়ে খুঁজতো দূরের বিচ্ছেদের অন্ধকার, সেদিনো তার চারপাশে বুনে তুলতো একটি অপরিচয়ের রঙিন কুজ্ঝটিকা।

আশ্চর্য্য এই মিল। এই মিলটির জন্যেই মীনাকে আজ চেনা যাচ্ছে। সেই ক'টি খণ্ড-খণ্ড বিচ্ছিন্ন মুহূর্ত্ত দিয়ে সে তৈরি।

আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য। আমরা কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসি না, ভালোবাসি একটা বিশেষ অভিব্যক্তিকে। নির্দ্দিষ্ট, স্পর্শসহ কোনো একটা অর্থকে নয়, নিরবয়ব, অনাবিষ্কৃত একটা ভাবকে। রেখাঙ্কিত কোনো রূপ নয়, একটা ছায়া।

সুকুমার জানলার থেকে ফিরে এলো। হ্যাঁ, সুখকে নিজের মাপে তৈরি ক'রে নেয়া যায় না; যা হাতের কাছে এসে পড়ে, সেই তোমার সুখ। সেই ছায়ার সঙ্গে যার যতোটুকু মিল, সেই মনে হ'বে তোমার সৃষ্টি।

সুকুমার স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। সব দিক থেকে সে একটা সুসম্বদ্ধ ছন্দ আনতে পেরেছে। নিজের রিক্ততার উপর একটি পরিপূর্ত্তির সমারোহ, সুভার সুখসমৃদ্ধির উপর একটি নিরাবরণ নির্মুক্তির আবহাওয়া।

আর কোনো দাহ নেই, অনুতাপ নেই, অসহায় স্বাধীনতা নেই। যাই বলো, জীবনের স্রোতের মুখে তুমি অসহায়।

শরীরে-মনে লঘুতরো স্ফূর্ত্তি নিয়ে সুকুমার পর দিন দুপুরবেলা আবার এসে হাজির হ'লো। আজ তার বেশ-বাসের পারিপাট্যের মাঝে থেকে-থেকে তার চিত্তের শিথিলতা উঁকি মারছে।

নিচে পিসিমার সঙ্গেই প্রথম দেখা হ'য়ে গেলো।

—এই যে সুকুমার এসেছে। তাঁর খুসি আর ধরে না, এগিয়ে এসে গদগদ গলায় বললেন,—প্রমীলার মা'র চিঠি এসেছে আজ। তারা মেয়ে নিয়ে হপ্তা খানেকের মধ্যেই এসে যাচ্ছে কিন্তু।

সুকুমার স্মিতমুখে বললে, আমার বিয়ে যে ইতিমধ্যে ঠিক হ'য়ে গেলো।

সামনেই ছিলো সিঁড়ি, সুকুমার আর নিচে দাঁড়ালো না।

পিসিমা চোখ কচলে অন্ধকারটাকে ফিকে ক'রে প্রায় একটা আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন: বিয়ে ঠিক হ'লো কী, সুকুমার? আমি যে তাদের আসতে চিঠি লিখে দিলাম।

ততোক্ষণ কুসুমার সিঁড়িতে বাঁক নিয়েছে। বললে,—বেশ তো, আসুন না তাঁরা। আমার বিয়েতে না-হয় নেমন্তন্ন খেয়ে যাবেন।

পিসিমা নিচে যেন নিরাবলম্ব শূন্যের উপর দাঁড়িয়ে রইলেন।

উপরে মিলিয়ে যাবার আগে সুকুমার কথাটা নিচে ছুড়ে মারলো: আমি এখুনি আসছি। এসে সব কথা বুঝিয়ে বলবো আপনাকে। কিছু ভাবনা নেই।

সুভাকে নাম ধ'রে সে আজ হঠাৎ ডাক দিতে যাচ্ছিলো, কিন্তু সে-ই আপনা থেকে সামনে উঠে এসেছে। বারান্দাতে বেতের ইজিচেয়ারটায় ব'সে-ব'সে সে যেন এতোক্ষণ রৌদ্র দেখছিলো, তার সারা শরীরে সেই নির্নিমেষ ক্লান্ত দৃষ্টির রুক্ষতা।

ভীত, বিবর্ণ মুখে সে জিগ্‌গেস করলো: কী ঠিক হ'য়ে গেলো?

কী আবার! বিয়ে।

বিয়ে? কা'র সঙ্গে?

তুমি দেখছি অবাক করলে। জানো না কা'র সঙ্গে? সুকুমারের চোখ-মুখ খুসিতে পিছল, যেন-বা লালায়িত হ'য়ে উঠলো: কা'র সঙ্গে আবার! মীনার সঙ্গে।

—ও। তাই বলো। সুভা তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে তার চেয়ারে গিয়ে বসলো।

সুকুমার এগিয়ে গেলো। সামনেই ছিলো আরেকটা চেয়ার, বসতে সে একটুও দ্বিধা করলো না। তার ভঙ্গিটা আজ অনেক প্রখর, অনেক অকুণ্ঠ।

চেয়ারটা সুভার দিকে আরো একটু টেনে এনে বললে, শেষ পর্য্যন্ত তোমার কথাই রাখলুম। তোমার সঙ্গে ঠাট্টার সম্পর্কই পাতানো হ'লো দেখছি।

সুভা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, তুমি তো আমাকে ঠাট্টা করতেই আছো।

কথার সুরে সুভার সমস্ত চেহারা যেন সুকুমারের চোখে পরিষ্কার প্রতিফলিত হ'লো। শুকনো, শূন্য একটা ফুলদানির মতো দেখতে। যেন উইয়ে-খাওয়া ছেঁড়া একটা বই রোদ্দুরে শুকোতে দেয়া হয়েছে। যেন বৃষ্টির সন্ধ্যায় কার্নিশে ব'সে একটা শালিখ ভিজছে। নিরুত্তেজ, নেবানো চেহারা। শরীরের সব ক'টি রেখা যেন সারা গায়ে এ কে-বেঁকে ভেঙে পড়েছে। সমুদ্রের পারে বালির চিহ্নের মতো বিলীয়মান সব রেখা।

সুকুমার সুরেলা গলায় বললে,—বা ঠাট্টা কোথায়? সত্যি-সত্যি তোমার কথাই রইলো।

—থাকাই তো উচিত।

—দেখ পুরুষের ভালোবাসার কী মাহাত্ম্য! সুকুমার তীব্র চোখে তাকে যেন আমূল বিদ্ধ করলো: ভালোবাসার জন্যে বিয়ে পর্য্যন্ত সে করতে পারে।

—হ্যাঁ, করাই তো উচিত একশো বার।

সামনের দেয়ালটা যেন সুভাকে কথা বলতে সাহস দিচ্ছে।

সুকুমার বললে,—তবে ঠাট্টার কথা বলছিলে কী?

—না, না। আমার কথা ছেড়ে দাও। সুভা উঠে বসবার চেষ্টা করলো; বললে—মীনা তা হ'লে মত দিলো?

—হ্যাঁ, কেন দেবে না? তুমিই তো তাকে মত দিতে বললে।

—বা, তার নিজের কোনো মত নেই? সে তো আর কচি খুকিটি নয়।

সুকুমার হেসে বললে,—তাই তো মনে হচ্ছে।

—কী মনে হচ্ছে?

—কচি খুকিটি তো নয়-ই, আর এ-বিয়েতে তার কোনো অমত-ও নেই।

—নেই? সুভাকে কী-রকম যেন চুপসানো, বুড়োটে দেখাচ্ছে: কী করে বুঝলে?

সুকুমার নির্লিপ্ত গলায় বললে,—তার সঙ্গে তারপর আমার দুয়েকবার নিভৃতে দেখা হয়েছিলো।

—যাক, ঘটা ক'রে তোমাকে আর সে-সব নিভৃত সন্দর্শনের বর্ণনা দিতে হ'বে না। বাইরের রোদের দিকে পিপাসিত চোখে চেয়ে স্বভা জিগ্‌গেস করলে : আর দাদারা ?

—তাঁরা এককথাতেই রাজি।

—যাক। নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো। স্বভা মন্দায়মান সন্ধ্যার মতো ধীরে-ধীরে ইজিচেয়ারের কোলে ডুবে গেলো।

স্বকুমার বললে,—তুমি তো আরেকজনের কথা জিগ্‌গেস করলে না ?

—কা'র ?

—আমার। আমারো তো একটা মত আছে।

—জিগ্‌গেস করতে সাহস হয় না।

—কেন ?

—পাছে, স্বভার ঠোঁটের কিনারে সেই ট্র্যাজিক্যাল রেখাটি গভীরতরো হ'য়ে ফুটে উঠেছে : পাছে তুমি ব'লে বসো মীনার মতো অমন মেয়েকে বিয়ে করতে তুমি রাজি নও।

—তোমার সে ভয় নেই।

—না, আমি তা জানতুম। সামনের দেয়ালের দিকে চেয়ে স্বভা আবার সাহস পেলো, তাড়াতাড়ি উঠে বসবার চেষ্টা ক'রে বললে,—ভয় তো নেই, কিন্তু বিয়ে ক'রে মীনাকে তুমি কী খাওয়াবে ? ওকালতি ক'রে তুমি কতো পাও ?

স্বকুমার রুক্ষ গলায় বললে,—পাত্র-মনোনয়নের বেলায় তো সে-সব কথা মনে করো নি।

—আমরা তা করিনি ব'লে তোমার দায়িত্ব তো কিছু ক'মে যাবে না। তোমার নিজের তো একবার ভেবে দেখা উচিত। এ তো আর একটা মফস্বলের মেয়ে ধ'রে আনছো না।

—তোমার তাতেও ভয় নেই। স্বকুমার পরিতৃপ্ত মুখে বললে,—মেয়ে মফস্বলেরই হোক, আর সহরেরই হোক, একজনকে সে যখন বিয়ে করে—

—তখন কী ? স্বভা যেন হঠাৎ আর্তনাদ ক'রে উঠলো।

—তখন ঝোড়ো রাত্রে তার সঙ্গে জাহাজের খোলা ডেকের ওপর শুয়েই সে যাত্রা করতে পারে জীবন-সমুদ্রে।

—ও। স্বভা চেয়ারে আবার ভেঙে পড়লো।

চুপচাপ। পাথরের মতো অনড়, অভেদ্য স্তব্ধতা।

স্বকুমার বললে,—আমাদের বিয়েতে যাবে তো নেমন্তন্ন রাখতে ?

সুভা যেন কাঁটার উপর শুয়ে আছে সারা গায়ে এমনি ছট্‌ফট ক'রে উঠে বললে,—তোমাদের বিয়ের দিনও ঠিক হ'য়ে গেছে নাকি ?

—প্রায়।

—কবে ?

—এই কাছাকাছি একটা দিন। আমারই সুবিধে বুঝে ঠিক হ'বে কিনা। তোমরা যাবে তো ?

—দেখি। তেমনি মাথার নিচে একখানি বাহু রেখে সুভা ক্লান্তিতে প্রসারিত হ'য়ে পড়লো : কাছাকাছি হ'লে থাকা প্রায় অসম্ভব হ'বে। আমরা দিন কয়েকের জন্যে কোথাও ঘুরে আসবার সঙ্কল্প করেছি। ওঁর হজমটা ভালো হচ্ছে না।

—বেশ তো, সুকুমার নির্লজ্জের মতো হেসে উঠলো : কিছু না-হয় লাইট-ফুডের বন্দোবস্ত করা যাবে। তোমার বোনের বিয়ে, তুমি থাকবে না কী !

সুভা চোখ নামিয়ে চাপা গলায় বললে,—পৃথিবীর সব উৎসবেই সকলে যোগ দিতে পারে নাকি ?

হাতের আধখানা তুলে সুভা চোখ ঢাকলো।

চারদিকের হাওয়া আবার থেমে-থেমে কঠিন পাথর হ'য়ে গেলো।

সুকুমার নিষ্পলক চোখে সুভাকে দেখতে লাগলো। ক' দিনে সে যেন কী হ'য়ে গেছে। সেই ঐশ্বর্য্য-সমারূঢ়া, বহুধনিকা নগরী যেন একটা বিধ্বস্ত দারিদ্র্যের স্তূপ। তার সঙ্গে-সঙ্গে ঘর-দোরের চেহারাও কেমন মলিন হ'য়ে এসেছে। মেঝেতে যেন ঝাঁটা পড়ে নি, কড়িতে ধরেছে ঝুল, ঘরের বিছানা দু'টো সেই বিহ্বল বিলাসিতায় আজ আর উদ্ঘাটিত নয়। সবখানে কেমন একটা এলোমেলো অসমমাত্রার ছন্দোহীন অপরিচ্ছন্নতা। অথচ কোথাও এতোটুকু মুক্তির ঔজ্জ্বল্য নেই।

সুভার এ কী চেহারা !

আরো কতোক্ষণ নীরবে কাটতো কে জানে, সুভা হঠাৎ ঝাঁজিয়ে উঠলো : এখানে আর ব'সে আছো কেন ? তোমার কথা তো হ'য়েই গেলো।

সুকুমারের মুখের উপর সহসা যেন কে চাবুক মারলো। মার হজম ক'রে হাসি-মুখে সে বললে,—তোমার হাতের এক পেয়ালা চায়ের জন্যে ব'সে আছি।

—আমার হাতের চা খেয়ে আর কী হ'বে ? সুভা চোখের থেকে হাত এখনো তুলতে পারছে না।

—কেন, তোমার হাতের চা কি কোনোদিন খাই নি ?

—তোমার চা তো অন্যত্রই তৈরি হচ্ছে। সেখানে গেলেই তো পারো। আমার শরীরটা আজ ভালো নেই।

—শরীর যখন ভালো নেই, তখন আর কী করা যাবে। সুকুমার উঠে দাঁড়ালো : অন্যত্রই যাচ্ছি।

সুকুমার সত্যি-সত্যি সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালো। নামবার মুখে ফিরে তাকাতে গিয়ে দেখলো হাত থেকে চোখ তুলে সুভা দীর্ঘায়মান, শাণিত একটি দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। সেই দৃষ্টি দূর দিগন্তের মতো একাকী।

একেক পা ক'রে সুকুমার আবার এগিয়ে এলো। সেই দৃষ্টি যেন চিক্কণ, বিশীর্ণ একটা সাপ।

সুকুমার বললে, কী দেখছো ?

—তোমাকে।

—আমাকে ? মুগ্ধের মতো সুকুমার স্তব্ধ হ'য়ে রইলো।

—হ্যাঁ, তোমাকে। পুরুষের ভালোবাসাকে।

সুকুমার দৃঢ় পা ফেলে আরো একটু অগ্রসর হ'লো। চেয়ারের কাঁধটা সজোরে ধ'রে ফেলে নিষ্ঠুর গলায় সে বললে,—আর তোমার ভালোবাসা ? আর নারীর ভালোবাসা ?

—বোলো না, আমার কথা আর বোলো না। কোলের উপর দুই হাত রেখে তার উপর মুখ লুকিয়ে সুভা ফুঁপিয়ে উঠলো।

সুকুমার দেয়ালের মতো স্তব্ধ।

বললে,—তুমিই তো বলেছিলে তোমার জীবনের সেই হারানো, অলিখিত দিন-রাত্রিগুলি আমাকে উপহার দিতে চাও।

সুভা তবু কথা কয় না, মুখ তোলে না।

—তুমিই তো চেয়েছিলে আবার বেঁচে উঠতে। মনে নেই ?

সুভা মুখ তুলতে চাইলো, মুখ তুলে কথা বলতে চাইলো। মনে হ'লো সামনে আর তার দেয়ালের আশ্রয় নেই। সব শূন্যে মিলিয়ে গেছে, চারদিক তার সমুদ্রের মতো ফাঁকা, সাদা, অবিনশ্বর। মনে-মনে অনুভব করলো সেই সুশুভ্র শূন্যের পারে তার কাছে সুকুমার দাঁড়িয়ে, একা, একমাত্র। অঞ্জলির আচ্ছাদন থেকে ধীরে-ধীরে সে মুখ তুললো। হ্যাঁ, সুকুমারের কাছে তার কিসের ভয়, কিসের লজ্জা।

সুভা মুখ তুললো। সাদা, মরা মুখ। গাল বেয়ে অশ্রুর দু'টি ধারা নেমে এসেছে।

সুকুমার চেয়ারে বসলো। কতোক্ষণ কোনো কথা বললো না।

কিন্তু কথা কিছু না-কিছু বলতেই হবে।

বললে, আমাকে আজই সন্ধ্যার ট্রেনে একবার মাদ্রাজ যেতে হ'বে। বলে'ই

ধাক্কা মেরে এক ঝটকায় নিজেকে সে চেয়ার থেকে তুলে ফেললে : আমার দাঁড়াবার আর সময় নেই।

—মাদ্রাজ ? কম্পমান, মুমূর্ষু একটি দীপশিখার মতো সুভাও উঠে দাঁড়ালো : সেখানে তোমার কী কাজ ?

—কিছু জিগ্‌গেস কোরো না। ভীষণ জরুরি কাজ—না গেলেই নয়। আজই যাওয়া চাই। সে কথা এতোক্ষণ আমার একদম মনে ছিলো না। টাইম্‌-টেব্‌ল আছে ? ক'টায় ট্রেন ছাড়ে বলতে পারো ?

সুভার ঠোঁটের কাছেই ট্র্যাজিক্যাল রেখাটি হাসিতে ভ'রে উঠলো। সে হালকা গলায় বললে, বা রে, চা খেয়ে যাবে না ?

—চা খাবার সময় নেই। আমার নিশ্বাস ফেলবারো সময় নেই। সুকুমার দ্রুত পায়ে দরজার দিকে ধাওয়া করলে : চোখ মুছে ফেল, সুভা, আমি চললুম।

তাকে ধ'রে রাখবার জন্যে আজ আর সুভা একটি আঙুলো বাড়িয়ে দিলে না। শুধু তার কথামতো সাড়ির আঁচলে মুখটা সে মুছে ফেললে।

নিচে নামতেই আবার পিসিমার সঙ্গে দেখা।

হন্তদন্ত হ'য়ে এসে জিগ্‌গেস করলেন : বিয়ে তোমার সত্যি ঠিক হ'য়ে গেলো নাকি, সুকুমার ?

—কই আর ঠিক হ'লো ?

তাকে ধরবার জন্যে পিছে-পিছে আসবার অক্ষম চেষ্টা করতে-করতে খুসি হ'য়ে বললেন,—যাক্‌, বাঁচালে। কোথায় যাচ্ছ এতো তাড়াতাড়ি ?

কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ না ক'রে সোজা এগিয়ে যেতে-যেতে, সুকুমার বললে,—মাদ্রাজ। আজকের বিকেলের ট্রেনে। ভীষণ জরুরি কাজ।

—কবে ফিরবে ?

সে-কথার কে উত্তর দেয় ?

———

অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী

চতুর্থ খণ্ড

সংকলন

বাঁকা-লেখা

॥ এক ॥

সে-ঘরটায় ঢুকলেই মনে হ'ত সেটা একটা সাহেবে: দোকানের খেলনার প্রদর্শনী। বিশ্বকর্ম্মার মডেল শিল্পাগার-ও তাকে বলা চলে। যেদিকে চাওয়া যায় যন্ত্রপাতি, কলকব্জা লোহা আর কাঠের জঙ্গল। ঘরের যিনি অধিকারী তাঁর হাত বিশ্বকর্ম্মার মতোই বিশ্বের সব কিছুতেই চলত। বিশৃঙ্খলভাবে ঘরের চারপাশে স্তূপাকার হয়ে আছে জাহাজের মডেল, সেতুর নমুনা, এরোপ্লেনের ক্ষুদে সংস্করণ; রেলের বামনাবতার, কাঠ বাক্সে নতুন কলের করাত, মাটি খোঁড়বার যন্ত্র ইত্যাদি ইত্যাদি। আর ছিল হাতুড়ী, র‍্যাঁদা, তুরপুন, করাত, বাটালি ও স্ক্রু-ড্রাইভার, আর যত কিছু অস্ত্রশস্ত্র বিশ্বকর্ম্মার সেবকদের জানা আছে।

অভিনিবেশ সহকারে বছর তেইশের ছেলেটি একগাদা কলকব্জার মাঝে ব'সে একটি নতুন কলের লাঙ্গল পরীক্ষা করছিল। দরজার চৌকাটের ওপর থেকে একটি বছর চৌদ্দ-পনেরোর মেয়ে অনেকক্ষণ সেইদিকে চুপ ক'রে চেয়ে থেকে বল্লে—"বলি অধীরদা, কথা কি কানে যায় না নাকি? ছাই-এর লাঙ্গল, দেব দূর ক'রে আস্তাকুঁড়ে ফেলে। মা যে দু'ঘণ্টা ভাত রেঁধে ব'সে আছে সে খেয়াল আছে?" …ছেলেটি কোন উত্তর না-দিয়ে নিজের কাজ ক'রে যেতে লাগল। নীচে থেকে একজন বর্ষীয়সীর গলা শোনা গেল—"তুই চ'লে আয় মা চারু, কোনোকালে যার হুঁশ হ'ল না আজ তুই কি তাকে তাড়া দিয়ে হুঁশ করাবি?" এইবার ছেলেটি কাজ থেকে মুখ তুলে হেঁকে বল্লে—"লক্ষ্মী মা, রাগ করো না, আর ঠিক পনেরো মিনিট, এই একটু সেরেই যাচ্ছি। তারপর গলা নামিয়ে বল্লে—"এই চারীটা হয়েছে যত নষ্টের গোড়া। তোকে কে এখানে ফফরদালালী করতে ডেকেছে বাপু! চারী নয় ত একেবারে অশোকবনের চেড়ী।"

"আচ্ছা আচ্ছা, চেড়ীর ত ভারী দায় তোমায় খাওয়াবার জন্যে! চল্লুম আমি।" ব'লে মেয়েটি উঠল।

এমন সময় বাইরে কে ডাকলে—"সুধীর, সুধীর আছ?"

নীচে থেকে বর্ষীয়সী আবার বল্লেন—"কে উৎপল? ভেতরে এস না বাবা!"

মেয়েটি যেতে উঠেও একপাশে দাঁড়িয়ে রইল। বিলাতি জুতো মশ মশ করতে করতে গরদের পাঞ্জাবী পরা একটি সুশ্রী যুবক সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে বল্লে—"কি, সুধীর মিস্ত্রির কি এখনো ফুরসৎ হয় নি?" তারপর মেয়েটির দিকে চেয়ে একটু হাসলে।

মেয়েটি ঈষৎ হেসে বল্লে—"নিন, আপনার বন্ধুকে সামলান, আমায় ত গালাগাল দিয়ে গলা ধাক্কা দিয়ে বা'র ক'রে দিলেন শুধু খাবার বেলা বয়ে যাচ্ছে এই কথা বলতে এসেছিলুম ব'লে।"

আগন্তুক ছেলেটি জিজ্ঞেস কল্লে—"কি সুধীরের এখনো খাওয়া হয়-নি? আমাদের যে বারান্তরের তাগিদ এসে পড়েছে। কি রে, খেতে যাবি না?"

লাঙ্গলটা মেঝেয় নামিয়ে রেখে ধীর বল্লে—"শুনলে মা, পেটুকের ইঙ্গিতটুকু বুঝলে ত!"

মা, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে আসতে আসতে বল্লেন—"শুনলুম, তোর হ'ল?"

"হ্যাঁ হ'ল। নে চারী, ঘরটা গুছিয়ে রাখ্, আবার সেদিনকার মত কেলেঙ্কারী ক'রে বোস না যেন। উইণ্ডমিলের মডেল্‌টা আমার গেছে একেবারে নষ্ট হয়ে! ওই কোণ থেকে টেবল-ফ্যান্‌টা আস্তে আস্তে সরিয়ে সেখানে লাঙ্গলটা রাখবি, দেখিস একটা পাখা আল্‌গা আছে।"

"আমি অত পারব না বাপু, তোমার যত ভুতুড়ে যন্ত্র ছুঁতে ভয় করে। সেদিন গেলুম প্যাট্‌রাটা সরিয়ে নতুন ক'রে একটু সাজাতে, আর ওমা, এমন 'শক্' লাগল হাতে।"

সুধীর হাসতে লাগল। মা বল্লেন—"নারে চারু, তুই বাড়ী যা, পরের মেয়েকে রোজ-রোজ তুই ঘর গুছোতে হুকুম করবি কেন বল্ ত? আর রোজ-রোজ ওর ভালো লাগে?"

সুধীর চারুর দিকে চেয়ে বল্লে—"ওঃ, ওর খুব ভালো লাগে। দেখ না রোজ ঘর গুছোবার লোভে পালিয়ে আসে বাড়ী থেকে। কেমন রে চারী, ভালো লাগে না?"

মেয়েটির সুন্দর মুখটি লাল হয়ে উঠল। উত্তর না দিয়ে সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। উৎপলের সঙ্গে একবার চোখোচোখি হওয়ায় আরো রাঙা হয়ে সে চোখ নামিয়ে নিলে।

মা হেসে বল্লেন—"তোর যত ক্ষ্যাপার মত কথা, আচ্ছা এখন খেতে চ! এস বাবা উৎপল, আজ সেই রকম ডিমের বড়া করেছি, আয় চারু।"

উৎপল একটু দুষ্টু হাসি হেসে সুধীরের দিকে চেয়ে বল্লে—"আজ এইমাত্র খেয়ে এসেছি মা, পেটটা বড় ভার।"

"থাক্ না পেটুকরাম, আর ছলনায় কাজ কি! মার হাতের বড়ার নাম শুনলে তোমার উদরে খাণ্ডবদাহনের ক্ষুধা জাগে, তাও যদি না জানতুম!"

সকলে হেসে উঠল।

আজো সুধীরের সুস্থ সবল শ্যামবর্ণ শক্তিমান হাস্যদীপ্ত মুখের দিকে চেয়ে উৎপল কি-একটা পূর্ব্ব-পরিচিত স্মৃতির সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজতে গিয়ে বিফল হল। তার নাতিদীর্ঘ পেশী-বহুল শক্তি-ব্যঞ্জক দেহে, কালো কোঁকড়া চুলের তলায়, উদার ললাটের নীচে ছোট-ছোট উজ্জ্বল চোখ দুটি কাফ্রী ধাঁচের চাপা বসা নাক ও চোখ ও নাকের সম্পূর্ণ বিপরীত একেবারে নারীর মতো সুকুমার পাত্‌লা ছোট ঠোঁট—কি যে তার মনে করিয়ে দিতে চাইত, উৎপল ভালো ক'রে এখনো বুঝতে পারত না। সে হাসলে তার দৃঢ় চিবুকের দু-পাশে নারীর মতো মোলায়েম গালের টোল পড়লে সাদৃশ্য আরো পরিস্ফুট ও স্পষ্ট হয়ে উঠত।

॥ দুই ॥

দু ` ` বাড়ী রাস্তার দুইপারে বহুকাল মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ঠিক এই দুই পরিবারের মতোই প্রীতির সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে। দুটো পরিবারের যেমন, দুটো বাড়ীর মধ্যে তেমনি বাহ্যিক পার্থক্য অনেক ছিল। সামনে বিলিতি ফুলের বাগান দেওয়া লাল প্রাসাদোপম ইমারৎ এর সামনে যেমন ভাঙা পুরোনো দোতলাটা মানাত না, অত বড় বনেদী জমিদারের সঙ্গে সামান্য ভুঁইফোঁড় জজ-কোর্টের প্রায়-ব্রীফ্‌হীন উকিলের পরিবারের ঘনিষ্ঠতাও সাধারণের চক্ষে তেম্‌নি বেমানান বলতে পারা যায়। তবু ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং যেদিন জজকোর্টের দরিদ্র উকিল রামমোহনবাবু মাত্র কয়েক হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ ও এই পৈতৃক দোতলাটি স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রের ভরণপোষণের জন্য রেখে কোন্ অজানা আদালতের শমন তামিল করতে প্রয়াণ করেছিল, সেদিন থেকেও এই ঘনিষ্ঠতা শিথিল হবার কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি অন্ততঃ এই দুই পরিবারের স্ত্রী-অধিবাসীদের দিক থেকে। দুই পরিবারের প্রীতির সম্বন্ধের সূত্রপাতই স্ত্রীলোকদের মধ্য দিয়ে। চারুলেখার মা ও সুধীরের মা ছেলেবেলায় একই পাড়ায় দুই সই ছিলেন। অনেক 'বেলফুল' বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে যায়, কিন্তু তাঁদের এ পর্য্যন্তও যায়নি।

চিত্রলেখা ও চারুলেখার বাপ বিদ্গাঁও-এর জমিদার অন্নদাবাবু ছিলেন শিক্ষিত জ্ঞান সন্ধানী ও কলা-রসিক,—সেকালের সাধারণ অধিকাংশ জমিদারের মতো বিলাসী মাংসপিণ্ড ছিলেন না। যে যুগে উপসর্গ না থাকলে জমিদারের সম্মান হত না, সেই যুগেই তিনি যে উপসর্গের লোভ কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন এটা একটা প্রশংসার কথা। বংশানুক্রমিক ভোগ-বিলাস-জাত শরীরের ও বুদ্ধিবৃত্তির আলস্য

তাঁর যে একেবারে ছিল না তা নয়, তবে সে আলস্য তাঁকে শুধু কঠিন দায়িত্ব-পূর্ণ কার্য্যেই বিমুখ করে তুলেছিল, ইতর ভোগ-বিলাসে ডুবিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি প্রথমে পিতৃ-পিতামহের মতো গোঁড়া হিন্দুয়ানীরই পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু যখন বড় মেয়ে চিত্রলেখা বিবাহের ছ'মাস পরে এগার বছর বয়সে থান প'রে ঘরে ফিরে এসেছিল, সেদিন তিনি সংস্কার জলাঞ্জলি দিয়ে ছ'বৎসরের মধ্যে আয়োজন করে আবার নতুন ক'রে মেয়ের বিয়ে দিতে পেছ-পাও হননি। সমাজ তাঁকে ত্যাগ করলে তিনিও এবার ক্রুদ্ধ হয়ে সমাজকে ত্যাগ ক'রে ৪৫ বৎসর বয়সে সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা নিলেন। এতদিন তাঁদের সংসার যে-রকম চলত, এই ব্রাহ্ম হওয়ায় রীতি-নীতির কোনো পরিবর্ত্তন কিন্তু হল না সেই রকমই চলতে লাগল।

চারুলেখা মানুষ হয়েছে এই ব্রাহ্ম-দীক্ষা ও হিন্দু-শিক্ষার আবহাওয়ায়। এখানে ছিল উদার আধুনিক-সংস্কার বর্জ্জিত চিন্তা-প্রণালী ও প্রাচীন বহুযুগের স্মৃতি-সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার আচার-নীতি।

অন্নদাবাবু চিত্রলেখার বেলায় একবার ঠকেছিলেন, এবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন চারু উপযুক্ত বয়সের না হ'লে আর বিয়ে দেবেন না তার। যারা বার বছরে বিবাহ না দেওয়ার পরিণাম সম্বন্ধে তাঁকে সচেতন করবার জন্য সচেষ্ট হ'ত, তাঁদের তিনি বললেন শুধু,—"আজ তো আর মানুষ শুধু দেহ সর্ব্বস্ব নয় যে তার দেহের ইঙ্গিতে সমস্ত কর্ত্তব্য নিরূপণ করতে হবে। বার বছরের মেয়ের দেহের পরিণতি হয় বটে আমাদের দেশে, কিন্তু শুধু দেহের সঙ্গে ত দেহের বিয়ে দিই না আমরা, মন আছে, বুদ্ধি আছে। শুধু দেহের পরিণতি হলে ত চলবে না, মন বুদ্ধির পরিণতি না হলে চলবে কেন?"...এ-কথা আট বছর আগে তিনি নিজেই অপরের মুখে শুনলে হয় ত হেসে উড়িয়ে দিতেন, কিন্তু তাঁর বড়মেয়ের বিধবা মূর্ত্তি তাঁর মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে অনেক নতুন জিনিষ দেখার সুযোগ করে দিয়েছিল। তা না হ'লে বার বছরের মেয়ের ভেতর শৈশবের প্রভাব বার বছরের ছেলের চেয়ে বিশেষ কিছু কম থাকে না, এবং সে শৈশবের স্বাধীনতাকে বন্ধনের মধ্যে খর্ব্ব করা যে ভয়ানক নিষ্ঠুরতা, এ-কথা কি তিনি আবিষ্কার করতে পারতেন তাঁর চারুলেখাকে দেখে? তাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা যে এই সামান্য জিনিষটি দেখতে পাননি, তা তাঁরা হৃদয়-হীন ছিলেন ব'লে নয়, শুধু তাঁরা বার-বছরের মেয়েকে স্বাধীনভাবে দেখবার অবকাশ পাননি ব'লেই। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন জীবনের অনেক নির্ব্বিচারে মেনে-নেওয়া সত্য, ধারণা ও আচার, নতুন দৃষ্টির আলোকে যাচাই করে নেওয়া দরকার। আজ তাঁর অধিকাংশ সময় যেত সেই কাজেই।

মেয়ে-মানুষ নিজে যা জানে বলে এবং যা জানে ব'লে জানে, তার চেয়ে অনেক

সময় অনেক বেশী জানে। পুরুষকে যেন সত্য বাইরে থেকে সংগ্রাম ক'রে ক'রে সঞ্চয় করতে হয়, আর নারীকে যেন তা ভেতর থেকে নাড়া দিয়ে মুক্ত করতে হয়। তাই পুরুষ নতুন সত্য জয় করবার আনন্দে উল্লসিত হ'য়ে যখন উন্মত্ত হয়ে ওঠে, নারী ধীরে ধীরে অতি সহজে তার সত্যকে ব্যক্ত করে, স্থির হয়ে থাকে। পুরুষ নতুন সত্যের নতুনত্বে চমকে ওঠে, নারীকে কেউ নতুন সত্য জানিয়ে চমকাতে পেরেছে কি? অন্নদাবাবুর স্ত্রী স্বামীর এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে বিস্মিত বা বিচলিত হননি, এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মত গ্রহণ করবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা না থাকলেও তার মূল কথা তাঁকে চেষ্টা ক'রে বোঝাতে হয়নি। তিনি পুরুষের সামনে এখনও সহজভাবে বা'র হতে পারতেন না এবং কোথাও যেতে হলে জুতো পরতে পারতেন না এবং তাঁর বাড়ীর রীতি-নীতিতে সাবেকের চালই বজায় রেখেছিলেন, তবুও তাঁর সঙ্গে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা কোনো মহিলাই আলাপ ক'রে বলতে বাধ্য হ'তেন যে বাংলার নারীর আদর্শের পথ এই রকম সমন্বয়ের ভেতর দিয়েই।

॥ তিন ॥

ছেলেবেলা যখন আর সব ছেলে লাট্টু ঘোরাত তখন সুধীর লাট্টু তৈরী করত এবং খেলাঘরের ইঞ্জিন দম্ দিয়ে চালিয়ে যখন সকলে আনন্দ করতে চাইত তখন সুধীর চাইত সেটাকে ভেঙে দেখতে। ছেলেবেলা তার বাবার বিচিত্র ঘড়ির কল-কব্জার রহস্য উদ্ধার করবার গোপন চেষ্টায় ধরা প'ড়ে সে যে কতবার বকুনি ও মার অম্লান মুখে সহ্য করেছে তার ঠিক নেই। স্কুলে ধনী বন্ধুদের দামী বিলিতি ফাউন্টেন্-পেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার থার্ম্মমিটারের খোলে তৈরী অদ্ভুত পেন্ দিয়ে লিখতে সে ঢের বেশী গৌরব অনুভব করত। বড় হলে সে ছুটির অবসর কাটিয়েছে মোটরের কারখানায়, ষ্টীমারের অন্দরে, খাবারের পয়সায় কিনেছে যন্ত্র-পাতি লোহা-লক্কড়, নভেলের বদলে পড়েছে দুর্ব্বোধ্য Mechanics। জড়-যন্ত্রের সে ছিল কালোয়াৎ, অনন্ত শূন্যে অপরূপ ভঙ্গীতে গ্রহ-তারা যিনি ঘুরিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন, প্রাণের কারখানার সূক্ষ্মের ভেতর অতিসূক্ষ্ম ধারণাতীত নির্ম্মাণ-কৌশল যাঁর, সেই বিশ্বকর্ম্মার সে ছিল তান্ত্রিক পূজারী। প্রাণহীন জড়ের বাণী সে বুঝি শুনতে পেয়েছিল, সে তাই বাঁধতে চাইত জড়ের ছন্দ, যন্ত্রের সঙ্গীত। যন্ত্রের সঙ্গীতে মানুষের আর্ত্তনাদ তখনও সে শুনতে পায়নি।

তার যন্ত্র-ভরা ঘরে উপদ্রব না থাকলে সে সমস্ত দিন-রাতই সেখানে কাটিয়ে দিতে পারত। তার এই যন্ত্র-সাধনার সহায় ও উপদ্রব দুই-ই ছিল চারুলেখা আর

তার মা ছিলেন নীরব উৎসাহদাত্রী। ছেলেরা এই যন্ত্রের নেশায় তাঁর নিজের অনভ্যস্ত মন সাড়া দিতে পারত না বটে, কিন্তু ছেলেকে তার অভীষ্ট পথ থেকে বিচলিত না-করার সমীচীনতা বোঝবার ক্ষমতা তাঁর ছিল। চারুকে সুধীর ছেলেবেলায় অনেকবার অনেক রকমারী অদ্ভুত পুতুল উপহার দিয়ে বাধিত করেছে। এই যন্ত্রের যাদুকরের প্রতি সেই ছেলেবেলা থেকেই চারুর একটা গোপন শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম ছিল। যে অনায়াসে কোন অজ্ঞাত যাদুবিদ্যার বলে অবিশ্রান্ত আক্ষেপকারী শিশু বা দোদুল্যমান হনুমানের মতো অদ্ভুত পুতুল তৈরী ক'রে ফেলে অতি সহজেই তা দান ক'রে ফেলতে পারে, তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম কোনো মানুষের মনে উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বয়সের সঙ্গে যাদুবিদ্যা আর যাদুবিদ্যা না থাকলেও শ্রদ্ধা সম্ভ্রম নষ্ট হয়নি। চারুর ভালো লাগত ওই অদ্ভুত যন্ত্রপাতির জগতে বেড়াতে এবং ওই যন্ত্রের পূজারীর পূজার আয়োজনে সাহায্য করতে।···

দুপুর থেকে সুধীরের মনটা ভালো ছিল না তার নিজের তৈরী উন্নত ধরণের কলের লাঙলের গোটা কতক ক্ষুদ্র ত্রুটি নিরাকরণের চেষ্টায় বার বার বিফল হয়ে। চারু দরজার পাশে চৌকাটে ব'সে একটা ইংরাজি ছবির বইয়ের পাতা উল্টাতে-উল্টাতে তার অধীরদার এই অধীরতা লক্ষ্য ক'রে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল।

খানিকক্ষণ আরো গোটাকতক পাতা অন্যমনস্কভাবে উল্টে সে বল্লে,—"আজ আর হবে না অধীরদা, তোমার মাথা ঠাণ্ডা নেই।"

সুধীর কোন কথা না ব'লে একটা বই-এর পাতা খুলে পড়তে লাগল। খানিকক্ষণ বাদে বই থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস কল্লে—"সেদিন যে-বইগুলো গুছোতে বলেছিলুম, সেগুলো কোথায় রেখেছিস?"

"কেন, ওই টেবিলের ওপর।"

খানিকক্ষণ টেবিলটা হাত্ড়ে বিরক্ত হয়ে সুধীর বল্লে—"কি যে আমার মাথামুণ্ডু করিস তা বুঝি না। কোথায় গেল বই?"

ক্ষুণ্ণস্বরে চারু বল্লে—"বা, আমি যত্ন ক'রে রাখি ব'লে আমার ওপর যত তোড়! যা বই দিয়েছিলে, ওইখানেই ত রেখেছিলুম।"

"রেখেছিলুম ত গেল কোথায়? তোকে রোজ যত বলি তুই আমার জিনিষ-পত্র ঘাঁটিস্‌নি, তুই ততই ঘাঁটবি। দূর ছাই···"

সুধীর বইগুলো মেঝেয় ছড়িয়ে ফেলে ঘরের চারধারে খুঁজতে আরম্ভ করলে। সমস্ত বইগুলো সযত্নে তুলে টেবিলে সাজিয়ে রেখে চারু বল্লে "বইগুলো এ-রকম ক'রে ছড়িয়ে ফেললেই কি বই পাওয়া যাবে? কি বই হারিয়েছে শুনি, নাম কি?"

"তুই বুঝবি নাম বল্লে?"

"না বুঝি, খুঁজে বার করতে পারব তো!"

"যা, তোকে আর খুঁজে বার করতে হবে না, তোর জ্বালাতেই ত সব হারায়।"

এবার একটু রেগে চারু বললে—"বেশ, বই হারালেই আমায় খোঁটা, আমার ত আর ঘরে ভাত জোটে না, তাই তোমার চাকরাণী-গিরি করতে আসি। এই কোণে প'ড়ে আছে কি বই?"

চাকরাণীর কথায় সুধীর বই খোঁজা ছেড়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বেশ একটু বড় গলায় বল্লে—"চাকরাণী নস্ ত তোকে আসতেও ত কেউ ডাকে না।"

চারুর দু-কান রাঙা হ'য়ে উঠল কিন্তু তপস্যা-নিরত সুধীর তা দেখতে পেলে না, যেমন সে দেখতে পায়নি সেদিনের শিশু চারু আজ আসন্ন-যৌবনা কিশোরী হয়ে উঠেছে।

চারু মুখের কথা চেপে বল্লে অতি শান্ত স্বরে—"আচ্ছা, আর আসব না।" এ শান্ত স্বরে যন্ত্র-তান্ত্রিক সুধীর ছাড়া বুঝি সকলের ভুল ভাঙত। কিন্তু ভাগ্যের বিদ্রূপ তখনও শেষ হয়নি, কোণের বইটা তুলতে গিয়ে একটা হাল্কা ক্রেনের মডেল্ প'ড়ে ভেঙে গেল।

সুধীর দাঁত খিঁচিয়ে বল্লে,—"ভাঙলে ত. ভেঙেছ ত!" তারপর কোণ থেকে বইটা তুলে নিয়ে বল্লে—"যাও, আর এ ঘরে ফফরদালালী করতে হবে না, অলক্ষী কোথাকার!"

এ রকম ঝগড়া তাদের আরো অনেকবার হয়ে গেছে।

কিন্তু সেদিন ঠিক এমনি সময়টাতেই ঘরে ঢুকে উৎপল বল্লে—"কি সুধীর, কি হচ্ছে?"

সুধীর তখন চীৎকার ক'রে বলছিল,—"যা, তোকে আর ওস্তাদি করতে এ ঘরে আসতে হবে না।"

উৎপল অবাক হয়ে অশ্রু-ভারাক্রান্ত চারুলেখার চোখের দিকে করুণভাবে চাইতেই কোনমতে দুর্দ্দমনীয় অভিমানের অশ্রু দমন ক'রে চারু তার প্রথম যৌবনের প্রথম নিদারুণ অপমান বুকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তপস্যান্ধ সুধীর তার কিছুই জানতে পারল না।

॥ চার ॥

কালো ভারী একটি মেঘের মতো পায়ের গতিটি ভারী ক'রে চারুলেখা নীচে চ'লে গেলে উৎপল খানিকটা খোলা দরজাটার দিকে চেয়ে রইল। তারপর যন্ত্র-তপস্বী সুধীরের মাথাটা একবার নেড়ে তার অভিনিবেশ চম্‌কে দিয়ে সে তিক্তকণ্ঠে বল্লে,—"কি হয়েছে তোর আজ? মাথা ঠিক নেই নাকি রে?"

সুধীর চড়া গলায় বল্লে,—"দেখিস না দুপুর থেকে পিছু লেগে আছে, এমন করলে কি আর কাজ এগোয়? গেল ক্রেণের মডেল্‌টা ভেঙে!"

উৎপল চারুলেখার সেই ব্যথা-ভারাতুর সজল চোখের দৃষ্টিটি মনে ক'রে নরম গলায় বল্লে—"তার জন্যে এমন ক'রে বকৃতে হয়?"

সুধীর রুখে উঠে বল্লে—"যা যা তোর আর দরদ দ্যাখাতে হবে না। যা এখন নীচে, মা ডাকছেন হয়ত।"

উৎপল বল্লে—"মা আমাকেই খালি ডাকছেন না, তোকেও, চল্, বেড়ে লুচি ভাজার গন্ধ বেরুচ্চে।"

"খাণ্ডবদাহ জ্বলেছে বুঝি? তা যা, আমার ভাগেরটা তোকে স্বচ্ছন্দচিত্তে দিয়ে দিলুম; মাকে গিয়ে বল্ আমি ওই ভাঙা মডেল্‌টা জোড়া না-দিয়ে আর উঠছিনে।" ব'লে তার অর্দ্ধভগ্ন যন্ত্রটার ওপর সে আরো গভীর মনোযোগে ঝুঁকে পড়ল।

উৎপল তার সুমুখ থেকে গুছানো যন্ত্রগুলি এলোমেলো ক'রে দিয়ে বল্লে—"তুই আজ বেরুবি না নাকি বেড়াতে? মাথা যে বিগড়ে যাবে একদম।"

সুধীর বিরক্ত হয়ে বল্লে—"তোদের মতন হাওয়া খেয়ে সময় নষ্ট করবার মতন সময় আমার নেই। যা আর জ্বালাস নে।"

উৎপল আর কিছু না ব'লে একটু এগিয়ে সুধীরের টেবিলের পাশের বন্ধ জানলাটা খুলে দিয়ে শান্ত আবেগ-ভরা কণ্ঠে বল্লে,—দ্যাখ, কেমন সুন্দর সন্ধ্যা হয়েছে!"

সহসা সুধীর চীৎকার দিয়ে উঠল—"শীগ্‌গির বন্ধ ক'রে দে জানলা, এখুনি হাওয়ায় আমার সমস্ত শিশি ভেঙে গুড়িয়ে যাবে। এই গেল কাগজগুলি উড়ে, সমস্ত experiment ভেস্তে গেল!…"

উৎপল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তখুনি জানলাটা বন্ধ ক'রে দিলে, গোধূলি আকাশের সেই বিদায়-ব্যথা-ম্লান ধূসর ঔদাস্যটি তার বুকে এসে বাজল। সে গম্ভীর কণ্ঠে বল্লে—"ওরকম ভাবে থাকলে দু-দিনে ম'রে যাবি।"

"তবু তোদের মতন ফুলেল হাওয়ার বাণ খেয়ে নিত্য নিত্য মরব না। যা, ফুল্‌কো লুচি খা গে যা নীচে।"

উৎপল আর কথা না ব'লে ধীরে ধীরে নীচে চ'লে গেল।

রান্নাঘরের বারাণ্ডায় একটা জলচৌকির ওপর ব'সে মা ষ্টোভে লুচি ভাজছিলেন, আর চারু দুটি কাঁসার রেকাবীতে তা পরিপাটি ক'রে গুছিয়ে রাখছিল। জুতোর আওয়াজ শুনতেই মা মুখ না ফিরিয়েই বল্লেন—"কে বাবা, উৎপল এলে, বোস! দে ত মা চারু একটা আসন পেতে।"

উৎপল আসনের অপেক্ষা না ক'রেই একেবারে মা-র পা ঘেঁষে মাটিতে ব'সে পড়ল। চারু আসন এনে মিষ্টি একটু হেসে বল্লে—"মাটিতে ব'সে পড়লেন যে, উঠুন, পাঞ্জাবীটা একদম নোংরা হয়ে যাবে।"

"তা যাক্, বড্ড খিদে পেয়েচে মা, নিই এই থালাটা।"

চারু আবার একটু মিষ্টি হেসে থালাটা উৎপলের সামনে এগিয়ে দিল। মা বল্লেন—"পাগ্‌লাটার বুঝি এখনো হুঁশ হোল না উৎপল? তুই যাবি মা চারু একবার ডেকে নিয়ে আস্‌তে।" চারুর রাঙা মুখ মেঘ্‌লা-করা চাঁদের মতো কি রকম থম্‌থম্ ক'রে উঠল উৎপল তা লক্ষ্য করলে। তাই বল্লে—"ও খাবে না ব'লে দিয়েছে, খাবার ওর সময় নেই, ভাঙা ক্রেন্ জোড়া না দিয়ে আর উঠবে না।"

মা একটু গৌরবের সুরে বল্লেন—"একেবারে ভোলা হয়েছে ছেলেটা, যন্ত্রের কি নেশা যে পেয়ে বসেছে ওকে বুঝি না। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, মাঝরাতে উঠে কোনোদিন আলো জ্বালিয়ে বসে, আর বিড়্‌বিড়্ করে বকে। তুই যা না তবে চারু থাবারের থালাটা নিয়ে, মুখের সামনে ধরে দিয়ে আয়, বল্‌ গে, মা দিলে, আমার কথা সে ঠেল্‌তে পারবে না।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও চারু থাবারের থালাটা নিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে গেল। গিয়ে দেখলে ঘনিয়ে-ওঠা অন্ধকারে নীচু হয়ে ব'সে তখনো সুধীর কাজ ক'রে যাচ্ছে। ঘরে ঢুকবে না ভেবেছিল, খুকীর ফুঁপিয়ে-ওঠা কান্নার মতো একটি অভিমান তখনো তার বুকে গুম্‌রে উঠছিল, তাই সে চৌকাটটা না পেরিয়ে মৃদু স্বরে ডাকলে—"অধীরদা।" কিন্তু সে-স্বর তার কানে গেল না। চারু ভাবলে, থালাটা চৌকাটটার পারেই রেখে দিয়ে আসে, কিন্তু পাছে মা কিছু মনে করেন সেই ভেবে ঘরে ঢুকল। সুধীর মুখ না তুলেই বল্লে—"আবার এসেছিস যে আমার ঘরে?" টেবিলটার ওপর খাবারের থালাটা রেখে আব্‌ছা গলায় চারু বল্লে—"মা পাঠিয়ে দিলেন।" ব'লে একবার সুধীরের নিবিষ্ট কঠোর মুখের পানে চেয়ে দেখলে, তাতে কোনো কৌতূহল কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। এক মুহূর্তের জন্য চারুর মন অভিমানে

গুলিয়ে গুম হয়ে উঠল। সে ঘূর্ণি-হাওয়ার মতো ছুটে গেল দ্রুতপদে, পেছন থেকে সুধীর তখন ডাকচে—"চারী, ও চারী শোন্, পালাস নে।"

নীচে এসে চারু মাকে বল্লে—"এবার তবে যাই মা, সন্ধ্যে হয়ে গেল, সেই কোন্ দুপুরে এসেছি।"

মা বল্লেন—"যা, কার সঙ্গে যাবি, সুধীর তো বুঝি আজ তার যন্ত্র ছেড়ে উঠবে না।"

চারু উৎপলকে লক্ষ্য ক'রে বল্লে—"উনিই তো আছেন। পারবেন না একটু এগিয়ে দিতে আমাকে ?"

উৎপল বল্লে—"হাঁ, আমিও তো এই বেরুচ্চি, চল।"

তখনো গ্যাস জ্বালা সুরু হয়নি, স্বল্প অন্ধকারে সরু গলিটা একটা করুণ একতারার সুরের মতো মায়াময় লাগছিল। সামান্য একটুখানি পথ এগিয়ে চারুকে তার বাড়ী পৌঁছে দিয়ে উৎপল বল্লে—"তবে আমি এখন যাই, লেখা।"

চারুলেখা গলার এই অপূর্ব্ব স্বরটি শুনে মনে মনে একটু চমৎকার রস অনুভব করলে, সেও তেম্নি গলার স্বরটি অনুকরণ ক'রে বল্লে—"আসুন গে।"

চারু চ'লে গেলে পর ওপর থেকে সুধীর চেঁচিয়ে উঠল—"চারী, ও চারী, খাবার জল দিয়ে যাবি না বুঝি ?"

মা বল্লেন—"দাঁড়া, নিয়ে যাচ্চি।" ব'লে কাঁচের গ্লাস ক'রে ঠাণ্ডা জল নিয়ে মা হাজির হলেন ছেলের কাছে। ছেলে বল্লে—"চারী গেল কোথায় ?"

মা জলের গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে বল্লেন—"বাড়ী চ'লে গেছে।" সুধীর জলের গ্লাসটা স্পর্শ না ক'রে ফের যন্ত্রের দিকে বৃথা মনোযোগ দেবার চেষ্টা ক'রে আপনমনেই ব'লে উঠল—"যাক গে, আপদ গেছে।"

সেদিনকার অন্ধকার বিনিদ্র রাত্রির ক্লান্ত প্রহর গুণে গুণে অতিষ্ঠ হয়ে উৎপল ঘর থেকে পথে বেরিয়ে পড়ল। নিথর নক্ষত্রদীপ্ত অনন্ত রাত্রির রাগিণী তাকে উদাস ক'রে তুলেছে। ঘুমন্ত পথে সে যেন কার সন্ধানে বেরুল, দূরে কালো আকাশে তখনো উচ্চশির একটা চিম্নি প্রকাণ্ড দৈত্যের মতন কালো ধোঁয়া উদ্গীরণ করচে, একটা মোটর বিকট আর্ত্তনাদ করতে করতে বেরিয়ে গেল। ঐ প্রচ্ছন্ন-রহস্য নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে চেয়ে বারে-বারে তার মনে পড়ছিল একটি রাঙা ডুরে শাড়ী-পরা লীলা-চঞ্চল কিশোরীর সেই অশ্রু-ভারাতুর দুইটি নয়নের সজল কান্তির ছবি! সেই বিশৃঙ্খল যন্ত্র-আস্‌বাবের ঘরে ব্যর্থ কল-কব্জার আয়োজনের মধ্যে একান্ত অসহায় দুঃখিনী মেয়েটির অশ্রু-উদ্বেল কাতর মুখের ছায়া! সে ভাবছিল তার সেই গানের সুরের মতো দোদুল গতিখানি, সেই কচি

লতার মতো দুটি বাহু, সেই দুটি আরতি-প্রদীপের মতো চোখ! সেই চোখ মুখ ও বাহুর তলায় কত যন্ত্রের সাজ-সজ্জা, কত শিরা-উপশিরা, কত আয়োজন, কত কৌশল, কত সৃষ্টি-চাতুরী, কিন্তু সবাইর ওপর বিশ্ব-শিল্পী এমন নয়ন-ভুলানো আবরণ রচনা করলেন কেন? কেন এই দেহ-যন্ত্র কোন্ অনাদি অসীম রহস্যের বার্তা বহন ক'রে আনে? পৃথিবীর বুকের মধ্যে কত গলিত ধাতু, কত আগুনের কারখানা, কিন্তু ভগবান তার ওপরে এই স্নিগ্ধ শ্যামলতার আঁচল টেনে দিলেন কেন? কেন নগ্ন আকাশের বুকে মেঘের লাবণ্য ঢেলে দিলেন? আদিহীন অন্তহীন রহস্য-সমুদ্র সেই শিল্পী যেন বলচে—"ঢেকে দাও এই সব ব্যর্থ কুশ্রী যন্ত্রের উপাচার, সুন্দরের কল্যাণের মাধুর্য্যের জয়ধ্বজা উড়ুক আকাশে!"···উৎপল গলির পর গলি পার হয়ে যাচ্ছিল, আর এই সব কথা ভাবছিল আবোল তাবোল করে। কোন্ একখানি অপরাজিতা ফুলের মতো নবীন স্নিগ্ধ মুখ তার বুকে প্রথম যৌবনের তোল্‌পাড় লাগিয়েছে আজ এই রহস্য-ভরা পরিপূর্ণ রাত্রে!

॥ পাঁচ ॥

দুইদিন উপর্য্যুপরি একটা যন্ত্রের অদ্ভুত কৌশল উদ্ভাবন করতে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে সেদিন সন্ধ্যায় সুধীর একান্ত ক্লান্ত হয়ে ঈজিচেয়ারটায় শুয়ে পড়ল। কাজ করবার সে যেন আর স্ফূর্ত্তি পাচ্ছিল না। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার ঠাহর হ'ল এ-দুদিন চারু তার ঘরে আর আসেনি। নীচে কোনো সময়ে তার গলার স্বর বা চলার আওয়াজ সে শুনেছে কিনা তাও সে মনে করতে পারলে না। মনে পড়ল, সেদিন তাকে এ-ঘরে ঢুকে জিনিষ-পত্র নাড়া-চাড়া করার জন্য তিরস্কার করায় হয়ত চারু রাগ করেছে। ঘরের এই সৌষ্ঠবহীন বিশৃঙ্খল চেহারাটা সুধীরকে পীড়া দিচ্ছিল, এরা এ দুদিন কার দুটি তনু মঙ্গল হস্তের স্পর্শ সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়ে ভাষাহীন জড়স্তূপের মতো নিষ্ঠুর হয়ে রয়েছে, তাই তারা এত চেষ্টাতেও এ-দুদিন একটুও সাড়া দিলে না তার এত ডাকাডাকিতে। এ যন্ত্র-জগতের প্রাণ-স্পন্দনটি যেন থেমে পড়েছে। সুধীর ক্লান্ত দেহটাকে আরাম কেদারায় আর বিশ্রাম করতে দিলে না, তাকে বিপুল বেগে টেনে তুলল।

রাস্তার ধারে বৈঠকখানায় তক্তপোষের ওপর ব'সে অন্নদা-বাবু শিথিল টানে গুড়্‌গুড়ি টানছিলেন আর তাঁর সুমুখে একটা হেলান দেওয়া বেঞ্চিতে ব'সে চারুলেখার মা সুনয়নী দেবী স্বামীর কাছে ছোট মেয়ের বিরুদ্ধে নালিশ করছিলেন। দক্ষিণ হাওয়াতে থেকে-থেকে লণ্ঠনের শিখাটা কেঁপে উঠছিল।

সুনয়নী বলেন—"সারা দিন পাড়া বেড়াবে, লেখা-পড়া কাজ-কর্ম্ম কিছু নেই, ওকে নিয়ে তোমাকে ভবিষ্যতে মহা মুস্কিলে পড়তেই হবে বলে রাখচি।"

অন্নদাবাবু অল্প একটু হেসে বল্লেন,—"ভবিষ্যতের ভাবনাটা এখন থেকেই ভাবতে সুরু করলে লাভ হয় এই যে, ভাবনাটা দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। আর আমাদের দেশের যত ভাবনা সব যেন এই মেয়েগুলোই একচেটিয়া আম্‌দানী করে সংসারে।"

সুনয়নী রুষ্টস্বরে বল্লেন—"তা ব'লে মেয়েটা অম্‌নি উড়ে বেড়াবে নাকি?"

"তা একটু বেড়াক না! প্রজাপতিগুলি যখন রঙ্-চঙে পাখা মেলে লঘুছন্দে উড়ে বেড়ায়, কি-রকম চমৎকার দেখায় বলত! আমরা ওদের একটিবার প্রাণ খুলে হাসতে গাইতে চেঁচাতে দিই না, শাসন সংস্কারের আবর্জ্জনা দিয়ে ওদের ঘিরে শক্ত লোহার বন্দীশালা গ'ড়ে তুলি, তাই ওরা দিন-কে-দিন জীবন্মৃত জড় হয়ে পড়চে। কুড়িতেই বুড়ি ব'লে প্রবাদটা খালি আমাদের মতন হতভাগ্য দেশেই চলে। বন্ধনহীন চঞ্চল আনন্দে যতদিন পারে ও উড়ুক না, তারপর যেদিন তার পাখার চাইতে প্রাণের ওজন ভারী হয়ে উঠবে…"

সুনয়নী কথার মাঝে কিসের একটি ইসারা পেয়ে স্বামীর কথার স্রোতে বাধা দিয়ে বল্লেন—"ওর বয়েসটা তো আর কম হোলো না, পনেরোয় পা দিতে চলেছে, একটা পাত্র জুটোতেও তো সময় চাই।"

"দ্যাখ, মেয়েকে কাঁধের বোঝা ব'লে মনে ক'রে তার থেকে রেহাই পাবার জন্য একবার চেষ্টা ক'রে ভীষণ ঠকেছিলে, সে-কথা ভুলে যেও না।…তা ছাড়া মেয়ের মনের আকাশে ফাল্গুনের নিমন্ত্রণ না-আসা পর্য্যন্ত আমাদের যে অপেক্ষা করতেই হবে। কচি গাছ নোয়ানো যেতে পারে বটে, কিন্তু নোয়াতে গেলে ভেঙেই যায় অধিকাংশ…"

হঠাৎ একটা দম্‌কা হাওয়ার মতন সুধীর সে-ঘরে দ্রুত পায়ে ছুটে এল। সুনয়নীকে সাম্‌নে দেখ্‌তে পেয়ে সে জিজ্ঞেস কল্লে—"চারু কোথায় মাসীমা?"

সুনয়নী সন্ত্রস্ত হয়ে বল্লেন—"আজ আবার তোর কোন যন্ত্র ভেঙে দিয়ে এল নাকি? এমন চঞ্চল হয়েচে মেয়েটা।"

সুধীর বল্লে—"না, কোথায় ও? ওর সঙ্গে একটা দরকার আছে।"

সুনয়নী বল্লেন—"ছাতে গান গাইছিল তো শুনছিলুম…"

সুধীর আর এক-মুহূর্ত্তও দেরী না করে' একদম বাড়ীর ভেতর চ'লে গেল।

অন্নদাবাবু বল্লেন—"চমৎকার ছেলে এই সুধীর। কি একান্ত অভিনিবেশের

সঙ্গে নিজের সব কাজ ক'রে যেতে পারে, তাতে কোনো ত্রুটি কোন বিচ্যুতির লেশ তার নেই। যেন যন্ত্র-সমুদ্র মন্থন ক'রে কোন্ অমৃত তুলবার পণ করেছে।"

সুনয়নী চিন্তিত স্বরে বল্লেন—"বেলফুল বলে ছেলেটা কেমন যেন দিল্‌ভোলা নেশাখোরের মতন থাকে, রাত জাগে, খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে কেবল কল-কব্জার ছিনিমিনি, কেবল ঝন্‌ঝন্ লোহার হাতুড়ির আওয়াজ, যেন একটা mania হয়ে গিয়েছে। শেষকালে মাথা খারাপ না হলে হয়!"

অন্নদাবাবু বল্লেন,—"ভালো, বাংলার পক্ষে এ একটা শুভ লক্ষণ। ভেতো বাঙালী কলম লিখে-লিখে একেবারে অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছে। চাই-ত এই রকম একনিষ্ঠসাধক, বিজ্ঞানাচার্য্য তেজী পুরুষের দল। খালি কৃষিতে সারা ভারতের পেট ভরে না, কল-কারখানা-বন্দর বাণিজ্য তার চাই, বিদেশী সব ঐশ্বর্য্য তার লুট ক'রে নিলে। পশ্চিম নব নব সৃষ্টির পথে এগিয়ে চলল, আর আমরাই অলস অপটু দুর্ব্বলের মতো পিছিয়ে রইলাম চিরদিন। চমৎকার শুভলক্ষণ এ, আমি বুঝতে পাচ্চি।"

তখন নির্জ্জন অন্ধকারে ছাতে একলা একটা রেলিং ধরে চারুলেখা পথের পানে চেয়ে ছিল। তিমিরাচ্ছন্ন আকাশে গ্রহ-তারকায় কোন্ বেহাগের কানাকানি চলেছে, তার একটি রেশ যেন এই কিশোরীর নূতন-বাঁধা প্রাণ-বীণার তারে মৃদু-মৃদু বাজছিল। সুধীর ছাতে উঠে অন্ধকারে চারুকে দেখে সাম্‌লে নিয়ে ডাকলে—"চারু!" এমন সময় এই সন্ধ্যালোকে মুখ দিয়ে চারু নামের অভ্যস্ত বিকৃত ধ্বনিটা যেন বা'র হতে পারল না। চারু চম্‌কে পিছন ফিরে দাঁড়াল। সুধীর এগিয়ে এসে শুধোলে—"আমাদের বাড়ী আর যাসনে যে?"

চারু চোখ নীচু ক'রে বল্লে—"যাই তো।"

"কৈ, আমার ঘরে তো তোকে আর দেখি না।"

এবার চারুর গলার স্বর কেঁপে উঠল, একটু রুক্ষ কণ্ঠে সে বল্লে—"যে ঘর থেকে তাড়িয়ে দ্যায়, চাকরাণী বলে, আমি তার ঘরে যাই নে।"

এর ভেতরে চারুর না যাওয়ার কি কারণ থাকতে পারে সুধীর প্রথমে কিছু বুঝলে না, তাই বল্লে—"তাড়িয়ে দিলেই বুঝি তাড়িয়ে দেওয়া হল! চাকরাণী বল্লেই বুঝি চাকরাণী হয়ে যায় লোকে! আমার ঘরে বুঝি আর তার জন্তে ঝাঁট পড়বে না, ধুলোতে সব বুঝি কদাকার হোয়ে থাকবে! বারে!"

"তা আমি কি জানি!"

সুধীর এ রহস্যের কিছু মীমাংসা করতে পারলে না। চারু রাগ ক'রে তার ঘর

গুছোতে যাবে না, এ-কথার মানে আয়ত্ত করবার মতন শক্তি তার ছিল না। তার কান্না পাচ্ছিল।

সে কান্নার সুরে বল্লে,—তবে ঐ ধুলো-বালির মধ্যেই আমি শোব বুঝি ?"

চারু কোনো কথা কইল না, রেলিংটার ওপর চোখ রেখে চুপ ক'রে রইল। তার দুই চোখের পাতা ব্যথার তন্দ্রায় ভারী হয়ে উঠছিল। সুধীর বুঝলে না যে এই যৌবনের ডাক-শোনা কিশোরীটির বুকে আত্মসম্মানেরও আমেজ লেগেছে, তাই সেদিনের উৎপলের সুমুখে নিদারুণ নিষ্ঠুর অপ্রত্যাশিত অপমানটা গুমোটের মতো তার সমস্ত বুক এঁদো ভারী ক'রে তুলেছে,—একে সে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পাচ্চে না।

সুধীর খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে, তবুও চারু এলো না দেখে রুক্ষ স্বরে বল্লে —"আসবি না তো, বেশ, তবে ধুলোতে শুয়ে আমার অসুখ হোক! তখন দেখব কেমন না আসিস। ঠিক, আসবি না ?" ব'লে গর্‌গর্ করতে করতে সে বেরিয়ে গেল।

চারু তাদের দোতালার বারান্দা থেকে দেখতে পেলে অধীরদা একটা ঝাঁটা হাতে তাঁর ঘরের মেঝে টেবিল বই প্রভৃতি থেকে ধুলো ঝাড়ছেন, আর ঝাঁটার বাড়ি খেয়ে অসংখ্য শিশি ও মডেল মাটিতে প'ড়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।...সে আর একমুহূর্ত্তও দেরী না ক'রে তেম্‌নি চপল ঝর্ণা-ছন্দিত গতিতে ছুটে চলল। সুনয়নী জিজ্ঞাসা করলেন—"কোথায় যাচ্চিস ?"

চারু অন্নদাবাবুকে বল্লে—"তুমি একটু শোন না বাবা, অধীরদা-দের বাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে দেবে।"

সুনয়নী বল্লেন—"এই রাত হয়ে এল, ওখানে আবার কেন ?"

চারু কথার জবাব দিতে ইতস্ততঃ করছিল, অন্নদাবাবু গুড়্‌গুড়ির নলটা ফেলে চটিটা পরতে-পরতে বল্লেন—"চল্ সুধীরদের বাড়ী।"

॥ ছয় ॥

নীচে মা ভাঁড়ারে হাঁড়ি-কুঁড়ি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সুধীরের অনাবশ্যক জোরে পা ফেলবার শব্দে আশ্চর্য্য হয়ে ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস কল্লেন,—"কি হয়েছে ?"

সুধীর সপ্তমে চ'ড়ে বল্লে—"হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। আমার ঘরটা মাকড়সা ইঁদুর আরশোলায় উচ্ছন্নে যাক, ধুলোর বাজার হয়ে উঠুক, তবু সেদিকে কারুর দৃষ্টি নেই। এই যে তিনদিন বই গুছানো নেই, জিনিষ-পত্র সব খুঁজে পাই না—দূর হোক গে ছাই!" আপন মনেই বকতে বকতে সে সশব্দে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

মা অবাক হয়ে পেছন-পেছন গেলেন বলতে বলতে—"তুই কোনোদিন দিয়েছিস আমায় তোর ঘরে ঢুকতে যে আজ আমার ওপর তম্বী করছিস! আমিও কি কখন ভেঙে যায় ভয়ে তোর ঘরে ঢুকি না।"

সুধীর কোনো কথায় ভ্রূক্ষেপ না ক'রে ঘরের কোণ থেকে ঝাঁটা তুলে নিয়ে ঘরের ভেতর যে-কাণ্ডটি বাধিয়ে তুললে তাতে হাসি চাপ্‌তে না পেরে মা তার হাত থেকে ঝাঁটাটা নিতে গিয়ে বল্লেন,—"নে ছাড, তুই ঝাঁট দিবি, তবেই হয়েছে!"

সুধীর কিন্তু ঝাঁটাটা না ছেড়ে আরো রেগে বল্লে—"না তুমি যাও, এক্ষুনি তো সব ভেঙে চুরে ফেলবে, আমার ঘর কাউকে ঝাঁট দিতে হবে না।"

তারপর অপটু হাতের ঝাঁটার তাডনে ধূলো উড়ে জিনিসপত্র প'ড়ে যে অপরূপ কুরুক্ষেত্র আরম্ভ হ'ল, তার নীরব দর্শক ছাড়া আর কিছু হবার উপায় না দেখে মা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অনেক অবাধ্য যন্ত্র সুধীর বশ করেছে এবং অনেক অদ্ভুত কল-কব্জায় দক্ষতালাভ করেছে, কিন্তু সামান্য একটা ঝাঁটাকে বাগিয়ে ধূলোকে আয়ত্ত করা যে এত কঠিন তা তার জানা ছিল না। একদিকে ঝাঁট দিলে আর একদিকে ধূলো উড়ে যায় এবং দুষ্টবুদ্ধি কল-কব্জাগুলো ছল ক'রে চারদিকে মৃত্তিকাশায়ী হতে থাকে—এ বড় বিষম জ্বালা।

যত দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ছিল সুধীরের রাগও তত বাড়ছিল ওই যত নষ্টের মূল চারুর ওপর।

এমন সময়ে নীচে অন্নদাবাবুর গলা শোনা গেল,—"সুধীর বাড়ী আছ?"

সুধীর নিজের অস্বস্তিকর কর্তব্য থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে নীচে দরজা খুলতে গেল এবং মা নিজের ঘরে গেলেন পাগল ছেলের পরিণাম ভাবতে ভাবতে।

দরজা খুলতেই অন্নদাবাবু একগাল হেসে বল্লেন,—"চল বাবা, তোমার যন্ত্রের যাদুঘর দেখাবে। অনেকদিন থেকে আসব-আসব ক'রেও হয়ে ওঠে না।"

সুধীর নিজের বিশৃঙ্খল ঘরের দুর্দ্দশা স্মরণ ক'রে বাইরে আনন্দ দেখালেও মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো না। অন্নদাবাবুর পেছনে অপরাধীর মতো চারুলেখা সিঁড়ি বেয়ে সুধীরের ঘরে ঢুকল।

প্রৌঢ় অন্নদাবাবুর ভেতর এমন উৎসাহী দর্শক পাবে তা সুধীর মোটেই আশা করেনি। সুধীরের নির্ম্মাণ-কৌশলের নানা নিদর্শনে অন্নদাবাবু বালকের মতো উল্লসিত হয়ে উঠলেন। বালকের মতোই নানা অদ্ভুত ও হাস্যকর প্রশ্ন জিজ্ঞেস ক'রে তিনি সুধীরকে প্রফুল্ল ক'রে তুললেন। দেখতে দেখতে তিনি বল্লেন—"এমন কারু-

রসিকের ছেলে এমন বিশ্বকর্ম্মা হবে তা কখন ভাবিনি। তোমার বাবা ছিলেন একেবারে ভাবের ফানুস, বস্তু-জগতের আঁচও তাঁর গায়ে সইত না। আমাদের তখনকার গল্প শুনবে? আমাদের দুজনের রেষারেষি ছিল কোথায় কে নতুন সাহিত্যিক নাম করলে তার খোঁজ আগে নিয়ে অপরকে চমকে দেওয়া, এর জন্যে কি কাণ্ডই না করেছি! ইংরেজি মাসিকপত্র যা পারতুম কিনতুম, যা পারতুম না যেখানে পেতুম আগে গিয়ে পড়ে আসতুম, তাও দুজন দুজনকে লুকিয়ে। তোমার বাবা হয়ত এসে বল্লে—"ওঃ, আর্মেনিয়ার যা একজন কবি আছে—'রাফি', পড়েছ?"

আমিও ঠকবার পাত্র নই, বল্লুম—'হাঁ 'রাফি' আবার কবি? পড়ো পড়ো 'সিঞ্জের' নাটক, পড়ো, বুঝবে কত বড় লিখিয়ে!'

তোমার বাবা বল্লেন—'সিঞ্জ' আবার পড়িনি, ওই আইরিশ ত!'

আমি বোকা হয়ে গেলুম। তার পরের বার হারবার পালা হয়ত তোমার বাবার। এমনি আমাদের চলত শুধু সাহিত্যালোচনা।"

অন্নদাবাবুর গল্প শেষ হ'তে হেসে চোখ নামাতেই চারু ও সুধীরের চোখাচোখি হয়ে গেল। সুধীর ভ্রূকুটি ক'রে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে এরোপ্লেনের কল-কব্জা বুঝোতে লাগল। অন্নদাবাবু মাঝ থেকে বল্লেন—"তা তোমার ঘরটা এমনি অগোছাল থাকে নাকি?"

সুধীর চারুর দিকে ফিরে একটা রূঢ় মন্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে হঠাৎ অন্নদাবাবুর দিকে চেয়ে থেমে গেল, শুধু বল্লে—"না, এই আজকাল একটু হয়েছে।" আজ সুধীর প্রথম লক্ষ্য করলে শুধু এইটুকু যে, সে-দিনকার সেই একরত্তি চারু আজ সুন্দরী দীর্ঘাঙ্গী কিশোরী হয়ে উঠেছে, তাকে যখন-তখন যা-তা তিরস্কার করা আর সাজে না।

সকলে যখন যন্ত্রালোচনায় তন্ময় তখন উৎপল এসে ঘরের ভেতর অপরিচিত লোক দেখে দরজায় থম্‌কে দাঁড়াল। সুধীর তখন জটিল যন্ত্রশাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে এবং অন্নদাবাবু তাঁর অনায়ত্ত মন নিয়ে যথাসাধ্য বোঝবার চেষ্টা করতে ব্যস্ত। শুধু চারু চোখ তুলে চেয়ে বল্লে—"আসুন উৎপল-দা, বাবা আজ সুধীর-দার কারখানা দেখতে এসেছেন।"

অন্নদাবাবু ফিরে চাইলেন। উৎপল নমস্কার ক'রে বল্লে—"আপনার কাজে ব্যাঘাত দিলুম মিছিমিছি।"

"না না ব্যাঘাত কি?" ব'লে অন্নদাবাবু তাকে বসতে বল্লেন।

সুধীর উৎপলের দিকে চেয়ে হেসে অন্নদাবাবুকে বল্লে—"এইবার কিন্তু আপনার দলের লোক পেয়েছেন, উৎপল একজন মস্ত কবি।"

অন্নদাবাবু বল্লেন—"তাই নাকি, বেশ বেশ, আপনার কবিতার সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পেলে সুখী হব।"

উৎপল বলতে যাচ্ছিল, "আমাকে 'আপনি'-বলা কেন?"

কিন্তু চারু বাধা দিয়ে ভয়ানক উৎসাহিত হয়ে বল্লে—'সত্যি উৎপলবাবু, আপনি কবি নাকি? কই আমায় তো জানান-নি?"

অন্নদাবাবু বল্লেন—"তোকে না জানালে কেউ বুঝি কবি হতে পারে না, পাগ্‌লি কোথাকার!"

সকলে হেসে উঠল। চারু বল্লে—"বাঃ. আমি বুঝি তাই বল্লুম। কিন্তু উৎপল-বাবু, এবার আপনাকে ছাড়ছি না, আপনার কবিতা আমায় শোনাতেই হবে।"

অন্নদাবাবু বল্লেন—"তা এ মন্দ নয়। একজন যন্ত্রের কবি, আর একজন ভাষার। যাবেন আপনি আমাদের বাড়ী, ভারী খুসী হব।"

উৎপল অন্তরের উদ্বেল আনন্দ চেপে বিনীত স্বরে বল্লে—"যাব।"

সুধীর বল্লে—"উৎপল সত্যি মস্ত বড় কবি, যদিও আমি ওর মিষ্টিক কবিতা মোটেই বুঝতে পারি না। আমার কাছে সব 'মিষ্ট্' অর্থাৎ কুয়াসার মতোই ধোঁয়া-ধোঁয়া লাগে!"

অন্নদাবাবু বল্লেন—"কিন্তু তোমার বাবা ছিলেন Verlaine, এ-ই দাদু, কবীরের মস্ত ভক্ত।"

তারপর আবার যন্ত্রালোচনা সুরু হল। যাবার সময় অত্যন্ত খুসী হয়ে অন্নদাবাবু বল্লেন—"সত্যি বাবা, তোমার যাদুঘর দেখবার জিনিষ! আমার মেয়ের মুখে তো তোমার সুখ্যাতি আর ফুরোয় না, আজ থেকে আমিও তোমার ভক্ত হলুম। বাংলায় এখন তোমার মতোই ছেলে দরকার, আশীর্ব্বাদ করি, দেশের মুখোজ্জ্বল করো।"

তারপর উৎপলকে বল্লেন—"যদি সেকেলে বুড়োর সঙ্গে সাহিত্যালোচনা আপদ মনে না করেন তাহলে যাবেন কিন্তু আমার বাড়ী। চেনেন ত, ঐ সামনেই।"

অন্নদাবাবু চারুর হাত ধ'রে বেরিয়ে গেলেন, নিজের আনন্দে তিনি ভুলে গিয়েছিলেন চারুরই বিশেষ দরকারে তার আহ্বানেই তিনি সুধীরের বাড়ী এসে-ছিলেন। কি যে দরকার চারুর, তা তাঁর জানবার সময় বা চারুর বলবার সুযোগ কিছুই হল না।

আর এখানে বারান্দায় দুই বন্ধু এই প্রথম মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েও বিভিন্ন চিন্তার ধারা নিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

।। সাত ।।

দর্জ্জিহীন দর্জ্জিপাড়ার সান্যালদের সুখ্যাতি বা অখ্যাতি ছিল যে, তাদের মাথায় ছিট আছে। এই ছিটের অস্তিত্বের ওপর দর্জ্জিপাড়ার প্রভাব কেউ অবশ্য আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেনি যদিও এই নিয়ে ব্যঙ্গ-নিপুণদের কল্পনায় নানা বৈচিত্র্য প্রকাশ পেত। সান্যালরা পাঁচ ভাই মিলে ছিলেন বাণীর একনিষ্ঠ সাধক। তাঁদের সকলেরই ছিল বিবাহে বিদ্বেষ। বড় ভাই ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ, তার পরের ভাই চিত্র-শিল্পী, তৃতীয় ভ্রাতা ভাস্কর, চতুর্থ অভিনেতা ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ ছিল উৎপল কবি। এম্‌নি ক'রে তাঁরা বীণাপাণির প্রায় সকল বিভাগেই নিজেদের প্রতিনিধি রাখবার বন্দোবস্ত করেছিলেন। এই অদ্ভুত পরিবারে এক উৎপল ছাড়া আর সকলেরই বাণীর সেবায় শক্তির চেয়ে উৎসাহ ছিল অনেক বেশী এবং সাধনা ছিল কঠোর। আপন-আপন বিভাগে তাঁরা মাঝারি গোছের সুনাম অর্জ্জন করতে পেরেছিলেন। এ-হেন আবহাওয়ায় মানুষ এবং নিজে একজন সাহিত্যিক হওয়া সত্ত্বেও উৎপলের বন্ধুত্ব কেমন ক'রে সুধীরের প্রতি প্রগাঢ় হয়েছিল তা সহজ বুদ্ধিতে বোঝা শক্ত। উৎপলের সমস্ত দেহে মনে কার্য্যে সৌন্দর্য্য ও শক্তি ছিল খুবই বেশী কিন্তু তার চেয়ে বেশী ছিল ইসারা। তাই সে যত সুন্দর তার চেয়ে তাকে দেখাত ঢের বেশী সুন্দর, সে যা লিখত তাতে আসল জিনিষের চেয়ে ইঙ্গিতই পাঠককে মুগ্ধ করত এবং তার ব্যবহারে স্পষ্ট শোভনতার চেয়ে অস্ফুট মিষ্টতাই বেশী লোককে আকৃষ্ট করত। উৎপল ছিল তার প্রতিভাহীন ভাই-এদের গৌরবের ভাই!

সেদিন বেশী কথা বলবার মতো মনের অবস্থা কারুর ছিল না, তাই কিছুক্ষণ দু-একটা অবান্তর কথা বলেই উৎপল বাড়ী চলে এল। কিন্তু ঘরের নির্জ্জন অবকাশ আজ তার ভাল লাগছিল না, পরিপূর্ণ নদীর মতো উচ্ছল অধীর মনের মধ্যে অস্ফুট আশা যত কলরব করছিল। সে কলরবের অর্থ বুঝতে তার নিজেরও সাহস হচ্ছিল না। তার মন চাইছিল এমন কারুর সঙ্গ, যে তার সব চেয়ে প্রিয় চিন্তা থেকেই তাকে এখন মুক্তি দিতে পারে।

দূরের ট্রাম রাস্তায় অদ্ভুত কোলাহলের সঙ্গে মিশে নিকটের কোন বাড়ীর বেসুরো হারমোনিয়মের সুর ও কচি কোন শিক্ষানবীশের মিষ্টি গলা ভেসে আসছিল অন্ধকারের ভেতর দিয়ে। দক্ষিণের নবকিশলয়-সমৃদ্ধ দেবদারুর বসন্ত বাতাসের স্পর্শে বিপুল শিহরণ সে অন্তরের মধ্যে অনুভব করছিল। কি অপরূপ স্পন্দন জেগেছে আজ তারও অন্তরের রহস্যলোকে শুধু একটি কিশোরীর মায়া-স্পর্শে! তারের সঙ্গে আজ তার বেজে উঠছে অকারণে অর্থহীন সুরের উন্মাদনায়। জানে সে পৃথিবীতে নির্ম্মম

দুঃখ আছে, কুৎসিত দারিদ্র্য, বীভৎস রোগ, অভাবনীয় পাপ ও পঙ্কিলতা আছে, কিন্তু আজ তার চারধারে আছে শুধু একটি অপূর্ব্ব ফাল্গুনের জগৎ যেখানে আকাশের চোখে অপরূপ নেশা, জলে স্থলে অপূর্ব্ব মিলনের ষড়্যন্ত্র, যেখানে নতুন তৃণ ও বনের ফুল প্রাণের প্রাচুর্য্যে অস্থির হয়ে উঠেছে যেখানে বাতাসের স্পর্শে অনাদি অতীতকালের সমস্ত গোপন প্রথম প্রণয়-চুম্বনের আভাস ও ভবিষ্যতের সমস্ত চুম্বনের আশ্বাস, যেখানে নব কিশলয়ের অশ্রান্ত মর্ম্মরে চিরকালের গোপন কথার সঙ্কুচিত শিহরণ!

নিজের এই উন্মাদ আনন্দের সঙ্গে বেশীক্ষণ মুখোমুখি হয়ে থাকতে উৎপলের ভয় করছিল, সে আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে সঙ্গী খুঁজতে গেল। কিন্তু এত সকাল-সকাল আসার দরুণ কোনো দাদাকেই ঘরে দেখতে পেলে না। এবার সে নিরুপায় হয়ে ঘরে ফিরে এসে নিজের লেখাগুলো উল্টে নিজের প্রথম প্রণয়ের রূপ দেবার চেষ্টা গুলি পড়তে বসল। বেতের সুদৃশ্য বাক্সটি থেকে অজস্র লেখার ভেতর হতে বেছে নিয়ে সে 'বিরূপাক্ষ'-য় পড়লে—

"কিন্তু সেই হিংস্র করাল দেশের ভ্রূকুটি-কুটিল মরু-জ্বালাময় দৃষ্টির তলায়ও একদিন লজ্জাজিতার মন নিশান্তের আকাশের মত কোন্ অপরূপ সম্ভাবনার রুদ্ধ-নিশ্বাস প্রতীক্ষায় থর-থর ক'রে কেঁপে উঠল। কোন্ অসম্ভব সার্থকতার আশ্বাসে অন্ধকারের অন্তরের সে কি সুমধুর আতঙ্কের আন্দোলন, দিকে দিকে আশাতীত সৌভাগ্যের প্রত্যাশায় সে কি গোপন বিপুল আয়োজন..."

জান্‌লা দিয়ে রাত্রির আকাশের দিকে চেয়ে উৎপল ভাবলে সেদিনের এই প্রেমের প্রথম সঞ্চারের রূপ দেবার চেষ্টায় কথার মায়াজালের তলায় কত ফাঁকি কত ত্রুটিই না ছিল!

আবার বেছে-বেছে 'নির্ব্বোধ' বা'র ক'রে পড়লে—"সমস্ত বিদ্রূপ সমস্ত ব্যঙ্গ সমস্ত লাঞ্ছনার অত্যাচার পার হয়ে আজ এই নগণ্য নির্ব্বোধের মনে কিন্তু বসন্তের সমস্ত কচি সবুজ পাতা এক সঙ্গে কাঁপছিল এবং সমস্ত পুষ্প-জগতের সৌরভ স্তবের মত উঠছিল অসীম শূন্য ভরে। আজ যে সে জানে সুন্দরী ফাল্গুন-রাত্রির গোপন নিমন্ত্রণ-লিপিটি তার—শুধু একমাত্র তার। যে বড়-সাহেব আজ তাকে তিরস্কার করেছে, যে বড় বাবু তাকে অপমান করেছে, যারা তাকে নিয়ে পরিহাস করেছে, হতভাগ্য তারা ত জানে না যে নবকিশলয়ের পথে বিশ্বের চিরকালের মায়াবী দেবতা আজ শুধু তারি বুকের দীপটি জ্বালাতে দখিন বাতাসের রথে ভুবনের দ্বারে এসেছে—"

মনে-মনে হেসে আবার 'কাগজ-কুচি'তে পড়লে—"তখন বাইরেও তাদের মনের

ভেতরে নব বর্ষার স্নিগ্ধ শীতল মেঘের ছায়ায় আর প্রখর রৌদ্রালোকে মিলে অপূর্ব্ব মায়ালোক রচনা করেছে। প্রেমের কল্যাণ কর তখন সংসারের সমস্ত কটু কঠোর কঠিন কুশ্রিতার ওপর কমনীয়তার অপূর্ব্ব কোমল প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে। যেমন বাইরে তখন রৌদ্র ছায়ার ক্ষণিক মিলনের মায়া জগৎ অন্তরেও তেমনি বাস্তব অবাস্তবের মিলনে অসম্ভব একটি দিনের দিল্‌দরিয়া আনন্দের রাজ্য…"

কাগজগুলো তুলে রেখে সে ভাবলে কল্পনায় প্রেমের অনেক ব্যাখ্যা সে করেছে, কিন্তু আজ সে শুধু একটি কথা ছাড়া আর কি বলতে পারে? আজ সে সমস্ত উচ্ছ্বাস বাদ দিয়ে শুধু একটি কথা বলতে পারে "ভালবাসি", আর কিছু নয়।

বাইরে তার দাদা এসে ডাকলে—"কি উৎপল, আজ খাওয়াটা এখানে হবে, না বন্ধুর বাড়ীতেই সেরে আসা হয়েছে?"

"না, যাচ্ছি" ব'লে উৎপল আবার লেখার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনটি ভাবতে লাগল।

তিন বৎসর আগের কথা, কলেজে সুধীরের সঙ্গে নতুন আলাপ হওয়ার পর সেই তার দ্বিতীয় বার সুধীরের বাড়ীতে যাওয়া। সুধীর তাকে ঘরে বসিয়ে রেখে খানিকক্ষণের জন্য মাকে তার কথা বলতেই নীচে গেছ্‌ল বুঝি। দরজার দিকে পেছন ফিরে ব'সে সে সুধীরের ঘরটি দেখছিল। এমন সময়ে পেছনে দ্রুত চঞ্চল পায়ের শব্দ শুনে সে একটি কস্তাপাড় শাড়ীর অঞ্চল ও দুটি সুন্দর সুগঠিত পা ছাড়া আর কিছু দেখতে পায়নি, আর শুনতে পেয়েছিল মিহি মিষ্টি গলায় "আমার কিন্তু এখনি উত্তর চাই অধীরদা।" অবাক হয়ে ফিরে দেখে পায়ের কাছে রুল-টানা কাগজে লেখা একটি চিঠি পড়ে আছে। চিঠি কাকে লেখা এবং কার দ্বারা লেখা তার কোন হদিস নেই। কৌতূহল খুব বেশী হওয়ায় সে চিঠিটা পড়ে ফেলে। চিঠির আরম্ভ একেবারে সপ্তমে—

"তুমি ভেবেছ বুঝি তোমার সঙ্গে কথা না কইলে আমার আর দিন যাবে না। ও, ভারী বয়ে গেছে আমার তোমার সঙ্গে কথা কইতে। তোমার খোট্টা যন্ত্র যেন না দেখলে আর কারুর ঘুম হয় না। আমরা দুপুর-বেলা কেমন গ্রামোফোন বাজাই, ছবি দেখি…চাই না তোমার ঘরে আসতে। আমি মার কাছে মাসীমার কাছেও বলেছি যে, অধীরদাটা ভারী স্বার্থপর একগুঁয়ে, আর কখন ওর ঘরে যাব না। এই যে আসি না তোমার ঘরে আমার যেন ভারী ক্ষতি হচ্ছে তাতে…" অধীরদার ঘরে না এলেও যে কারুর বিশেষ ক্ষতি হয় না সে কথাটা এমন ঘটা করে জানানর দরকারের কোনো কারণ খুঁজে না পেয়ে উৎপল দেখল শেষের দিকে সুর কিন্তু একেবারে সপ্তম

থেকে খাদে নেমে অধীরদাকে সেদিনকার বিশেষ কোন আশ্চর্য্য বায়স্কোপ দেখাবার জন্যে পায়ে ধরে মিনতি করাতে এসে ঠেকেছে।

শেষকালে আছে, "সত্যি অধীর-দা আর ককৃখনো তোমার অবাধ্য হব না, তুমি এইবারটি শুধু ক্ষমা করো, এবার থেকে তুমি যা বলবে দেখো তা যদি না করি, ত আমায় ঘরে আর ঢুকতে দিও না। তোমার পায়ে পড়ি অধীরদা; আজকে ভারী সুন্দর ফিল্ম হবে, তুমি না গেলে বাবা কিছুতেই যেতে দেবে না। দোহাই অধীরদা, আর রাগ করে থেকো না, তোমার পায়ে ধরি···"

হাসতে হাসতে এই অপরূপ চিঠিটা উৎপল মুড়ে যথাস্থানে রাখতে যাচ্ছিল এমন সময় পেছন থেকে ঈষৎ বিস্মিত গলায় শুনতে পেলে -"ওমা কাকে অধীরদা ভেবেছি!" ফিরে চাইতে চাইতেই সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ওঃটুকুর মধ্যেই একটি সুন্দর মুখের দুটি দীর্ঘায়ত নয়নের বিস্ময়-মাধুর্য্য দেখবার অবসর তার যথেষ্ট হয়েছিল।

নীচে থেকে ন'দার গলা শোনা গেল—"ও উৎপল, আমরা সবাই খেতে বসেছি যে।"

ভাবনার মধ্যপথে থেমে উৎপল তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে খাবার ঘরে নেমে গেল।

।। আট ।।

সুধীর তার সবল হাতে মুগুরের ঘায়ে একটা বাক্সের চারিধারে পেরেক মারছিল আর উৎপল যে-কথা বলতে এসেছিল সে-কথা বলবার সুযোগ এ পর্য্যন্ত না পেয়ে অকারণে বাটালিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। আজ সুধীরের কোনো কাজে তার কোনো ঔৎসুক্য না থাকলেও একবার জিজ্ঞেস করলে—"কোথায় যাবে বাক্সটা?"

"গয়ার এক লিমিটেড এগ্রিকাল্চ্যারাল কোম্পানির অনুমোদনের জন্য পাঠাচ্ছি।"

"কি আছে?"

"সেই কলের লাঙলের মডেলটা।"

"তারা কিনতে পারে?"

"দেখি চেষ্টা ক'রে, টাকার ত বিশেষ দরকার আমার এখন।"

এ-সব কথায় কোনো আগ্রহ না থাকলেও উৎপল জিজ্ঞাসা করলে- "কত দরকার?"

"অন্ততঃ হাজার পাঁচেক না হলে ত আর নতুন কিছুতে হাত দিতে পারছি না। এই ছোট ঘরে মডেল তৈরী করলে ত আর চলবে না, একটা কারখানা ঘরের বিশেষ দরকার পড়েছে।"

উৎপল চুপ ক'রে রইল। সুধীর পেরেক ঠুকতে লাগল।

হঠাৎ উৎপল কোন ভূমিকা না ক'রেই জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা চারুলেখার বাবার নাম কি?" তারপর কৈফিয়ৎ স্বরূপ বল্লে—"ভদ্রলোকের সঙ্গে কাল আলাপ হল, কিন্তু এখনো নামটা জানা হোল না।"

এই অবান্তর প্রশ্নের আকস্মিকতায় কিছুমাত্র বিস্ময় কিন্তু সুধীরের মুখে দেখা গেল না। সে অন্যমনস্কভাবে বাক্সের ওপর ঠিকানা লিখতে লিখতে বল্লে—"শ্রীঅন্নদা-সুন্দর বসু।"

আবার উৎপল খেই খুঁজে না পেয়ে চুপ করলে। সুধীর বাক্সটায় ঠিকানা লেখা শেষ ক'রে সেটা একধারে সরিয়ে রেখে বল্লে—"যাক, দেখা যাক, এই প্রথম চেষ্টার ফল কি হয়?"

উৎপল শুধু বল্লে—"আশা করা যাক, ভালই হবে।"

আবার সমস্ত চুপচাপ। বাইরে রাস্তায় দমকলে জল দেবার শব্দ শোনা যাচ্ছে, বিকেল হয়ে এসেছে। টেলিফোনের তারের ওপর ব'সে কাকের দল কোলাহল করছিল।

সুধীর ততক্ষণে আবার একটা ইলেকট্রিক ষ্টোভ নিয়ে বসেছে। উৎপল বল্লে—"তোর কি একদিনও বিশ্রাম করতে ইচ্ছে হয় না সুধীর? ভালো লাগে রোজ এই কল-কব্জা ঘাঁটার একঘেয়েমি?"

"তোর কবিতা গল্প লিখতে লিখতে বিরক্তি আসে?"

"তাও মাঝে-মাঝে আসে।"

"আমার কিন্তু আসে না, এখনও ত আসে নি।"

উৎপল সাহস ক'রে পাড়লে, "একবার প্রেমে না পড়লে তোর আর কল-কব্জার মোহ থেকে নিষ্কৃতি নেই।"

"তুই তা হ'লে পড়েছিস বল প্রেমে?"

খানিকক্ষণ কোন কথা না ব'লে উৎপল আবার আরম্ভ করলে—"আচ্ছা সুধীর, সত্যি কি তুই কখন কাকেও ভালোবাসিস নি?"

"বাসব না কেন, এই যেমন..."

"না, তা বলছি না, ও রকম নয়..."

"না, বাসিনি অন্য কোন রকম।"

উৎপল একটু থেমে বল্লে—"আচ্ছা, চারুলেখা মেয়েটি বেশ—না?"

এইবার সুধীর কাজ থেকে চোখ তুলে একটু বোধ হয় অবাক হয়ে বল্লে—"ভারী দুষ্টু।"

"না না, আমার ত খুব ভালো লাগে।"

"ও, দূর থেকে দেখলে অমনি ভালো লাগে, আমায় একেবারে জ্বালাতন করে মারছে।" হঠাৎ সুধীরের মনে প'ড়ে গেল আজ পাঁচদিন সে ঘর গুছিয়ে দ্যায়নি এবং সেদিন ডাকতে গেলেও অবাধ্য হয়ে আদেশ শোনে নি, তারপর অন্নদাবাবুর সঙ্গে ছল করে এলেও ক্ষমা না চেয়ে পালিয়ে গেছে সুতরাং তাকে শাস্তি দেওয়া দরকার। রাগের সুরে বল্লে—"এবার আর ঘরে ঢুকতে আসে যেন কোনোদিন!"

উৎপল একটু ব্যথিত সুরে বল্লে—"তুই অত বড় মেয়েকে সেদিন ও রকম ক'রে ব'কে ভালো করিসনি, বিশেষতঃ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলাটা।"

সুধীর আবার অবাক হয়ে চোখ তুলে বল্লে—"বকবো না? ঘরের কোথায় কি রাখবে ঠিক থাকবে না, জিনিষ ভেঙে ফেলবে, আর তাকে মিষ্টি কথা বলতে হবে?"

কিন্তু উৎপল সমস্ত জগতে চারুলেখাকে তিরস্কার করবার সপক্ষে কোন যুক্তি থাকতে পারে এ কল্পনাও না করতে পেরে শুধু বল্লে—"আমার এমন কষ্ট হয়েছিল সত্যি সুধীর, লেখাকে আমার এত ভালো লাগে..."

এবার সুধীর ষ্টোভ্‌টা সরিয়ে বিস্মিত কৌতুক দৃষ্টিতে উৎপলের মুখের দিকে চেয়ে হেসে উঠল। তারপর বল্লে—"ওঃ হরি, চারীকে তুই ভালোবেসেছিস নাকি রে?"

উৎপল লজ্জিতমুখে চোখ নামিয়ে চুপ ক'রে রইল। সুধীর হাসিতে সমস্ত ঘর কাঁপিয়ে তুললে।

কিন্তু জড়-ধেয়ানি এই যন্ত্র-পুরোহিতের হৃদয়ের কোন গোপন তন্ত্রীতে কি উৎপলের এই অপ্রত্যাশিত স্বীকারোক্তিতে ক্ষণেকের তরেও কোন বেসুর মূর্চ্ছনা বেজে ওঠে নি? তার একান্ত অনুগত চিরকালের বাধ্য যন্ত্র-পূজায় নীরব সেবিকা চারুলেখার পক্ষে আর কারুর ভালোবাসার পাত্রী হওয়ার মতো অদ্ভুত নতুন কল্পনার মধ্যে কি তার অপরিসীম বিস্ময় ও অশেষ কৌতুক ছাড়া কোন সামান্য বেদনার তিলমাত্র আভাসও ছিল না?

সুধীরের মুখে "ডাকি তবে এইবার চারীকে" এবং উৎপলের মুখে কি একটা অস্ফুট প্রতিবাদ কিন্তু দ্বারের দিকে চেয়ে থেমে গেল।

নিজের সমস্ত অপমান ও অভিমান দমন ক'রে তখন চারুলেখা অপরাধীর

মতো ধীরে-ধীরে এসে দরজার পাশে দাঁড়িয়েছে। ভেতরে যেতে তার পা উঠছিল না।

হঠাৎ গত পাঁচদিনের অপরাধ ও অবাধ্যতা স্মরণ ক'রে সুধীর গম্ভীর মুখে ষ্টোভ্‌টার ওপর অত্যন্ত মনোযোগ প্রদান করলে। এবং উৎপল সমস্ত কান রাঙা ক'রে নির্ব্বাক হয়ে ব'সে রইল।

সুধীরের গম্ভীর মুখে কোন ভরসা না পেয়ে চারু দরজার পাশেই দারুণ অস্বস্তিকর অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল। উৎপল না থাকলে হয়ত সে আগেকার মতই অধীরদার মান ভাঙাতে চেষ্টা করত সেধে-কেঁদে অনুনয়-বিনয় ক'রে, কিন্তু উৎপলের উপস্থিতিতে সেটা একেবারেই সম্ভব নয়।

সুতরাং নিরুপায় হয়ে তার সদ্যজাগ্রত নারী-হৃদয়ের লজ্জার মর্য্যাদা রাখবার চেষ্টা একমাত্র অধীরদার কাছ থেকেই একান্ত মনে প্রত্যাশা ক'রে সে চুপ ক'রে রইল।

কিন্তু সুধীর ত্রিভুবনের কাউকে কোন লজ্জা থেকে নিষ্কৃতি দেবার কোনরকম লক্ষণ না দেখিয়ে নীরবে অনাবশ্যক গম্ভীর মুখে ষ্টোভের স্ক্রুগুলো অকারণে খুলতে ও লাগাতে লাগল।

যত সময় যাচ্ছিল তত চারুলেখার বুকে একটা দুর্নিবার ক্রন্দনের উৎস প্রবল হয়ে উঠছিল, তার সঙ্গে ছিল এই অকারণ অপমানে একটা ক্ষুব্ধ ক্রোধের বিদ্রোহ।

শেষে আর থাকতে না পেরে সে অস্বাভাবিক রূঢ়স্বরে বল্লে, "তোমায় বিরক্ত করতে এসেছি ভেবো না অধীরদা, বাবা কাল উৎপলবাবুর কবিতা শুনতে চেয়েছিলেন তাই দেখতে এসেছিলুম উৎপলবাবু এসেছেন কি না? উৎপলবাবু, আপনাকেই ডাকতে এসেছি, যাবেন কি আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে?" চারুর ঠোঁট কাঁপছিল অবরুদ্ধ ক্রোধের প্রাবল্যে।

সুধীর ও উৎপল দু'জনেই চমকে চারুর মুখের দিকে চাইল। উৎপল করুণস্বরে বল্লে—"কিন্তু আমি তো আমার লেখা আনিনি।"

চারুলেখা কঠিন হয়ে উত্তর দিলে, "না এনেছেন না এনেছেন, এখন আমার সঙ্গে আসতে আপনার আপত্তি আছে কি না বলুন-না!"

উৎপল বল্লে—"না আপত্তি থাকবে কেন? তারপর ইতস্ততঃ ক'রে উঠে বল্লে—"যাচ্ছি, সুধীর তুমিও চল না।"

সুধীর শুধু বল্লে—"না।" তারপর গম্ভীর মুখে কাজ করতে লাগল।

উৎপলকে সঙ্গে নিয়ে নীচে নামতে নামতে চারুর মনে হল—কিন্তু সবই বৃথা, ওই যন্ত্রোন্মাদ হৃদয়হীন অধীরদার পাষাণ বুকে এই নিদারুণ শরও চিরকালের মতই ব্যর্থ হয়ে যাবে, একটুখানি আঘাতও নিতে পারবে না।

॥ নয় ॥

ওই সামান্য পথটুকু পার হ'য়ে উৎপলকে নিয়ে তাদের বাড়ী যাবার মধ্যেই কিন্তু চারুর মনে অনেক প্রশ্নই উঠেছিল এবং সত্য সত্য যে আকস্মিক ঘটনাটি ঘটে গেল তাতে তার নিজের অংশটুকুর শোভনতা ও সঙ্গতি সম্বন্ধে অনেক সন্দেহই জেগে উঠল। যখন সে নিজের সমস্ত অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে অধীরদার সঙ্গে মিটমাট করতে গিয়েছিল তখন সে কল্পনাও করতে পারেনি, ভাগ্যের কারসাজিতে সে একটু পরেই এতখানি আঘাত পেয়ে তার কণামাত্রও ফিরিয়ে দিতে না পেরে অমন ক'রে সেখান থেকে চলে আসবে উৎপলকে নিয়ে। নিজের লজ্জা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে তখন উৎপলকে ডাকার ওজর দেখালেও এখন উৎপলকে যে কেমন করে বাড়ীতে নিয়ে যাবে ভেবে পাচ্ছিল না। বাড়ীতে অন্নদাবাবু অবশ্যই এখন হঠাৎ কাব্যরস উপভোগ করবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। এরকম অবস্থায় অকারণে উৎপলকে তাদের বাড়ীতে টেনে নিয়ে গিয়ে বিব্রত করা যে কতদূর অশিষ্টতার পরিচয় এবং তাতে উৎপলের তার সম্বন্ধে ধারণা কি-রকম হওয়া সম্ভব, তা কল্পনা ক'রে সে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিল। আর উৎপলের সামনেই অমন ক'রে মেজাজ দেখানো ও অধীরদাকে উপেক্ষা করে তাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় টেনে আনা যে যে-কোন লোকের চোখেই বিসদৃশ ঠেকতে পারে এটা বোঝা বিশেষ কঠিন নয়। শুধু চলতে আরম্ভ করলে আর থামা যায় না বলেই চারুলেখা উৎপলকে নিয়ে তাদের বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে বসাতে পারলে, নয়ত সম্ভব সে পথের মাঝেই থেমে উৎপলকে বলত, 'আমায় ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে অকারণে ডেকে এনে অপমান করেছি।' অন্ততঃ তা হলে সে ভবিষ্যতের কর্তব্যের ভাবনা থেকে মুক্তি পেত।

উৎপল এই অসময়ে এই অপ্রত্যাশিত নিমন্ত্রণের আকস্মিকতায় একেবারে যে বিস্মিত হয়নি এমন নয়, কিন্তু যত কথা সে ভাবছে মনে কোরে চারুলেখা অস্থির হয়ে উঠছিল তার কিছুই ভাবে নি। ভাববার মতো অবস্থা তার ছিল না, সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। একটা বিলিতি শোফায় নরম গদিতে ব'সে প'ড়ে সে নিজেকে নিতান্ত বেখাপ্পা মনে ক'রে অন্তরে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল।

চারুও এই একান্ত অস্বস্তিকর সমস্যা সমাধান করবার কোন উপায় না পেয়ে ঘরের মাঝের শ্বেত পাথরের টেবিলের ওপরকার ফুলদানীগুলি নিয়ে অনাবশ্যক নাড়াচাড়া করছিল। খানিকবাদে সে উৎপলের মুখের দিকে না চেয়েই বল্লে—

"বসুন, আমি বাবাকে ডেকে আনি—" তারপর পেছনের দরজা দিয়ে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল। এতক্ষণ যে-ভাবনার স্রোত উৎপলের মনে চারুর উপস্থিতিতে রুদ্ধ হয়েছিল এই একলা হওয়ার সুযোগে তা হঠাৎ প্রবল হয়ে উঠল। উৎপলের মনে হোল যে-সৌভাগ্যের জন্যে সে এতদিন একান্তমনে কামনা ক'রে এসেছে সেই সৌভাগ্যই তার এল এ কি বিকৃত বেশে! এতক্ষণ সে অন্ততঃ এইটুকু বুঝতে পেরেছিল যে সুধীরের ঘরে যাবার কারণ চারুলেখার আর যাই থাক না, তাকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনা কোনমতেই সে কারণ নয়। তবু তাকে এমন করে ডাকবার তাৎপর্য্যও সে ভালো ক'রে বুঝতে পারছিল না। তা বুঝতে পারলে ভবিষ্যতের অনেক জটিলতা হয়ত সেইদিনই সহজ হয়ে যেত।

অন্নদাবাবু উৎপলের আগমনের জন্যে প্রস্তুত না থাকলেও তাঁকে কোন রকমে বুঝিয়ে আনা বিশেষ কঠিন হবে না ভেবেই চারুলেখা তার বাবার খোঁজ করতে গেছ্‌ল, কিন্তু সেদিন যেন সকল দিকেই ভাগ্য তাকে প্রতিহত ক'রে পরিহাস করতে বদ্ধ-পরিকর হয়েছিল। চারু ওপরে গিয়ে জানলে অন্নদাবাবু কোনো বিশেষ কাজে তাঁর সাধারণ অভ্যাসের ব্যতিক্রম ক'রে বেরিয়ে গেছেন।

নিরুপায় হয়ে অতিথির সম্মান রাখতে চারুলেখা আবার বাইরের ঘরে ঢুকল, কিন্তু এবার তার গতিতে বিমূঢ়তার শৈথিল্য ছিল না, সে কোন একটা বিষয়ে স্থির-প্রতিজ্ঞ হয়ে এসেছিল।

চারুলেখা উৎপলের দিকে চেয়ে বল্লে—"বাবা ত ঘরে নেই, বেরিয়ে গেছেন!" তারপর উৎপলকে কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়েই এক নিশ্বাসে ব'লে গেল —"আমায় ক্ষমা করুন উৎপল-দা, আমি বাবাকে না জিজ্ঞেস ক'রেই আপনাকে ডেকে এনেছি। আপনাকে ডেকে আনতে আমি যাইনি ওখানে, কিন্তু আপনি যদি তখন না আসতেন তা হ'লে আমার লজ্জা রাখবার আর জায়গা থাকত না। আমাকে লজ্জা থেকে বাঁচাবার জন্যে আপনাকে শত ধন্যবাদ উৎপল-দা।"

চারু চুপ করলেও তার এই কৈফিয়ৎ ও কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে বিচলিত হয়ে উৎপল কোন কথা বলতে পারলে না।

চারু আবার বল্লে, "আপনি খুব প্রতিভাবান মহাপুরুষ না হতে পারেন উৎপলদা, কিন্তু এইটুকুর জন্যে আপনাকে আমি চিরকাল শ্রদ্ধা করব যে আপনি মানুষ, কাউকে অকারণে বারবার অযথা পীড়ন ক'রে আপনি নিষ্ঠুরের মতো আনন্দ উপভোগ করেন না।" বলতে বলতে চারুর গলা ভারী হয়ে উঠল।

উৎপল এইবার বিস্মিত করুণ দৃষ্টি চারুর মুখে তুলে বল্লে, "এত কথা তুমি আমায় বলছ কেন লেখা? তোমায় কোন্ লজ্জা থেকে বাঁচিয়েছি তা আমি জানি না, কিন্তু

যদি কোনো লজ্জা থেকে পরিত্রাণ দেবার উপকরণ হয়ে থাকি তবে তাতে আমারই গৌরব মনে করছি, তোমার কৃতজ্ঞতার কোনো কারণ নেই।"

চারুলেখার অন্তরের নব-জাগ্রত মহিমান্বিত নারী এই অযাচিত শ্রদ্ধার অঞ্জলিতে প্রীত না হয়ে থাকতে পারল না। সে স্মিত মুখে নীরব হয়ে রইল।

এমন সুন্দর চোখে উৎপল কোনো নারীকে কোনোদিন দেখেনি। এই কিশোরীর সুগৌর প্রতিভামণ্ডিত মুখে, আষাঢ়ের মেঘের মতো ঘনকৃষ্ণ ভুরুর তলায়, পূর্ণিমা শর্ব্বরীর মতো রহস্যভরা দুই চোখে কৈশোরের তরলতা ও যৌবনের নিবিড়তা একসঙ্গে মিশে ছিল। অন্তরে যে প্রেম নিয়ে পুরুষ সমস্ত নিখিলের সৌন্দর্য্য ও বিস্ময়মণ্ডিত ক'রে নারীকে নারীর চেয়ে অনেক বড় ক'রে দেখে, উৎপলের চোখে ছিল সেই দুর্লভ প্রেমের দৃষ্টি। তাই তার যৌবনের নিভৃত নিলয়ের দীপটিতে যে প্রথম ও সম্ভবত শেষ আলো জ্বালাল তাকে এমন ক'রে একান্তে পাওয়ার মাধুর্য্যে তার কাছে কলকাতার ধূলি-ভারাক্রান্ত চিরমলিন বিষণ্ণ সন্ধ্যাও পরম রমণীয় হয়ে উঠল।

অনেকক্ষণ দুজনেই কোনো কথা কয়নি। উৎপলের মুগ্ধ দৃষ্টির মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিস্তব্ধতার ভার হাল্কা করবার জন্যে চারুলেখা হেসে বল্লে—"বা, আমরা ত খুব কাব্যালোচনা করছি।"

উৎপল লজ্জিত হয়ে মুগ্ধ দৃষ্টি সরিয়ে বল্লে—"কাব্য না থাকলে কাব্যালোচনা কি করে হতে পারে তা ত আমি বুঝি না।"

"বা, তা বুঝি হতে পারে না?"

"পারে। কিন্তু আমি সে-রকম অবাস্তব আলোচনার পক্ষপাতী নই।"

চারু উঠে বল্লে, "তা হ'লে কাব্যালোচনা ত হল না, এখন দেখি, কোনো বাস্তব রসালোচনার জোগাড় করতে পারি কিনা!"

উৎপল বাধা দিয়ে বল্লে—"না না, একে আমার ও বিষয়ে বিশেষ দুর্নাম আছে, তোমাদের বাড়ীতেও সেটা আর প্রচার করতে চাই না।"

"দুর্নামকে চাপা দিলেই ত আর দুর্নাম চাপা পড়ে না, আর নিছক সুনামের লোভ বেশী ভালো নয়।" বলে চারুলেখা ভেতরে চলে গেল। উৎপলের মনে হ'ল সুধীরের বাড়ীতে সময়ে অসময়ে যে লেখাকে সে দেখেছে এ যেন তার আর এক রূপ! এখানকার লেখার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠ পরিণত মন নারীর বিকাশ অনেক বেশী স্পষ্ট।

খাওয়া শেষ হ'লে লেখা বল্লে, "কাল বিকেলে আসবেন উৎপলদা, আমি বাবাকে ব'লে রাখব কিন্তু।"

উৎপল বল্লে, "আচ্ছা।"

তখন পথে গ্যাস্ জ্বেলে দিয়ে গেছে এবং নির্মম নিরপেক্ষ দিনের আলোয় ব্যস্ত কুশ্রী কলকাতা রাত্রির অস্পষ্টতায় তার অসংখ্য জীবনের গোপন কাহিনীর বৈচিত্র্য নিয়ে অদ্ভুত অপরূপ হয়ে উঠেছে!

উৎপল রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। একবার শুধু সে ফিরে তাকালে, তার মনের কোণে একটি গোপন ক্ষীণ আশা ছিল যে লেখা দরজায় এখনো আছে।

কিন্তু অন্ধকারের দরুণ বা যে কারণেই হোক সেখানে কাউকে দেখা গেল না।

॥ দশ ॥

কলকব্জায় জাতা বিশৃঙ্খল ঘরটার এক কোণে মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে ব'সে সুধীর নোংরা হাতে একটা সাইড্-কার-বিহীন অথচ দু'জন-ব'সা একটা নূতন ধরণের মোটর বাইকের মডেল গড়ছিল। ধুলোয় আবর্জ্জনায় ঘরটা একদম শ্রীহীন হয়ে রয়েছে, উদাস নির্বিকার এই জড়-পূজারীর চোখেও সে-কুশ্রিতা এড়াচ্ছিল না। সুধীর যতই তার কাজে মন দেবার চেষ্টা করছিল ততই তার মন দুলে উঠছিল বারে বারে, সে এই অকারণ চাঞ্চল্যের কোনো সংজ্ঞা দিতে পারছিল না। সেদিন অস্বাভাবিক অসুলভ কর্কশস্বরে তাকে অযথা তিরস্কার করে উৎপলকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে চারুর স্বভাবের অদ্ভুত পরিবর্ত্তনকে সে মোটেই আয়ত্ত করতে পারছিল না। এও হতে পারে? চারুর গলার সুরে যে এতটা রুক্ষ বিষ ঝ'রে পড়তে পারে, সুধীরের কোনো কালে তা জানা ছিল না। তা ছাড়া একদিন কি ছাই একটু বকেছে, তার জন্যে এমন করে একেবারেই কি আর আসতে হয় না? তার বকুনি খেয়ে চারী রাগ ক'রে তার ঘরের দরজা পর্য্যন্ত মাড়াচ্ছে না, এর মতো আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার সুধীর যেন কোনো দিন আর ভাখেনি, এমন কি তার অত্যদ্ভুত অপ্রত্যাশিত নূতন-নূতন আবিষ্কারের মধ্যেও।

সুধীর তার যন্ত্রের থেকে মুখ তুলে বল্লে,—"কি রে, তোর কাজ হোল নন্দ?"

"না, এই হচ্চে।"

সেদিন দোরের গোড়া পর্য্যন্ত এসে তার ঘরে না ঢুকে চারু বাইরে দাঁড়িয়েই তাকে রুক্ষ স্বরে তিরস্কার ক'রে উৎপলকে নিয়ে চ'লে গেলে পর সুধীর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল একটা ছোকরা মিস্ত্রির খোঁজে। সে বল্লে—"ভারী তো আমার ঘর-গুছোনিরে, ও ভেবেচে ওকে না হলে আমার যেন আর চলে না, ভারী দেমাক হয়েচে ওর।"...দুদিন ঘুরোঘুরির পর মোটরের একটা কারখানা থেকে সে বেশী

মাইনে দিয়ে এই ষোলো-সতেরো বছরের ছেলেটিকে তার নতুন কাজে ভর্ত্তি ক'রে দিয়েছে, কাজের মধ্যে তো দুই, শুধু ঘরটা গুছিয়ে রাখা, আর চাইবামাত্র হাতের কাছে এটা ওটা সেটা এগিয়ে দেওয়া। কিন্তু এই যন্ত্রোন্মাদ তপস্বীটি বুঝতে পারছিল এ দুটি কাজ সুসঙ্গতভাবে নির্ব্বাহিত হলেও যেন প্রকাণ্ড ফাঁকা রয়ে যাবে যা শত নন্দতেও ভরাট হয়ে উঠবে না।

নন্দটার কালো কুৎসিত মুখের দিকে চেয়ে সুধীরের ভারী রাগ হচ্ছিল। তাকে এই ছোঁড়াটা এক মুহূর্ত্তের জন্যও তার যন্ত্রধ্যানে অভিনিবেশ দেবার অব্যাহতি দিচ্ছে না। "এটা কোথায় রাখব, বাবু?" "এটা দিয়ে কি হবে?" এমনি অজস্র প্রশ্ন ক'রে সে তাকে ব্যতিব্যস্ত ও অস্বাভাবিক ভাবে রাগান্বিত ক'রে তুলছিল। সে অস্ফুট ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বল্লে—"এই সব আনাড়িদের কর্ম্ম যন্ত্র গুছোনো, পারবে খালি বিঁড়ি টানতে। অকর্ম্মণ্য কুড়ের দল।" তার নোংরা তেলচিটে কাপড়, পান-খাওয়া কালো দুটো ঠোঁট, ঘাম-ঝরা আদুল গা তার সমস্ত যন্ত্র-নিকেতনটি যেন কুশ্রী বীভৎস ক'রে তুলছিল তার চোখে। কল-কব্জার সমস্ত আয়োজনের মধ্যে কি যেন একটি অম্লান সৌন্দর্য্য বাস করছিল এতদিন, আজ যেন তা হারিয়ে গেছে।

নন্দ দু'হাতে কতকগুলি বইর গাদা নিয়ে ভীত কণ্ঠে বল্লে, "এগুলি কোথায় রাখব বাবু?" সুধীর রুক্ষ গলায় বল্লে— "চুলোয়।"

নন্দ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তার মনিবের পানে চেয়ে রইল মূঢ় দৃষ্টিতে। সুধীর চোখ নীচু ক'রে সাইকেলের ষ্টিয়ারিঙ হুইলটায় বৃথা মনোযোগ দিচ্ছিল।...সহসা চোখ তুলে সুধীর রুখে উঠে দাঁড়িয়ে তীব্রকণ্ঠে বল্লে—"গেল আমার এরোপ্লেনের পাখাটা ভেঙে! পাজী শুয়ার, বইগুলি মেঝেয় রাখতে হয়! সেল্‌ফ দেখতে পাচ্ছিস না?" বলে ধাঁ ক'রে নন্দর গালে এক বিপুল চড় বসিয়ে দিলে। নন্দর হাত থেকে সমস্তগুলি বই সশব্দে যন্ত্রপাতির ওপর লুটিয়ে পড়ল। সুধীর রাগে অন্ধ হয়ে নন্দর কান ধ'রে এক ঝাঁকানি দিয়ে বল্লে—"বেরো ব্যাটা আজিই আমার ঘর থেকে, মেঝের ওপর বই গুছোচ্ছেন!"

নীচের থেকে গোলমাল শুনে মা তাড়াতাড়ি উঠে এসে সন্ত্রস্ত হয়ে শুধোলেন— "কি হোল রে সুধীর?"

সুধীর চড়া গলায় বল্লে—"হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! সবাই মিলে আমার পেছনে লেগেছে। আনলাম একটা ব্যাটাকে ধ'রে ঘর গুছোতে, দিলে আমার এরোপ্লেনের পাখা ভেঙে। যত সব আনাড়ী অকেজো কর্ম্মনাশারা!"

মা নন্দ বেচারীর কান্না-ম্লান মুখখানা দেখে ব্যথা অনুভব ক'রে বল্লেন—“তা ব'লে তুই ওকে মারবি ?”

“না দুধকলা খাওয়াব। তোমার আর বিরক্ত করতে আসতে হবে না। আমি চল্লুম, যাক সব ভেঙে, ব'য়ে গেল !” ব'লে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলল।

মা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—“কোথায় যাচ্চিস রে এই রোদে ?”

নামতে নামতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সুধীর জবাব দিলে—“চুলোয়।”

তপ্ত রৌদ্রে যন্ত্রোন্মত্ত রাজধানীর বিপুল বীভৎস রূপ দেখে সুধীরের মনে আবার যন্ত্রের নেশা লাগল। ট্রামের চলাচল, মোটরের হুঙ্কার, অসংখ্য যন্ত্রের বিপুল প্রাণের স্পন্দন, সহস্র চিম্‌নীর উত্তুঙ্গ শিখরে যন্ত্র-দেবতার ধূম-নর্ত্তন, সবাই মিলে সুধীরের মনে অভিনন্দন পাঠালে। সে খানিকক্ষণ মন্ত্র-মুগ্ধের মতন ঘুরে বেলা হলে বাড়ী পৌঁছে ডাক দিলে—“মা !”

মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্লেন—“কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ ? ঘামে যে একেবারে ভিজে গেছিস !”

সুধীর মাকে দুই বাহুতে আলিঙ্গন ক'রে বল্লে—“একটু রৌদ্রে ঘুরে এলাম মা। এত কষ্টের এরোপ্লেনের মডেলটা দিলে ভেঙে ! কি করতে ইচ্ছে করে বল ত ?”

মা বল্লেন—“তা না হয় সারিয়ে নিতে পারতিস। কিন্তু ছেলেটা যে কাঁদতে-কাঁদতে চ'লে গেল…”

আলিঙ্গন ছেড়ে হঠাৎ সুধীর আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—“চলে গেল ?”

“তা যাবে না ? ও-রকম ভাবে মারলে কেউ বুঝি থাকে ?”

“তুমি রাখতে পারলে না ? বল্লে না কেন, অন্যায় করেছিস তাই মেরেছে। বল্লে না কেন, বাবুর মাথার ঠিক নেই…”

“বল্লাম তো, কিন্তু কে শোনে আমার কথা ? ছোঁড়াটা কেঁদে কেঁদে বল্লে, এমন মা'র কোনদিন আর খায়নি।”

এবার সুধীর রুখে উঠল, বিরক্তি-ভরা কটু কণ্ঠে জোরে বল্লে—“ভারী নবাব হয়েছে সব, ভারী দেমাক ! একটু বকেছি কি মেরেছি, তার জন্য একেবারে রেগে কেঁদে ঘর থেকে চ'লে যাওয়া ! দ্যাখা যাবে সব ! আমার ভারী চাকরের অভাব হবে কি না কলকাতায়। বেটা পাজী নচ্ছার হতভাগা !” বলে দুম্ দুম্ করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

সেদিনকার দু'পহরে করবার মতো তেমন কোনো কাজ তার হাতে ছিল না। টেবিলটার সামনে ব'সে সে Gibson-এর Hydro Electric Engineering পড়ছিল, কিন্তু কিছুতেই মন বসছিল না তাতে। নন্দ-ছোঁড়াটা চ'লে গেল,

তার যন্ত্র-জগৎ আবার সেই অসীম শূন্যতায় ভ'রে উঠেছে। যতই সে সমস্ত ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পড়ায় দ্বিগুণ মনোযোগ দিতে যাবে ততই বারে-বারে তার মনে পড়ছিল উৎপলের সেই অদ্ভুত ভারী গলার কথাগুলি। সেদিন ঠাট্টা ক'রে কথাগুলিকে উড়িয়ে দিলেও, আজ তারা কোথাকার একটুখানি রং মেখে তার মনে মোহ সঞ্চার করছিল। চারুকে অন্য কারুর ভালো-লাগার মধ্যে কি যেন একটা ষড়যন্ত্র আছে যা নির্ব্বিবাদে সহ্য ক'রে যাবার মতো ঔদাসীন্য এবং ক্ষমা ক'রে যাবার মতো উদারতা সুধীর পাচ্ছিল না আজ খুঁজে। এই অলস দু'পহরের স্নিগ্ধ অবকাশটি তাকে ভারী অস্থির ক'রে তুলেছে। তারপর মনে হচ্ছিল চারুর সঙ্গে উৎপলের সেই বেরিয়ে যাওয়াটা। উৎপলের সমস্ত আচরণের মধ্যে অনধিকার প্রবেশের মতো কি যেন একটা ভীষণ অপরাধ রয়েছে, কিন্তু সেই অপরাধের শাস্তি দেবার মতো যোগ্যতা তার কৈ? সে সমস্ত ভাবনা মন থেকে তাড়াবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হোল। "দূর ছাই" ব'লে হাতের মোটা বইটা মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একবার হাই তুলে গা ভেঙ্গে চাঙ্গা হয়ে যন্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে সুরু করলে।

এমন সময় মা "চারু এখানে এসেচে সুধীর?" ব'লে সেখানে এসে হাজির হলেন।

সুধীর বিস্মিত হয়ে বল্লে—"না এখানে আসবে কেন?"

"বাঃ, নীচে এসেছিল মেয়েটা একথালা খাবার নিয়ে, কে একজন জমিদার অন্নদাবাবুকে ভেট পাঠিয়েছেন, থালাটা সামনে রেখেই কোথায় যে চলে গেল দেখলাম না, ভাবলাম তোর ঘরে বুঝি আছে।"

"আমার ঘরে তাকে আসতে দিলে ত? আসুক দেখি না সে একবার!"...

মা চ'লে গেলে সুধীরের মনে চারুর সেই কথাটা তোলপাড় ক'রে উঠতে লাগল, চারু তাদের বাড়ী আসে, অথচ তার ঘরে ঢোকে না। সে মুখে যতই কেন না বলুক, সে তাকে এ-ঘরে আসতে দেবে না, কিন্তু এতে মন কি তার সত্যিই সায় দিচ্ছিল? যদি তেম্‌নি ঘাস-রঙের শাড়ীটি প'রে ছোট ছোট ঠোঁট দুটি রাঙা ডালিমের রসে ভিজিয়ে নিয়ে এই একলা দু'পহরে তার দরজার চৌকাটটার পারে দাঁড়িয়ে ডাকে—সুধীরদা! তবে কি সত্যিই সে তাকে তাড়িয়ে দিতে পারে আর?

সুধীর ভাবলে—'না, এরকম ভাবে পারা যায় না।' সমস্ত যন্ত্র যেন বিকট দৈত্যের মতো হাঁ ক'রে তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে, কর্ম্মহীন এতবড় অবকাশটা সে সহ্য করতে পারছিল না। সে ভাবলে, শাসিয়ে অনুনয় ক'রে

মিষ্টি কথা ব'লে নূতন যন্ত্র দেখাবার লোভ দেখিয়ে সে চারুকে নিয়েই আসবে ঘরে আজ। এই কথাটি মনে গ্রহণ করতেই তার সমস্ত অস্বস্তি দূর হয়ে গেল, সহজে যে এমন মীমাংসায় উপনীত হতে পারা যায় তা তার ধারণা ছিল না। তার আর দেরী সইছিল না, ভাবছিল—এখুনি গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে আসে!

॥ এগারো ॥

বৈশাখের সন্ধ্যাকাশ অকারণে সেদিন রুখে ছিল। তার আর সব দাদারা বজ্রের হুম্‌কি, বিদ্যুতের ঝিকিমিকি ও আসন্ন ঝঞ্ঝায় ভীত বিহ্বল আকাশের মূর্ত্তি দেখে ঘরে গা ঢাকা দিয়ে কেউ বেহালা সাধছিলেন, কেউ চীনাবাদাম চিবুচ্ছিলেন, আর দুটিতে মিলে হ্যাথা-বিস্তি ও পেটাপেটি খেলছিলেন! উৎপল আস্তে-আস্তে তার কবিতার খাতাটি চাদরের আড়ালে লুকিয়ে নিয়ে বর্ষা-প্রতীক্ষা-মগ্ন তপ্ত ধরণীর ধূলি-পথে বেরিয়ে পড়ল। এই মেঘ-মোহাচ্ছন্ন অবনমিত আকাশ কার সেই দুটি যুগল আঁখির প্রতিবিম্ব তুলে ধরেছে। আজ আবার সেই দুটি চোখে নবসৌন্দর্য্যের ছন্দ শুনতে সে অভিলাষী, আজ তার খালি ইচ্ছা হচ্চিল তার কবিতার সোনার কাঠির ছোঁয়ায় সেই দুটি ছন্দভরা নয়নে সে গতির সঞ্চার করে দ্যায়।

বাইরের ঘরে ব'সে অন্নদাবাবু তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে গুড়্‌গুড়ি টানছিলেন ও তাঁর পায়ের তলায় ব'সে চারুলেখা তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, এমন সময় উৎপল সেখানে হাজির হোলো। চারু উৎফুল্ল হয়ে ব'লে উঠল—"উৎপলদা এসেছেন বাবা। এতক্ষণ আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলুম, ভাবছিলুম, আসবেন না বুঝি। মেঘ দেখে হয়ত পদ্য উথলে উঠল। তা, এনেছেন তো খাতাটা? না, আবার ভুলে গেছেন?"

অন্নদাবাবু বল্লেন—"বসো বাবা বসো। দেখো, কি সুন্দর মেঘ করে এসেছে, একটা বৃষ্টির কবিতা পড়।"

উৎপল অল্প একটু হেসে তার গরদের চাদরের তলা হতে জাপানী-ধাঁচের বাঁধানো খাতাটি বা'র ক'রে পড়তে লাগল নূতন অদ্ভুত ছন্দভঙ্গীতে—

"আজ সারা সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টির আয়োজন চলেছে আকাশে। দুর্য্যোগের রাতে কোন্ সে বিরহিনী নারী অভিসারিকা হয়ে কার সন্ধানে বেরুল, কোন্ দূরে কোন্ গ্রহ-তারকার নিদ্রাহীন নিশীথিনীতে কে তার দয়িত পরম রমণীয় বিরহব্রত উদ্‌যাপন করছে! কণ্টকাকীর্ণ তিমিরাচ্ছন্ন বিপদ-সঙ্কুল এ পথ, তবু ঘর-ছাড়া পথহারা এ কোন্ পথ-বাসিনী তরুণী যাত্রা করল আজ ঝটিকার হাহাকারে বিদ্যুতের অগ্নিশিখায় বৃষ্টির

রোদন-মহোল্লাসে! আকাশ-পথের সমস্ত তারার প্রদীপ ম্লান, বর্ষার অক্লান্ত ক্রন্দনধারায় পথের সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত হয়ে গেছে, কূল নেই দিশা নেই থই নেই, তবুও এ বিরহিণী চলে কোথায় কার উদ্দেশে? ক্লান্ত অথচ বিশ্রামহীন তার চলা, যুগে যুগে তার এই অভাবনীয় অনির্ব্বচনীয়ের উদ্দেশে এই অভিসার, কিন্তু কোথায়, তার বিরহী ভগবান কোথায়?"

'চমৎকার, চমৎকার' ব'লে অন্নদাবাবু লাফিয়ে উঠলেন, পরে উৎপলের হাত দুটো ধ'রে খুব জোরে ঝাঁকানি দিয়ে বলে উঠলেন, "এতদিনে একজন খাঁটি কবির সন্ধান পেলুম। তুমি যে এত ভালো লিখতে পার এ আইডিয়া আমার একেবারে ছিল না।" উৎপলের বুক আত্মপ্রসাদে ভরে গেল।

আর সেই নবকিশলয়ের মতো কিশোরীটি ভোরবেলাকার সূর্য্যমুখীর মতো একান্ত শ্রদ্ধা ও কমনীয় আনন্দে বিভোর হয়ে উৎপলের আবেগদীপ্ত মুখের পানে চেয়ে রয়েছিল। সে উৎপলের সমস্ত কথার মানে বুঝতে পারে-নি, কিন্তু তার কবিতার সেই মন্দাক্রান্তা বিরহ-ব্যথা জাগিয়ে-তোলা অপরূপ তন্দ্রাচ্ছন্ন সুরটি, কি-যেন বলতে চাইবার ইসারাটি—তার বুকে ভারী দোলা দিতে লাগল, ভাষাহীন কি নবীন ছন্দোময় স্তোত্র উঠেছে তার মনে! চারুলেখা মুগ্ধ হয়ে দেখতে পেলে উৎপলের লম্বা কোঁক্ড়ানো চুলে, স্বপ্নভরা স্নিগ্ধ দু'টি চোখের তারায় ভোরের আলোর শিখার মতো সরু সুচলো আঙুলগুলিতে তার আবৃত্তিভঙ্গী ও সুরের মূর্চ্ছনায় কি এক মাদকতার শিখা কাঁপছে। চারুর বুক নববর্ষার মেঘের মতো থরথর করে কাঁপতে লাগল।

একলা অন্নদাবাবুর প্রশংসাতেই উৎপলের মন খুশী হয়ে উঠতে পারলে না, তাই চারুর পানে চেয়ে সে শুধোলে—"তোমার কেমন লাগল?"

চারু কি ক'রে যে তার ভাবের ভাষা দেবে বুঝতে পাচ্ছিল না। খানিকক্ষণ থতমত খেয়ে চোখে শ্রদ্ধা নিয়ে সে বল্লে—"ভারী ভালো লেগেছে আমার। সমস্তগুলি কবিতা না-শুনিয়ে কিছুতেই আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি না আজ। কি বল বাবা?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ পড়ো গোটাকতক—পড়িয়ে শোনাও উৎপল! ভারী চমৎকার তোমার ছন্দ, ভারী সুন্দর তোমার ভাব-ব্যঞ্জনা।"......

কালবৈশাখীর আক্ষেপ তখন থেমে গেছে আকাশে! হঠাৎ কথার মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঠে বইটা হাতে তুলে উৎপল বল্লে—"এবার যাই।"

চারু ধরা গলায় বল্লে—"এত তাড়াতাড়ি যাবেন?"

চারু একটু ভেবে দেখলেই সহজেই বুঝতে পারত, বেশী তাড়াতাড়ি মোটেই

নয়, উৎপল প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধ'রে এসে ব'সে আছে, কিন্তু আজ তার আর সময়ের মোটেই ঠিক ছিল না। উৎপল যেন একটা পুঞ্জীভূত কবিতার উন্মাদনা হয়ে তাকে আকর্ষণ করছিল, অতি আচম্‌কা এই তরুণ কবির অপূর্ব্ব ছন্দে তার বুকে তৃষিত প্রকাশ-প্রয়াসিনী নারীটি যেন জেগে উঠেছে!

তবু উৎপল সত্যিই দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে চারু করুণ কণ্ঠে বল্লে—"খাতাটা আমাকে দিয়ে যান না।" অন্নদাবাবু চেঁচিয়ে বল্লেন—"দিয়ে যাও খাতাটা উৎপল, সব কবিতা তো শোনা হোল না, আমি একটিবার দেখব, চারুও দেখবে।"

উৎপল জীবনে তার কবিতার খাতা কোনোদিন হাতছাড়া করেনি, কিন্তু আজ সে আর কোনো দ্বিরুক্তি করলে না, স্বচ্ছন্দচিত্তে চারুর হাতে তা সঁপে দিলে। চারু দোরের গোড়া পর্য্যন্ত এগিয়ে এল, দুই চোখ পুরে তার বিদায়ের ব্যথা গোধূলি আকাশের মতো ধূসর হয়ে উঠল। উৎপল আর একবার চারুর মুখের ওপর চোখের দৃষ্টিটি ছুঁইয়ে পথে নেমে পড়ল।

পথে নেমেই সে চম্‌কে দাঁড়াল, খানিকটা আগে সামনে দাঁড়িয়ে সুধীর। এই রাত্রে তার যন্ত্রের ধ্যান ছেড়ে সুধীর এখানে? উৎপল এগিয়ে এসে আনন্দভরা কণ্ঠে বল্লে—"এই সুধীর যে, কোথায় যাচ্ছিস, লেখাদের বাড়ী?"

সুধীর চারুকে শুনিয়ে তীব্র কণ্ঠে বল্লে—"বয়ে গেছে আমার ও অলক্ষ্মীটার বাড়ী যেতে! আমার কতগুলো স্ক্রু ও পেরেকের বিশেষ দরকার পড়েছে, কিনতে যাচ্ছি।" সুধীর জানত এ পথ দিয়ে বাজার যাওয়া যায় না, তাই সে আর বৃথা কথা না ক'য়ে উল্টো পথে বেরিয়ে গেল।……

চারুলেখা উৎপলের কবিতার খাতাটা দুই হাতের মুঠির মধ্যে চেপে ধ'রে হতবাক হয়ে ঘুমন্ত পথের পানে চেয়ে রইল।

॥ বারো ॥

এগারোটা বেজে গেছে ঘড়িতে, চারুলেখা পালঙের ওপর আল্‌গোছে চুপটি ক'রে শুয়েছিল একান্ত শিথিল আলস্য ভরে। তার দিনগুলি যেন আর কাটে না! সকাল হয়, দুপুর আসে, রাত্রির কোলে তপ্ত দিন আবার ঢ'লে পড়ে, চারুর খালি মনে হয় যেন দিনের পায়ে কে লোহার বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে। এর আগে অবকাশের এই দুঃসহ শ্রান্তি তাকে যেন পীড়া দ্যায়নি। কোনো কাজই যেন তার হাতে নেই, তার জীবন যেন দেউলে হয়ে গেছে এ ক'টি দিনে!

অধীরদা সেদিন বাড়ীর এত সামনে এসে তাকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও এলেন না, এ কথা ভাবতে গেলে চারুলেখার সমস্ত বুক ঠেলে এক কান্না রুদ্ধ অভিমানে গুম্‌রে ওঠে। তার অলক্ষিতে আজ মহীয়সী নারীটি জেগেছে তার বুকে, তাই আর-আর বারের মতন সেধে যেচে অধীরদার স্নেহ ও ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে ভাব করবার মতো হীনতাকে সে কিছুতেই পোষণ করতে পারছিল না। তার খালি এই কথাই মনে পড়ছিল বারে বারে—তার অবমানিত অভিমানাহত বিক্ষত নারী হৃদয়ের অভিমানের মর্য্যাদা রাখবার জন্যে অধীরদা নিজে এসে তার ক্ষমা চেয়ে আদর ক'রে ডেকে নিয়ে যাবে; কিন্তু সেই জড়-ধেয়ানি যন্ত্র তান্ত্রিক নিষ্ঠুর সাধকের বুকে একটুখানি করুণা জাগাবার মতো ক্ষমতা যেন তার নেই, কোনো বাণই যেন সেই নিরপেক্ষ নির্ব্বিকারচিত্ত পূজারীর অটল বর্ম্ম ভেদ করতে পারবে না।

চিত্রলেখা ঘরে ঢুকে বল্লে, "নাইতে যাবি না নাকি চারি?"

"এই যে যাচ্চি।" ব'লে চারু যেমনি শুয়ে ছিল, তেমনি উদাস মুখে শুয়ে রইল।

চিত্রলেখা বল্লে—"কি বিশ্রী আওয়াজ হচ্চে, লোহার ঝনঝন, হাতুড়ীর চীৎকার..."

"যেন বুকে এসে লাগে!" ব'লে চারু নিজের গলার স্বর শুনে মনে মনে একটু চম্‌কালে!

"কি ক'রে যে ভালো লাগে ওর রাতদিন এই সব বাজে খেয়াল?"

"তুমি একে বাজে খেয়াল বলছ দিদি? একদিন যদি দেখতে যাও ওঁর যাদুঘর, তবে দেখতে পাবে কি রকম সব অদ্ভুত আবিষ্কার তিনি করেছেন, একেবারে অবাক হয়ে যাবে। সমস্ত মন ঢেলে দিয়েছেন ঐ কাজে, যেমন পরিশ্রমী, তেম্‌নি..."

চিত্রলেখা হেসে বল্লে, "তেম্‌নি গোঁয়াড়-গোবিন্দ। মার মুখে শুনলুম ওর কোন চাকরকে এক চড় মেরেই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে।"

"এত কষ্ট ক'রে একটা এরোপ্লেনের মডেল গড়েছেন, তার পাখাটা আনাড়ী ছোঁড়াটা ভেঙে ফেললে, এতে কার না রাগ হয়? তোমার ওই চমৎকার সেলাইটা যদি আমি জলন্ত আগুনে বেশ ক'রে ধরাই, তবে তুমি আদর ক'রে আমার গালটা টিপে দাও, না?"

দিদি হেসে বল্লে, "গালটা টিপে দিই বটে, কিন্তু হয়ত তাতে রক্ত বেরিয়ে পড়বে তোর।"

চারু হেসে উঠে বল্লে, "তেমনি অধীরদাও ছেলেটার গালে একটু হাত বুলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তবে আদরের মাত্রাটা একটু বেশী হয়ে পড়তেই বেচারার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়েছে।"

দুজনেই হাসতে লাগল।

চিত্রলেখা বল্লে—"নে ওঠ, মা ডাকছেন। কান ঝালাপালা হয়ে গেল লোহার আওয়াজে।" ব'লে সে চ'লে গেল।

রান্নাঘরে দুটি বোন একসঙ্গে ব'সে খাচ্ছিল, সামনে ব'সে অন্নদাবাবু খাচ্ছিলেন আর পরিবেশন করছিলেন সুনয়নী দেবী। ব্রাহ্ম জমিদার গৃহিণী হলেও সুনয়নী দেবী এ পর্য্যন্ত নিজের বিশেষ অসুস্থতা ছাড়া রোজই স্বামীর পাক ক'রে দিয়েছেন, রাঁধুনে বামুনের হাতে এই ভোজন বিলাসী জমিদারটির আহার মোটেই রুচত না। খেতে খেতে নানা বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল বাপ ও মেয়েদের মধ্যে।

অন্নদাবাবু চিত্রলেখাকে বল্লেন—"তুই যদি আর দুদিন আগে আসতিস ছবি, তবে উৎপলের মুখে তার নিজের লেখা কবিতা শুনতে পেতিস, ভারী চমৎকার সে! আমি এতদিনে একজন রসিক তরুণ কবির সন্ধান পেলুম।"

চিত্রলেখা জিজ্ঞেস করলে—"কে উৎপল?"

"সুধীরের বন্ধু, ভারী নম্র অমায়িক ছেলেটি, তার কবিতায় কি উন্মাদনা—কি তেজ! একেবারে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। যেমনি ভাববিন্যাস, তেমনি শব্দ-ঝঙ্কার। আমার এই মর্চ্চে-ধরা মনের তারে সে নবজীবনের সুর লাগিয়ে গেছে। তুই কি বলিস চারু?"

চারু বল্লে—"কি সুন্দর তাঁর সেই 'ধূর্জ্জটি' কবিতাটি, বাবা! যেন প্রতি শব্দে অধীরদার লোহার হাতুড়ীর মতো গম্ভীর ধ্বনি উঠছে!"

অন্নদাবাবু মাছের মুড়াটা মুখে তুলছিলেন, নামিয়ে রেখে বল্লেন—"হ্যাঁ, ধ্বংস দেবতা রুদ্র প্রলয়লীলায় মেতেছেন বটে কিন্তু তাঁর সমস্ত তাণ্ডার মধ্যে সুকোমল একটি বেদনা, সুগোপন একটি করুণা নিরন্তর উথলে উঠছে! নটবর প্রলয়েশ্বর ধ্বংসের ধূমকেতু ছেড়ে ছারখার ক'রে দিচ্চেন বটে সৃষ্টি, কিন্তু সেই ধ্বংস-ধ্বস্ত পথে নবজীবনের বীজ বপন ক'রে যাচ্চেন, ঠিক অনেকটা শেলীর West Wind-এর মতো, কিন্তু কি passionate!"

চারু বল্লে—"আমার মনে কি হয় জান? মনে হয় উৎপল-দা অধীরদাকে দেখেই এ কবিতার প্লট পেয়েছেন।"

"হ্যাঁ, বেশ দুটি বন্ধু জুটেছে যা হোক। একজন যন্ত্রের পূজারী, আর একজন ভাবের উপাসক। এক-জনের কাছে জাহাজের মাস্তুল, কারখানার ধোঁয়া, সহরের হৈ-চৈ, আর একজনের কাছে রাত্রির ধ্যান নীহারিকার জীবন-চাঞ্চল্য, আকাশের অসীমতা! চমৎকার বন্ধু দুটি!"

চারু হেসে আর একটি উপমা দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলে না, বল্লে—

"একজন দুনিয়ার সমস্ত সৌন্দর্য্যে ডুবে আছেন, আর একজন ভোলা শিবের মতোই সন্ন্যাসী...নিষ্ঠুর।" শেষের কথাটা আর স্পষ্ট হয়ে ফুটল না, তার ঠোঁট দুটির আড়ালে একটু কেঁপে আব্‌ছা হয়ে মিলিয়ে গেল।

সুনয়নী দেবী এসে বল্লেন—"খেতে খেতে আর অত কবিত্ব করতে হবে না। যাবে যখন মাছের কাঁটা গলায় আটকে, কি ভাতের গরস্ বুকে ঠেকে তখনই সমস্ত কবিত্ব বেরিয়ে যাবে।"

চিত্রলেখা হাসতে হাসতে বল্লে—"তখন আসবেন কৃতজ্ঞ বন্ধুরা আমাদের রক্ষা ক'রে তাঁদের প্রশংসার ঋণ শুধতে। সুধীর আসবেন তাঁর তুরপুণ বাটালী নিয়ে গলা চেঁচে কাঁটা বার করতে, আর উৎপল আসবেন তাঁর খাতা কলম নিয়ে আমাদের বিবর্ণ বিকৃত চেহারা দেখে কতগুলি কবিতা লিখে ফেলে আমাদের ধন্য করতে।"

সবাই হো-হো ক রে হেসে উঠলেন।

আঁচাতে-আঁচাতে অন্নদাবাবু বল্লেন, "উৎপল তার খাতাটি রেখে গেছে, সেটি নিয়ে আয় মা ছবি আমার বাইরের ঘরে, শোনাই তোকে।" পরে খড়্‌কে দিয়ে দাঁত খুঁচতে-খুঁচতে বল্লেন—"আমি কি আর তার মতো পড়তে পারব? সে কি সুন্দর পড়া!"

ওপরে এসে চিত্রলেখা চারুকে বল্লে—"কৈ দেখি উৎপলের খাতা?"

টেবিলের ওপর খাতাখানি ছিল. আঙুল দিয়ে দেখিয়ে চারু বল্লে—"ঐ যে, কি সুন্দর তাঁর হাতের লেখাগুলি! অধীরদার হাতের লেখা তুমি দেখেছ দিদি? মনে হয় মাকড়সার পায়ে কে কালী মাখিয়ে কাগজের ওপর ছেড়ে দিয়েছে।"

চিত্রলেখা খাতার পাতাগুলো উল্টোতে উল্টোতে বল্লে—"চল্, যাবি না? বাবা পড়বেন।"

"না, আমি ত শুনেইছি সব, তুমি শোন গে, আমার ভারী ঘুম পাচ্চে।"

"ঘুম পাচ্চে, সে কি রে? তুই দিনে ঘুমোস নাকি? এ বদ অভ্যাস আবার কবে থেকে হোল?"

চারু বিব্রত হয়ে বল্লে—"না, এমনি শুয়ে শুয়ে একটু মাসিকপত্র পড়ব, তুমি যাও, আমার আর এখন পদ্য শুনতে ইচ্ছা হচ্চে না।"

চিত্রলেখা তাকে আর বিরক্ত না ক'রে খাতাটা নিয়ে নীচে বৈঠকখানায় নেমে গেল।

চারু কি করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না। দিদিকে সে বল্লে বটে, তার

ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু ঘুম কি আসবে তার চোখে? কাল তার দিদি এসেছেন, তার সঙ্গে কথায়-বার্তায় এ দিন অনায়াসে কেটে যেতে পারে, তবুও তার ভালো লাগছে না কেন? অন্নদাবাবু উৎপলের কবিতা শোনবার জন্য ডাকলেন, কবিতা সে কত ভালোবাসে, কবিতা শুনলে তার মন অজানা রঙের কৌতুকে অপরূপ হয়ে ওঠে, অনায়াসে সে এই অলস মধ্যাহ্ন কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু না, তার ভালো লাগেনা এ-সব! তার কোনো দিন এমন অবসাদে এমন ক্লান্তিতে কাটেনি আর!

সে পালঙে খানিক এ-পাশ ও-পাশ করলে, একটা বই কয়েকপাতা প'ড়ে ভালো লাগল না ব'লে ফেলে দিলে, সেলাইটা নিয়ে বসল, এস্রাজটা বাজাতে চাইল, কিছুতেই মন বসছিল না। সে বিমূঢ়ের মতন খানিকক্ষণ পায়চারি করতে করতে দোতলার বারান্দার সামনে এসে হাজির হোল।

এ কয়দিন চারু ভুলেও একটিবার বারান্দায় আসেনি, পাছে জানলা দিয়ে সুধীরের সঙ্গে একটুখানি চোখাচোখি হয়ে গেলে অধীরদা ভাবে—চারীটা লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে ছাখে বা তার ঘরে আসবার জন্য চোখে কাকুতি পুরে তাকায়। গভীর অভিমান এতদিন তার বুকে আঠার মতো জমাট বেঁধেছিল, তাই সে বারান্দা আর মাড়ায়নি। তার আত্মপ্রতিষ্ঠ নারীত্বের অহঙ্কারকে ক্ষুণ্ণ করবার মতো দীনতাকে সে জোর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজ তার পা তার চিন্তা ও সঙ্কল্পের অলক্ষিতে এই বারান্দায় টেনে আনলে। চারু সুধীরের ঘরের পানে একটি বার চোখ না ফেলে আর পারলে না।

তাকিয়েই মুহূর্ত্ত মধ্যে পলক পড়তে-না-পড়তেই চারুর দৃষ্টি প্রতিহিত হয়ে ফিরে এল। অধীরদার ঘরের জানলা বন্ধ! চারুর চোখের কাছে সমস্ত বিশ্বসংসার যেন নিমেষের মধ্যে মসীবরণ হয়ে গেল। অধীরদার ঘরের অবরুদ্ধ জানলাটা যেন তারই নিষ্ঠুর লৌহ-কঠিন মমতাহীন হৃদয়ের রূপক হয়ে তাকে শাসাচ্ছে। জানলাটা যেন বলছে তোমার সমস্ত প্রবেশদ্বার বন্ধ হয়ে গেল, এখান দিয়ে তোমার দৃষ্টি কণিকাটিকেও পাঠাতে পারবে না আর। চারুর বুকে কান্নার সমুদ্র উথল হয়ে উঠল। অধীরদা তাকে এমন নির্ম্মম নির্ব্বিচারে ঠেলে ফেলে পর করে দিচ্ছে? সে আর মনে কোনো অহঙ্কার কোনো প্রতিজ্ঞার লেশ দেখতে পাচ্ছিল না। তার ইচ্ছা হচ্ছিল এক্ষুণি ছুটে গিয়ে অধীরদার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলে,—'আমাকে তুমি ক্ষমা কর!'

চারু আর এক মুহূর্ত্তও দেরী করল না। বরাবর নীচে এসে চলল পথের মুখে।

চিত্রলেখা বল্লে—"কোথায় যাচ্ছিস রে?"

"মাসীমাদের বাড়ী।"

"দাঁড়া, আমিও যাব।"

তখন চারু রাস্তায় নেমে পড়েছে, দিদির জন্য সে আর দাঁড়াল না। একেবারে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে প'ড়ে ডাকলে—"মাসীমা!" পাশের ঘর থেকে সুধীরের মা বেরিয়ে আসতে-আসতে বল্লেন—"কে, চারু? আয় মা আয়, আর তো তেমন ঘন ঘন আসিস নে। একি ভারী রোগা হয়ে গেছিস যে!"

চারু ফিকা হেসে বল্লে—"কৈ রোগা হচ্চি?"

"বাঃ, চোখের কোণে কালী পড়েছে, গলার হাড় উঁকি মারছে, কৈ রোগা হচ্ছিস? তা যাক, শুনলাম নাকি ছবি এসেছে।"

"হ্যাঁ, কাল এসেছে।"

"নিয়ে এলি না কেন তাকে?"

"আসবে 'খন'।...ব'লে চারু তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল, তার বুকে ব্যাকুল কান্না বিপুল দুর্নিবার আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে, সে আজ সমস্ত অধীরদার পায়ের কাছে নিবেদন ক'রে আসবে। সে ঘরের কাছে এসে দেখতে পেলে ঘরের দুয়ারে শক্ত লোহার তালা আঁটা। তার উৎকণ্ঠিত বুকে যেন লোহার হাতুড়ীর মতোই একটা ভীষণ আঘাত লাগল। এ কি অদ্ভুত আচরণ! আজ তাকে এমন ভাবে বিপর্য্যস্ত বিক্ষত করবার জন্যেই কি অধীরদা এই নির্ম্মমতার আয়োজন করেছেন? সে অশ্রু-বাষ্প-ভরা কণ্ঠে ডাকলে—"মাসী মা!"

"কি মা?"

"অধীরদা কোথায়?"

"সে খিদিরপুরে না কোথায় একটা প্রকাণ্ড কারখানা খুলছে, সেখানে।"

"কারখানা খুলছে, সে কি?"

"কেন, তোকে কিছু বলেনি? এ দু'দিন ধরে ত কারখানা নিয়েই মেতে আছে, খাওয়া-দাওয়া নেই, রৌদ্রে টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়ানো সাইকেলে মোটরে, কখন যে অসুখ হয়ে বসে, আমার সেই ভাবনা। সমস্ত যন্ত্রপাতি সরিয়ে ফেলেছে প্রায়, একলা একলা কি পরিশ্রম করছে যে ছেলেটা, তেমন একটা দোসরও নেই সঙ্গে কি যে হবে এ সব যন্তর-ফন্তরে ভগবানই জানেন।"

চারুর মুখ দিয়ে আর কোনো কথা সরছিল না। সে তার প্রথম যৌবনের প্রথম নিদারুণ ব্যর্থতা বুকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এল। পালঙের ওপর শুয়ে প'ড়ে সে নিজের রুদ্ধ অভিমানের বেগকে কিছুতেই রোধ করতে পারছিল না, তার যৌবন-স্বপ্ন-ভরা কালো ডাগর দুই চোখে প্রথম যৌবনের জ্বালাময় অতৃপ্তিভরা প্রথম কান্নার বিপুল বাদল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল!

নীচে তখন গরদের পাঞ্জাবী-পরা উৎপল বৈঠকখানায় ঢুকে চিত্রলেখাকে দেখে একটু সন্ত্রস্ত হয়েই ফিরে যাচ্ছিল, অন্নদাবাবু গুড়গুড়ির নলটা মুখের থেকে ফেলে দিয়ে আনন্দাপ্লুত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন—"এসো বাবা উৎপল। ছবি, ইনিই আমাদের উৎপল কবি। তোমারই কাব্য-আলোচনা করছিলাম আমরা। বসো এই চেয়ারটায়।"

॥ তেরো ॥

যে পথ দিয়ে কোনো কাজের লোক বাজারে যায় না সেই পথেই মেঘ-নমিত আকাশের সমস্ত ভ্রূকুটি উপেক্ষা ক'রে সুধীর লক্ষ্যবিহীন হয়ে চলল যেদিকে উৎপল গিয়েছে তার উল্টোদিকে। আজ তার জীবনে এ কি অসম্ভব সংঘটনের দিন এল হঠাৎ! তার একটানা জীবনে এমন অসঙ্গতির অত্যাচার ত কোনোদিন ছিল না। কেন সে যে চারুকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেও দরজায় উৎপলকে দেখে অমন উল্টো কথা ব'লে ফিরে এল, এবং কেন সে যে হঠাৎ অমন একটা মিথ্যা ওজর তুলে বসল, তার কারণ মনের মধ্যে ভাল ক'রে খুঁজে না পেলেও যে অস্ফুট বেদনাটি তার সমস্ত মন আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল সেটিকে সে বেশ অনুভব করতে পারছিল। এই বেদনার উৎস কোন অন্তর্গূঢ় মর্মের গোপন অতলে লুকিয়ে আছে তা কথায় বুঝাতে না পারলেও তার মনে হচ্ছিল আজ চারু যেন কোন অকথিত অঙ্গীকার ভেঙ্গে অক্ষমনীয় কোন অপরাধ করেছে, যে-অপরাধের তুলনা নেই! এরি সঙ্গে তার মনে হচ্ছিল সে যেন আজ ভয়ানক অপমানিত, অত্যন্ত অপদস্থ হয়েচে চারু ও উৎপলের কাছে, তার গোপন অভিসন্ধি ও মিথ্যা ওজর ধরা পড়ে সে যেন অতিশয় ছোট হয়ে গেছে আজ।

"কি সুধীর, মস্ত লোক হলে কি আর রাস্তায় চোখ চেয়ে চলতে হয় না?"

চিন্তায় বাধা পেয়ে সে সামনের গ্যাসের আলোয় দেখলে তার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের একজন সহপাঠী দাঁড়িয়ে। সহপাঠী আবার বল্লে—"চিনতে পারবে কি?"

সুধীর এবার সজাগ হয়ে লজ্জিত হয়ে বল্লে—"অন্ধকারে দেখতে পাইনি ভাই।"

"অন্ধকার যদি থাকে ত তোমার মনে, এখানে ত দেখচি খাসা গ্যাসের আলো। আচ্ছা সে কথা থাক, কিন্তু এ পথে কোথায় যাচ্ছিলে ভাই?"

সুধীর এতক্ষণে বুঝতে পেরেছিল যে অন্যমনস্কভাবে সে যেখানে এসেছে সেখানে কোনো প্রয়োজনেও তার আসবার দরকার ছিল না, এবার কিন্তু মিথ্যা না

ব'লে সে বল্লে—"একটা কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবে এসে পড়েছি ভাই।"

"এই না হলে বড় বৈজ্ঞানিক! কিন্তু কি নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রব্লেম ভাবছিলে ভাই? Industrial India-য় Paper Machinery সম্বন্ধে যা লিখেছে তা পড়ে ত আমরা সবাই অবাক যদিও কলেজেই জানতাম, তুমি একদিন একটা মস্ত লোক হবেই।"

সুধীর এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে বল্লে—"চল ফিরি, তুমি কোন্‌দিকে যাবে।"

"তোমার পথেই যাচ্চি, চল না। সেই পাস ক'রে বেরুবার পর ত আর দেখা হয় নি। এই একবছরে তুমি কত বড একটা লোক হয়ে উঠলে আর আমি করপোরেশনে সামান্য রাজমিস্ত্রী হয়ে আছি।"

"কি এত বড় লোক হয়েছি ভাই?"

সহপাঠী এবার অবাক হয়ে বল্লে—"কি হয়েছ? আমেরিকার "Paper and Pulp" কাগজখানা তোমার প্রবন্ধ-সমালোচনায় কি লিখেছে দেখেছ? কিছু করবার ক্ষমতা না থাকলেও খোঁজ-খবরটা এখনো রাখি। পড়োনি তুমি?"

সুধীর বল্লে—"পড়েছি।"

"তবে?"

সুধীর কোন কথা না ব'লে চলতে লাগল। সহপাঠী নানা কথা বলতে বলতে চলেছিল, হঠাৎ অন্য কথার মাঝে সে জিজ্ঞাসা কল্লে—"সুধীর, তুমি বিয়ে করেছ?"

সুধীর একটু আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—"কেন? না।"

সহপাঠী উল্লসিত হয়ে বল্লে—"করো নি ত! ঠিক করেছ ভাই, কখ্‌খনো বিয়ে করো না। যার জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে তার বিয়ে করার মতো ঝকমারি আর নেই!"

সহপাঠীর এই অহৈতুক বিবাহ-বিদ্বেষে একটু বিস্মিত হয়ে সুধীর বল্লে—"কেন, বিয়ে করলে কি আর বড় হওয়া যায় না?"

সহপাঠী উত্তেজিত হয়ে বল্লে—"কক্‌খনো না কক্‌খনো না, ছেলে মেয়ে বউ সংসার সকলের পেটের ধান্দায় বিব্রত হয়ে থাকলে কি আর অন্য কিছুর সময় থাকে? এই আমি…"বলতে গিয়ে আবার থেমে বল্লে—"তোমার বিয়ে করবার ইচ্ছে টিচ্ছে আছে নাকি?

সুধীরের এ পর্য্যন্ত সেরূপ কোনো ইচ্ছা না হওয়ার স্বীকারোক্তিতে আশ্বস্ত হয়ে সে বল্লে—"তা হলে আর কোরো না ভাই, আমি তোমায় চেয়ে অন্য বিষয়ে অনেক

ছোট, কিন্তু আমার এ উপদেশটি মেনো ভাই। শাস্ত্রের কথা একটুও মিথ্যে নয় জেনো, মেয়েমানুষ সব রকম তপস্যারই বাধা তা জ্ঞানই হোক আর ধর্মই হোক আর ইঞ্জিনিয়ারিংই হোক। এই আমি…"ব'লে আবার থেমে গিয়ে বল্লে—"তোমার কাছে আমরা অনেক আশা করি, নিজেদের দিয়ে ত আর কিছু হবে না।"

তার শেষকালের কথায় এমন একটা করুণ সুর ছিল যে সুধীর তার মুখের দিকে না চেয়ে পারলে না। কলেজে সে কোনোকালে ভাল ছেলে ছিল না কিন্তু অত পরিশ্রম বোধ হয় আর কেউ করত না। এই গাধার মতো রাতদিন খাটবার জন্যে সে কত উপহাসাস্পদই না হয়েছে, কিন্তু তার জেদ একটুও কমেনি। তবু তার পরীক্ষার ফল কোনোকালে ভালো হ'ত না। আজ সেই প্রতিভাহীন সহপাঠীর হাড় বেরুনো জ্যোতিহীন মুখের যেটুকু সে গ্যাসের আলোয় দেখতে পেলে তাতে তার নিজের ব্যথা একটু ভুলে গিয়ে সে ব্যথিত হয়ে বল্লেন দরদের সুরে—"কেন হবে না ভাই?"

"না না সে হবে না, সে কথা ছেড়ে দাও। কিন্তু তুমি আমার কথাটা রেখো। আচ্ছা চল্লুম ভাই, এই পথে আমায় একটু যেতে হবে, তোমাদের সঙ্গে দেখা হলেও মনে একটু আনন্দ হয়, আমি ত…" বলে থেমে "আচ্ছা ভাই, ভুলো না আসি" বলে সে চ'লে গেল!

সুধীর তার নিজের প্রচ্ছন্ন ব্যথার সঙ্গে আর একটি বেদনার ছায়া নিয়ে বাড়ীতে গিয়ে দেখলে টেলিগ্রাম এসেছে—'অনুমোদিত, আমাদের কলকাতার প্রতিনিধির সঙ্গে কাল সকালেই দর-দস্তুর ঠিক করুন।" এ তার সেই গয়ায় পাঠানো মোটার লাঙ্গলের অনুমোদন।

তার পরের কয়েক দিনে সুধীরের নিশ্বাস নেবার, অবকাশও ছিল না। ভাগ্য যখন নির্ম্মম হয় তখন তার নির্ম্মমতা মানুষের কল্পনার সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে যায়, আবার তেমনি যখন সে দেয় তখন সে মানুষের অসম্ভব আশাকেও পরাস্ত ক'রে অপর্য্যাপ্ত দানের প্লাবনে অস্থির ক'রে তোলে। আজ সেই উচ্ছৃঙ্খল দেবতার তার প্রতি এই অকস্মাৎ অজস্র কৃপা-বৃষ্টির ভেতর কোনো দুরভিসন্ধি ছিল কিনা, কে বলবে, কিন্তু এই আকস্মিক অনুগ্রহের প্লাবনে সুধীর যে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল এটা নিশ্চিত।

দশহাজার টাকায় সুধীরের কলের লাঙ্গলের স্বত্ব বিক্রী হবার দুদিন পরেই Indian Engineering লিখলে সুধীরের ফটোসমেত—"We here introduce to our readers Mr. S. K. Sen inventor of the new motor plough. This invention makes a new epoch in the history of

Agricultural industry in India. We hardly ever thought that it was reserved for an Indian to solve the vital problem of agricultural machinery in India to devise a plough suitable to the Indian soil which even Mr. Ford will find hard, if not impossible, to out-do in simplicity and cheapness. We understand that the enterprising Trivedi Co. of Goya made a very cheap bargain.···Mr. Sen is young and India can justifiably expect greater things from this young man of great promise··· অর্থাৎ তেইশ বছরের ছেলের এই উদ্ভাবনী শক্তিতে সবাই বিস্মিত হয়ে গেছেন। তার পরের দিনই কলকাতার এক বিখ্যাত দান-বীর ব্যবসাদার সুধীরের সঙ্গে দেখা ক'রে তাকে পঁচিশ হাজার টাকা তার অনুসন্ধানের কাজ চালাবার জন্যে সাহায্য করতে চাইলেন। সুধীর অনেক ভেবে ও মার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ধন্যবাদের সঙ্গে সে-দান প্রত্যাখ্যান করলে।

তারপর নিজের যন্ত্রাগার স্থাপনের জায়গা অনুসন্ধান করতে ও সমস্ত বন্দোবস্ত করতে সুধীরের খাবার ঘুমোবারও সময় জুটত না। তার জীবনের স্বপ্ন আজ সফল হতে চলেছে। সে সত্যই ছিল অন্তরে শিল্পী, কিন্তু তার শিল্পের ব্যঞ্জনা ছিল চক্রের সাথে চক্রের মিলনের ছন্দে, ইস্পাতের অপরূপ যোজনায়, জড়ের সাথে অগ্নিশক্তির মিলন সঙ্গীতে, অন্ধ জড়শক্তিকে সচেতন সেবক করবার প্রয়াসে। শক্তি-অর্জ্জনের যে বিপুল প্রেরণায় আদিম অণু-জীবাণু সীমাহীন উদ্বর্তনের পথে ঝাঁকে ঝাঁকে জয়-পতাকা উড়িয়ে আজকের এই বিশ্ববিস্ময় মানবে এসে দাঁড়িয়েছে সেই প্রেরণাই ছিল সুধীরের মাঝে উদ্দাম। আজ সভ্য মানুষ রূপকথাতে যে আলাউদ্দিনের দীপ-দৈত্য অনুচরের কল্পনা ক'রেও আনন্দ পেত, সেই বিরাট আজ্ঞাবাহী লৌহ-দানব ছিল সুধীরের স্বপ্ন ও সাধনা। এমনি সব সুধীরদের দুরন্ত জিগীষার ফলেই মানুষ আজ ত্রিভুবনে দুর্জ্জয়, দুরাশা-দাম্ভিক, দুর্লভ জীব।

কিন্তু তিন চারদিনের অত্যন্ত পরিশ্রমের ফলে কতকটা বন্দোবস্ত ক'রে সে যেদিন ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রাম নিতে ঘরে এল সেদিন তার মনে হ'ল অকস্মাৎ, যেন সবই বৃথা, এই সমস্ত উন্নত কর্ম্মের ঘূর্ণিপাকে ঘুরে মরা, এই সমস্ত বিপুল আয়োজন ও অশেষ আন্দোলন সমস্তই নিরর্থক। সমস্ত বিশ্বজয় করলেও যেন মানুষের প্রাণের সব ক্ষুধা মিটে না। সে ঘরের বিছানায় শুয়ে শুয়ে অন্তরের এই অকারণ অস্বস্তির উৎস নিরূপণ করতে চেষ্টা করছিল, মা এসে তাকে একটু বাতাস করতে বসলেন। বাধা দিয়ে সে বল্লে, "না মা, তোমার আর বাতাস করতে হবে না।"

মা পাখা না নামিয়েই বল্লেন, "এমন ক'রে কাজ করলে যে শরীর থাকবে না।"

সুধীর উঠে পাখাটা মার হাত থেকে নিয়ে বল্লে, "তা ব'লে তোমায় এই খাটুনীর পর বাতাস করতে দেব না আমি।"

মা হেসে বল্লেন, "বেশ ত বাবা, একটি বউ আন, তাহলে আমার ত ভাবতে হয় না।"

"আচ্ছা আচ্ছা, তুমি শোও গে যাও।" ব'লে সুধীর পাশ ফিরে শু'ল। সত্যিই যন্ত্রের তপস্যার মাঝে কোনোদিন নারীকে মা ছাড়া অন্য কোনো ভাবে দেখবার কথা তার মনেও হয়নি। আসলে সে বিবাহ সম্বন্ধে নিজের অনুরাগ বা বিরাগ কি আছে, সে বিচার করবারই সময় পায়নি। কিন্তু সেদিনকার সেই সহপাঠীর উপদেশ আজ এই সূত্রে মনে প'ড়ে যাওয়াতে সে একবার নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে পারলে না। সেখানে যন্ত্রলোকের অসীম জটিলতা ও আতিথেয়তাহীনতার মাঝে কি ভীরু প্রণয়দেবতার মুকুল-সুরভি নিমন্ত্রণ-লিপিটি এসে কোনোদিন পৌঁছোয়নি?

আজ সিদ্ধির সমস্ত উল্লাসও যেন বুকের কোন্ কোণের সামান্য একটু শূন্যতা তার কিছুতেই পূর্ণ করতে পারছিল না।

॥ চৌদ্দ ॥

চারুর সব চেয়ে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল নিজেকে। কেন সে ভিখারীর মতো নিজেকে অপমানিত করতে গেল। অধীরদার এই নীরব উপেক্ষা কি সব চেয়ে বড় অপমান নয়? যে চাকরটাকে সেদিন অধীরদা কাজের ক্ষতি করবার জন্য মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে তার চেয়ে বেশী মূল্য কি চারুর আছে অধীরদার কাছে? এই চাকরটার মতোই চারু শুধু তার কাছে যন্ত্র-পূজায় আবশ্যকীয় পরিচারিকা মাত্র নয় কি? তারও সামান্য ত্রুটির জন্যে তাকে অমন ক'রে ভর্ৎসনা করার ও তার পরে তার আসা-যাওয়া সম্বন্ধে এই নির্ব্বিকার ঔদাসীন্যের এই একমাত্র ব্যাখ্যা ছাড়া আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে? সমস্ত ছেলেবেলার স্মৃতি খুঁজে-খুঁজে চারু আজ দেখছিল সেই ত চিরকাল অধীরদার মন দাসীর মতো জুগিয়ে এসেছে, তার নিজের দোষ থাকুক বা না-থাকুক ঝগড়া ক'রে সেই অধীরদার ক্ষমা ভিক্ষা করতে গিয়েছে চিরকাল, অধীরদা কোনদিন তার প্রতি এতটুকু মনোযোগ দিয়ে তাকে সম্মানিত করে নি। তার যন্ত্র-জগতে সেবিকারূপে ছাড়া চারুলেখার তিলমাত্র স্থান ছিল কি? আর সেই অধীরদার মনস্তুষ্টির জন্যে সে কোন হীনতা না স্বীকার করেছে। আজও

যখন অধীরদা তার নিজের কাজে তার অস্তিত্বও বোধ হয় ভুলে গেছে সে তখন কাঙালের মতো গেছ্‌ল তার ক্ষমা ভিক্ষা করতে। তার সত্ত্বজাগ্রত আত্মসম্মান জ্ঞানে আজ বিষম আঘাত সে অনুভব করতে লাগল!

সুনয়নী দেবী ঘরে ঢুকে বল্লেন—"অবেলায় শুয়ে যে, চ' দেখি, বেলফুলের বাড়ী যাই একটু।"

চট করে অশ্রু চিহ্নিত মুখটা মার দিক থেকে ফিরিয়ে চারুলেখা বল্লে—"আমার মাথা ধরেছে, তুমি আর কাউকে নিয়ে যাও মা।"

সুনয়নী দেবী বল্লেন—"মাথা ধরেছে? জ্বর হোল নাকি দেখি, কদিন থেকেই মুখটা শুক্‌নো শুক্‌নো লাগছে।"

"না না জ্বর হয়নি, শুধু মাথা ধরেছে, এখ্‌নি সেরে যাবে।"

"তবে চ'না—বেড়িয়ে এলেই সেরে যাবে।"

চারুলেখা পেছন ফিরেই বল্লে—"আমার ভালো লাগছে না মা যেতে।"

মা একটু ক্ষুব্ধ স্বরে বল্লেন—"বেলফুলের বাড়ী দিনে দশবার যাচ্ছিস, আর আমি একটু বল্লেই যত আপত্তি।" ব'লে আর কোনো সঙ্গীর সন্ধানে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু চারুর নির্জ্জনতা নিরুপদ্রবে ভোগ করা হ'ল না। মা না যেতে-যেতেই চিত্রলেখা ঘরে ঢুকে বল্লে,—"ও চারু! ওমা, দুপুর বেলা ঘুম হচ্ছে যে, ওঠ্‌।" তারপর বিছানায় বসে বল্লে—"এই মাসীমাদের বাড়ী গেলি, আবার এর মধ্যেই শুয়ে পড়লি যে। আমি যাব বল্লুম, তাত কানেই গেল না।" চারুর কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে তার হাতে একটু চিম্‌টি কেটে বল্লে--"চ' নীচে তোমাদের কবি এসে ব'সে আছেন। আমি ত বাপু কবিতার অর্থ একবর্ণও বুঝলুম না, তাই তোকে ডাকতে এলুম, নে ওঠ্‌।"

এইবার চারু মুখ বিছানায় গুঁজেই জিজ্ঞেস কল্লে—"উৎপল দা কতক্ষণ এসেছেন?"

"এই ত তুই আসবার একটু পরেই। অমন করে মুখ গুঁজে শুয়ে আছিস কেন, যাবি না?"

এবার অশ্রু-সজল মুখটা কোনো রকমে একটু মুছে চারুলেখা দিদির দিকে ফিরে মিনতি ক'রে বল্লে-"না আজ আমার মনটা ভারী খারাপ লাগছে, তুমি যাও।"

"তোর আবার মন খারাপ রোগ কবে থেকে ধরল! ও একটু কবিতার টনিক খেলেই সেরে যাবে। দুর্বোধ কবিতার অর্থ হজম করতে আমার যদি মাথা না ধরত

ত তোকে আর ডাকতে আসতুম না,—আর" ব'লে একটু হেসে চিত্রলেখা তার হাতে একটু চিমটি কাটলে।

কিন্তু এই চিমটিটুকুর অকিঞ্চিৎকর ইঙ্গিতটিও আজ কোন দুর্জ্ঞেয় পথ দিয়ে গিয়ে চারুর মনের ব্যথার স্থানে অদ্ভুতভাবে আঘাত করলে চিত্রলেখার ঈপ্সিত অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত দিক দিয়ে।

চিত্রলেখা তখনও সেই চিমটিটুকুর অপ্রত্যাশিত পরিণতি কিছুমাত্র না জেনে ব'লে যাচ্ছিল—"ও ভাষার ভোজবাজির চেয়ে তোমার বধিরদার যন্ত্রের যাদুগিরী ঢের সহজ!" হঠাৎ অবাক হয়ে থেমে সে দেখলে চারুলেখা তার কোলে মাথা রেখে উদ্বেল কান্নার বেগ রোধ করতে না পেরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে!

পলকে নিজের ভাষা-চাতুর্য্যের কথা ভুলে গিয়ে চিত্রলেখা চারুর মুখের ওপর সস্নেহে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা কল্লে—"কি হয়েছে চারু?"

চারুর সমস্ত দেহ কান্নার প্রবলতায় কাঁপছিল। চিত্রলেখার মনে হোল, এ কান্না তো সাধারণ কোনো কান্না নয়। এ কান্নার ভেতর এমন একটা বুক ভাঙা হতাশার আভাস ছিল যে তার কারণ ভাল ক'রে না বুঝেও কি একটা কল্পনা ক'রে চিত্রলেখা অন্তরে শিউরে উঠল। সে জানত এ কান্নার সান্ত্বনা দেওয়া যায় না, এ সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে কোনো ফল হয় না, ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, এমন কান্নার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য মানুষের জীবনে খুব কমই আসে! তাই সে আর কোন কথা ব'লে বোনের মাথাটা কোলের ওপর নিয়ে স্তব্ধ হয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল।

একটা কবিতা উৎপলের মুখ থেকে শোনবার পর চিত্রলেখা উঠে "যাই বাবা, চারু কোথায় গেল দেখে আসি" ব'লে উঠে গেছ্‌ল। তখন থেকে উৎপল সমস্ত কথাবার্ত্তার মধ্যে একটি সজাগ উৎসুক দৃষ্টি অন্নদাবাবুর কাছ থেকে যথাসাধ্য গোপন ক'রে দ্বারের পানে স্থাপন করে ব্যাকুল মনে প্রতীক্ষা করছিল। অন্নদাবাবুই আজ বেশীরভাগ কথাবার্ত্তা কইছিলেন, সে মাঝে-মাঝে দু-একটা ছোটখাট মন্তব্য প্রকাশ করছিল। অন্নদাবাবু বলছিলেন, "আজকালকার ছেলেদের চেয়ে আমাদের কাব্যানুরাগ ছিল একটু সবল গোছের, মৌখিক যুক্তি অনেক সময়েই শারীরিক যুক্তিতে পর্য্যন্ত গড়াত। যাকে আমরা বড় করতুম, একেবারে স্বর্গে তুলে দিতুম, আর যাকে নাবাতুম একেবারে পথে বসিয়ে ছেড়ে দিতুম। কোনো কবির সম্বন্ধে তর্ক করতে-করতে শেষে পরস্পর পরস্পরকে কটূক্তি করবার ক্ষমতা দেখিয়ে তর্কের মীমাংসা হ'ত অনেক সময়। হুইট্‌ম্যান কবি কি কবি

নয় এবং তিনি কবি কি সামান্য মানব-হিতৈষী এই নিয়ে হুইট্‌ম্যানের সপক্ষেও যে-সব যুক্তি প্রয়োগ করা হ'ত তা জানতে পারলে হুইট্‌ম্যান লজ্জায় বোধহয় অধোবদন হতেন। সকলেই অবশ্য এরকম ছিল না, কিন্তু তখন আবার সুধীরের মতন যন্ত্রের সঙ্গীত শুনতে খুব কম ছেলেই পারত। তোমাদের যুগটা যেন আমাদের চেয়ে অনেকখানি আলাদা। তোমাদের বয়সে আমাদের ভাবের উচ্ছ্বাস ছিল জ্ঞানের গভীরতার চেয়ে ঢের বেশী, কিন্তু আজকালকার ছেলেরা যেন জীবনটাকে গোড়া থেকে গম্ভীরভাবে দেখতে শেখে। পৃথিবীটা খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে।"

উৎপল বল্লে—"অনেকে ত আবার বলেন যে, আজকালকার ছেলেরাই সেকালের ছেলেদের চেয়ে বেশী shallow, তারা বড্ড বেশী কথা কয়।"

মাথা নেড়ে অন্নদাবাবু বল্লেন—"ও হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক নিজেকে বড় করে দেখবার প্রবৃত্তি। আজকালকার সাধারণ ছেলে যে সেকালে সাধারণ ছেলের চেয়ে সব শুদ্ধ ঢের বেশী অগ্রসর সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।" তারপর একটু থেমে বল্লেন, "তোমার সঙ্গ পেয়ে আমি যে কি খুশী হই তা বলতে পারি না। সুধীরের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা না থাকলেও তার ও ঘরটিতে ঢুকলেই আমার আনন্দ হয়, কিন্তু ওর অযথা সময় নষ্ট ক'রে বাজে প্রশ্ন ক'রে বিরক্ত করতে ভরসা হয় না। ও বোধ হয় বেশী কোথায় বেরোয়-টেরোয় না!"

অন্নদাবাবুর কথায় মনে মনে এতদিন সুধীরের বাড়ী যাওয়া প্রায় এক রকম বন্ধ করায় ও বন্ধুর প্রতি এতদিনের অনিচ্ছাকৃত অবহেলার কথা স্মরণ ক'রে উৎপল লজ্জিত হয়ে উঠল, বল্লে- "না, ওর পৃথিবীর আর কোনো বিষয়ে বিশেষ আসক্তি দেখা যায় না। ছবি সাহিত্য এ সবে ওর বিশেষ কোনো আগ্রহ নেই, শুধু গানটা ও খুব ভালোবাসে।"

অন্নদাবাবু বল্লেন, "গান না ভালোবেসে যে মানুষ পারেই না। ওহোঃ, তোমায় ত আমার মেয়েদের গান শোনান হয় নি, তুমি রোজ কবিতা শুনিয়ে যাও, আজ একটু গান শোনো।"

অন্নদাবাবু ডাকলেন—"ছবি! চারু!" তারপর উৎপলের দিকে চেয়ে বল্লেন, "ছবির গলায় স্বাভাবিক মিষ্টতা বেশী, কিন্তু গান শিখেছে ভালো চারু।"

কারুর কোনো সাড়া না পেয়ে বল্লেন, "ছবি এতক্ষণ ছিল না এখানে?"

উৎপল বল্লে, "না তিনি ভেতরে চারুকে ডাকতে গেছেন অনেকক্ষণ।"

অন্নদাবাবুর ডাকে দুজনে যখন ঘরে এসে ঢুকল তখন দুই বোনের মুখেই এমন একটা অসাধারণ বেদনার ছায়া ছিল যে অন্নদাবাবু তা লক্ষ্য না করলেও উৎপল লক্ষ্য ক'রে অত্যন্ত বিস্মিত হ'ল।

অন্নদাবাবু বল্লেন, "বা, তোরা রোজ উৎপলকে ডাকিয়ে আনিয়ে বিরক্ত করিস আর ওকে ত একদিন নেমন্তন্নও করলি না···"

উৎপল বল্লে, "বাঃ, কোন্‌দিন আপনারা না খাইয়ে ছেড়েছেন বলুন ত !"

অন্নদাবাবু বল্লেন, "না একদিন উৎপলকে আর সুধীরকে ভালো ক'রে নেমন্তন্ন করতে হবে, কালই হোক না, ক্ষতি কি ?"

চারু হঠাৎ বাধা দিয়ে বল্লে, "কিন্তু অধীরদা ত আসতে পারবে না।"

অন্নদাবাবু বল্লেন, "কেন ?"

"তিনি নতুন কারখানা খুলছেন, তাঁর কাজে ভয়ানক ব্যস্ত, এখন তাঁর সময় নেই।"

"কারখানা খুলছে নাকি সুধীর ?" অন্নদাবাবু ও উৎপল একসঙ্গে ব'লে উঠলেন।

"আমি জানি সুধীর সাধারণ ছেলে নয়। কিন্তু তা হলে আর ওকে এখন বিরক্ত ক'রে কাজ নেই। উৎপল, কালই তোমার নেমন্তন্ন রইল বাবা এখানে"—তারপর মেয়েদের দিকে ফিরে বল্লেন, "আজ উৎপলকে একটু গান শুনিয়ে দাও ত মা। এস ছবি।"

ঘরের কোণের অর্‌গ্যানটায় ব'সে চিত্রলেখা গাইলে—

"মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ,
তোমায় করিগো নমস্কার···"

উৎপল বল্লে, "আপনার গলা খুব মিষ্টি ত !"

অন্নদাবাবু বল্লেন, "ওর গলা খুবই ভালো, কিন্তু ও ত আর ভালো ক'রে শিখতে পারলে না। এইবার তুমি একটা গাও ত মা।"

চারু অর্‌গ্যানে ব'সে জিজ্ঞেস কল্লে—"কি গাইব বাবা ?" প্রশ্নটা যেন অত্যন্ত করুণ শোনালে।

অন্নদাবাবু বল্লেন—"তোমার যেটা ভালো লাগে – না হয় একটা হিন্দুস্থানীই গাও।"

চারুলেখা খানিকক্ষণ 'কি'গুলো নাড়াচাড়া ক'রে গাইলে···"ওহে নিষ্ঠুর ফিরে এস···"

গান শেষ না-হওয়া অবধি উৎপলের তন্ময়তায় এমন একটি নিবিড়তা ছিল যে অন্নদাবাবুও তা লক্ষ্য না ক'রে পারলেন না এবং চিত্রলেখা সে তন্ময়তা শুধু গানের দরুণ নয় বুঝতে পেরে চারুর সম্বন্ধে তার দুর্ভাবনার একটা কিনারা পেয়ে অত্যন্ত আশ্বস্ত হ'ল।

উৎপল বিদায় নিয়ে গেলে চিত্রলেখা চারুকে একলা পেয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে তাকে চুমু খেয়ে বলে, "দুষ্টু মেয়ে, দিদি কিছু বুঝতে পারে না, না?"

॥ পনেরো ॥

লেখাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে উৎপল অপরূপ ভুবনের সুষমা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। মেঘলা আকাশের ঘোলাটে থমথম্ কেটে গিয়ে অশেষ নীলিমার স্বপ্ন পারাবার উতল হয়ে উঠেছে, তার মুখের পানে চেয়ে জ্যোতির অভিনন্দন পাঠাচ্চে নক্ষত্রপুঞ্জ, নগরীর ধূলি-চিহ্নিত পথ তার পায়ের নীচে জল-তরঙ্গের গৎ হয়ে বেজে চলেছে, প্রকৃতির বাণীকে এমনভাবে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে উৎপল আর কোনো-দিন অনুভব করেনি এ জীবনে। সে ভাবছিল, সত্যিই সে কবি, সুন্দর, ধরিত্রীর বুকের দুলাল, দেবতা, সে নিজেকেই যেন নিজে চিনে উঠতে পাচ্চিল না।

রাস্তার মোড়ে একটা ভিখারী করুণস্বরে ভিক্ষা জানাচ্ছিল, অন্যদিন হলে উৎপল লক্ষ্য না করেই চ'লে যেত, কিন্তু আজ তার মনে হচ্চিল এ প্রার্থনাটি এড়ালে তার অন্তরের আনন্দ দেবতাকে অপমান করা হবে, সে তার পাঞ্জাবীর পকেট উজার ক'রে সমস্ত কিছু ঢেলে দিলে ভিখারীর হাতে। ভুবনেশ্বর অক্লান্ত দানের বর্ষায় তাকে ধন্য করেছেন, তাঁর দানের অমৃতের একটি কণাও বণ্টন ক'রে দিতে না পারলে সে দানের মর্য্যাদা থাকে কৈ? রাস্তার ধারের 'ডাষ্টবিন' ও 'গ্যাস্‌পোষ্ট' তার দিকে চেয়ে যেন বন্ধুর মতন হাসছে ও তাদের আনন্দ জানাচ্চে। তার চুলে রাতের সুস্নিগ্ধ বাতাসটি আদরে দোল খাচ্চিল, ও তার সমস্ত গায়ে হাত বুলিয়ে যেন বলছিল—খুশী হয়েছি। দিশাহারা হয়ে আপন আনন্দে সে পথ চলছিল, হঠাৎ অন্ধকার একটি গলির মোড়ে গ্যাসের তলায় সে একটি নারীকে দেখে চমকে উঠল। অন্যদিন হলে সে হয়ত ঘৃণায় মুখ সরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চ'লে যেত, কিন্তু আজ সে সামনে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ তার মুখখানি দেখলে, কার যেন অপরাজিতার মতো স্নিগ্ধ সুন্দর মুখের আদল ফুটে উঠছে এ ম্লান দুঃখী মুখের ছায়ায়! সে অন্তরে-অন্তরে এই রহস্যময়ী অভাগিনীকে প্রণাম ক'রে পথ চলল।

হঠাৎ একটা চলন্ত দ্রুত মোটর গাড়ী পথের ঠিক ঠাহর করতে না পেরে রাস্তার একটা কুলির গায়ের ওপর হুড়মুড় ক'রে প'ড়ে তাকে দলিত নিষ্পেষিত ক'রে খানিকটা এগিয়ে থেমে পড়ল। মুহূর্ত্তে একটা অতি কান্নার রোল একটা বীভৎস চীৎকার এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট জনতা জমে গেল নির্য্যাতিত লোকটিকে ঘিরে। বেচারী পথিকটি নিশ্চিন্তচিত্তে পথ অতিক্রম করছিল, তার

ওপরে এ কি অন্যায় ভয়ঙ্কর উপদ্রব। যন্ত্রের একি ক্রূর বীভৎসতা—নিষ্ঠুর অত্যাচার! তার মনে পড়ল তার বড়দার বাঁশীটির কথা। এমন রাতে তিনি হয়ত নিরালায় ব'সে সেটি বাজাচ্ছেন। সৌন্দর্যশিল্পীর হাতের এ বাঁশীতো কাউকেও মারে না, বরং সবাইকে খুশী ক'রে তোলে! উৎপলের মন ব্যথায় ভারী হয়ে উঠল, জনতা ঠেলে মুমূর্ষুকে দেখবারও তার ক্ষমতা ছিল না, সে আবার তেম্‌নি পথ চলল।

এই সূত্রে হঠাৎ তার মনে প'ড়ে গেল যন্ত্র-তান্ত্রিক সুধীরের কথা। লেখাদের বাড়ীতে অন্নদাবাবুর সঙ্গে কথায়-কথায় সুধীরের কথা উঠলে সে মনে মনে স্থির করেছিল একবার সুধীরের যন্ত্র-ধ্যানে একটু গোলমাল বাধিয়ে সে আসবেই। কিন্তু এই আকস্মিক উৎপাতের পরে সুধীরের ওপর কেন যেন ভারী রাগ হতে লাগল। সে এমন কি একটু বিচার ক'রে দেখবার ধৈর্য্য পর্য্যন্ত পেলে না, এ অকারণ ক্রোধ কেন? তার শুধু মনে পড়ল অনেকদিন আগের সেই অশ্রু-ভারাতুর কালো দুটি চোখের অপরূপ একটি কাকুতি, সেই ব্যথা-গভীর মুখের ক্লান্ত ম্লান কান্তিটি। তার মনে হোল ঐ মুখে ব্যথার ছাপ দেগে দেবার জন্যে অপরাধী সুধীর। তার আরো মনে হোল, যেদিন লেখা তাকে অযাচিত আনন্দে চমকে দিয়ে সুধীরের ঘর থেকে টেনে নিয়ে যায়, সেদিনকার তার সেই অদ্ভুত ব্যবহারে সুধীরের কঠোর নিষ্ঠুরতা বা মর্ম্মহীন ঔদাসীন্যের আভাস প্রচ্ছন্ন ছিল। তারপর উৎপল যে লেখাকে এক গভীর লজ্জা থেকে বাঁচালে সেটা লেখার অপমানিত বা প্রত্যাখ্যাত হবার লজ্জা থেকেই বাঁচানো। যাকে সে অসীমের অভিব্যক্তি ব'লে কল্পনা ক'রে পূজা করে তাকে কেউ তাচ্ছিল্য বা ঘৃণা করে এমন আস্পর্দ্ধা সহ্য করতে সে কিছুতেই পারছিল না। সুধীরের মুখে লেখার নামের সে অসভ্য বিকৃত উচ্চারণটা পর্য্যন্ত তার কাছে অসহ্য লাগছিল, ঐ শব্দটা যেন তার প্রাণহীন যন্ত্র-রাক্ষসের একটা কর্কশ আওয়াজ! ...বিভিন্ন চিন্তার দোলায় দুলতে-দুলতে উৎপল যখন দর্জ্জিপাড়ায় তাদের বাড়ী এসে পৌঁছল তখন তার 'রীষ্টওয়াচে' বারোটা বেজে গেছে।

নীচের ঘরে ন-দা পার্ট মুখস্থ করছিলেন চেঁচিয়ে, তার সেজদা তাই শুনছিলেন ও দু-একটা নতুন ভঙ্গীর ইসারা দিচ্ছিলেন। উৎপল ঘরে ঢুকতেই সেজদা চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন—"এই যে উৎপল! কোথায় ছিলি এতক্ষণ? আমরা তো ভেবে ভেবে হায়রান।"

ন-দা হেসে বল্লেন—"পথে কিছু মিলেছিল নাকি কবিতার খোরাক?"

উৎপল হেসে বল্লে,—"সত্যি ন-দা, কোহিনুরের সন্ধান পেয়েছি, আলাদীনের প্রদীপ।"

"এঁ্যা! সত্যি? কেল্লা মার দিয়া! কোহিনুর? গলায় পড়চিস কবে রে?"

"এ থিয়েটারের রিহার্সাল হয়, সত্যি!"

উৎপলের গলার স্বর শুনে মেজদা এসে বল্লেন—"ভাত একেবারে জুড়িয়ে গেছে। খাবি চ, তুই আসিসনি ব'লে আমরা কেউ এখনো খাইনি!"

সেজদা বল্লেন—"আর উৎপলের খাওয়া মেজদা! একেবারে কোহিনুরের অধীশ্বর, জাহাঙ্গীর।"

উৎপল বল্লে—"বেশ, কোহিনুর পেলে বুঝি আর ক্ষিদে পেতে নেই? এসো তোমরা…" বলে চলতে যাচ্ছিল, মেজদা তার হাত ধ'রে বল্লেন—"কি উৎপল, একেবারে আমাদের ডিঙিয়ে?" উৎপল হেসে বল্লে—"পাগল হয়েচ মেজদা? শুধু সন্ধান পেয়েচি মাত্র, কিন্তু জান, সে সাত রাজার ধন একমাণিক, তাকে কি অম্নি হাত পাতলেই পাওয়া যায় কখনো?" ব'লে ওপরে চ'লে গেল।

ন'দা পাটের তাড়াটা টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে বল্লেন—"রইল আমার রিহার্সাল! আজ উৎপলের কবিতার ভক্ত সেজে তারিফ বাহবা দিয়ে আস্তে-আস্তে নাম-ধামটা জেনে নিতেই হবে।" তার বসবার থিয়েটারী ভঙ্গীতে সবাই হাসতে লাগল।…

সুষুপ্ত বিভাবরী তখন অন্ধকার ভবিষ্যতের মতো নিথর নিস্পন্দ অনিশ্চিত নিরপেক্ষ হয়ে আছে—ধরণী ও আকাশের অন্তহীন অক্ষুব্ধ তিমিরে আচ্ছন্ন ক'রে।

॥ খোলস ॥

ছাই রঙের দামী একখানা শাড়ী পড়ে, দরজার কাছে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চারুলেখা কাঁধের কাছে আঁচলে ধারের কাপড়গুলি সেফ্‌টিপিন দিয়ে আঁটবার বৃথা চেষ্টা করছিল খানিকক্ষণ ধ'রে। এমন সময় বিলিতি জুতোর মশ্‌মশ শব্দ করতে-করতে উৎপল সেখানে এসে হাজির হোলো। উৎপলের এ-বাড়ীতে গতিবিধির এখন আর কোনো নিষেধ—কোনো অবরোধ নেই।

উৎপলকে আসতে দেখেই চারু একটু গিয়ে এসে মিষ্টি সুরে বল্লে, "আঁচলটা সেফ্‌টিপিন দিয়ে এঁটে দিন না উৎপলদা, আজ সকালে বঁটিতে বাঁ হাতের আঙুলটা কেটে ফেলচি, একহাতে পাচ্ছি না আঁটতে।"—ব'লে সে তার সুঁচলো রাঙা চাঁপার পাপড়ির মতন সুন্দর আঙুলটি উৎপলকে দেখালে।

উৎপল আরো এগিয়ে এসে বাঁ হাতে শাড়ীর আঁচলটা ধ'রে সোনার সুদৃশ্য

সেফ্‌টিপিনটা তাতে আঁটবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু প্রায় দু মিনিট কসরৎ ক'রেও পেরে উঠল না। তার সমস্ত দেহ রক্তের প্রলয়ে কাঁপছিল। লেখার চুলের গন্ধ ও বুকের নিশ্বাসটির সে ঘ্রাণ পাচ্ছিল, কে যেন তার বুকে এসে আনন্দের মৃদঙ্গ বাজিয়ে চলেছে তাকে চঞ্চল উন্মত্ত ক'রে। সে যে দুর্জ্জয় ধূর্জ্জটিকে আকাশের মেঘাচ্ছন্ন বন্ধুর পথে ধ্বংসের অভিসারে যাত্রী হবার কল্পনা করেছিল সেই প্রলয়ঙ্কর মহেশ্বর আজ যেন অবতীর্ণ হলেন তার শিরা-উপশিরার পথে-পথে।

চারু হেসে বল্লে—"যান, আপনি কোনো কর্ম্মের নন। একটা সেফ্‌টিপিন আঁটতে পর্য্যন্ত শেখেন নি। কবিগুলো কোনো কাজে আসে না। অধীর-দা হলে আর কিছু না হোক কাঁধে একবার সেফ্‌টিপিনের খোঁচাটা অন্ততঃ লাগিয়ে দিতেন। যাই দিদির কাছে। বসুন, মা চা আনচেন।" ব'লে চারু চ'লে গেল।

বেশীদূর যেতে হোল না, সামনে দাঁড়িয়ে চিত্রলেখা চারু আর উৎপলকে দেখছিল। চারু আসতেই চিত্রলেখা সুস্পষ্ট অর্থপূর্ণ একটি হাসির ইসারা করল। সে ইসারাটি চারুলেখা বুঝতে পেরে গম্ভীর হয়ে গেল। এ সুন্দর গাম্ভীর্য্যে খুশী হয়ে চিত্রলেখা বল্লে—"দে, আমি লাগিয়ে দিচ্চি।"

চিত্রলেখা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল পরস্পরের সান্নিধ্যের স্বাদানুভব ক'রে দুজনেরই মুখ আনন্দময় ব্রীড়ায় রাঙা হয়ে উঠেছে,—উৎপলের মুখে ধ্যানীর তন্ময়তা, সাধকের নিবিড়তা, আর চারুর দুইটি চোখে ললাটে কপোলে অপরূপ লাবণ্যময় হ্রী ও শ্রী মাখানো! চিত্রলেখার বুক তৃপ্তিতে ভরে গেল, চারু ও উৎপলকে সে নতুন মহিমায় মহিমান্বিত ক'রে দেখলে।

মুখে হাসি টেনে আবছা গলায় সে বল্লে,—"দুটি হাতের স্পর্শের চাইতে সেফ্‌টিপিনের খোঁচা বুঝি বেশী ভালো, বোকা মেয়ে?"

চারুর মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুল না, শুধু তার মুখের গাম্ভীর্য্যের ছায়াটি আরো নিবিড়তর হয়ে এল।

চিত্রলেখা বল্লে—"যা বাবাকে বল গে যা, ট্যাক্সি আনাতে কাউকে দিয়ে। আমি যাচ্ছি, মা উৎপলের চা নিয়ে যাচ্ছেন, যা।"

চারু নীচের থেকে ঘুরে এসে বল্লে—"বাবা যাবেন না বলচেন দিদি। বল্লেন, উৎপল একাই নিয়ে যেতে পারবে।"

পাশের ঘরে চা খেতে খেতে উৎপল চারুলেখার মুখে তার নামের এই পদবীবিহীন উচ্চারণটি শুনে ভারী খুশী হোল।

চারু ঘরে এসে হেসে বল্লে—"নিয়ে যেতে পারবেন একলা? বাবা যাবেন না বলচেন।"

উৎপল গম্ভীর হয়ে বল্লে—"কি জানি, কবি মানুষ, যদি ভাবের ঘোরে চিৎপাত হয়ে পড়ে যাই মোটরের তলায়।"

"আপনিও আর সবাইর মতন রাগ করেন দেখছি। না না, আপনি খুব পারবেন, সব পারেন, ভালো পারেন। হল ত?" ব'লে আঁচলের একটা ঘূর্ণি দিয়ে সে চলে গেল।

ট্যাক্সিটা এলে চিত্রলেখা চালাকি ক'রে আগে উঠে প'ড়ে এক ধারে গিয়ে বসল; তারপর উঠল চারু। উৎপল ইতস্ততঃ করছিল, অন্নদাবাবু বল্লেন, "উঠে পড়।"

উৎপল ড্রাইভারের পাশে বসতে যাচ্ছিল, চিত্রলেখা বললে—"সে কি! এখানে আসুন।" ব'লে চারুকে নিজের কাছে একটু টেনে নিলে। উৎপল চারুর পাশে বসলে চিত্রলেখা চারুর কব্জিতে ছোট একটু চিমটি কাটলে।

অন্নদাবাবু ড্রাইভারকে বল্লেন—"পিকচার প্যালেস।"

মোটর ছুটল, আপন চিন্তায় বিভোর উৎপল ও লক্ষ্যহীন চিত্রলেখা কেউ দেখতে পেলে না, কিন্তু সন্ধান-তৎপর চারুলেখা দেখতে পেলে তার মুখের ওপর তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধ-দৃষ্টি হেনে ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তার অধীরদা। তার বুকের সমস্ত রক্ত যেন একবার থম্‌কে দাঁড়াল। যে খুশীর মায়াপুরীটি নিজ মনে সে গ'ড়ে তুলেছিল এতক্ষণ ধ'রে, তা যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল এক নিমেষে। তার কিছু আর ভাল লাগল না, 'কুগান' ফিল্মের সত্যজাগ্রত মোহটা তখুনিই মিলিয়ে গেল আকাশে।

কাল হাজার চেষ্টা ক'রেও চারুর ঘুম হোল না, আজ সকালবেলা থেকে উঠে তার ভারী দুর্ব্বল লাগছিল। আজ দিদি চ'লে যাবে ভোরে। চারু খাটের ওপর চুপ ক'রে বসেছিল, আবার অকারণ তার দুই চোখের কোণে শিশিরের মতো অশ্রু জ'মে উঠছে! চিত্রলেখা চ'লে গেলে কি ক'রে তার দিন কাটবে? না—দিনগুলি কাটবে না আর। চারুলেখা নীচে দরজার গোড়া পর্য্যন্ত দিদিকে এগিয়ে দিয়ে গড় হয়ে তাকে প্রণাম করলে। চিত্রলেখা ছোটবোনকে সস্নেহ আদরে বুকে জুড়িয়ে ধ'রে মা-বাবার একটু আড়ালে টেনে নিয়ে তার অশ্রুভরা চোখে একটি চুমু দিয়ে অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখে বল্লে—"উৎপলের প্রেমকে কোনো দিন তাচ্ছিল্য করিসনি চারু। জগতে এ-রকম ভালোবাসা একেবারে দুর্লভ।

॥ সতেরো ॥

মা যখন কথায়-কথায় বল্লেন, চারু সেদিন সুধীরকে খুঁজতে এসেছিল এ-বাড়ী, বেচারী দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে বাসি ফুলের পাপ্ড়ির মতন, তখন সুধীর সকল অবসাদের আলস্য থেকে এক ঝট্‌কায় উঠে প'ড়ে মার মুখের পানে চেয়ে বেদনার্ত্ত তীব্র কণ্ঠে শুধোলে—"আমায় এতদিন জানাও নি যে সে-কথা ?"

মা ছেলের এই অদ্ভুত তীক্ষ্ণ কটু কণ্ঠ শুনে মনে মনে একটু আশ্চর্য্য হলেন। তিনি বুঝতে পাচ্ছিলেন, সুধীরের এই চাঞ্চল্য ও অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের মূলে শুধু কারখানার উদ্বেগই ছিল না, কি যেন একটি সুগোপন বেদনা তাকে নিরন্তর পীড়িত করছে। তিনি ভাবলেন, হয়ত চারুর সঙ্গে সুধীরের কোনো ঝগড়া হয়েছে, নইলে যে-চারু দিনে চার-পাঁচ বারের কম আসত না, সে এখন কদাচিৎ আসে এখানে, আর উৎপলও আসে না আজকাল। মা সুধীরের এই অস্বস্তির কারণ অনুসন্ধান করতে যাচ্ছিলেন, সুধীর আবার কর্কশকণ্ঠে বল্লে, "আমি বুঝি সংসারের কেউ নই, আমাকে খবর দেবার কিছুই দরকার বোঝ না তুমি !"

মা বল্লেন, "এ আবার এমন কি কথা যে তোকে ছুটে গিয়ে তক্ষুনিই বলতে হবে ?"

"না, এ দরকারী হতে যাবে কেন, দরকারী কথা হবে তোমার কার বাড়ীতে বেড়াল-ছানা মরল, কোন্ বাড়ীর বৌ শুক্তোতে লঙ্কা দিয়েছে ?"

মা সুধীরের এই অদ্ভুত ধরণের কথা কওয়া শুনে হাসি চেপে বল্লেন, "তুই তখন কারখানা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলি যে তোকে তখন বাড়ীতে প্রায়ই পেতুম না, মনেও ছিল না আমার।"

সুধীর খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল, পরে খাট থেকে নেমে জুতো পরতে সুরু করলে। মা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বল্লেন, "এই রোদ্দুরে আবার কোথায় যাচ্ছিস ? চারুদের বাড়ী ?"

সুধীর জুতোর ফিতে বাঁধতে-বাঁধতে বল্লে, "বয়ে গেচে আমার ওর বাড়ী যেতে। আমি চল্লুম কারখানায়।"

"কারখানায় ? এই তো এলি সেখান থেকে। একটু জিরিয়ে যা, এরকম করলে অসুখ করবে যে ভারী !"

তিক্ত কণ্ঠে সুধীর বল্লে, "করুক গে অসুখ। আমার কারখানায় অনেক কাজ প'ড়ে আছে, না গেলেই নয়।"

মা পেছন থেকে বল্লেন, "বিকেলের খাওয়াটা খেয়েই না হয় যেতিস। অনেক-দিন উৎপল আসে না, আজ আসবে হয়ত।"

"উৎপল এলে আসবে, আমার তাতে কি?"—ব'লে সুধীর তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল।

কিন্তু সে ঠিক কারখানার উল্টো পথে হাঁটতে সুরু করলে, তার মগজে চিন্তায় জট বেঁধে গিয়েছে। চারু সেদিন তাকে খুঁজতে এসেছিল কেন, এমন কি কথা তার বলবার আছে? সুধীর নানা প্রশ্ন ক'রেও কোনো উত্তর পাচ্ছিল না। আরো ভাবছিল, উৎপলটা আর আসে না কেন? চারু না হয় আজকাল একটা প্রকাণ্ড লোক হয়ে পড়েছে যে তাকে একটু বক্‌লে বা রেগে কথা কইলে সে রাগ ক'রে আর ঘরে আসে না, কিন্তু বন্ধু উৎপলের প্রতি সে কি অপরাধ করেছে? তার কোন্ অপরাধের শাস্তি দেবার জন্য উৎপল আর চারু একসঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে এই নিষ্ঠুর ধর্ম্মঘটের আয়োজন করেছে? সুধীর রাস্তার যন্ত্রের আর্ত্তনাদ থেকে নিজের চিন্তার ধারার সংযম রাখতে একটা নির্জ্জন পার্কে ঢুকে পড়ে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। হঠাৎ তার মনে পড়ল সেই স্বল্পান্ধকার গলিটার মোড়ে সেদিন উৎপলের সেই আনন্দোজ্জ্বল দীপ্ত দুটি চোখ আর সেই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চারুর সেই বিদায়-ব্যথাতুর উদাসীন মূর্ত্তিখানি! চারুর হাতে যে একখানি বাঁধানো খাতা ছিল সেটি পর্য্যন্ত সুধীরের চোখ এড়ায়নি। অনেকদিন তার যন্ত্র-যাদুঘরে উৎপল ওই মোটা সুদৃশ্য খাতাটি এনে তার কবিতা আওড়ে তার ধ্যান ভাঙবার বৃথা চেষ্টা করেছে, এই খাতাটিকে সুধীর বেশ চিনত। সেই খাতাটি সুধীর কতদিন দেখতে চেয়েছে, বলেছে 'আমার এই জলন্ত আগুনের বয়লারেই এর স্থান'—কতদিন কবিতাগুলি পড়বে বলে অনুনয় করেছে, কিন্তু উৎপল তার হাতে তা দ্যায়নি, বলেছে—'এই যন্ত্র কাপালিকের হাতের ছোঁয়া লেগে আমার কাব্য নোংরা হয়ে যাবে'—সেই কবিতার খাতাটা চারুর হাতে! অকস্মাৎ চারুর প্রতি নিরুদ্ধ অভিমানের বেগ জলন্ত অগ্ন্যুৎপাতের মতন ক্ষেপে উঠে একেবারে উৎপলকে গ্রাস ক'রে বসল। সুধীর ভাবলে—সমস্ত অপরাধের মূলই হচ্ছে এই উৎপল। সে নানা চাতুর্য্য ও লীলা-কৌশলের আয়োজন ক'রে তার ও চারুর মধ্যে এই বিচ্ছেদের প্রাচীর গেঁথেছে। কথার কাঙাল তরলমতি মেয়েটা হয়ত উৎপলের ভাষার ও ভাবের ফানুসে, কথার বর্ণজালে বন্দী হয়ে রয়েছে, তাইতো চারু আর আসে না, উৎপল তাকে আগলে রেখেছে। তার সমস্ত মন উৎপলের প্রতি আক্রোশে ফুলে উঠল। সেদিন উৎপল চারুকে ভালো লাগে বললে সুধীর ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দিয়েছিল, এখন সে যা উপলব্ধি করতে পারলে তাতে রেগে ক্ষেপে উঠবার তার যথেষ্ট কারণ

আছে। তার খালি এই কথাই মনে পড়ছিল, উৎপল দস্যুর মতো তার ঘরে ঢুকে জোর ক'রে তার সর্ব্বস্ব হরণ ক'রে নিচ্ছে, সে দুর্ব্বল বলেই তো তাকে বাধা দিতে পাচ্ছে না। না, সুধীর হঠাৎ বেঞ্চিটার থেকে উঠে পড়ল। সে ভাবলে, এখুনি চারুদের বাড়ী গিয়ে এর একটা পরিষ্কার বোঝাপড়া করে নিতে হবে, আজ সে কোন কারণেই ফিরে আসবে না, আসবে না।

দিনের আলো তখন ঢলে পড়েছে আকাশের পশ্চিম ধারটাতে। সুধীর মনে মনে একটি স্বস্তি অনুভব করতে করতে চারুদের বাড়ীর মুখে পথ চলল। এই পথটা তার ভারী আরামে কেটে গেল, যন্ত্রের কোলাহল স্নিগ্ধ আলোর মায়ার সঙ্গে তার চিন্তা-তপ্ত মনে যাদুদণ্ডের মোহ-স্পর্শ বুলিয়ে দিল। কিন্তু চারুদের বাড়ীর সামনে রাস্তায় নামতে-না-নামতেই যে-দৃশ্য তার চোখ ধাঁধিয়ে টাটিয়ে দিল সে দৃশ্যের নিষ্ঠুর উপহাসের আর যেন তুলনা নেই। উৎপল চারুকে দামী সিল্কের শাড়ীতে সাজিয়ে পাশে বসিয়ে মোটরে ক'রে হাওয়া খেতে যাচ্ছে! একটা বিরাট মুষলের ঘা এসে তার বুকে বাজল, তার দৃঢ় দেহের মাংসপেশীগুলো বিপুল বেদনায় টন্‌টন্ করে উঠল। বজ্রাহতের মতন খানিকক্ষণ বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে তার সমস্ত দেহে ক্রোধের আগুন লেলিহান হয়ে উঠল। তার ইচ্ছা হোল ছুটে গিয়ে মোটরটাকে টেনে ধ'রে এক ঝাঁকানিতে উৎপলকে গাড়ী থেকে নামিয়ে তাকে তীব্র তপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে—চারুকে পাশে নিয়ে এমন করে বেড়াতে যাবার তার কি অধিকার আছে,—কিসের দাবী?

॥ আঠারো ॥

সুধীর কারখানাতেই গেল। মিস্ত্রীরা তখন জামা কাপড় ঝেড়ে ঘরে ফেরবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। দরোয়ান সেলাম ক'রে বল্লে—"আপনার জরুরি চিঠি এসেছে, আমি ত আপনার বাড়ীই যাচ্ছিলুম চিঠি দিতে।"

অন্যমনস্কভাবে চিঠিটা হাতে নিয়ে সুধীর আফিস-ঘরে গিয়ে বল্লে—"আমি এখন কিছুক্ষণ এখানে থাকব, কারখানা খোলা থাক।"

চেয়ারে তার শিথিল দেহ এলিয়ে দিয়ে সে নিজেকে এতদিন বাদে একবার ভাল ক'রে বুঝতে চেষ্টা করছিল। বাইরের জগতের বিক্ষিপ্ত মনকে একবার অন্তরে সংগ্রহ ক'রে আপনাকে চিনতে চেষ্টা করলে। যতদিন সে পৃথিবীর জড়শক্তি জয় করবার প্রয়াসে তন্ময় হয়ে ছিল ততদিন তার অন্তর যে ভুখা হয়ে হাহাকার করছিল

কেন, তা সে আজ প্রথম যেন ভাল ক'রে ধরতে পারলে। একজন মিস্ত্রী এসে বল্লে, —"বাবু, আবদুল ত মারা গেছে; আরেকজন হেডমিস্ত্রীর দরকার।"

সুধীর বল্লে "আচ্ছা, যাও!"

মিস্ত্রী তবু খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার বল্লে,—"কলের করাতের কাজ আজ আর কিছু করতে পারিনি।"

সুধীর এবার রেগে উঠে বল্লে,—"কেন পারনি, তোমাদের কি ব'সে থাকবার জন্যে মাইনে দিই?"

মিস্ত্রী সন্ত্রস্ত হয়ে বল্লে,—"আবদুল নেই, তা ছাড়া 'লেদের' একটা 'লিভারে' ভয়ানক 'জাম' ধ'রে গেছে, লিভার কিছুতেই—"

সুধীর তার কথা শেষ না হতে দিয়েই ধমকে বল্লে,—"মাথা আর মুণ্ডু হয়েছে! তোমরা এতগুলো লোক কি করতে ছিলে এখানে?"

মিস্ত্রী সভয়ে বল্লে,—"আজ্ঞে সেটা এমন কোণের দিকে যে দু'জনের বেশী দাঁড়ান যায় না, আমরা ত কত চেষ্টা করলুম।"

সুধীর উঠে বল্লে,—"চল, কি হয়েছে দেখি।"

অন্যান্য মিস্ত্রীরাও সেখানে জড় হয়েছিল। তারাও সুধীরকে 'লিভার' টেনে ছাড়াতে উদ্যত দেখে বল্লে,—"ও হবেনা হুজুর, আমরা সবাই অনেক চেষ্টা করেছি।"

একটা হেঁচ্‌কায় লিভারটাকে মুক্ত ক'রে সুধীর বল্লে,—"ছাই করেছ! আর গায়ের জোর ছাড়া অন্য পথ কি ছিল না?"

মিস্ত্রীরা অবাক হয়ে মুখ-চাওয়া-চায়ী করছিল। একজন বল্লে,—"আজ্ঞে আবদুল নেই ব'লে আমরা কলকব্জা কি নষ্ট হয় ভয়ে অন্য কিছু খুলতে সাহস করিনি!"

সুধীর তাদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—"আবদুল নেই কি রকম?"

সেই মিস্ত্রীটি তখন বল্লে,—"আপনাকে ত বল্লুম হুজুর আবদুল মারা গেছে।"

হঠাৎ সুধীরের মাথার চুল কে যেন সবল মুঠিতে ধ'রে তাকে এক বিষম নাড়া দিয়ে সচেতন ক'রে তুললে। কালও যে সদাহাস্যময় তরুণ বুদ্ধিমান মিস্ত্রীটি উৎসাহের সঙ্গে কাজ ক'রে গেছে, আজ সে নেই!

সুধীর অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বল্লে—"মারা গেছে?···কালও ত সে এসেছিল, না?"

—"আজ্ঞে হাঁ, আজ সকালে রেলের লাইনে গলা দিয়ে সে আত্মহত্যা করেছে।"

সুধীরের মনে হল অসম্ভব! ওই মিস্ত্রী মুসলমান যুবকটির বুদ্ধির প্রাখর্য্যে, তার কর্ম্মপটুতায়, তার সুগঠিত দেহের সবল পৌরুষে সত্যি সুধীর তাকে সব চেয়ে বেশী ভালবাসত। সেই সদানন্দময় যুবক আত্মহত্যা করবে কি দুঃখে?

সে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কেন?"

আবদুলের পাড়ায় যে-মিস্ত্রীটি থাকত, সে বল্লে,—"আজ্ঞে ওর একজনের সাথে 'নিকা' হবার কথা হচ্ছিল, সব ঠিকঠাক হয়ে গেছ্‌ল, আর পনেরোদিন বাদে 'নিকা' হবে, হঠাৎ সেই ছুঁড়িটা কাল দুপুরে আরেক জনের সঙ্গে পালিয়ে গেছে।"

সকলেই ব'লে উঠল—"শুধু এই জন্যে?"

বক্তা মিস্ত্রীটি বল্লে—"আর ত কোন কারণই জানা যায়নি! আবদুল ছুঁড়িটাকে বড্ড ভালবাসত..."

সুধীর নীরবে গিয়ে তার চেয়ারে ব'সে পড়ল। আবদুল সম্বন্ধেই আলোচনা করতে করতে একে একে মিস্ত্রীরা তাকে সেলাম ক'রে চ'লে গেল। অন্ধকার হয়ে এসেছিল, তবু তার ঘরের বাতি জ্বালাতে ইচ্ছা হল না। করোগেটের টিনে ছাওয়া প্রকাণ্ড কারখানা ঘরটার স্পষ্ট অন্ধকারে যন্ত্র ও কলকব্জাগুলো যেন হিংস্র শ্বাপদদের মত নিঃশব্দ ব্যগ্রতায় ওৎ পেতে আছে মনে হচ্ছিল।

এবার আর সুধীরের নিজেকে বুঝতে কিছু বাকী ছিল না। মূর্খ সে, তাই সেদিন উৎপলের চারুকে ভালবাসার কথায় হেসেছিল, ঠাট্টা করেছিল। আজ তারই সামনে দিয়ে সেই উৎপল বিজয়ীর মত তার একান্ত আপনার তার চিরকালের অনুগত চারুকে তার অধিকার থেকে কেড়ে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে, আর সে তার ভুয়ো জড় যন্ত্রের তপস্যায় ভুলে একটা অঙ্গুলিও তোলেনি বাধা দিতে! শুধু এই কথা ভেবে সে আশ্চর্য্য হচ্ছিল যে, চারু তার জীবনের যে এত বড় সম্পদ এই সামান্য কথাটা এতদিন সে বোঝেনি কেন? উৎপল বাইরে থেকে এ রকম আঘাত না দিলে সে হয়ত নিজের সহজ অধিকারের নিশ্চিন্ততায় চারুর প্রতি তার এই গোপন আকর্ষণের গভীরতা কোন দিনই আবিষ্কার করতে পারত না। তার চোখের সামনে চারুর সেই চিরকালের নিবেদিত, একান্ত আত্মসমর্পণের মূর্ত্তিখানি ভেসে উঠতেই, তাকে আরেকটু হ'লেই হারাতে যাচ্ছিল ভেবে সে শিউরে উঠল। তার নিজের: অঙ্গের মত চারুর ওপর তার এমনি সহজ অধিকারবোধ ছিল যে বাইরে থেকে টান না পড়া পর্য্যন্ত সে চারুর অভাবের বেদনা কল্পনা করতে পারেনি। সুধীর সারাজীবন যা চেয়েছে, প্রবলভাবে চেয়েছে, সে চাওয়ার ভেতরে কোন দ্বিধা কোন দুর্ব্বলতা কোন ফাঁকি কখনো থাকেনি।

আজ সমস্ত অন্তর দিয়ে সে তেমনি অনুভব করছিল, তার দুর্নিবার প্রেম হাঁকছে—চারু তার, চারুকে চাই-ই।

এরি সঙ্গে তার উৎপলের ওপর রাগ হচ্ছিল। কোন্ অধিকারে দু'দিনের উৎপল তার চারুলেখাকে ঠকিয়ে নিতে আসে? কি মূল্য আছে তার ওই ক'টা শব্দসার কবিতার আর তার মেয়েলি চেহারার? বোকা চারু কি ওই ফাঁকা আওয়াজেই মুগ্ধ হয়ে গেছে? সুধীর আর স্থির থাকতে পারছিল না; দরোয়ানকে দরজা বন্ধ করতে বলতেই কিন্তু তার চিঠির কথা মনে প'ড়ে গেল। তাড়াতাড়ি আলোটা জ্বেলে পড়লে, একটা নতুন বিলিতি কোম্পানী লিখেছে—

"আমরা —তে নতুন কাগজের কারখানা খুলছি, অন্যান্য কাষ্ঠজাত জিনিষেরও কারখানা তার সাথে থাকবে। আমরা আপনার কাগজের কারখানা সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি প'ড়ে বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। আমাদের নতুন কাজ আরম্ভ হয়েছে, সবে একটা পাহাড়ের ঝর্ণা থেকে তড়িৎশক্তি সংগ্রহ করার ব্যবস্থা হচ্ছে। এ সময় একজন উপযুক্ত অভিজ্ঞ লোকের বিশেষ দরকার থাকায় Mr. Jameson-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি আপনার নাম করেন। আমাদের বড় তাড়াতাড়ি, আপনি যদি আমাদের Second Engineer-এর পদ গ্রহণ করেন তবে বিশেষ বাধিত হব। Mr. Powell এখন Chief Engineer, কিন্তু তাঁর শরীর এ-দেশের জল-হাওয়া সহ্য করতে পারছে না। আশা করি আপনি আমাদের বিমুখ করবেন না। মাইনে সম্বন্ধে আলোচনা চিঠি পেলে হবে। উত্তরটা তাড়াতাড়ি দেবেন, আমাদের সময় বড় দরকারী।"

বিরক্ত হয়ে লম্বা চিঠিটার উত্তরে "কাজ নিতে পারব না, ক্ষমা করবেন।" লিখে সুধীর, এতক্ষণে হাওয়া খেয়ে উৎপল বাড়ী ফিরেছে ভেবে উৎপলের বাড়ীর দিকে রওনা হল। আজ উৎপলকে সে ভাল ক'রেই জানিয়ে দেবে চারুকে তার ভালবাসার কোন অধিকার নেই।

উৎপলের মেজদা হাঁকলেন,—"তা হ'লে টু ক্লাবস্ রইল।"

বড়দা হাঁকলেন—"টু রয়্যালস।"

সেজদা হাঁকলেন—"থ্রি হার্টস।"

সুধীর দরজায় মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"উৎপল আছে?"

সুধীরের দিকে চেয়ে মুখভঙ্গী করে ন'দা বল্লেন—"এই যে, থ্রি নো ট্রাম্পস।"

বড়দা বল্লেন—"একি, সুধীর যে!"

ন'দা হেঁকে বল্লেন—"ওই দেখ বড়দা, মেজদা তোমার সব তাস দেখে নিলে।"

ওদিক থেকে মেজদা ন'দার ঘাড়টা ধ'রে বল্লেন—"তবে রে পাজী, তুই যে মেজদার তাস এই ফাঁকে দেখে নিলি।"

মেজদা বল্লেন—"দেখেছে ত, তবে এই যাঃ," ব'লে সব তাস সামনে খুলে দিলেন।

সেজদা চেঁচিয়ে বল্লেন—"কি করলে মেজদা, এবার যে আমাদের রবার হত।"

ন'দা বল্লেন—"হ্যাঁ, ডনলপ টায়ার হত, ফুটবল ব্লাডার হত।"

বড়দা বল্লেন – "তোরা থাম দেখি, এস সুধীর, বহুদিন তোমার রাসভবিনিন্দিত কণ্ঠস্বর শুনিনি, একহাত ব্রে খেলা যাক!"

"আচ্ছা, বড়দা, এ-পর্য্যন্ত যতদিন ব্রে খেলেছি, কোনদিন ও-মর্য্যাদা তুমি কাউকে প্রাণ ধ'রে ছেড়ে দিয়েছ, বল ত ঠিক ক'রে।" বলে ন'দা হাসতে লাগলেন।

সুধীর বল্লে—"না, এখন আমার সময় নেই, উৎপল এসেছে?"

ন'দা বল্লেন—"সে কি আর আছে ভাই, তাকে কি আর তোমরা রেখেছ? খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে—"

বড়দা এক ধমক দিয়ে বল্লেন—"থাম দেখি ফাজিল, না ভাই, উৎপল ত নেই।"

ন'দা বল্লেন—"তুমি আমায় ধমক দিলে যখন, তখন শোন। সেদিন অর্দ্ধেক রাতে দেখি উৎপল চিৎ হয়ে ছাতে প'ড়ে আছে আকাশের দিকে চেয়ে। আমি বল্লুম—'তুই ত কবি ছিলি জানতুম, আবার জ্যোতির্ব্বিদ কবে থেকে হলি?' তার উত্তর হল—'সত্যি ন'দা, রাত্রির এই রহস্যলোকের দিকে চেয়ে যে কোনদিন সারারাত জেগে কাটাল না, সে অতি দুর্ভাগ্য।' আমি বল্লুম—'আমি ত জানি যে রাত জেগে কাটায় সেই দুর্ভাগ্য, এবং ডাক্তারি শাস্ত্রেও এ রোগকে বলে Insomnia, এবং তার রীতিমত চিকিৎসা দরকার।' তারপর বিস্তর সাধ্যসাধনা করেও তাকে রাত্রির রহস্যলোকের ধ্যান থেকে বিচলিত করতে পারলুম না। প্রেমে পড়েই না অমন চিৎপাত অবস্থা আজ ওর! দোহাই সুধীর, তোমার দু' একটা ইলেকট্রিক 'শক' দিয়ে তোমার বন্ধুটিকে বাঁচাও, ধুথভ্রষ্ট ভাইটিকে আমাদের ফিরিয়ে দাও।"

"আচ্ছা, তা হ'লে আমি আসি," ব'লে সুধীর বেরিয়ে গেল।

উৎপল এতক্ষণ চারুদের বাড়ীতে স্ফূর্ত্তি করছে এই চিন্তাতেই তার শিরায় শিরায় আগুনের হল্‌কা ছুটছিল। অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক উৎপল!

অতি মৃদু হাল্‌কা ভাবে অর্‌গ্যানের ওপর চারু আঙুল চালিয়ে যাচ্ছিল, এবং সমস্ত ঘরটি যেন একটি অতি সঙ্গোপনে কানে-কানে-বলা সুরের ইসারায় ভ'রে

ছিল। এ যেন পাখীর পাখা থেকে পালক খ'সে যাবার, অন্ধকারে রজনীগন্ধার পাপ্ড়ি মেলার, রিক্ত শাখায় নতুন পাতা জাগবার নিঃশব্দ অতি কোমল সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা! উৎপল ঘরের অন্য পাশের একটি সোফায় চোখ বুজে হেলান দিয়ে ছিল। সুধীর চৌকাটের উপর নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়াল, ঘরটার চারধারে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। একসঙ্গে সুধীরের মনে সম্পূর্ণ বিপরীত দু'টি ভাবের ধারা বইছিল। তার মনে হচ্ছিল, সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্যজগতের এই অতুলনীয়া চারুকে সে ত' কোনদিন জানেনি, কোনদিন চেনে নি,—হতভাগ্য সে! তার হিংসা হচ্ছিল, ক্রোধ হচ্ছিল এই ভেবে যে, এই চারুলেখাকে উৎপলই প্রথম আবিষ্কার করেছে। চারুর এই পুষ্পপেলব চম্পক-অঙ্গুলিগুলি একটু ছোঁবার জন্য এত লোভ কোথায় তার অন্তরে এতদিন সুপ্ত ছিল! এরই সঙ্গে তার রাগ হচ্ছিল চারুর ওপর, কিন্তু বুকের ভেতর সে ক্রোধ যেন হাহাকারের মত শোনাচ্ছিল। একবার মনে হ'ল চীৎকার ক'রে সঙ্গীত থামিয়ে চারুকে সে বলে—"নির্লজ্জ চারু, এ কি হচ্ছে?" কিন্তু প্রাণপণে নিজেকে দমন ক'রে সে দরজা দুটো সবলে ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল।

চারু বাজ্না থামাতেই উৎপল উঠে বল্লে—"আচ্ছা, এইবার তা হ'লে আসি, তোমায় একটু বিরক্ত করলুম, কিছু মনে করো না।"

চারু ফিরে কি একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে অস্ফুট চীৎকার ক'রে উঠল— "একি, অধীরদা!" ঘরের অনতিস্পষ্ট আলোতে তার কান ও চোখ-মুখ হঠাৎ রাঙা হয়ে যাওয়াটা কেউ লক্ষ্য করলে না।

উৎপলও বিস্মিত হয়ে দরজার দিকে চেয়েছিল। সুধীরের অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখ দেখে কিন্তু কারুর মুখ দিয়েই কোন কথা সরলো না। সুধীর উৎপলকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা ক'রে চারুকে বল্লে—"তোমার সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে চারু, ভেতরে চল।"

উৎপল বিস্মিত লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হয়ে "চল্লুম আমি" ব'লে বেরিয়ে গেল। উৎপলকে এমন ক'রে যেতে দেওয়ার অশোভনতা অনুভব করতে পারলেও চারুলেখা কিছু বলতে পারলে না। তখন তার হৃদয়ের স্পন্দন যদি কেউ অনুভব করতে পারত!

চারু উঠে দাঁড়িয়েছিল। কি কথা তার নিষ্ঠুর অধীরদা এতদিন বাদে অকস্মাৎ আজ বলতে এসেছে ভাবতে না পারলেও কি এক অপূর্ব্ব প্রতীক্ষায় তার সমস্ত দেহ কাঁপছিল। একটা হাত দিয়ে সে অর্‌গ্যানের একটা কোণ ভাল ক'রে ধরল।

খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে সুধীর ক্রুদ্ধ গম্ভীর স্বরে বল্লে—"এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয় চারু। নির্লজ্জতারও একটা সীমা আছে।"

চারুর পা দুটো অবশ হয়ে এল, সে চেয়ারে ব'সে পড়ল। এক মুহূর্ত্তে তার সমস্ত স্বপ্ন চুরমার ক'রে ওই কর্কশ অপ্রত্যাশিত কথাগুলো দুঃসহ অপমান হয়ে তার আত্মমর্য্যাদাকে আহত ও বিদ্রোহী ক'রে তুললে।

নিজেকে একটু সাম্‌লে নিয়ে রূঢ় স্বরে সে বল্লে—"আর তোমাকেও বলি, সহ্যেরও একটা সীমা আছে, অভদ্রতারও একটা—" সে আর বলতে পারলে না, কান্নায় রাগে অভিমানে তার ঠোঁট কাঁপছিল।

সুধীর চারুর কাছ থেকে এমন প্রতিঘাত কল্পনাও করতে পারেনি। সে ক্ষিপ্ত হয়ে বল্লে—"ঠিক বলেছ, সহ্যেরও একটা সীমা আছে। কিন্তু তোমার উৎপলের সঙ্গে আচরণ সহ্যের সীমাও ছাড়িয়ে গেছে, তাই বলতেই এসেছি।"

"তার জন্যে তোমার এতটা কষ্ট করবার কোন দরকার ছিল না সুধীরদা। এই কথাটুকু তুমি ভুলে যাচ্ছ ব'লেই তোমায় মনে করিয়ে দিতে চাই যে, আমাকে শাসন করবার অধিকারটা বোধ হয় তোমার হাতে নেই। ঢের হয়েছে, আর অনধিকার চর্চ্চা ক'রে নিজের অপমান নিজে ডেকে এনো না।"

কঠিন ব্যঙ্গের সুরে বলা কথাগুলি সুধীরের সর্ব্বাঙ্গে বহ্নিদাহ জ্বালিয়ে তুললে। সে উন্মত্ত হয়ে বল্লে—"তোমার এত উন্নতি হয়েছে চারু এই ক'দিনে! এটা জানলে অবশ্যই তোমাকে শাসন করতে এসে নিজের অপমান নিজে ডেকে আনতুম না। শুধু এইটুকু জানালে বাধিত হব এ সব কি উৎপলের শিক্ষার ফল?"

চারু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বল্লে—"কোন কথাই তোমায় জানাতে আমি বাধ্য নই। আর এটা ঠিক জেনো যে উৎপলের শিক্ষা আর মনুষ্যত্বের এক কণা পেলে তুমি ধন্য হয়ে যেতে!...হয়েছে ত, আর বিরক্ত করোনা, যাও।"

এবার সুধীরের কান্নায় গলা রুদ্ধ হয়ে আসছিল। সেদিনকার সেই নম্র অক্লান্ত সেবারতা চারু কি এই! তার মনে এ ধারণা ক্রমশঃ দৃঢ় হচ্ছিল যে সে চারুকে এইবার একেবারে হারিয়েছে। এই নিষ্ফল কথা-কাটাকাটিতে সে হারানোর বেদনা দ্বিগুণ অসহ্য হয়ে উঠলেও সে বেদনার ও ক্রোধের আতিশয্যেই বোধ হয় নিরস্ত হ'তে পারছিল না কিছুতেই। তার ছাইবরণ মুখের দিকে চেয়ে চারু স্তম্ভিত হয়ে গেল, তার হৃদয়টা কে যেন তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে নির্ম্মমভাবে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিচ্ছিল। কিন্তু অসহায় অন্ধ মানুষ যে ভাগ্যের নির্ব্বোধ ক্রীড়নক!

সুধীর বল্লে—"হ্যাঁ যাচ্ছি, তোমার বিরক্তি উৎপাদন করছি জেনেও তোমার বাড়ীতে থাকব, উৎপলের তুলনায় যত হেয়ই হই এতটা অমানুষ আমি কখনই নই। কিন্তু তোমাকে একটা কথা আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই চারু, যে কিছু দিন আগেই বারবার তিরস্কৃত হয়েও যেচে ক্ষমা ভিক্ষা করতে যেতে, বিরক্তি ত দূরের

কথা, লজ্জা পর্য্যন্ত তোমার হয়নি কোন দিন। তখনও আমার মধ্যে উৎপলের মনুষ্যত্বের এককণা ছিল না, তবে তখন উৎপলের সঙ্গে তোমার প্রেমাভিনয়ের সুযোগ ছিল না বটে।"

কিন্তু আঘাতের ওপর দ্বিগুণ আঘাত দিয়ে চারু চাপা কঠোর কণ্ঠে বল্লে—"দোহাই অধীরদা, ভেতরে মা বাবা আছেন, এখানে মিছিমিছি চীৎকার ক'রে একটা কেলেঙ্কারি করোনা। এখনো বাবা মা'র তোমার ওপর যেটুকু ভাল ধারণা আছে, সেটুকু আর খুইও না। যাও।"

কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে সুধীর এই মর্ম্মান্তিক আঘাতের উত্তরে শুধু বলতে পারলে—"তোমার ওপর আমার দাবী আছে, সেই বিশ্বাসেই তোমার কাছে এসেছিলাম চারু। আচ্ছা চল্লুম, আর তোমায় জীবনে বিরক্ত করব না।" তারপর সে বেরিয়ে চ'লে গেল। তার শেষ কথাগুলোর করুণ মর্ম্মভেদী ক্রন্দন শুধু ঘরের ভেতর চারুর বুকে বারবার হাহাকার তুলতে লাগল।

বাড়ী গিয়ে সুধীর আগেকার চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে তৎক্ষণাৎ লিখলে—"আপনাদের কাজ সানন্দে গ্রহণ করলুম, যতশীঘ্র হয় আমি কার্য্যভার গ্রহণ করতে রাজী জানবেন।"

আর এখানে একটি নিঃসঙ্গ মেয়ে অন্ধকার ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে অন্তরের অশান্ত হাহাকার কোন মতে নিবারণ করতে না পেরে ভাবছিল—দাবী আছে তা কি তুমি জানতে না নিষ্ঠুর? আর এতদিন বাদে যদি দাবী থাকার বিশ্বাস স্বীকারই করলে, তবে কেন সমস্ত দাবী অমন ক'রে ভুলে শুধু আঘাতটুকু নিয়ে ফিরে গেলে—কেন—কেন?—চিরকালের মত শুধু জোর ক'রে কেড়ে নিলে না কেন?

॥ উনিশ ॥

অর্দ্ধেক রাতে মা ঘুম থেকে জেগে উঠলেন হঠাৎ। বারান্দায় কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। 'সুধীর' ব'লে ডাক দিতে বারান্দা থেকে উত্তর এল—"কি মা?"

মা আশ্চর্য্য হয়ে বাইরে এসে বল্লেন—"ঘুম হচ্ছে না বাবা?"

সুধীর পাইচারি থামিয়ে বল্লে—"ঘুমোতে পারছি না মা।"

স্তব্ধ জনহীন পথে নিশ্চল গ্যাসগুলো ঘুমন্ত শহরের ওপর পাহারা দিচ্ছিল। মা ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন বাবা, অসুখ করেছে কিছু?"

সুধীর মা'র কাছে এসে বল্লে—"আমার কখনো অসুখ করেছে মা?—এম্‌নি ঘুম আসছে না।" তারপর আরেকবার পায়চারি ক'রে থেমে বল্লে—"মাসীমাকে

একটা চিঠি দিতে হবে মা, কালই তাঁকে জগাকে সঙ্গে ক'রে আসতে লিখে দাও।"

"তা লিখে দেব, কিন্তু সে কথা হঠাৎ এখন মনে হ'ল কেন?"

"বাঃ, তুমি কি একলা এখানে থাকবে নাকি?"

মা বিস্মিত হয়ে বল্লেন—"পাগ্‌লা কোথাকার, তুই থাকতে আমি আবার একলা থাকব কেন?"

"আমি যে কাল পরশুই চ'লে যাচ্ছি মা।—খুব ভাল চাকরী পেয়েছি একটা।"

মা আরো বিস্মিত হয়ে বল্লেন—"কি হয়েছে তোর, যা তা বকছিস কেন বল দেখি?"

"না মা, সত্যি আমি যাচ্ছি।"—তারপর একটু শুক্‌নো হেসে বল্লে—"আমাদের ত আর স্বপ্ন আর মরীচিকা নিয়ে ব'সে ব'সে সময় নষ্ট করলে চলে না মা, পৃথিবীতে আমাদের কাজ আছে।" পায়চারি করতে করতে সুধীর বলতে লাগল—"অকর্ম্মণ্য যারা, তারা প্রজাপতির মত জীবনের মধুটুকু খেয়ে সুখের স্বপ্নে দিন কাটাক, আমাদের ত দুঃস্বপ্ন কেটে গেলেও কাঁদবার অবসর নেই মা! আমাদের সময়ের অনেক দাম, পৃথিবীতে এখনো ঢের কাজ আছে। কোথায় কাঁটা ফুটল তাই নিয়ে ব'সে হা হুতাশ করলে ত চলবে না।"

এ সব অসংলগ্ন কথার কোন অর্থ খুঁজে না পেয়ে মা বল্লেন—"আজ তোর কি হয়েছে বল ত? এই সেদিন এত খেটে কারখানা করলি, আবার আজ হঠাৎ বলছিস কাল পরশুই কোথায় চাকরী নিয়ে যাবি—এর মানে কি?"

সুধীর রেগে উঠে বল্লে—"মানে ছাই, আমার মাথা আর মুণ্ডু! বড় কাজের সুবিধে পেলেও যাবনা ত' এখানে ব'সে কবিতা লিখতে আর গান শুনতে হবে নাকি? আমি যাচ্ছি, শুধু এইটুকু শুনে রাখ।" সুধীর আরো দ্রুত পায়চারি আরম্ভ করলে।

কিন্তু খানিকবাদেই অনুতপ্ত হয়ে মা'র পায়ের কাছে ব'সে প'ড়ে বল্লে—"লক্ষ্মী মা, রাগ করোনা, আমার না গেলেই নয়, তাই যাচ্ছি। বল, রাগ করোনি, বল মা, তুমি মত দিয়েছ, তা না হলে পা ছাড়ব না।"

মা ব'সে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বল্লেন—"আমি মত দেব না কেন বাবা? তোমার যাতে ভাল হয় তাই করবে, কিন্তু কি হয়েছে বল ত বাবা।"

সুধীর হাসতে চেষ্টা ক'রে বল্লে—"বাঃ, তুমি ভাবছ আমি কোনো দুঃখে যাচ্ছি? সত্যি মা, আমার কোনো দুঃখ নেই। ভুল ক'রে ঠ'কে দুঃখ করব এমন বোকা তুমি আমায় ভেবেছ? আমি কিছু কেয়ারই করি না, অত মোমের পুতুল আমরা নই। তুমি দেখোনা মা, এবার এমন একমনে কাজ করব, এমন সব কাজ

করব যা কেউ কখনো ভাবেনি। সকলকে দেখিয়ে দেব, আমার কিছুই আসে যায় না। তাদের অভাবে আমার লাভ বই ক্ষতি নেই।"

সুধীর চুপ করল। দূরে কোন্ বাড়ীতে একটি শিশু জেগে উঠে কাঁদছিল। নিস্তব্ধ অন্ধকার আকাশের তলায় সে কান্না অদ্ভুত শোনাচ্ছিল, নিদ্রিত শহরের পথে পথে সে কান্নার প্রতিধ্বনি উঠছিল।

মা আজ যথার্থই শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন সুধীরের জন্য। কিন্তু কি গভীর ব্যথা যে সুধীরের অন্তরকে এমন ক'রে পীড়িত করছিল বুঝতে না পেরে তিনি বিমর্ষ হয়ে বল্লেন—"আমি কি ক'রে তোকে ছেড়ে একলা থাকব? তুই আমায়ও নিয়ে চল্ না তোর সঙ্গে।"

"সে এখন হয় না মা।" তারপর খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সুধীর বল্লে—"জানো মা, যন্ত্রের জগতে যুগান্তর আনবে এই যার পণ, মানুষের হাতে সমস্ত জড় শক্তিকে বন্দী ক'রে দান ক'রে যাবে এই যার সাধনা, তার কি ছোটখাট দুঃখ ব্যথা নিয়ে দুর্ব্বলের মত কান্নাকাটি করা চলে? তার ত ওসব তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে মাথা ঘামাতে যাওয়াই বোকামি। আর তাতে যদি ঘা সে খায়, সে তার ভালর জন্যই—শুনছ ত মা?"

"শুনছি বাবা।"

"আমি এইটুকু বুঝি মা, যবনিকার অন্তরালে ব'সে, যিনি মানুষের পুতুল-নাচ খেলাচ্ছেন, তিনি যেই হোন তাঁর ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতার তুলনা নেই। যাকে যেমন ক'রে চালাবেন, সে-পথ থেকে তার তিলমাত্র বিচ্যুতি তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না। আমার হাতে হাতুড়ি দিয়েছিলেন আমার মালা গাঁথবার চেষ্টা তিনি সহ্য করবেন কেন? আর আমিও তা চাই না মা, তাঁর দেওয়া এই হাতুড়িকেই আমি যেন সার্থক করতে পারি আমার জীবনের সমস্ত দিয়ে। এই ঠিক না মা?"

"আমি কিছু বুঝতে পারছি না বাবা।"

"না মা, আমি জানি তুমি সব জান, তুমি অনেক বেশী বোঝ।"

কিছুক্ষণ পরে সুধীর বল্লে—"আজ আর একবার ছেলেবেলার মত তোমার কোলে মাথা রেখে শুতে ইচ্ছে হচ্ছে মা।"

মা'র কোলে মাথা রেখে শুয়ে সে বল্লে—"দুঃখ কিসের মা? দুর্ব্বল কাপুরুষ ঘা খেয়ে কাঁদবে, কাঁদুক! আমার তুমি আছ মা, আর থাক এই হাতুড়ি, আমি কিছু কেয়ার করি না।"

মা কিন্তু অনুভব করলেন তপ্ত জলের ফোঁটায় তাঁর কোল সিক্ত হয়ে যাচ্ছে।

তখন রাত্রির নিথর নিস্তব্ধতায় নিকটের কোন পথে একটা গরুর গাড়ী প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে অশেষ বিরোধের শব্দে নালিশ জানাতে জানাতে চলেছে।

॥ কুঁড়ি ॥

টেবিলের ওপর পাশাপাশি দু'খানি বই—Indian Engineering আর উৎপলের জাপানী বাঁধাই খাতাখানি। অন্নদাবাবু সুধীরের প্রশংসা বেরিয়েছে শুনে খুঁজে খুঁজে এই পত্রিকাখানি কিনে এনেছিলেন। একটা শোফায় চারুলেখা ব'সে ছিল। পত্রিকাটা সে একবার হাতে টেনে নিয়ে পড়তে চাইল, দুর্ব্বোধ ভাষার অর্থ তার মগজে ঢুকছিল না, অক্ষরগুলি সমস্ত যেন ষড়যন্ত্র ক'রে তার চোখের সুমুখে ধাঁধা হয়ে উঠছে! রাগ ক'রে বইটাকে সে ছুঁড়ে ফেলে দিলে, বইটা টেবিলের নীচে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল! চারু সেদিকে দৃকপাত না ক'রে সাদরে উৎপলের খাতাখানি টেনে নিল কোলে। কি সুন্দর খাতাখানি, কি পরিষ্কার সুস্ফুট হাতের লেখাগুলি! বিশ্বশিল্পী রাত্রির মৌন আকাশে যেমন নক্ষত্রের অক্ষরে রহস্যের জাল বোনেন অবিরত, তেমনি এই মাটির মোহন কবিটি তার শাদা খাতার বুকে তুলির টানে এ কি নব নব অর্থভরা কথার জাল বয়ন ক'রে গেছে! এই অক্ষরগুলি যেন প্রদীপ জেলে ধরেছে কোন্ অন্ধকার রহস্যলোকের দুর্গম পথের নিশানা ব'লে দিতে। এ অক্ষরগুলি যেন কোন্ প্রস্ফুটিত আলোকশত-দলের পাপড়ির গায়ে গায়ে রঙের লেপন। চারু বিমুগ্ধ হয়ে এ অক্ষরগুলি দেখতে লাগল। খাতাটা খুলতেই চোখে পড়ল—'বাসকশয্যা' কবিতাটি। চারু অস্ফুট কণ্ঠে আবার কবিতাটি পড়তে লাগল।—

"প্রিয়া নির্জ্জন নিকেতনে বসন্তমঞ্জরী ও অশোক চম্পকের ফুলশয্যা রচনা ক'রে রেখেছে, রচনা করেছে বকুল-শেফালির মালা, মৃন্ময় প্রদীপ একটি জ্বালিয়ে রেখেছে নিরালায় দ্বারের কিনারায়, তিমিরান্ধ বন্ধুর পথের সম্মুখে, ধূপাধারে গন্ধধূপের আলোড়ন উঠেছে, ম্লানকান্তি প্রতীক্ষামগ্না বিরহিনীর চোখে নিদ্রা নেই, তার অলকগুচ্ছে রাতের সুশীতল শিশির বাতাস অন্ধকারের সুবাস মাখিয়ে দিচ্ছে, তার দয়িত হৃদয়বল্লভ আসছেন! রাত্রির ক্লান্ত বিনিদ্র প্রহর শেষ হয়ে এল, নীড়ে পাখীর পাখার ঝাপট স্তব্ধতাকে হানছে, তারার চোখের আলো প্রতীক্ষার ব্যথায় স্তিমিত হয়ে এসেছে আকাশে, দুঃসহ বিরহ বেদনা সহ্য করতে না পেরে বিরহিণী ব্যর্থ বাসকশয্যা ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে পড়ল অন্ধকারে ধূলি কণ্টকিত পথে পথে।...একি অপরূপ অনন্ত বাসক-শয্যা রচনা ক'রে রেখেছে

বিশ্বদরদী রাজেন্দ্র, নিথর রাত্রির অনাদি আকাশের নীচে এই শ্যামাঙ্কিত ধরিত্রীর বুকের আসনে! এ কি সুষমা! তার প্রিয় তাকে এই শয্যায় আহ্বান করেছেন। ব্যথাহতা বিরহিণী ধরিত্রীর ম্লান বাসক-শয্যায় লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদতে লাগল—এস হৃদয়েশ, এস নিষ্ঠুর, এস বিবাগী!"

পড়তে পড়তে চারুর দু' চোখ চোখের জলে ছলছল ক'রে উঠল। সে আস্তে-আস্তে খাতাটিকে বুকের ওপর নিবিড় স্নেহে চেপে ধরল! দুঃখিনী ঘরছাড়া নারীর বুকের স্পন্দনটি যেন খাতার বুকে বাজছে, এমন ক'রে নারীর বুকের বিরহ ব্যথাকে ভাষা দিতে পারে এই খাতা! চারুলেখা খাতাটিকে আরো একটু জোরে চেপে ধরতেই তার সমস্ত দেহ অসহনীয় লজ্জার আনন্দে কচি কিশলয়ের মত কাঁপতে লাগল। তার মনে প'ড়ে গেল সকালের ডাকে তার দিদির লেপাফার চিঠিখানি। তাতে এক জায়গায় লেখা ছিল—

"তোর বিষয়ে আমি ভারী নিশ্চিন্ত আছি, চারু। উৎপলের গলায় মালা দিবি বোন, এ ভাবলে আমার মনে খুসী আর ধরে না। বাবা মাও উৎপলের এই সাধকের মত গভীর প্রেমকে উপলব্ধি করতে পেরেছেন; আমি জানি তাঁরা কোন দিন তার প্রার্থনাকে উপেক্ষা করতে পারবেন না। আর আমি এও জানি আমার ছোট লক্ষ্মী দুষ্টু বোনটি কবির কল্পনাকে একটি সুন্দর মূর্ত্তি দিয়ে সার্থক করতে ভারী অভিলাষী! নয় কি দুষ্টু মেয়ে? আমার কাছে আর কোন কথা গোপন ক'রে লাভ নেই, সব খুলে লিখিস, আর উৎপলকে বলিস আমি তাকে আশীর্ব্বাদ পাঠাচ্ছি।"

মনে পড়তে চারুর বুকের সমস্ত রক্ত চন্‌চন্ করে উঠল। সে আস্তে আস্তে কবিতার খাতাখানি টেবিলের ওপর গুছিয়ে রাখলে।

সুনয়নী দেবী ঘরে ঢুকে বল্লেন—"তোর অধীরদা যে আজ চ'লে যাচ্ছে কোথায়, কোন্ হিমালয়ের পাহাড়ের ধারে কি কারখানার কাজ পেয়ে। চল্ বেলফুলের কাছে, একবার দেখা করে আসি।"

"অধীরদা চ'লে যাচ্ছেন!" চারুর সর্ব্বাঙ্গে কে যেন চাবুকের ঘা মারলে।—"একেবারে আজই?"

মেয়ের কথার ধরণে মা একটু সচকিত হয়ে বল্লেন—"হাঁ, কাজ পেয়েছে প্রকাণ্ড মাইনের, যাবে না? নে ওঠ, বেলফুল ব'লে পাঠাল এই মাত্র। বেচারীর বড্ড কষ্ট হবে ছেলেটাকে ছেড়ে।"

চারু প্রাণপণে নিরুদ্ধ অশ্রুর বেগ সংযত করছিল। অবরুদ্ধ বেদনার স্বরে সে চোখ নীচু ক'রে বল্লে—"না মা, আমি যাব না।"

"সেকি রে? চ'লে যাবে, দেখা ক'রে আসি।"

"তুমি একলা যাও।"

"তুই যাবিনে?"

"না মা, আমি পারব না যেতে।" ব'লে চেয়ার ছেড়ে উঠে অন্য ঘরে তাড়াতাড়ি চ'লে গেল।

মা বিস্মিত হয়ে একটু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকলেন—"এ কি চারু?"

চারু ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে—"অধীরদা আপনিই হয়ত দেখা করতে আসবেন, আমার না গেলেও চলবে।"

সুনয়নী দেবী পাশের ঘরে গিয়ে দেখতে পেলেন চারু মেঝের ওপর পালঙের পায়ায় পিঠের ভর রেখে আঁচলে মুখ ঢেকে ব'সে আছে। তিনি তার কাছে ব'সে প'ড়ে মৃদুস্বরে বল্লেন—"কি হয়েছে চারু? কাঁদছিস্ যে?"

চারু আঁচলের আড়ালে বারে বারে ফুঁপে উঠছিল, তার এই ব্যথার গোপন কাহিনীটি বলবার তার ভাষা ছিল না যেন! অধীরদা চ'লে যাচ্ছেন! এত নির্মম তাঁর প্রতিশোধ! নিরপরাধ চারুকে কি এম্‌নি ক'রেই ঘা দিতে হয় প্রতিদানে?

সুনয়নীর মনে একটি সন্দেহের ছায়া ঘনিয়ে উঠছিল। হঠাৎ সদাপ্রফুল্ল মেয়েকে কয়েক দিন থেকে অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর ও উদাসীন থাকতে দেখে তিনি ও অন্নদাবাবু মনে মনে ভারী অস্বস্তি অনুভব করছিলেন। সহসা আজ মেঘের নিবিড় গুমোট কেটে কান্নার শ্রাবণ নেমে আসতেই তাঁর সন্দেহের একটা ঠিক কিনারা পেয়ে তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। পরে সান্ত্বনার সুরে তিনি বল্লেন—"তাতে কি মা? বিদেশে সবাইরই যেতে হয় চাকরী পেলে। আবার দু'দিন বাদে ফিরে আসে। চল্ একবার দেখা ক'রে আসবি।"

মা'র কথা শুনে চারুর সমস্ত অন্তর জ্ব'লে গেল। সে তীব্র কণ্ঠে বল্লে—"তুমি কি ভাবছ মা? আমি যাব দেখা ক'রে আসতে? যে বাড়ী ব'য়ে অপমান ক'রে যায়, যার সামান্য একটু ভদ্রতাজ্ঞান নেই, তার বাড়ী আমি যাইনে।" চারু আবার আঁচলে মুখ ঢেকে কান্নায় ফুলে উঠতে লাগল।

সুনয়নী ঠিক কিছুই বুঝতে পারলেন না, তার পিঠে হাত রেখে বল্লেন—"সুধীর তোকে অপমান করেছে? সে কি কথা? কবে?"

"যাও, কিছু বুঝবে না তুমি, আমি যাব না।" ব'লে উঠে পালঙটার ওপর শুয়ে পড়ল ঝড়ে ছিঁড়ে-পড়া শীর্ণ লতাটি যেমন ভুঁয়ের ওপর নেতিয়ে পড়ে।

মা দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে একলাই চ'লে গেলেন একান্ত উদ্বিগ্ন চিন্তাকুল মন নিয়ে।

তারপর এম্‌নি করেই অভিমান-আহত দুর্ব্বল অসহায়ের বুকে কান্নার বাদল নেমে আসে! চারু জীবনে কান্নার এই বহ্নি-জ্বালা কোনো দিন আর অনুভব করেনি। সে বলছিল—"ভগবান তোমার হাতে হাতুড়ী দিয়েছিলেন কি আমারই বুকে খালি আঘাত হানতে, নিষ্ঠুর? এত শক্তিমান তুমি কিন্তু তোমার ঐ বাহুতে কি এতটুকু শক্তি ধরল না যে আমাকে..."

চারু সমস্ত অন্তর দিয়ে যন্ত্রতপস্বীকে ডাকছিল, কিন্তু সে এলো না। তার বিশ্বাস ছিল এত দূর দেশে যাবার আগে একটিবার সে দেখা ক'রে যাবেই। তার হঠাৎ মনে পড়ল কলেজে ভর্ত্তি হতে যাবার সময় সুধীর তাকে সঙ্গোপনে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছিল—'আমাকে রোজ চিঠি লিখিস চারু, নইলে তোদের জন্য আমার ভারী মন কেমন করবে।' চারুর চোখ জলে ভ'রে উঠেছিল দেখে কান্নাভরা কণ্ঠে বলেছিল—'আমারো ভারী কষ্ট হচ্ছে চারু তোদের ছেড়ে যেতে। কিন্তু দেখিস, পাশ ক'রে নিশ্চয়ই একটা মস্ত লোক হব। একটা প্রকাণ্ড কারখানা করব তখন কলকাতাতেই, তখন আর তোতে-আমাতে ছাড়াছাড়ি হবে না।' তারপর সুধীর যখন চ'লে যায়, চারু দুয়ার ধ'রে পথের পানে চেয়ে রয়েছিল, আর যদ্দূর না গলিটা পূবে বেঁকে গেছে চোখের শেষে, ততদূর সুধীর গাড়ীর জানলা দিয়ে দেখেছে আর দেখেছে। বিদায় বেলায় পরম রমণীয় অনন্তমধুর একটি ব্যথা আছে। সেটি সেদিন দুজনে কি অপার আনন্দে সম্ভোগ করেছিল!

কিন্তু দিনের আলো থিতিয়ে পড়ছে আকাশে, সুধীর এখনো একটিবার এলো না বিদায় জানাতে। চারু ভাবছিল, এ কি সেই সুধীর, সেই করুণায়-ভরা অশেষ স্নেহশীল তার অধীরদা! বাইরে বারান্দায় এসে দেখলে সুধীরের ঘরের সেই অবরুদ্ধ জানলাটা তার পানে চেয়ে ভ্রূকুটি করছে। সে নিজেকে ভারী অপমানিত বোধ করছিল; হঠাৎ এই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বৃথা এতক্ষণ কাঁদবার জন্য নিজেকে তার ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হল। সে ফের নিজের ঘরে এল। তখন অন্ধকার আকাশের কোণে কোণে জমে উঠছে! মেঝেয় লুটানো Indian Engineeringটা তুলে টেবিলের ওপর উৎপলের খাতার ওপর রেখে দিলে। হাতের কাছে কোন কাজই পাচ্ছিল না সে করবার। চুল বাঁধতেও ইচ্ছা হচ্ছিল না, চুলগুলি শুকোয় নি এমন জড়সড় ভাবে শুয়ে থাকায়। সে আস্তে জানলার সামনে এসে বসল। এখান থেকে সুধীরদের বাড়ীর কোন ঠাহর হয় না ব'লেই এখানে সে বসেছিল, দেখলে বাত্তি-ওয়ালা মই কাঁধে নিয়ে চলেছে। খানিকক্ষণ পর আবার সেখান থেকে উঠল, ঘরে ব'সে থাকতে তার মন টিঁকছিল না, কে যেন তাকে ডাকছে; সে চুলগুলি খোঁপা করে জড়িয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে পথে বেরিয়ে পড়ল। সে নিজের অলক্ষিতে গলির মোড়

পেরিয়ে একেবারে সুধীরদের বাড়ীর কাছে এসে পড়ল। দেখতে পেলে অন্ধকারে তার মা ও মাসীমা দুয়ারের পাশে বুকের ওপর বেদনাকুল স্নেহ-কোমল দৃষ্টি পথের বুকে প্রসারিত ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। তবে এইমাত্র যে মালবোঝাই গাড়ীটা চ'লে গেল তাতেই কি অধীরদা ব'সে ছিলেন? তাকে দেখতে পায়নি ত অন্ধকারে? না, না, পায়নি, সে কি একটুও জানে, চারু আজ অন্ধকার পথের কিনারায় নিঃসম্বল ভিখারিণীর মত কাকুতি-ভরা চোখে চেয়ে রয়েছিল তারই একটি দৃষ্টির সম্ভাষণ পাবার জন্য? ঈস? অমনি একটু ঠাণ্ডায় ঘুরে যেতেই ত সে পথে এসেছে। ভারী বয়ে গেছে তার···

চারু নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল; দেখতে পেলে দূর থেকে হাওয়ায় সিল্কের উড়ুনি উড়োতে উড়োতে উৎপল আসছে। চারুর মন পাতার মতন ঝিরঝির ক'রে কাঁপতে লাগল। সে দেখতে পেলে উৎপলের রুক্ষ লম্বা চুলগুলি অন্ধকারের শিখার মতন বাতাসে কি সুন্দর কাঁপছে, চলার ভঙ্গীতে সঙ্গীতের যেন একটি মদির মূর্চ্ছনা, চাদরের চারু সজ্জাকৌশলের মধ্যে একটি অপূর্ব্ব শ্রী! চারু মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল! উৎপল কাছে এলে অন্ধকারে চারুকে দেখতে পেয়ে পরম আনন্দে একটু হাসলে, চারু একটি সুমোহন লজ্জা দিয়ে সেই হাসিটিকে অভিনন্দন করলে।

উৎপল দেখলে চারুর মুখে ক্লান্ত একটি ব্যথার লাবণ্য মাখানো, দীর্ঘায়ত মদির নয়নে কোন্ আকাশের সুনীল স্বপ্নভরা, দুটি পুষ্পপেলব হাতে একটি সুশীতল সান্ত্বনা। আরো একটু এগিয়ে এসে উৎপল বল্লে,—"অন্ধকারে পথে একলা যে লেখা!"

চারুকে এমন সুরে কেউ ডাকেনি। তার সমস্ত দেহ সেতারের তারের মত বাজাতে লাগল অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে। চারু কার ওপর নির্ম্মম প্রতিশোধ নেবার আশায় মরীয়া হয়ে বলে ফেললে,—"তোমার জন্য পথের পানে চেয়ে রয়েছিলাম, জানতাম যে তুমি আজ আসবেই।"

উৎপলের সমস্ত রক্ত ফুটছিল। সে চারুর শিথিল একখানি হাত নিজের মুঠির মধ্যে পরম আদরে টেনে নিয়ে আনন্দকম্প্র কণ্ঠে বল্লে—"চল, ঘরে যাই।"

। প্রকুশ।

নিঃশব্দ সঞ্চারে যে আদিম নিবিড় অরণ্যে যুগ যুগ ধরে শুধু হিংস্র শ্বাপদ শিকারের অনুসন্ধানে ফিরেছে, যার অসংখ্য শাখা প্রশাখা ও বন্যলতার জটিলতার মাঝে অগণন জীবন কাহিনীর বিচিত্র অভিনয় হয়ে গেছে মানুষের অজ্ঞাতে, যার পতঙ্গ-গুঞ্জন-মুখর অন্ধকারের গোপনতায় কি বিপুল বিভীষিকা ও কি অসীম রহস্য

কি অনন্ত জীবন-সমারোহ ও ভীষণ মৃত্যু মহোৎসব—সেই অরণ্যেরই এতকালের দুর্গমতার সমস্ত সম্মান ও সম্ভ্রম পদদলিত ক'রে একহাজার কুলি জঙ্গল কেটে নতুন কারখানার পত্তন করতে লেগেছে।

সুধীরের মনে হয় রাত্রে এই ক'টি উচ্চকর্মচারীদের তাঁবু আর কুলিদের পাতায় ছাওয়া বস্তির চারিধারে ক্রুদ্ধ বিশাল অরণ্য এই ক'টা দুর্বল মানুষের দুঃসহ দাম্ভিকতায় বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে হিংস্র ক্রূর দৃষ্টি হেনে শুধু পেতে থাকে। দিনের বেলা সে উন্মাদের মতো কাজ করে, আর সমস্ত রাত ভালো ক'রে ঘুমুতে পারে না। যত অদ্ভুত কথা তার মনের মাঝে জট পাকাতে থাকে। রাত্রির অন্ধকারে অরণ্য হতে যখন কোনো মর্ম্মর ওঠে, তার মনে হয় অরণ্যের মাঝে পশু ও উদ্ভিদ্ জগতে যেন এক বিষম ষড়যন্ত্র চলেছে মানুষের বিরুদ্ধে। সত্যি এ সংগ্রাম। দুরাশা-দাম্ভিক মানুষের সাথে চিরসহিষ্ণু প্রাচীন প্রবীণ অরণ্যের এ সংগ্রাম। এতদিন বাদে বোঝাপড়ার দিন এসেছে, মানুষের অত্যাচারে উত্যক্ত হয়ে অরণ্য আজ বেঁকে রুখে দাঁড়িয়েছে।

কুলিরা দলে দলে জ্বরে পড়ছিল। অরণ্যের পচা পাতার জঞ্জাল থেকে বিষাক্ত বাষ্প উঠে বাতাস ভারাক্রান্ত ক'রে রেখেছে। যে ঝর্ণার গতি ফিরিয়ে তাকে লৌহ-বন্ধনে বেঁধে তার কাছ থেকে তড়িৎশক্তি আদায় করবার সঙ্কল্প কোম্পানীর ছিল, সে ঝর্ণাকে আয়ত্ত করা এক রকম অসম্ভব দেখা গেল। সুধীরের আসবার দিন দুই পরেই বিদেশী জঙ্গলের জলহাওয়া সহ্য করতে না পেরে Chief Engineer, Mr. Powell মারা গেলেন। সুধীরের হাতে সমস্ত ভার পড়ল। সে এতদিন যন্ত্রের স্বপ্নই দেখেছিল, যেখানে যন্ত্রদেবতার পূজা চলে সহস্রোপচারে সেখানকার অভিজ্ঞতা তার ছিল না। তার মনে ভয় হল হয়ত বাঙালীর মুখ সে রাখতে পারবে না। তাই প্রাণপণে সে কাজে লাগল। সমস্ত দিন অক্লান্ত কাজের মধ্যে সে নিজের মনকে এতটুকু ছুটি দিত না, কিন্তু রাত্রে অত খাটুনির পরও সে নিজের তাঁবুতে বসে ভাল ক'রে ঘুমুতে পারত না, অন্ধকার অরণ্যের গুমোট যেন তার বুকের ওপর ভার হয়ে থাকে। অরণ্যের মাঝে যেমন, তার অন্তরেও তেমনি কি যেন এক অন্তহীন অস্বস্তিতে অহরহ অস্থির বেদনা-গুঞ্জন উঠছে।

সে নিজেকে বোঝাত, "এই কর্ম্মই তার সত্য, আর সব ফাঁকি, মিথ্যা, যন্ত্র-তপস্যার বাধা।" কিন্তু তার মনের কোণের সুগভীর বেদনাটিকে সে কিছুতেই দূর ক'রে দিতে পারত না, এ সব কথা নিজের কাছেই স্তোকবাক্য ব'লে মনে হত। নিজের ভেতর থেকেই কে তাকে বিদ্রূপ করে বলত, "জীবনে যা ঘটল তা ভাগ্য-দেবতার আদেশ ব'লে অত বিশ্বস্তভাবে মেনে নেবার আগে আর কিছু করবার

ছিল না কি ?" সে এই বিদ্রোহী বাণীকে দমন করবার জন্তে ভাবত, "করবার দরকার ত ছিলই না, আমার কি ক্ষতি হয়েছে ?" কিন্তু অত সহজে মীমাংসা হ'ত না, বিদ্রোহী মন বলত, "অত কষ্ট ক'রে খাড়া করা কারখানাটা একদণ্ডে ছেড়ে দিয়ে এই বনবাসে আসাই কি এমন প্রয়োজন ছিল তবে !" সে মনে মনে এ অশান্তিকর দ্বন্দ্ব থেকে রেহাই পাবার জন্তে চাকর-বাকরকে ধম্‌কে জাগিয়ে আলো জালিয়ে হয়ত Electric Plant-এর plan নিয়ে বসত এবং অনিচ্ছুক মনকে চাব্‌কে কার্য্যে নিয়োগ ক'রে রাত্রির তৃতীয় প্রহরে হয়ত শুতে যেত। কিন্তু এম্‌নি ক'রে জীবনের বাকী সমস্ত দিন নিজের সঙ্গে বিরোধ মেটাতেই যাবে ভাবতে সে শিউরে উঠত। একদিন যে যন্ত্র তপস্যা তার আনন্দের খেলা ছিল, আজ তা শুধু নীরস কর্ত্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শাল, ওকার, পানি শাজ, সফেদ চাঁপ, বুক ও পিপলি গাছের জঙ্গলের মাঝে ছবির মতো ছোট ষ্টেশনটি। লাল কাঁকরের পরিষ্কার প্লাটফর্ম্মের ওপর স্থধীর একটু অস্থিরভাবে পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছিল। নির্জ্জন ষ্টেশনে দূরে নীল কোর্ত্তাপরা দু-একটি ভূটিয়া কুলি ছাড়া আর কাউকে বাইরে দেখা যাচ্ছিল না। ষ্টেশনের রেলিঙের বাইরে একটা টমটমে শাদা রঙের একটা টাট্টু ঘোড়া থেকে থেকে অস্থিরভাবে পা ঠুকছিল। টালী-ছাওয়া ঘর থেকে ষ্টেশনমাষ্টার বেরিয়ে এসে বল্লে, "আপনার কারখানার slasher mill আর couch roll গুলোই ত শুধু আসছে দেখছি, barking mill আর ground wood mill-এর কোন খবর পেলুম না ত।"

স্থধীর অধৈর্য্য হয়ে মাটিতে পদাঘাত ক'রে বল্লে, "অথচ আমি একমাস আগে থেকে তাড়া দিচ্ছি। আমাদের কি রকম সময় নষ্ট হচ্ছে ওদিকে।"

ষ্টেশন মাষ্টার সসম্ভ্রমে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের ঝোরা বাঁধা শেষ হয়ে গেছে ?"

স্থধীর বল্লে, "তার জন্তেই ত আর দেরী করতে পাচ্ছি না! কুলীরা বেকার ব'সে আছে, এবারের বাজার মন্দা, আর দেরী করলে কাল দিতে পারব না।"

ষ্টেশন-মাষ্টার বল্লেন, "দেখুন, আমাদের কোন দোষ নেই, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।"

স্থধীর এসে বল্লে, "না না আপনাদের দোষ কি !"

ষ্টেশন-মাষ্টার একটু ইতস্ততঃ ক'রে বল্লেন, "দেখুন আপনি যদি কিছু মনে না করেন ত একটা কথা বলি। আপনাদের এই আশ্চর্য্য ঝোরা বেঁধে ইলেকট্রিসিটি তৈরী করবার কথা শুনে এত ইচ্ছে হয় দেখবার, যদি একদিন অনুমতি দেন, তা হলেই…"

সুধীর অবাক হয়ে বল্লে, "এর আবার অনুমতি কি দরকার? আপনি গেলেই দেখতে পারেন ত!"

ষ্টেশন মাষ্টার মাথা নেড়ে বল্লেন, "না না, আমায় ঠাট্টা করবেন না। আমি কি জানিনা এ সব গোপন জিনিষ, বিনা অনুমতিতে দেখতে গেলে গুলি ক'রে মারে? তবে আপনি যদি—"

সুধীর এবার হেসে ফেলে বল্লে, "কে আপনাকে ও সব কথা বলেছে, বলুন ত। আপনি নির্ভয়ে যাবেন, আর আমিই না হয় আপনাকে নিয়ে যাব'খন।"

অত্যন্ত খুসী হয়ে ষ্টেশন-মাষ্টার বল্লেন, "তা হলে আর কথাই নেই। দেখুন আপনি বাঙালী হলেও এত বড় লোক হয়েছেন, কত দিন আপনাকে বলব-বলব ভেবেও বলতে পারিনি ভয়ে।"

সুধীর বল্লে, "তা হলে ওই মালগুলো সম্বন্ধে একটু তদ্বির করবেন। আমি একদিন এসে আপনাকে নিয়ে যাব'খন।

ষ্টেশন-মাষ্টার ইতস্ততঃ ক'রে বল্লেন, "কিছু যদি মনে না করেন ত আমার বাড়ীতে একটু চা খেয়ে গেলে বিশেষ বাধিত হব। ওই ষ্টেশনের কাছেই আমার কোয়ার্টার।"

সুধীর আপত্তি করবার কোন কারণ না পেয়ে রাজী হ'ল।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরটিতে সুধীরকে বসিয়ে প্রৌঢ় ষ্টেশনমাষ্টার অনাবশ্যক উচ্চস্বরে ডাকলেন—"সেবা! চায়ের জল চড়াও শীগ্‌গির, একজন ভদ্রলোক এসেছেন।" এতবড় নামজাদা অতিথির উপস্থিতিতে প্রৌঢ় স্পষ্টই একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। ঘরখানিতে আসবাবপত্র বেশী না থাকলেও পরিচ্ছন্নতা ও রুচির ছাপ ছিল।

সুধীরের দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে প্রৌঢ় বল্লেন, "ও সব আমার মেয়ের হাতের আঁকা। দেখবেন Art Exhibition-এ কি রকম প্রশংসাপত্র পেয়েছিল?"

এমন অকস্মাৎ কারুর প্রশংসাপত্র দেখবার জন্যে আদৌ ইচ্ছুক না হলেও সুধীর ভদ্রতার খাতিরে 'না' বলতে পারলে না। কিন্তু ভদ্রলোক প্রশংসাপত্রের পর স্কুলের প্রাইজ এবং স্কুলের প্রাইজের পর সূচীকার্য্যের নমুনা যে রকম ভাবে দেখাতে আরম্ভ করলেন ও সেই সঙ্গে তাঁর অসাধারণ মেয়ের যে রকম পরিচয় দিতে সুরু করলেন তাতে সুধীর বেশ একটু শঙ্কিত কৌতূহল নিয়েই এই অসামান্য মেয়েটির আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগল। ভদ্রলোকের কথায় জানা গেল যে সংসারে তাঁর এই মেয়েটি ছাড়া আর কেউ নেই, এবং গরীব হলেও মেয়েটিকে তিনি শিক্ষা দিতে কার্পণ্য করেন নি। এখন একটি সৎপাত্রে তাকে অর্পণ করতে

পারলেই তিনি নিশ্চিন্ত হন, কিন্তু পেটের দায়ে এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশে চাকুরী করতে করতে কখনই বা পাত্রের খোঁজ করেন, এই ছাই-এর দেশে ত চ্যাপ্টা নাক আর ইঁদুর চোখ দেখতে দেখতেই প্রাণান্ত, একটা দেশের লোক যদি কালে ভদ্রে চোখে পড়ে—! সুতরাং এমন জায়গায় বাঙালী বাঙালীর সহানুভূতি করবে, ও আর এমন বেশী কথা কি—ইত্যাদি ইত্যাদি। চা খেতে আসতে রাজী হওয়ার সময় অবশ্যই সুধীর ষ্টেশনমাষ্টারের সাংসারিক ইতিহাস ও সমস্যা জানবার এই অযাচিত সৌভাগ্য আশা ক'রে আসেনি। তথাপি এতক্ষণের সমস্ত কথাবার্ত্তা সে সহজভাবে যথাসাধ্য মনোযোগের সঙ্গে শুনতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু ভদ্রলোক এই দু'দণ্ডের আলাপেই যখন তার প্রতি কোন সঙ্গত কারণ ব্যতীতই অকস্মাৎ অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে একেবারে বলে বসলেন, "দেখুন, আপনি ঘরের ছেলের মতো, আপনাকে বলতে আর লজ্জা কি? আমার মেয়েটির পছন্দ ভারী উঁচু। যার তার হাতে ত আর ওকে দেওয়া চলে না, অথচ গরীব মানুষ, বিনা যৌতুকে সৎপাত্র পাওয়া আজকাল কি দুষ্কর জানেনই ত। তবে যদি গুণ বিদ্যা রূপ দেখে আপনার মতো আজকালকার শিক্ষিত ছেলেরা কেউ অমনি বিয়ে করে—," তখন তাঁর প্রভাতের এই আতিথেয়তার নিঃস্বার্থতা সম্বন্ধে একটু সন্দিহান না হয়ে উঠে সুধীর পারলে না।

দরজায় একটি মেয়ে এসে বল্লে, "বাবা, চা এনেছি।"

সুধীর দেখলে ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের রূপ সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি করেননি, অন্য বিষয়ে যাই বলুন না কেন। মেয়েটি সাধারণ বাঙালী মেয়ের চেয়ে দীর্ঘ একটু বেশী, দোহারা সুন্দর গঠন ও উজ্জ্বল গৌর রঙ, কিন্তু বিশেষত্ব তার চোখের অসাধারণ রঙে। চোখের তারা তার একেবারে আকাশের মত নীল ও তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ মর্ম্মভেদী রহস্যভরা।

ষ্টেশনমাষ্টার একটু বিরক্ত কণ্ঠে বল্লেন, "তোমার কি এই ছাড়া জামা কাপড় নেই সেবা?"

একবার সুধীরের দিকে চকিতে চেয়ে টেবিলের ওপর চা ও পরোটা রাখতে রাখতে সে বিরক্ত মৃদুস্বরে বল্লে, "সকালে এর চেয়ে ভালো জামা কাপড় কবে আমি প'রে থাকি?"

এই মেয়েটির সান্নিধ্যে সুধীরের মনে অতি কষ্টে দমন ক'রে রাখা বেদনাটি যেন আবার প্রবল হয়ে উঠছিল কোন অজ্ঞাত কারণে। বনের মাঝে কুলি কল আর কাজের আবেষ্টনে যতটা মনকে ভোলানো গেছল এই ষ্টেশনমাষ্টারের সংসারের মাঝে এসে মন ততটাই বেশী অশান্ত হয়ে উঠল। এই মেয়েটির

সূত্রে আরেকটি মেয়ের স্মৃতি হঠাৎ অত্যন্ত স্পষ্ট হবার অবকাশ পেল যেন, এবং তার হৃদয় স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় ও হতাশায় ফিরে ফিরে হাহাকার ক'রে উঠল! এই মেয়েটি সামনে থাকাতেই সে যেন আজ এতদিন বাদে তার এই নির্ব্বাসিত জীবনের নিষ্ফলতা ও আশাহীন দৈন্য প্রথম সম্পূর্ণভাবে অনুভব করতে পারলে। আশ্চর্য্য এই যে, মেয়েটির বেশ ভূষা আচরণ সবই তাকে আরেক জনের কথাই অনবরত স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। তার আধময়লা মোটা রাঙাপাড় শাড়ীটি কোমরে জড়িয়ে ধরবার বিশেষ ভঙ্গীটি সেই আরেকজনের সঙ্গে একটুও না মিললেও একটি বেদনাভরা আবেগে তার অন্তর আন্দোলিত হয়ে উঠছিল স্মৃতিসূত্রে!

মেয়েটি চা ও পরোটা দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রৌঢ় ডেকে বল্লেন, "আজ কাকে ধরে এনেছি জানিস ত? সে দিন যার কথা খবরের কাগজে প'ড়ে শোনাচ্ছিলি সেই সুধীরবাবু।"

সুধীর প্রৌঢ়ের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হবে কি হাসবে ভেবে পাচ্ছিল না। মেয়েটি দরজায় ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে, "ও!"

প্রৌঢ় সুধীরকে বলতে যাচ্ছিলেন, "কি রকম পরোটা ভাজা হয়েছে?" এমন সময় বাইরে থেকে চাপরাশী হাঁকলে, "সাত নম্বর ডাউনের টাইম হোইল।"

ভদ্রলোক ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে পড়লেন। সুধীরও অপ্রস্তুত হয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু তিনি তাকে উঠতে নিষেধ ক'রে বল্লেন, "দোহাই সুধীরবাবু, খাওয়া না শেষ ক'রে উঠবেন না। আমি এখুনি আসছি, আপনার লজ্জার কারণ নেই জানবেন।" ব'লে সুধীরকে প্রত্যুত্তর দেবার অবসর না দিয়েই টুপি মাথায় দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। অগত্যা সুধীর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে মাথা নীচু ক'রে খেতে লাগল।

কিন্তু আহার থেকে ক্ষণেকের জন্যে মাথা তুলে একবার চেয়েই সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। মেয়েটি ঠিক তেমনিভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে নিঃশব্দে হাসছিল।

ষ্টেশনমাষ্টারের সমস্ত আলাপ এই সঙ্গে মনে প'ড়ে যাওয়ায় বিতৃষ্ণায় তার মন ভ'রে উঠল। সে ভাবলে, "এরা এম্‌নি ক'রে ছেলেধরার ফাঁদ পাতে নাকি?" বিতৃষ্ণা তার মুখেও একটু ফুটেছিল বোধ হয়।

কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই এমন চিন্তা একবারও মনে স্থান দেবার জন্য তাকে একান্ত অনুতপ্ত ও নিজের কাছে বিষম লজ্জিত হতে বাধ্য ক'রে মেয়েটি বল্লে, "বাবা এতক্ষণ আপনার কাছে নিজের দুর্ব্বলতার পরিচয় দিতে ভোলেননি বুঝতে পারছি, কিন্তু দোহাই আপনার, ওইটুকু থেকেই তাঁর প্রতি অবিচার ক'রে আমার

সম্বন্ধে একটা অন্যায় ধারণা পোষণ ক'রে যাবেন না।" মেয়েটির মুখ চোখ রাঙা হয়ে উঠেছিল, তারপর মুখ ফিরিয়ে চাপা স্বরে বল্লে, "আপনি একবেলার জন্যে আমাদের অতিথি হয়ে তাঁর অসঙ্গত আচরণে অত্যন্ত অস্বস্তি ভোগ করছেন, তাই বলছি যে তাঁর যে দুর্ব্বলতাটুকু দেখেই আপনি তাঁর সম্বন্ধে একটা অন্যায় অবিচার ক'রে বসেছেন সে দুর্ব্বলতার দরুণ লজ্জা আপনার চেয়ে আমার অনেক বেশী। কিন্তু এইটুকু শুধু জানবেন, ও তাঁর সঙ্গে আরো একটু পরিচিত হলেই বুঝতে পারবেন যে সে দুর্ব্বলতাটুকু ছাড়া কোন হীনতা তাঁর মধ্যে নেই…ওকি! সব ফেলে রাখছেন যে! না না, সে হবে না, এত কথা শোনবার পরও কি আপনি আমাদের আরো…" মেয়েটি আর বলতে পারলে না।

চায়ের বাটি টেবিলে রেখে সুধীর বল্লে, "না থাচ্ছি, কিন্তু তার আগে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা দরকার আমার। আমি…"

"না না ক্ষমা চাইবার কোন কথাই নেই। আপনি শুধু ভুল ক'রে অবিচার না করলেই অত্যন্ত বাধিত হব।"

"যে অবিচার করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত না করতে পারলে আমার মনে যে শান্তি পাব না কিছুতেই।"

মেয়েটি এবার একটু হেসে বল্লে, "প্লেটে যা আছে তার ওপর আরো গোটাকতক পরোটা আর খানিকটা মোহনভোগের সঙ্গে উদ্ধার করলেই যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হবে।"

"প্রায়শ্চিত্ত অত মধুর করলে পাপের প্রশ্রয়ই দেওয়া হবে।"

"প্রায়শ্চিত্ত কঠোর করলেই যদি পাপের মূলোচ্ছেদ হত, তা হলে আজ পৃথিবীর চেহারা অন্যরকম দেখতুম। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ত কোথাও সহজ প্রায়শ্চিত্তের বিধান করেন নি।"

"তা হলেও সহজ করার চেয়ে কঠিন করায় ফল হ'ত বেশী।"

"সে বিষয়ে নিঃসংশয় হইনি এখনো। যাই হোক, আপনার কঠোর প্রায়শ্চিত্তেই যদি অভিরুচি থাকে তা হলে আমাদের আপনার অদ্ভুত ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল দেখিয়ে দিন, তা হলেই হবে।"

"আপনি 'কঠোর' শব্দটাকে অমন ক'রে অপদস্থ করবেন না।"

সেবা হেসে উঠল, বল্লে, "তা হলে আমি পারলুম না, আপনার প্রায়শ্চিত্ত আপনিই ঠিক করুন।"

"পৃথিবীর সব বিচারকর্ত্তা যদি এমনি সদয় হত—"

"যদি সব পাপী এমনি শাস্তি নেবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হত। আর তা ছাড়া আমি ত আপনার বিচারকর্ত্তা নই।"

দুজনেই হঠাৎ নীরব হয়ে গেল। এইটুকুর মধ্যে কথায় কথায় এতটা সহজ আলাপের সূত্রপাত হওয়াটা সেবার মনে হচ্ছিল ভালো হয়নি—যদিও তার কোন হাত ছিল না এতে। সুধীরের সহসা মনে প'ড়ে গেল সেদিন এই বিচার করবার অধিকার সহজ বিশ্বাসে খাটাতে গিয়েই না জীবনের প্রথম নিদারুণ আঘাত সে পেয়েছিল। সে ভাবছিল, যে অধিকার তার নয়, সেই অধিকার থাকার বিশ্বাস তার এসেছিলই কোথা থেকে? পৃথিবীর আর কাউকে ত সে অমন ক'রে তিরস্কার করতে যেতে পারে না। এ দুঃসাহস তার হয়েছিলই কেন?

সেবা বল্লে, "আপনার জন্যে আর দুটো পরোটা ভেজে নিয়ে আসি?"

অন্যমনস্কভাবে সুধীর বল্লে, "আচ্ছা।" তারপর ভাবতে লাগল, চারুর শৈশবে ও কৈশোরের স্নেহ প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল তারই, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না, এবং সেই প্রীতির জোরেই সে সেদিন অমন করতে যেতে সাহস করেছিল। কিন্তু চারুর যৌবনের প্রেম যে আরেকজনের হতে পারে এ কল্পনা ত তার মনে স্থান পায়নি।—যেখানে প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল কৈশোরে, সেখানে যৌবনে ভালোবাসা জাগাটাই স্বাভাবিক ছিল না কি? তবু কেন সে ভালোবাসা জাগেনি? এই না-জাগার কারণ সবটাই কি চারুর দোষ ও উৎপলের প্রবঞ্চনা, তার নিজের অবহেলাটাও কি কিছু নয়? এই দিক থেকে বিচার সে কোন দিন করেনি। আজ তার মনে হল, চারুর ওপর সে যখন জোর ক'রে দাবী খাটাতে গিয়ে বিফল হয়েছে—প্রত্যাহত হয়েছে, উৎপল তাকে তখন প্রণয়ের অর্চ্চনা মুগ্ধ হৃদয়ের স্তুতি দিয়ে ধীরে ধীরে জয় করেছে।

সেবা এসে তার প্লেটে আরো খাবার দিয়ে বল্লে, "কি ভাবছেন বলুন ত? হাত যে উঠছে না!"

"না, এই যে খাচ্ছি।" সুধীর যন্ত্রচালিতের মত খেতে খেতে ভাবতে লাগল, 'যার অভাবে তার দিন ও রাত্রি এমন দুঃসহ হয়ে উঠছে, তার কাছে নিজের মর্য্যাদাকে একটু ক্ষুণ্ণ হতে দিলেও এমন কি দোষ হত! যে প্রেম জীবনের চরম পুরস্কার, যার জন্যে বিশ্বময় এত সংগ্রাম এত তপস্যা এত ক্রন্দন এত হাহাকার, সেই দুর্লভ প্রেম, কি মূর্খ সে, শুধু একটুখানি হাত বাড়িয়েই পেতে চায়! এবং হাত বাড়িয়ে না পেলেই কি নিজের ক্ষুণ্ণ অহঙ্কারকেই এত বড় ক'রে এমন ক'রে অভিমানে স'রে দাঁড়াতে হয়! সত্যিই ত, কি মূল্য সে দিয়েছে এত দিন এই

অমূল্য প্রেমের, কি ত্যাগ কি সাধনা সে করেছে! সে দিন অমন ক'রে প্রত্যাহত হবার পরও কি তার আর কিছু করবার ছিল না?…'

ষ্টেশনমাষ্টার ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বল্লেন, "একটু দেরী হয়ে গেছে সুধীরবাবু, মাপ করবেন। আপনাকে অনেক কষ্ট দিলুম।"

সুধীর সজাগ হয়ে বল্লে, "না কষ্ট কই দিলেন, এরকম কষ্ট পাবার সৌভাগ্য আর কদিন হয়!"

প্রৌঢ় হাসলেন, তারপর মেয়েকে না দেখে বল্লেন, "বাঃ, সেবা গেল কোথায়?" সুধীরের অন্যমনস্কতা লক্ষ্য ক'রে সেবা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছল, সুধীর তা লক্ষ্য করেনি। সেবা ঘরে ঢুকতে তিনি বল্লেন, "বেশ অতিথি-সৎকার হচ্ছিল ত তোমার! উনি একলা এ ঘরে ব'সে আছেন—"

সুধীর বাধা দিয়ে বল্লে, "না না, উনি ত এতক্ষণ আমার সঙ্গে আলাপ করছিলেন।"

প্রৌঢ় এবার হেসে বল্লেন, "আমার মেয়েকে কি খুব বোকা দেখলেন?"

সুধীর মনে মনে হেসে বল্লে, "মোটেই না।"

সেবা বিরক্ত মুখে চোখ নামাবার আগে সুধীরের সঙ্গে একবার তার চোখাচোখি হয়ে গেল।

সুধীরকে টমটমে তুলে দিয়ে ষ্টেশনমাষ্টার বল্লেন, "দেখবেন একেবারে ভুলে যাবেন না। আপনার মতো লোকদের বাড়ীতে পাওয়া কি কম সৌভাগ্য!"

ক্যাম্পে ফিরে সুধীর দুখানি চিঠি পেলে।

মা লিখেছেন…"—বাবা, আর এমন ক'রে থাকতে পারি না। কত দিন আর এমন ক'রে বনবাসে প'ড়ে থেকে আমায় কষ্ট দিবি?" সুধীরের চোখ অশ্রুতে ভ'রে এল; নিষ্ঠুর সে, নিজের অন্যায় অভিমানে মাকেও এমন ক'রে সে ব্যথা দিচ্ছে কোন্ অপরাধে?

অন্য চিঠিটায় উৎপল লিখেছে—"আমি তোমার কাছে কি এমন দোষ করেছি ভাই, যার জন্যে তুমি এতদূরে যাবার সময় একবার একটু খবরও দেবার সময় পেলে না,—আমাদের এতকালের বন্ধুত্ব!—দেশশুদ্ধ লোক তোমার আজ জয়গান গাইছে ভাই, কিন্তু আমি তাতে যোগদান করতে পারব না, ক্ষমা করো। আমার ভাবলে কান্না পায়। তুমি কি সর্ব্বনাশ করছ, বুঝতে পারছ কি? সাগরপারের বিদেশী সদাগরের ইঙ্গিতে তুমি ভারতের যে লীলাময়ী স্বচ্ছন্দ-বিহারিণী ঝর্ণাকে বন্দী ক'রে দেশকে চমৎকৃত ক'রে দিয়েছ, তারি সঙ্গে যে দেশের মুমূর্ষু প্রাণেও তুমি লোহার শেকল লাগালে ভাই। সাত হাজার মুখের ক্ষুধার অন্ন

বিক্রয় ক'রে দিলে, সাতশ মজুরের মনুষ্যত্ব যন্ত্রাসুরের কাছে বলি দিলে, দেবতার দেওয়া সাতশ জীবনের সমস্ত আশা ও আশ্বাস ভস্মসাৎ ক'রে দিলে আর ভবিষ্যতের সাতকোটি সন্তানের জন্যে জীবনব্যাপী দুঃখদৈন্য ও হাহাকারের উত্তরাধিকার কায়েমী ক'রে গেলে।...পৃথিবীতে ত দুঃখ দৈন্যের অবিচার অত্যাচারের অভাব নেই ভাই, তুমি কেন তাতে আর যোগ দিতে যাও?—যন্ত্র হয়ত যন্ত্রদেব বিশ্বকর্ম্মার, কিন্তু আজ তাতে যাঁর ভর হয়েছে তিনি কোন্ অসুর জানি না, তবে বিশ্বকর্ম্মা নন। অসুরের পূজা ছাড় ভাই।..."

সুধীর তার উত্তরে লিখলে—"তোমার সমস্ত অসার ভাবুকতা আর ভুয়ো কবিত্ব গোল্লায় যাক, আর তার সঙ্গে তুমিও।—"

॥ বাইশ ॥

একটা বিলিতি কোম্পানীর একখানা সমুদ্রগামী মালজাহাজ অষ্ট্রেলিয়ার সিড্‌নিতে আজ প্রায় দিন পনেরো হল নোঙর ফেলে জিরুচ্ছে। শীগ্‌গিরই আবার যাভা থেকে চিনি নিয়ে ভারতবর্ষের দিকে পাড়ি দেবে।

আজকে সেই জাহাজে ভারতীয় ডাক এসে পৌঁচেছে। জাহাজের একটা ছোট্ট কেবিনে দোতলার বার্থের ওপর একটি বাঙালী তরুণ পালক-দেওয়া বালিশে মাথা রেখে শুয়ে ছিল। সকাল থেকে খেটে-খেটে তার সমস্ত দেহে বেদনা ধ'রে গেছে, তার আর নড়বার ক্ষমতা নেই। ছেলেটি খাকীর হাফ্-প্যান্ট পরা, তাতে জায়গায়-জায়গায় কয়লা ও পেট্রলের দাগ লেগে নোংরা হয়ে আছে। সমস্ত ঘরটি আবর্জ্জনা ও ধুলোয় ভরা, ভারী গরম, ছেলেটির লম্বা কালো রুক্ষ চুলগুলি কপালের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছে, তার তলায় নীল আকাশের স্বপ্নভরা দুটি ছলছল চোখ। ছেলেটি বি-এ পড়ছিল, হঠাৎ কোন খেয়ালে যে সে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে এই জাহাজ কোম্পানীতে সামান্য মার্কনি ওয়্যাচারের চাকরী জুটিয়ে নিরুদ্দেশের না' ভাসালে কেউ জানে না। আজ প্রায় দুটি বছর ধ'রে ছেলেটি ঘরছাড়া।

সুখানি একখানি ট্রে ক'রে অনেকগুলি চিঠি কাগজপত্র, ম্যাগাজিন নিয়ে এসে টেবিলটার ওপর রেখে চলে গেল। ছেলেটি নীচু হয়ে হাত বাড়িয়ে চিঠিগুলি নিলে, এই কাগজের স্তূপের মধ্যে কোন্ কোহিনুরের আশায় একবার ব্যাকুল হয়ে কি খুঁজলে,—রোজই সে এমনি খোঁজে আর রোজই সে এমনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চিঠিগুলি ভুল ক'রে বুকে চেপে ধরে। প্রথম খামখানা দেখতে পেয়েই ছেলেটির

হাতের লেখা ঠাহর হল, আর সে না এগিয়েই চিঠিখানি খুলে পড়তে সুরু করল—

গিরিডি।

বাবুল,

কি যেন কথা বলতে চাই, বলতে পারছি না। বুকের ভেতরে কি কথার ভিড় বদ্ধ ঘরে মৃগনাভির তীব্র ঘ্রাণের মতো নিবিড় হয়ে উঠেছে, তবু বলতে পারছি না। কত-রকমের কত কথা, তার না পাই থেই, না পাই ফাঁক। হাস্নাহানার বদ্ধকুঁড়ির মতো প্রকাশের ব্যথায় টন্‌টন্ করছে সমস্ত প্রাণ, কিন্তু পারছি না বলতে। কাল থেকে কতবার ছন্দে দুলিয়ে দিতে চাইলুম, পারলুম না, ছন্দ দোলে না আর! বোবা বাঁশী যেন আমি, ব্যাকুল সুরের নিশ্বাস শুধু দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, বাজতে পারছে না। কত কথা ভাই,—যদি বলতে পারতুম!

নিজেকে খালি শুধাই—এ আমি কোথায় এলাম? আকাশের ঐ উদার নীলিমা, ধরিত্রী-মার এই শ্যামল ক্রোড়, নব তৃণাঙ্কুরের এই জীবন-সমারোহ, মন্থরগতি চলচ্ছন্দা তটিনীর এই ঊর্মি-গুঞ্জরণ—আমাকে এখানে পাঠালেন কেন বিশ্বশিল্পী? এত লাবণ্য এত ভুখ্ এত ব্যথা এত সৌন্দর্য্য কেন দিলেন তিনি? সত্যি ভাই বাবুল, সুন্দর এ পৃথিবী! জানি, এখানে কত নিষ্ঠুর অত্যাচার, কত কলুষিত স্বার্থান্ধতা, কত কুৎসিত রোগ, বীভৎস দারিদ্র্য, কত দম্ভ ব্যাভিচার, জঘন্য লালসা, ...কিন্তু ভাই, তারপর ঐ হলুদ-বরণ গাঁদা ফুলটির পাশে একটি প্রজাপতিকে রঙ্-চঙে পলকা দুটি পাখা মেলে উড়তে দেখি, ম্লান সন্ধ্যালোকে নির্জ্জন শীর্ণ নদীর কোল বেয়ে স্বপ্নের মতো পাল তুলে ছোট্ট একখানি না' নদীর জলে গাঙশালিকের ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে যায়, দিবালোকের রাঙা চিঠি পড়বার জন্যে রাত্রির স্তব্ধ অন্ধকারে লক্ষ লক্ষ কুঁড়ি ধীরে ধীরে গোপনতার অবগুণ্ঠন খুলে স্মিত-আরক্ত মুখে চেয়ে থাকে—ভারী সুন্দর এ পৃথিবী! গোধূলির রাঙা আলো ধূসর নীল পাহাড়ের গায়ে কেমন চুপটি ক'রে মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে থাকে, পাহাড়ে-বনে কি মধুর সঙ্গীত ওঠে দিন-রাত, মনে হয় আমার জন্য ভুবনশিল্পী কত সৌন্দর্য্যের কত প্রাচুর্য্যের যে আয়োজন করেছেন তার আর অন্ত নেই, নেই।...

কি হবে বাবুল, ভাই, জীবনের ঘানি টেনে টেনে অমন নিরুদ্দেশ চলায়, কি হবে ভাই যন্ত্রাসুরের ব্যর্থ পূজায় চিত্ত নিবেদন ক'রে? শান্তি কি সত্যিই পাস তোরা ঐ চিম্‌নীর ধোঁয়ায়, ইঞ্জিনের চীৎকারে, বয়লারের হুহুঙ্কারে? তার চেয়ে আয় ভাই বাবুল, মাটি-মার এই ঠাণ্ডা কোলখানিতে, এই শান্ত উদাস পাহাড়ের নীচে বাঁশীর সুরের মতো ক্লান্ত রাঙা মাটির সরু পথটির কিনারায়, যাকে ভালোবাসিস তার কথা ভেবে দুটি ফোঁটা চোখের জল ফেল ভুঁয়ে, আর এই অনন্ত রাত্রির বিনিদ্র প্রহর

জেগে-জেগে নক্ষত্রদীপ্ত আকাশের কবিতা শোন্। জীবনের পেয়ালা নে, সারঙ্ বাজা, অমন ক'রে ঘানি টানিস নে,—তোর আর সুধীরের কথা ভাবলে সত্যি-সত্যিই আমার কান্না পায়, যখন ভাবি এই জীবনকে নিয়ে তোরা কি ব্যর্থ জুয়ো খেলতে বসেছিস!...

পৃথিবী যে এত সুন্দর, আগে কোনোদিন বুঝিনি। মাটির বুকে কান পেতে পৃথিবীর হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, আমার বুকে ভূমিকম্পের স্পন্দন উঠছে। কে যেন ভাই চোখে আঁজন বুলিয়ে দিয়ে গেল,—ভোরের আলোর সোনার কাঠি—সব সুন্দর লাগছে! পাহাড়ের নীচে এই যে শুক্‌নো ঝরা পাতাগুলি অস্ফুট মর্ম্মর তুলছে হাওয়ায়, ঝিরঝির ক'রে ওপর ডালের ঐ যে কয়েকটা খেজুর পাতা কাঁপছে, ঐ যে একটা পাথর কতকাল ধ'রে এই কাঁকর-বিছানো পথের ধারে নিশ্চল হয়ে রয়েছে, কত পথিকের স্পর্শ পেয়ে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে আনন্দে, ঐ যে ঘাসের ডগাটি ম্লান সন্ধ্যালোকপানে স্তিমিত চোখে চেয়ে বেদনায় একটু কাঁপছে, ঐ যে শাদা মেঘটার ধারে আব্‌ছা লালের একটু দাগ—সব যেন বিরাট রহস্য-ভরা চমৎকার! সবাইকে হৃদয় দিয়ে যেন স্পর্শ করছি। মনে হচ্ছে আমি যেন দেবতা।...

আমি ভালোবাসি, আমার এই ছোট বুকে এত গৌরবের স্থান কৈ? জীবনকে যৌবনকে কী যে মধুময় লাগছে ভাই বাবুল, বলতে পারছি না। ভাবছি, যারা জীবনে ভালোবাসার স্বাদ পেলে না কোনোদিন, তাদের মতন হতভাগ্য আর নেই, তারা এই বিপুল জীবনের রহস্যকেই অপমান করলে, তারা নিজেদের মহিমাকে তুচ্ছ ক'রে কত ক্ষুদ্র নগণ্য ও হতাশ হয়ে রইল। ভাই বাবুল, আগে এই ভালোবাসা নিয়ে কত ভুয়ো কবিত্ব করেছি, এখন মনে হচ্ছে ও একেবারে মিথ্যা আজগুবি। ভাবছি—একে রূপ দেওয়া যায় না, ভাষা ভেঙে পড়ে, শুধু রাত্রির অন্ধকার রহস্য-লোকের পানে চেয়ে একে বোঝা যায়।...ঝিরঝির ক'রে ঠাণ্ডা একটু বাতাস এসে কপালে লাগছে কার স্নিগ্ধ নরম হাতটির বুলানির মত,—এই পৃথিবীকে প্রণাম করছি ভাই। সমস্ত পৃথিবী আমাকে যেন কি জিগ্‌গেস করছে করুণ নয়নে চেয়ে, সন্ধ্যাতারার চাহনিটি কি ম্লান, আমি প্রশ্ন বুঝতে পারছি, কিন্তু জবাব দিতে পারছি না।

ভাই, সকল ভালোবাসার মধ্যে একটি ক্লান্তি একটি অপরূপ ব্যথার স্বাদ আছে। কেন যে এই ব্যথা এর সংজ্ঞা দিতে পারি না। ভারী মিষ্টি এই ব্যথাটি! একে চোখের পাতায় রাখি, আর এই ব্যথাটি গ'লে ঝ'রে পড়ে। ভারী ভালো লাগে। তাকে পাব কি পাব না, সে সব কিছু ভাবি না, শুধু ভাবি তাকে ভালো লাগে, তাকে ভালোবাসি, সে আমার চোখে এই পৃথিবীকে সুন্দর মধুর পবিত্র ক'রে তুলেছে।

কোথা থেকে কোন্ অনাদি অসীমের বার্তা সে নিয়ে এল তার আঁখির তারায়, তার দুটি হাতের স্পর্শে—আমি সেই ডাকে বেরুলাম পথে-পথে ঘরছাড়া আর নাম-হারাদের দলে।…

সেদিন সে অর্গ্যানটার সামনে ব'সে একটা বসন্তের গান গাইছিল। গানটি গেয়ে সে চুপ করল। সে চুপ ক'রে চেয়ে-থাকাটির মধ্যে যে এত গান আছে, আমি জানতুম না। আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম সেই স্তব্ধতার সুর শুনে। আস্তে-আস্তে একটি আঙুল দিয়ে তার বাঁ হাতের একটি আঙুল স্পর্শ করলাম, তারপর আর একটি দিয়ে আর একটি। খানিকক্ষণ রইলাম,—আমার সমস্তটি দেহ যেন একটি সেতার—তারপর আবার আস্তে আস্তে আঙুল দুটির ক্ষণিক বন্ধুত্ব ঘুচিয়ে দিলাম। একটি চুল হাওয়ায় তার চেয়ারের হাতলটার ওপর একটু কাঁপছিল, এটিকে ছোঁবার জন্য আমার সমস্ত দেহ উৎসুক ব্যগ্র হয়ে টলছিল, খুব ধীরে ধীরে সেটিকে স্পর্শ করলাম, তারপর আস্তে-আস্তে তার গহন-কালো শাড়ীর লাল-পাড়টি! ভাই বাবুল, কিছু মনে করিসনি, এই প্রেমের নেশা আমাকে উদাস ক'রে তুলেছে, ভারী ভ'রে আছে বুক, তুই ছাড়া আর কেউ নেই যাকে এ বোঝাই, কে-ই বা বোঝে? বঁটিতে তার বাঁ হাতের একটি আঙুল কেটে গিয়েছিল, সেই রক্তে লালিয়ে-ওঠা তার আঙুলের ডগাটি আজো আমি ভুলিনি।…

একদিন সে এস্রাজ বাজাবার ভঙ্গীতে পা দুটি সামনের দিকে কাৎ ক'রে গুটিয়ে চুল বাঁধছিল হাত দুখানি তুলিয়ে, আর পাৎলা দুটি ঠোঁট ফুলের পাপড়ির মতন কাঁপিয়ে আমার কবিতার প্রশংসা করছিল। চুল বাঁধা সাঙ্গ হওয়ার পর দেখি, হাওয়ায় চিরুণী-থেকে-খসা তার রুক্ষ ছেঁড়া চুলের কতগুলি গুছি মেঝেয় উড়ছে, তার অলক্ষিতে সেই চুলগুলি পকেটে পুরলাম। আমার প্রাণে এ কিসের প্রলোভন বুঝি না। ঐ চুল দিয়ে আমি কি করব? তবুও চুলগুলি একটা চওড়া লেপাফায় ক'রে ট্রাঙ্কের তলায় লুকিয়ে রেখেছি।—

তার একদিন একটু বেশী জ্বর হয়েছিল। আমি পাশে ব'সে তার মাথায় হাওয়া করছিলাম। জ্বরে রাঙা শুকনো মুখখানা যে কি সুন্দর লাগছিল, বাবুল! হঠাৎ সে আমার হাতদুটো ধ'রে ফেলে উত্তেজিত কণ্ঠে বল্লে, "তুমি এসেছ? এতদিন বাদে মনে পড়ল?"…সবাই বলছিল মেয়েটা প্রলাপ বকছে, বেশী ক'রে আইস্ ব্যাগ দাও, কিন্তু জানিস ভাই বাবুল, সেই নিবিড় স্পর্শটি এখনো যেন আমার দেহের বীণায় বাজছে। তার পর সে আমাকে আর তেমন স্বরে সম্বোধন করেনি বটে, কিন্তু ব্যথা-ভরা করুণ চোখে চেয়েছে। সে আমাকে ম্লান কণ্ঠে বলত—"তুমি এখন বাড়ী যাও উৎপলদা, আর কত রাত জাগবে?" আমি তার কপালে হাত রেখে বলতাম,—

"আমার জন্য ব্যস্ত হয়ো না লেখা, আমার ঘুম আসে না।" সে আর কথা কইত না, চুপ ক'রে থাকত। বলতাম—"তোমার ঘুম আসছে না?" সে বলত, "না।—তুমি বাড়ী যাও।"—ভাবতাম, আমার আরামের জন্য সে—কিন্তু ভাই বাবুল, সে কি জানে তা'র শিয়রে ব'সে কত দীর্ঘ বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়ে দিতে পারি!

তেলের বাতিটি ঘরের এক কোণে জ্বলত, আমি আব্‌ছায়ায় তার শিয়রে ব'সে রুক্ষ চুলগুলিতে হাত বুলাতাম, পাখা করতাম, আর ভাবতাম—এই গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের যুগে আমরা এবার বাংলা দেশে এসে জন্মালাম। সৃষ্টির আদি কাল থেকে আমরা দুজন প্রেমের নব নব খেলা খেলে এসেছি কভু মিলনে কভু বিরহে। কত জন্মে দান্তে আর বিয়াত্রিস, কীট্‌স্ আর ফ্যানী, ব্রাউনিঙ্‌ আর ব্যারেট। তাকে নিয়ে কত feud, কত bot, কত দ্বন্দ্ব, কত যুদ্ধ, তাকে নিয়ে কত মড়কে কাঁদলাম রুষিয়ায় ফ্রান্সে একটুকরো রুটির জন্য, তার জন্য কত কাঁদলাম আরব-তাতারে দেশে-দেশে ভিক্ষু সন্ন্যাসীর দেশে, কতবার বেদে আর বেদেনী হয়ে পথের পর পথ পার হয়ে গেলাম, গাঁয়ের পর গাঁ! আবার এই জন্মে এই সবুজ বাংলার ঘরে নতুন খেলা খেলতে এসেছি, এই জীবনের কি বিচিত্র সমারোহই যে চলেছে অনন্তকাল ধ'রে! অন্নদাবাবু বলতেন—"পাশের ঘরে তোমার বিছানা করিয়েছি, তুমি এবার শোওগে।" মা বলতেন—"আইস্‌ব্যাগটা এবার আমাকে দাও।" আমি বলতাম—"না, আরো একটু রাত জাগি।"

ভাই বাবুল, জীবন-দেবতাকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নমস্কার কর! আমাদের তিনি কত দিলেন—এই তারায় ভরা মৌন রাত, এই ফেণশীর্ষ উর্ম্মিক্লান্ত সমুদ্র, এই উদার নীলিমাঙ্কিত আকাশ, এই রসসিঞ্চিত পৃথিবী! মার ক্রোড় প্রিয়ার বুক বন্ধুর হাত, ...আমরা কি সব-কিছুরই যোগ্য? একবার ভাব বাবুল কত কিছু তিনি দিলেন—কত লাবণ্য কত আশা কত মাধুর্য্য কত অতৃপ্তি! কিছুরই কি আর শেষ আছে ভাই? আমরা সব কিছুরই কি মান রাখতে পেরেছি? কত অপচয় না করলাম—কত অপমান! তাতেও তিনি দুঃখিত হলেন না, তৃপ্ত হলেন না, আমাদের তিনি পাবার জন্যে বাঁধলেন কত মায়ায় কত মোহে কত প্রণয়ে। আমি তাঁকে যেন দেখলাম, তিনি যেন কার দুটি চোখে আমাকে ডাক দিলেন। আমি সেই ডাক শুনেছি, আমি নিজেকে আর ধ'রে রাখতে পারছি না। অসীম আমাকে ডেকেছে।

শীগ্‌গিরই আবার কলকাতা ফিরে যাব। এখানে এসেছি শুধু দূর থেকে তাকে একটা চিঠি লিখে একখানি জবাব পেতে তার। হয়ত তাকেও পেতে পারি, জানিনা আমার তপস্যা পূর্ণ হয়েছে কিনা, হয়ত হয়েছে, হয়ত সে আসবে। ভাবতে পাচ্ছি না, সমস্ত প্রাণ কিশলয়ের মতো কাঁপছে! যাবার বেলায় সে যে দুয়ার ধ'রে পথের

পানে চেয়ে থাকত, সেই সুরটি এসে মনে লাগছে। আর লিখতে পাচ্ছি না। এখানকার হাওয়ায় তার ভিজা চুলের গন্ধটি যেন পাচ্চি। অনেক বাজে কথা বললাম হয়ত, ক্ষমা করিস, যদি কোনোদিন ভালোবেসে থাকিস, তবে হয়ত বুঝতে পারবি কিছু।

সুধীরের কথা সব জানিস হয়ত, খুব নাম কিনেছে ও। বাঙালীর গৌরব! কিন্তু কি হবে ভাই ঐ যন্ত্রের যজ্ঞে সহস্র নিরপরাধ দরিদ্রদের আহুতি দিয়ে, কলুষে কদর্য্যতায় সমস্ত দেশকে পীড়িত ক'রে? তাকে চ'লে আসতে বলেছিলুম, কিন্তু সে আমাকে গোল্লায় যেতে উপদেশ দিয়েছে।

গোল্লাকে সত্যিই তোরা চিনলি না, মনে হচ্ছে, প্রতি জন্মে এম্‌নি গোল্লায়ই যেন যেতে পারি। আমি জানি, ভারী দরাজ মন সুধীরের, যাকে ও আঁকড়ায়, বিপুল আগ্রহেই তাকে আঁকড়ায়, আঁকড়ায়, কিছুতেই তাকে সে ছাড়তে চায় না। তাকে যখনই আমি দেখি, তখনই সেজদার The Lord of Darkness মূর্ত্তিটার কথা মনে পড়ে,—দুটি চোখে সেই জ্যোতির স্বপ্ন, সেই নিবিড় রাত্রির ঘনিমার রূপ তার পেশীবহুল দৃঢ় দেহে, আর সেই মেদুর মুগ্ধ রাত্রির অপরূপ লাবণ্য তার তারুণ্যমণ্ডিত মুখখানিতে! সে যাকে চায় না, তাকে এম্‌নি ক'রেই চায় না। কিন্তু আমি জানি ভাই, ওর ভুল ভাঙবেই, জীবনে ঐ ভুল না ভেঙে পারে না। হয়ত অনুপাতে তেম্‌নি আবার আঘাত চাই। যন্ত্রের সঙ্গীতের সঙ্গে প্রেমের বাঁশীর সুর কে মেলাবে?

চিঠিটা প্রকাণ্ড হয়ে গেল। পাছে শ্রান্ত হয়ে পড়িস, সেই ভয়ে আর এগোলাম না। কলকাতায় কবে তোর জাহাজ এসে পৌঁছুবে? বিয়ের লাল চিঠি দিয়ে তোকে এইখানে লট্‌কে রাখব, আর ছেড়ে দোব না। ভাই বাবুল, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই জীবন-দেবতাকে নমস্কার কর! ইতি।

উৎপল।

চিঠি পড়তে পড়তে ছেলেটির দুই চোখ জলে ভ'রে উঠল। সে একবার ক্লান্ত উদাস চোখে ছোট্ট কেবিনটি দেখলে। কতগুলি সিগারেটের খোলা বাক্স, রুমাল, নেকটাই, ছেঁড়া ওয়াইন-কার্ড মেঝের ধুলোয় পড়েছিল, সেগুলির পানে একটু তাকালে। চিঠিখানি বুকের ওপর মেলে রাখল, তারপর বালিশের তলা থেকে কি একটা শক্ত পিজবোর্ডের মতো বা'র ক'রে বুকে চেপে ধরল।

জাহাজের গায়ে প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউটি তখন মৃদু মৃদু করতালি দিচ্ছে।

। তেইশ ।

"মাসীমা!"

"কে মা, চারু? আয় এই ঘরে।"

মা তখন ঘরে মেঝেয় ব'সে চরকায় সুতো কাটছিলেন, চারু ধীরে ধীরে তাঁর পা ঘেঁষে এসে বসল। মা চারুর একান্ত বিষণ্ণ শুকনো মুখখানির পানে চেয়ে ব্যথিত কণ্ঠে বল্লেন—"তোর চেহারা এখনো সারল না যে চারু! একটুও জোর পাচ্ছিস না?"

চারুলেখা চোখের পাতা দুটি নীচু ক'রে আস্তে বল্লে, "যে অসুখটা হয়েছিল, বেঁচে যে উঠেছি, এই ঢের।"

মা বল্লেন, "হাওয়া বদলাতে কেন যাসনে? বেলফুল বল্লে, তুই নাকি যেতে চাস না একেবারে।"

"না মাসীমা, আমার কলকাতাই ভারী ভালো লাগে। কোথাও যেতে চাইনে।"

মা চারুর রুক্ষ চুলগুলি হাতে নিয়ে বল্লেন, "কি জট পাকিয়ে আছে চুলগুলি! বেঁধে দিই?"

চারু ঘাড় নাড়লে।

চুল বাঁধতে বাঁধতে মা বল্লেন, "পরশু তো অন্নপূর্ণার বিয়ে হচ্ছে, জানিস?"

"হ্যাঁ, আমাকে অনেক ক'রে যেতে ব'লে দিয়েছে।"

"যাবি তো?"

"না মাসীমা, আমার ভালো লাগে না কিছু।"

গলার স্বর শুনে মা বিস্মিত হয়ে বল্লেন, "সে কি রে? তোর ছেলেবেলাকার সই অন্নপূর্ণা। যাবি নে? কেন, ঝগড়া হয়েছে বুঝি?"

চারুর চোখের পাতায় এক ফোঁটা জল পড়ি-পড়ি করছিল, সে আঁচলের কোণ দিয়ে জলটি মুছে নিয়ে বল্লে, "না মাসীমা, আমি ঝগড়া করি না। কাল অনেক ক'রে আমাকে যেতে বলে গেছে, কিন্তু—"

"সে কি চারু, কাঁদছিস? কি হয়েছে, আমাকে বলবিনে?"

"কিছুই তো হয়নি মাসীমা। অমনি কেন যেন চোখে জল এসে পড়ল।"

মা আদর ক'রে চারুর মাথাটি কোলে টেনে নিয়ে তরলস্বরে বল্লেন, "নিজে আইবুড় হয়ে আছিস, তাই বুঝি পরের বিয়ের খবর পেয়ে কষ্ট হচ্ছে?—"

চারুর চোখের জলের ওপর লাল একটু হাসির রামধনু ঝিক্‌মিক্ ক'রে উঠল।

মা বল্লেন, "উৎপলের চিঠি পেলি চারু? গিরিডি গিয়ে শরীর সারছে ত ওর?"

হঠাৎ বিবাহপ্রসঙ্গের পর মাসীমার মুখে উৎপলের নাম শুনে চারুলেখার মুখ একেবারে রাঙা হয়ে উঠল। সে নিজেকে আর সামলাতে পারলে না। এতক্ষণ প্রাণপণ শক্তিতে সে প্রাণের সমস্ত আবেগের মুখ চেপে রেখেছিল, তারে আর ধরতে পারলে না, বল্লে, "তুমি অধীরদার কোনো চিঠি পেলে? তিনি কি আর এখানে ফিরে আসবেন না?"

কথার স্রোত উল্টে যেতেই মার বুকে অশ্রু উথল হয়ে উঠল। ভারী গলায় মা বল্লেন, "সুধীর আমার একেবারে ঘরছাড়া হয়ে গেল, কেউ ওকে আর বেঁধে রাখতে পারলে না।—কি যে ওর দুঃখ, কিছু বুঝেও বুঝলাম না। যাবার দিন রাত্রে আর ঘুমোয়নি, খালি পায়চারি ক'রে বেড়িয়েছে। বল্লাম—'হাঁটছিস কেন অমন সুধীর?' বল্লে '—ঘুম আসছে না মা।'—এত টাকা খরচ ক'রে প্রকাণ্ড কারখানাটা খুল্লে, তারপর হঠাৎ কেন যে তেপান্তরের মাঠের পানে ছুটল বনবাসে, আমাকে কিছুই বল্লে না, ভালো ক'রে কিছু বুঝলুমও না।"

"তিনি কি ফিরে আসবেন না আর মাসীমা?"

আঁচলে চোখের জল মুছে মা বল্লেন, "কি ক'রে বলি? চিঠি লিখলাম, ফিরে আয়, সে খালি লেখে—'না মা, বাংলার গৌরব রাখবার জন্য যন্ত্র আমাকে ডেকেছেন, আমি আমার কাজ আধখানা রেখে যাব না। তা ছাড়া ভগবান সবাইকে একই রকম জীবন দেননি মা, কারো হাতে হাতুড়ী, কারো হাতে বাঁশী! আমার জীবনে বাঁশী আর বাজবে না, কি হবে আমার আর ফিরে গিয়ে? এইখানে আমি বেশ আছি।' মা চারু, মা'র ডাক সে শুনলে না, কিন্তু এতবড় সংসারে আর কি কেউ নেই যে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে?"

চারু ঘাড় নীচু ক'রে চুপ ক'রে রইল হাঁটুর ওপর কাতর ম্লান মুখখানি রেখে।

তার পিঠে একখানি হাত রেখে মা বল্লেন, "সুধীর তোকে সেখানে গিয়ে একখানাও চিঠি লেখেনি?"

"না।"

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে মা বল্লেন, "তুই একখানা আগে চিঠি লেখ্ না মা চারু, তাকে বল্, সবাই তাকে ফিরে আসতে বলছে,—ছাখ্ না সে কি জবাব দেয়।"

"তিনি জবাব দেবেন না মাসীমা।"

"কে বললে জবাব দেবে না?"

"আমি জানি।"

"না না দেবে, তুই লেখ্ না একখানা চারু। আমি ত জানি, তুই লিখলে সে শত কাজে ব্যস্ত থাকলেও জবাব দেবেই।"

চারুলেখার জলে-ভেজা দীর্ঘায়ত চোখের পাতাদুটি একটু কেঁপে উঠল, সে ঘাড়টি আর একটু নীচু ক'রে কান্নাকাঁপা গলায় বল্লে, "আমি লিখতে পারব না মাসীমা।"

"কেন, কেন মা চারু?"

চারু মাথা তুলে বল্লে, "চিঠি লিখে ডেকে আনার হীনতাকে আমি সহ্য করতে পারছি না। তিনি যদি আমাদের ভালোবেসে থাকেন, তবে তাঁর আপনার থেকেই চ'লে আসা উচিত! আমাদের ওপর তাঁর যদি কিছুমাত্র স্নেহের দাবী থেকে থাকে, তার খেলাপ করলে তাঁকেই ঠকতে হবে। তাঁর এই নিষ্ঠুরতার ভুল একদিন ভাঙবেই মাসীমা, সে দিনই তিনি ফিরে আসবেন। সে দিনটির জন্যে প্রতীক্ষা ক'রে থাকাটাই পরীক্ষা।"

মা বিস্ময়বিমুগ্ধ নয়নে চারুর আবেগদীপ্ত চোখদুটির পানে চেয়ে রইলেন।

কতক্ষণ কেউ আর কোনো কথা কইল না। মা চরকা কাটতে লাগলেন আর চারু তুলো পাজতে লাগল।

হঠাৎ চারু তুলোগুলো প্যাট্‌রার মধ্যে রেখে উৎসুক কণ্ঠে বল্লে, "ওপরের বন্ধ ঘরের চাবীটা অধীরদা কি নিয়ে গেছে মাসীমা, না তোমার কাছে আছে?"

"আমার কাছেই আছে। কেন?"

"আমাকে দাও না।" চারু কথাটা বলেই চোখ নামিয়ে নিল।

মা চারুর এই আকস্মিক খেয়ালের কারণ জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কথার শেষে তার সর্ব্বাঙ্গে একটি সুন্দর ব্রীড়ার রক্তিমা ফুটে উঠতে দেখে আঁচলের থেকে চাবির গোছাটা খুলে তার হাতে দিয়ে বল্লেন, "নে।"

চারু চাবিটা পেয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মা চেঁচিয়ে ডাকলেন, "কোন্ চাবিটা চিনে যা।"

চারু জবাব দিলে, "আমি চিনি।"

আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে ওপর উঠে চাবি দিয়ে আস্তে-আস্তে দুয়ার দুটি খুলে চারুলেখা অতি আস্তে-আস্তে ঘরে এসে ঢুকল। বিশৃঙ্খল অন্ধকার ঘরটি ধুলোয় আর আবর্জ্জনায় নোংরা হয়ে রইলেও চারুর চোখে সমস্ত যেন অপরূপ বিস্ময়ভরা পরম রমণীয় ব'লে প্রতিভাত হচ্ছিল। সে আর একটু এগিয়ে মৃণালশুভ্র গ্রীবার ওপর শাড়ীর আঁচলটি টেনে নিয়ে ভাঙা কলকব্জার স্তূপের পাশে নত হয়ে কার উদ্দেশে বারে বারে প্রণাম করতে লাগল। দুটি ফোঁটা চোখের জল মেঝের

ধুলোর ওপর ঝ'রে পড়ল। দাঁড়িয়ে উঠে সে আস্তে আস্তে সমস্ত জিনিষগুলি হাত দিয়ে স্পর্শ করল। এক জায়গায় দেখতে পেলে কতগুলি মডেলের ভাঙা টুকরো পড়ে আছে। সেগুলি সে আঁচলে বেঁধে নিলে। আর কতক্ষণ বাদে দরজাটা বন্ধ না ক'রেই নেমে গেল নীচে।

মা তখনো চরকা কাটছিলেন, তাঁকে বল্লে, "ঘরটা খোলাই রেখে এলাম মাসীমা, এটা খোলাই থাক। আজ আর কিছু হোল না, আমি আর একদিন এসে ঘরটা গুছিয়ে দিয়ে যাব।" বলেই চাবিটা মেঝের ওপর তাঁর পাশে ফেলে দিয়ে সে একছুটে বাইরে এসে পড়ল।

চারুলেখা তাদের বাড়ীর মুখে এগোতেই দেখতে পেলে একখানা রাঙা মিহিশাড়ী প'রে অন্নপূর্ণা আসছে। কি সুন্দর তাকে দেখাচ্ছে আজ! বুকের গোলাপ-রঙের ব্লাউজটির ওপর সোনার হারটি কি সুন্দর একটু দুলছে, ঠোঁটের ফাঁকে আলতার দাগের মতন কি হাল্কা একটি হাসি, চুলগুলি কেমন নরম ক'রে বাঁধা, চোখের তারায় কেমন সুন্দর দুটি প্রদীপ জ্বলছে। চারু দাঁড়াল, অন্নপূর্ণার হাতটি ধ'রে টেনে তাকে বাইরের ঘরে নিয়ে শুধোলে—"নিজেই নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছিস নাকি?"

অন্নপূর্ণা একটা চেয়ারে ব'সে ফিকা একটু হাসলে, বল্লে, "না ভাই, নেমন্তন্ন করতে আমার ভাল লাগে না।"

"তবে? এমন সময়?"

ব্যথিত কণ্ঠে অন্নপূর্ণা বল্লে, "ভালো লাগছিল না ভাই, বাড়ীর ঐ সমারোহের অত্যাচার, তাই একটু হাঁপ ছাড়তে তোর কাছে চলে এলাম—"

চারু বল্লে—"খুব ফুর্ত্তি হচ্ছে বুঝি? একা বুঝি ভালো লাগে না? তাই বুঝি ভাগ দিতে এসেছিস, না পূর্ণা?"

অন্নপূর্ণা উদাস চোখে চেয়ে কান্নাভরা কণ্ঠে বল্লে,—"ফুর্ত্তি? ভাই চারু—"

"সে কি পূর্ণা, কাঁদছিস তুই?" ব'লে চারুলেখা তার হাত দুটো কঠিন ক'রে চেপে ধরল।

অন্নপূর্ণা সেই নিবিড় স্পর্শটির ওপর সমস্ত দেহের ভর রেখে কান্নাগলা স্বরে ব'লে যেতে লাগল—"ভাই চারু, বাংলার মেয়েরা কত অসহায়, কত দুর্ব্বল। পারলুম না ভাই, পারলুম না, এই অবরোধের শিকল ছেঁড়বার শক্তি আমাদের বিধাতা দেন নি। যাকে দিয়েছিলেন সে ঘর ছেড়ে উধাও হয়ে চলে গেল নিরুদ্দেশের অভিসারে। ভেবেছিলুম আমাকে মুক্তি দিতে একদিন সে বুঝি আসবে।

কিন্তু ভাই চারু, সে আসে না, এমন ক'রে অধিকারের জোর দেখায় আর তার মর্য্যাদা রাখতে পারে না। ফুর্ত্তি?"

চারু তার মাথাটি কাছে টেনে নিয়ে কাতর স্বরে বল্লে, "এই বুক-ভরা কান্না নিয়ে আমার কাছে হাঁপ ছাড়তে এসেছিস পূর্ণা! কিন্তু ভাই, আজো আমার প্রতীক্ষার ব্রত ভাঙেনি, জানি—"

ফুঁপে উঠে অন্নপূর্ণা বল্লে, "সে আসবে না চারু, সে আসবে না—কিন্তু তোরা স্বাধীন সম্প্রদায়ের লোক, তুই হয়ত পারবি, কিন্তু ভাই আমি পারলুম না, আমার দম আট্‌কে গেল, নিজের গলায় নিজেকেই ফাঁসী পরাতে হল।"

কোথা থেকে যে এই বিপুল কান্নার শ্রাবণ নেমে এল, তাদের কারো কিছু ঠাহর হোল না। দিনের আলো ম্লান মুমূর্ষু হয়ে এলে অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি চারুর বুকের থেকে মুখ তুলে ভাঙ্গা গলায় বল্লে, "এবার যাই ভাই। তুই চেয়েছিলি আনন্দের ভাগ, কিন্তু শুধু-শুধু তোকে কাঁদিয়ে চল্লাম। একেবারে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কিন্তু যাস ভাই আমার মৃত্যু-অভিনয়টা দেখে আসতে।"

অন্নপূর্ণা উঠতে যেতেই রাস্তার থেকে তার দাদা হাঁক দিলেন, "অন্নপূর্ণা এখানে আছিস?"

অন্নপূর্ণা বেরিয়ে আসতেই তিনি কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠলেন, "সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এতক্ষণ এখানে কি করছিস? এতবড় ঢেঙা হলি, এখনো হায়া হল না? এখন এতটা রাস্তা হেঁটেই যাই আর কি!"

অন্নপূর্ণা চারুর পানে আর একটি পরম বিষণ্ণ একান্ত দুঃখী দৃষ্টি ফেলে ধীরে-ধীরে তার দাদাকে অনুসরণ করল।

চারুলেখা ওপরে উঠতেই সুনয়নী দেবী বল্লেন, "তোর একটা চিঠি এসেছে, টেবিলের ওপর আছে।—বেলফুলের বাড়ী গিয়েছিলি বুঝি? নীচে অন্নপূর্ণার গলা শুনলাম না!"

চারু মার কোনো কথার উত্তর দেবার জন্যে দাঁড়াল না। তার চিঠি এসেছে শুনে তার সমস্ত রক্ত ঝিলমিল করছিল। সে ঘরে ঢুকেই আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে দিলে। যদি তিনি লিখে থাকেন চিঠিটা! দিদির চিঠি ত বিকেলের ডাকে আসে না।

সে ব্যগ্র হাতে সুদৃশ্য গন্ধযুক্ত খামখানা হাতে তুলে নিলে। তখনো তার বুক কাঁপছে। হাতের লেখাটি দেখে তার একটু সন্দেহ হোল। কিন্তু তার মন যার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষায় প্রতীক্ষা করছে, তার ছাড়া এ চিঠি আর কারুর হতে পারে সে ভাবতে পারছিল না। সে কম্পিত হাতে খামের মোড়কটা খুলে ফেললে। সম্বোধন, প্রথম লাইন ও ইতিতে নাম দেখে তার সন্দেহ আর মিথ্যা রইল না।—

চারুলেখা টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে টেবিলে মাথা গুঁজে প'ড়ে রইল।

সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত এম্‌নি ক'রে মানুষের জীবনে এক একটা কেবল কান্নার দিন আসে।

॥ চব্বিশ ॥

সুধীর বল্লে—"আচ্ছা, আমি তবে যাই।"

ষ্টেশনমাষ্টার বল্লেন, "বিলক্ষণ! এই তোমায় এত ক'রে সব দেখাবার কষ্ট দিয়ে এখনি ছেড়ে দিচ্ছি আর কি? এই সমস্ত ঘোরাঘুরি ক'রে দেখিয়ে কি কম শ্রান্ত করেছি তোমায়!"

"আপনারাও তো শ্রান্ত হয়েছেন। এখন একটু বিশ্রাম করবেন না?" ব'লে সুধীর সেবার মুখের দিকে চাইল। সেবার স্বাভাবিক উজ্জ্বল মুখে একটা ক্লান্ত বেদনার ছায়া পড়েছিল। সে কিন্তু কোনো কথা বললে না।

প্রৌঢ় কিন্তু কোনোমতেই ছাড়লেন না, বল্লেন, "একটু বিশ্রাম না করলে যেতে দেব না।" তারপর শতমুখে সুধীরের ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশলের প্রশংসা আরম্ভ করলেন।

সুধীর তার এরকম ও এর চেয়ে উঁচুদরের প্রশংসা অনেক শুনেছে ও পড়েছে, কিন্তু আজ সামনের ওই নীরব মেয়েটির শ্রান্ত ঘর্ম্মবিন্দুশোভিত মুখের দিকে চেয়ে এই প্রশংসার প্রেরণায় সে অনেক নতুন কথা ভাবছিল। এই দেশব্যাপী প্রশংসার এককণা সেখানে কি পৌঁছোয় নি? যে একদিন তার সামান্য একটা খেল্‌না নির্ম্মাণের কৌশল দেখে আনন্দে অধীর হয়ে উঠত, সেই চারুর অন্তরকে আজ তার এই অশেষ খ্যাতি কতটুকু নাড়া দেয়? সত্যি কি সে এত পর হয়ে গেছে তার কাছে? জীবন-দেবতার এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস! কৈশোর যার সঙ্গে যার স্মৃতিতে যার স্পর্শে ভরপুর হয়ে রইল, যৌবন তার নাগালই পাবে না? এবং এ বিচ্ছেদ কি অসীম! কাল যদি উৎপল তাকে বিবাহ করে তা হলে তার কথা চিন্তাও হয়ত অন্যায় হবে।

সেবা ধীরে ধীরে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুধীর ভাবতে লাগল, আজ দেশ তার ললাটে যে গৌরবের টীকা পরিয়ে দিচ্ছে, এই গৌরব তার হৃদয়ের অসীম বুভুক্ষা মেটাতে পারবে কি? খ্যাতির মূল্য যদি এই জীবনভরা হাহাকার হয়, তা হলে তার সামান্য প্রতিভাহীন একটি বাংলার নগণ্য ছেলে হওয়া যে অনেক ভাল ছিল।

ষ্টেশনমাষ্টার টুপিটা মাথায় দিয়ে বল্লেন, "তুমি একটু বোস বাবা, আমি আফিসে একটু দেখা দিয়ে আসি। ততক্ষণ সেবাকে চায়ের জল চড়িয়ে দিতে বলে যাচ্ছি।"

আপত্তি নিষ্ফল হবে জেনে সুধীর সায় দিলে।

সেবা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে, "চায়ের সঙ্গে কি খাবেন? টোষ্ট করব না পরোটা ভাজব?"

সুধীর তার ক্লান্ত মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, "আপনাকে আর এই ক্লান্ত শরীরে চা করতে হবে না। চা খেতে এখন ভালো লাগছে না।"

তারপর বল্লে, "আপনি আজ সমস্তক্ষণ একটিও কথা বলেন নি কেন, বলুন ত! কোনো অসুখ করেছে কি?"

"কই না! অসুখ করবে কেন? সেদিন আপনার কাছে অমন প্রগল্‌ভতা করেছি ব'লে রোজই করব, অত নির্লজ্জ আমায় ভাবছেন কেন?"

সুধীর ব্যথিত কণ্ঠে বল্লে, "সেদিন কি যে প্রগল্‌ভতা আপনি করেছিলেন যার জন্যে বারবার সে কথা তুলে আপনি নিজেকে ঘা দিচ্ছেন, আমি ত এখনো বুঝলুম না।"

"সিভ্যাল্‌রি দিয়ে সত্য কথাটা ঢাকা যায় বটে, কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

"না, আপনার সঙ্গে পারা গেল না। আচ্ছা, আজ কি রকম দেখলেন বলুন।"

সেবা পাশের চেয়ারটায় ব'সে প'ড়ে বল্লে, "আমার মতো সামান্য লোকের প্রশংসায় কি যাবে আসবে আপনার, আর আমি বুঝিই বা কি?"

"আপনাদের মতো সামান্য লোকের প্রশংসা নিন্দায় পৃথিবীর অনেক কিছুই আসে যায়, এ আপনি ভালো রকমই জানেন।"

ঈষৎ রাঙা হয়ে উঠে সেবা সে কথার উত্তর না দিয়ে বল্লে, "আমাকে মাপ করবেন, কিন্তু সমস্ত দেখা-শোনার মাঝে আমার মনে ক্রমাগত যে লোকটির হাত মুখ কলে থেঁৎলে গেছে তার কথাই উঠছিল। আমি ভালো ক'রে অন্য কিছু দেখতে পারিনি।"

সুধীর একটু বিস্মিত হয়ে বল্লে, "কিন্তু ওরকম তো আমাদেরই কাজে আরো কতজনের হয়েছে। ও সব ছোট দুঃখ দেখতে গেলে আর বড় কাজ করা চলে না।"

"কিন্তু ওই মানুষগুলোর দুঃখই ছোট, আর আপনার কাজ বড় সে-বিষয়ে যে এখনো আপনাদের মতো নিঃসংশয় হতে পারিনি।"

সুধীর অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, "আপনারা সকলেই যে এক সুরে কথা কইতে আরম্ভ ক'রে দিলেন।"

"সকলেই মানে?"

"আমার এক পুর্ব্বেকার বন্ধুও ওই রকম কথা বলে।"

"আমার মনে হয় তিনি মিথ্যা বলেন না। এ সব দেখলে আমি মনে কেন জানি না আনন্দ পাই না। হয়ত এ আমার ভুল, কিন্তু ওই আপনাদের দরিদ্র কুলিদের অবস্থা দেখলে কি মনে হয় বলুন ত!"

সুধীর খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বল্লে, "কিন্তু তাদের অবস্থার জন্যে কি আমরা দায়ী?"

"তর্ক করলে হয়ত আপনার দায়িত্বতা প্রমাণ করতে পারব না, কিন্তু অন্তর দিয়ে যে বুঝছি আপনারাই দায়ী।"

সুধীর এবার হেসে বল্লে, "বা, তা হলে এই যে জড়শক্তিকে জয় করার চেষ্টা মানুষের, একে আপনি অন্যায় বলতে চান?"

"এই শক্তি-অর্জ্জনকে অন্যায় বলছি না, কিন্তু এই যে শক্তির অন্যায় ব্যবহার যাতে মানুষের সুখের বদলে দুঃখই বাড়িয়ে দেয় সেই অন্যায় ব্যবহারকে নিন্দা করছি।"

"দুঃখ যে বাড়ছে, তার প্রমাণ তো আমি কিছু দেখছি না।"

সেবা চুপ ক'রে রইল।

সুধীর বল্লে আবার, "যখন যন্ত্র ছিল না তখন কি সকলে ভয়ানক সুখে ছিল আপনি বলতে চান?"

সেবা ধীরস্বরে বল্লে, "আপনি যদি নিজে এই কুলীদের দুঃখ না দেখতে পান তাহলে আপনাকে তর্ক ক'রে তা বোঝবার চেষ্টা করা বৃথা।"

সুধীর একটু রুক্ষ স্বরে বল্লে, "মাপ করবেন, কিন্তু আমার মনে হয় এই সমস্ত কথা শুধু শুনতেই সুন্দর ও মধুর, তাই আপনাদের মতো যারা পৃথিবীর অন্তরের খোঁজ না রেখে স্বপ্ন নিয়েই কাটায়, তাদের মুখেই শোভা পায়!"

"আমার মনে হয় আমরা যদি স্বপ্ন দেখে থাকি, আপনারা দেখছেন দুঃস্বপ্ন। আমাদের কথা শুনতে মধুর আপনিই স্বীকার করছেন কিন্তু আপনাদের কথা যে শুনতেও কটু ও করুণ।"

খানিক থেমে সেবা উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগল, "আপনিই তখন পঞ্চাশ জন কুলির জলের তোড়ে ভেসে পাহাড় থেকে প'ড়ে যাবার কথা বলেছেন। এই পঞ্চাশ জনই যদি স্ব ইচ্ছায় কোনো গৌরবের জন্যে প্রাণ দিত তবে এই প্রাণ দেওয়ার ভেতর এত দুঃখ এত বেদনা থাকত না। কিন্তু এরা প্রাণ দিলে যে যন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় তার গৌরবের এক কণা তাদের জন্যে কেউ পরিবেশন করবে কি? পেটের দায়ে অনাহারী থেকে নিজেকে বাঁচাতে তারা অসহায়ভাবে পশুর মতো প্রাণ দিলে, কিন্তু

মানুষের মূল্য আপনাদের কাছে এত অল্প হয়ে গেছে যে এই প্রাণ নেবার লজ্জা এতটুকু আপনাদের বিচলিত করলে না। কোনো মহৎ অনুপ্রেরণায় তারা সে কাজে যায়নি, তাই তাদের দিক থেকে এই মৃত্যুটা এত করুণ এত ব্যর্থ এত অকারণ। আর শুধু ত এই পঞ্চাশ জন নয়, তাদের মতো আরো পাঁচশ জন যে ধীরে ধীরে জীবন ও জীবনের চেয়ে বড় জিনিষ তাদের মনুষ্যত্ব খোয়াচ্ছে। ঐ ত আপনাদের কুলিদের থাকবার পল্লীটা দেখে এলুম, বলুন ত ওখানে পশুর মতো ছাড়া মানুষ থাকতে পারে কি না। বিলেতে গোটাকতক নিষ্কর্মা লোক বৎসরের শেষে শতকরা দু'শ টাকা লাভ করে ফুর্তি করবে, আর তার জন্যে শুধু পশুর মতো খেটে মরবে শুধু দু'মুঠো ভাতের জন্য এখানে হাজার কুলী! জানি, বিশ্বজোড়া এই অবিচারের বিরুদ্ধে আমার মতো সামান্য একটা মেয়ের মুখের কথায় কিছু ফল হবে না, কিন্তু না ব'লেও পারি না। আপনার কলকৌশলের কথা ভাবলেই তার সঙ্গে আমার মনে পড়ে ঐ হাত-মুখ থেঁৎলান কুলীটাকে। সমস্ত কুলীর দলকে আমি ওই লোকটির ভেতর দেখতে পাই। অমনি তাদের মনুষ্যত্ব থেঁৎলে বিকৃত পঙ্গু হয়ে গেছে।"

সুধীর কোন কথা বল্লে না।

সেবা স্বর নামিয়ে লজ্জিতভাবে বল্লে, "আবার দেখুন অনেক বেশী কথা ব'লে ফেল্লুম, কিন্তু কতবার আর ক্ষমা আশা করা যায় আপনার কাছে!"

"এ রকম বেশী কথার জন্যে আপনাকে সহস্র বার ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছি, যদিও ক্ষমা করবার মত কি দোষ হয়েছে আমি জানি না। দেখুন, এ পর্য্যন্ত যন্ত্র-নির্ম্মাণই আমার তপস্যা ছিল, কিন্তু যন্ত্রের ব্যবহার নিয়ে মাথা কখনো ঘামাইনি, সুতরাং এদিক দিয়ে কথাটা বিশেষ ক'রে ভাবিনি কোনোদিন। তবু আমার এতে কি দোষ হয়েছে তা তো বুঝতে পারলুম না। আমি যন্ত্র নির্ম্মাণ করেই খালাস, তার ব্যবহার যদি অপরে অন্যায়ভাবে করে আমি তার কি করতে পারি! আপনি কি বলেন আমি এ কাজ ছেড়ে দেব?"

সে বল্লে, "সে কথা আপনাকে আমি বলতে যাব কেন, কোন্ অধিকারে?"

সুধীর অপ্রতিভ হয়ে বল্লে, "না না, আমি শুধু বলছি আপনার মতে আমার এমন কাজ ছেড়ে দেওয়া উচিত কি?"

"সে মতামত আপনি ঠিক করবেন।" তারপর হেসে সেবা বল্লে, "আমি ত শুধু খানিকটা বাহাদুরী ক'রে বক্তৃতা দিলাম বই ত নয়।"

"বাহাদুরী ক'রে বা যাই ক'রে হোক, এমন বক্তৃতা দিয়েছেন যে আমাকে দস্তুর মতো নাড়া খেতে হয়েছে। বাঙালীর মেয়েরা এসব কথা ভাবে আমি জানতুম না।"

সেবা লজ্জিত হয়ে বল্লে, "আমার মুখে এই গোটাকতক মামুলী কথা শুনেই

যখন এত তারিফ করছেন, তখন বাঙালীর মেয়ে সম্বন্ধে আপনার অজ্ঞতা খুব বেশী বলতে হবে।"

"তা নয়, তবে মেয়েদের সম্বন্ধেই আমার অজ্ঞতা খুব বেশী বটে, আমি তাদের বুঝতে পারি না।" ব'লে সুধীর অন্যমনস্ক হয়ে গেল।

"তারা কি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রব্লেমের চেয়েও জটিল?"

"আমার ত মনে হয় অনেক বেশী।"

"কোনোদিন বুঝি সমাধান করতে গিয়ে বিফল হয়েছেন?" বলেই সেবা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। কিন্তু সে লজ্জা একটুও লক্ষ্য না ক'রে সুধীর বল্লে, "সে কথা যাক, কিন্তু আমি ত এই কুলী মজুরদের দুঃখ দূর করবার কোনো পথ দেখতে পাই না। তাদের দুঃখকে যতদিন স্বাভাবিক উপায়হীন ভাগ্যদোষ ব'লে ভুল করেছি ততদিন কোনো বালাই ছিল না, কিন্তু আজ আপনি যখন আমাদের তাদের দুঃখের জন্যে দায়ী করলেন তখন ত আর একেবারে এড়িয়ে যেতে পারি না।"

সেবা বল্লে, "না, আমি অনেক বাজে বকেছি, আর দুর্ব্বলতা প্রকাশ করতে চাই না।"

সুধীর চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, "আচ্ছা, আজ আপনি শ্রান্ত আছেন, আজ থাক, কিন্তু আর একদিন আপনাকে ছাড়ব না ব'লে রাখছি। এখন আসি।"

"বাবা কিন্তু আপনাকে বসতে ব'লে গেছলেন।"

"তাঁর কাছে আমার ক্ষমা ভিক্ষা জানাবেন। আর থাকতে পারি না।" ব'লে সুধীর বেরিয়ে গেল।

॥ পঁচিশ ॥

আগের দিন হিন্দুস্থানী আর পাঞ্জাবী কুলীদের মধ্যে একটা বিষম মারপিট হয়ে গেছল। দুপক্ষের বিচার করতে সুধীর আর ম্যানেজার সাহেব সেখানে গেছলেন। সুধীর সেখানে গিয়ে মারপিটের কারণ শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। এর আগে পাঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানীদের মধ্যে ছোটখাট অনেক ঝগড়া হয়ে গেছল, কিন্তু এমন রক্তারক্তি ব্যাপার কখনো হয়নি। তিনজনের মাথা ফেটে গেছল গুরুতর আঘাত পেয়ে এবং আরো জন বিশেক দু'পক্ষের কম বেশী আঘাত খেয়ে শয্যাশায়ী হয়েছিল।

দু'পক্ষের ওকালতির মধ্যে সত্য মিথ্যা নিরূপণ করা শক্ত হলেও জানা গেল যে একজন পাঞ্জাবী কুলী সস্ত্রীক বাস করত ও স্ত্রীর ওপর নাকি ভয়ানক অত্যাচার

করত। হিন্দুস্থানী কুলীরা বলে তাদের একজন সেই প্রহৃতা স্ত্রীর চীৎকার শুনে বাধা দিতে যাওয়া থেকে বচসা হয়েই এই মারপিটের সূত্রপাত, আর পাঞ্জাবী কুলীরা বলে, একজন হিন্দুস্থানী কুলী তাকে নিয়ে পালিয়ে যায়, তারপর তারা খুঁজে বার করার পর তারা তাকে ছাড়তে না চাওয়ায় এই মারপিটের সূচনা। যে স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে এই কাণ্ড, তার বয়স বছর ত্রিশ হবে, একটা চোখ কানা ও মুখময় বসন্তের দাগ। তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে কোন কথা পাওয়া গেল না। সে ক্রমাগত ব'সে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতেই ব্যস্ত; যে হিন্দুস্থানীর নামে মেয়েমানুষটিকে নিয়ে পালিয়ে যাবার অভিযোগ ছিল তাকে পাওয়া গেল না। স্ত্রীলোকটির স্বামীকে তলব করলে একজন পাঞ্জাবী বল্লে, সে কাল রাত্রেই কলেরায় মারা গেছে এবং তার সেই কলেরা হবার সময়ই সুযোগ পেয়ে হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে যাবার সুবিধা পেয়েছে!

সুধীর জিজ্ঞেস করলে, "কলেরা? এখানে কলেরা হচ্ছে নাকি?"

তারা বল্লে, "কেন, আজ চার পাঁচ দিন হ'তে কলেরা আরম্ভ হয়েছে। এর মধ্যেই জন দশেক সাবাড় হয়ে গেছে—"

সুধীর অবাক হয়ে ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলে, "কলেরা হয়েছে সে কথা ত আমরা কেউ জানি না!"

ম্যানেজার বল্লে, "ওদের কলেরা-ফলেরা ত হামেশাই হচ্ছে, তার জন্যে আর ঢেঁড়া পিটে বেড়ান যায় না।"

সুধীর ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লে, "ঢেঁড়া পিটে বেড়ান যায় না, কিন্তু কি ব্যবস্থা হয়েছে শুনি!"

ভ্রূকুটি ক'রে ম্যানেজার বল্লে, "সে ওদের ঠিকাদার জানে, আমরা তার কি করব!"

সুধীর বিরক্ত মুখে জিজ্ঞাসা করলে, "ঠিকাদার কোথায়?"

ঠিকাদার নতুন কুলী আনতে বেরিয়ে গেছে, চার পাঁচ দিন পরে আসবে জানা গেল। সুধীর জিজ্ঞাসা ক'রে জানলে এই সমস্ত কুলী অন্য সব বিষয়ে তাদের অধীন হলেও টাকা-কড়ি সংক্রান্ত বিষয়ে ঠিকাদারের অধীনে। ঠিকাদারই তাদের নানা স্থান থেকে সংগ্রহ ক'রে আনে ও মাইনে ইত্যাদি দেওয়ার সেই মালিক। কি ওষুধ দেওয়া হয়েছে জানতে চাওয়ায় তারা বল্লে, বিলিতি দাওয়াইতে তারা বিশ্বাস করে না, তাদের মধ্যে একজন মন্ত্র-টন্ত্র জানে, তাকে দিয়েই ঝাড়ফুঁক করিয়েছে।

সুধীর প্রথমে দূর থেকে এই মজুরদের দুঃখের দায়িত্ব ভাগ্যের ওপর ফেলে নিশ্চিন্ত ছিল এবং সেদিন সেবার কথায় সে মনোভাবের কিছু পরিবর্তন না হলেও মজুরদের দুর্দশার পরিমাণ যে কত তা কোনো দিন জানবার চেষ্টা করেনি।

শুধু বাইরের দারিদ্র্য ছাড়া তাদের মনের অন্ধকার যে এত বেশী ও নীতিজ্ঞানের যে এত অভাব তা সে কোনো দিন ভাবেনি। প্রমাণাভাবে বিচারে কিছু সাব্যস্ত করতে না পেরে ম্যানেজার সাহেব চ'লে গেলেন। সুধীর কিন্তু কুলীদের বল্লে, "কই, কাদের কাদের ঘরে কলেরা হয়েছে নিয়ে চল ত।"

তারা বেশ একটু অবাক হয়েই সুধীরকে নিয়ে প্রথম যেখানে গেল সে ঘরের ও ঘরের রোগীর অবস্থা দেখে সুধীর আশ্চর্য্য হয়ে গেল। একটা ছেড়া নোংরা চাদরের ওপর প'ড়ে মল ও বমনে মাখা হয়ে কুলীটি ছটফট্ করছিল। অতি ক্ষুদ্র ঘর, পাশেই হাড়িকুঁড়ি ও পিতলের একটা থালা। একটা মাটির কলসী ছিল, কিন্তু সেটা কোনরকমে প'ড়ে ভেঙ্গে গেছে, জল মেঝেময় গড়িয়ে গেছে। তাদের আসতে দেখে লোকটা ক্ষীণ স্বরে জল ব'লে চীৎকার করবার চেষ্টা করলে। ঘরটা থেকে অসহ্য দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল। একজনকে জল আনতে পাঠিয়ে সুধীর জিজ্ঞাসা করলে "কখন হয়েছে?"

লোকটা তার কোন উত্তর না দিয়ে ছটফট্ করতে করতে ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে তাকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করতে লাগল, সেখানে তার মা আছে, বৌ আছে, সে আর বাঁচবে না। একবার শেষ তাদের দেখতে চায়। বেহারের কোন গাঁয়ে তার বাড়ী, সুতরাং তাকে বাড়ী পাঠান অসম্ভব। সুধীর বল্লে, "ভয় কি, তুমি সেরে যাবে, আবার তোমার বাড়ীতে যাবে।" কিন্তু এই মিথ্যা সান্ত্বনা তার গলা যেন চিরে বেরুল। তাকে জল খাওয়াতে গিয়ে সুধীর জলের চেহারা দেখে যে জল এনেছিল তাকে এক ধমক দিয়ে বল্লে, "বদমাস, এই কি খাবার জল এনেছিস! আক্কেল নেই পাজী?"

সে ক্ষুণ্নস্বরে বল্লে যে ঐ জলই ত তারা খেয়ে থাকে, ওর চেয়ে ভালো জল তারা কোথায় পাবে? সাহেব আর বাবুদের জন্য দশ মাইল দূর থেকে যে জল আসে সে জল ত আর তাদের নয়।

সুধীরের স্মরণ হল সত্যিই ত, সে ভালো জল ত শুধু বাবুদের জন্য ঝর্ণা থেকে আসে। কুলীরা এখানকার কোন্ ডোবার জল খায় সে জানত, কিন্তু সে ডোবার জল যে এমন ভয়ানক, এ সে জানত না। অযত্নসম্ভূত অরণ্যের ডোবার পাতাপচা জল যেমন দুর্গন্ধ তেমন অস্বাস্থ্যকর, স্বাদও বোধ হয় তার তেম্‌নি। লোকটা 'জল জল' ব'লে চীৎকার করছিল। অগত্যা সুধীর তাকে সেই জলই খেতে দিলে। তার মনে হচ্ছিল সে নিজ হাতে ওই মরণাপন্ন লোকটির মুখে বিষের পাত্র ধরেছে।

সুধীর সমবেত কুলীদের বল্লে, "তোমরা এ রকম জল খাও কেন? নালিশ করতে পার না?"

একজন হেসে বল্লে, "গরীবের অত বাবুয়ানীর দাবী কথনো চলে ?"

অসুস্থ লোকটার কাছে একজনকে থাকতে বলায় কেউ রাজী হ'ল না। আরো পাঁচজন এইরকম আক্রান্ত হয়েছে শুনে সে বরাবর ম্যানেজারের কাছে গিয়ে বল্লে, "পাঁচ-পাঁচজনের রোগ হয়েছে, দিন দিন নতুন লোককে রোগে ধরছে, এর কি একটা ব্যবস্থা হবে না ?"

ম্যানেজার সুধীরের অনধিকার চর্চ্চায় বেশ ক্রুদ্ধ হয়ে জবাব দিলে, ওসব বাজে কাজ নিয়ে মাথা ঘামানোর তার সময় নেই, ঠিকাদার আস্‌লে যা হয় বন্দোবস্ত করবে।

সুধীর বল্লে, "কিন্তু ঠিকাদার আসবার আগেই যে এরা মারা পড়বে, তার কি ?"

ম্যানেজার বল্লে, "আমি কি করতে পারি ? ডাক্তারবাবুর কাছে যাও।"

সুধীর রেগে বল্লে, "কিছু না পার ওদের জন্যে একটু ভালো খাবার জলের বন্দোবস্ত ক'রে দিতে হবে।"

ম্যানেজার এবার রেগে বল্লে, "অত দরদ থাকে নিজের জলের ভাগ থেকে দাও গে, ক্যাম্পের জল দিয়েই কুলিয়ে উঠতে পারা যায় না, আবার কুলীদের বাড়তি জল কোথা থেকে দেওয়া যায়।" সত্যই জল দেওয়াটা একটু কঠিন ছিল। ক্যাম্প থেকে ঝর্ণা দশ মাইল, সেখান থেকে লোক দিয়ে জল আনানো বিশেষ কষ্টসাধ্য।

"নিজের থেকে দেব সে তোমায় বলতে হবে না! কিন্তু তুমি এমন স্বার্থপর কুকুর তা জানতুম না।" ব'লে সুধীর বেরিয়ে গেল।

ম্যানেজার সাহেব নিরুপায় রাগে গর্জ্জাতে লাগল। সুধীরের শক্তির পরিচয় পাবার সৌভাগ্য তার আগে হয়েছিল।

একদিন সে যাদের সম্বন্ধে অজ্ঞানে অন্ধ হয়েছিল, আজ বিধাতা যেন তাদের সম্বন্ধে তার একদিনেই চোখ ফুটিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন চারিদিক থেকে আঘাত দিয়ে।

ডাক্তারকে অনেক ব'লে-ক'য়ে রোগী দেখাতে রাজী করান গেল বটে, কিন্তু ডাক্তার মধ্যাহ্নভোজন ক'রে একটু বিশ্রাম না ক'রে যেতে চাইলেন না কিছুতেই। সুধীর নিজের ক্যাম্পে গিয়ে নিজের ব্যবহারের জলের অধিকাংশ একজন লোক দিয়ে অসুস্থদের মধ্যে বিলি করবার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে একটা চেয়ারে শ্রান্ত হয়ে ব'সে পড়ল। রাগে দুঃখে ওই গরীবদের জলের কথা চিন্তা ক'রে হতাশায় তার মনে এক বিপুল আলোড়ন চলছিল। আর সেবার প্রতি শ্রদ্ধায় তার মন এই সঙ্গে

ভ'রে যাচ্ছিল। সে এতদিন সামনে থেকেও যা দেখতে পায়নি, সেবা একদিনের দৃষ্টিতেই কিন্তু তা সব বুঝে নিয়েছিল।

এই সাতশ' আটশ' কুলীর ব্যবস্থাও যে কি করা যেতে পারে সে ভেবে পাচ্ছিল না। চার জনের খাবার জল না হয় সে দিলে, কিন্তু এই আটশ' কুলীর জল কোথা থেকে আসবে? অথচ এই রোগের সময় ওই দূষিত জল খেলে তাদের কি অবস্থা হবে সে কল্পনা করা বিশেষ কঠিন নয়। সত্যি কোন উপায় নেই…

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে যখন সে ডাক্তারকে নিয়ে কুলীদের পল্লীতে গেল তখন তার প্রথম দেখা লোকটি মারা গেছে, আর চার জনের অবস্থাও আশাহীন। আরো দু' একজনের রোগ হওয়ার সংবাদও পাওয়া গেল।

বাইরে সুধীরের ডাক শুনে সেবা তাড়াতাড়ি অৰ্দ্ধেক আঁকা ছবিখানা লুকিয়ে দরজা খুলে দিয়ে বল্লে, "বাবা ত বাড়ী নেই, আফিসে আছেন।"

"আচ্ছা, আমি বসছি, আর আপনার সঙ্গেই আমার কথা আছে।" ব'লে সুধীর ঘরে ঢুকে চেয়ারে ব'সে পড়ল।

সেবা একটু বিস্মিত হয়ে বল্লে, "আমার সঙ্গে?"

সুধীর হেসে বল্লে, "হ্যাঁ, আপনাদের কাছে বিদায় নিতে এলুম, কাজ ছেড়ে দিয়েছি।" সেবা-র বিমূঢ় দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে সে আবার বল্লে "না ঠাট্টা না, সত্যি ছেড়ে দিয়েছি, আর এখান থেকে কালই যাচ্ছি।"

সেবা এতক্ষণ বাদে বলতে পারলে—"কেন?"

"নিশ্চেষ্ট নিরুপায় হ'য়ে চোখের সামনে অসহায় মানুষের যন্ত্রণা দেখতে পারব না ব'লে।"

সেবাকে নির্ব্বাক দেখে সুধীর আরো বল্লে,—"যাবার আগে আপনাকে একটু কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যেতে চাই। আপনি ঘা না দিলে আরো কত দিন এই নিষ্ঠুরতার সহায়তা করতুম অজান্তে, বলতে পারি না।"

সেবা আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, "এতদিন বাদে হঠাৎ একদিনেই আপনার এমন পরিবর্ত্তন হয়ে গেল যে?"

"যখন মানুষের হুঁস হয় এম্‌নি করেই হয়। পাহাড় যখন ধ'সে পড়ে, তখন হঠাৎ এম্‌নি অতর্কিত ভাবেই পড়ে।"

"কিন্তু তার আগে তার ভিৎ ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়েছে জানবেন।"

"হাঁ, ধীরে ধীরে কিন্তু অলক্ষ্যে। আমার ভেতরও অলক্ষ্যে এই মিথ্যা বিশ্বাসের ভিৎ ক্ষয় হচ্ছিল নিশ্চয়।"

পশ্চিমের জানলা দিয়ে পড়ন্ত রোদ এসে সুধীরের মুখে পড়ছিল। সেবা উঠে

জান্‌লাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে চেয়ারের হাতলটা ধ'রে দাঁড়িয়ে বল্লে, "আপনি কালই যাচ্ছেন?"

"কালই সকালে।"

দুজনে নীরব হয়ে রইল কিছুক্ষণ। দূর থেকে একটা ট্রেন আসবার শব্দ আসছিল। তার তীক্ষ্ণ হুইসিলের আওয়াজে আকাশ যেন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল।

টেবিলের ওপর একটা কনুই রেখে হাতে মাথার ভর দিয়ে সুধীর ব্যথিত হয়ে অনেকটা আপনমনে বলতে লাগল, "কালই চ'লে যাচ্ছি, কিন্তু কত বড় শূন্যতা বুকে নিয়ে যাচ্ছি তা যদি কাউকে বোঝাতে পারতুম..."

সেবার দিকে সুধীরের চোখ ছিল না, তবু সেবা কি ভেবে একবার চমকে উঠল।

"...জীবনের সমস্ত দুঃখ বঞ্চনার মাঝে যে সাধনাকে আঁকড়ে ধ'রে সব ভুলতে চেয়েছিলুম, সে সাধনাও আজ শেষ হয়ে গেল। সে সাধনার আড়ালে এত মানুষের চোখের জল এত দরিদ্রের হাহাকার অলক্ষ্যে জ'মে উঠছিল তা ত জানি না। কিন্তু আজ অন্তরে বাইরে আশ্রয় নেবার আর কিছু রইল না। আমার চিরকালের যা একমাত্র ধ্যান, যা আমার জীবনের সঙ্গে শিরায় উপশিরায় জড়িয়ে আছে, যার ভরসায় ভাগ্যের নিষ্ঠুরতম আঘাতকেও তুচ্ছ করব ভেবেছিলুম সেই ধ্যান ছেড়ে কি করব আমি? হাতে যে রক্ত লাগিয়েছি, সে রক্ত ধোব কোথায়? সংসার যে সব দিক থেকে আমায় ঠেলে বার ক'রে দিলে।"

সেবা দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে তবু নীরব হয়ে রইল।

সুধীর আবার বলতে লাগল, "যৌবনের মাঝে এসে জানলুম, এতদিন যা করেছি যা ভেবেছি সব ভুল, যা বিশ্বাস করেছি সমস্ত মিথ্যা ভুয়ো, যা কিছু আশা করেছি সমস্ত মরীচিকা। দেবতা জেনে যার অর্চ্চনা করলুম সমস্ত জীবন, তার ভেতর থেকে দানবের অট্টহাসি উঠল আজ। বলুন আমি ভবিষ্যতে কি সম্বল নিয়ে ভরসা ক'রে তাকাব?"

মুখ ফিরিয়ে সেবার চোখের অন্যমনস্ক দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে সুধীর বল্লে, "আপনাকে এ সব কথা ব'লে অকারণে বিরক্তি করছি হয়ত, কিন্তু কাউকে না ব'লেও যে আর পারি না। তা ছাড়া আপনারা প্রথম আলাপ থেকে আমার সঙ্গে যে-রকম সদয় ব্যবহার করেছেন—"

এইবার সেবা বল্লে, "কিন্তু দুঃখ দেখে পালিয়ে যাওয়াটাই কি উচিত কাজ হবে?"

"সে আমি ভেবে দেখেছি অনেক। কোন উপায় নেই। পঞ্চাশজন কুলী আমার

সামনে জল জল বলে চীৎকার করে মরেছে, জলের নামে তাদের যা দিয়েছি তা যদি দেখাতে পারতুম বুঝতে পারতেন। তাদের শবগুলো পর্য্যন্ত সৎকার করবার উপায় নেই! ঘরে ঘরে রোগ লেগেছে, ও রোগের মড়া কে ছোঁবে? বনের ভেতর টেনে ফেলে দিতে হয়েছে। আর এই মহামারী যখন তাদের শিয়রে দাঁড়িয়ে, তাদের মাঝে যারা সুস্থ আছে তারা সস্তা মদ নিয়ে সে কি বীভৎস উল্লাসে মেতেছে! তার মাঝে একটি স্ত্রীলোককেও দেখলুম। আগের দিন তার স্বামী কলেরায় মারা গেছে আর তাকে নিয়ে কুলীদের ভেতর রক্তারক্তি হয়ে গেছে। কিন্তু কোন উপায় নেই। চোখের সামনে অমন ব্যাপার দেখতে পারা যায় না। না, যেতেই হোল।"

সেবা কি একটা কথা বলতে গিয়ে বল্লে না, বা বলতে পারলে না।

সুধীর বল্লে, "আপনাদের সঙ্গে হয়ত আর দেখা কখনো হবে না, কিন্তু এই ক'মাসের আলাপে আপনি আপনারও অজ্ঞাতে আমার জীবনে অনেক বিষয়ে পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছেন। সে পরিবর্ত্তনে আপাত দুঃখ হয়ত অনেক আছে, কিন্তু তার কল্যাণের ইঙ্গিতকেও অস্বীকার করতে পারিনে। আর আজ যাবার সময় তার জন্যে আপনার কাছে ঋণ স্বীকার ক'রে কৃতজ্ঞতা না জানিয়েও পারিনে, যদিও সব কথা খুলে বলতে আমি পারব না, এবং বলাও সম্ভব নয়।"

সেবা চেয়ারের হাতল ধ'রে তেমনি দাঁড়িয়েই রইল নীরব একটি কাতর সজল দৃষ্টি মেলে।

যত কথা পৃথিবীতে আজো প্রকাশ হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী, ব্যর্থ মুকুলের মত অলক্ষ্যে নিঃশব্দে অন্তরের গোপনতায় শুকিয়ে গেছে।

ষ্টেশনমাষ্টার ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ঘরে ঢুকে বল্লেন, "এই যে সুধীর, কখন এলে? তুমি নাকি ম্যানেজার সাহেবকে চাব্‌কে একেবারে লাল ক'রে চাকরী ছেড়ে দিয়েছ শুনলাম, সত্যি?"

॥ ছাব্বিশ ॥

ট্রেনটা আসতে দু'ঘণ্টার ওপর দেরী হয়ে গেছল।

একটা ছ্যাকড়া গাড়ীর মাঝে সুধীর ব'সে ছিল। খোলা জানলাটার ওপর বাঁ হাত রেখে তার ওপর মাথা রেখে সে কি ভাবছিল আর দৃঢ় আঙুলগুলি দিয়ে নিষ্ফল নির্ব্বাক যন্ত্রণায় দীর্ঘ চুলগুলি জোরে টানছিল। ঘুমন্ত নিশীথের কলকাতার প্রায় স্তব্ধ জনহীন পথে গাড়ীটা অদ্ভুত অসহ্য কোলাহল করতে করতে চলেছে। সুধীর ভাবছিল—এ তার কি হয়ে গেল এ ক'দিনের মধ্যে?

এত বড় সংসারে তার আর দাঁড়াবার ঠাঁই কোথায়? যাদের সে এত নিবিড় বন্ধনে আঁকড়ে ধরলে তারাই তাকে ব্যঙ্গ ক'রে মিলিয়ে গেল! আজন্মের এই যন্ত্রসাধনা তার কাছে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস ব'লে মনে হচ্ছিল। যাক না যন্ত্র ভেঙে ছারখার হয়ে, সে একেবারে রিক্ত নিঃসম্বল হয়েই না হয় থাকত, কিন্তু তার দীন দুঃখী আবাসে যদি তাকে সে এ জীবনে পায় এ তপ্ত ব্যর্থ বুকের কুলায়, যদি তাকে সে পেত এই ব্যথামৌন অলস নিশীথে…! সুধীরের দু'চোখ বেয়ে জল ঝরছিল। জীবনে এমন কান্নাকে সে কোনো দিন অনুভব করেনি। তার খালি মনে পড়ছিল সেই ট্যাক্সিতে পাশাপাশি চারু আর উৎপলের সজ্জাসমৃদ্ধ দুইখানি আনন্দ-উদ্ভাসিত ছবি। এতদিনের এই দীর্ঘ বনবাসের পর সে যদি আজ গিয়ে দেখে চারু উৎপলের গৃহিণী, তবে তার চমৎকাবার একটুও কারণ আছে কি? যে তার জীবনে মর্ম্মমূল আঁকড়ে রয়েছে, তাকেই সে উপেক্ষা করে ব্যর্থ খ্যাতির সন্ধানে মরুপারে গিয়ে তৃষিত চাতকের মতো হাহাকারে কাল কাটালে, আর উৎপল এই দীর্ঘ অবকাশে তার স্বপ্নভরা সুকোমল হৃদয়শতদলের পাপড়িগুলি ধীরে ধীরে বিকশিত ক'রে তার ওপর চারুলেখার সুরভিত সিংহাসনখানি রচনা করলে। উৎপল সাধনা করেছে, তার যদি জয় হয়, তবে সুধীরের অভিযোগ করবার মধ্যে কতটুকু যুক্তির সঙ্গতি আছে?

নিশুতি রাতে পাড়াটা একেবারে নিঝুম হয়ে ঘুমুচ্ছে। সুধীর গাড়ীর মাথার থেকে জিনিষপত্র মোটঘাট নামিয়ে গাড়োয়ানকে দর চুকিয়ে দিয়ে খানিকক্ষণ রোয়াকটার ওপর চুপ ক'রে ব'সে রইল। সে ফিরে এসেছে এমন ভাঙা হতাশ হতোদ্যম বুক নিয়ে সে মোটেই ভাবতে পাচ্ছিল না। বেদনামথিত বক্ষের মতো স্তিমিতজ্যোতি আকাশ থম্‌থম্ করছে অন্ধকারে। সুধীর দুইহাতে সমস্তটা চোখের জল মুছে ফেলে সজোরে কড়া নেড়ে ডাকতে লাগল—"মা, মা, মা!"

মা নীচেই ঘুমুতেন, সহসা এই হাহাকারের মতো কণ্ঠ শুনে ধড়মড় ক'রে বিছানায় উঠে বসলেন।—এঁ্যা! এ—তারই আওয়াজ নয় কি! তিনি তাড়াতাড়ি ছুটে আসতে আসতে শুধোলেন—"কে, কে বাবা, সুধীর এলি?" বলতেই দরজাটা দু-ফাঁক হয়ে গেল।

সুধীর তক্ষনিই 'মা' ব'লে মার প্রসারিত বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মা তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বিস্ময়োদ্বিগ্ন কণ্ঠে বল্লেন, "হঠাৎ চলে এলি যে, কি হয়েছে?"

"পারলুম না মা থাকতে, চাকরী ছেড়ে দিয়েছি।"

"ছেড়ে দিয়েছিস কেন?"

"ভারী কান্না, ভারী দুঃখ সেখানে। সে দুঃখ দেখে নিশ্চল হয়ে সহ্য করবার মতো পাষাণ বুক আমার নয় মা, নয়, কক্‌খনো নয়। সহস্র কুলী জল জল ব'লে চীৎকার ক'রে মরছে আর আমি তাদের তৃষ্ণার্ত্ত মুখের কাছে নোংরা ডোবার কাদাময় পচা দুর্গন্ধ জল তুলে ধরেছি। পারলুম না মা থাকতে। কি হবে খ্যাতিতে কি হবে অর্থে যদি তাকে এতগুলি অসহায় নিরপরাধ মজুরের বুকের রক্তে, সমস্ত জীবনের ব্যর্থতা দিয়ে কিনতে হয়? তাই মা, চলে এলুম, তোমার কোলে ফিরে এলুম মা। আজ আমার আর কেউ নেই, আমার সমস্ত জীবনের সাধনা ভস্মীভূত হয়ে গেল। এবার তুমিই আমার একমাত্র…"

সুধীর মার কাঁধের ওপর মুখ গুঁজে রইল। মা কোনোদিন তাঁর এই উদাসীন বৈরাগী ছেলেকে এত দুর্ব্বল এত ভঙ্গুর ব'লে উপলব্ধি করেননি, আজ তাঁরো বুক কান্নায় উদ্বেল হয়ে উঠল। তিনি সুধীরের মাথায় হাত রেখে বল্লেন, "এসেছিস বেশ করেছিস বাবা, তার জন্যে দুঃখ করছিস কেন? আয় ভেতরে, চাকরকে জাগিয়ে মোটগুলি তুলছি ঘরে, জামা-কাপড় ছাড়বি আয়।"

অন্ধকার ঘরে মা আলো জ্বালালেন। সুধীরের বেদনার্ত্ত ম্লান মুখখানা দেখে মা আবার সান্ত্বনার সুরে বল্লেন, "তার জন্যে তোর সাধনা তো ব্যর্থ হয় নি, জ্ঞানসন্ধিৎসা, খ্যাতি, তোর কর্ম্মশক্তি, তোর প্রতিজ্ঞা তো ম্লান হবে না। এবার যন্ত্রের যা অপব্যবহার তারই সংশোধন করতে উঠে প'ড়ে লাগ।"

"না মা, আমার আর সে শক্তি সে উদ্যম নেই। আমি একেবারে পঙ্গু, পক্ষাঘাত রোগীর মতো অচল হয়ে পড়েছি, আমার কেউ নেই।"

মা বল্লেন, "উনুনে আগুন দিই। কিছু লুচি ভেজে দিই সুধীর?"

"না মা, ক্ষিদে নেই, ট্রেনে খাবার কিনে খেয়েছিলুম। শুধু একগ্লাশ জল দাও। তোমার পাশে ঘুমুব, তোমার বুকে মাথা রেখে।"

"তা ঘুমোস, কিন্তু খাবি না কেন? বেশী সময় লাগবে না। তুই আয় আমার সঙ্গে রান্নাঘরে, সেখানকার গল্প করবি।"

সুধীর জামা-কাপড় ছেড়ে হাত-পা ধুয়ে মার কাছে রান্নাঘরে গিয়ে বসল।

সেই রাত্রে মার বুকে মুখ রেখে শুয়ে সুধীর খালি অঝোরে কাঁদছিল, তার সমস্ত বুক ভেঙে যে-কথা বেরুবার জন্য তোলপাড় করছিল সে কথাকে কিছুতেই সে প্রকাশ করতে পারছিল না, তার বুকের সমস্ত কান্না যেন সে কথাটির মুখ চেপে ধরছে। মা তার চোখের জল মুছে শুধু বলছিলেন—"আমি মা বলছি, তোর এত দুঃখ করবার কিছু দরকার ছিল না সুধীর।"

সেই রাতে মা ও ছেলের কারুরই ঘুম এলো না।

ভোরবেলা বিছানা থেকে উঠে সুধীর বল্লে, "মা, আমি একটু ঘুরে আসি।"

মা বল্লেন, "আসতে-না-আসতেই আবার রোদে পথে বেরুনো?"

সুধীর ফিকা হাসি হেসে বল্লে, "কতদিন এই পথ চলিনি মা, পথ যেন আমাকে ডাকছে।" ব'লে সুধীর বেরিয়ে পড়ল।

খানিকক্ষণ পথভোলার মতো এখানে-সেখানে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে সুধীর পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। এ রকম উদ্দেশ্যহীনের মতো ঘুরে ঘুরে সময় নষ্ট করবার মতো অভ্যাস তার কোনো কালে ছিল না। রাস্তার ধারে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের মাথায়-মাথায় সূর্য্যের আলো সোনার মতো ঝিলিক দিচ্ছে, এই রুক্ষ কর্কশ নগরীর বীভৎস সৌন্দর্য্যের মধ্যে ঐ লালিমার মোহটি তার চোখে যেন অপরূপ বেদনার একটি অঞ্জন বুলিয়ে দিল!

একটা গলির বাঁক ফিরতেই সুধীর দেখতে পেলে সে-মুখ দিয়ে উৎপল আসছে, হাতে কতগুলি ম্যাগ্নোলিয়া ফুলের তোড়া। উৎপলকে দেখে সুধীরের বুকে আবার সেই সঞ্চিত পুঞ্জীকৃত বেদনা উথল হয়ে উঠল! উৎপলের মুখে কি প্রশান্ত আনন্দের জ্যোতি, পদদাপে কি ছন্দোময় গর্ব্ব, দেহে বিলাসের কি ঐশ্বর্য্য! নিজের কাছে নিজেকে ভারী কুশ্রী বোধ হচ্ছিল। হয়ত ঐ ফুল সে কিনে নিয়ে যাচ্ছে দুটি অঞ্জলিতে ক'রে তার প্রিয়াকে নিবেদন করতে। উৎপলের সুমুখে এগোতে তার ভয় হচ্ছিল, নিজেকে একান্ত দীন মনে হচ্ছিল। সে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে কাছের একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

এত সামনে এসেও চিনে চোখের পানে চেয়ে সুধীর তাড়াতাড়ি তাকে এড়িয়ে অন্য দিকে চ'লে গেল, এর কি অর্থ, উৎপল কিছুই বুঝলে না। সুধীরকে হঠাৎ এখানে দেখে তার বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না। এতদিনের এই দীর্ঘ বিচ্ছেদের শেষে আজ পথে দেখা হওয়ার সৌভাগ্যের পর একটি কুশল প্রশ্ন না ক'রে সে চ'লে গেল পালিয়ে এত দিনের এত বন্ধুত্বকে অস্বীকার ক'রে! উৎপল ভাবতে ভাবতে পথ চলল সেই সরু গলিটার মধ্য দিয়ে।

ঘুরে ঘুরে হায়রান হয়ে সুধীর বাড়ী ফিরে এল। সে আর হাঁটতে পাচ্ছিল না। নীচে মাকে পেলে না, ওপরে আছে মনে ক'রে সিঁড়ি বেয়ে সে ওপরে উঠে গেল। ঐ তার শিল্পাগার তার যত্নের যাদুঘর হয়ত ধূলিতে আর আবর্জ্জনায় কুশ্রী কদাকার হয়ে আছে। থাক, ধূলির পর ধূলির স্তূপে তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা সমস্ত সাধনা সমস্ত আনন্দ চাপা প'ড়ে থাক, ধূলি হয়ে যাক মিশিয়ে এই ব্যর্থ জীবনের সঞ্চিত হাহাকার!

ঘরের দরজা দুটো খোলা দেখে সুধীর ভাবলে মা কোনো দরকারে ঢুকেছেন

হয়ত। ধীরে ধীরে চৌকাটের সামনে এসে সে একেবারে অভাবনীয় বিস্ময়ে থম্‌কে গেল। কতগুলি কাঠের স্তূপীকৃত স্তম্ভের উপর বাহু রেখে তাতে মুখ লুকিয়ে দরজার দিকে পেছন ফিরে একান্ত শিথিল দুর্ব্বল ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে চারু!

তার কালো চুলের ফাঁপানো খোঁপা কাঁধের ওপর আদরে নুয়ে পড়েছে, তার ক্ষীণ কটিতে আঁচলের বাঁধুনিটা আল্‌গা হয়ে খ'সে এসেছে পায়ের কাছ দিয়ে, হাতে একটা ঝাউপাতার ঝাঁটা শিথিল হয়ে ঝুলছে। এ কি, চারু তার ঘরে, তার এই পরিপাটি ক'রে গুছানো সাজানো যত্ন-নিকেতনে! ভূমিকম্পের আলোড়নের মতো সুধীরের বুক আথালি-পিথালি ক'রে দুলছিল, সে একবার মর্ম্মভেদী তীব্র কণ্ঠে চীৎকার দিয়ে উঠল—"চারু।"

ব্যথা-বিদীর্ণ আর্ত্তকণ্ঠ শুনে চম্‌কে চারু পেছন ফিরে তাকাল। তাকিয়ে একেবারে বিমুগ্ধ বিস্ময়ে বাত্যান্দোলিত কচি পাতার মতন কাঁপতে লাগল। সুধীর দেখলে চারুর বুকখানি থরথর ক'রে কাঁপছে, তার পরিপূর্ণ গাল দুটিতে ঝর্ণারেখার মতো অশ্রু বেয়ে চলেছে, তার ম্লানিমা-আচ্ছন্ন চোখ দুটিতে কি একখানি করুণ আকুল আকুতি ও আকাঙ্ক্ষা, তার দুটি শীর্ণ বাহুতে কি একখানি সুকোমল আলিঙ্গন উৎসুক প্রতীক্ষায় কাঁপছে! সে দুই হাত বাড়িয়ে ভীত ত্রস্ত বিস্মিত চারুর বুকের কাছে এগিয়ে এসে ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকলে,—"চারু!"

চারু নিজেকে আর রোধ করতে পারলে না। নদীর মতো ব্যগ্র পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাসে সে সুধীরের প্রসারিত বলিষ্ঠ দেহে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার আঁচল স্খলিত হয়ে প'ড়ে গেল মেঝেতে, তার চুলের খোঁপা খুলে গিয়ে পিঠের ওপর ছড়িয়ে গেল, সুধীর তাকে কঠিন ব্যগ্র বাহুবন্ধনে নিপীড়িত ক'রে ভাবোদ্বেল বেদনার্ত্ত কণ্ঠে আবার ডাকলে, "চারু!"

এমন সময় বিলিতি জুতো মশ্‌মশ্‌ করতে করতে ওপরে উৎপল উঠে এল। খোলা দরজা দিয়ে ঘরের দৃশ্য দেখে সে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। প্রভাতের কনকরৌদ্রে অবগাহন ক'রে ঐ জানলাটার পাশে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে নিবিড় উন্নত আলিঙ্গনে বন্দী হয়ে লেখা আর সুধীর। সুধীর তার দৃঢ় পুষ্ট দুই হাতে লেখাকে একেবারে বুকের ওপর টেনে এনেছে আর লেখা একান্ত নির্ভয়ে ও স্বস্তিতে সুধীরের বাহুর তলায় বুকের কাছে মুখ লুকিয়ে ফুঁপে ফুঁপে কাঁদছে।

উৎপল ধীরে ধীরে ফুলের তোড়াটি দরজায় চৌকাটের ওপর রেখে বিলিতি জুতো মশ্‌মশ্‌ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অচিন্ত্যকুমার
রচনাবলী

চতুর্থ খণ্ড

পত্রগুচ্ছ

বিঃ দ্রঃ—এই অংশে অচিন্ত্যকুমার লিখিত অথবা তাঁকে লিখিত মূল্যবান চিঠিপত্র ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছে। সাহিত্যানুরাগী পাঠক, গ্রাহক এবং বাংলা সাহিত্য বিষয়ে গবেষণারত বিদগ্ধজন এই প্রকার চিঠিপত্রের সন্ধান দিলে বাধিত হবো। মূলপত্র, অনুলিপি অথবা ফটোস্ট্যাট্-কপি পাঠাবার যা খরচ হবে তা অবশ্যই প্রকাশক বহন করবেন। এই সহযোগিতা রচনাসংগ্রহের তথ্যপঞ্জীতে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকৃত হবে।

সম্পাদক

বুদ্ধদেব বসুর চিঠি : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে

॥ ১ ॥

৪৭ নং পুরাণা পল্টন্‌
পোঃ রমণা, ঢাকা
৮ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রি

অচিন্ত্য বাবু,

আষাঢ় মাস থেকে আমরা "প্রগতি" ছেপে বার করচি। মস্ত দুঃসাহসের কাজ—না?

হঠাৎ সব ঠিক হ'য়ে গেল। এখন আর ফেরা যায় না। একবার ভালো ক'রে চেষ্টা ক'রেই দেখি না, কি হয়।

আপনার কাছ থেকে যথাসম্ভব সাহায্য আমরা পাবো, এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আপনি ঢাকায় থাকতে একদিন বলেছিলেন, "Make me one of your Pragati"। সে-কথা বলবার অনেক আগেই আমরা মনে-মনে আপনাকে আমাদেরই একজন ক'রে নিয়েছিলাম; তাই এখন আপনার কাছ থেকে অনেকখানি সহানুভূতিই আমরা আশা করি।

আপনি আমাদের হাতে যে ক'টি কবিতা দিয়েছিলেন, তা'র মধ্যে দু'টি তো "কল্লোলে"ই ছাপা হ'ল। বাকীগুলো যেন অন্য কোথাও ছাপা না হয়। আমরা আস্তে-আস্তে "প্রগতি"তে তুলবো। প্রথম সংখ্যায় দু'টি দেবো—"আমার পরাণ মুখর হয়েছে সিন্ধুর কলরোলে" (এটি সব্বার আগে যাবে) আর "মৃত্যুর সাথে বিয়া।" বাকী কবিতাগুলোর প্রথম লাইন আপনার সুবিধের জন্য লিখে দিচ্ছি: (১) "লাখ লণ্ঠন লুণ্ঠিত আজি" (২) "মিলনের রাতে উঠানের কোণে" (৩) "ভৃঙ্গার ভ'রে মদ রেখেছিনু" (৪) "আজিকার রোদে রোদন ভুলেছি।" এই কবিতাগুলো আবার অন্য কোথাও ছেপে ফেলবেন না যেন।

আপনার একটি গল্প চাই-ই। আপনি খুব বেশি লেখেন ব'লে আমাদের দিতে আপনার বোধ হয় কোনো অসুবিধে হবে না। আপনাকে আর বেশি কি বলবো—আপনার গল্পের জন্য উৎসুক হ'য়ে রইলাম।

প্রেমেন বাবুকে এ-খবর দেবেন। তাঁর কাছ থেকে আমাদের জন্যে দু'একটা লেখা আদায় করতে আপনি হয়-তো চেষ্টা করলে পারবেন। "প্রগতি" যারা বার

করচে, তাদের মধ্যে অনেকেই এককালে তাঁর খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলো। সেই মনে ক'রেও "প্রগতি"র প্রতি তাঁর একটা আন্তরিক টান থাকতে পারে।

"উত্তরা"তে আপনার নাকি খুব influence আছে। সেখানে ব'লে-ক'য়ে একটা বিনি-পয়সায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন কি? "কালি-কলমে"ও আমরা বিজ্ঞাপন দিতে চাই। সেখানে কি একটা exchange-এ বিজ্ঞাপন জোগাড় করা যায় না? এ-সব বিষয়ে যথাযোগ্য খবর আপনার কাছ থেকে পেতে চাই।

আর চাই একটি গল্প।

চিঠির উত্তরের জন্য উৎসুক

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

॥ ২ ॥

৪৭ নং পুরাণা পল্টন্
পোঃ রম্‌ণা, ঢাকা
৫ই আশ্বিন (রাত্রি)

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি ও কবিতা পেয়ে বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ পেলাম। আপনারা আমাদের সঙ্গে নিজেদের এমন নিবিড়ভাবে যুক্ত করেছেন ব'লে কি ক'রে যে আপনাদের ধন্যবাদ জানাবো, জানিনে। তবে আমাদের অন্তরের পরিচয় এতদূর অগ্রসর হ'য়ে গেছে যে ভদ্রতামাফিক ধন্যবাদ-জানানোর প্রয়োজনও বোধ হয় আর নেই। অন্ততঃ আমার তো তাই মনে হয়।

আপনার এ-কবিতাটি যদিও সবুজপত্রের কবিতাটির মত অমন জোরালো হয়নি, তবু আমার কাছে তা খুবই ভালো লেগেছে। আপনার কাব্য-প্রতিভাকে সম্মান করি। অনিলের চিঠির ভাবে মনে হ'ল, আপনি একটি গল্পও পাঠাবেন। আশা করি, কিছুদিনের মধ্যে আপনার একটি গল্পও পাবো। কার্ত্তিক-সংখ্যাটা আমরা খুব ভালো ক'রে বার করতে চাই—আপনাদের সাহায্য পেলেই এ প্রচেষ্টা সর্বাঙ্গসুন্দর হ'য়ে উঠতে পারে। আমরা উৎসুক আগ্রহে আপনার গল্পটির প্রতীক্ষা করছি। নেপেনদার একটি লেখার জন্যও আমাদের আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই, তবে সে আকাঙ্ক্ষা কোনোদিন পূর্ণ হবে কিনা জানিনে।

"প্রগতি"র প্রতি সংখ্যাই আপনার ভালো লাগে, এ কথা শুনে আমাদের সবাকারই ভালো লাগবার কথা। তবে এ ভালো-লাগার উৎপত্তি কতটুকু এর sentimental দিক থেকে আর কতটুকুই বা এর সত্যিকারের মূল্যের জন্য, তা আমি যথার্থরূপে নির্ণয় করতে চাই। "প্রগতি"র ideal খুবই বড়—তা আপনার ভালো লাগবে, সে এমন কিছু নতুন কথা নয়, কিন্তু তার achievement-এ যদি কিছু দোষ খুঁৎ আপনার নজরে প'ড়ে থাকে, তবে তা' জানালেই আমরা বরং বেশি উপকৃত হই।

আপনার পরীক্ষা খারাপ হয়েছে শুনে মন খারাপ হ'ল। যা হবার হ'য়ে গেছে—এখন কোনো রকমে উৎরে গেলেই হয়। আপনি ও নেপেনদা এ-ছুটিতে কিন্তু একবার ঢাকায় আসবেনই। আপনাদের দু'জনকে আমি প্রগতি-সমিতির পক্ষ থেকে বিশেষ আমন্ত্রণ পাঠাচ্ছি। যদিও পাথেয় পাঠাতে আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় অক্ষম, তবে এখানে এলে আতিথেয়তার ত্রুটি হবে না। আপনার পকেট আশু রৌপ্য-গর্ভ হ'য়ে উঠুক। এবার যদি আপনারা ঢাকায় না আসেন, তা হ'লে আমরা মর্ম্মাহত হব। নেপেনদা তো সেই কবে থেকেই ঢাকায় আসার কথা বলছেন। তিনি ন্যায়তঃ একবার আসতে বাধ্য। এ বিষয়ে আমি অনিলকে ও D. R.-কে লিখলাম। পূজোর ছুটিতে আমাদের নানাজাতীয় উৎসব করার প্ল্যান্ আছে—সেই উৎসবের মধ্যে আপনাদের যদি পাই, তবে উৎসবের দেবতার বোধন-কার্য্য সার্থক জ্ঞান করি।

এ-নিমন্ত্রণ আমাদের সবাকার, তা মনে রাখবেন—আমার একার নয়। একে আপনারা গ্রহণ করলেন কিনা, সত্বর জানাবেন। আচ্ছা—অনিলদের সঙ্গে আসা কি আপনাদের পক্ষে সম্ভব হবে না?

আপনার তো এখানে আসার অভিপ্রায় আছে ব'লেই মনে হয়। আপনি যদি কোনোক্রমে এসে পড়েন তো একা আসবেন না—যে ভাবেই হোক, নেপেনদাকে সঙ্গে আনবেনই।

আমাদের নতুন খবর বিশেষ কিছু নেই। আশ্বিনের "প্রগতি" দু-চারদিন আগেই বেরিয়ে গেছে। ভাদ্রের সংখ্যা আজ "কল্লোলে" পাঠাচ্ছি।

আমাদের সম্মিলিত সম্ভাষণ ও আমার ব্যক্তিগত অনুরাগ জ্ঞাপন করি। ইতি—

স্নেহমুগ্ধ

শ্রীবুদ্ধদেব বসু।

পুনশ্চঃ—অজিতের দাদা সারবার পথে।

॥ ৩ ॥

৪৭ নং পুরানা পল্টন্
পোঃ রম্‌না, ঢাকা
৭ই অগ্রাণ

অচিন্ত্য বাবু—

'ধূপছায়া'র কবিতা দু'টো পড়লাম। ছি-ছি, কী vulgar! 'শনিবারের চিঠি' vulgar ও personal হয়েছে ব'লেই কি আমাদেরো তা-ই হ'তে হ'বে?—বাপ-মা তুলে গাল দেয়ার আর বাকী কি? সঙ্গে-সঙ্গে বেচারা সুনীল দে-কে টেনেই বা এনেছেন কেন? তাঁর আর দোষ কি বিশেষ? 'বিস্মরণী'র প্রশংসা—সে কে না করে? বররুচির লেখাটা আমাদের বিরুদ্ধে হ'লেও খুব খারাপ তো নয়—তা'র ভেতর যুক্তি যথেষ্ট ছিল। আমাদের পক্ষে সব চেয়ে respectable হ'ত চুপ ক'রে থাকলে—যেন ওরা যতই এবং যাই বলুক, আমাদের কিছুই আসে যায় না। আর যদি কিছু লিখতে হয়, বেশ ভালো ক'রে ওদের কথার জবাব দিতে পারলে ঠিক হ'ত—গালাগাল দিতে কে না পারে? এই mean squabble-এ আপনি কেনই বা যোগ দিতে গেলেন? এতে আপনার position আপনি নিজে কত যে খারাপ করলেন, তা কি বুঝতে পারছেন না? আপনার তো নয়ই—সঙ্গে-সঙ্গে আমারো আর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।—হুতাশ হালদার নামটি বদ্‌লে দিলে ভালো করতেন। ফল হবে এই যে এর পর থেকে শনিবারের চিঠি আরো vulgar হবে—এখন থেকে যা লিখবে, তার বোধ হয় কোনোরকম ভদ্র interpretation দেয়াই সম্ভব হবে না।—কবিতা দুটোর প্রধান দোষ হয়েছে যে তা মোটেই humorous নয়—একেবারে নির্জলা সেরেফ গালি! —আপনি একজন artist—এই পাঁক নিয়ে হোলি-খেলা আপনাকে সাজে না।—'সওদা'র গদ্যাংশটুকুও এবার আপনার লেখাই নিশ্চয়ই—ওটুকু বরং ভালো হয়েছে। প্রেমেন বাবু, নেপেনদা, D.R.—তাঁরা দেখেছেন ও কবিতা দু'টো? কি বলেন ওঁরা? —'শনিবারের চিঠি'র পাল্টা জবাব হিসেবে অবিশ্যি খুব কড়া হয়েছে, কিন্তু এ আপনার-আমার লেখা না হ'য়ে যদি 'ধূপছায়া'র কারু হ'ত, তা হ'লে আপত্তি থাকতো না। আপনি আর সজনী দাস নিশ্চয়ই এক level-এর লোক নন।—অথচ এ যে কা'র লেখা তা জানতেও কারুই বাকী থাকবে না। যাই হোক, দিনকতক ধুলো-ছিটোনোই ঠিক করেছেন যখন, তখন কিছু আর বক্তব্য নেই।

কিন্তু এটা অবিশ্যি বোঝেন যে আপনার ক্ষমতা ও সময় অন্যভাবে নিয়োজিত হ'লেই তা'তে বঙ্গ-সাহিত্যের মঙ্গল হবে বেশি।

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য নবত্ব' পড়লাম। মোটের ওপর ঠিক কথাই লিখেছেন মনে হ'ল—অবিশ্যি যতদূর বুঝতে পারলাম। বিচিত্রায় ধূর্জ্জটির প্রবন্ধটা সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য ঠেক্‌ল। নীহাররঞ্জনের audacity দেখলে অবাক হ'তে হয়—অবিশ্যি he is not worth considering. মীরাটের প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে আধুনিক সাহিত্য নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখতে জোর-তাগিদ দিচ্ছেন। কি যে মাথামুণ্ডু লিখব—কিছুই মনে আসছে না। আর যে ভয়ানক গোলযোগ চলছে, তা'তে গলাযোগ করতে সাহসও হয় না। তবু দেখা যাক্।—

প্রগতি ছাপা শেষ হয়ে গেছে—আজ কি কাল বেরুবে। অগ্রাণেরটাও প্রেসে গেছে। আপনার কবিতা কিন্তু পেলাম না আর। পৌষ কি মাঘে আর-একটা গল্প দেয়ার কথা—মনে আছে তো?

January-তে উপন্যাস লিখবেন শুনে আনন্দিত হ'লাম। সেই যে ভবানীপুরের রাস্তায় একদিন বলেছিলেন—সেই plotটা নিয়েই তো?

কল্লোলে দু'টো কবিতা পাঠিয়েছি—আপনি দেখেছেন? 'কবির বিপদ' ব'লে কবিতাটা general public ও বিশেষ ক'রে 'শনিবারের চিঠি'র ওপর একটা satire;—তাই আমার বিশেষ ইচ্ছা, ওটা কল্লোলে বেরোয়।

এবার 'প্রগতি'তে শনিবারের চিঠির সমালোচনা আছে একটা।

অগ্রাণের কল্লোল কি বেরিয়েছে?

গ্রীষ্মের ছুটিতে ঢাকায় আসবেন কিন্তু। তারপর একসঙ্গে দার্জিলিঙ্ যাওয়া যাবে।

আশা করি ভালো আছেন। ভালোবাসা নেবেন। ইতি—

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

॥ ৪ ॥

৪৭ পুরাণা পল্টন্‌
রম্‌ণা, ঢাকা—
১২ই পৌষ রাত্রি

প্রিয়বরেষু,

এতদিন আপনাকে চিঠি লিখি নি—লজ্জায়। লজ্জা 'প্রগতি' বেরোয় নি ব'লে। 'প্রগতি' আপনার চিঠি পাবার আগেই বেরিয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু কভারটা ছাপতে মারাত্মক ভুল করেছিলো ব'লে সেটা আবার ছাপতে দেয়া হয়েছিলো। দ্বিতীয়বারের ছাপাও শেষ ;—দপ্তরীর বাড়ীতে প'ড়ে আছে। প্রেসের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বা মারামারি ক'রে কোনোমতেই বা'র ক'রে আনতে পারছি না। ছাপাখানার সঙ্গে বচসা ক'রে-ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে গেছি। ওদের কোনো মতেই সজুত করতে পারলাম না। কালকে যেমন ক'রেই হোক—প্রগতি নিয়ে আসবো। এতদিনই যখন অপেক্ষা করলেন তখন আর দু'চার দিনের সবুর সইবে নিশ্চয়ই। এই unreasonable ও unjustifiable বিলম্বের জন্য সবাই-র কাছে—বিশেষ ক'রে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

এবার প্রেস বদ্‌লালাম। পৌষের matter আজ দিয়ে এলাম। ওরা বলেছে ২৫শের মধ্যে বা'র ক'রে দেবে। হয়-তো দেবেই। মাঘ থেকে আবার মাসেরটা মাসে বেরুতে পারবে আশা করছি। কারণ নতুন প্রেসটা অনেক বেশি efficient ও respectable. আপনার কবিতা দু'টো পাশাপাশি দিলাম। পৌষের সংখ্যাটা বেশ ভালো হবে। প্রভু গুহঠাকুরতার প্রবন্ধ ও ধূর্জ্জটির পত্র আছে।

আজ 'শনিবারের চিঠি' এসেছে। 'টান'কে অল্পেতেই সেরেছে যা-হোক্‌। 'ময়ূরপঙ্খী তনু'র ছবির চাইতে অধিকতর vulgar কিছু জীবনে দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। ছি-ছি ;—এখন এমন হয়েছে যে কাগজটা ছুঁতে ঘেন্না হয়। যাঁরা ফরাসী, জর্ম্মান ও ইতালিয়ান ভাষায় সুপণ্ডিত, সাহিত্যে শালীনতা ও সৌন্দর্য্য যাঁদের মন্ত্র—সেই সব লোকের পক্ষে যে এ-ছবি ছাপানো কি ক'রে সম্ভব জানি নে। মোহিতলাল আবার স্তুতি-গাথা লিখেছে। জিতা রহো, জী! এমন কি যতীন সেনগুপ্তও আসরে নেবেছেন।—যাক্‌—ওদের কথা গায়ে মাখতে চাই নে—তাহ'লে এতদিনে বোধ হয় দুঃখে, লজ্জায় ম'রেই যেতাম। এতদিন তবু কাগজটার মধ্যে একটু wit ছিল—এখন একেবারে যতদূর হ'তে হয় gross

হয়ে পড়ছে। আর এই কাগজ বাঁচাবে কিম্বা দেশকে—অন্ধকারের কবল থেকে!—

পৌষের 'ধূপছায়া' কি বেরোয় নি? এখনো পাচ্ছি না যে?

এবার 'কল্লোলে' আমার কবিতা আপনাদের ভালো লেগেছে জেনে কৃতার্থ বোধ করছি। 'জানি তা-ও ঝুট্'—কথাটা যে ভালো হয় নি তা এখানকার বন্ধুরাও অনেকে বলেছিলো। কিন্তু শেষাশেষি আর বদ্‌লানো সম্ভব হ'ল না।

আপনার শরীর কেমন আছে? নতুন কিছু লিখছেন? কবিতা পাঠাতে ভুলবেন না—যথাসময়ে। গল্পের বড় অভাব। একট গল্প কি দিতে পারেন না? আমাদের মুস্কিল এই যে বাইরে থেকে একেবারেই কোনো লেখা পাই নে। যা পাই তা অবিশ্যি অপাংক্তেয়। 'সতীত্ব' গল্পটা এখনি দিন না লিখে। পারবেন?

আপনি দারুণ দুঃখ ও নৈরাশ্যের ভিতর দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন ভেবে আমারও সত্যি-সত্যি মন খারাপ লাগে। কি হয়েছে? কেন? —এ-সব প্রশ্ন করা অবিশ্যি অসঙ্গত—অন্তত: চিঠিতে। কিন্তু আপনার দুঃখের কারণ কি, তা জানতে সত্যি ইচ্ছে করে—অলস কৌতূহলবশতঃ নয় কেবল,—আপনাকে বন্ধু ব'লে হৃদয়ে গ্রহণ করেছি, তাই। আপনার প্রতি সুখদুঃখের সঙ্গে আমি নিজকেও ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট বিবেচনা করি।—আপনি কি সত্যি-সত্যি ঢাকায় আসবেন? আসুন না। আমার যতদূর বিশ্বাস, ঢাকায় এলে আপনি অনেকটা শান্তি পাবেন;— পল্টনের এই খোলা মাঠের মধ্যেই একটা মস্ত relief আছে। আপনি এলে আমাদেরো অনেকটা ভালো লাগবে, তা তো জানেনই।

অনিল এখানেই আছে; তবে আমাদের সঙ্গে কদাচিৎ দেখা হয়। ও বাড়ি থেকে বড় একটা বেরোয় না। আমাদেরও যাওয়া সম্ভব হ'য়ে ওঠে না বড়। শুনলাম, দেবীদাস দু'দিনের জন্য ঢাকায় এসেছিলো। আমাদের সঙ্গে দেখা হয় নি।

আজ এই থাক্। শীগ্‌গির উত্তর দেবেন চিঠির। কল্লোলের সবাই কেমন আছে? নৃপেন-দা আজকাল খুব লিখছেন, দেখছি। তাঁর শরীর অনেকটা সুস্থ হয়েছে আশা করি। আপনার মাকে আমার প্রণাম জানাবেন। ইতি—

আপনাদেরই

বুদ্ধদেব বসু

॥ ৫ ॥

৪৭ নং পুরাণা পল্টন্
পোঃ রমণা, ঢাকা
২৪শে জানুয়ারী
মঙ্গলবার রাত্রি

প্রিয়বরেষু,

যাক্, এতদিনে তবু আপনার একটা সাড়া পাওয়া গেল ! আপনি কখনো এত দেরী করে চিঠির জবাব দেন না কিনা—তাই এবার ভারি অস্বস্তি লাগছিলো মনে। এখন বুঝতে পারছি, পরীক্ষার গোলমালে ব্যস্ত ছিলেন ব'লেই লিখতে পারেন নি। ও হ্যাঙাম তো চুক্‌লো এবার—বাঁচলেন। আর কখনো এতদিন ধ'রে আমাদের suspense-এর মধ্যে ফেলে রাখবেন না, আশা করি।

অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত, দুর্ব্বোধ্য এবং অকারণ (অন্ততঃ—আপাততঃ) ব'লেই আপনার কাছে এ আঘাতের কোনো সীমা বা সান্ত্বনা নেই। এ-চিন্তা—আপনার কথা দূরে থাক্—আপনাকে যা'রা ভালোমত জানে-শোনে—তা'দের পক্ষেও মনে স্থান দেয়া অসম্ভব ছিল। বিশেষতঃ—after all that have passed—এর কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজতে গিয়ে মন বৃথা পরিশ্রান্ত হ'য়ে ফিরে আসে। সত্যি, পূর্ব্বেকার সমস্ত ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে গেলে ব্যাপারটাকে কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। আপনি এ-চিঠিতে যে-সব কথা লিখেছেন, সবই আমি অনেক আগেই ভেবেছি ; —শুধু যে ভেবেছি তা নয়, হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছি ;—আপনার এ দুঃখ আমাকে নিজের দুঃখের মতই বেদনা দিয়েছে ; কারণ এ ঘটনার অন্তরালে যে মনোভাব রয়েছে, তা প্রত্যেক কবি-মনের পক্ষেই অত্যন্ত পীড়াদায়ক। ভাবি, এ-ও যদি সম্ভব হ'তে পারে, তা হলে পৃথিবীতে কিছুই বুঝি অসম্ভব নয়, কিছুরি বুঝি কোনো দাম নেই—তা হলে সবই হয়তো মেকি ; জীবনে যে-কয়টি জিনিষকে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম ব'লে হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা ও স্নেহের সহিত লালন ক'রে এসেছি তা সবই তাহলে বাজে বুজ্‌রুকি। কিন্তু তা-ই যদি হয় —তারপর আর ভাবতে ইচ্ছে করে না। এইরূপ কঠিন একটা আঘাত পেলে অত্যন্ত idealistic মনের বিশ্বাসের ভিত্তিও টলমল ক'রে ওঠে ;—কিন্তু যেমন ক'রেই হোক্, সেটা অটুট রাখা দরকার—নইলে মানুষ বাঁচবে কি নিয়ে ? তবু এ-প্রশ্নকে কিছুতেই ঠেকানো যায় না—এতেই যদি এর পরিসমাপ্তি হ'তে হয়,

তা হ'লে কেন, কেন এতদিন ধ'রে এত দুঃখ দেয়া আর দুঃখ নেয়া ? কিন্তু হয়তো এ-প্রশ্নও অবান্তর। প্রিয়ার ঘরের নবীন অতিথি কেমন অভ্যর্থনা পেল, সে-প্রশ্ন ক'রে বাস্তবিক কোনো লাভ আছে কি ? সাত বছর ধ'রে আপনার আকাশে যত তারা ফুটেছে, তাদের ভুলে যাবেন কি ক'রে ?

পৌষের প্রগতি ভালো লেগেছে জেনে খুসী হলাম। মাঘেরটা ছাপা হচ্ছে;—একটা reasonable সময়ের মধ্যে বেরিয়ে যাবে এইটুকু ভরসা করতে পারি। আপনার কবিতা ঠিক সময়েই এসেছে—মাঘেই যাবে। এবারকার কল্লোলে আপনার কবিতাটা খুব ভালো লাগলো। ভালো গল্পের অভাবে আমার অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট গল্পও যে আমি ছাপতে বাধ্য হই, বাইরের লোক তা না বুঝলেও আপনি বুঝবেন নিশ্চয়ই। গল্প বাইরে থেকে যা পাই তা এত stereotyped যে ছাপা অসম্ভব। নতুন গল্প আমি লিখছি;—খুব আশা করছি আগের চাইতে ভালো হবে। আপনার গল্প আবার কবে পাব ? লিখতে কি আরম্ভ করেছেন ?—পরিমল লেখা একেবারে ছেড়ে দেয় নি, তবে খুব কম লিখছে। এ মাসে ওর কতগুলো জাপানী কবিতার অনুবাদ যাচ্ছে। আপনার 'দক্ষিণ' কবিতাটা আপনি না বললেও ছাপতাম না। ফাল্গুনের কবিতা একটু তাড়াতাড়ি পাঠাতে চেষ্টা করবেন;—কারণ ফাল্গুনে আপনার কবিতা প্রথমে দিতে চাই। কাজেই মাঘেরটা বেরুবার আগেই একটা নতুন কবিতা পেলে সুবিধে হয়,—পারবেন ?

এই পত্র পাওয়া মাত্রই যদি আপনার প্যারাগ্রাফগুলো লিখে পাঠান, তা হ'লে এ-মাসের মাসিকীতে যেতে পারে। আশা করি তা-ই পাঠাবেন। তলায় আপনার কী স্বাক্ষর থাকবে ? 'অ' লিখলে অজিতের সঙ্গে confusion হয়, অথচ সম্পাদকীয় বিভাগে পুরো নাম থাকাটাও বাঞ্ছনীয় নয় বোধ হয়। কোনো একটা ছদ্মনাম নেবেন কি ? আপনার যেরূপ ইচ্ছে।

প্রগতি আগামী বছর চলবে কিনা, এখনও ঠিক করি নি। সাধ তো আকাশের মত প্রকাণ্ড ; কিন্তু পুঁজিতে যে কুলোয় না। এ-পর্য্যন্ত এর পেছনে নিজেদের যত টাকা ঢালতে হয়েছে, তা'র হিসেব করলে মন খারাপ হ'য়ে যায়। এরূপ পুরোপুরি লোকসান দিয়ে আর এক বছর চালানো সম্ভব নয়।

এখনো অবিশ্যি একেবার হাল ছেড়ে দিই নে; গ্রীষ্মের ছুটি হওয়া মাত্র একবার বিজ্ঞাপন-সংগ্রহের চেষ্টায় কলকাতায় যাবো;—যদি কিছু পাওয়া যায়, তা হ'লে 'প্রগতি' চলবে। যথাসাধ্য চেষ্টার ফলেও যদি কিছু না হয়, তা'হলে আর কি করা ? আপনি আর প্রেমেন বাবু মিলে একটা নতুন উপন্যাস যদি লেখেন, তা হলে তা দ্বিতীয় বর্ষের আষাঢ় থেকে আরম্ভ করা যায়। না চললে

অবিশ্যি কথাই নেই। মোট কথা—আষাঢ় অবধি অপেক্ষা ক'রে আপনারা অন্য কোনো কাগজে দেবেন, এইটুকু অনুরোধ আমার রাখতেই হবে। প্রেমেন বাবুর চিঠি পেয়েছি ;—শীগ্‌গিরই উত্তর দেবো ভাবছি, কিন্তু কিই বা উত্তর দেবার আছে ?

আপনি কবে কলকাতা থেকে বেরোবেন ? ঢাকায় কি আসবেন না একবার ? এখন শীত প্রায় কেটে গিয়েছে—আর কয়েকদিন পরেই পল্টনের বিস্তৃত মাঠ অতিক্রম করে হু-হু ক'রে জোয়ারের জলের মত দক্ষিণা বাতাস এসে আমার ঘরে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়বে—যে বাতাস গত বছর আপনাকে মুগ্ধ করেছিল, যে বাতাস আপনার কলম ভেঙেছিল। এবারো কি একবার আসবেন না ? যখন ইচ্ছে। You are ever welcome here—এইটুকু মনে রাখবেন।—

ভালোবাসা ও শুভকামনা জানবেন—

বুদ্ধদেব

॥ ৬ ॥

Buddhadeva Bose

47, Purana Paltan
Ramna, Dacca
The 1st Feb., 1928

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি, কবিতা, পোস্‌টকার্ড ও লেখা পেয়েছি। আপনার কবিতার লাইন কথামত বদলে দেয়া হয়েছে। প্যারাগ্রাফ্‌গুলো মাসিকীতেই দিলাম—টায়-টায় ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত—কাল না পেলে হয়-তো আর এ মাসে দিতে পারতুম না। লেখাটা খুব ভালো হয়েছে—খুবই। আপনি যে-সব কথা লিখেছেন, identically ঠিক এই সব কথা আমি মনে-মনে ভেবেছিলাম এবং সময়ে লিখবো ব'লেও মনে করেছিলাম। এ-মাসে আমার যে প্রবন্ধটা যাচ্ছে, তা'তেও এমন অনেক কথা আছে, যা আপনার সঙ্গে মিলে গেছে। আপনার প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে আমরা একমত। শনিবারের চিঠি সম্বন্ধে ভাষা প্রয়োগ যদিও too strong হয়েছে, তবু ওতে দোষ নেই ;—বরং খুসিই হয়েছি, কারণ এম্‌নি খোলাখুলি খানিকটা গালাগালি খাওয়াই ওদের পক্ষে এখন দরকার। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উক্তিগুলি নিষ্করুণ হ'লেও সত্য—তাই তা'র কোনো পরিবর্তন করার আবশ্যক

নেই। আপনি যে এটা লিখেছেন, সে খবর যথাসম্ভব গোপন রাখবেন, কারণ শনিবারের চিঠি লেখককে চিনতে না পারলেই ভালো। আপনার নিজস্ব style গোপনের চেষ্টা সফল হয়েছে ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভাষাটা খুব জোরালো ও সুশ্রী হয়েছে। এইরকম ভবিষ্যতে আরও লিখবেন—যদি প্রয়োজনবোধ করেন। শনিবারের চিঠিকে এ-কথা টের পাইয়ে দেয়া ভালো যে ওরা যা-কিছু বলছে, তাই দেশের লোক অভ্রান্ত সত্য ব'লে মেনে নিচ্ছে না।

আচ্ছা, বলাহক নন্দী কে, জানেন? ঢাকায় গুজব যে S. K. De—কিন্তু আমাদের তা বিশ্বাস হয় না। Dr. De আর যা-ই হোন, এত mean এবং idiotic হবেন না। তা ছাড়া, স্পষ্টই বোঝা যায় যে লোকটা কলকাতাবাসী।

মাঘের প্রগতি আর দু' তিনদিন পরেই বেরুবে। ফাল্গুনে আপনার কবিতা প্রথমে দিতে চাই ;—আর কারো কিছু হাতেও নেই। তাই এই চিঠির জবাব দেয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই কবিতা পাঠাতে চেষ্টা করবেন ; তা হ'লে আমাদের সুবিধে হবে।

আপনি Summer-এ ঢাকায় আসবেন শুনে খুব খুসি হ'লাম। আমি হয়তো Summer-এর আগেই একবার কলকাতা যেতে পারি। কল্লোলের কোনো খবর পাই নে অনেককাল। DR কে একটা চিঠি লিখেছিলাম—কোনো জবাব পাইনি। একটা কবিতাও পাঠিয়েছিলাম—তা'র কি হ'ল জানি নে। আমরা সবাই ভালো আছি। ভালোবাসা নেবেন।

বুদ্ধদেব

॥ ৭ ॥

Buddhadeva Bose

47, P. P.
RAMNA, DACCA.
19th February, 1928.

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি ও কবিতা পেয়ে যারপরনাই খুসি হ'লাম। আপনার কবিতা আসার আগেই প্রগতি প্রেসে দেয়া হ'য়ে গিয়েছিলো, তাই আপনার কবিতা প্রথমে দিতে পারলাম না—সেজন্য আমারো খারাপ লাগছে। আপনার দ্বিতীয় কবিতাটি সুন্দর হয়েছে—প্রথমে দেয়া যেত।—প্রথমে গেছে প্রিয়ম্বদা দেবীর

একটি ছোট কবিতা—তেমন কিছু নয়, ওর খর্ব্বতাই ওর একমাত্র গুণ। আপনার কবিতা দুটি পরে পাশাপাশি দিলাম। আগামী মাসে ঠিক সময়ে কবিতা পাই যেন—বুঝলেন ?

প্রগতিকে টিকিয়ে রাখা সত্যিই বোধ হয় যাবে না। তবু একেবারে আশা ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে না—কুসংস্কারগ্রস্ত মনের মত miracleএ বিশ্বাস করবার দিকে ঝুঁকে পড়ছি। প্রগতি উঠে গেলে আমার জীবনে যে vacuum আসবে, তা আর কিছু দিয়েই পূর্ণ করবার মত নয়—সেই হিসেবেই সবচেয়ে খারাপ লাগছে। যাক্ গে। কালি-কলম কি আর এক বছর চলছে ? মাঘের কালি-কলম এখনো পাইনি কিন্তু। হ'ল কি ?

আপনার শরীর দেখছি কখনোই ভালো থাকে না। এর একটা কোনো ব্যবস্থা কি করতে পারেন না ? প্রত্যেক চিঠিতেই আপনার শরীর খারাপ জেনে ভারি খারাপ লাগে। আপনার পরীক্ষা কি হ'য়ে গেছে ? অজিতের Subsidiary exam. শেষ হ'ল। মোটেই ভালো করে নি। তা'তে অবিশ্যি আসে যায় না। আগামী বছর honours-এ ভালো করলেই ভালো। April মাসে আমরা সবাই কলকাতা যাবার চেষ্টা করব—অন্ততঃ আমি তো। আপনি থাকবেন তো ?

এবারকার কল্লোলে শৈলজার ছবি দিয়েছে দেখে ভারি আনন্দ পেলাম। আধুনিকদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, তাঁদের যথাযোগ্য সম্মান করার সময় বোধ হয় এসেছে। তাহ'লে কিন্তু একবার মোহিতলালের ছবিও দিতে হয় ;—কারণ আজকের দিনে কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন শৈলজানন্দ, কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেম্‌নি মোহিতলাল—নয় কি ?—

আপনার কল্লোলের কবিতা দু'টির মধ্যে মেঘ্‌না নদীটা বিশেষ ভালো লাগলো না—অন্যটি বেশ। (হেমেন্দ্রকুমার রায়ের যে কবিতাটা প্রথমে দেয়া হয়েছে, ওটা অত্যন্ত idiotic কবিতা হয়েছে—ওটার উপযুক্ত স্থান ছিল waste paper basket. ও কবিতা select করেছে কে ? আপনি ?)

আমি শীগ্‌গিরই কল্লোলের জন্য আপনার কাছে একটি কবিতা পাঠাব—DR নেই, তাই। যদি সম্ভব হয়, চৈত্র মাসেই সেটা ছাপতে চেষ্টা করবেন।

ইতিমধ্যে নৃপেন-দার এক ইংরিজি চিঠি পেয়েছি—চিঠি তো নয়, যেন কবিতা। আমার সৌভাগ্য !

ভালোবাসা নেবেন। চিঠির জবাব দিতে আমার মত দেরি ক'রে ফেলবেন না। ইতি— আপনাদেরই

বুদ্ধদেব

॥ ৮ ॥

Buddhadeva Bose

47, PURANA PALTON,
RAMNA, DACCA.
27. 2. 28

'প্রিয়বরেষু',

আপনার চিঠি ও কবিতা তিনটি পেয়ে খুব খুসি হ'লাম। কবিতা তিনটিই আমরা ছাপবো ;—তবে এক মাসে নয় অবিশ্যি। 'হেনা' ছাড়া অন্য দু'টো চৈত্রে দেবো। আমাদের মতে 'এই মোর অপরাধ' কবিতাটিই সবচেয়ে ভালো হয়েছে, অথচ আপনার কথার সুরে বোধ হ'ল, ও-কবিতাটি আপনি বিশেষ আমলে আনতে চান না। আশ্চর্য্য! 'কোথায় তোমারে দেখেছি বল ত'-ও সুন্দর হয়েছে—খুব একটা freshness আছে। Stale নয় মোটেও। তিনটির মধ্যে হেনারটাই একটু weak হয়েছে। হেনার কপাল মন্দ।

আপনার কাছে কল্লোলের জন্য একটা কবিতা পাঠাচ্ছি ;—DR এখন কলকাতায় নেই, তাই। আপনিই এর যা-হোক্ একটা ব্যবস্থা করবেন। কবিতাটা একটু বড় হ'য়ে গেছে—কিন্তু অনাবশ্যক দীর্ঘ হয়নি, আশা করি। তবু দু'কলমে ছাপলে কল্লোলের পৃষ্ঠায় খুব জায়গা নেবে না বোধ হয়। কবিতাটা একটু নতুন ধরণের ;—আপনাদের কেমন লাগলো, জানবার জন্য উৎসুক হ'য়ে রইলাম।

নজরুল ইস্‌লাম এখানে দিন-কতক কাটিয়ে গেলেন। এবার তাঁর সঙ্গে ভালোমত আলাপ হ'ল। একদিন আমাদের এখানে এসেছিলেন ;—গানে, গল্পে, হাসিতে একেবারে জমাট্ ক'রে রেখেছিলেন। এত ভালো লাগলো। আর ওঁর গান সত্যি অদ্ভুত! একবার শুনলে সহজে ভোলা যায় না। আমাদের দু'টো নতুন গজল দিয়ে গেছেন ;—স্বরলিপি সুদ্ধ ছাপবো, ভাবছি।

নাট্যমন্দির এখানে এসেছে। আজ, কাল, পরশু—তিন রাত অভিনয় হবে—যথাক্রমে 'সীতা', 'ষোড়শী' ও 'আলমগীর'। আমি আজ যেতে পারলাম না—একদিনও যেতে পারবো না হয়তো। অর্থাভাব। যাক্, একবার তো দেখেইছি। এরপর আবার ষ্টার্ আসছে। ঢাকাকে একেবারে লুটে নেবে।

আমাদের কলেজ ছুটি হ'তে-হ'তে April-এর second week. তাই আপনি আসা অবধি এখানেই আছি। আপনি আসবেন ব'লে দিন গুনছি। সুখে হোক, দুঃখে হোক,—বন্ধুর স্নেহোপভোগের চাইতে বড় আনন্দ কিছু নেই।

প্রগতি সত্যি-সত্যি আর চললো না। কোনোমতে জ্যৈষ্ঠটা বের ক'রে দিতে পারলেই যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। তবু যদি কখনো অর্থাগম হয়। আবার কি না বা'র করবো? এ তিন মাসের ভেতর আর একটা গল্প দিতে পারেন না আমাদের?

বেদে ও টুটা-ফুটা বৈশাখের আগেই বেরুবে জেনে খুসি হ'লাম। বেদের cover-design কেমন হয়েছে? আমাকে উৎসর্গ-পত্র লিখতে বলেছেন কেন? আপনার চেয়ে কি ভালো লিখতে পারবো?

চিঠি লিখবেন। এবার জবাব দিতে বড় দেরি করেছেন—খুব খারাপ লাগছিলো। এরূপ দেরি আর যেন না হয়। আপনার মা-কে আমার প্রণাম জানাবেন।

ফাল্গুনের প্রগতি কাল বেরুবে। আপনার শরীর ভালো আছে জানতে পেলে খুসি হব। ইতি

আপনাদেরই

বুদ্ধদেব

পুনশ্চ:—'শিরার শোণিতে হ'ল স্পন্দিত বাত্যার বিদ্রোহ'—এই লাইনটি পড়তে একটু আট্‌কে যায়। 'স্পন্দিত হ'লে' অনেক ভালো শোনায়। আপনার অনুমতি পেলে বদ্‌লাতে পারি।